ভারতের মুসলিম স্থাপত্য

সম্পাদনায় :

ড. সুলতান আহমদ

প্রাক্তন সভাপতি, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ,

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

দুটি কথা

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমন শুধুমাত্র রাজনৈতিক পরিমণ্ডলেই কৃতিত্বের চিহ্ন রাখে নি বরং এদেশের শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, স্থাপত্যকলা, চিত্রকলা প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাদের অসামান্য প্রতিভার স্বাক্ষর দিবালোকের ন্যায় উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে। মোহাম্মদ ঘোরী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মুসলিম শাসন একদা পরিণত হয় মহীরুহে। মুসলমানগণ শাসনব্যবস্থায় যেমন সফলতা বয়ে নিয়ে এসেছিল অনুরূপভাবে স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রেও ভারতীয় স্থাপত্যকলাকে বিশ্বের যে কোনো স্থাপত্যকলার সমকক্ষ করে তুলতে সক্ষম হয়েছিল।

ভারতের মুসলিম স্থাপত্যের একটি আঞ্চলিক শাখার ওপর গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার সময় আমি ভারতের বিভিন্ন শহর, বন্দর, কসবা, গ্রাম ইত্যাদি পরিদর্শন করেছি এবং ঐগুলোর মুসলিম স্থাপত্যের চোখ ধাঁধানো ইমারত দৃষ্টে মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম দেশে ফিরে এগুলো সম্পর্কে মাতৃভাষায় কিছু লিখব। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সাথে যুক্ত হওয়ার পর থেকে আমি দেশী ও বিদেশী গবেষণাধর্মী কিছু জার্নালে ভারতীয় স্থাপত্যকলার ওপর বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশ করি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মহারাজা সাঁয়াজীরাঁও ইউনিভার্সিটিতে অধ্যয়নকালে আমি আমার পরম শ্রদ্ধেয় গুরুজন প্রফেসর সিরাজুল ইসলামের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পাই। তিনি ঐ সময় হার্বার্ড ইউনিভার্সিটিতে ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে কর্মরত ছিলেন এবং আগা খান ট্রাস্টের সহায়তায় 'ডকুমেন্টাশন অব ইসলামিক মনুমেন্টস্ ইন সাউথ এন্ড সাউথ-ইস্ট এশিয়া' শিরোনামে একটি প্রজেক্ট পরিচালনা করছিলেন। তিনি আমাকে উক্ত প্রজেক্টের অন্তর্ভুক্ত করায় আমি ভারতের পশ্চিমাঞ্চলীয় বেশ ক'টি রাজ্যের মুসলিম স্থাপত্য পরিদর্শনের সুযোগ পাই। এগুলো থেকে আহরিত জ্ঞানই আমাকে মাতৃভাষায় লিখতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত কার্যক্রম ধীর গতিতে এগিয়ে চলছিল। বিগত জুন (২০০০) মাসে হঠাৎ করেই শাহ মুজিবুল আলম চৌধুরী নামে এক আমেরিকা প্রবাসী বাঙালি ভদ্রলোক আমার সঙ্গে দেখা করে স্থাপত্যকলার ওপর বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত একটি পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর করেন। আমি পাণ্ডুলিপিখানা আদ্যোপান্ত পাঠ করার পর লক্ষ করি যে উনি দীর্ঘদিন যাবৎ লেখাপড়ার সাথে বিচ্ছিন্ন থাকার প্রকট ছাপ এতে রয়েছে। তবে পাণ্ডুলিপিখানা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পারিমার্জন ও নতুন কিছু সংযোজন করলে একটা আশানুরূপ ফল পাওয়া যাবে বলে আমি আশান্বিত হই। আমার দীর্ঘদিনের গবেষণালব্ধ ফলাফলের সাথে এ পাণ্ডুলিপিখানার কিছু কিছু অংশ সমন্বয়ের মাধ্যমে এটি বর্তমানরূপ লাভ করেছে। আশা করি স্থাপত্যের পাঠক-পাঠিকাসহ ছাত্রছাত্রীরা এ থেকে উপকৃত হবে।

মাতৃভাষায় স্থাপত্যকলার ইতিহাস লেখা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য কাজ। কারণ স্থাপত্যকলায় ব্যবহৃত অধিকাংশ শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ পাওয়া দুষ্কর। ইচ্ছা থাকলেও প্রতিশব্দের অভাবে অনেক সময় ল্যাটিন বা গ্রিক শব্দ ব্যবহার করতে হয়েছে। আবার কখনো দুর্বোধ্য বাংলা শব্দ ব্যবহারে বাক্যের মনোহারিত্ব লোপ পেয়েছে। আশা করি সুধীমহল আমার দৈন্যদশা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি ঐ সকল দেশী ও বিদেশী গ্রন্থকারবৃন্দকে যাঁদের গ্রন্থ থেকে আমি ভূমি নকশা ও আলোকচিত্র গ্রহণ করেছি। আমি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক প্রফেসর এ.বি.এম. হোসেনকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি যিনি পাণ্ডুলিপিটির শিরোনাম নির্ধারণে পরামর্শ দিয়ে উপকৃত করেছেন। আমি ধন্যবাদ জানাই প্রফেসর হাবিবা খাতুনকে যিনি পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুতের সময় আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করেছেন। পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুতের সময় আমার স্ত্রী মিসেস তাছমিনা আহমদ, পুত্র নাতেক আহমদ ও পরম আদরের কন্যা তাবাসসুম আহমদ তাসমীকে যথাযথ সময় দিতে না পারায় এদের কাছে আমি ঋণী। সকাল-সন্ধ্যা এদের অনুসন্ধিৎসু জিজ্ঞাসাই পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতের কার্য ত্বরান্বিত করেছে।

পাণ্ডুলিপিটি প্রস্তুতে আমাকে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছেন আমার স্নেহাস্পদ এম.ফিল. ফেলো জনাব এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম। প্রকাশনার কাজে তাকে প্রেস পর্যন্ত যেতে হয়েছে। আরো সাহায্য করেছেন জনাব আমিনুর রহমান (এম.ফিল. ছাত্র)। এদের সাহায্য না পেলে হয়তো বইটির প্রকাশনা আরো দেরি হয়ে যেত। পাণ্ডুলিপিখানা কম্পিউটার কম্পোজ করার কাজে জনাব ছাইফুল ইসলাম অত্যন্ত দক্ষতাসহকারে কম্পোজ করেছেন। তার নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই গ্রন্থটি বর্তমান অবস্থায় এসেছে।

পরিশেষে আমি ধন্যবাদ জানাই জনাব আলমগীর রহমানকে যিনি পাণ্ডুলিপিটি যত্নসহকারে প্রকাশের সকল দায়িত্ব গ্রহণ করে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ রেখেছেন। ধন্যবাদ জানাই মোঃ জাকির আহমেদকে যিনি কম্পিউটারে প্রচ্ছদ, ভূমি নকশা, আলোকচিত্র ও মানচিত্র অতি দক্ষতার সাথে স্ক্যানিং করে পাণ্ডুলিপিটির কম্পোজের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। পাণ্ডুলিপির প্রুফ রিডিং-এ জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান যথেষ্ট সাহায্য করায় তাকে জানাই ধন্যবাদ।

পাণ্ডুলিপিতে এখনো বেশ কিছু বানানের প্রমাদ রয়ে গেছে—এজন্য আমি পাঠকবৃন্দের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী। আশা করি পরবর্তী সংস্করণে এ ত্রুটিগুলো দূরীভূত করার চেষ্টা করব—পাঠকবৃন্দ আমার ত্রুটিগুলো ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন এটাই আমার প্রত্যাশা।

সূচিপত্র

ভূমি নকশার তালিকা

আলোকচিত্র তালিকা

অতিরিক্ত আলোকচিত্র

প্রথম অধ্যায়
উপক্রমণিকা

স্থাপত্য মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের দর্পণ। মানব সংস্কৃতির শিরা-উপশিরায় এর ব্যাপ্তি। অন্যকথায় মনুষ্য হৃদয়ে উপ্ত মনীষারই প্রতিচ্ছবি স্থাপত্য। সভ্যতার ঊষালগ্নে এ অনির্বাণ জ্ঞানশিখার সূচনা, এরই রন্ধ্রে রন্ধ্রে এর পদচারণা। মানব সভ্যতার উন্মেষ ও বিকাশের স্তরে স্থাপত্যকীর্তির গঠনে, গাঁথুনিতে এবং অলঙ্করণে গ্রোথিত করে রেখেছে স্ব স্ব জাতীয় ঐতিহ্যময় মনীষা। যে মনীষা অবলম্বনে স্থাপত্যকীর্তির আদি ইতিহাস ও বিস্তৃতি রোমন্থন সম্ভব এবং বিভিন্ন জাতির স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও স্থাপত্যরীতির মৌলিকত্ব ঐ জাতিগুলোর স্থাপত্যকলার আদিমূল খুঁজবার অবকাশ সৃষ্টি করে দেয়, আর সে একই ধারা বা পদ্ধতি অনুশীলন করে অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের মহামিলন সেতুর পটভূমি বিশ্লেষণ করা যেতে পারে।

মানব ইতিহাসের ধারায় দুটি বৃহৎ অথচ বিপরীতমুখী সংস্কৃতি ও সভ্যতার সমন্বয় কদাপি দৃষ্ট হয়, যেরূপ ঘটেছিল হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যশিল্পের যাত্রাপথ সূচনায় হিন্দু ও মুসলিম উপকরণ ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে যদিও এ দুজাতির শিল্পবোধ, সংস্কৃতি, জীবনযাত্রা ও ধর্মীয় আচরণের দিক হতে ছিল একেবারেই স্বতন্ত্র ও পৃথক, তথাপি উভয়ের যৌথ প্রতিভায় বা মিলিত ভাবরস ও উপাদানে যা গড়ে উঠেছিল তা ছিল এ দেশের সংস্কৃতি বিপ্লব ও শিল্প চেতনার নব রূপায়ণ।

এগুলোর মধ্যে স্থাপত্যে বিকশিত প্রতিভা অধিকতর আকর্ষণ যুগিয়েছে। পার্থক্যাবলি এদের পারস্পরিক প্রভাবের ইতিহাসকে অদ্ভুতভাবে তাৎপর্যময় করেছে। অবশ্য এ সব স্থাপত্যকীর্তি সৃষ্টির সঠিক মূল্যায়নে কতটুকু বৌদ্ধ বা হিন্দু আর কতটুকুই বা মুসলিম উপকরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল তা প্রণিধানযোগ্য। এর সমালোচনায় কিছু কিছু স্থপতি পশ্চিমা দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সঙ্গতি রাখতে গিয়ে হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যশিল্পকে স্থানীয় একটা বিশেষ মুসলিম সংস্করণ বলে অভিহিত করেছেন।

অন্যপক্ষে আবার অনেকে এতে মুসলিম আদর্শের চেয়ে ভারতীয় আদর্শের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে একে হিন্দু ভাবধারার দ্বারা প্রভাবিত সংস্কারপ্রাপ্ত স্থাপত্য ছাড়া আর কিছুই বলে আখ্যায়িত করতে পারেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একদিকে যেমন মুসলিম স্থাপত্য হতে উদাহরণ উদ্ধৃত করা যায়, যার সাথে হিন্দু বৈশিষ্ট্যসংবলিত স্থাপত্যের সাদৃশ্য বিদ্যমান এবং মনে হয় একটি অন্যটি হতে অবিভাজ্য; অন্যদিকে আবার সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় প্রভাব বর্জিত মধ্য এশিয়ার সমরখন্দ, বুখারা এবং পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোর বড় বড় শহরগুলোতে

যথা- দামেস্ক, সামাররা ও বাগদাদে নির্মিত কীর্তির অনুরূপ আদর্শের স্থাপত্য সৌধ ভারতে নির্মিত হয়েছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। অথচ এ দু চরম মনোভাবপূর্ণ সমালোচনা বাস্তবের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় এবং এ জাতীয় পক্ষপাতদুষ্ট ধারণা বিভ্রান্তিজনক। অবশ্য এ দু মতবাদকে অবলম্বন করে অনেক যুক্তির অবতারণা করা যেতে পারে।

মূলত: ভারতে স্থাপত্য ক্রমবিকাশের চলমান ধারা হিন্দু যুগে যার সূত্রপাত হয়েছিল তা কখনই থেমে যায় নি। তবে এটি ধীরে ধীরে দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এর আকার ও বৈশিষ্ট্যগত আদর্শের পরিবর্তন এসেছিল। এ পরিবর্তন ব্যবহারকারীদের প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন আয়োজনে দিনে দিনে বিকশিত হয়ে ওঠে। এর ফলে স্থাপত্য নির্মাণ পদ্ধতি ও পরিচর্যায় যে নতুন ধারার আবির্ভাব ঘটেছিল তাই নতুন ধরনের স্থাপত্য ইমারত ভাবতের বুকে প্রথমবারের মতো সৃষ্টির সুযোগ কবে দিয়েছিল।

ভারতের স্থাপত্যশিল্প সময় ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের ধারার সাথে সম্পৃক্ত হয়ে সমৃদ্ধিলাভ করেছিল। তবে মুসলমানদের ভারতে আগমনের প্রায় সাথে সাথে পূর্বের হিন্দু পদ্ধতির স্থাপত্য অনুশীলন একেবারে থেমে না গেলেও কোনো শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নি। এটি স্মরণ করা যেতে পারে যে ভারতের বাইরে এশিয়ার অন্যান্য দেশে বা আফ্রিকা ও ইউবোপে ইসলামি স্থাপত্য আন্দোলনের ধারা তেমন প্রাধান্য বিস্তাবে সমর্থ না হলেও ভারতের বুকে এটি সম্ভবপর হয়েছিল। কেননা বিশ্ব বিজয়ের মাধ্যমে বহুজাতির আদর্শের সাথে যখন মুসলমানদের পরিচয় ঘটেছিল তখন তাদেরকে বিজিত জাতিগুলোর আদর্শ হতে অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয়েছিল। উল্লেখ্য যে, মরুভূমির তাঁবুতে বসবাসকারী আরবদের অন্যকে দেওয়ার মতো স্থাপত্য জ্ঞান ছিল না।

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটে এটি ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম। এখানকার সংস্কৃতি, আচার ও ধর্মের মতো এত বিপরীত বৈশিষ্ট্যের সংঘাতময় অবস্থাব সাথে কখনই মুসলমানদের ইতঃপূর্বে সংযোগ ঘটে নি। বস্তুতঃ খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী থেকে ভারতে জৈন ও বৌদ্ধ মন্দির, বিহার ও আশ্রম নির্মাণের মধ্য দিয়ে ভারতের বুকে স্থাপত্যের পদযাত্রা শুরু হয়েছিল। মন্দির নির্মাণে সুষম প্রস্তর খণ্ড ও অসম প্রস্তর খণ্ড, চেপ্টা আকারের ইট, পোড়ামাটির ফলক ও গুটিকা ব্যবহৃত হয়েছে যা মৌর্য স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান। অবশ্য পরবর্তীকালে মুসলিম শাসকদের স্থাপত্য উপকরণেও এ বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়।

বলা বাহুল্য প্রস্তর নির্মিত কাষ্ঠ স্থাপত্য অনুসারী স্তূপা, ইমারত, ভাস্কর্য ও উত্থিত অলঙ্করণ অথবা আয়তাকার মিলনায়তন ও এর পশ্চাতে অর্ধবলয় প্রকোষ্ঠ বৌদ্ধ-বিহান, যার চতুর্দিক প্রসাবিত প্রদক্ষিণ পথ কেন্দ্রীয় ভজনালয়টিকে অস্পৃশ্যতার হাত হতে মুসলিম আমলের প্রসারিত মসজিদের বিপরীত আদর্শ সংবলিত ভজনালয় সৃষ্টি হয়েছিল তা মুসলিম আদর্শের সর্বজনীনতাকে মালিন্য দান করতে পারে নি। ফলে এর কোনো প্রভাব দৃশ্যত মুসলিম স্থাপত্যের পথ নির্দেশে সহায়ক হতে পারে নি।

মুসলিম পূর্বযুগে হিন্দু স্থাপত্যের পরবর্তী স্তরেও গুপ্তদের আমলে ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রচণ্ড আচার-নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা ও ধর্মীয় স্বেচ্ছাচারের প্রাবল্যে মন্দির স্থাপত্য যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তাতেও অঙ্গ-সৌষ্ঠব রচনায় কাষ্ঠ স্থাপত্যরীতির কলাকৌশল দ্বারা প্রভাবিত বৌদ্ধ আদর্শ নিষিক্ত করে হিন্দু মন্দিরগুলো যেভাবে রূপায়িত হয়েছিল তা কড়ি বা তীরের বাহন করার জন্য আলম্বযুক্ত (brackets) প্রস্তর স্তম্ভ, স্ফীত উৎকীর্ণ নকশা যুগল, সমতল ছাদ, ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে গড়ে ওঠা দালানকোঠায় দৃষ্ট হয়েছে।

এ পদ্ধতিতে সমশায়িত তীরের উপর প্রস্তরের শায়িত তক্তার দল (চেপ্টা শিলাখণ্ড) আস্তে আস্তে ভিতরের দিকে অগ্রসর হতে হতে অবশেষে শূন্য স্থানটিতে ছাদের আকার দান করেছে। এভাবে প্রবেশ পথের দু ধারে ফলকগুলো উভয় দিক হতে ক্রমশ মুখোমুখি অগ্রসর হয়ে এক শীর্ষবিন্দুতে মিলিত হওয়ার ফলে খিলানের ন্যায় শূন্য স্থানটি পূরণ করতে সক্ষম হত। এভাবে গড়ে ওঠা সমতল ছাদ, সম্মুখভাগে থাম বিশিষ্ট দরদালানসহ বর্গাকারের যে প্রকোষ্ঠ গড়ে উঠত তাই মন্দির স্থাপত্যের সাফল্যজনক অবদান যার সাথে মুসলিম স্থাপত্যের কোনো সম্পর্ক ছিল না।

অনুরূপভাবে সপ্তম শতাব্দীর মন্দির স্থাপত্য নিদর্শনের কিছু উন্নয়নমূলক আভাস সূচিত হয়ে মন্দির ছাদের উপর আর একটি কক্ষ স্থাপনের প্রচেষ্টা নিয়ে ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতির যে উন্নতি সাধন করেছিল তাতে মন্দিরের আকার ক্রমে ক্রমে আকাশের দিকে উত্থিত হলেও কেন্দ্রীয় উপাসনালয় পূর্ববৎ রয়ে শুধুমাত্র ব্রাহ্মণ ও দেবতার স্থান সংকুলান করেছিল, সাধারণ ভক্তের জন্য কোনো স্থান বরাদ্দ এতে হয় নি; বরং মন্দিরের শীর্ষভাগ ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নিচে ভারবাহী দেয়ালের মধ্যবর্তী প্রবেশদ্বার সংকীর্ণ হতে সংকীর্ণতরে রূপান্তরিত হয়।

ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে সর্দল বা এক খণ্ড প্রস্তরের উপরে সমস্ত ভারকে ধরে রাখার দায়িত্ব পালন করার ফলে এর আকার যত ছোট হত ততই শক্তিশালী বলে বিবেচিত হত; পক্ষান্তরে এটিই প্রকোষ্ঠের দরজা-জানালা প্রয়োগের সুবিধা হতে বঞ্চিত করে প্রকোষ্ঠ অভ্যন্তরকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলত। এ সংকীর্ণ অবয়বময় হিন্দু স্থাপত্য ধর্মীয় জীবন ছাড়া লৌকিক স্থাপত্য গঠনের স্বাভাবিক স্পন্দন বিধৃত করতে সমর্থ হয় নি।

এর পরবর্তী সময়ে বা মন্দির স্থাপত্যের সর্বশেষ পর্যায়ে নবম শতাব্দীর প্রারম্ভে রূপায়িত হিন্দু স্থাপত্য যেভাবে প্রকাশমান ছিল তা মুসলিম আমলের বিশাল স্থাপত্য প্রচেষ্টার নিকট অকিঞ্চিৎকর রূপে প্রতিভাসিত হতে অপেক্ষা রাখে নি। এ তৃতীয় ধাপের মন্দির স্থাপত্যের নতুন সংযোজন বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠটি পূর্বের ন্যায় উপরের দিকে উঠে গিয়েছে এবং এর পার্শ্বে স্তম্ভ পরিশোভিত এক খোলা মিলনায়তন বা মণ্ডপ দণ্ডায়মান রয়ে থাম সারির উপর একটি খোলা বারান্দা মন্দির ও মণ্ডপের মাঝে সংযোগ রচনা করেছে।

দরজায় পাথরের চৌকাঠ বা কাঠামো, ফুল ও জ্যামিতিক নকশা এবং ভাস্কর্যে অলঙ্করণ দৃশ্যমান হয়েছে। এখানে পুজাপ্রার্থীদের ভক্তির আবেশ প্রদর্শনের সুযোগ করে দেওয়ার অভিলাষে মন্দিরকে প্রদক্ষিণ করে চারধার মোড়াই করার প্রবণতার সূত্রপাত এ সময় সূচিত হতে দেখা যায়। এর সাথে মুসলিম ভাবাদর্শের সাম্য-মৈত্রীর নিগূঢ় সম্পর্ক রচিত হতে সমর্থ না হলেও আপাতত অতি সূক্ষ্ম ভাবরসের সূত্র একত্রে গ্রোথিত হওয়ার প্রয়াস সৃষ্টি করেছিল।

ভারতে প্রাক-মুসলিম স্থাপত্য বলতে মন্দির নির্মাণের কার্যক্রমের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল এবং এর পূর্বাপর পর্যালোচনায় তিনটি শিল্পরীতি বা শৈলীর পরিচয় ধরা পড়ে; প্রথমটি ইন্দো-আর্য, দ্বিতীয়টি দ্রাবিড়ীয় এবং তৃতীয়টি এ উভয়ের সমন্বয়ে চরম উৎকর্ষময় শেষ ধাপ বা স্তর। প্রথমটির আকৃতি লম্বমান বা আকাশের দিকে উত্থিত, দ্বিতীয়টি পাশাপাশি মন্দির প্রকোষ্ঠের প্রসারণ এবং তৃতীয়টি খাড়া মন্দির ও তার সাথে পার্শ্বগামী মন্দিরের সমন্বয়ে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ এক নতুন স্থাপত্য আদর্শ চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত থাকতে দেখা গিয়েছিল। এ ধাপে এসে মন্দিরগুলো ক্রমপ্রলম্বন বা কর্বেল পদ্ধতির পরিবর্তে খিলান

পদ্ধতির অর্ধ-গোলাকার কুলঙ্গির (niche) ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে এ খিলানগুলো প্রকৃত পদ্ধতি প্রয়োগে নির্মিত খিলান ছিল না। এটি পরপর খাড়াভাবে সংস্থাপিত চৌকা ইট বা প্রস্তর খণ্ড ব্যবহারের দ্বারা সর্দল সম্বলিত ছোট দরজা বা জানালা হতে কিছুটা প্রসারিত আকারে নির্মাণ করে দেবমূর্তির স্থান সংকুলান করে দেওয়ার প্রচেষ্টায় সফলতা আনয়নে সক্ষম হয়ে উপরের ভার দেয়ালের মধ্যে বণ্টন করার কারিগরি প্রযুক্তি খিলান পদ্ধতির ব্যবহারের পূর্ব ধাপের সূচনার কথা স্মরণ করে দেয়। এতে ভূঁসোয়া (voussoir) যোগে নির্মিত বৈশিষ্ট্যপূর্ণ খিলান স্থাপত্যশৈলী অর্জনের আভাস সংবলিত মনে করার কোনো কারণ নেই।

মুসলমানেরা এ উপমহাদেশে আগমন করে যে স্থাপত্যশৈলী ও অলঙ্করণ দেখতে পেয়েছিল তা তাদের স্থাপত্যশৈলী বা আদর্শ হতে স্বতন্ত্র ও অনেক ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। এটি মুসলমানদের সৌন্দর্যানুভূতির অলঙ্কার এবং বিলাসের সংযমতাকে অতিক্রম করেছিল। মুসলমানেরা বিশ্বাস করে যে সৌন্দর্য সৃষ্টির মূলে ঐকান্তিক সংযমই সাফল্যজনক সৌন্দর্য সৃষ্টির পূর্বশর্ত। তা সত্ত্বেও বাস্তবে দেখা যায় যে, দুটি ভিন্নমুখী কৃষ্টির বিরোধকে উপেক্ষা এবং আঞ্চলিক আবহাওয়ার সক্রিয় প্রভাবকে অবহেলা করে বরেণ্যকে গ্রহণের মানসিকতা নিয়ে তারা সানন্দে হিন্দু স্থাপত্য নির্মাণশৈলীকে গ্রহণ করেছিল। তাই মন্দির স্থাপত্যের একঘেঁয়েমি লৌকিক স্থাপত্য রূপায়ণে যে বৈচিত্র্য ও রকমারিত্ব সৃষ্টি করতে পেরেছিল তা এ উপমহাদেশে ইতঃপূর্বে দৃষ্ট হয় নি।

তাই কালক্রমে সংকীর্ণ মন্দির স্থাপত্যের কৌশল প্রয়োগের ফলে যে বিশাল নামাজঘরের পরিণতিপ্রাপ্ত হয়ে খিলানের ব্যবহারে দরজা-জানালার প্রসারতা ও সৌন্দর্য প্রকাশক গাত্রালঙ্কার সমাবেশিত হয়ে ইন্দো-মুসলিম শিল্পশৈলী বা রীতির পুষ্পায়ন যে সুখকর আবেদন সৃষ্টি করেছে তা হিন্দু ও মুসলিম স্থপতিদের মনীষা নিঃসৃত হাজার বছরের ফলশ্রুতি এবং তাতে মুসলিম প্রভাব অপরাপর প্রভাবকে অতিক্রম করতে সমর্থ হয়েছে।

স্পষ্টত, হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যশিল্প হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণে পরিপুষ্ট নতুন এক বৈপ্লবিক অবদান। বলা বাহুল্য এ উভয় স্থাপত্যরীতির উপকরণ ও কৌশল, বৈশিষ্ট্য, কারুকার্য ও নকশালঙ্কার গ্রহণের মাত্রা সব সময় রক্ষা করে একটা সুনির্দিষ্ট পথে গড়িয়ে অগ্রসরমান হয়েছিল এমনও নয়। গভীরভাবে ভেবে দেখলে এটি অবশ্য স্বীকার করতে হয় যে, ইসলামি স্থাপত্যের রূপরেখা অন্যান্য বিজিত দেশগুলোতে যেভাবে গড়ে উঠেছিল ভারতে পরিবেশগত স্বতন্ত্রতার কারণে তার কিছুটা বিচিত্রতা প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে।

এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, হিন্দু স্থাপত্যের মন্দির নির্মাণ কলাকৌশলের তিনটি বিবর্তনমান শিল্পরীতির অনুসরণ মুসলিম স্থাপত্যের সাথে যে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে তাই ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের গোড়াপত্তনে এর মৌলিক উপকরণ ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে সহনশীলতার মধ্যদিয়ে নিষিক্ত করে নিতে কোনোরূপ অন্তরায় সৃষ্টির ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় নি এবং পরবর্তীকালে খিলাননির্ভর ও স্তম্ভ-সর্দল পদ্ধতি (arcuate and trabeate system) একত্রে নতুন অবয়ব এ উপমহাদেশের স্থাপত্য মানসে অভূতপূর্ব মনোহারিত্ব সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে স্থাপত্য পদ্ধতির স্বতন্ত্রতা থাকা সত্ত্বেও মুসলমানেরা এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতো বা ইউরোপ-আফ্রিকায় তাদের নিজস্ব প্রচলিত ও সংগৃহীত রীতির সাথে প্রয়োজনবোধে স্থানীয় উপকরণ ও কৌশল সংযোজিত করে একে নিজেদের ব্যবহার উপযোগী করে তুলেছিল।

মনস্তাত্ত্বিক দিক হতে এটি গ্রহণযোগ্য যে, যখন কোনো জাতির ঐতিহ্যগত প্রশ্নের সৃষ্টি হয় না তখন তা নতুনভাবে গ্রহণ করতে কোনো সংকোচ, দ্বিধা বা বাধা থাকতে পারে না। এ প্রসঙ্গে এটি স্বীকৃত যে, ইসলাম পূর্বযুগে আরবদের উন্নত স্থাপত্যশিল্প সংক্রান্ত কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। তারা মুসলমান হিসেবে শাসক জাতিতে পরিণত হওয়ায় যে নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা তাদের জ্ঞানচক্ষুকে সামনে প্রসারিত করেছিল। তারা এবাদতখানা বা মসজিদ নির্মাণ প্রতিদ্বন্দ্বী জাতিসমূহেব ইমারত হতে আকর্ষণীয় ও উৎকৃষ্টতর করে গড়ে তোলাও অপবিহার্য বলে মনে কবেছিল। কারণ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ আভিজাত্যবোধ যে কোনো মূল্যে বজায় রাখতে গিয়ে বিজিত অঞ্চলের স্থপতি ও কারিগরদের কলাকৌশলকে কাজে লাগাতে বিশেষভাবে প্রয়োজনবোধ করেছিল।

এ প্রয়োজনবোধই একদা মুসলিম কৃষ্টির দ্বাবোদঘাটন করেছিল। অবশেষে আবব মুসলমান ও ধর্মান্তরিত মুসলমান পরবর্তীকালে পূর্বপুরুষের শিল্প চেতনা ও উপলব্ধিবোধ অক্ষুণ্ন রেখে অবমানসে স্থাপত্যশিল্প সাধনার সামঞ্জস্যপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল। এ নতুন সংস্কৃতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্র ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত—পূর্বাঞ্চলের বিরাট সাসানীয় সাম্রাজ্যের পারস্য সভ্যতা, সিরিয়া-প্যালেস্টাইন হতে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় বাইজান্টাইন সভ্যতা এবং উত্তর আফ্রিকার মিসরীয় পিবামিড সভ্যতার জনপদ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল।

সেকালের এ দু শ্রেষ্ঠ সভ্যতার ওপর প্রতিষ্ঠিত শাসনদণ্ড মুসলমানদের নিকট পদানত হওয়ার সাথে সাথে তৌহিদবাদীদের রীতি ও আচার বিজিতদের কৃষ্টিতে নিষিক্ত হয়ে এবই মাঝে এক অনুপম ইসলামি স্থাপত্যের সঠিক জন্মলাভ সম্ভবপর হয়ে উঠেছিল। যেহেতু মুসলমানেরা একই ইসলামি আচার কৃষ্টি কেন্দ্রবিন্দু হতে সৃজনশীলতার অনুপ্রেরণা লাভ কবেছিল বা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই ধর্মানুভূতির চেতনা জোরালোভাবে জাগ্রত করতে পেরেছিল সেহেতু মুসলিম স্থাপত্যের বিশেষ কতকগুলো বাঁধাধরা উপকরণ ও বৈশিষ্ট্য পশ্চিমে স্পেন হতে শুরু করে পূর্বে পারস্য পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম জাহানের সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছে।

কিন্তু তা সত্ত্বেও মুসলমানেরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই স্থানীয় উপকরণ ও স্থাপত্য কৌশলের সংমিশ্রণে আঞ্চলিক প্রভাবপুষ্ট হয়ে সামগ্রিকভাবে মুসলিম স্থাপত্যের কলেবরকে সম্প্রসারিত করেছিল এবং এতে আঞ্চলিক ও জাতীয় বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছিল। ঠিক সে কারণেই ইসলামি স্থাপত্য একটা আন্তর্জাতিক মানে উপনীত হতে পেরেছিল। এরূপ আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হওয়া সত্ত্বেও ভৌগোলিক ও মননশীলতার স্থানীয় মান ইমারতের দেহে মুদ্রিত হতে দেখা যায়। তাই ইসলামের মূল আত্মিক চেতনার সাথে সম্পর্ক রেখে স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের প্রলেপে বা প্রভাবে স্পেনে রোমাঞ্চকর টলেডোর তোরণদ্বার (Gate-way) অথবা অতীন্দ্রিয় মানস সুন্দরী আল-হামরা প্রাসাদ অঙ্গনে নিজস্ব ভঙ্গিমায় প্রকাশমান প্রত্যক্ষ করা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্য প্রায় অনুরূপভাবেই বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হলেও এর বাস্তব প্রেক্ষিত কিছুটা ভিন্নতর ছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতীয় উপমহাদেশে স্থায়িভাবে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথম হতে শুরু করে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত মুসলিম স্থাপত্যকলা এবং অন্যান্য সংস্কৃতিমূলক শিল্পজাত অনুশীলনের প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে অতি উচ্চমানের ইমারত প্রযুক্তির পরিচর্যা আয়ত্ত করতে পেরেছিল। এটি সমসাময়িক খ্রিস্টান ইউরোপের স্থাপত্য পদ্ধতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শীয় প্রভাবেব ফলশ্রুতিও কিছুটা বটে। কাজেই ভারতে বিজিত অঞ্চলে কর্ষিত স্থাপত্য হতে খুব একটা অনুকরণীয় নির্মাণ অভিনবত্ব তাদের নিকট গ্রহণীয় হয়েছিল এরূপ ভাবার অবকাশ নিতান্তই কম।

বলা বাহুল্য ইসলামি স্থাপত্য আদর্শ উন্নয়নে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা স্যারাসেনিক বা সেমিটিক আরব জাতির জনগোষ্ঠী নয়। যদিও এ স্থাপত্য ধারা স্যারাসেনিক স্থাপত্য পদ্ধতি বলে পরিচিতি লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকগণ অনেকে এর গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে দ্বিমত পোষণ করেন। তারা এটি এভাবে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিলেন যে, উক্ত স্থাপত্য পদ্ধতি কেবলমাত্র স্যারাসেনিক আরবদের একার নয়; বরং বিভিন্ন সভ্যতার জারক রসের একত্র সংমিশ্রণে ও সমাবেশে উৎপাদিত হয়েছে।[১]

অন্যপক্ষে ভারতীয় স্থাপত্যের প্রথম পর্যায়ে দিল্লিভিত্তিক যে স্থাপত্য পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তা এ যাবৎ পর্যন্ত পাঠান বংশীয় সুলতানেরা অংশগ্রহণ করেছিল বলে একে পাঠান স্থাপত্যরূপে অনেক সময় আখ্যায়িত করা হয়েছে। অথচ ভারতের এ স্থাপত্য নির্মাণ পদ্ধতিতে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা সকলেই পাঠান ছিল তা সঠিক নয়। অন্তত দু শাসক বংশ তুর্কিদেশীয এবং তারা আবার খল্‌জী ও আরব বংশধর বলে চিহ্নিত হয়েছে।

এসব নতুন ভারত বিজেতারা সরাসরি আফগানিস্তান বা ঘোর হতে আসলেও ইরানি আরব ও তুর্কি বংশোদ্ভূত ছিল। তারা মুসলমান হওয়ার পূর্ব হতে অনাদিকাল ধরে মনোরম প্রাসাদ নির্মাণ পদ্ধতির সাথে বংশ পরম্পরায় পরিচিত ছিল। অবশ্য অনেক সমালোচক অজ্ঞাত কারণে তাদেরকে অর্ধ-সভ্য বর্বর পাহাড়ি জাতির বংশধর বা বীরধর্মবিবর্জিত নিষ্ঠুর যোদ্ধা, দুর্দান্ত পামর বলে আখ্যায়িত করে সত্যের অপলাপ করেছেন। এ প্রেক্ষাপটে পাঞ্জাবের ওপর সুলতান মাহমুদের বারংবার হামলার নিষ্ঠুর কাহিনী উদাহরণ হিসেবে উত্থাপন করা হয়ে থাকে। কিন্তু সমকালীন ঐতিহাসিক তথ্যের সূত্র ধরে বলা চলে যে, সে সময়ের এশিয়ার রাজনৈতিক উত্থান-পতনের তরঙ্গাঘাতে এগুলোকে প্রায় অতি সাধারণ ঘটনা বলে আখ্যায়িত করা যায়। এ সমস্ত দোষক্রটি থাকা সত্ত্বেও মুসলিম নৃপতিগণ কলাকৃষ্টির উন্নয়ন প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণের দৃষ্টান্ত স্থাপনে অনীহা প্রকাশ করে নি। গজনীর সুলতানগণ ইসলামি কলাচর্চার ক্ষেত্রে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন । কবি ফেরদৌসী কর্তৃক রচিত শাহনামা গ্রন্থটি এর এক অনন্য উদাহরণ।

সুলতান কুতুবউদ্দিনের নাম কালিঞ্জরের অধিবাসীদিগকে নির্মমভাবে হত্যা ও দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ করার কাহিনীর সাথে জড়িত থাকলেও তিনি এ দেশের নব স্থাপত্যশিল্পের পত্তনে অমর হয়ে রয়েছেন। অন্যপক্ষে সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জী হাজার হাজার মোঙ্গলকে হত্যা করলেও অনন্যসাধারণ প্রাণবন্ত স্থাপত্যকীর্তির জন্মদাতারূপে সর্বজন বিদিত। সুলতানের আবাল্য শিল্প চেতনাবোধ ও ভাব আস্বাদন শক্তির অভূতপূর্ব ক্ষমতা দ্বারা ভারতীয় স্থাপত্য প্রতিভাকে অতি সহজে উপলব্ধি করে তা নিজের ইমারতে প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করেছিল।

ভারতে মুসলমানদের গ্রহণযোগ্যতা ও অন্য ধর্মের সাথে নিজেদের অবস্থান অটুট রেখে সমন্বয় সাধনের পটভূমি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা ইসলামি আন্দোলন তুলনামূলকভাবে হিন্দু সভ্যতার মতো ততটা প্রাচীন নয়; অন্যপক্ষে হিন্দু ধর্মের কাঠামো ও সমাজ অতি প্রাচীনকাল হতে গভীরভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত। প্রকারান্তরে দেখা যায় যে, এদের বাস্তববাদ আদর্শবাদের বৈষম্য দৃঢ়প্রত্যয় ভিত্তিগত বিপক্ষতা দাবি করে। পক্ষান্তরে আদিভৌতিকের সাথে অতি প্রাকৃতিক বা অলৌকিক বস্তুর এবং দৃশ্যমান অবস্থার সাথে ভাবমূলক বিমূর্ত আদলের অসামঞ্জস্য চিন্তাধারা বিরাজমান। এদের ধর্মীয় ও জাতিগত বিভিন্নতা কোনোভাবেই বিশ্লেষণ করা সম্ভবপর নয়।

এ দু সম্প্রদায়ের অন্তর্নিহিত সজ্ঞান বা সচেতনতার নীতিতে বিভিন্নতার গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। এ বৈষম্যতা অত্যন্ত জোরালোভাবে প্রকাশমান হয়েছে স্ব স্ব জাতির আরাধনার

পাদপীঠ মসজিদ ও মন্দিরের বাস্তব অবয়বগত অবস্থানের মধ্য দিয়ে। এদের গঠন কাঠামো ও আকৃতি-প্রকৃতির মাঝেও দু ধর্ম বিশ্বাসের প্রতীক গভীরভাবে উপলব্ধি বা প্রত্যক্ষ করা যায়। হিন্দু ও মুসলিম স্থাপত্যের সংঘাতময় বৈসাদৃশ্য ও সাদৃশ্যতা কৌতুকের উদ্রেক করে। কেননা হিন্দু মন্দির ও মুসলিম মসজিদের প্রভেদ কিছুটা আকাশচুম্বী বলা যেতে পারে।

মসজিদ ও মন্দিরের মাঝে তুলনা করলে দেখা যায় যে মসজিদ পরিষ্কারভাবে স্পষ্টতার প্রতীক, আর মন্দির একটা রহস্যঘেরা আবাস। অর্থাৎ হিন্দুদের ধর্মীয় পাদপীঠ অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ। মসজিদ প্রাঙ্গণ আলো-বাতাসের মাঝে উন্মুক্ত, এর অনেক দরজা জনসাধারণকে আহ্বানের জন্য প্রসারিত, বিশাল ও বিস্তৃত। পক্ষান্তরে মন্দির ঘন অন্ধকারের অলীক ছায়ামূর্তি, একটা ঘোরকৃষ্ণবর্ণ মলিন পথ আবছা ছোট প্রকোষ্ঠের দিকে বিস্তারিত ও সংরক্ষণে সতর্ক যত্নশীল এবং যথেষ্ট ব্যবধান বিশিষ্ট। এক কথায় বলতে গেলে এরূপ দাঁড়ায় যে, একটি হল তিমিরাচ্ছন্ন ও দুর্বোধ্য; অপরটি ক্লেশমুক্ত, দীপ্তিময় ও স্বর্গীয় বাতাসের দিকে প্রসারিত।

মসজিদের কেন্দ্রীয় কোনো পবিত্র স্থানের প্রয়োজন হয় না। একজন বিশ্বাসী মক্কার দিকে এবাদতের জন্য মুখ করে দাঁড়ালে প্রক্রিয়ার পরিপূর্ণতা আসে। কিন্তু মন্দিরের নির্দিষ্ট লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে এর পবিত্র প্রকোষ্ঠ যা অভ্যন্তর সংযোগ পথের অন্তহীন ও সীমাহীন প্রান্তরের গভীরে অবস্থিত। স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে একটি মসজিদের অবয়ব সম্পূর্ণভাবে দৃশ্যমান এবং বোধগম্যের মধ্যে রয়েছে; অন্যপক্ষে মন্দির বিরলভাবে অন্তর্দর্শী ও জটিল অস্থিরীকৃত। মসজিদের প্রতিরূপ প্রাকৃতিক আকারত্ব ইসলামি বিধিবিধান দ্বারা সীমায়িত। বলাবাহুল্য মন্দিরের দেয়াল কল্পিত, রোমাঞ্চ ও স্পন্দনে ভরপুর এবং এর অভ্যন্তর দেবতার বসবাসের স্থল।

যেহেতু হিন্দু ধর্মের বাস্তব প্রকাশ প্রতীক পূজার মাধ্যমে এবং তাদের মন্দির দেবদেবীর বিগ্রহে পরিপূর্ণ, ধর্মীয় কথা চিত্রাঙ্কন দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়ে থাকে। বহু সংখ্যক মূর্তির আকার দেওয়ার মাঝে তাদের ধর্মকথা বুঝার উপায় হিসেবে প্রচলিত। হিন্দু মন্দির বর্ণালীভাবে বিভিন্ন রং বৈচিত্র্যের বিমূর্ত প্রত্যক্ষ ফল বলা চলে। পাথরের উপর রং দ্বারা দেবতাদেরকে জীবন্ত করার একটা চেষ্টা দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

পক্ষান্তরে ইসলাম কঠোরভাবে মূর্তি বা কোনো জীবন্ত বস্তুর প্রতিচ্ছবি মসজিদে সংযোজন গর্হিত কাজ বলে মনে করে এবং এর মূলনীতি হল জীবনের সমস্ত আকৃতি নিরাকার আল্লাহর জন্য নিবেদিত। হিন্দু স্থাপত্যের শোভাবর্ধক অলঙ্কারাদি নিরতিশয় স্ফীত, ভাস্কর্যাদি তরুলতাসহ জীবজন্তুর চিত্র দ্বারা সমাকীর্ণ। অনেক সময় মনে হয় এটি যেন গথিক্ পদ্ধতি হতে প্রাণবন্ত। এটি যেমন ঐশ্বর্যশালিতার একঘেঁয়েমিপূর্ণ তেমনি বৈচিত্র্যহীনতার সাক্ষ্যও এতে দেদীপ্যমান। এর বিপরীতে মসজিদের দেয়ালপৃষ্ঠ বিভিন্ন রঙের মার্বেল নমুনা অনুসারে নক্সায়িত করে ফলিত কাজ দ্বারা সমৃদ্ধ করা হয়ে থাকে। তা ছাড়া ঢালাই বা ছাঁচ ও উজ্জ্বল চকচকে টালির কাজে এটি সজ্জিত। মসজিদের সম্মুখ দেয়াল বিশেষভাবে অলঙ্কৃত হস্ত লেখচিত্রে (calligraphy) অক্ষর সাজিয়ে সর্বোৎকৃষ্ট গ্রন্থের বাণী উৎকীর্ণ হয়ে থাকে; পক্ষান্তরে মন্দিরে উৎমর্জন, অন্তলেখ বা শিলালিপি কদাপি দৃষ্ট হয়। মুসলিম ইমারতগুলোতে বিশেষ শ্রেণীর অলঙ্কারাদি চোখে পড়ে যথা- রেখা সম্বলিত কারুকার্য, আরব্যনকশা, উৎকীর্ণলিপি সংবলিত সরু নকশা প্রভৃতি স্থাপত্যের বিভিন্ন উপাঙ্গে বিচিত্রভাবে পরিশোভিত করার রীতি প্রচলিত রয়েছে।

এরূপ পরস্পর বিরোধী ভাবধারার পাশাপাশি ব্যবহার বা বিরোধভাব আধ্যাত্মিক বা পারলৌকিক ও সৌন্দর্য শিল্পজাত মানসিক ধারণা তাদের ধর্মীয় পাদপীঠে চিত্রিত হয়ে রয়েছে। এটি পরিষ্কারভাবে প্রতীয়মান হয় যে, যদি যুগপৎ সমলয়ের চেষ্টা দু সম্প্রদায়ের মাঝে হতে পারে তথাপি অলঙ্ঘনীয় দুঃসাধ্যতা এমনকি প্রথম বিরোধ মনোভাব অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও দুর্লভভাবে একই বুদ্ধিবৃত্তি বোধগম্যতার সমতল ভূমিতে উপনীত হতে পারবে না। কেননা হিন্দুদের ছন্দপূর্ণ ছান্দসমন; অন্যপক্ষে মুসলমানদের বাহ্যিক বিধিবৎ নিয়মমাফিক নিয়মনিষ্ঠ মন।

এরূপ আত্মবিরোধী সম্বন্ধহীন বেমানান অবস্থা সত্ত্বেও কালক্রমে উভয়েব মধ্যে একটা মিলনের যোগসূত্র গড়ে উঠেছে। উভয়ের মধ্যে একটি গ্রহণযোগ্য পরিবেশ ধীরে ধীরে আকার লাভ করতে থাকে। এটি মূলত ইমারত নির্মাণ পরিধির মাঝে আবর্তিত হতে থাকে। এ মিলন উৎস মন্থনে এর সমাধান পাওয়া যায় এবং বিশেষভাবে উভয়ের মধ্যে কতকগুলো সাধারণ সূত্রের ধারণা দানা বেঁধে উঠেছে।

কেননা স্থাপত্যের মতো দৃষ্টিলব্ধ উদ্ভাসিত শিল্প সমবায় ও সহযোগিতামূলক যৌথ মানসিক বিনিময় ও বিনিয়োগ যোগ্য পরিবেশ সৃষ্টির সুযোগেব মাঝে অধিক নির্ভরশীল। তা ছাড়া একটা সামাজিক মেলামেশা, আদান-প্রদান শিল্প প্রকাশের আকার উৎসাহিত করেছিল যার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল কিছু একটা স্থায়ী চরিত্রের শিল্প উৎপাদন করা। এ অনুভূতি একটা বিশ্বজনীন চেতনার জন্ম দিয়েছিল।

বলা বাহুল্য স্মৃতিসৌধ বা স্থাপত্য নির্মাণের মাঝে একটা সাধারণ আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছিল। এটি মানুষের মনকে অভ্যন্তর হতে সরিয়ে নিয়ে বহির্মুখী করেছিল, যা ধর্মীয় বা অন্যান্য বাধাবিপত্তি ভেঙে অপসারিত করেছিল। পরিশেষে সমস্ত বিভেদ দূরীভূত কবে সম্মিলিত একটা কারিগরি শিল্পকৌশল রূপলাভ করে এবং পরিণতিতে একটা নতুন শিল্পকৌশল উদ্ভাবন সম্ভব হয়েছিল।

এভাবে উভয় সম্প্রদায় এমন একটা বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছিল যে তার মাঝেও তারা জ্ঞানের পরিধির মাঝে উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। এ মিলন উৎস মন্থনে দেখা যায় যে হিন্দু মন্দির ও মুসলিম মসজিদের মূল কাঠামো এবং এগুলোর বৈশিষ্ট্য এশিয়া ও ইউরোপের পূর্বাঞ্চলের বাসগৃহের সনাতনী প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি পশ্চিম এশিয়া হতে শুরু করে ভারতীয় উপমহাদেশের সর্বত্র সমভাবে পরিচিত। বাসগৃহের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে খোলা ও প্রসারিত অঙ্গন কক্ষ, স্তম্ভ বা থাম দ্বারা পরিবৃত। সুতরাং এভাবে নির্মিত মন্দির স্বতঃস্ফূর্তভাবে মসজিদে রূপান্তরিতকরণে বিজয়ীদের মোটেই কোনো অসুবিধা হয় নি। তা ছাড়াও উভয়ের মৌলিক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা সাধারণ যোগসূত্র অঙ্গ সজ্জায়নে দেখতে পাওয়া যায়।

নকশালঙ্কার ব্যবহার উভয় স্থাপত্যের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বলেই পূর্ণাঙ্গ বিকাশোন্মুখ হতে এর ওপর নির্ভরশীল। ভারতীয় স্থপতি ও কারিগরবৃন্দ ইমারতের শোভাবর্ধনের প্রবণতা হঠাৎ প্রাপ্ত হয় নি। এ প্রেরণার উৎস অন্বেষণে জানা যায় যে তারা প্রাক-ভারতীয় আর্য জাতিগণের নিকট হতে এটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়েছিল এবং এ মানসিকতার প্রভাব তাদের সমস্ত শিল্পকলায় ও স্থাপত্য সাধনায় বিধৃত হয়ে রয়েছে।

পক্ষান্তরে মুসলমানদের জাতীয় জীবনের প্রথমাবস্থায় অনুরূপ কিছু একটা না থাকলেও পরবর্তীকালে সাসানীয় ও বাইজান্টাইনদের প্রভাবপুষ্ট হয়ে বা তাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হরণ করে প্রচুর ধন-সামগ্রী, শৈল্পিকমেধা, সাংস্কৃতিক চেতনা, নানা প্রকার নকশা, কারুকার্য

বা ডিজাইন, স্থাপত্য কৌশল আয়ত্ত ও অধিকার করেছিল। অবশ্য এর রস আস্বাদন বা ব্যবহার করার রুচিও ভারতীয়দের মতো প্রাথমিক পর্যায়ে উৎকৃষ্টতর ছিল কি না তা বিতর্কের বিষয়বস্তু। কিন্তু ভালো জিনিসের কদর বুঝার মতো মানসিকতার অধিকারী যে তারা ছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ ভারত বিজয়ের সাথে সাথে এ উপমহাদেশে এক বিরাট সম্ভাবনাময়ী স্থাপত্যশিল্পের উন্নয়নের পথ উন্মুক্ত হয়েছিল। বিজয়ীরা বিজিতদের শৈল্পিক মূল্যবোধ উপলব্ধি করে এর পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিল।

এ স্থাপত্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল নির্মাণ উপকরণ ও নির্মাণ প্রক্রিয়া। ভারতীয় স্থাপত্য কারিগরবৃন্দ বহু শতাব্দী ধরে মনোজ্ঞ ও চিত্তাকর্ষক নকশা নমুনায় প্রস্তর দ্বারা মন্দির নির্মাণ কাজে নিয়োজিত রয়েছিল এবং তাদের শৈল্পিক দক্ষতা বিজেতারা নিঃসন্দেহে মূল্যায়ন করেছিল। কিন্তু এ দেশীয় কারিগরবৃন্দ সুদীর্ঘ সময় ধরে কাজের মাঝে না কোনো নতুন প্রবর্তন আবিষ্কার করে পদ্ধতির কোনো শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পেরেছে, না কোনো বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি আয়ত্ত করে ভারতীয় স্থাপত্যধারাকে আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করতে পেরেছে। তাদের স্থাপত্য কার্যক্রম স্থবির হয়ে একখানেই আটকিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাদের মানসিক প্রবৃত্তিটাই সহজাত বা জন্মগত প্রকৃতির মাঝে অত্যাধিক একরূপত্বক ও অধিকতর অবনতির বীজ ধারণ করে রয়েছে বলে মনে করা যায়। কাজেই শিল্প একটা সমান্তরাল অবস্থায় একঘেঁয়েমিতে পরিপূর্ণ হয়েছিল এবং প্রগতিমূলক অগ্রগতিতে হীনতাভাব কার্যকর ছিল।

হিন্দু স্থাপত্য স্তম্ভ-সর্দল (trabeate system) রীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। অপরদিকে মুসলিম স্থাপত্য খিলাননির্ভর (arcuate system) রীতির সমন্বয়ে গঠিত। মন্দিরের শিখরগুলো কোণাকৃতি দীর্ঘ চূড়া দ্বারা গঠিত অথবা পিরামিড আকৃতির টাওয়ার দ্বারা সুশোভিত এবং মসজিদের ছাদের উপর একটি বা প্রয়োজনমতো অনেক গম্বুজ ও মিনার দেখতে পাওয়া যায়। হিন্দু ও মুসলিম তারা যে স্ব স্ব ধর্ম ও ধর্মীয় অনুশাসন মান্য করে চলে তাতেও ধর্ম মতাদর্শের প্রভেদের মতোই স্থাপত্য কাঠামোর পার্থক্য সৃষ্টি স্বাভাবিকভাবে এসে গিয়েছে। এরূপ বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও বিশেষ কতকগুলো ক্ষেত্রে উভয় স্থাপত্য পদ্ধতির মধ্যে আকারজনিত কারণে কিছু কিছু মিলন সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

ভারতে বিজেতারা কেবলমাত্র তাদের শিল্প চেতনার একটা নতুন প্রেরণার স্রোত প্রবাহিত করে নি; বরং অন্য দেশ ও জাতির নিকট হতে প্রযুক্তি গ্রহণ করার যে সুযোগ পেয়েছিল তা সকল অবস্থায় গ্রহণ করত পরিচর্যা করে সার্থক ফল লাভে সমর্থ হয়েছিল। অধিকন্তু প্রতিটি জাতি তাদের নিজস্ব পদ্ধতির স্থাপত্য নির্মাণ প্রক্রিয়ায় অভ্যস্ত, বিশেষভাবে হিন্দুরা তাদের নিজস্ব বিধিবদ্ধ ঐতিহ্যবাহী প্রচলিত প্রথার আদর্শমূল্য বাধ্যবাধকতা দ্বারা পরিচালিত হয়ে দেশীয় ক্রমপ্রলম্বন রীতিতে স্থাপত্য অংশের ফাঁকা স্থানের উপরের ভার বহন করার জন্য ঐ জায়গায় অনুভূমিকভাবে বা শোয়ানো অবস্থায় প্রসারণের মাপের চেয়ে অপেক্ষাকৃত একটু বড় আকারের কড়ি বা বর্গা (beam) প্রয়োগ করে দেয়ালের মধ্যে ঐ স্থানের ওজনভার বণ্টন করে দেয়।

অপরপক্ষে মুসলমানেরা একটা স্থাপত্য রীতিমালা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্য দিয়ে ধারাবাহিকভাবে গতিময় করতে পেরেছিল। স্থাপত্য নির্মাণ পদ্ধতির প্রয়োগ ক্ষেত্রে তারা ভিন্ন ভিন্ন নির্মাণ আদর্শ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করত। তারা স্থাপত্য কাঠামোর ফাঁকা বা প্রসারিত দেয়াল অংশে উপরের ভার বণ্টন করে দেয়ার একটা স্বাতন্ত্রসূচক প্রযুক্তি ব্যবহার করত, যা

অনেক বড় আকারের ফাঁকা স্থানের ভার সেতুর মতো একটা চাকের মধ্যে ধারণ করে কাঠামোকে অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে বহিঃপ্রকাশিত হতে সহায়তা দান করেছে। এটিই খিলাননির্ভর পদ্ধতি। অবশ্য খিলাননির্ভর পদ্ধতির আবির্ভাব মুসলমানদের স্থাপত্য নির্মাণ কাজে হঠাৎ আসে নি। কেননা ইসলামের প্রাথমিক যুগে তারা পূর্ব রোমান সাম্রাজ্য জয় করার পর গম্বুজের ভার বহনের এ বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং তা তারা গ্রহণ করেছিল। অবশ্য রোমানদের নিকট হতে প্রাপ্ত হলেও তাদের পদ্ধতিতে কিছুটা ভিন্ন আকারত্ব সৃষ্টি হয়েছিল।

কিন্তু ভারতীয় স্থাপত্যে কড়ির (beam) স্থলে খিলানের ব্যবহার তখনই সম্ভবপর হয়েছিল যখন গাঁথুনি সংযোগ করার উপকরণ মসলা হিসেবে মর্টার (mortar) ব্যবহার প্রক্রিয়া চালু হয়। এ দেশের স্থাপত্য কারিগরবৃন্দ তখন পর্যন্ত এ সম্পর্কে সামান্যই অবগত ছিল। মুসলমানেরা এরূপ সংযোগ মসলার ব্যবহারের রীতি প্রথমে স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে প্রয়োগ কবে ভারত ভূমিতে স্থাপত্য ইমারত নির্মাণে ব্যাপৃত হয়েছিল। কিন্তু পূর্বেব আদিম সরল-সোজা রীতিতে পাথরেব উপব পাথর বসিয়ে খাড়াভাবে গেঁথে তোলার রীতি প্রচলন ছিল। এতে পাথরের সমস্ত ভার নিচের দিকে সঞ্চালিত হত। ফলে কাঠামোগত কোনো সমস্যা হতো না এবং এটিই সমস্ত হিন্দু স্থাপত্য ইমারতে দেখা যায়।

অন্যপক্ষে মুসলমানেরা কিছু কিছু বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও শৈল্পীক অভিজ্ঞতা অন্য সভ্যতার অনুশীলন হতে লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এবং যখন তারা এসব প্রযুক্তি ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়ে তীযক ও পার্শ্বগত ধাক্কা বা চাপ প্রতিহত করে আঘাত বা কম্পমান অবস্থা প্রতিরোধ কবতে সমর্থ হয়েছিল তখন তারা ইমারতের শক্তিবৃদ্ধি ও স্থায়িত্বদান করতে সমর্থ হয়েছিল।

ফলশ্রুতিতে দেশের সবত্র মনোজ্ঞ ইমারতে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। তখন পর্যন্ত ইমাবতেব লম্বমান আকৃতি, সমতল ছাদ ও নিচু ডগা বিশিষ্ট হয়ে নির্মিত হত। কিন্তু মুসলমানেবা এ দেশে গম্বুজ নির্মাণ পদ্ধতি সর্বপ্রথম আনয়ন করে, যা এ দেশে ছিল সম্পূর্ণরূপে নতুন প্রবর্তন। এর ফলে পিরামিডের আকার পরিবর্তিত হয়ে ডিম্বাকার রূপ লাভ করে। এভাবে এ দেশের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে পরিচর্যা প্রথা কার্যকর হয়েছিল। ফলে এ দেশের শহর-বন্দর ও গ্রামে-গঞ্জে বাল্ব আকারের ও আকৃতিতে শীর্ষদণ্ড সম্বলিত ইমারত দৃষ্ট হতে থাকে।

ভারতে এ স্থাপত্যধারা ইন্দো-ইসলামিক বা ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য নামে আখ্যায়িত হয়েছে।[২] ভাবতীয় ইসলামিক এ স্থাপত্যধারার অপরিসীম গুরুত্বের কথা তখনই উপলব্ধি করা যায় যখন দেখা যায় যে ইসলামের প্রভাবে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যে স্থাপত্য অনুশীলনে ইমারত গড়ে উঠেছে তার চেয়ে ভারতীয় ইসলামি ইমারতগুলো সর্বদিক দিয়ে সুন্দর ও ঐশ্বর্যবান। তবে ভারতে এরূপ প্রাণবন্ত, স্থাপত্য গড়ে ওঠাব পেছনে দুটি কারণ কার্যকর ছিল বলে পি. ব্রাউন উল্লেখ করেছেন—প্রথমত, এ স্থাপত্যধারা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য স্থাপত্যধারার চেয়ে পরবর্তী সময়ে শুরু হয়েছিল এবং দ্বিতীয়ত, এ দেশের কারিগর বা স্থপতিদেব প্রশংসনীয় প্রতিভা যা একটা নতুন জিনিস বা প্রযুক্তিকে অনুসরণ করার ক্ষমতার উৎস হিসেবে উৎসাহ যুগিয়েছিল[৩]।

প্রথম কারণটি বিশ্লেষণে বলা চলে যে, এ স্থাপত্য কৌশল ভারতে ব্যবহার ও পরিচর্যার পূর্বেই বিভিন্ন দেশে মুসলমানেরা এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছিল। আর এ অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে ইমারত গঠনে অনেক দুঃসাধ্যতা অতিক্রম

করে স্থাপত্য অংশের সুনির্দিষ্ট অসুবিধা ও প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করতে পেরেছিল এবং পরিশেষে এর সুষ্ঠু সমাধানই একটা সঠিক পদ্ধতির জন্ম দিয়েছিল।

ভারতে বিশেষ করে উত্তর ভারতের মুসলিম স্থাপত্য ধারায় যে বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে উঠেছে তা অত্র অঞ্চলে চর্চিত স্থাপত্য ও মুসলমানদের বহির্ভারতীয় স্থাপত্যের সংমিশ্রণেরই ফসল। উভয় স্থাপত্য ধারার নিষিক্ত রসই সামগ্রিকভাবে নতুন স্থাপত্য ইমারতের অবয়বকে সুন্দররূপে ফুটিয়ে তুলেছিল।

বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্যের স্পষ্টত বহিঃপ্রকাশের চেয়েও ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যের মূল্যায়নের গুরুত্ব ছিল অন্যভাবে। কেননা অন্য কোথাও আর কোনো মুসলিম স্থাপত্যের সাথে এটি সম্পূর্ণরূপে একত্রীভূত হয়ে যায় নি। ভারতীয় উপমহাদেশে জেরুজালেমের বা দামেস্কের সবুজ ও সোনালি মোজাইক অথবা পারস্যের সুন্দর উজ্জ্বল রং-এর টালি হুবহু ব্যবহার বা আশ্চর্য ও স্বপ্নময় কল্পনাপ্রসূত স্পেনীয় নমুনার (design) দৃষ্টান্ত ভারতে বিরল। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনে করা যায় যে স্থাপত্য শক্তি ও এর পদক্ষেপ সংযুক্ত হয়ে চিরন্তনত্বে এত জোরালোভাবে অন্য কোনো স্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নবরূপায়ণ লাভ করে নি।

ভারতের মতো বিশাল উপমহাদেশে স্থাপত্যের বৈচিত্র্যময় অভিব্যক্তির প্রকাশ যেন প্রাকৃতিক নিয়মেই সংঘটিত হয়েছে এবং এর অনুসারী বিভিন্ন প্রদেশের বা অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের ভাষা, আচার ও সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পদ্ধতির স্পষ্টতর সমর্থনে অসংখ্য স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ইমারতে ফুটে উঠেছে। অন্যপক্ষে এ স্থাপত্য ইমারতগুলোতে কোথাও ধর্মীয় স্বতন্ত্রের ছাপ, আবার কোথাও বৈদেশিক অনুপ্রেরণা ও পরিচালনার ছাপ দৃষ্ট হয়েছে। তা ছাড়া জলবায়ু ও চতুষ্পার্শ্বস্থ মাটির আবরণ সংবলিত প্রভাবের বৈচিত্র্যময় স্থাপত্যিক নকশায় আত্মপ্রকাশ ঘটেছে এবং সবগুলো বৈশিষ্ট্য ও উপাদানের মাঝে আর একটি প্রভাব যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল- এটি চেতনা ও উপলব্ধিবোধ। তাই সব পদ্ধতির স্বতঃস্ফূর্ত উন্নয়নের অন্তর্নিহিত কারণগুলো ধর্মীয় ও সামাজিক প্রয়োজনের অভ্যস্ততার মধ্যে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

অবশ্য ভারতের মুসলিম স্থাপত্য অন্য যে কোনো স্থাপত্য পদ্ধতির দ্বারা যতখানি প্রভাবপুষ্ট হয়েছিল তার চেয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্ম সংমিশ্রণ এর অবয়বকে অধিকতর সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছিল। ভারতের বুকে নব স্থাপত্য সাধনাব দিকদর্শন ইসলামি স্থাপত্য অনুশীলনের নামান্তর বললে বাস্তবকে অস্বীকার করা হবে। দিল্লিতে ব্যক্তি স্বতন্ত্রতাবোধ বা জাতীয় প্রভাবপুষ্ট চেতনাকে সঞ্জীবিত রাখার অবকাশ রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বারা স্বীকৃত হলেও বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু স্থপতি ও কারিগরবৃন্দকে তাদের কৌশলকে নতুন ইমারতে প্রয়োগের সম্মতি দিতে হয়েছিল। বলাবাহুল্য দিল্লিতে হিন্দু কারিগরদের কলাকৌশল দাক্ষিণাত্যে অথবা জৌনপুরে একইভাবে অনুসৃত হয়েছিল এ কথাও যুক্তিযুক্ত নয়।

এ অনুসৃত রীতির সাথে আবার আঞ্চলিক স্বকীয়তা ও প্রভাবের কার্যকারিতা পরিলক্ষিত হয়েছে। বাংলা বিজয়ের পর বিজেতারা ময়নামতি, মহাস্থান এবং পাহাড়পুরের চির সনাতন ইমারত নির্মাণ কৌশল ও উপকরণ, যেমন- ইটের চেপ্টা গাঁথুনিকে নিজেদের মনঃপূত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করতে বিরত ছিল আবার মুসলিম আমলে খোদাই ও ছাঁচে তৈরি কারুকার্যাদি যা হিন্দু স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়েছিল, তার হুবহু অনুসরণ করার নিদর্শন তাদের ইমারত গাত্রে দৃষ্ট হয়েছে। গুজরাট অঞ্চলে যে মুসলিম স্থাপত্য গড়ে উঠেছে তা প্রাক-মুসলিম যুগের গুজরাট মন্দির স্থাপত্যের অনেক পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে যা যুগযুগান্তর হতে

চলে এসেছিল। স্থানীয় কারিগর যখন মুসলিম ইমারতগুলোতে কাজ করার জন্য নিয়োজিত হয়েছিল তখন তারা রাজকীয় বাধানিষেধ সত্ত্বেও মনের অজ্ঞাতে তা প্রয়োগ করেছিল। এভাবে গুজরাটের আদি স্থাপত্য পদ্ধতির চেতনা ও উপলব্ধি মুসলিম স্থাপত্যে নিষিক্ত হয়ে অনুপম স্থাপত্যকীর্তির সার্থক রূপায়ণ সম্ভবপর করে তুলেছিল। কাশ্মীরে তারা হিমালয় অঞ্চলে প্রচলিত বৌদ্ধ যুগের কাঠ ও পাথরের যে স্থাপত্যরীতি প্রচলিত ছিল তার সাথে নিজেদের স্থাপত্যরীতি একাকার করে এক নব রূপায়ণ দানের প্রয়াস পেয়েছিল।

বলা বাহুল্য ইসলামি স্থাপত্যের পাদপীঠ, যেমন- কায়রো, বাগদাদ, দামেস্ক, সামাররা, জেরুজালেম ইত্যাদি নগরে নির্মিত বৃহৎ মসজিদ, মাকবারা, মিনার এমনকি প্রাসাদের মতো আরো অনেক ইমারত নির্মিত হয়েছিল যা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। কিন্তু এদের প্রায় সবগুলোই দিল্লির প্রথম মুসলিম ইমারত নির্মাণের পূর্বের ঘটনা। তাই দিল্লিতে যা নির্মিত হয়েছিল তা সকল স্থাপত্য পদ্ধতির পূর্ণাঙ্গ ও পরিপক্ব অবস্থার যৌগিক ফল।

পি. ব্রাউনের ন্যায় অনেক ঐতিহাসিকের মতে ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের প্রকৃত কৃতিত্ব বা অনন্যসাধারণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির মূলে এর দ্বিতীয় উৎপাদকের মাঝে নিহিত রয়েছে। তা হচ্ছে স্থাপত্য কারিগরবৃন্দের মনীষা। অন্যভাবে বলা যায় যে, এটি একটি জীবিত চলমান জ্ঞানানুশীলনজনিত দক্ষতা- ভারতীয় কারিগরদের প্রজ্ঞা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। মূলত এসব ভারতীয় কারিগরবৃন্দের বিশেষভাবে প্রস্তরকর্মের শৈল্পিক চেতনায় আর কোনো জুড়ি ছিল না। এ সম্পর্কে তাদের জ্ঞানের পরিপক্বতা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মন্দির নির্মাণ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছিল।

এরূপ প্রস্তরকর্ম নিপুণভাবে দেশের বিভিন্ন স্থানে পরিচালনা করার মধ্য দিয়ে বাস্তব যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল তার ফলেই একটা আন্তর্জাতিক মানের স্থাপত্যশিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। এসব কারিগরবৃন্দ বলিষ্ঠ ও জাঁকজমকভাবে তাদের নির্মাণ উপকরণ দিয়ে মন্দির নকশার কাজ, ঢালাই ইত্যাদি কাজের মধ্যে প্রতিভার বিকাশ সীমিত রেখেছিল এবং কাঠামো গঠনে কোনো রকমারিত্ব প্রতিফলন ঘটানোর দিকে মনোনিবেশ করে নি। এর ফলে তারা যা প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিল তা স্থাপত্য গাঠনিক প্রসঙ্গের চেয়ে ভাস্কর্য সংক্রান্ত কার্যক্রমের নকশা নমুনার (design) মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ধীরে ধীরে তারা এসব সীমাবদ্ধ পরিচালনামূলক কর্ম কুশলতাকে পরবর্তীকালে কেমন করে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিমূলক শিল্পজনোচিত নির্মাণ কাজে পারদর্শী হয়ে বৃহৎ, সৃজনশীল ও ঐশ্বর্যশালী সৌধমালা মুসলিম শাসকদের অধীনে মৌখিক নির্দেশনাকে অবলম্বন করে প্রায় সফলভাবে বাস্তবায়ন করতে পেরেছিল তা অবলোকন করা যেতে পারে।

ভারতের ইসলামিক স্থাপত্য অধিকাংশে মসৃণভাবে কাটা বা পালিশ করা প্রস্তর দ্বারা গেঁথে নির্মাণ করা হয়েছে; ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের এটিই একটা বিশেষত্ব। পক্ষান্তরে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে ইমারতসমূহ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ইট, নুড়ি পাথর ও আস্তরে নির্মিত হতে দেখা গিয়েছে। স্থাপত্য নির্মাণে এ দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্মাণ উপকরণ তুলনামূলকভাবে কম স্থায়ী প্রকৃতির, তবে সুবিধাজনকভাবে প্রয়োগে স্বচ্ছন্দতা রয়েছে। প্রথম যুগে দ্রুত বেগে ইমারত নির্মাণের তাগিদে মুসলিম ইমারত নির্মাণ পরিকল্পনাগুলো হয়তোবা সেভাবেই বাস্তবায়িত হয়েছিল। কিন্তু এভাবে তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ইমারত গড়ার কাজ অন্য দেশে হলেও ভারতে যখন স্থাপত্যকর্মের সূচনা হয়েছিল তখন ঐ ভাবটা শান্ত হয়ে গিয়েছিল। তাই ভারত বিজেতারা এ দেশীয় কারিগরদের প্রচলিত পদ্ধতি সম্পর্কে বিশেষভাবে বিচার বিবেচনা করার সুযোগ পেয়েছিল।

বলা বাহুল্য এ সন্ধিক্ষণে অন্য আর একটি বহিরাগত গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যরীতি এ দেশের স্থাপত্য পদ্ধতিকে প্রভাবিত করেছিল। ভারতের পশ্চিম সীমান্তের দেশগুলো, যথা- পারস্য, সিরিয়া, আফগানিস্তান, আরব ইত্যাদি এবং মুসলমানেরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এসব দেশ হতেই ভারতে প্রবেশ করেছিল। এসব দেশে স্থাপত্য নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইট ও নুড়ি পাথরের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ভারতের নতুন স্থাপত্য পদ্ধতিতে এসব উপকরণ এসে যোগ হয়েছিল। এতে পদ্ধতির ক্ষমতা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছিল। তবে সব সময় নয়, কখনো কখনো জোড়াতালি দেয়ার প্রয়োজন হত।

ভারতে স্থাপত্য নির্মাণ পদ্ধতির পরিস্থিতিতে একটা পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল অন্যভাবে; ভারতীয় স্থাপত্য কারিগরবৃন্দ মুসলিম শাসকদেব সক্রিয় নির্দেশনায় স্থাপত্য প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রধান অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তবে এতে এটুকুই তাৎপর্য ছিল যে ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য পদ্ধতি এর আদি উৎস নিঃসৃত বৈশিষ্ট্য দ্বারা সীমিতভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। ঐসব ধর্মীয় ইমারতের কিছু কিছু সাধারণ রীতি যে বৃহৎ এলাকায় ইট দ্বারা ইমারত নির্মাণ হত সেখানে এটি গৃহীত হয়েছিল এবং প্রয়োজনমতো এর সাথে নির্মাণ প্রযুক্তি কৌশলগত কারণে স্বল্প মাত্রায় ব্যবহার করা হত। বাস্তবিকপক্ষে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে, ভারতীয় কারিগরবৃন্দ তাদের ঐতিহ্যবাহী বং নির্ভরশীলতার অতিরিক্ত এসব নতুন প্রবর্তনগুলোতে যথেষ্ট অভিজ্ঞ হয়ে স্বাধীনভাবে নিজেদের উপকরণ ও কৌশল সুবিধামতো উপায়ে প্রয়োগ করতে সমর্থ হয়েছিল।

ভারতের নতুন শাসকদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য এ দেশীয় কারিগরবৃন্দ এসব কাঠামো অতি সতর্কতার সাথে নির্মাণ করত। এর ফলে দেখা যায় যে সামগ্রিক মুসলিম স্থাপত্যেব প্রথমদিকের ইসলামিক পদ্ধতির কিছু কিছু ইমারত মসৃণ কাটা প্রস্তরে নির্মিত হয়েছিল। ভারতে এ পদ্ধতির নির্মাণ প্রযুক্তি অধিকাংশ অঞ্চলে তখন হতে কার্যকর ছিল। খিলান ভারতীয়দের নিকট নতুন বিষয় ছিল না। কিন্তু মুসলমানদের মতো বন্ধনী সংযোগ সৃষ্টিকারী মসলা সহযোগী ভুঁসোয়া দ্বারা নির্মাণ জ্ঞানের অধিকারী তারা ছিল না। পক্ষান্তরে যুগযুগান্তর হতে মুসলমানেরা খিলান ও গম্বুজ নির্মাণ কৌশলের সাথে গভীরভাবে পরিচিত ছিল, যা মুসলিম স্থাপত্যের অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু।

দৃশ্যত মুসলমানেবা যদিও অনেক সময় ভারতীয় কারিগরদের প্রভাবে ক্রমপূরণ রীতির অনুসরণ করেছিল তথাপি খিলান ও গম্বুজকে তাদের মৌখিক বিশ্বাসের প্রতীকরূপে আঁকড়ে রেখেছিল। এ ছাড়াও অন্যান্য স্থাপত্যিক উপাঙ্গ যেমন- মিনার, বুরুজ, পেন্‌ডেন্‌টিভ, স্কুইন্স-খিলান, স্ট্যালেকটাইট, অর্ধগম্বুজ বিশিষ্ট দ্বিজ প্রবেশ পথ ইত্যাদি তারা বিশেষভাবে অনুসরণ করেছিল। মুসলমানদের হৃদয়ানুভূতিতে সৌন্দর্য সাধনার প্রবণতা চিরজাগ্রত, যার বাস্তব অনুশীলনের প্রতিধ্বনি তাদেব ইমারতের সুসামঞ্জস্য সাজ ও ভূষণ, উজ্জ্বল রঙিন অঙ্গসজ্জায়নের সার্থক রূপায়ণের মাঝে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে দিল্লিভিত্তিক মুসলিম স্থাপত্য চর্চা শুরু হওয়ার পূর্বে সিন্ধু প্রদেশে ও পাঞ্জাবের কিছু অংশে স্থাপত্য অনুশীলনের প্রমাণ পাওয়া যায়। ৭১২ খ্রিস্টাব্দে রাজা দাহিরের পরাজয় ও মোহাম্মদ বিন-কাসিমের বিজয়ের মধ্য দিয়ে সিন্ধু দেশে তথা ভারতের পশ্চিম প্রান্তে প্রথম আরব সভ্যতার গোড়াপত্তন ঘটেছিল। আরবরাও অন্যান্য সেমিটিক শাখার মতোই প্রথম দিকে কোনো স্থাপত্যশিল্পের অধিকারী ছিল না। সে কারণে সিন্ধু ও পাঞ্জাবের কিছু অংশ প্রায় দেড় শ বছরের মতো তাদের অধীনে থাকলেও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে তেমন উল্লেখযোগ্য অবদান সৃষ্টি হয় নি।

তাদের সময়ে যেটুকু স্থাপত্য নির্মাণ কাজের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে তাতে স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোনো গুরুত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। করাচীর উপকণ্ঠে ভাম্ভোরে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে মুসলিম ও প্রাক-মুসলিম ইমারতের আবেষ্টনী প্রাচীর ও সারি সারি ভিত্তিপ্রস্তর অনাবৃত হয়েছে। তন্মধ্যে মসজিদের যে অবয়ব প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে এর সাথে উমাইয়া যুগের মসজিদের সাদৃশ্য বিদ্যমান। এ ছাড়া বুরুজ বিশিষ্ট দুর্গ-প্রকার, তোরণ-দ্বার, প্রশাসনিক ইমারত ও অনুরূপ দালান-কোঠার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এগুলোর কাঠামো আগুনে পোড়ানো ও রৌদ্রে শুকানো বিভিন্ন আকারের ইট এবং প্রস্তর গাঁথুনি, চুনাপাথর এবং ছাদ, তীর ও বর্গার সমন্বয়ে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা যায়।

সিন্ধু বিজয়ের পরবর্তী সময়ে আরবদের দ্বারা যে স্থাপত্যশিল্পের অনুশীলন ঘটেছিল তাতে ভারতের মুসলিম স্থাপত্য প্রভাবিত হয়েছিল এমন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া না গেলেও আফগানিস্তানের গজনভীদের অবিস্মরণীয় স্থাপত্য অবদানের কথা পর্যালোচনার অবকাশ নিঃশেষ হয় না। কেননা তারা একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমস্ত উত্তর ভারত রণহুঙ্কারে পদানত করেছিল। এ সময়ের ইসলামি কলাকৃষ্টির পাদপীঠগুলো পশ্চিম এশিয়ার বিস্তৃত অংশ জুড়ে রয়েছিল। যদিও এর শৈল্পিক প্রতিভার মূল সুর প্রধানত পারস্য অঞ্চল হতে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছিল তথাপি এর উৎকর্ষ সাধন পারস্যের ভৌগোলিক এলাকার বাইরে বিস্তার লাভ করেছিল। এ শিল্পবোধকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করে নিজেদের শিল্পমানে এক অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক সৃষ্টিধর্মী স্থাপত্য ও কলাচর্চার সূচনা হয়েছিল। ভৌগোলিক দৃষ্টিকোণ হতে যেহেতু পারস্যের অবস্থান মধ্যপ্রাচ্যের ঠিক মাঝখানে সেহেতু এটি একদিকে তুর্কিস্তান ও চীনের কলাকৃষ্টি; অন্যদিকে মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের কলাচর্চার মিলন ভূমিতে পরিণত হয়েছিল।

এসব সভ্যতার চর্চিত স্থাপত্য ধারা নিষিক্ত করে যে জারক রসের ঝরনা প্রবাহিত হয়েছিল এটি নতুনভাবে পারস্যের চিরন্তনী ও অমোচনীয় সৌন্দর্যের ছাপ বক্ষে ধারণ করতে সমর্থ হয়ে এক অভিনব স্থাপত্যচর্চার দ্বারোদঘাটন করেছিল। এ নব প্রবাহিত স্রোতধারার যে তরঙ্গ দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে ভারত ভূমিকে পারস্যের কৃষ্টি রসে উর্বরা করে তুলেছিল এটিই গজনীবাসীর কৃতিত্ব। গজনী শুধুমাত্র ইসলামি কৃষ্টি বা জীবন দর্শন বিকীর্ণ করার কেন্দ্র হিসেবে গড়ে ওঠে নি; বরং এর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত।

কেননা নবম ও দশম শতাব্দীর কলাকৃষ্টি ও পার্থিব জীবনের চাকচিক্য যা উত্তর-পূর্ব পারস্যে সাসানীয় রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় গড়ে উঠেছিল তা উত্তরাধিকার সূত্রে গজনীর সুলতানগণ প্রাপ্ত হয়ে এর চরম উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হয়েছিল। সুলতান মাহমুদ ও পরবর্তী বংশধরগণের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম জাহানের সবগুলো নগরের মধ্যে গজনীই স্থাপত্যশিল্প ও কলাচর্চার উজ্জ্বল এবং দীপ্তিময় পাদপীঠ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। অবশ্য আলাউদ্দিন হোসেন জাহান জার আক্রমণের প্রাক্কালে এসব ইমারতের অধিকাংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে গিয়েছে। সুলতান মাহমুদের সমাধিসৌধে দুটি মিনার ও একটি বিজয়স্তম্ভ কালের সাক্ষী হয়ে পথচারীর মনে বিস্ময়ের উদ্রেক করে। এ দুটি মিনারের মধ্যে একটি তার উত্তরপুরুষের। স্থপতিদের নিকট মিনার দুটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা দিল্লির বিখ্যাত কুতুব মিনার পরিকল্পনায় এর মূল অবয়বে প্রচ্ছদকে অনুসরণ করে রচনা করা হয়েছিল।

প্রায় দু শ বছর পূর্বে মিনার দুটি ৪২.৭০ মি. (১৪০ ফুট) উচ্চতা নিয়ে দণ্ডায়মান ছিল। এটি দ্বিতল বিশিষ্ট এবং এর নিচের তলা তারকা আকারের ও উপর তলা গোলাকৃতির ছিল। উভয় তলাই ইট দ্বারা নির্মিত হয়ে প্রশস্ত পোড়ামাটির নকশায় সুশোভিত হয়েছিল।

আফগানিস্তানের অপর একটি সমাধিসৌধ মাহমুদ ইয়াসিন-উদ-দৌলার (৯৯৯-১০৩০ খ্রি.) ইট দ্বারা নির্মিত হয়েছিল এবং পুনঃনির্মাণকালে এর কিছুটা আধুনিক অবয়ব প্রাপ্তি ঘটেছে। এর প্রাচুর্যপূর্ণ খোদাইকৃত অক্ষত কাষ্ঠ নির্মিত দরজা এর সমগ্র বৈশিষ্ট্যের কেবলমাত্র একটা উৎকর্ষের পরিচয় বহন করছে। দরজাটি ১৮৪২ খ্রিস্টাব্দে গজনী হতে নীত হয়ে আগ্রা দুর্গে সংরক্ষিত রয়েছে।

দেবদারু কাঠের তৈরি দরজায় খোপ খোপ আকাবে ছয়টি ছুঁচালো বিশিষ্ট চিকন তারকাখঁচিত নকশা ও সাধারণ জ্যামিতি নকশায় সুশোভিত ছিল। নিপুণ হস্তে তারকা ও অলঙ্কারাদিসহ পাল্লার উভয় ধারে খোদাইকৃত নকশা, মনোমুগ্ধকর জড়ানো-বুনানোভাবে বসানো আরব্য নকশার সাথে একাকার হয়ে এটি পুনবায় কবজার সাথে লৌহবন্ধনী সজ্জিত হয়ে শৈল্পিক সমৃদ্ধতা সৃষ্টিতে সহায়তা করছে। সর্দলের নিম্নধাব ঘিরে কুফিক পদ্ধতির হস্তাক্ষরে উৎকীর্ণ লিপিমালায় খোদার নিকট মাগফেরাৎ কামনা ও সবুক্তগীনের পুত্র আবুল কাশেম মাহমুদের ওপর তার আর্শিবাদ বর্ষিত হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হয়েছে এবং দরজার চৌকাঠের চতুর্দিক হতে একই লিপিমালা খোদাইকৃত হয়েছে 'আল্লাহ সর্বশক্তিমান'। জন মার্শাল অভিমত পোষণ কবেছেন যে, ইসলামি স্থাপত্য এবং এ জাতীয় কলাকৃষ্টিচর্চায় আফগানিস্তান পারস্য দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সাংস্কৃতিক উন্নযনে মিসবের চেয়ে শত বছর অগ্রগামী ছিল।[৪]

ভারতীয় উপমহাদেশে যে স্থাপত্যকর্ম ধারা সঞ্চালিত ছিল বিশেষভাবে হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে স্থাপত্য নির্মাণকার্য দেখা গিয়েছিল তা মন্দিব নির্মাণের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ মুসলিম শাসনামলে ভারতে বিভিন্ন প্রকার ইমাবত নির্মিত হতে দেখা যায়। তাদের নির্মাণ প্রেক্ষাপট দুটি ধারায় বিভক্ত- ধর্মীয় ও ধর্মনিবপেক্ষ। ধর্মীয় ইমারতগুলোব মধ্যে মসজিদ, মাকবারা, ঈদগাহ, মুসল্লা, মক্তব বা মাদ্রাসা অন্যতম। আর ধর্মনিবপেক্ষ ইমারতগুলোর মধ্যে জনসাধারণেব প্রয়োজনজনিত প্রশাসনিক ইমারত, বসবাসের জন্য আবাসনগৃহ, বিনোদনের জন্য চন্দ্রাতপ, শহরের প্রবেশ তোরণ, স্মৃতিস্তম্ভ, বিজয়স্তম্ভ, সরাইখানা, উদ্যান, বাউলী, ইঁদারা বা কূপ ইত্যাদি ছাড়াও বৃহত্তর নির্মাণ প্রকল্পগুলোতে রাজপ্রাসাদ, দুর্গ ও দুর্গ-নগরী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে প্রথম ধর্মীয় কাঠামোর কথা বলা যেতে পারে। মসজিদ কেবলমাত্র মুসলমানদের নামাজ আদায়ের নির্দিষ্ট ইমারত নয়; বরং এটি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভাবনী পদ্ধতির বিকাশ ক্ষেত্রও বটে। আরব দেশের মদিনা নগরীতে মূলত মহানবী (সঃ)-এর অতি সাধারণ নামাজগৃহ হতেই মসজিদের উৎপত্তি। মসজিদের পূর্ব-দক্ষিণ কোনায় (বহির্পার্শ্বে) ছিল নবীর আবাসিক গৃহ। সুতরাং মসজিদ প্রকল্পে বাসগৃহের চিহ্ন এখনো দেখা যায়।

ইসলামের প্রাথমিক যুগেই সুন্নাহ অনুসারে ব্যবহারিক নিয়মগুলো হাদিস আকারে পবিত্র অনুশাসনরূপে মান্য হয়ে আসছে। এ অবধারিত নিয়মগুলো যুক্তির চেয়ে আবেগতাড়িত হয়ে শক্তিরূপে দানা বেঁধে উঠেছিল। আদি পরিকল্পনায় বা অভিপ্রায়ণে কোনো সুনির্দিষ্ট কাঠামো আরাধনার জন্য ছিল না। নামাজ খোলা বাতাসে আল্লাহর সাথে বান্দার নৈকট্য লাভের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বাস্তবে মানুষের বক্র চেতনা সেভাবে চিন্তা না করে একটা আবেষ্টনী ঘেরা গৃহ বা ইমারতের মধ্যে নামাজের পরিবেশ গড়ে তোলার প্রয়োজন অনুভব করে প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিবন্ধকতা হতে দূরে একটা নিরিবিলি স্থান করে নিয়েছিল এবং এভাবেই মসজিদ এবাদত গৃহের রূপলাভ করেছিল।

মসজিদ একটি আয়তাকার বা বর্গাকার পরিসর বা স্থান নিয়ে গঠিত। জুল্লাহর তিনদিক প্রাকার পরিবেষ্টিত। কিবলা দেয়ালের বিপরীত দিক অধিকাংশ সময়েই সাহনের দিকে উন্মুক্ত। কখনো কখনো জুল্লাহ ও সাহনের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত হয়েছে ফাসাদ দে'য়াল। সাহনের মধ্যে অথবা বাইরে রয়েছে অজু করার জন্য পানির চৌবাচ্চা। এটি স্মরণ করা যেতে পারে যে নামাজের পরিপূর্ণতার পূর্বশর্ত হচ্ছে সঠিকভাবে অজু করার মধ্যে পাক পবিত্র হওয়া। মসজিদের নকশা পরিকল্পনায় আরো রয়েছে কিবলা দেয়ালে মিহরাব নির্মাণ। এটি এবাদতের দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে। মিহরাবের ডান ধারেই রয়েছে মিম্বার বা বক্তৃতা মঞ্চ।

কোনো কোনো মসজিদে জুল্লাহর কিছু অংশ পর্দাঘেরা করে মহিলাদের নামাজ আদায়ের ব্যবস্থা রয়েছে। মসজিদের সামনের দিকে সাধারণত উচ্চ একটি মঞ্চের হতে মোয়াজ্জিম বিশ্বাসীদিগকে নামাজে শরিক হওয়ার জন্য আজানের মাধ্যমে আহ্বান জানায়। এটি পরবর্তীকালে অতি উচ্চ স্তম্ভ বা মিনারের আকার ধারণ করেছিল।

প্রতি শুক্রবারে জোহরের ওয়াক্তে যে নামাজ আদায় করা হয় একে জুমার নামাজ বলে। জুমার নামাজে সাধারণত মুসল্লির সংখ্যা অপেক্ষাকৃত ওয়াক্তিয়া নামাজের চেয়ে বেশি হয়। তাই মসজিদের মধ্যে জায়গার সংকুলান করার লক্ষ্যে যে মসজিদগুলো নির্মাণ করা হয় সেগুলোকে জামে মসজিদ বলে আখ্যায়িত করা হয়। অবশ্য জামে মসজিদ ও সাধারণ মসজিদের অনুরূপই সব ওয়াক্তের নামাজ আদায় করা হয়ে থাকে। জামে মসজিদগুলোর পরিসর অপেক্ষাকৃত বৃহৎ হওয়া ছাড়াও নামাজের সুবিধার জন্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাদির দিকে লক্ষ্য রেখে মসজিদ নকশা পরিকল্পিত হয়ে থাকে।

মসজিদ স্থাপত্যের বিভিন্ন কাঠামো ও উপাঙ্গগুলো ধীরে ধীরে একটির পর আর একটি এসে একসময় আদর্শ মসজিদ নকশার সুষমা এনে দিয়েছিল। এসব উপাঙ্গ কখনো একসাথে আসে নি, বাস্তব প্রয়োজনের ভিত্তিতে মসজিদের পূর্ণাঙ্গ বৈশিষ্ট্যগুলো গড়ে উঠেছিল। পর্টিকো বা গাড়ি বারান্দা এবং অনুরূপ ধরনের প্রবেশ মিলনায়তন মসজিদের বহির্প্রাঙ্গণের সাথে যোগ হয়েছিল।

ভারতে প্রায় প্রতিটি মসজিদ নির্মাণ অগ্রগতিতে পদে পদে দেয়াল পর্দা এবং গম্বুজের আকারত্বে বৈসাদৃশ্যা বিরাজমান সমস্যার সমন্বয় সাধনের অক্লান্ত প্রয়াস সঞ্চালিত করে অবশেষে মীমাংসিত অবস্থায় আসতে পেরেছিল। গম্বুজের অবস্থান অভ্যন্তরের নেভের (nave) ঠিক উপরের কেন্দ্রীয় ছাদ অংশে। এর ফলে দেখা যায় যে ফাসাদের সম্মুখ দেয়ালের উপর দিয়ে যে উন্নত বপ্র (parapet) নির্মিত হয়ে থাকে এর দ্বারা গম্বুজের কিছু অংশ ঢাকা পড়ে সরাসরি দৃষ্টি পথে পতিত না হয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়। অবশ্য অনেক সময় মসজিদের পার্শ্ব হতে বা পশ্চাৎ হতে দেখতে অশোভন মনে হয় না।

মসজিদ নকশায় উচ্চতার সামঞ্জস্য বিধান করার সঠিক জ্ঞানের অভাবে ভারতে প্রথম দিকে মসজিদ নির্মাণে যথেষ্ট ভুলভ্রান্তি দৃষ্ট হয়েছে। এর ফলেই দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ ও আজমিরের আড়াই দিন-কা-ঝোঁপড়া মসজিদে পরবর্তীকালে পর্দার সংযোগ করেও মসজিদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ফুটে তোলা সম্ভব হয় নি। এর ফলে দেখা গিয়েছে যে একই প্রকারের ভুলের পুনরাবৃত্তি ঐতিহ্যবাহী হয়ে পরবর্তী মসজিদগুলোতে অনুকরণীয় মডেল হিসেবে এসেছে। অবশ্য এ পুনরাবৃত্তি যতই দিন গিয়েছে ততই ধীরে ধীরে কমিয়ে একটা স্থিতিশীল অবস্থায় ভারতীয় মসজিদ স্থাপত্য পদ্ধতিতে অবস্থান গ্রহণ করতে পেরেছিল।

বলাবাহুল্য গুজরাট এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে নির্মিত মসজিদগুলোতে আজমির মসজিদের সম্মুখ পর্দার প্রভাব নিঃসন্দেহে নিষিক্ত হওয়ার প্রয়াস দৃষ্ট হয়। আবার এ পরিবর্তনশীলতা মসজিদের আদি বা পুরোনো আদর্শের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করায়।

ধর্মভিত্তিক অন্য আর এক প্রকারের যে ইমারত নির্মিত হয়েছিল তা মাকবারা বা সমাধি। ভারত ভূমিতে এটি একেবারে নতুন প্রবর্তন। তখন পর্যন্ত মরদেহের উপর স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে কোনো পবিত্র সৌধ নির্মাণ প্রথা ভারতীয়দের নিকট অজ্ঞাত ছিল। কারণ হিন্দুরা শবদেহ দগ্ধ করার পর যে ছাই-ভস্ম পাওয়া যেত তা কোনো পবিত্র নদীগর্ভে নিক্ষেপ করত।

এমনকি মুসলমানদের মাঝেও কবরের উপর কোনো স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ইমারত নির্মাণ ইসলামের প্রাথমিক যুগে ধর্মীয়ভাবে নিষিদ্ধ ছিল। তবে পরবর্তীকালে ধর্মীয় বাধানিষেধ উপেক্ষিত হয়ে এটি দৃষ্টিনন্দন স্থাপত্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

মিসরে ফেরাউন (ফাঁরাও) উপাধিধারী রাজাদের রাজত্বকালে খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০-২৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ সময়ে পিরামিড নির্মাণ করে রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সংরক্ষিত দেহাবশেষ সাক্ষীরূপে সমাহিত রাখার প্রথা প্রথম চালু হয়েছিল এবং এ প্রথা ৭০০ খ্রিস্টাব্দের পর মিসর আরবদের রাজ্যভুক্ত হয়ে ইসলামি শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। এ প্রথা রহিত হওয়ার সাথে সাথে পিরামিডের আবশ্যকতাও লোপ পেয়েছিল। এশিয়া মাইনরের হ্যালিকারনাসাসে (halicarnassus) রাজাদের সমাধির উপর সৌধ নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়।[৫] তবে ভারতের ইসলামি সমাধি সৌধগুলোর আকারত্ব অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে উজ্জ্বলভাবে দীপ্তিশীল, অত্যুৎকর্ষ ও সমারোহপূর্ণ।

এসব মহৎ স্থাপত্য সৌধ ঢেউ বা ধনুক আকারের ছাদসহ শীর্ষে গম্বুজ ধারণ করে নির্মিত হতো। এর সাথে স্তম্ভানুরূপ উপাঙ্গ সংযুক্ত হতো। আবার এদের কিছু কিছু প্রশস্ত উদ্যান প্রাঙ্গণের কেন্দ্রে রচিত হয়েছে যার চারদিক দিয়ে আবেষ্টনী প্রাচীর সংযুক্ত করে ক্ষুদ্র তোরণ বা দরজা রাখা হতো। এসব শবাধারের প্রকোষ্ঠ তলদেশে সামান্য মাটির স্তূপ সংযুক্ত হতে দেখা যায়। কালক্রমে বিশেষভাবে উত্তর ভারতের সমাধিসৌধগুলো প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলীর চিত্র শিল্পের ন্যায় সুশোভন দৃশ্যপট সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের উৎকৃষ্টতম অংশ হচ্ছে সমাধি সৌধের উপর নির্মিত স্মৃতিসৌধগুলো। সমাধিসৌধ সাধারণত একক প্রকোষ্ঠ নিয়ে গঠিত যার কেন্দ্রে দাফনকৃত মরদেহ জানাজার পর শবাধারটিতে সমাধিস্থ করে রাখা হয় এবং সমস্ত কাঠামোটার উপর গম্বুজ ছাদ হিসেবে নির্মিত হয়ে থাকে। কখনো আবার ছাদ নির্মাণের পর কেবলমাত্র মধ্যবর্তী ছাদের অংশটুকুতে গম্বুজ নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়। মাকবারার পশ্চিম দে'য়ালের সাথে সাধারণতঃ মিহরাব নির্মিত হয়ে থাকে। আবার বৃহৎ সমাধিসৌধের সাথে আলাদাভাবে মসজিদ নির্মিত হতে দেখা যায়। অবশ্য সমস্তটাই একটা আবেষ্টনী প্রাচীরের মাঝে অবস্থিত। এগুলোকে রওজা বলা হয়ে থাকে। মদিনা শরিফে রসুলে খোদা হযরত মোহাম্মদ (দঃ)-এর মাজার একসময় উদ্যানে মসজিদ সহকারে নির্মিত হয়ে আধুনিককালে সবটাই বিরাট মসজিদ হিসেবে দৃশ্যমান হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ মাকবারাগুলোকে সময় সময় দরগাহ্ বলা হয়ে থাকে। মূলত এটি ফার্সি শব্দ যার বাংলা প্রতিশব্দ মাজার।

ধর্মভিত্তিক স্থাপত্য ইমারতগুলোর নির্মাণ প্রক্রিয়া তুলনামুলকভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ইমারতগুলো হতে একটু আলাদা ধরনের। তবে এগুলোর শ্রেণীবিন্যাস বা বিভাজন করা অসুবিধাজনক। কেননা এগুলো বিভিন্ন প্রকার ব্যবহার উপযোগী হয়ে ব্যক্তিবিশেষের

চিন্তাচেতনার নিরিখে নকশা পরিকল্পনার সৃষ্টি হয়েছে। এগুলোর একটির সাথে অপরটির নির্মাণ পরিচর্যার বিভিন্নতার কারণে আকারত্ব অন্যরূপ হয়েছে।

ভারতে মুসলিম শাসন আমলে তিনটি ক্রমবিকাশের ধারা পরম্পরানুসারে দানা বেঁধে উঠেছে। এর প্রথম ধাপ সীমিত সময়ের জন্য অব্যাহত ছিল। এ সময়ে অপবিত্রকরণ ও ধ্বংস করার নীতি অনুসরণ করা হয়েছিল। এর পেছনে হয়তো ধর্মান্ধতার আবেগপ্রবণতা কার্যকর ছিল। তা ছাড়া তখনকার বিজয়ীদের প্রথাই ছিল পরাজিত শত্রুর দুর্গ ও দুর্গের সংশ্লিষ্ট সকল ইমারত ভেঙে ধূলিসাৎ করে দিয়ে বিজয়ের হুঙ্কার সমাপ্ত করা। হাতির সাহায্যে ইমারতের ভারী স্তম্ভ বা থামগুলো টেনে অপসারিত করা হত। এভাবেই অনেক সংরক্ষিত নগর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। সাধারণভাবে যে কোনো বৃহৎ ইমারত কাঠামো ভেঙে তা হতো তাদের ইমারত নির্মাণ উপকরণ সংগ্রহ করা হতো। হিন্দু আমলে সাধারণভাবে মন্দির ছাড়া আর কোনো ইমারত নির্মিত হতো না। তা ছাড়া মন্দিরগুলো অত্যন্ত সমৃদ্ধিশালীভাবে প্রস্তর দ্বারা নির্মিত ছিল। ফলে বিজয়ীরা মন্দিরের মালমসলা সংগ্রহে সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিল বলে মনে হয়।

ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় ধাপেও ঐ একইরূপ ধ্বংসপ্রবণতা থাকলেও ইমারত নির্মমভাবে ভেঙে একাকার না করে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় রূপ ইমারত অংশ অপসারণ করে মসজিদ বা মাকবারার অংশ হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে জানা যায় যে, এসব ভাঙাচোরা কাজে এবারও হাতি দ্বারা বৃহৎ থাম বা স্তম্ভ, কড়ি বা বর্গা টেনে নির্মাণস্থলে নেওয়া হত। আধুনিককালেও জঙ্গলে যেখানে যান্ত্রিক উপায়ে কাঠ সংগ্রহ করা দুষ্কর সেখানে হাতির সাহায্যে কাঠ সংগ্রহ করা হয়। সেকালে মানুষেব অসাধ্য কাজগুলো এ শান্ত মেজাজের প্রাণীটি দ্বারা সুসম্পন্ন করা হত।

পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন[৬] যে মুসলমানেরা যখন কোনো অঞ্চল বা এলাকা পদানত করত তখন ঐ এলাকার মন্দির বা অনুরূপ কাঠামোগুলো তাদের রাজধানী, দুর্গ বা যে কোনো ধরনের ইমারত নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণের খনি হিসেবে ব্যবহৃত হত। তিনি আরো মতো পোষণ করেছেন যে হয়তোবা এ কারণে উত্তর ভারতে হিন্দু স্থাপত্যের তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য ইমারত দেখা যায় না। বিশেষভাবে দিল্লি ও আজমিরে মন্দির হতে সংগৃহীত উপকরণের সাথে নতুন মাল-মসলা যোগ হয়ে মুসলিম ইমারতগুলো নির্মিত হয়েছিল।

তৃতীয় ধাপে মুসলমানেরা যখন ভারতের বিভিন্ন অংশে পাকাপোক্তভাবে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিল তখন স্থাপত্য নির্মাণের জন্য নকশা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে থাকে। এ পর্যায়ে নির্মাণ কাজে কোনো পুরোনো মালমসলা জোড়াতালি দিয়ে ব্যবহারপ্রবণতা একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিশেষ ধরনের ইমারতের সঠিক প্রয়োজন অনুসারে নতুন মালমসলার আয়োজন করা হত। ভারতে যখন ইসলামিক স্থাপত্য এরূপ অবস্থায় উপনীত হতে পেরেছিল কেবল তখনই এর প্রকৃত বৈশিষ্ট্য অর্জন করে উৎকর্ষপূর্ণ স্থাপত্য পদ্ধতিরূপে বহিঃপ্রকাশিত হতে পেরেছিল।

ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য তিন পর্যায়ে গড়ে উঠেছিল এবং এদের গড়ে ওঠার সময় ও অবস্থান ব্যাখ্যাব প্রয়োজন রয়েছে। প্রথমত, দিল্লিভিত্তিক রাজ্যের কেন্দ্রীয় রাজধানীতে সুলতানি যুগে গড়ে উঠা স্থাপত্যধারা, দ্বিতীয়ত, প্রাদেশিক বা আঞ্চলিকভাবে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে ওঠা রাজ্যগুলোর রাজধানী শহরগুলোর স্থাপত্যধাবা, তৃতীয়ত, মোগলদের সময়ে গড়ে ওঠা স্থাপত্যধারা।

দিল্লিভিত্তিক স্থাপত্যচর্চা শুরু হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ক্রান্তিলগ্নে মামলুক সুলতান কুতুব উদ্দিন আইবেকের দ্বারা সূচনা হয়ে খল্জী বংশ, তোঘলক বংশ, সৈয়দ বংশ ও সর্বশেষ লোদী বংশের ইব্রাহীম লোদীর রাজত্বকালে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট জহির উদ্দিন মোহম্মদ বাবরের হস্তে পরাজয়ের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে গড়ে ওঠা স্থাপত্যধারা। এর সাথে রোম সাম্রাজ্য যখন বিস্তার লাভ করে রোম শহরে যেভাবে স্থাপত্য গড়েছিল তার তুলনা করা যেতে পারে। এর স্থাপত্য পদ্ধতি ও নির্মাণ পরিচর্যা ও বৈশিষ্ট্য বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ছিল এবং একে সনাতনী আদর্শ (classic) হিসেবে পরিগণিত করা হত। এটি রাজ্যের অন্যান্য অংশের ইমারত নির্মাণ আদর্শ হতে একটু স্বতন্ত্র গুণ সমৃদ্ধ ছিল। ভারতে দিল্লির অবস্থান কিছুটা অনুরূপভাবেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। এ ধারা প্রাদেশিক স্থাপত্যধারা হতে উন্নতমানের ছিল।

মুসলিম ভারতের দিল্লিভিত্তিক স্থাপত্যের নিজস্ব আকারত্ব ও আভিজাত্য ছিল; অবশ্য অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এর উন্নয়নের ধারা বা আকারত্বের বিভিন্নতা দেখা গেলেও কখনই এর সুস্পষ্ট অবয়ব এবং রাজকীয় বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যায় নি। দিল্লির এ রাজকীয় পদ্ধতি ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে প্রায় সাড়ে তিন শ বছর নিরবচ্ছিন্নভাবে অব্যাহত ছিল। অবশ্য এর সাথে পাঠান সুলতান শেরশাহের স্বল্পকালীন রাজত্বকালে নির্মিত স্থাপত্যকর্মগুলোকে দিল্লির সুলতানি যুগের স্থাপত্যকর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে।

অন্যপক্ষে দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রাদেশিক বা অঞ্চলিক স্থাপত্যচর্চার যুগ বলতে সে সময়কে বুঝায় যখন দিল্লির শাসনব্যবস্থার সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করে প্রাদেশিক সুবেদার বা রাজপ্রতিনিধিরা স্বাধীনভাবে ভারতের বিভিন্ন অংশে অঞ্চলভিত্তিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে স্ব স্ব রাজধানীর উন্নয়নে স্থাপত্য নির্মাণ কাজ শুরু করেছিল।

এসব স্থাপত্যধারার বৈশিষ্ট্য আঞ্চলিক প্রভাব ও শাসকের নিজস্ব অভিরুচির ওপর নির্ভরশীল ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং তৈমুর লঙের ভারত আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্য একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল তখন প্রাদেশিক শাসনকর্তারা একে একে স্বাধীনতা ঘোষণা করে রাজধানী গড়ার কাজে মনোনিবেশ করে। তবে এ প্রাদেশিক স্থাপত্য অনুশীলন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অব্যাহত থাকলেও দিল্লির দুর্বল শাসকদের আমলে সীমিত মাত্রায় স্থাপত্যকর্ম চলমান ছিল। অন্যপক্ষে মোগলদের দিল্লিভিত্তিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্থাপত্য অনুশীলন অব্যাহত ছিল।

তৃতীয় পর্যায়ে ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য মোগল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতায় ষোড়শ শতাব্দীতে শুরু হয়ে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রবহমান ছিল। এ সময়েই ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যধারা অত্যন্ত পরিপক্ব ও জাঁকজমকভাবে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল। এ সময়ের স্থাপত্যকর্মের মান আন্তর্জাতিক সীমারেখা স্পর্শ করতে পেরেছিল।

উপসংহারে বলা যেতে পারে যে, বিজেতা আরব মুসলমানদের তুলনায় বিজিত অনারব জাতির মুসলমানেরা স্থাপত্য ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধতা লাভ করেছিল। এরাই মুসলিম কলাকৃষ্টির নবরূপায়ণে ঔদার্যপূর্ণ শাসন ও পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। তাদের প্রধান সম্বল ও চেতনাবোধ ছিল গ্রহণযোগ্যতা ও সহনশীলতা। তারা যেখানেই গিয়ে পৌঁছেছে সেখানেই সর্বজনীন সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। রসাস্বাদনী মন দ্বারা উৎকৃষ্টতা যাচাই করে তাকে একান্ত আপন করে গ্রহণ করেছিল। সর্বোপরি প্রাণবন্ত স্বভাব, উদার দৃষ্টিভঙ্গি এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার নিরিখে ক্রমবিবর্তনশীল পরিবেশকে খাপ খেয়ে নেওয়ার মানসিক প্রবণতার জন্য

তারা বিজিত অঞ্চলগুলোতে প্রচলিত কৃষ্টিকলার সাথে একান্ত আপন হয়ে যেতে পেরেছিল। মুসলমানদের সংস্কারমুক্ত মানসিক অভিযান বিভিন্ন আঞ্চলিক উপাদানের সংমিশ্রণে আরব-ইসলামি, তুর্কি-ইসলামি, মিসরীয়-ইসলামি, স্পেনীয়-ইসলামি ও অবশেষে ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যধারার রূপায়ণ বিভিন্ন স্থানীয় উপকরণের সাথে সমন্বিত হয়ে একটি অপরটি হতে প্রভেদ সৃষ্টি করতে সমর্থ হলেও মৌলিক ধর্মীয় আদর্শ মসজিদ স্থাপত্যে যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে তা সর্বক্ষেত্রে প্রায় অপরিবর্তিত রয়ে গেছে। তাই মুসলিম লৌকিক স্থাপত্যে বৈষম্য দৃষ্ট হলেও ইসলামের মূল ধর্মীয় নীতির ক্ষেত্রে তার কোনো সংমিশ্রণের আপস চিহ্নিত হয় নি। এ উপমহাদেশের স্থাপত্য বিপ্লবেরই নিরিখে তা বিশ্লেষণ ও প্রণিধান করতে হবে।

দিল্লিতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ক্রান্তিলগ্নে গড়ে ওঠা স্থাপত্য আলোচনায় মুসলিম শিল্পকলার প্রথম বিকাশমান সত্তার ধাপগুলো যে নতুন আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল তা সক্রিয়ভাবে মোটামুটি শিল্পকলার তিনটি শাখারই বিস্তৃতি কয়েক শ বছর ধরে অব্যাহত থাকার পর পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। এগুলো হচ্ছে—(১) স্থাপত্য, (২) চিত্রকলা, (৩) ভাস্কর্য (বিমূর্ত আদলে) ইত্যাদি।

এগুলোর উন্মেষের যে ধারাবাহিকতা প্রবহমান হয়েছিল তা প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় যে, আদর্শগত বৈশিষ্ট্য ইসলামি সংস্কৃতির যে নিজস্ব গতি ও প্রকৃতি রয়েছে তা বাহ্যিকতাকে অতিক্রম করে নয়; বরং সর্বক্ষেত্রে ইসলামি জীবন দর্শনকে সম্পৃক্ত করে নতুন এক আঙ্গিকে পরিস্ফুট করে ইসলামি আদর্শের স্বাতন্ত্রবোধকে জাগিয়ে তুলেছিল, যা অন্যান্য বিজাতীয় শিল্পকলার বৈশিষ্ট্য হতে কিছুটা ভিন্নতর ছিল।

এ ভিন্নতর আদর্শটি বিশেষভাবে উৎকর্ষ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল স্থাপত্য অনুশীলনের মধ্য দিয়ে। বাইজান্টাইন বা পূর্ব রোমান এবং পারস্য বা সাসানীয় স্থাপত্যের গৌরবময় উজ্জীবনের মাঝে এদের সনাতনী আদর্শের অলঙ্ঘনীয় জলুসকে অতিক্রম করে এবং কিছুটা সঙ্গে রেখে ইসলাম ধর্মের অনুসারীরা নিজেদের আদর্শে স্থাপত্য গড়ার জারক রস বা চেতনা অভিসিঞ্চায়ন অব্যাহত রেখেছিল তা সুদূর আরব ভূমি ও সুমেরিয়ান সভ্যতার পাদপীঠ তাইগ্রিস ও ইউফ্রেতিস নদীর অববাহিকায় মেসোপটেমিয়া হয়ে ইরান ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়ে খাইবার গিরিপথ ধরে ভারতে উপনীত হয়েছিল।

এটি গড়ার দায়িত্বভার যার ওপর অর্পিত হল তিনি হলেন ঘোর অধিপতি মোহম্মদ ঘোরীর আশীর্বাদপুষ্ট সৌভাগ্যবান ক্রীতদাস ও রাজপ্রতিনিধি কুতুব উদ্দিন আইবেক। এ রাজপ্রতিনিধি স্বাধীনভাবে মামলুক রাজবংশ স্থাপন করে নববিজিত দিল্লি ও আজমির ভিত্তিক যে স্থাপত্যশিল্প গড়ে তুলেছিলেন তা ইসলামের আদর্শকে পরিহার করে নয়; বরং ইসলামি আদর্শের ধারাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অন্তর্নিহিত ভাবসত্তাকে শিল্প আঙ্গিকের মাঝে পরিস্ফুট করার ধ্যান-ধারণা দায়িত্ব সহকারে পালনের মাধ্যমে চেষ্টা করা হয়েছিল।

ভারত ভূমিতে মুসলিম স্থাপত্য যেভাবেই গড়ে উঠুক না কেন এর পশ্চাতে মূলধারার লক্ষ্যই ছিল উন্মুক্ততার প্রতীক অর্জন করা। বাস্তবে এ প্রতীক দৃশ্যমান হয়েছে গম্বুজ ও খিলানের একত্র ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। ইসলামে এ যে প্রাণপণ উন্মুক্ত প্রান্তরের দিকে ধাবমান হওয়ার আকুতি অনাবিল স্বর্গীয় সুবাস নেওয়ার প্রেরণা, সেটাই সৃষ্টি করেছিল স্থাপত্য আদর্শে আলোড়ন সৃষ্টিকারী উন্মুক্ততার আদল। ইসলামের সর্বজনীন আদর্শ প্রকাশমান ভিতরকে বাইরের সাথে একাকার করে দেওয়ার প্রাণস্পর্শতার মাঝে।

ইসলামের অন্তর্নিহিত ভাবসত্য স্থাপত্যের গাত্রে গভীর ও মূলীভূতভাবে বিধৃত হয়ে গিয়েছে। বিশ্ব শান্তির প্রতীক ধর্ম ইসলাম যে একার কারো আবেদন বা আরাধনার সুযোগের মাঝে সীমায়িত নয়; বরং সকলকে নিয়ে ঐক্য গড়ে তোলার মাঝে জীবনের কল্যাণ নিহিত রয়েছে তারই প্রতীকরূপ স্থাপত্যকর্মের নকশা পরিকল্পনার মাঝে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। সাধারণ বা লৌকিক দৃশ্যমান জীবন ও নৈতিক আধ্যাত্মিক জীবনবোধের মাঝে ঐক্য সৃষ্টির মানসে সঠিকভাবে এখানে স্থান করে নিতে পেরেছে।

মসজিদ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় মুসলিম স্থাপত্যে যে নতুন স্থাপত্য মাত্রা যোগ হয়েছে তাকে কতকটা এভাবে বলা হয়েছে যে 'পরিসরের মধ্যে এবং পরিসর ছাড়া' (space in and space without)| উপরের বিশাল নীলিমা ঘেরা উন্মুক্ত আকাশ আর নিচে প্রশস্ত মোলায়েম মাটি। অন্তরের সত্তার সাথে বাইরের সত্তার অপূর্ব মিলন। এক কথায় বাইরের প্রসারিত প্রান্তরের সাথে ভিতরের পরিসরের সমন্বয় সাধন এবং মসজিদ স্থাপত্য নকশার প্রতিপাদ্য বিষয়ই হচ্ছে বাইরের বিশালতা ও ভিতরের সীমিত অবস্থানের মাঝে যোগসূত্র সৃষ্টি করা। কেননা বাহির ও ভিতর একত্র হওয়ার ব্যবস্থা সংবলিত এক নতুন সত্তার মাঝেই ইসলামের জীবন-দর্শনের সূক্ষ্ম অথচ জোরালো বিশ্বজনীন সাম্যতার দুর্লভ আদর্শের প্রতীক সৃষ্টি হতে পেরেছিল। এ দু-এর একত্রীভূত সমাহার আর কোনো স্থাপত্য পদ্ধতির মাঝে এমন প্রাঞ্জলভাবে প্রত্যক্ষ করা যায় না।

মোট কথা বাইরের কোলাহল ও ভিতরের স্তব্ধতাকে সমীকরণ করার প্রতিশ্রুতি স্বীকার করে আল্লাহতালার নৈকট্য লাভের যে চেতনা সেটাই ইসলামে আরাধনার প্রকৃত পন্থা। বিচ্ছিন্ন জীবন ইসলামে কাম্য নয়, সংসার সমরাঙ্গনে ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধতাকে মেনে নিয়ে জীবন তখন বিশ্বস্রষ্টার বৈদীমূলে নতজানু হয়ে আপন অর্ঘ্য নিবেদন করতে পারে তখনই তার এবাদত ও প্রার্থনা প্রশস্তি লাভ করে।

তাই সে বিরাটের সাথে নিজেকে মিশিয়ে ফেলার ভাবধারার পরিপূর্ণ বিকাশ মসজিদ স্থাপত্যের মাঝে নিষিক্ত হয়েছে। স্রষ্টার উদ্দেশ্যে এখানেই বন্দিত হয় বান্দার মনের আকুতি ভরা মিনতি। ভারত ভূমিতে মুসলিম স্থাপত্য সৃষ্টির সূচনালগ্নে যে বাস্তব কতকগুলো অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল তা কোনোক্রমে কেটে ওঠা সম্ভব হয় নি। সে কারণে পরিস্থিতিজনিত অসুবিধাগুলোকে সাথে করেই এখানে মুসলমানদের হাতে যে স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল তাই দিল্লিতে রাজধানী ভিত্তিক মুসলিম স্থাপত্য অনুশীলন। এ স্থাপত্যকর্মের সাথে মুসলিম শাসক এবং অমুসলমান স্থপতি ও কারিগরবৃন্দের হৃদয়ের যোগসূত্র গ্রোথিত হয়ে সেকালের এক সফল যৌগিক স্থাপত্যকর্ম প্রথমত দিল্লির লাল কোর্ট এলাকায় মুসলিম স্থাপত্যরূপে বহিঃপ্রকাশিত হয়েছিল।

অবশ্য স্থাপত্যে মুসলিম মানসের যে আদর্শগত বৈশিষ্ট্য গম্বুজ ও খিলান ব্যবহারের মাঝে বিশাল ও উন্মুক্ত আকাশকে হাতছানি দেওয়ার একটা ঐশ্বী স্বর্গীয় প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যায় তা প্রকৃতপক্ষে মদিনার প্রথম মুসলিম এবাদতখানা হজরত মোহম্মদ (দঃ)-এর ছাদবিহীন উর্ধ্ব গগনের বিশাল নীলিমাকেই মসজিদ উপাঙ্গ হিসেবে পাবার আধ্যাত্মিক চেতনার পরিস্ফুরণ রূপে চিহ্নিত করা যায়, যা বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ায় ও আদলে বিভিন্ন মুসলিম দেশে এটি প্রতিবিম্বিত হয়ে ইসলামি ঐক্যের প্রতীক চিহ্নরূপে বিদ্যমান রয়ে কাল হতে কালান্তর ঐ একই বাণীর ধারাকে গতিশীল করে রেখেছে।

এখানেই মুসলিম স্থাপত্যের অমোচনীয় স্বতন্ত্রতাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল হয়ে উচ্ছলতায় স্পষ্টভাবে দেদীপ্যমান এবং দিল্লির প্রথম মুসলিম স্থাপত্য যেন তারই প্রকৃষ্ট প্রতীক ধারণ

করে রয়েছে। পরবর্তীকালে দিনে দিনে বিভিন্ন স্থাপত্যধারার সাথে যোগ-বিয়োগ সাধন করে পরিশেষে একটা গ্রহণযোগ্য মানের সার্থক স্নিগ্ধময় স্থাপত্য-ঐতিহ্য অর্জন করে এক গৌরবময় স্থাপত্যের বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল এবং পৃথিবীর বিশাল স্থাপত্য ইতিহাসে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি , ১৯৭৫, পৃ. ২ ।

২ The Hındu system of constructıon was trabeate, based on column and architrave. The Muslım was arcuate, based on arch and vault. In Indıa, the Muslım buılders used both the systems. Henceforth, ıt has begun to be known as Indo Islamıc method of constructıon

৩. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৩।

৪. জে. মার্শাল, "দি মনুমেন্টস অব মুসলিম ইন্ডিয়া", *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া,* ভলিউম-৩, দিল্লি, ১৯৫৮, পৃ. ৫৭৫।

৫. পি ব্রাউন, *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৪।

৬. *তদেব*।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতে মুসলিম স্থাপত্যের উৎস

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ক্রান্তিলগ্নে দিল্লিভিত্তিক রাজধানী স্থাপনের মধ্য দিয়ে ভারতের বুকে মুসলিম স্থাপত্যেব সূচনা হলেও অষ্টম শতাব্দীব প্রারম্ভে দুটি ইসলামিক স্থাপত্য নির্মাণ ধারা গড়ে ওঠার দৃষ্টান্ত দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। এসব শাসকের দ্বারা নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শনগুলো ধ্বংস হয়ে গেলেও আদর্শের প্রভাব বিলীন হয় নি। কেননা আরবদের বিজিত সিন্ধু উপত্যকায় নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শনে তার প্রভাব বিদ্যমান। বিজয়ীরা এসব স্থাপত্যশিল্পজাত কৌশলের মধ্যে বেবিলন এলাকায় ব্যবহৃত মসৃণ ও চকচকে টালির ব্যবহার পাঞ্জাবের মুলতান ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রচলন করেছিল।

অপর আর একটি স্থাপত্যধারা প্রবর্তন একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আফগানিস্তানের গজনভী শাসকগণ রাজধানী পাঞ্জাবে স্থানান্তর করেছিলেন। প্রতিনিধি শাসকবর্গ প্রশাসনিক কারণেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদ ও রাজকীয় ভবন এখানে নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যখন ঘোর সুলতানগণ ভারতের বুকে পদার্পণ করেন তখন তারা এসব নিদর্শনগুলো সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করেছেন।

পাঞ্জাবের প্রাচীন রাজধানীর প্রাসাদ ও প্রশাসনিক ভবনের ধ্বংসাবশেষের কুলঙ্গিতে ও গৃহকোণে ইষ্টক ও কাষ্ঠ নির্মিত কাজের সুস্পষ্ট নিদর্শন প্রতীয়মান হয়েছে। এসব স্থাপত্যকীর্তির নির্মাণশৈলী অবলোকনেই ইসলামি স্থাপত্যের প্রাথমিক যুগের পদ্ধতির উন্নয়ন এখনও বুঝতে পারা যায়। এর পূর্বে বিশেষ করে কাষ্ঠ নির্মিত দরজা ও দ্বারদেশ বা দেউড়ির কেন্দ্রীয় খিলানের ত্রিকোনাকার ভূমিতে উদগৃত কারুকার্য নকশা ও অলঙ্কৃত কুলঙ্গি মধ্যপ্রাচ্যে একাদশ শতাব্দীতে চর্চিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। এ অলঙ্করণ ও কারুকার্য সম্বলিত উপাদানসমূহ পরবর্তী সময়ে ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে ধীরে ধীরে দৃঢ়তায় সমন্বিত হয়ে গিয়েছিল।

এতদসত্ত্বেও এটি স্পষ্টত, বলা যায় যে, দিল্লিতে মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশ ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মামলুক সুলতানদের আমলে চূড়ান্তভাবে সূচিত হয়েছিল; কারণ এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.) একটা বিরাট স্থাপত্য কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে অত্যন্ত শক্তিশালী মর্যাদাসম্পন্ন ও বৈশিষ্ট্যময় স্থাপত্যরীতি জাগ্রত করতে সক্ষম হন এবং এক নতুন পদ্ধতির নির্মাণশৈলীর গোড়াপত্তন করেন। তাঁর প্রথম প্রচেষ্টার সফল ফসল হল কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ (১১৯৫ খ্রি.), যা হিন্দু মন্দিরের ধ্বংসাবশেষের উপর এবং মন্দির হতে সংগৃহীত উপাদান দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। হিন্দু মন্দির

হতে সংগৃহীত উপাদানের সমন্বয় এবং জোড়াতালি দিয়ে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল তা পরিপূর্ণ রসগ্রাহী স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে ওঠে নি। এটি খাপ খাওয়ানো পাঁচমিশালী অংশ বিশেষে সমাহার রূপে একটি জগাখিচুড়ি স্থাপত্য নিদর্শন বলে পরিগণিত হয়েছে। কতকগুলো স্তম্ভ ও থাম সহযোগে খিলান ও খিলানশ্রেণী দ্বারা একটা প্রশস্ত ঘেরা জায়গা মুসলিম এবাদতখানা রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা ছিল মাত্র।

দুঃখের বিষয় এ দেশীয় মন্দির নির্মাণ বিদ্যায় পারদর্শী মিস্ত্রি ও কারিগরগণের হাতেই নির্মিত প্রথম স্থাপত্যকীর্তি সুলতানের মানসিক ইচ্ছা পূরণ করতে সক্ষম হল না। অতঃপর কুতুবউদ্দিন উক্ত মসজিদের বহিরাঙ্গনকে ইসলামি চেতনার কাছাকাছি নিতে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে এর পরিবর্ধন করার মানসে পশ্চিম এশিয়ার মেসোপটেমিয়া হতে ইসলামি স্থাপত্যে পারদর্শী স্থপতি ও কারিগরদেরকে দিল্লিতে আহ্বান করেন। উক্ত মসজিদের বিসদৃশ্য থামগুলো দৃষ্টির আড়ালে নেওয়ার জন্য এর সঙ্গে এক বিস্তৃত খিলান পর্দা সংযোজন করা হয়। এটিই ভারতের বুকে মূলত ইসলামি আদর্শে গড়ে ওঠা প্রথম স্থাপত্য নিদর্শনরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে।

সমসাময়িককালে গড়ে ওঠা স্থাপত্যকীর্তিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুতুব মিনার, যা কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের মিনাররূপে বহিঃপ্রকাশিত হয়েছিল। অবশ্য অনেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মতো পি. ব্রাউন একে স্মারক স্তম্ভরূপে ঘোষণা দিয়েছেন।[১] এর পূর্ণাঙ্গ অবয়বপ্রাপ্তিতে পরবর্তী সময়ে কয়েকজন সুলতানের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষ করা যায়। অন্যপক্ষে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দে আজমিরে আড়াই দিন-কা-ঝোঁপড়া মসজিদটি প্রথম কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের মতোই মন্দিরের ভঙ্গ মালমসলার সমব্যবহারে তিন স্তম্ভের সংযোগে উঁচু করে নির্মাণ করা হয়। তবে খিলান পর্দাটি মূলত নতুন সংযোজন ছিল। ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের উৎকর্ষের পথে আজমির মসজিদের এ খিলান পর্দাটি ছিল একটি নব আবিষ্কার। ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের প্রথম সোপান ১১৯৫ খ্রিস্টাব্দে শুরু হলেও এর পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তিতে ১২০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় লেগেছিল।

স্থাপত্য নিদর্শনের আকৃতি-প্রকৃতি ডিজাইন ও নির্মাণ কৌশলগত জটিলতা পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে ধারাবাহিকভাবে আলোচনার অবকাশ সৃষ্টি করে এখানে কেবলমাত্র ভারতের বুকে ইসলামি স্থাপত্য গড়ে ওঠার যে বিস্তৃত পটভূমি রয়েছে তারই উৎসমুখ আলোচনা সর্বপ্রথম অপরিহার্য। স্থাপত্যের উদ্ভাবনী স্রোতধারার সাথে সংস্কৃতির আন্তঃপ্রবাহের যে মিলন সেতু দিল্লির বুকে দানা বাঁধতে পেরেছিল তার পশ্চাতে যে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সংযুক্ত হয়ে স্থাপত্যের উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল তা বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। কেননা ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের বিকাশধারার যে বৈশিষ্ট্য বিধৃত হয়েছে তার সাথে পশ্চিম এশিয়ায় চর্চিত স্থাপত্যিক পদ্ধতির একটা অন্তর্নিহিত সংস্পর্শতার যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়। পশ্চিম এশিয়ায় স্থাপত্য আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ এশিয়া মাইনরে সেলজুক সম্রাটগণের দ্বারা চর্চিত হয়েছিল, যা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এসে স্তব্ধ হয়ে যায়। অন্যপক্ষে যখন সেলজুকদের স্থাপত্য প্রভাব সীমান্তে এসে পৌঁছেছিল তখন দিল্লিতে মুসলিম ক্ষমতা বিস্তার লাভ করতে আরম্ভ করে। ফলে সেলজুক বৈশিষ্ট্যময় স্থাপত্য আদর্শ এ নব স্থপতিদের মনে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল এবং এটি আশীর্বাদরূপে ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য অঙ্গনে চিরন্তনত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল।

দ্বাদশ শতাব্দীতে একটা যাযাবর জনগোষ্ঠী মধ্য এশিয়ার চারণভূমি হতে আপন আবেগে তাড়িত হয়ে পশ্চিম দিগন্তে অগ্রসর হতে থাকে এবং তাদের নেতা সেলজুক

সিরিয়া-ইরাকের মুসলিম অঞ্চলগুলোতে আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয় এবং পরবর্তী সময়ে এশিয়া মাইনর ও আনাতোলিয়ায় রাজ্য স্থাপন করে মুসলিম সংস্কৃতিতে সম্পূর্ণভাবে অভিনিবিষ্ট হয়ে এক অনন্যসাধারণ সভ্যতার বিকাশ ঘটিয়েছিল।

তারা কোনিয়াতে রাজধানী স্থাপন করে অতিসত্বর শিল্প নৈপুণ্যের বিচক্ষণতার পরিবেশ সঞ্চয়ের মধ্য দিয়ে এক অলঙ্কার সমৃদ্ধ নৈপুণ্যময় স্থাপত্য পদ্ধতির গোঁড়াপত্তন করতে সমর্থ হয়েছিল। তাদের প্রাসাদ, মসজিদ, বিদ্যাপাদপীঠ, রাজকীয় বাসভবন প্রভৃতি এর সাক্ষ্য বহন করছে। একটা অপেক্ষাকৃত অসভ্য মরু জনগোষ্ঠী কীভাবে সামান্য সময়ের ব্যবধানে একটি উন্নতমানের স্থাপত্যধারার অনুশীলনে সফলতা লাভে সমর্থ হয়েছিল তা কিছুটা বিস্ময়ের ব্যাপার। এ প্রসঙ্গে বলা চলে যে তাদের স্থাপত্য গঠন প্রণালী নিজস্ব প্রতিভা হতে উদ্ভূত আদি ও অকৃত্রিম এবং পূর্বের প্রথাগত সমাজ উন্নয়নের পরিকল্পনার সাথে এটি সম্পর্কিত প্রবাহে আবর্তিত হতে পেরেছিল।

সেলজুক জনগোষ্ঠী স্থাপত্য পদ্ধতি সম্পর্কে যে একেবারে অনভিজ্ঞ ছিল তা নয়; বরং ইসলাম ধর্মে দীক্ষার পূর্বেই এ বিষয় তারা কিছুটা অবগত ছিল এবং চলমান ধারার মধ্যে নতুনত্ব ও অভিনবত্ব আনয়ন করে স্থাপত্যে এক নতুন প্রাণস্পর্শতা জাগাতে সক্ষম হয়েছিল। নির্মাণশৈলী মজবুত ও টেকসই করতে উপাদান, মালমসলা নির্বাচন ও পছন্দ করার সাথে একটা শৈল্পিক চেতনার উন্মেষ উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষণীয়। নিঃসন্দেহে তাদের অভিজ্ঞতা ও পছন্দ রোমান যুগের সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে নির্মিত স্থাপত্যকীর্তিগুলোর ওপর ভিত্তি করে রচনাশৈলী আহরিত হয়েছিল এবং এ সনাতন পদ্ধতির গতিধারা চলমান রেখে পরবর্তীকালেও প্রতিভার সাক্ষ্য রেখে যায়।

কাজেই সেলজুকদের ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত চর্চিত স্থাপত্য উন্নয়ন ধারার চরিত্র বিশ্লেষণে দুটি বিপরীত স্থাপত্যশৈলীর সমন্বয় সাধনের সুস্পষ্ট প্রমাণ দৃষ্ট হয় বলে পি. ব্রাউন উল্লেখ করেছেন; এর একটি হচ্ছে—এশিয়ার কল্পনাপ্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি, অপরটি হচ্ছে রোমানদের চাতুর্যপূর্ণ কৌশল ও উদ্ভাবন শক্তিময় স্থাপত্য আদর্শের আন্তরিক প্রয়োগ।

এ দুটি ধারার বিশ্লেষণে প্রথম ধারার ঐশ্বর্যময় অলঙ্করণযুক্ত সুশোভনে শ্বেতমর্মর ও লাল বেলে পাথরের উপর নকশালঙ্কার ও খোদিত নকশার সজ্জায়ন, বক্ররেখা, বিজড়িত জটিল ও দুর্বোধ্য নকশা, জ্যামিতিক নকশালঙ্কার এবং স্ট্যালেকটাইট আঁকাবাঁকা ঘুরানো নকশার কৌশল ইত্যাদির প্রয়োগ উল্লেখযোগ্য, যা প্রাচ্য আদর্শের স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত।

শেষোক্ত ধারায় হেরোডিয়ান পদ্ধতিতে প্রস্তর বন্ধনীর প্রয়োগ ও সমন্বয় সাধন, নিরেট কঠিন প্রস্তর দেয়াল, ভূঁসোয়াযুক্ত ছুঁচালো খিলান, জাঁকালো খিলান ছাদ প্রভৃতি প্রধান অবলম্বন হিসেবে প্রতীয়মান হয়। বিশেষ করে সেলজুকদের প্রাসাদ ও পান্থশালায় নিষ্ফল কৌশল অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী ও চিত্তাকর্ষক, স্তম্ভসারির ভারী পিয়ার ও থাম, ছুঁচালো খিলান সমসাময়িক যুগের গথিক্ গির্জার নির্মাণ কৌশলের সাথে অত্যাশ্চর্য সাদৃশ্য বিদ্যমান। ত্রয়োদশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে পশ্চিম এশিয়ায় যখন সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল তখন তাদের স্থাপত্য নিদর্শনগুলো প্রাচ্য ও পশ্চাত্যের মধ্যে সংস্কৃতির একটা সেতুবন্ধ রচনা করতে সমর্থ হয়েছে।

মোঙ্গলদের এ ধ্বংসাত্মক অভিযানের ফলে ঐ অঞ্চলের সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে। জনপদ বিচ্ছিন্ন ও বিধ্বস্ত হয়ে বিতাড়িত অবস্থায় অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ে। এর পরোক্ষ ফলস্বরূপ এ সভ্যতায় লালিত মানুষগুলো নিকটস্থ সুবিধাজনক স্থানে অনুকূল পরিবেশেও তাদের আশ্রয় খুঁজে নিত। এ ধ্বংসযজ্ঞের হাত হতে বেঁচে যাওয়া সংস্কৃতিমনা মানুষগুলো নিরাপদ স্থানে

নিজেদের কর্মস্থল চয়ন করে অনেকেই নিরাপদ ও অনুকূল স্থান হিসেবে ধ্বংসপ্রাপ্ত বিরান এলাকার বাইরে দিল্লিকেই পছন্দ করেছিল এবং সেখানেই সেলজুক আমলে চর্চিত স্থাপত্যকলা ও অন্যান্য সংস্কৃতিমূলক শিল্পকর্মের উন্নয়ন করার সুযোগ পেয়েছিল এবং স্থানীয় শাসকবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় এর শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ব্রতী হয়েছিল।

দিল্লির প্রথম যুগের মুসলিম স্থাপত্য অনুশীলনে এসব মনীষীর অবদান প্রস্তরগাত্রে খোদিত হয়ে রয়েছে। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের খিলান পর্দাটির অলঙ্করণ ও ডিজাইনে এমনকি কুতুব মিনারের বহির্গাত্রেব সুশোভনের মধ্য দিয়ে এটিও প্রমাণিত হয়েছে। অবশ্য প্রথম স্থাপত্যকর্মের মধ্যে প্রতিভার সাক্ষ্য তেমন স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও যতই দিন গিয়েছে ততই পদ্ধতির উন্নয়ন ও অগ্রগতির সুস্পষ্ট ছাপ প্রকাশমান হয়েছে এবং সুনির্দিষ্ট স্থাপত্য পদ্ধতি ও নকশা পরিকল্পনা এবং কৌশলগত পরিপক্বতা দৃষ্ট হয়েছে। ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন খল্‌জী কর্তৃক দিল্লির কুতুব এলাকায় আলাই দরওয়াজা নামের প্রবেশপথ নির্মাণের মধ্যদিয়ে স্থাপত্য উৎকর্ষতার চরম বিন্দুতে উপনীত হয়েছিল।

দিল্লিতে মুসলিম সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের স্থাপত্য কার্যক্রমও চাহিদা অনুসারে সম্প্রসারিত হতে থাকে এবং লক্ষণীয় যে সেলজুক প্রভাব ক্ষীণ হয়ে এটি কমতে আরম্ভ করে; অন্যপক্ষে অপর একটি পদ্ধতিপূর্ণ আদর্শের সাথে কেবল সমন্বিত হল না; বরং ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যধাবাব ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। এ নব্য ধারাটি ছিল পারস্য স্থাপত্যের প্রত্যক্ষ প্রভাব পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যখন তৈমুর লঙের বংশধর মোগলরা ভারতের বুকে নিজেদেরকে সুপ্রতিষ্ঠিত করল তখন তারা এক নতুন স্থাপত্য স্রোতধারার প্লাবনে এ দেশকে সয়লাব করে দিয়েছিল।

এ ধারার প্রধান প্রণিধানের বস্তু ছিল খিলানের আকার সৌকার্যকরণ, কেননা সেলজুকদের ছুঁচালো অশ্বখুরাকৃতির খিলান সুবিস্তৃত পরিসরের ভার বহনের উপযুক্ত ছিল না। তাই প্রশস্ত পরিসরের ভার বহন করার প্রয়োজনে চতুর্কেন্দ্রিক টিউডর খিলানের প্রবর্তন করা হয়। তবে উত্তর ভারতে এটি প্রথম স্বতঃস্ফূর্তভাবে ব্যবহার করা হয় নি। এর প্রকৃত কার্যকারিতা ও নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছিল এবং সর্বত্র পরীক্ষামূলকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। স্থপতিবা এ সংশয়ের বশবর্তী হয়ে খিলানের ভার বহন ক্ষমতা মনঃপূত করার জন্য খিলানের উপর দিয়ে দেশীয় কায়দায় প্রস্তর খণ্ড কড়ি বা বর্গার ন্যায় সংস্থাপিত করে সেতুর মতো করা হয়, যা ভারতে বহুপূর্বে হিন্দু স্থাপত্যের উপকরণরূপে ব্যবহৃত হয়েছিল। ফলে খিলান ও সর্দলের সমন্বয়ে নতুন একটা স্থাপত্য কৌশলের আবির্ভাব চতুর্দশ শতাব্দীর তোঘলক স্থাপত্যে দৃষ্ট হয়েছে।

তোঘলকদের এ অবৈজ্ঞানিক স্থাপত্য কর্মধারা পরবর্তী যুগে আর পুনরাবৃত্তি হতে দেখা যায় নি। অন্য কোনো নির্মাতা ছুঁচালো অশ্বখুরাকৃতির খিলান-সর্দল সহযোগে ব্যবহার করে নি। সৈয়দ ও লোদী সুলতানগণের আমলে সমাধি ভবন ও মসজিদ নির্মাণে চতুর্কেন্দ্রিক খিলান পদ্ধতির স্বতঃস্ফূর্ত ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তবে লক্ষণীয় যে যখন এটি প্রথম প্রবর্তিত হয়েছিল তখন গঠন-কাঠামো ঘরের দেয়ালের ও খিলানের বাইরে কারুকার্য অপরিপক্বতার দৃষ্টান্ত বহন করছে।

ভারতের বুকে পারস্যের জাতীয় স্থাপত্যধারা সম্ভবত সম্প্রসারিত ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রত্যক্ষ কারণ হচ্ছে রাজক্ষমতার গোঁড়াপত্তন ও পূর্বের দিল্লির সুলতানগণের ধীরে ধীরে পতনের দিকে অগ্রসরতা এবং নতুন রাজবংশের সংস্কৃতির স্রোতধারা পারস্যের স্থাপত্যশিল্পের উপাদান দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রত্যক্ষ সুযোগ। এর কারণ অন্বেষণে আরো

গভীরে প্রবেশ করলে সময়ের দীর্ঘসূত্রতা প্রথমত, এদের জাতীয় দৈহিক প্রকৃতি ও মেজাজ, দ্বিতীয়ত, ভিন্নতর কলাতত্ত্ব ও স্থাপত্যশিল্পজাত অভিজ্ঞতা। পারস্যের স্থাপত্য প্রতিভার স্ফুরণে বিস্ময়কর বুনন, কৃত্রিম বস্তুর প্রয়োগ সফলতার ফলপ্রসূ বিভিন্ন আকৃতির গঠনক্ষম উপাদানকে স্থাপত্যের ব্যবহার কৌশল রপ্ত করে মাটির তৈরি উজ্জ্বল তৈজসপত্রে অনুরূপ ইট ও উজ্জ্বল চকচকে টালির আবিষ্কার এবং এর সার্থক ব্যবহার স্থাপত্য অবয়বকে অতীব সৌন্দর্যে সুশোভিত করে দিতে পেরেছিল।

চিরাচরিত ভারতীয় স্থপতিদের সৌন্দর্যমূলক অবদানের চেয়ে প্রাসাদ নির্মাণ পরিকল্পনায় নিরেট পাথর খণ্ড, যা পাথর খনি হতে কঠিন কায়িক শ্রমে হাতুড়ি-বাটালের ব্যবহারে প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে যেখানে স্থাপত্যকর্মে মনোহর চমৎকারিত্ব সৃষ্টির অবকাশ দৃষ্ট হত না। অন্যপক্ষে তৈমুরীয় শাসকগণের স্থাপত্যে অনুরূপ সাদৃশ্যময় পাথরের সাথে পাথরের নির্মাণ কৌশল গভীরভাবে কারুকার্যের প্রাচুর্যে বহির্দেয়াল নকশায় শোভিত করার সাথে জাঁকজমকে দৃপ্তমান রঙের একত্র সমাহার দৃষ্ট হয়েছে।

ইসলামিক স্থাপত্যের চারিত্রিক উপকরণ খিলান ছাদ ও গম্বুজ, যা পারস্যবাসী ব্যবহার করত তা ভারতীয় স্থপতিরা অন্য মালমসলা ও পদ্ধতি প্রয়োগে পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। মোগলদের হাতে পারসিক প্রযুক্তির প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। সম্রাট আকবরের ব্যক্তিগত (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.) প্রচেষ্টায় স্থাপত্যশিল্প এক অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। তা ছাড়া দেশীয় পদ্ধতি ও মালমসলার সাথে পারসিক প্রকৌশল ও উপাদান মিলিতভাবে এক স্থাপতিক বিপ্লব সৃষ্টি করতে পেরেছিল। আগ্রার দুর্গ ও ফতেপুর সিক্রির স্থাপত্যকীর্তিগুলোর মধ্য দিয়ে এটি উদ্ভাসিত হয়েছে। পারস্যের স্থাপত্যিক আন্তঃপ্রবাহ মোগল প্রাসাদগুলোর মাঝে সর্বত্র বিরাজমান এবং সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৭-৫৮ খ্রি.) আমলে এ স্থাপত্যধারা একটি বিস্ময়কর মানে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিল। সূক্ষ্ম সৌন্দর্যময় স্থাপত্যকর্মের চরম বিকাশ এর আগে ও পরে আর কখন সম্ভবপর হয় নি। উজ্জ্বল ইট, দ্বিজ-গম্বুজ ও শোভিত খিলান সারি যদিও পারস্যের ইস্পাহানে ও তাব্রিজে সাফাভীয় যুগে চর্চা হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু আরো মসৃণতায় এখানে এ পদ্ধতি আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। বেলে পাথরের উপর মর্মর পাথরের সার্থক কারুকার্যের রূপায়ণ বা শ্বেতমর্মরের উপর অলঙ্কার কারুকার্য ব্যাপকভাবে এর পূর্বে প্রয়োগ দৃষ্ট হয় নি। ভারতের বুকে মুসলিম স্থাপত্য যে ঐশ্বর্য সৃষ্টি করেছিল তা যুগে যুগে শ্রেষ্ঠত্বের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. *পি. ব্রাউন, ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (ইসলামিক পিরিয়ড)*, দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৬।

২. *The building art, as this developed under the seljuks upto the 13th century, may be traced to a synthesis of two contrasting conditions. on the one hand of the imaginative vision of Asiatic and on the other the scientific ingenuity of the Latin, পি. ব্রাউন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭* ।

তৃতীয় অধ্যায়
মামলুক স্থাপত্য
(১২০৬-১২৯০ খ্রি.)

ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য স্থায়িভাবে গোড়াপত্তন হয়েছিল দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ক্রান্তিলগ্নে। ভারতের শক্তিশালী হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে গজনী অধিপতি মোহম্মদ ঘোরী ও তাঁর সেনাপতি কুতুবউদ্দিন আইবেকের হস্তে পরাজয়বরণ করেন, ফলে আজমির ও দিল্লি মুসলমানদের অধিকারে চলে আসে। দিল্লি তৎকালীন ভারতের প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু ছিল এবং হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির পাদপীঠরূপে চিহ্নিত হত।

১২০৬ খ্রিস্টাব্দে মোহম্মদ ঘোরীর মৃত্যুর পর দিল্লিতে দাস বা মামলুক বংশের শাসনকার্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এ বংশের দশ জন সুলতান ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করলেও কেবলমাত্র দুজন সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক (১২০৬-১২১০ খ্রি.) এবং তদ্বীয় জামাতা শামসউদ্দিন ইলতুৎমিস (১২১০-১২৩৬ খ্রি.) স্থাপত্য কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

মোহম্মদ ঘোরীর রাজপ্রতিনিধি ও সেনাপতি সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক রাজ্য পুনর্বিন্যাস, সুদৃঢ় ও শক্তিশালী কবতে ব্যস্ত ছিলেন। তা সত্ত্বেও দিল্লির প্রথম প্রস্তর নির্মিত মসজিদ ও মিনার তাঁরই দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। দিল্লির প্রথম নগরী কিলা-ই-রাঁও পিথাউরা বা পৃথ্বীরাজের দুর্গ নগরীর মধ্যে লালকোট এলাকা সবচেয়ে সুরক্ষিত ছিল। দুর্গের অভ্যন্তরে বিজয়ীরা এক কালজয়ী স্থাপত্যকীর্তি নির্মাণ করেছিল, যার জন্য মুসলমানেরা নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করে থাকে।

তাজ-উল-মা'ছির গ্রন্থে[১] হোসেন নিজামী বর্ণনা দিয়েছেন যে বিজয়ীরা দুর্গ দখল করে ভিতরে প্রবেশ করে পার্শ্ববর্তী অঞ্চল বিগ্রহমুক্ত দেখেন এবং তারা অন্যদিকে মন্দির গৃহে অবস্থিত মূর্তি অপসারণ করে এক আল্লাহর আরাধনার জন্য সন্নিকটে মসজিদ নির্মাণ করেন। মুসলিম বিজয়ীরা যেখানেই আধিপত্য বিস্তার করতেন সেখানেই তাদের পূর্বসূরিদের মতো আরাধনার জন্য শিবিরের সাথে মসজিদ নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। মোহম্মদ ঘোরীর রাজপ্রতিনিধি কুতুবউদ্দিন তাই করেছিলেন। এটিই কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ, পৌত্তলিকতার উপর নিরাকার আল্লাহর বিশ্বাসী বান্দাদের বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন। হিন্দু সভ্যতার ধ্বংসাবশেষের উপর মুসলিম সভ্যতার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে মসজিদের যে তাৎপর্যপূর্ণ নাম দেওয়া হয়েছিল এর অর্থ ইসলামের শক্তি, যে শক্তি শতাব্দীর পর শতাব্দী অক্ষুণ্ন রয়ে ভারতের বুকে তৌহিদের বাণী প্রচারের সুযোগ কেবল করে দেয় নি; বরং এ

উপমহাদেশে হারিয়ে যাওয়া সাম্যমৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের মানবিক অধিকারবোধকে প্রতিষ্ঠিত ও অনুশীলন করার মশাল প্রজ্বলিত করেছিল। নতুন এক সভ্যতা ও দর্শন ভারত ভূমিতে স্থিতিলাভ করার পরিবেশ সৃষ্টি করল। কোনো জাতিকে চিরতরে পদানত করার জন্য তার চলমান সংস্কৃতি ও দর্শনের প্রভাবকে স্থিমিত করে দেওয়ার গুরুত্ব যে কতখানি তা প্রমাণের আর অপেক্ষা রাখে না।

কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ :

দিল্লির এ প্রথম মসজিদটি স্থাপত্যিক দৃষ্টিকোণ হতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা পরবর্তী কয়েক যুগ ধরে এর রচনাশৈলী, আদর্শ ও কলাকৌশল অনুসরণ ভারতের অন্যান্য মসজিদ ও ইমারতে ঘটেছিল। তা ছাড়া এ মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে সর্বপ্রথম হিন্দু-মুসলিম স্থাপত্য কৌশল ও আদর্শের সমন্বয়ে এক নতুন স্থাপত্যধারার উদ্ভব ঘটেছিল।

সুলতান কুতুবউদ্দিন দিল্লির বিখ্যাত দুর্গ কিলা-ই-রাঁও পিথাউরার অভ্যন্তরে অবস্থিত বিরাট মন্দিরটি ভেঙে ফেলে তদস্থলে মসজিদটি নির্মাণের নির্দেশ দেন। কারিগরগণ মন্দিরের পুরোনো আড়ম্বশালী সুউচ্চ প্রস্তর ভিত্তিটি অক্ষত রেখে এর সঙ্গে অনুরূপ পরিমাণে নতুন অংশ যোগ করে দৈর্ঘ্যে ৬৪.৬৫ মি. (২১২ ফুট) ও প্রস্থে ৪৫.৭৫ মি. (১৫০ ফুট) সমান্তরাল ক্ষেত্র রচনা করে এবং তার উপর এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এর সমস্ত এলাকা প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত করে চারদিকে আচ্ছাদিত খিলান বারান্দা (cloister) রচনা করা হয়। মসজিদের আচ্ছাদিত খিলান শোভিত পথ বারান্দা পূর্ব দিকে তিন আইলবিশিষ্ট অথচ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুআইল বিশিষ্ট। প্রকৃতপক্ষে যে কারিগরগণ নতুন পরিস্থিতিতে মসজিদ নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিল তারাই ইতঃপূর্বে মন্দির নির্মাণের কাজে নিয়োজিত ছিল। মসজিদ নির্মাণের জন্য মসৃণ সাইজ করা (অ্যাসলার) ধূসর রঙের প্রস্তর ব্যবহার করা হয়। নিকটবর্তী সাতাশটি মন্দির হতে এ প্রস্তরসমূহ সংগৃহীত।[২]

স্থানীয় কারিগরবৃন্দ মসজিদ নির্মাণে তাদের মন্দির নির্মাণের পূর্ব অভিজ্ঞতা স্তম্ভ-সর্দল (trabeate) রীতির পুনরাবৃত্তি ঘটায়। মন্দিরের সাইজ করা প্রস্তর খণ্ডে হিন্দু পদ্ধতিতে খোদিত দেব-দেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। মসজিদ প্রাঙ্গণ ৪৩ মি. × ৩২ মি. (১৪১ ফুট) × (১০৫ ফুট) ক্ষেত্রফলবিশিষ্ট (ভূমি নকশা নং- ১)। এ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের পশ্চিম দিকে মূল নামাজঘর অবস্থিত এবং নামাজঘর পাঁচটি 'আইলে' বিভক্ত। মন্দিব হতে সংগৃহীত খাট স্তম্ভ
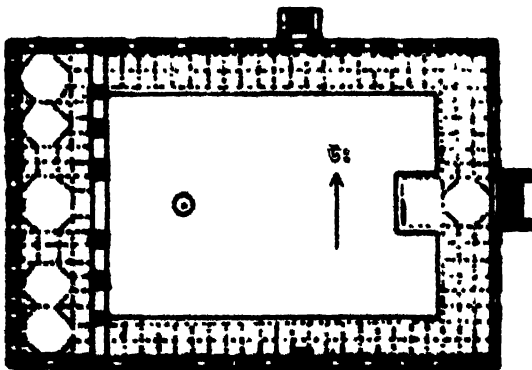
ভূমি নকশা নং-১ : কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ

একটির সাথে আর একটি জোড়া দিয়ে তার উপর গম্বুজ ছাদ নির্মিত হয়েছিল। অগভীর ভাসা-ভাসা ক্রমপূরণ গম্বুজ ছাদ নির্মাণ করে কিছুটা নিষ্ফলভাবে উচ্চতা বাড়ানোর চেষ্টা করা হয়। হিন্দু মন্দির নির্মাণ কারিগরেরা অনেকগুলো মন্দির ছাদ একত্র করে মসজিদের প্রশস্ত ছাদ নির্মাণ করেছিল বটে তবে ছাদকে ধারণ করার জন্য ঘন ঘন বহু স্তম্ভের ব্যবহার করতে হয়েছিল (আলোকচিত্র নং-১)। কিবলার দেয়ালের সাথে বহু ফালিবিশিষ্ট ক্রমপ্রলম্বন রীতির গম্বুজের নিম্নে একটি কুলঙ্গি সংযোজিত এবং এটিই মসজিদের মিহরাব। পি. ব্রাউন বলেছেন যে 'মসজিদ অভ্যন্তর সৌষ্ঠবময় খোদিত প্রস্তর স্থাপত্যকর্ম অপেক্ষা বিভিন্ন উপকরণ সমাহারে প্রত্নতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যময় জগাখিচুড়িতে পরিণত হয়েছে'[৩]।

এত দ্রুততায় নির্মাণ করা মসজিদটি দুবছর এ অবস্থায় থাকার পর সুলতানের মনে এর অবয়বের বৈসাদৃশ্য অনুভূত হয়। মোটের ওপর এটি মুসলিম চেতনাবোধকে সন্তুষ্ট করতে সক্ষম হয় নি। তাই মুসলিম রুচি অনুসারে অংশবিশেষের পূর্ণ সংযোজন প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তখন বেমানানসই অংশটির সাথে কিছু স্থাপত্যিক উপাদান যোগ করে অর্থাৎ মসজিদ নকশায় গূঢ় অর্থপূর্ণ সংযোজন হিসেবে ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে নামাজ ঘরের সম্মুখ বরাবর একটা খিলান পর্দা (arched-screen) সংযুক্ত করা হয়।

এ খিলান পর্দা নির্মাণের প্রাক্কালে নতুন কোনো কারিগরিক প্রযুক্তি আহরণ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে নি। কেননা মোঙ্গল আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত মুসলিম সংস্কৃতি এবং স্থাপত্যচর্চার ও উৎকর্ষতার পাদপীঠ ছিল পারস্য, সিরিয়া, ইরাক, সমরখন্দ, বোখরা, তাসখন্দ, মিসর এবং তুরস্কের বিভিন্ন শহরগুলোতে। মুসলমানেরা সেকালের দুটি সুসভ্য জাতির সাম্রাজ্য দখল করে (বাইজান্টাইন-সাসানীয়) তাদের স্থাপত্য প্রযুক্তি ও প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ দ্বারা নিজেদের স্থাপত্য ইমারতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করতে পেরেছিল। মুসলিম স্থাপত্য বিকাশে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত রীতি ও কৌশলগুলো রপ্ত করতে কয়েক শতাব্দী সময় লেগেছিল এবং তা পশ্চিম এশিয়া, স্পেন ও উত্তর আফ্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। নববিজিত মুসলিম ভারতে তা এসে পৌছতে বেশ কয়েক যুগ সময় লাগার ফলে কুতুবউদ্দিন আইবেক বা তার জামাতা ইলতুৎমিস্ দিল্লিভিত্তিক স্থাপত্য উন্নয়নে তখন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তি সহায়তা লাভে সমর্থ হন নি।

কিন্তু পশ্চিম এশিয়ার সমৃদ্ধিশালী শহর যখন দুর্ধর্ষ মোঙ্গলদের আক্রমণে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল ঠিক তখনই স্থপতি ও কারিগরবৃন্দ নিরাপদ আশ্রয় লাভের আশায় খাইবার গিরিপথ অতিক্রম করে ভারতের বিভিন্ন নগরীতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তারা ভাগ্য অন্বেষণে প্রধানতঃ দিল্লিতে এসে ভিড় জমাচ্ছিল। অবশ্য তা অনেক পরের কথা আপাতত ভারতীয় কারিগরগণই খিলান পর্দা নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিল।

মসজিদগাত্রে নতুনভাবে পুনঃঅঙ্গ সংযোজন মসজিদ স্থাপত্যে কোনো নতুন ঘটনা নয়। কেননা সপ্তম শতাব্দীতে খলিফা হজরত ওসমান রসুলে খোদার মদিনাস্থ প্রথম মসজিদের এরূপ সংস্কার প্রয়োজনবোধে করেছিলেন[৪]। এখানে ইট দ্বারা পর্দা নির্মাণ করে মূল এবাদতখানাকে সম্মুখাংশ হতে আলাদা করা হয়েছিল। ঠিক কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদেও সম্মুখভাগে বৃহৎ খিলান পর্দাটি সংযোজন করে হিন্দু আদর্শের স্তম্ভ জোড়া দিয়ে নির্মিত মূল এবাদতখানার অভ্যন্তরের কুয়াশায়িত স্তম্ভের জঞ্জাল বাহির হতে দৃষ্টির অগোচরে রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উল্লেখ্য যে, এ সংযোজন পরিকল্পনায় পূর্বের মতো মন্দিরের মালমসলা প্রয়োগ করার কোনো সুযোগ ছিল না। কী ধরনের মালমসলা ব্যবহারের উপযোগী হবে তা কারিগরদের

উদ্ভাবনী মেধার প্রয়োগ অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। অথচ কাজটি সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট ধারণা বা অনুসরণীয় নকশা তখন পর্যন্ত ভারতে বিরল ছিল। তা সত্ত্বেও কেবলমাত্র সুলতান বা সংশ্লিষ্ট উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের মৌখিক বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে তারা কার্যটি আরম্ভ করে। স্থাপত্যকর্মের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ আপাত দৃষ্টিতে সেরূপ অবস্থার কথাই মনে করিয়ে দেয়। কেবলমাত্র জন্মগত সহজাত প্রতিভার প্রয়োগ দ্বারা যে শিল্পকলার উন্মেষ ঘটেছিল তা তখনকার সায়দণ্ডে একটা শক্তিশালী মৌলিকত্বে সৌষ্ঠবময় ও অনুপম কর্মরূপে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্য আন্দোলনের সফল পদক্ষেপ রূপে চিহ্নিত হল।

এ বৃহদাকৃতির খিলান পর্দাটির কেন্দ্রস্থলের উচ্চতা ১৫.৩০ মি. (৫০ ফুট), দৈর্ঘ্যে ৩৩ মি. (১০৮ ফুট) ও প্রস্থে ২.৬০ মি. (৮.৫ ফুট) এবং খিলান পর্দাটি পাঁচটি খিলান পথের সমন্বয়ে গঠিত। কেন্দ্রীয় খিলান পথের উচ্চতা ১৩.৭৫ মি. (৪৫ ফুট) ও প্রসারতা ৬.৭৫ মি. (২২ ফুট)। এ কেন্দ্রীয় খিলান পথটির উভয় পার্শ্বে দুটি করে মোট চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের খিলান পথ অবস্থিত এবং এদের প্রত্যেকটির উচ্চতা ৭.৬৫ মি. (২৫ ফুট) (চিত্র নং-২)। পার্শ্ব খিলানগুলোর উপরিভাগে চারটি ছোট আকারের খিলান সমন্বয়ে গঠিত খিলান সারি (clerestory) অবস্থিত।

যাহোক সমগ্র মসজিদ অবয়বের অংশগুলোর সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা পুরোপুরি সফল না হলেও খিলান পর্দাটির অভিনবত্ব ছিল। প্রকৃতপক্ষে এটি নিজেই একটা স্বতন্ত্র অংশবিশেষ রূপে প্রতিভাসিত হয়েছে, যার সাথে এর পশ্চাতে অবস্থিত হিন্দু স্তম্ভের দ্বারা নির্মিত এবাদতখানার সামান্যই আঙ্গিক (organic) সংযোগ দৃষ্ট হয়। এ খিলান পর্দার উপর দিকে নির্মিত খিলান সারি এককভাবে অপ্রযোজ্য নিস্প্রভ এবং বাস্তবে নামাজগৃহের অভ্যন্তরে আলো প্রবেশের কাজে বা অন্য কোনো প্রয়োজন মেটাতে এটি সক্ষম হয় নি।

বাস্তবিকপক্ষে স্থাপত্য বিপ্লবে এ সুন্দর উদাহরণটি কোনো ব্যতিক্রমধর্মী পরিস্থিতি ছিল না। যখন কোনো চিরাচরিত উপাদান প্রকল্পে সমাবেশিত করা হয় তখন এর প্রকৃত গুরুত্ব বা তাৎপর্য ভুলে যাওয়া হত অথবা এটি হৃদয়ঙ্গম করা হত না। এ উদাহরণে এটি সুস্পষ্ট যে পর্দাটি পারস্যের মসজিদ বহির্ভাগ পর্দার নকশার ছাঁচে নির্মাণের চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কাঠামোগত অর্থ বুঝার মতো জ্ঞানের অভাবে অথবা মসজিদের অন্যান্য অঙ্গের সাথে এর সম্পর্ক অনুধাবন করতে না পারায় তাদের এ প্রচেষ্টা ফলবতী হতে পারে নি। তা সত্ত্বেও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ ও সমালোচকগণ মতো পোষণ করেন যে কতকগুলো মৌলিকত্বের অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতি থাকলেও লাল-বেলে পাথরের তৈরি পর্দাটি নিজেই একটা অভিজাত ধারণা ও প্রত্যয়ময়তা সার্থকভাবে সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। কৌশলগত দিক হতে দেখা যায় যে, এর রূপকারগণের কি-স্টোন বা খিলানের মধ্যমণি বিন্যস্ত উপকরণ ব্যবহারের অজ্ঞতার কারণে কর্বেল পদ্ধতি অনুসরণ করে মেকি খিলান প্রস্তুত করেছিল। মূল মসজিদ ধূসর গ্রানাইট দ্বারা প্রস্তুত হলেও এ পর্দায় মসৃণ সাইজ করা প্রস্তর খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছিল। ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য কার্যক্রমে প্রাথমিক অবস্থায় কর্বেল রীতির ব্যবহার এখানেই লক্ষ করা যায় যা প্রাচীন ভারতের সর্বত্র বিশেষ করে গ্রাম্য কুঁড়েঘরের বক্র ছাঁইচের (কারনিস) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি অবলোকনে প্রতীয়মান হয় যে খিলানটিতে দেশীয় রীতির প্রভাব বিদ্যমান। পি. ব্রাউনের মতো অনেক সমালোচক মনে করেন যে, যদি এ নির্মাণকর্মে কোনো মুসলিম স্থাপত্য কারিগর উপস্থিত থাকত তা হলে এরূপ রীতি কখনই সমর্থন করত না; কেননা তখন হতে কয়েক শতাব্দী পূর্বে অন্যান্য মুসলিম সাম্রাজ্যে প্রকৃত খিলান পদ্ধতির প্রয়োগ চালু হয়েছিল, যা তারা রোমানদের নিকট হতে প্রাপ্ত হয়েছিল[৫]।

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে বিহারের বারবার পাহাড় গাত্রে হর্ম্যের সম্মুখ দেয়ালেও অবিকল প্রতিরূপই (অনুরূপ খিলান) প্রত্যক্ষ করা যায়। এমনকি বৌদ্ধ চৈতে স্তূপাতে ও হলঘরের সূর্য জানালায় এ ধরনের খিলান দেখা গিয়েছে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে সারনাথের ধর্মস্তূপাতে সৌন্দর্যবর্ধক উপকরণ হিসেবে বদ্ধ খিলান ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। মাঝে মধ্যে নির্দিষ্ট ব্যবধানে কুলঙ্গি বসিয়ে তার সঙ্গে লৌহনির্মিত কিছু সংস্থাপন করে ভাস্কর্যাদি রাখার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। চূড়ায় খাঁজ কেটে লৌহ দণ্ড বা ধাতুর গোজে পুরু পাথর বা কাষ্ঠ খণ্ড স্থাপনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। বক্রকে বৃহদাকারে পরিবর্তিত করে এবং খাঁজকাটা আগাকে সম্প্রসারিত করে S-এর ন্যায় আকার বিশিষ্ট বক্ররেখায় এ মসজিদের খিলান পর্দায় প্রয়োগের দৃষ্টান্ত দেখা গেলেও পরবর্তী ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে এ বক্রতা কেবলমাত্র খাঁজে প্রত্যাবর্তন করতে দেখা গিয়েছে। গুজরাট ও অন্যান্য প্রাদেশিক স্থাপত্য অনুশীলনে তীক্ষ্ণ খিলান শীর্ষদেশে এটি দেখা গিয়েছে। ভারতীয় মুসলিম ইমারতে যেখানেই এ খাঁজকাটা বা তীক্ষ্ণ বা তীক্ষ্ণাগ্র খিলান (pointed arch) দেখা গিয়েছে তা মোটের ওপর নিজেই নিরর্থকভাবে প্রতীয়মান হয়েছে এবং অতীতের বৌদ্ধ ভারতীয় উৎস হতে উৎসারিত হয়েছে বলে মনে করা যায়।

পক্ষান্তরে হিন্দু মন্দির হতে সংগৃহীত মালমসলা উপকরণাদি কেবলমাত্র মন্দিরকে সুশোভিত করার জন্যই উপযুক্ত ছিল। উক্ত সাইজ করা প্রস্তর খণ্ডগুলো মসজিদ গাত্রে কখনই সুন্দরভাবে লাগিয়ে মসজিদের প্রকৃতরূপ ফুটে তোলা সম্ভব হয় নি। তাই শেষ পর্যন্ত মসজিদের দেয়াল, স্তম্ভ বা থাম, থামশীর্ষ এবং এর উপরে হিন্দু সর্দল নিয়ে একটি বিকর্ষণীয় ইমারতে আত্মপ্রকাশ করে, যাতে পশ্চিম দেয়ালের সাথে সংস্থাপিত পাঁচটি মিহরাব ছাড়া মুসলিম ইমারতরূপে বুঝার অবকাশ সামান্যই ছিল ।

ভারতীয় স্থাপত্য ইতিহাসের ধারায় দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের সম্মুখ দেয়াল শিল্প ও স্থাপত্য চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য উন্নয়ন ইতিহাসের দলিল ছাড়াও গত এক হাজার বছরে পৃথিবীর একটা মহান সভ্যতার উত্থান ও পতনের নিরিখে খিলান নির্মাণ ক্রমোন্নতির অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এর ক্রমোন্নয়নের ধাপ ও ধারা সহজেই অনুধাবন করা যায়। খিলানের ভারতীয় আকৃতি বা ছাঁচ পারস্যের ইট নির্মিত মসজিদের খিলানশ্রেণী আদর্শ হতে গৃহীত হয়েছিল। তবে খিলাফতের আমলে নির্মাতাগণ তাদের নিজস্ব আরবীয় আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল যা অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে সিরিয়ার মরুভূমি সীমান্তে উখাইদির ও সামাররায় গড়ে উঠতে দেখা গিয়েছে। খিলান নির্মাণের এ আদর্শ তৃতীয় শতাব্দীর সাসানীয় রাজাদের কর্তৃক টেসিফোনে (সেসিফোন) নির্মিত প্রাসাদের খিলানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অন্যপক্ষে পারস্যবাসী এটি দ্বিতীয় শতাব্দীতে মসুলের নিকট হাত্রায় নির্মিত পার্থিয়ন প্রাসাদ হতে গ্রহণ করেছিল। রোমান-সিরিয়া হতে সেপ্টিমাস (septimus), সিভিরাস (severus) এবং কনস্টান্টাইনে (constantine) বিজয়সূচক তিন দরজা বিশিষ্ট খিলান নির্মাণ করা হয়, যার মধ্য দিয়ে অশ্বারোহীসহ ছয় হাজার সৈন্য গমন করেছিল। দু'মহাদেশের স্থাপত্য পরিকল্পনায় শত শত বছরের ঐতিহাসিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অবিরত প্রচেষ্টার ফলশ্রুতির প্রভাব দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদে গড়ে ওঠা বৃহৎ কেন্দ্রীয় খিলান পথ ও উভয় পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ছোট খিলান পথের সৃষ্টি ও আদর্শের চর্চা স্থাপত্য ক্রমবিকাশের ধারায় একটা অবিচল ও পূর্ণাঙ্গ পরিণতির সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদে শৈল্পিক চেতনাবোধ কতখানি পরিপক্বতা লাভ করতে পেরেছিল তা খিলান পর্দার প্রচ্ছদ অংশ আলোচনা করলে সমক্ষ উপলব্ধি করা যায়। খিলান

পর্দার বহির্ভাগের পৃষ্ঠদেশ চমৎকার নমুনার খোদাইকার্য দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল। এর কিছু কিছু ডিজাইন ও নকশা অত্যন্ত মনোজ্ঞ, সৌন্দর্যময় ও কমনীয়তায় ভরপুর যা দর্শনে মন উদ্বেলিত হতে পারে। এর পাকানো বা প্যাঁচানো কিনারাগুলো অকপট সরলতায় পরিপূর্ণ হয়ে পুষ্প নকশা প্রতিটি কুণ্ডলীর মধ্যে মোচড়ানো থেকে প্রবলভাবে ও নিঃসন্দেহে হিন্দু শিল্প ধারণার সাদৃশ্যতা প্রদান করছে, যা ঠিক খাড়াভাবে সৌন্দর্যবর্ধক ইসলামি আদর্শে খোদিত শিরোনামগুলোর বিপরীত। সমসাময়িককালের ঐতিহাসিকগণ সাদাসিধাভাবে বর্ণনা দিয়েছেন যে পাথরের উপর পবিত্র কুরআনের আয়াত এমন সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ করা হয়েছিল যা মোমের মতো নরম পদার্থের উপর সম্ভবপর ছিল না। দেখে মনে করা যেতে পারে যে কুরআনের আয়াত স্বর্গ পর্যন্ত উঠে গিয়ে পুনরায় অন্য একটি রেখায় (line) স্বর্গ হতে নিচের দিকে নেমে এসেছে। পবিত্র কুরআনের আয়াতগুলো এক বন্ধনী হতে অন্য বন্ধনী পর্যন্ত তোঘরা ঢঙের হস্তাক্ষরে উৎকীর্ণ করে এর সাথে বক্রাকারে পত্রদল জড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি পাকানো পুষ্প অলঙ্কার, আরব্য নকশালঙ্কার (arabesque) এবং জ্যামিতিক অলঙ্করণ দ্বারা অভূতপূর্ব ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে সজ্জিত। এ খিলান পর্দার শিল্পরূপে অবিভূত হয়ে ঐতিহাসিক ফারগুসন বলেন, "....the most exquisite specimens of its class known to exist anywhere".[৬]

খোদাইকৃত পর্দা স্থাপত্যিক ও চারুশৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে কতখানি ভারতীয় বা কতখানি অভারতীয় তা নির্ণয় করতে গেলে স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে ক্যালিওগ্রাফি বা সুন্দর হস্তলিখন পদ্ধতি ভারতীয় নয়, কারণ এর চর্চা ও উৎকর্ষতা স্থান পারস্যে। তা সত্ত্বেও এতে স্থানীয় হিন্দু অলঙ্করণ প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। কাজেই একে ইন্দো-ইসলামিক বা ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যধারায় শিল্প চেতনার মিশ্রিত রূপের সমাহার বলে পরিগণিত করা যেতে পারে ।

সুলতান ইলতুৎমিস কর্তৃক সম্প্রসারিত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ :

১১৯৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক নির্মিত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে তার জামাতা সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিস প্রথমবারের মতো সংস্কার ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ত্রিশ বছর সময়ের ব্যবধানে দিল্লি শহরের গুরুত্ব যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল তেমনিভাবে এর মুসলিম জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পেয়েছিল বলে মনে করা যায়।

অবশ্য তিনি বর্তমান মসজিদটিকে ভেঙে ফেলে তার উপর বা স্থানে আর একটি মসজিদ কাঠামো গড়ে তুলতে পারতেন। কিন্তু এটি তিনি না করে পূর্বের মূল মসজিদ কাঠামো ঠিক রেখে উক্ত মসজিদের কলেবর দ্বিগুণ আকারে বৃদ্ধি করেন। কারণ ধর্মীয় অনুশাসন অনুসারে মসজিদ ভাঙা নিষিদ্ধ বলে সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারণ করা যায়। তাই সংযোজন ও সংস্কার সাধনের মধ্য দিয়ে মসজিদের পুরোনো খিলান পর্দার উভয় পার্শ্বে তিনটি করে খিলান পথ সংযোজন করা হয়। ইলতুৎমিসের এ সংস্কারমূলক কাজের মধ্য দিয়ে মসজিদের আয়তন দ্বিগুণ হওয়া ছাড়া আর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটে নি। আচ্ছাদিত পথ বারান্দা (cloister) পূর্বে যা ছিল তার সাথে আয়তনের তুলনা অনুসারে নতুন অংশ সংযোজন করা হয়। তবে এরূপ সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের আয়তন বৃদ্ধি পাওয়ায় কুতুব মিনারটি সাহনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে (ভূমি নকশা নং-২)।

তা সত্ত্বেও ত্রিশ বছর পর যখন সম্প্রসারণ পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হচ্ছিল তখন যুগের অগ্রগতির সাথে সঙ্গতি রেখে কিছু পরিবর্তন কর্মপ্রক্রিয়ায় লক্ষ করা যায়। খিলানগুলোর নির্মাণ প্রণালী পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণে সমৃদ্ধতার তথ্য লক্ষণীয়। এগুলো সংখ্যায় বৃদ্ধি না
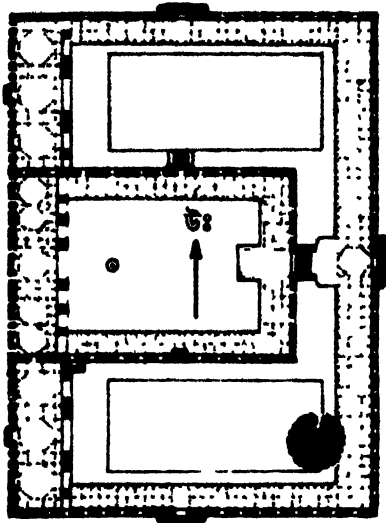
ভূমি নকশা নং-২ · ইলতুৎমিস কর্তৃক সম্প্রসারিত কুওযাতুল ইসলাম মসজিদ

পেলেও গুণাগুণে সামান্য কিছু উৎকর্ষতা বৃদ্ধি পেয়েছিল নিঃসন্দেহে। নির্মাণ কলাকৌশল ও রীতিনীতি পূর্বের মতোই ভারতীয় রয়ে গেল। কিন্তু আকারত্ব ও চেহারায় পরিবর্তন লক্ষ কবা যায়। পূর্বের বক্ররেখার (ogee curve) স্থলে সাধারণ বক্রবেখার চাপ (arch) আকার ধারণ করে যা ইক্যুইলেটার‍্যাল (equilateral) খিলান নামে খ্যাত এবং গথিক পদ্ধতির অলঙ্কৃত সূক্ষ্মাগ্র খিলান হতে খুব একটা বিসদৃশ নয়, যা তৎকালের ইল্যান্ডে স্থাপত্য নির্মাণ কাজে প্রয়োগ করা হত। মসজিদের সম্মুখ দেয়াল (facade) অত্যন্ত মনোজ্ঞ অলঙ্কবণ দ্বারা শোভিত করা হয়। কিন্তু এর কারুকার্যেব নকশা নমুনা সমসাময়িককালে নির্মীয়মাণ আজমির মসজিদের চলতি প্রয়োগ রীতির অনুরূপই হয়েছিল। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদে পাশাপাশি সময়ের ব্যবধানে নির্মিত দুটি আলাদা সংস্কারপ্রাপ্ত পর্দাংশ কৌশলগত ও গঠনপ্রকৃতি স্বগোত্রীয় পরস্পর সামীপ্য গুণাবলীর বিভিন্নতা উপলব্ধি করা যায়।

খিলানের আকারত্বের যে পরিবর্তন এসেছিল তাতে স্থাপত্য অনুশীলনে উন্নতি সাধিত হয়েছিল বলে মনে করা যায়। অন্যপক্ষে গভীরভাবে উপলব্ধি করা হলে প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে যে পরবর্তী খিলান নির্মাণ কৌশল পূর্বাপেক্ষা অধিক দৃঢ়, স্থির ও পদ্ধতি হিসেবে মীমাংসিত ও নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করতে পেরেছিল। এ সংস্কাব কাজে নতুন মালমসলার ব্যবহারের কারণে স্থাপত্য কারিগরদের কোনো পুরোনো জিনিসের ব্যবহারের ঝামেলা পোহাতে হয় নি। ইচ্ছামতো নির্মাণ উপকরণকে ব্যবহার কবে তারা স্থাপতিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছিল। ইতোমধ্যে ভারতের বাইর হতে মুসলিম স্থাপত্যরীতির সাথে পরিচিত দুচারজন কারিগর (স্থপতিসহ) এসেছিল। তারাই সে দিনের ভারতীয সনাতনী গড্ডলিকা প্রবাহের ধ্যান-ধারণা হতে ইসলামি চেতনার দিকে ধাবিত হতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

অবশ্য এটি ছিল স্বতঃস্ফূর্ত একটা সূচনা মাত্র। এর স্পন্দন প্রকারান্তরে প্রতিফলিত হতে আরো কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল।

মিনার স্থাপত্য :

মামলুক রাজবংশের পরবর্তী স্থাপত্য কার্যক্রম হচ্ছে কুতুব মিনার। এটি অনেকটা সোহার্দ মিনারের আদলে গড়া। উক্ত মিনার দুটির ক্রমবিকাশ ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব আলোচনা করা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে এ.বি.এম. হোসেন রচিত *মানারা ইন ইন্দো মুসলিম আর্কিটেক্‌চার* অবলম্বনে আলোকপাত করা হল। মিনার আরবি শব্দ বহুবচনে যা মাযিনা বা মাযানা (ইংরেজিতে টাওয়ার) নামে পরিচিত। এটি মূলত সুউচ্চ চূড়াবিশিষ্ট অবকাঠামোকে বুঝায়। এটি বিজয়স্তম্ভ, বাতিঘর, সময় নির্দেশক ঘড়ি সংস্থাপনের নিমিত্তে সুউচ্চ কাঠামো, গির্জার ঘণ্টা লটকানোর স্থান বা নামাজের আহ্বান জানাবার জন্য মসজিদসংলগ্ন সুউচ্চ স্থানকে নির্দেশ করে।

সোহার্দ মিনার ঃ

এ উপমহাদেশে কুতুব মিনারের পূর্বসূরি হচ্ছে সোহার্দ মিনার। এ মিনার সম্পর্কে এ.বি.এম. হোসেন আবুল ফজলের বরাত দিয়ে বলেছেন এটি ইষ্টক নির্মিত ছিল।[৭] মিনারটি পাকিস্তানের গুজরানওয়ালা জেলায় অবস্থিত। এটি ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে ছিল। শিখদের রাজত্বকালে এর অংশবিশেষ নষ্ট হয়েছিল এবং ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দে ভূপাতিত হয়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। মি. কানিংহাম লিপিবদ্ধ করেছেন যে,[৮] এটি বর্গাকৃতি ভিত্তির উপর অষ্টভুজাকারে নির্মিত হয়েছিল, যার পরিমাপ ৯.৭৫ বর্গ মি. (৩২ বর্গফুট), ব্যাসার্ধ ৭.৬৫ মি. (২৫ ফুট), দেয়াল ১.২৫ মি. (৪ ফুট) পুরু ও ৪৫.৭৫ মি. (১৫০ ফুট) বেশি উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল। এর শীর্ষদেশে ওঠার জন্য পেঁচানো সিঁড়ি বা সোপান ছিল। এটি পাঁচ তলায় বিভক্ত হয়ে আলো প্রবেশের জন্য ইটের জালি বা জাফরি সংযুক্ত গবাক্ষের বন্দোবস্ত ছিল। ৪টি জাফরির প্রতিটি .৩৫ মি. (৯.৫ ইঞ্চি) বর্গাকার ও .০৮ মি. (২.৫ ইঞ্চি) পুরু ইটে নির্মিত হয়েছিল। এর সুন্দর কারুকার্যখচিত মসৃণ একখানি ইট তিনি দেখতে পেয়েছিলেন।

এটি গজনীর সুলতান মাহমুদের এক প্রিয় পাত্রের শ্যালক আয়আজের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। কানিংহাম মনে করেন সোহার্দ এলাকা উক্ত আয়আজ জায়গিররূপে পাবার পর মিনারটি নির্মিত হয়েছিল।[৯] স্থানীয় অধিবাসীদের মন্তব্য যদি ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত হয় তা হলে ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বেই ১০২১ খ্রিস্টাব্দে যখন পাঞ্জাব মাহমুদের রাজ্যভুক্ত হয়েছিল তখনই এটি নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

কুতুব মিনার :

কুতুবউদ্দিন আইবেক যখন পৃথ্বীরাজের কিলা-ই-রাঁও পিথাউরা দখল করে নিয়েছিলেন তখন দিল্লির সাতটি প্রথম নগরী হিসেবে ঐতিহাসিকভাবে লিপিবদ্ধ হলেও এটি কোনোভাবেই কৌশলগত ও রাজনৈতিক দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ ছিল না যতটা পরবর্তীকালে লাভ করেছিল। তবে ঘোরের প্রথম মুসলিম রাজপ্রতিনিধির কৃতিত্ব যে তিনি সমক্ষ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, "দিল্লি যার দখলে থাকবে ভারত তারই অধিকারে রইবে।" সেজন্য তিনি একে দেশের একটা গুরুত্বপূর্ণ নগরীরূপে প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ইতোমধ্যে

তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের সাথে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষার ব্যগ্রতা বুঝাতে মসজিদ নির্মাণ করে নাম দিয়েছিলেন ইসলামের শক্তি। তিনি যে এক আল্লাহর প্রতি অসীম বিশ্বাস রেখে তাঁরই অনুপ্রেরণায় শক্তিশালী হয়ে উঠতে পেরেছেন এর ব্যাপকতা আরো সুস্পষ্টভাবে মহিমান্বিত করে দৃষ্টি আকর্ষণীয় বাস্তব প্রতীক চিহ্ন নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মনের এ অনুভূতিকে কার্যকর করার জন্য দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ বছরে একটি স্থাপত্য কাঠামোর ভিত্তি স্থাপন করেন এবং এটি যখন সমাপ্ত হয়েছিল তখন তা বিশ্বের একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্য স্মৃতিসৌধে পরিণত হয়।

পৃথিবীর পৃষ্ঠে আজ পর্যন্ত যতগুলো মিনার নির্মিত হয়েছে তন্মধ্যে কুতুব মিনার সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। সৌন্দর্যের প্রতীকরূপে এটি মধ্যযুগ হতে আজ পর্যন্ত বিশ্বনন্দিত হয়ে রয়েছে বলে জেমস ফারগুসন উল্লেখ করেন। তার মতে, একমাত্র কায়রোর হাসান মসজিদের মিনারই কুতুব মিনার হতে অধিক উচ্চতাসম্পন্ন।[১০] এটি কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদসংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব কোণ হতে ৪৮.৮০ মি. (১৬০ ফুট) দূরে নির্মিত হয়েছিল।[১১]

এটি এক বিরাট ও অত্যুচ্চ মিনার। এর আদি উচ্চতা শীর্ষে অবস্থিত চন্দ্রাতপ বা ছত্রী বাদ দিয়ে ৬৯.৫০ মি. (২২৮ ফুট) এবং চন্দ্রাতপের উচ্চতা ৩.১০ মি. (১০ ফুট) কমপক্ষে। এর ফলে কুতুব মিনারের সর্বমোট উচ্চতা ৭২.৬০ মি. (২৩৮ ফুট)। এর নির্মাণের প্রাথমিক উদ্দেশ্যেই ছিল বিশ্বের দরবারে ইসলামের প্রতিপত্তি, গর্ব ও মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠার ঘোষণা ও প্রচার করা। ঠিক সে কারণে রাজকীয় নির্মাতার কোনো সন্দেহ ছিল না যে এরূপ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের পেছনে কী তাঁর মহৎ আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে। কুতুব শব্দের অর্থ দ্বারাই বুঝানো হচ্ছে- গোলাকার দীর্ঘ দণ্ড, অক্ষরেখা বা মেরুদণ্ড, ন্যায়বিচার ও বিশ্বস্ততার সার্বভৌমত্বের প্রতীক। কুতুব মিনারে বহির্গাত্রে সুন্দরভাবে ও স্পষ্টভাবে শিলালিপি খোদিত হয়ে মনখোলাভাবে পরিকল্পিত নির্মাণ উদ্দেশ্য ঘোষিত হচ্ছে যে "আল্লাহর ছায়া পৃথিবীর পূর্ব হতে পশ্চিম প্রান্ত জুড়ে'। যদিও গাত্র খোদাইকৃত বাণী সরাসরি ধর্মীয় প্রতিশ্রুতি বহন করে না তথাপি এটি নিশ্চিতভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে যে সমসাময়িককালে আর একজন মুসলিম শাসক প্রথম ইউসুফ স্পেনের সেভিলে অনুরূপ একটি স্মৃতিস্তম্ভ (giralda) নির্মাণ করেন, যা কুতুব মিনারের চেয়ে উচ্চতাবিশিষ্ট। এ মিনার দুটি প্রকারান্তরে মুসলিম রাজ্য বিস্তৃতির সর্বশেষ পশ্চিম ও পূর্ব প্রান্তরের কথাই ঘোষণা প্রদান করছে।

মিনার, বিজয়স্তম্ভ বা অনুরূপ সুউচ্চ নির্মাণকার্য ইসলামিক স্থাপত্যের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য; বিশেষ করে পশ্চিম এশিয়ায় মিনার দৃষ্ট হয়ে থাকে। সেখানে থামের মতো মিনার একটি স্বতন্ত্র কাঠামো হিসেবে নগরের সন্নিকটে দেখতে পাওয়া যায়। বিশেষভাবে উত্তর পারস্যে বহুসংখ্যক এ জাতীয় কাঠামো চোখে পড়ে। কিন্তু এদের অধিকাংশই ইটের অথবা নুঁড়ি পাথরের তৈরি এবং দেখতে গোলাকার। মাঝে মধ্যে এগুলো শিরালো ও খাঁজকাটা (fluted)। আফগানিস্তানের গজনীতে এরূপ একটি মিনার দৃষ্ট হয়। গজনী হতে দিল্লির দূরত্ব খুব একটা বেশি নয়। এ মিনারের তারকা আকৃতি ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কুতুব মিনারকে প্রভাবিত করেছে বলে অনেকে মনে করেন। তবে আকৃতি ও উদ্দেশ্য বিশ্লেষণে এদের কোনোটাই ভারতের কুতুব মিনারের মতো সুন্দর নয়। এমনকি সমগ্র ইসলামিক স্থাপত্যশিল্পে অনুরূপ কোনো নির্মাণ কাজ নেই। এটি সম্ভবত কুতুবউদ্দিন আইবেকের সৃজনশীল মানসিক প্রতিভার বহিঃপ্রকাশ, যা ভারতীয় স্থপতিদের নিজস্ব মেধা ও মননশীলতার গুণে জন্মলাভ করতে পেরেছিল। এটি ভারতীয় স্থপতিদের নিজস্ব চেতনার ফসল।

পি. ব্রাউন বলেছেন যে এ বিজয়স্তম্ভটি মসজিদের মিনার হিসেবে সম্পূরক দায়িত্ব পালন করেছিল।[১২] ব্যালকনি হতে মুসল্লিদেরকে নামাজে শরিক হওয়ার জন্য আজান দেওয়া হত। মিনারের গোড়ায় এটিই লিপিবদ্ধ রয়েছে। ইসলাম বিকাশের প্রাথমিক পর্যায় হতেই আরবদের মাঝে আজান দেওয়ার প্রথা চালু হয় এবং ইসলাম বিস্তৃতির সাথে সাথে আরব দেশের বাইরেও আজানের জন্য সুউচ্চ স্থান হিসেবে মিনারকে মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত করে আজানের ব্যবস্থা করা হয়। মিনার সাধারণত মসজিদের আবেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যে অথবা বাইরে নির্মাণ করা হয়ে থাকে। ইসলামের প্রাথমিক যুগের বিখ্যাত মসজিদগুলোর সাথে অনুরূপ মিনারের অবস্থান লক্ষ করা যায়। ইরাকের সামাররায়, কায়রোর ইবনে তুলুন এবং সিরিয়ার রাক্কা মসজিদে সুন্দর মিনার দৃষ্ট হয়। অবশ্য প্রথম দুটি মসজিদের মিনার আবেষ্টনী প্রাচীরের বাইরে হলেও শেষোক্ত মসজিদের মিনারটি আবেষ্টনী প্রাকারের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। যতই মসজিদ নকশার উন্নয়ন সাধিত হচ্ছিল ততই নিয়মানুগভাবে মসজিদ নির্মাণ কার্যাদির সাথে মিনারের সম্পৃক্ততা দৃঢ়স্থান লাভ করতে থাকে। উপরোক্ত মসজিদত্রয়ের মিনার অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে নির্মাণ করা হলেও পরবর্তীকালে মিনারকে পৃথক একটা স্থাপত্যকর্ম হিসেবে না ভেবে মসজিদ স্থাপত্যের অংশবিশেষ হিসেবে মসজিদ নকশার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছিল এবং সাধারণত ফাসাদ বা সম্মুখ দেয়ালের সাথে উত্তর বা দক্ষিণ কোনার দিকে নির্মাণ করা হত।

কুতুব মিনার প্রথমে চারতলায় সমাপ্ত হয়েছিল। এর গোড়া হতে যতই উপরের দিকে উঠে গিয়েছে ততই ধীরে ধীরে সরু হয়েছে এবং প্রতিটি স্তরে বা তলায় ব্যালকনি বা ঝুলন্ত বারান্দা প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। নিচের দিকের তিনতলা অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। পরবর্তীকালেও এর কোনো রদবদল হয় নি। কিন্তু চতুর্থ বা শীর্ষতলা পরবর্তী সময়ে সংস্কারপ্রাপ্ত হওয়ার সময় আর একটি অতিরিক্ত তলার উদ্ভব হয়ে পাঁচতলা বিশিষ্ট মিনারে পরিণত হয়েছে। শীর্ষতলায় খোলা জানালাসহ গম্বুজ ছাদ বা ছত্রী শোভা পাচ্ছে। পি. ব্রাউন উল্লেখ করেছেন যে মিনারের উৎকর্ষ সাধনের ফলে মূল কাঠামোর কোনো উচ্চতা বা আকৃতি অথবা বিভিন্ন অংশের সুষমতা ও আনুপাতিক পরিবর্তন আসে নি। কিন্তু এ.বি.এম. হোসেন মতো প্রকাশ করেছেন যে ফিরোজ শাহ তোঘলকের সময় সংস্কারকালে আর একটি তলা এর সঙ্গে সংযোজিত হওয়ার ফলে উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে। তিনি বলেছেন এর উচ্চতা ৭২.৬০ মি. (২৩৮ ফুট); গোড়ার দিকে ১৪.৪৫ মি. (৪৭ ফুট ৩ ইঞ্চি) যা শীর্ষে ২.৮০ মি. (৯ ফুট) দাঁড়িয়েছে। সর্বনিম্ন তলার মাপ হচ্ছে ২৮.৭০ মি. (৯৪ ফুট ১১ ইঞ্চি), দ্বিতীয় তলার মাপ ১৫.৫৫ মি. (৫০ ফুট ৮.৫ ইঞ্চি), তৃতীয় তলার ৯.৭৫ মি. (৩২ ফুট), চতুর্থ তলা ৭.৬৫ মি. (২৫ ফুট) ও পঞ্চম তলাটি ৬.৭৫ মি. (২২ ফুট)। অবশ্য পি. ব্রাউন তার Indian Architecture গ্রন্থে মিনারে গোড়ার দিকের মাপ ১৪.১০ মি. (৪৬ ফুট) এবং শীর্ষ ৩.১০ মি. (১০ ফুট) উল্লেখ করেছেন।[১৩] তবে হোসেনের বিবরণ সঠিক বলে মনে হয়।[১৪] মিনারের নকশা মূলত গোলাকার এটি সব সূত্র হতে সঠিক (ভূমি নকশা- ৩)।

মিনারের সর্বনিম্ন অংশ বা বুনিয়াদ বহুভুজ বিশিষ্ট; যার ২৪টি ভুজের প্রত্যেক বাহু ১.৯০ মি. (৬ ফুট ১.৫ ইঞ্চি) ও .৭০ মি. (২ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। প্রত্যেক ভুজের মুখ পলতোলা কিন্তু খাঁজ আকারের অর্ধগোলাকার কলসির কাঁধকে বাইর থেকে দেখলে যেমন অর্ধগোলাকার (convex cymarecta) মনে হয় ঠিক সেরূপ। এদের অবস্থান প্রথমটি কৌণিক ও পরেরটি অর্ধগোলাকার; দ্বিতীয় তলায় সবগুলো অর্ধগোলাকার; তৃতীয় তলায় কৌণিক বা সবগুলোই কোনাকুনি; চতুর্থ তলায় গোলাকৃতি ও সমতল এবং পঞ্চম তলায় দ্বিতীয় তলার

মতোই অর্ধগোলাকৃতি আকারে নির্মিত হয়েছে (চিত্র নং- ৩)।

প্রথম তলা হতে তিনতলা পর্যন্ত তিন শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকার পাথর ও গাঁথুনি ব্যবহার করা হয়েছে। মিনারের বাইরের আবরণে আগ্রার বেলে প্রস্তর খণ্ড, যা পাথরের সাথে পাথর সংযোজক বন্ধনীরূপে অবস্থান করছে। এর পরবর্তী স্তর অসমতল পাথর। ভিতবেব মুখে দিল্লির মসৃণ পাথর প্রয়োগ কবা হয়েছে। দ্বিতীয় তলা পর্যন্ত বেলে-পাথরের রং বিবর্ণলোহিত বিস্কুট বর্ণাবেশ, তৃতীয় তলায় কালচে লাল বং. চতুর্থ ও পঞ্চম তলার ভিতর ভাগে লাল বেলে-পাথর, কিন্তু বহির্গাত্র শ্বেতমর্মব ও মাঝে মাঝে অনিয়মিত মাপের বেলে-পাথর ব্যবহৃত হয়েছে।

কুতুব মিনাবের অভ্যন্তরে একটি বামাবর্ত পেঁচানো সিঁড়ি ৩৭৯ ধাপে নির্মিত হযে মিনার শীর্ষে উপনীত হয়েছে। আবুল ফিদা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বর্ণনা করেছেন যে এ সোপান শ্রেণীর সংখ্যা চারতলা পর্যন্ত ৩৬০টিতে সীমায়িত ছিল। সম্ভবত ফিরোজ শাহ তোগলকের রাজত্বকাল (১৩৫১-৮৮ খ্রি.) সিঁড়ির ১৯টি ধাপ পূর্বের ৩৬০ টির সাথে যোগ হয়েছে।[১৫]

ভমি নকশা নং-৩ : কুতুব মিনাব

মিনার গাত্রের সৌন্দর্যকে অমরত্বদানে বিভিন্ন অভিনব প্রক্রিয়ার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়েছে। আকর্ষণীয় সুশোভনের জ্যামিতিক নকশার সাথে উৎকীর্ণ লিপিমালার বন্ধনী যা ব্যালকনির স্তরে স্তরে সংঘবদ্ধ হয়ে পাশাপাশি বৈচিত্র্যময় অন্য নকশার সাথে পরিদৃষ্ট হচ্ছে। তোঘরা পদ্ধতিতে খোদাইকৃত আরবি লিপিমালার[১৬] সাথে স্ফীত পুষ্পিত নকশা সম্পৃক্ত হয়ে রোজেট বা গোলাপের অনুরূপ ফুলের বিস্তারিত সমাবেশ একদিকে নকশাকে পূর্ণাঙ্গতা দান করছে অন্যদিকে ভাবুকের হৃদয় আপ্লুত করছে। এ খোদিত লিপির বন্ধনী পুনরায় প্রত্যেক দিকে দু-তিন বা আরও অধিক রেখা দ্বারা কিনারা বেষ্টনাবদ্ধ হয়ে আলাদা আলাদাভাবে নানা প্রকার চেহারায় শোভিত হয়েছে। সর্বনিম্ন
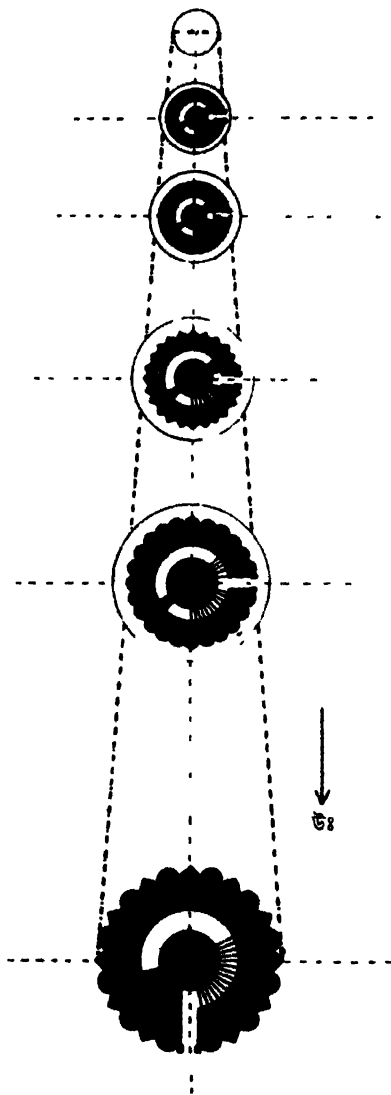
লিপিকা বন্ধনী লজেন্স ও গোলাকৃতি চিকন বর্ডারে সমাচ্ছন্ন এবং এর উপরে অবস্থিত আরব্য নকশা বন্ধনীর নিচে বর্ডার রেখা দড়ির মতো।

খোদাইকৃত লিপিবন্ধনীর প্রত্যেক ধারে তিনটি প্যানেল বা বন্ধনী দিয়ে সুশোভিত রয়েছে—(১) উৎকীর্ণ বা খোদাইকৃত লিপিমালার সবচেয়ে নিকটবর্তী বন্ধনী লজেন্স আকৃতির, (২) রোজেট প্রান্তিক রেখায় সীমায়িত এবং (৩) ঝুলন্ত প্রান্তিক রেখা একে অর্ধবৃত্তাকারে সারিবদ্ধ ত্রিকোনাকার অবস্থায় সুশোভিত। উল্টানো রোজেট নকশার মাঝে ঝুলানো কুন্তল সংস্থাপিত হয়েছে। এ তিনটি নকশার অবস্থান খুব কাছাকাছি তাই অনেক সময় একটা বন্ধনী বলে ভ্রম হয়ে থাকে। প্রায় পূর্ব নকশানুরূপ অঙ্কিত উৎকীর্ণ লিপিমালার বন্ধনী প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলার শোভাবর্ধন করছে। কিন্তু চতুর্থ তলার উৎকীর্ণ লিপিমালার বন্ধনী দু'টি দড়ি প্রান্ত রেখার মাঝে অবস্থিত এবং এ বন্ধনীর উর্ধ্বে বুটিদার সীমান্ত রেখা, যা আবার এক জোড়া দড়ি সীমান্ত রেখা বা প্রান্তিক রেখাতে সংস্থাপিত হয়েছে। মিনারের ব্যালকনিগুলো অস্বাভাবিকরূপে সুশোভিত করে তার সাথে খাড়া পলতোলা ও ঘুরানো দলবদ্ধ খোদিত লিপিমালা পত্রযুক্ত নকশালঙ্কারের সাথে একত্র করে সৌন্দর্যকে প্রাণবন্ত করেছে, যা মিনারের মসৃণ অবয়বকে অনন্তকালের জন্য ধরে রেখেছে। অধিকাংশ উৎকীর্ণ লিপিমালা পবিত্র কুরআন হতে সংগৃহীত যা কুতুব মিনারে পূত চরিত্রের ও উদ্দেশ্যের কথা ঘোষণা করছে। তা ছাড়া যে সকল সুলতান এর নির্মাণ বা পুনর্নির্মাণ কার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের স্তুতিবাদ এর পৃষ্ঠদেশকে প্লাবিত করে রেখেছে। এ সমস্ত প্রশংসাসূচক বাণী এবং এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে স্পষ্ট বলা যায় যে প্রথম তলার অধিকাংশ নির্মাণ কাজ সুলতান কুতুবউদ্দিনের দ্বারা সমাপ্ত হয়েছিল।

মিনারের অবশিষ্ট নির্মাণ কাজ তার উত্তরাধিকারী সুলতান ইলতুৎমিস নিষ্পন্ন করেছিলেন। নিচের তলায় সর্বনিম্ন বন্ধনীতে উল্লিখিত উৎকীর্ণ লিপিমালা সুলতান কুতুবউদ্দিনকে আমির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তা ছাড়া তাঁকে মহামহিম ও মহৎরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। এর নিকটস্থ বন্ধনীতে তাঁর প্রভু মইজ উদ্দীন মোহম্মদ ঘোরী এবং তাঁর ভ্রাতা গিয়াসউদ্দীন ঘোরীর নামে প্রশংসাবাক্য লিপিবদ্ধ রয়েছে।

এ লিপি দ্বারা এটিই প্রতিপন্ন করা যায় যে যখন মিনারের কাজ শুরু হয়েছিল অথবা কাজের কিছু অংশ শেষ হয়েছিল তখন কুতুবউদ্দিন ঘোর রাজ্যের রাজপ্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত ছিলেন; স্বাধীন নৃপতিরূপে আত্মপ্রকাশ করে নি। সুলতান ইলতুৎমিসের লিপিমালা কেবলমাত্র দ্বিতীয় ও তৃতীয় তলায় খোদিত রয়েছে। কিন্তু অন্য একটি উৎকীর্ণ লিপিমালা চতুর্থ তলায় রয়েছে। তবে এটি সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলকের রাজত্বকালের। বজ্রপাতে এটি ভেঙে পড়ে গেলে সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলক কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়েছিল।

এ পুনর্নির্মাণ কাজে যে মালমসলা ও বহির্সজ্জায়ন ব্যবহৃত হয়েছিল তা পূর্বের পদ্ধতির অনুরূপ ছিল না। কেননা মামলুক রাজবংশ ১১৯২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১২৯০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। এ সময়ের মধ্যে কুতুব মিনার প্রথম নির্মিত হয়েছিল। অন্যপক্ষে তোঘলক সুলতানগণ ভারতের সিংহাসনে ১৩২০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। এ সময়ে কুতুব মিনার সংস্কারপ্রাপ্ত হয়েছিল। তাই প্রথম নির্মাণ কাজ হতে সংস্কারপ্রাপ্ত কাজের সময়ের ব্যবধান প্রায় দু শ বছর। এ দু শ বছরের মধ্যে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রযুক্তির পরিবর্তন এসেছিল। তার সাথে নির্মাণ কাজের যাবতীয় মালমসলার প্রাপ্তি সুবিধা-অসুবিধার পরিবর্তনও এসেছিল।

এর ফলে দেখা যায় যে, ফিরোজ শাহ তোঘলক যখন বজ্রপাতের কারণে উপর তলার সংস্কারমূলক কাজে হাত দেন তখন ঐ অংশটুকু সম্পূর্ণভাবে নতুন আকৃতিতে নির্মিত হয়েছিল। এতে মিনারটির একটি তলার সংযোজন ঘটেছিল। এ পুনর্নির্মিত চতুর্থ ও পঞ্চম তলা লাল বেলে পাথরে নির্মিত এবং এর পৃষ্ঠদেশ শ্বেতমর্মরে ঢেকে দেয়া হয়েছিল। সর্বশেষ ১৫০৩ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সিকান্দার লোদী কর্তৃক এ মিনারের পঞ্চম তলা পুনর্নির্মিত হয়েছিল।

মিনার অভ্যন্তরে অবস্থিত নাগরা লিপি দ্বারা লিখিত একখণ্ড পাথরের অবস্থান এর নির্মাণকারীর পরিচয় নির্ণয় করতে কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছিল। নাগরী মূলত ভারতীয় ভাষা এবং হিন্দু সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত তাই এটি হিন্দু স্থাপত্যকর্ম এবং পরে মুসলমানেরা এর বহির্দেয়ালপৃষ্ঠ পুনঃখোদাইকৃত করেছিল বলে একটা ধারণা সৃষ্টি করেছিল। একে হিন্দু ইমারতরূপে প্রমাণ করতে অনেক চেষ্টাও করা হয়েছিল।

তবে খিলানের নিচে বা জানালার চৌকাঠের অব্যবহিত উর্ধ্বে অবস্থিত ১১৯৯ খ্রিস্টাব্দের পূর্ব সন উল্লেখ থাকে যে খোদাইকৃত লিপিকা এতে সম্পৃক্ততা শুধু এটিই প্রমাণ করতে সহায়তা করে যে, উক্ত খোদাইকৃত পাথরখণ্ড কোনো হিন্দু ইমারত হতে সংগৃহীত হয়ে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছিল মাত্র।

সাধারণের বিশ্বাস যে পৃথ্বীরাজ স্বীয় কন্যার যমুনা দর্শনের অভিলাষকে পূর্ণ করার নিমিত্তে এ মিনারটি একদা নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু এর দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত আর একটি উৎকীর্ণ লিপিকা এ ভ্রান্ত ধারণাকে সম্পূর্ণরূপে নস্যাৎ করে দিয়েছে। লিপিকায় কানওয়ারমেইন নামে এক অমুসলমানের নাম যুক্ত রয়েছে। তথ্য মন্থনে এটি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত নামে একজন কারিগর সক্রিয়ভাবে কর্ম সম্পাদনে মুসলিম প্রকৌশলী আফগানিস্তানের ফিরোজকোর অধিবাসী মোহম্মদ আমিরকোর অধীনে কর্মরত ছিল।

কুতুব মিনারে কিছু কিছু হিন্দু স্থাপত্যের অলঙ্করণ ও সজ্জায়নের প্রতীক চিহ্ন ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে; যেমন—দড়ি ঝুলানো নকশা এবং তার সাথে ঘণ্টার দোলায়মান অবস্থা এবং প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ও এর কিনারা ইত্যাদি। এসব কারুকার্য এর নির্মাতাদের আদিত্ব অন্বেষণে খুব একটা সহায়তা করে না; কারণ স্থাপত্য অনুশীলনে বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রভাব পরবর্তীকালের নতুন স্থাপত্যধারায় আগমন হওয়ার ঘটনা মানব সভ্যতা বিস্তারের লগ্ন হতে চলে এসেছে। তাই হিন্দু অধ্যুষিত জনপদে যখন মুসলমানেরা স্থাপত্য গড়তে শুরু করেছিল স্বাভাবিকভাবে তাতে হিন্দু আদর্শের শিল্প প্রতীক এসে পড়েছিল। বিশেষভাবে কুতুব মিনারের উৎকীর্ণ লিপিমালার প্রান্তিক রেখা সুশোভন করতে হিন্দুরীতির অনুসরণ করা হয়েছিল।

কুতুব মিনারের অনুরূপ সজ্জায়ন প্রক্রিয়া ভারতের বাইরেও প্রচলিত ছিল। এ ইমারত সজ্জায়নের ও অলঙ্করণের গঠন প্রকৃতি ও পদ্ধতি আরবীয় হস্ত লিপিমালার প্রচলিত আনুভূমিক শিকল সারি বা ঝুলন্ত প্রান্তিক অলঙ্কারের প্রক্রিয়ায় যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল এটি ইরানের সমাধিস্তম্ভ (tomb tower) অলঙ্করণের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ প্রক্রিয়া পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোতে বিশেষভাবে ইরান, তুর্কিস্তান, সমরখন্দ, আফগানিস্তান ইত্যাদি দেশের বিজয়স্তম্ভ বা সাধারণ ধরনের মিনারে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়।

কুতুব মিনারের সাথে উক্ত দেশসমূহে নির্মিত সমাধি বুরুজের (tomb tower) স্থাপত্যিক গঠনেও বেশ মিল খুঁজে পাওয়া যায়। আফগানিস্তানের ফিরোজকো গ্রামের নিকট ঘোর রাজাদের জাম মিনারটি হুবহু কুতুব মিনারের সাদৃশ্যানুরূপ অবয়ব নিয়ে নির্মিত

হয়েছিল। উক্ত মিনারটি মইজউদ্দিন মোহাম্মদ ঘোরীর ভ্রাতা গিয়াসউদ্দিন কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল এবং এর নকশা পরিকল্পনা ও অঙ্গসজ্জায়ন সম্পূর্ণরূপে ইসলামি স্থাপত্য পদ্ধতির অনুসরণ ঘটেছিল। মিনারটি নিচের দিকে অষ্টভুজাকৃতিতে শুরু হয়ে ক্রমান্বয়ে সরু ও গোলাকৃতিরূপ পরিগ্রহ করে ৫৯.৫০ মি. (১৯৫ ফুট) পর্যন্ত উত্থিত হয়েছে।

এটি কুতুব মিনারের ন্যায় বিভক্ত হয়ে প্রশস্ত ব্যালকনি অভিক্ষিপ্ত অবস্থায় তলায় তলায় সংযোজিত হয়েছে এবং পেঁচানো সোপান শ্রেণী এর শীর্ষদেশ পর্যন্ত উত্থিত। কুতুব মিনার ও জাম মিনারের নির্মাণ প্রযুক্তি ও রীতিনীতি একইভাবে অনুসৃত হয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন।

মিনার দুটির পার্থক্য শুধু ব্যবহৃত মালমসলা বা নির্মাণ সামগ্রী ও বহিঃপ্রচ্ছদের। জাম মিনার ইটের ও কুতুব মিনার পাথরের তৈরি। কুতুব মিনার নিঃসন্দেহে মধ্যপ্রাচ্যে নির্মিত মিনারগুলোর বংশধর এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় কিছুটা পরবর্তিত অবয়বে আত্মপ্রকাশ করেছে। হয়তো উপকরণ হিসেবে আফগানিস্তানে ইট গেঁথে ইমারত নির্মাণ অপেক্ষাকৃত সুবিধাজনক, অন্যপক্ষে ভারতে পাথর দ্বারা ইমারত নির্মাণে অধিক গ্রহণযোগ্যতা সে সময়ে ছিল।

প্রকৃতপক্ষে মিনার গাত্রে যে মৌলিকত্ব ও নির্মাণ প্রযুক্তির যে ধারাবাহিকতা অনুসৃত হয়েছে তা নিঃসন্দেহে ইসলামি ঐতিহ্যপুষ্ট চিন্তাচেতনার বাস্তব ফসল। কেননা এ ধবনের স্তম্ভ ভারতীয়দের নিকট অপরিচিত ছিল; অথচ মুসলমানেরা এ ধরনের মিনারের সাথে পূর্ব হতেই পরিচিত ছিল।

সুন্দর হস্তলিপির উৎকীর্ণ লিপিমালা ও ব্যালকনির নিচে কর্বেল (corbel) রীতিতে বিস্তৃত স্ট্যালাকটাইট বন্ধনীর (stalactite bracket) ব্যবহার পশ্চিম এশিয়ার মিনারগুলোতে পূর্ব হতেই প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক ফারগুসন যথার্থভাবে মতো প্রকাশ করেছেন যে, কুতুব মিনার একটি মিনার হিসেবে অনন্যসাধারণ এবং নিখুঁত অবদান।

কুতুব মিনারের সুঠাম গঠন, বিস্ময়কর অভিব্যক্তি ও অংশগঠনের সুষমতা চিত্তাকর্ষকরূপে প্রতিভাসিত হতে সহায়তা করেছে। এরূপ একটা বিশাল উচ্চতাপূর্ণ অবস্থান সেকালের মুসলিম ক্ষমতার উপযুক্ত প্রতীকরূপে আত্মপ্রকাশ করে অদ্যাপি টিকে রয়েছে। এর গাত্রে সংযত ও সুগম্ভীর ভাবপূর্ণ খোদাইকৃত সজ্জায়ন ও অলঙ্করণ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও পরিপাটিভাবে নিষ্পন্ন করে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

ঐতিহাসিক ফারগুসন একে বিজয়স্তম্ভ প্রমাণের চেষ্টা করেছেন।[১৭] তবে তার যুক্তির পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন কোনো ঐতিহাসিক ভাষ্যে এমনকি সে সময়ের কোনো কবি-সাহিত্যিকের উদ্ধৃতি দ্বারা এর সত্যতা প্রমাণিত হয় নি।

অন্যপক্ষে কুতুব মিনার গাত্রে খোদাইকৃত তোঘরা ঢঙের উৎকীর্ণ আরবি লিপিমালায় আল্লাহ ও সুলতানের প্রশংসার কথাই কীর্তিত হয়েছে। এতে কোনো বিজয়ের ছোট ঘটনাও লিপিবদ্ধ হয় নি। অথচ এ মিনারটি কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের নিকটে অবস্থিত। সুতরাং একে উক্ত মসজিদের মিনার বলে উল্লেখ না করা হলেও স্বাভাবিকভাবে মসজিদ মিনার ছাড়া আর কিছু বলে মনে করার সুযোগ নেই। তাই মনে হয় মানব-মনকে অভিভূত করার ক্ষমতা সর্বোপরি সৌষ্ঠব সম্পন্নতায় এবং সজ্জায়নসহ অলঙ্করণ বিন্যাসের পরিপূর্ণতায় এটি অদ্বিতীয়।

কুতুব মিনারে সৌন্দর্য সুষমা সৃষ্টিতে যে শৈল্পিক প্রভাব বিধৃত হয়ে রয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য। শীর্ষতলায় ঘুরানো সিঁড়িটি একটি বেদিতে (platform) এসে শেষ হয়েছে।

ব্যালকনি বা ঝুলন্ত বারান্দার ভারবহন বা সংরক্ষণের প্রয়াসে ব্যবহৃত শিল্পচাতুর্য ও কৌশলই মিনারের সবচেয়ে মনোজ্ঞ আড়ম্বরপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ব্যালকনির চতুর্দিক দিয়ে সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্রস্তম্ভ শ্রেণী সচ্ছিদ্র সিঁড়ির প্রাচীরের আকার ধারণ করেছে যাকে বলা হয় কাঞ্জুরা (kanjuras), যার অংশ দ্বারা গঠিত নমুনা (প্যাটার্ন) দরজার উপরে অলঙ্করণ ও শোভাবর্ধনের জন্য এখনো অবস্থান করছে। এ শিল্প আদর্শ অত্যন্ত ক্ষীণভাবে হলেও এখানে দৃষ্ট হচ্ছে, যা খ্রিস্টপূর্ব ৭২২-৭০৫ খোরশাবাদের অ্যাসেরীয় প্রাসাদ সারগনে ব্যবহৃত হয়েছিল বলে পি. ব্রাউন মত প্রকাশ করেছেন।[১৮]

ব্যালকনিগুলোকে ধারণ করার পদ্ধতির পরিকল্পনা স্ট্যালেক্টাইট ব্রাকেটিং দ্বারা সমাধা করা হয়েছে। এ পদ্ধতি অনুসারে একগুচ্ছ ক্ষুদ্র খিলান ও অবতল গাত্রের মধ্যবর্তী স্থানে ঠেকনা বা ব্রাকেট সংযুক্ত করে জ্যামিতিক স্টালেক্টাইটের ধারণা সৃষ্টি করা হয়েছে। স্টালেক্টাইট (stalactite) বা মৌচাক আকৃতিব ক্ষুদ্র খিলানের ধারণা ইসলামি স্থাপত্যের বিশেষ একটা বৈচিত্র্য, যা তৎকালীন ভারতে বিরল ছিল এবং কেবল বিশেষ ক্ষেত্রে এটি দৃষ্ট হত। অতি ক্ষুদ্রাকার খিলান সৃষ্টি করে তাদের পুঞ্জীভূত ভার বাহনের পন্থানুসরণের সুস্পষ্ট প্রভাব মনে হয় এ দেশীয় মন্দির ছাদ নির্মাণ কৌশল হতে এসেছে। চোরকুঠুরির মতো বা জাল বুনেই খোপগুলো মৌচাক সদৃশ নকশা (ডিজাইন) কোনো অনুকরণীয় বস্তু হতে উদ্ভূত নয়; বরং এটি তাদের নিজস্ব মৌখিক পরামর্শের ফল। কারণ সে সময়ও ইসলামি স্থাপত্যে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটে নি। এর নলাকার অবয়ব ধীরে ধীরে চিকন হয়ে উপরের দিকে উঠে যাওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে ক্রমোন্নত বেগ ও বর্ধিত উচ্চতার বিভ্রান্তিকে হরণ করা।

সর্বোপরি এর স্থির নিশ্চিত আঙ্গিক মর্যাদা হচ্ছে স্থায়িত্বতা, ব্যতিক্রম অসীমতা ও দায়মুক্ততা। এটি যতই উপরের দিকে উঠে গিয়েছে ততই পিরামিডের আদলে রূপ পেয়ে ক্রমশ সরু হয়েছে। এটি মানব জাতির এক চরম প্রচেষ্টার অভিপ্রেত ফল, যা চিরন্তনত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। কুতুব অবর্ণনীয় রহস্যের তিমিরাচ্ছন্নতার প্রতীক হয়ে এটি সকল প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাভূত করেছে। মধ্যযুগেব এক উদীয়মান জাতির সংস্কৃতি ও কলাচর্চার এবং তার চরম বিকাশের মৌলিক পরিণতির স্মৃতিচিহ্ন ধারণ করে বিশ্বলোকের দিকে নীববে তাকিয়ে রয়েছে। যে জাতি একে নির্মাণ করেছিল তারা দিনে দিনে স্তিমিত হয়ে পড়ছে।

আড়াই দিন-কা-ঝোঁপড়া :

সুলতান কুতুবউদ্দিনের পরবর্তী স্থাপত্য পরিকল্পনায় আড়াই দিন-কা-ঝোঁপড়া নামের মসজিদটি ১২০০ খ্রিস্টাব্দে রাজপুতানার আজমিরে নির্মিত হয়েছিল। ১২১১ খ্রিস্টাব্দে হতে ১২৩৬ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তাঁর জামাতা সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিস এর খিলান পর্দার সংযোজন ছাড়াও অন্যান্য সংস্কারমূলক কাজে হাত দিয়েছিলেন। দিল্লির মতো আজমির দখল করার পরপরই সেখানেও একটি মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। দিল্লি মসজিদ নির্মাণে যেভাবে উপকরণ ও মালমসলা সংগৃহীত হয়েছিল আজমির মসজিদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছিল। নিকটবর্তী মন্দিরগুলো ভেঙে এর মালমসলাদি ব্যবহার করে মসজিদের আকার প্রদান করা হয়েছিল।

বেলে-পাথরের পাহাড় অংশ কেটে মসজিদের বেদি বা মঞ্চ তৈরি করে এর উপর মসজিদটি নির্মাণ করা হয়। সম্ভবত মসজিদের অবস্থান একটি পুরাতন মেলার পার্শ্বেই ছিল, যা বছরে আড়াই দিনের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করত এবং সে কারণেই উক্ত মসজিদের নামকরণ হয়েছে আড়াই দিন-কা-ঝোঁপড়া। ঝোঁপড়া অর্থে কুঁড়েঘরকে বুঝানো হয়েছে। অবশ্য জন

মার্শাল কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তার মতে,"The origin of the name, the mosque of Qutb-ud-din is more likely to have taken two-and-a half years than two-and-a half days to errect".[১৯]

এ মসজিদ নির্মাণেও হিন্দু মন্দির হতে সংগৃহীত মালমসলার প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু নির্মাতারা ইতোমধ্যে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পেরেছিল তারই নিরিখে বিন্যস্ত ও সংগঠিতভাবে নির্মাণ কাজ পরিচালিত হয়। এ মসজিদটি দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের দ্বিগুণ আয়তনবিশিষ্ট। এর পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ৮৩.০৫ মি. ও প্রস্থে ৮০.৬০ মি. এবং নামাজগৃহের পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ৭৫.৬৬ মি. ও পূর্ব-পশ্চিমে ১২.৩৬ মি. (ভূমি নকশা নং- ৪)। সুতরাং এখানকার মসজিদ নকশা নির্মাণ পরিকল্পনাকারীদের পক্ষে অনেক
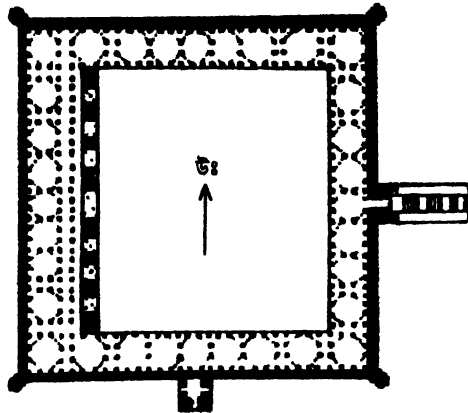
ভূমি নকশা নং-৪ : আড়াই দিন-কা-ঝোঁপড়া মসজিদ

কিছু যোগ করার সুযোগ হয়েছিল। ফলে মসৃণ স্তম্ভগুলোর স্বাভাবিক সৌষ্ঠবময় হয়ে উঠতে সহায়তা করেছে। দিল্লির মসজিদ পরিকল্পনায় বিশেষ করে মুসাল্লা (sanctuary) নির্মাণে অধিকতর ভালো জিনিসের অভাবে কাজ চালিয়ে যাবার মতো দ্রব্যাদি ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে একটা মসজিদ কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছিল মাত্র, যেখানে স্তম্ভশ্রেণী ও থামগুলো যেমনি ঘন সংঘবদ্ধ তেমনি নিচু। আজমির মসজিদে এ সমস্যার সমাধানকল্পে সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়েছিল। এ মসজিদের স্তম্ভগুলো সুশৃঙ্খলভাবে বিন্যস্ত এবং বিপুল সংখ্যক সমাহারে এর নামাজগৃহ একটি বিরাট কক্ষে পরিণত হয়েছে।

দিল্লি মসজিদের খিলানপথের যে সংকীর্ণতা ছিল তা এখানে দূর করা হয়েছিল। দিল্লি মসজিদের দু তিনটি খিলান পথের সমান করে এখানে একটি বিস্তৃত খিলানপথ সৃষ্টি করা হয়েছিল। মুসাল্লার (নামাজগৃহ) অভ্যন্তরভাগে গম্বুজ ও থামের মধ্যে সমতা ও সামঞ্জস্য বিধানকল্পে দিল্লি মসজিদের দুটি স্তম্ভের পরিবর্তে এ মসজিদে তিনটি করে স্তম্ভ জোড়া দিয়ে মসজিদের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। ফলে মেঝে হতে ছাদ পর্যন্ত উচ্চতা ৬.১৫ মি. (২০ ফুট) (চিত্র নং-৪)। মসজিদ এভাবে উচ্চতাসম্পন্ন হওয়ার কারণে এর বাইরের পূর্বদিকের দেয়ালে কিছু কর্ম পরিকল্পনা কার্যকর হতে পেরেছিল। চার নিয়ন্ত্রণ ধাপে দীর্ঘ সিঁড়ি প্রধান প্রবেশপথের সাথে গাড়ি বারান্দায় এসে মিলিত হয়েছে। প্রত্যেক প্রান্তের শিরাল খাঁজকাটা (fluted) মিনার এর সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। আজমির মসজিদ নির্মাণে নতুন

প্রযুক্তি গ্রহণের পদক্ষেপের আভাস পাওয়া যায়, যা স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মন্দির হতে সংগৃহীত উপকরণাদি সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করার কৌশলই ইতোমধ্যে তারা আয়ত্ত করতে পেরেছিল। কারিগরদের অক্লান্ত সাধনা ও প্রচেষ্টার ফলস্বরূপ আজমির মসজিদকে গুরুগম্ভীর ও সুন্দররূপে বহিঃপ্রকাশিত হতে দেখা গিয়েছে।

মসজিদ নির্মাণের কিছুকাল পর্যন্ত অভ্যন্তর প্রাঙ্গনের চতুষ্পার্শ্ব দিয়ে কেবল খোলা স্তম্ভ সারি দ্বারা সজ্জিত থাকার পর দিল্লির মসজিদ অনুরূপ খিলান পর্দা মুসাল্লার সম্মুখ বরাবর নির্মাণের মধ্য দিয়ে ফাসাদে পরিণত করা হয়েছে (চিত্র নং- ৫)। এ সম্মুখ দে'য়াল ইলতুৎমিসের সময় মসজিদ অঙ্গে সংযুক্ত হয়েছিল। আজমির মসজিদের খিলান পর্দা এবং অন্যান্য ছোটখাটো সংস্কারাদি দিল্লি মসজিদের খিলান পর্দা নির্মাণের ২৫ বছর পর সম্পন্ন হয়েছিল। সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে স্থাপত্য কারুকার্য ও ব্যবহৃত কলাকৌশলের অনেক পরিবর্তন ও উন্নতি লক্ষ করা যায়। আজমির মসজিদের দৃশ্যমান অঙ্গ সুশৃঙ্খলকরণ ও ঐক্যতার পদধ্বনি দিল্লির মসজিদ হতে একে অভিনবত্ব দান করেছে। আজমির মসজিদে পশ্চিম দেয়ালের সাথে শ্বেতমর্মর গাত্রে অতি চমৎকার ও মনোজ্ঞভাবে খোদাইকৃত মিহরাব মুসলিম স্থাপত্যের এক অনুপম সৃষ্টির নজিব বহন করছে। এর পূর্বে ভারত ভূমিতে মতো সুন্দরভাবে মিহরাব আর নির্মিত হয় নি।

স্থাপত্যশিল্প চেতনায় ইতঃমধ্যে যে বিপ্লব শুরু হয়েছিল তা দুটি মসজিদের অঙ্গ সজ্জায়ন তুলনা করলে সমক্ষ উপলব্ধি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, আজমির মসজিদে কোনো উপর তলা নেই, কিন্তু প্রধান খিলান পথের উন্নত বপ্রের উপব প্রত্যেক পার্শ্বে একটি করে খাঁজকাটা মিনার সংস্থাপিত হয়েছে। এখানে বক্র রেখায় কোঁচকানো নকশার চেয়ে সোজাসুজি চতুর্কেন্দ্রিক (four centeıed) আদর্শ বা নমুনার দিকে অধিক আকর্ষণ যুগিয়েছে, যা সাধারণত আকারত্বে পরবর্তী ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য পদ্ধতিতে অধিক হারে দৃষ্ট হয়ে থাকে। এর চারটি বহু ফালি বিশিষ্ট সূক্ষ্মাগ্র বা কৌণিক খিলান, যা ভারতীয় স্থাপত্যে (তখন পর্যন্ত) বিরল এবং সম্ভবত আরবীয় উৎস সম্মত অষ্টম শতাব্দীতে ইরাকের উখাইদির প্রাসাদ মসজিদের আদর্শ অনুসরণে করা হয়েছে।

এর ছাদ অগভীর গোলায়িত গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত। গম্বুজগুলো কর্বেল পদ্ধতিতে নির্মিত। এদের তলদেশ নিখুঁত খোদাইকার্যে শোভিত। এ মসজিদের পূর্ব দিকের খিলান পর্দা উত্তর-দক্ষিণে সংস্থাপিত। কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের স্থাপত্য প্রয়োগ কৌশলের শুধুমাত্র সংশোধন ও ভুলত্রুটি নিরসন আজমির মসজিদে করা হয়েছে এরূপ মনে করলেই চলবে না; বরং পর্দা প্রসঙ্গে এ অভিমত পোষণ করা যায় যে এটি নিঃসন্দেহে শুধুমাত্র পূর্বরীতির সংস্কার ছিল না এতে অভিনবত্বও ছিল। দিল্লির মসজিদের খিলান পর্দায় পাঁচটি খিলানপথ রয়েছে। কিন্তু আজমির মসজিদের খিলান পর্দা সাতটি খিলানপথের সমন্বয়ে গঠিত। এর দৈর্ঘ্য ৬১ মি. (২০০ ফুট) ও প্রস্থ ৩.৭০ মি. এবং বপ্রসহ কেন্দ্রীয় খিলানপথের উচ্চতা ১৭.১০ মি. (৫৬ ফুট) যা পার্শ্ববর্তী খিলানপথের উচ্চতা ও পরিসর অপেক্ষা বেশি। এগুলোর বৈশিষ্ট্য মিলিতভাবে পর্দাটিকে আড়ম্বরপূর্ণ মর্যাদার আসনে সমাসীন করতে সহায়তা করেছে। দিল্লি মসজিদের খিলান তলদেশ নকশা প্রয়োগে সৌন্দর্যময় করা হয় নি। কিন্তু আজমির মসজিদের অর্ধ-বৃত্তাকার (নকশাঙ্কন দ্বারা) খিলান তলদেশ বর্শাফলক দ্বারা নক্‌শায়িত করা হয়েছে। এক কথায় খাঁজকাটা নকশায়িত খিলান এখানে প্রথম বিকাশ লাভ করেছিল।

স্থাপত্যকর্মের বহিরাঙ্গে অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্যের রীতিনীতির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দিল্লির স্থানীয় দেশী শিল্পীদের হাতে নির্মিত নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ পুষ্পিত ছাঁচে ঢালাই

অলঙ্করণ নকশার পরিবর্তে সেখানে খোদাইকৃত লেখার (inscription) প্রয়োজন হয় নি। সেখানে চলতি রীতিব (নমুনা) রুচিসম্মত যন্ত্রবৎ শৃঙ্খলভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। কুতুব পর্দায় হিন্দু শিল্পীদেব হাতের নমনীয় অবাধ স্বাচ্ছন্দ্য কর্মের বদলে আজমির মসজিদে পবিত্র কুরআনের বিধিনিষেধ অনুসরণ করে আবো কঠোর নিয়মানুবর্তিতা অবলম্বন করা হয়েছে। খিলান পর্দার রূপায়ণ ঐতিহাসিকভাবে কৌতূহলোদ্দীপক হলেও পরিতাপের সাথে উল্লেখ করতে হয় যে, সুষম শৈল্পিক চেতনাব ব্যবহার এখানে নিরাশ হয়ে ফিরিয়ে গিয়েছে; কেননা অসামঞ্জস্য আকারের কুলঙ্গি (niches) খিলান বক্রের পার্শ্বে ত্রিকোনাকার স্থানে বেমানান মেডেলের শৈল্পিক কারুকার্য কারিগরের সামর্থ্যকে সার্থকভাবে ফুটে উঠতে দেয় নি। শিল্পানুভূতির বিজয় অপেক্ষা প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটেছে মাত্র।

ক্ষুদ্র আয়তকাব প্যানেল নকশা (panel) প্রত্যেক খিলান পথের দু পিলারেব মধ্যবর্তী প্রসারণে অবস্থান করছে, যা আরবের প্রাথমিক যুগের মসজিদ কাঠামোর মৌলিক বৈশিষ্ট্যরূপে বিদ্যমান ছিল। তবে ভারতে এটি কয়েক শতাব্দীব কেবলমাত্র অলঙ্করণ নমুনারূপে দেখা যায় তথাপি এর আকার ও চিহ্ন শনাক্ত করতে পারা যায়। সৌন্দর্যবর্ধক ডোবাকাটা ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলো (relief) প্রশংসনীয়। এত আড়ম্বর ও শৈল্পিক প্রচেষ্টা ও স্থাপত্যিক প্রকৌশল সফলতা সত্ত্বেও সৌন্দর্যবোধের অন্তরদর্শিতা নিপুণতায় ও নমনীয়তায় সার্থকতা অর্জনে ব্যর্থতার ছাপ মূর্ত হয়ে বয়েছে।

সুলতান ঘারীর সমাধি :

কুতুব কমপ্লেক্স হতে ৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্বে বর্তমান মেহেরলী- পালাম রাস্তাব পার্শ্বে মহীপাল নামক স্থানে এ সমাধিসৌধ অবস্থিত। সুলতান ইলতুৎমিস তাঁব প্রিয় পুত্র নাসির উদ্দীন মাহমুদের (মৃ. ১২২৯ খ্রি.) মরদেহের উপর ১২৩১ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মাণ কবেন। এ সমাধিটি একটি বর্গাকার (২০.২৫ বর্গ মি.; ৬৬ ফুট) আবেষ্টনী প্রাচীবেব অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছে (ভূমি নকশা নং-৫)। একটি নির্জন স্বর্গীয পবিবেশ ও নিভৃত শান্তিব আশ্রযরূপে গড়ে
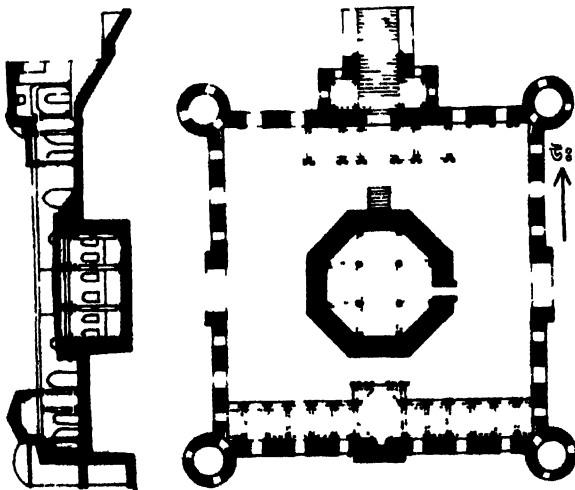
ভূমি নকশা নং-৫ . সুলতান ঘারীর সমাধি

তুলতে গিয়েই এ খিলানশ্রেণী সংবলিত আবেষ্টনী প্রাচীর নির্মিত। প্রাকার নির্মাণের ফলে স্থানটি অতি নিস্তব্ধ ও কোলাহলমুক্ত এলাকায় পরিণত হয়েছে।

বাহ্যিক দিক থেকে পর্যবেক্ষণ করলে এ সমাধি স্থানটিকে একটি ক্ষুদ্র দুর্গ হিসেবেই প্রতীয়মান হবে। কিন্তু তোরণ দরজা অব্যবহিত অভ্যন্তরে আসলেই তাৎক্ষণিক এ ধারণার পরিবর্তন ঘটবে। এ সমাধিটি একটি হিন্দু মন্দিরের স্থলে নির্মিত বলে অনেকের ধারণা। স্থানটি পারিপার্শ্বিক সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৩.১০ মি. উঁচু। পূর্ব প্রাকারের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত একটি জাঁকালো সোপান পথের সাহায্যে সমাধির অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। এ সিঁড়িপথের সর্বোচ্চ সোপান সমতার উভয় প্রান্তে দুটি প্রহরী কক্ষ রয়েছে।

এ সমাধিসৌধের প্রতি কোনায় অভিক্ষিপ্তাবস্থায় গ্রানাইট পাথরে নির্মিত হয়েছে বৃত্তাকার বুরুজ। অভ্যন্তরভাগ ফাঁপা এ বুরুজগুলো স্বল্প উচ্চতাবিশিষ্ট গম্বুজে আচ্ছাদিত। প্রতিটি বুরুজে রয়েছে অর্ধ-বৃত্তাকার সূচ্যগ্র খিলানের সাহায্যে নির্মিত উন্মুক্ত দুটি করে গবাক্ষ। অভ্যন্তরীণ অঙ্গন থেকে সিঁড়ি বেয়ে এগুলোতে প্রবেশ করা যায়।

এটি একটি হুজরা টাইপ সমাধি। বর্গাকার এ সমাধিসৌধের পশ্চিম অংশটাই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এখানে এক আইলবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র নামাজঘর রয়েছে। নামাজঘরে কেন্দ্রীয় নেভটি বেশ প্রশস্ত এবং একটি অষ্টভুজাকার কৌণিক গম্বুজ দ্বারা এটি পরিবৃত। নেভের উভয় পার্শ্বের প্রসারিত আইলের স্তম্ভগুলো মার্বেল প্রস্তরে নির্মিত। অতি নিখুঁত ও সম্মুখভাগে খাঁজকাটা স্তম্ভগুলোর শীর্ষদেশে চাকার ন্যায় আলম্ব ধাবণ করে রয়েছে। নেভের উভয় পার্শ্বের আইলের মধ্যবর্তী স্থানেও রয়েছে অষ্টভুজাকারের একটি করে কৌণিক গম্বুজ। এ জাতীয় গম্বুজ দ্বাদশ শতাব্দীতে মধ্য এশিয়ায় আনাতোলিয়ার কায়সারিয়াতে নির্মিত হয়েছিল। গম্বুজগুলো মরুভূমিতে বসবাসকারী বেদুইনদের তাঁবুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট।

কেন্দ্রীয় নেভের পশ্চিম দেয়ালে একটি সুষমামণ্ডিত মিহবাব রয়েছে। মিহরাবটি আরব্য নকশা, জ্যামিতিক নকশা ও লতা-পাতার অলঙ্করণে শোভিত। এখানে পবিত্র কুরআনের বাণী নাসখ পদ্ধতিতে অতি সুন্দরভাবে উৎকীর্ণ রয়েছে।

উক্ত প্রাচীর পরিবেষ্টিত আঙ্গিনার ঠিক মধ্যবর্তী স্থানে ও মসজিদের অব্যবহিত পূর্বে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিসের জ্যেষ্ঠপুত্র নাসির উদ্দীন মাহমুদের অষ্টভুজাকার সমাধিসৌধটি অবস্থিত (চিত্র নং- ৬)। সমাধিটি আঙ্গিনা সমতল ভূমি থেকে ০.৯ মি. (৩ ফুট) উঁচু। কথিত আছে যে এ অষ্টভুজাকার অবকাঠামোটি একসময় চন্দ্রাতপ দ্বারা শোভিত ছিল। সমাধির দক্ষিণ বাহুতে একটি ফোকর রয়েছে। সাম্প্রতিককালে এ ফোকরে অধঃগামী একটি সোপান পথ আবিষ্কৃত হয়েছে যা অভ্যন্তরীণ কবর প্রকোষ্ঠে পৌঁছে দেয়। সুতরাং ভারতবর্ষে ভূগর্ভস্থ সমাধি নির্মাণের ধারণা এখান থেকেই সূচিত হয়েছিল এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিসের সমাধি (১২১১-১২৩৬ খ্রি.) :

দিল্লিতে সম্প্রসারিত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের বহিস্থ উত্তর-পশ্চিম কোনায় ইলতুৎমিসের সমাধি নির্মাণের মধ্য দিয়ে মামলুক যুগের স্থাপত্যশিল্প উন্নয়নের চরম নিদর্শন সৃষ্টির ইতিহাস ঘোষিত হয়েছে। ভারতের বুকে মুসলিম স্থাপত্যরীতির নতুন প্রবাহ এত বলিষ্ঠভাবে এর পূর্বে আর আত্মপ্রকাশ করে নি। স্থাপত্য নির্মাণের ভারতীয় সনাতনী পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার কোথাও এর আগে বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। তবুও ইলতুৎমিসের মাকবারা

নির্মাণে হিন্দু স্থাপত্য প্রভাব বর্জিত হয়ে কেবল মুসলিম স্থাপত্যরীতির প্রয়োগ হয়েছে তা নয়। এমনকি মুসলিম কৌশলের অলঙ্করণ বা গাত্রশয্যা পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হতে হিন্দু স্থাপত্যের ধারাবাহিকতার স্পর্শতা হতে একেবারে মুক্তি পায় নি। মুসলিম স্থাপত্য সৃষ্টিশীলতা হিন্দু স্থাপত্যরীতির দ্বারা সর্বদাই কিছুটা প্রভাবিত ও অনুসারিত হয়েছে। তবে কুতুবউদ্দিনের সময়ের হুবহু অনুকরণপ্রবণতা অনেক পরিমাণে কমে আসলেও নির্মাণ পদ্ধতি দোলায়মান অবস্থা হতে দৃঢ়তা লাভে সমর্থ হয় নি।

কিছু সংখ্যক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, সমাধিসৌধ নির্মাণে সৌন্দর্যের বলিষ্ঠতা পরিহার করে নিষ্প্রাণ স্থাপত্য গড়ার চেষ্টা করা হয়েছে এবং একেই ইসলামি বৈশিষ্ট্যের পরিপূরক বলে মনে করা হয়েছে। তবে বাস্তব দৃষ্টিতে তা ততটা নয়। কারণ এ সমাধিসৌধের সমস্ত ভিতর অংশ মুসলিম রীতির জ্যামিতিক নকশা ও পবিত্র কুরআনের আয়াত উৎকীর্ণ নকশায় শোভিত হয়েছে। ইসলামি স্থাপত্যরীতির অনুসরণে শিল্পীরা নতুনভাবে তাদের প্রচেষ্টাকে সার্থকভাবে প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছে।

এ সমাধিসৌধের ছাদ নির্মাণে যে স্থাপত্যরীতির প্রয়োগ হয়েছে তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করছে। যদিও সমাধির অধিকাংশ অবকাঠামো ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তথাপি এর উপরে একটি যে কোনো ধরনের অনুচ্চ গম্বুজ ছিল তা অনুমান করা যায়। গম্বুজের যে বক্র ভগ্নাংশ অবশিষ্ট রয়েছে তা দেখে বলা যায় যে এটি দেশীয় অর্থাৎ ভারতীয় সনাতনী কৌশল অবলম্বনে নির্মিত যা একটি এক কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তাকার স্থাপত্যকর্ম এবং উভয় পার্শ্বের মধ্যবর্তী ব্যবধান বা প্রসারতা বেশি থাকার জন্য নিজেই উপরের ভারবহন করতে অক্ষম হয়ে ভেঙে পড়েছে। অভ্যন্তরের উপর কোনায় পদ্ধতির অবশিষ্টাংশ গম্বুজের গোলাকার বেড়, যা বর্গাকার হলের কোণ অতিক্রম করে গম্বুজের ভার বহন করত এবং এমন স্থানে ভারবহন করছে যেখানে বর্গাকার হলে কোণ অতিক্রম করে উপরে ছাদের রূপায়ণ ঘটেছে। বর্গাকার কক্ষকে উপরের গোলাকার গম্বুজের সাথে একবারে না মিলিয়ে পর্যায়ক্রমে মিলিয়ে দেয়ার কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে (phase of transition) বা ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার জন্য কক্ষ শীর্ষকোণে স্কুইঞ্চ (squinch) প্রণালীতে গম্বুজটি স্থাপন করা হয়েছে[২০] যার প্রয়োগ ইতোপূর্বে ভারতে দৃষ্ট হয় নি। এ গম্বুজার্ধ নির্মাণে খিলানে ভূঁসোয়া বা একদিকে পাতলা ও অন্য দিকে মোটা ইট বা পাথর ব্যবহারে স্তর সাজিয়ে গম্বুজ গড়ে তোলা হয়। এখানে শৈল্পিক মেধা ও দৃষ্টিভঙ্গির অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছে। স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে ছোট ছোট গম্বুজ বর্গাকার হলের কোনার উপরাংশ অতিক্রম করে সংস্থাপন করা হয়। এভাবে বর্গাকারকে অষ্টভুজে পরিণত করা যায় এবং প্রয়োজনবোধে এটি আবার একইভাবে ১৬ বাহুবিশিষ্ট কাঠামোয় প্রস্তুত করে তার উপর গোলাকার বেড় (rim) বিনা অবলম্বনে ভর করতে পারে। এ পর্যায়ে স্কুইঞ্চ ক্ষুদ্র খিলান বা অর্ধ গম্বুজ ধারণ করার ফলে এর বহিস্থ মুখে যে খিলানের সৃষ্টি হয় তাই উপরের সমস্ত ভার বহন করতে সক্ষম।

এ পদ্ধতির অনুশীলন পৃথিবীর অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে প্রচলিত ছিল। বাহ্যত চতুর্থ শতাব্দীর সাসানীয় ইষ্টক নির্মিত সৌধ হতে এটি অনুকরণ করা হয়েছিল। তবে ভারতে যে পদ্ধতি বা কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে তা ভারতীয় প্রতিনিধিমূলক আদর্শ নমুনার ছোঁয়াচযুক্ত ছিল। কেননা এতে প্রকৃত ভল্ট বা খিলান ছাদ অথবা প্রকৃত খিলান (true arch) প্রতিভাসিত না হয়ে ঐতিহ্যগত ধারণায় অত্যধিক অগ্রসরমান স্থাপত্যকর্মের সৃষ্টি হয়েছিল তা কৌশলগতভাবে অবৈজ্ঞানিক ছিল। তবে যে মেকি খিলান রীতির প্রয়োগ করা হয়েছিল এর সাথে বহু ফালির ব্যবহার বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছিল।

মূলত এটি অনাবশ্যক বাহুল্যবর্জিত একটি বর্গাকৃতি কাঠামো যার প্রতি বাহুর পরিমিতি ১২.৮০ মি. (৪২ ফুট) এবং দেয়ালগুলো ধূসর বর্ণের স্বচ্ছ পাথরের মধ্যে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত লাল বেলে পাথর এবং অন্য রঙের পাথরও নির্মাণ কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। ৯.২০ মি. (৩০ ফুট) বর্গাকার কক্ষের ভিতর মুখ এখন বিস্তৃতভাবে খোদাইকার্য দ্বারা আচ্ছাদিত যা হিন্দু মন্দিরে ব্যবহৃত হয়েছে। এর তিন দিকে খিলানকৃত প্রবেশপথ রচিত হয়েছে। পশ্চিম দেয়ালের ঠিক মাঝখানে একটি মধ্যম (মাঝারি) আকারের মিহরাব এবং এর উভয় পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত একটি ছোট আকারের মিহরাব নির্মিত হয়েছে (চিত্র নং-৭)।

একে নিপুণ শ্রমসহকারে নির্মিত সৌধের প্রতীক বলে মনে করা যায়। এর সুউচ্চ আড়ম্বরশালী প্রবেশ বারান্দা ছাড়াও মেঝের কিনার হতে ছাদ পর্যন্ত দেয়ালগাত্র তুঘরা, কুফিক এবং নাস্তালিক হরফে পবিত্র কোরানের বাণী খোদাই করা হয়েছে। এর সাথে আরব্য নকশালঙ্কার, জ্যামিতিক ও বুটিদার নকশালঙ্কার শোভা বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। অন্যপক্ষে অভ্যন্তরের এ অলঙ্কার সুষমা পশ্চাতের শ্বেতমর্মের উপর বৈচিত্র্য বর্ণের রিলিফ প্রণালীতে অঙ্কিত হিন্দু-রীতির অলঙ্করণের ব্যতিক্রমধর্মী সফলতা একে অপূর্ব সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তুলেছে। তবে বিশদভাবে পরীক্ষা করলে সহজেই উপলব্ধি করা যায় যে এগুলো ইসলামি চিত্রকলায় অনভ্যস্ত ভারতীয় কারিগর দ্বারা রচিত হয়েছিল। ভারতে ইসলামি স্থাপত্যশিল্প সাধনার যে বিকাশ ঘটেছিল তার সূতিকাগৃহ রূপে এ মাকবারাককে মনে করা যায়। বহু স্থাপত্যরীতির সমাবেশ এখানে ঘটেছে। এমনকি শাহজাদা নাসির উদ্দিনের মাকবারায় ব্যবহৃত স্থাপত্য পদ্ধতির কিছুটা অগ্রগতি এখানে এসেছে বলে মনে করা যায়।

সুলতান গিয়াস উদ্দিন বলবনের সমাধি :

সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিসের মৃত্যুর (১২৩৬ খ্রি.) সাথে সাথে মামলুক বংশের স্থাপত্য অনুশীলনের ধারা বন্ধ হয়ে যায়। যেভাবেই হোক ১২৬৬ খ্রিস্টাব্দে মামলুক রাজদরবারের প্রভাবশালী আমির ওমরাহ গিয়াস উদ্দিন বলবন স্বল্পকালীন একটি রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তার সমাধিসৌধটি স্থাপত্য কলাকৌশলের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদানরূপে চিহ্নিত হতে পেরেছে। এ প্রতাপশালী ও বিচক্ষণ মন্ত্রী এবং পরবর্তী সময়ে সুলতান বলবন ১২৮০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত মাকবারা ১২৮৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর পর সমাহিত হন। এটি এখন একটি বিকর্ষণীয় ধ্বংসস্তূপ ছাড়া আর কিছুই নয়; কালের করস্পর্শে এর অলঙ্কারাদি ও বাহ্যিক সৌন্দর্য সুষমার প্রকৃষ্ট ছাপ বিলীন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এ ধ্বংসস্তূপের মাঝে সেকালের স্থাপত্য উন্নয়ন ধারার অনেক মৌলিক অগ্রগতির চিহ্ন বিদ্যমান যা একটা স্থাপত্য বিপ্লবের স্মৃতি ধারণ করে রয়েছে। এটি অনুধাবন করলে সুলতান ইলতুৎমিসের মৃত্যুর (১২৩৬ খ্রি.) প্রায় ৫৪ বছর পর ভারতে মুসলিম স্থাপত্য ধারায় কতখানি অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তা সমক্ষ উপলব্ধি করা যায়। অথচ এ দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে আর কোনো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম দেখা যায় না যা প্রত্যক্ষ করে মধ্যবর্তী সময়ের স্থাপত্য ইতিহাস আমরা জানতে পারি।

অবশ্য এ প্রগতির ধারা হঠাৎ প্রাপ্ত নয়। এর পশ্চাতে বিশেষ কতকগুলো কারণ কাজ করেছিল তা সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রকৌশল দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। ভারতের বাইর হতে সে সময়ের পূর্ব পর্যন্ত যারা ভারতে প্রবেশ করেছিল তারা সামরিক অভিযান পরিচালনা করে ব্যক্তিগত বা পারিবারিকভাবে লাভবান হয়েছেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে যারা ভারতে আগমন করেছেন তারা সামরিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না।

মুসলমানদের ভারত উপমহাদেশে স্থায়িভাবে রাজ্য বিস্তার লাভ করার ফলে দিল্লিকে যে রাজধানীরূপে গড়ে তুলেছিল তার পরিচিতি ভারতের বাইরে মধ্য ও পশ্চিম এশিয়ায় পৌঁছে গিয়েছে। এর সম্পদ, প্রভাব, প্রতিপত্তি খুব তাড়াতাড়ি একে সংস্কৃতিমান, শিক্ষিত, জ্ঞানী, দক্ষ প্রকৌশলী ও পণ্ডিতসুলভ ব্যক্তিদের আকর্ষণীয় কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। এদের সাথে সাথে শিল্পী, দক্ষ কারিগর এবং অন্যান্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীর দল দিল্লিতে ভিড় জমাতে থাকে। এদের অনেকে অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোতে ইতোপুর্বে এ জাতীয় কর্মে নিয়োজিত রয়ে দক্ষ ও অভিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল এবং পরবর্তী সময়ে দিল্লির দরবারে এসে সুযোগ গ্রহণ করেছিল। এ কর্মোদ্যোগী মানুষগুলো মুসলিম ভারতের স্থাপত্যধারায় আবহমান কালের গতির পরিবর্তন এনে দিয়েছিল।

ফলশ্রুতিতে তখন ভারতের স্থাপত্যধারায় কী পরিবর্তন এসেছিল তা অবলোকন করা যেতে পারে। বলবনের সমাধিসৌধ একটি বর্গাকারের সাধারণ সাদামাটা ধরনের স্থাপত্যকর্ম যার শীর্ষে একটি গম্বুজ সংস্থাপিত হয়েছে। এটি আড়াআড়িভাবে এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ১১.৬০ মি. (৩৮ ফুট)। এর পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে একটি করে ক্ষুদ্র কক্ষ সংযুক্ত রয়েছে। এর একটিতে সুলতানের পুত্র খান মুহিত সমাহিত রয়েছেন (যিনি মোঙ্গলদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে ১২৮৫-১২৮৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।)

বলবনের সমাধিসৌধ পৃথ্বীরাজের নগর কিলা-ই-রাঁও পিথাউরার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এ সমাধিসৌধে প্রথমবারের মতো ভারত উপমহাদেশে প্রকৃত খিলান (true arch) নির্মাণ প্রত্যক্ষ করা যায় (চিত্র নং- ৮)। হিন্দু প্রভাব বর্জিত ইসলামি স্থাপত্যশিল্পের বিকাশে যে অগ্রগতি এসেছিল তার একটা সুনির্দিষ্ট সীমারেখার ছাপ এ মাকবারার গাত্রে চিরকালের জন্য বিধৃত হয়ে রয়েছে। ঔজ্জ্বল্যময় প্রকৃতির সাইজ করা প্রস্তর খণ্ড সহযোগে (radiating voussoirs) চক্রনাভির ন্যায় প্রসারিতভাবে প্রকৃত খিলান রূপায়ণ করা হয়েছিল। এতে খিলানের ফাঁকা অংশের ভার দেয়ালের মাঝে স্থানান্তরিত হতে পারে। সমাধিসৌধ কাঠামো অতি সাধারণ নুঁড়ি পাথর দ্বারা ভিত্তি হতে ছাদের নিচ পর্যন্ত সংযোগকারী মালমসলা ব্যবহারে গেঁথে তোলা হয়েছে। প্রত্যেক পার্শ্বে খিলান পথ অবস্থিত। প্রতি খিলান পরস্পরের সাথে সংযুক্ত। পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন যে ঐ খিলানগুলো বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পরস্পরের মাঝে বন্ধন সৃষ্টি করানো হয়েছে[২১]। মূলত রোমান স্থপতি ও প্রকৌশলীদের দ্বারা এর পন্থা ও কৌশল উদ্ভাবিত হয়েছিল এবং তার প্রয়োগ সার্থকভাবে এখানে হয়েছিল। এ উদ্ভাবন বিবেচনা করলে পরিষ্কাররূপে বলা যায় যে বুদ্ধিগত চেতনা অর্জিত হয়েছিল এবং কাঠামোগত অনুশীলনে অগ্রগতি এসেছিল।

এটি স্মরণ করা হয় যে সুলতান কুতুবউদ্দিনের সময় প্রত্যেকটি ইমারতে খিলান নির্মাণে ভূঁসোয়া ব্যবহৃত না হয়ে হিন্দু স্থপতি ও কারিগরগণ তাদের জানা ক্রমপূরণ রীতিতে মেকি খিলান প্রস্তুত করেছিল। কিন্তু সুলতান ইলতুৎমিসের সময় প্রকৃত খিলান নির্মাণের যে ধারা সূচিত হয়েছিল তা অর্ধশতাব্দী পরে খল্‌জী সুলতানদের সময় ভারত ভূমিতে চরম উৎকর্ষ অর্জন করেছিল ।

মামলুক শাসনামলে নির্মিত অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তি :

মামলুক সুলতানদের আমলে বিশেষভাবে শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে আরো কিছু স্থাপত্যকীর্তি দিল্লির বাইরে নির্মিত হয়েছে। দিল্লি হতে দক্ষিণে-পূর্ব দিকে প্রায় ২৫০ কি.মি. দূরে প্রাচীন বদাউন শহর অবস্থিত। তৎকালে এ শহরটি মামলুক শাসনের

অধীনে একটি সম্পূরক প্রশাসনিক কেন্দ্র রূপে গড়ে উঠেছিল। এখানে তিনটি স্থাপত্য নিদর্শন কালের সাক্ষী হয়ে আজো টিকে রয়েছে। এগুলো হচ্ছে—(১) হাউজ-ই-সামসী, (২) সামসী ঈদগাহ ও (৩) বদাউনের জামে মসজিদ। ইমারতের নামকরণ হতেই স্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিসের সময়ে এগুলো নির্মিত হয়েছিল।

উপরোক্ত কীর্তিগুলোর মধ্যে জামে মসজিদই স্থাপত্য দৃষ্টিকোণ হতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মসজিদটি অত্যন্ত মজবুত ও বৃহদায়তন আকারে নির্মিত। এর সম্মুখ বরাবর ৮৭.৮০ মি. (২৮৮ ফুট) মাপ বিশিষ্টতায় সমাপ্ত করা হয়েছিল। কিন্তু মসজিদটি বিভিন্ন সময়ে সংস্কারের ফলে বারমিশালী স্থাপত্য পদ্ধতি ও উপকরণের সম্মিলিত অবয়ব উদাহরণে পরিণত হয়েছে। তা সত্ত্বেও প্রথম যখন ১২২৩ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল তখনকার আদি স্থাপত্য কার্যক্রমের ও গঠনের ছাপ এখনও কিছুটা টিকে রয়েছে।

এটি নির্মাণের প্রায় এক শ বছর পরে তোঘলক সুলতান মোহাম্মদ বিন তোঘলকের সময় বিস্তৃত ও ব্যাপকভাবে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছিল। মোগল সম্রাট জালাল উদ্দিন আকবরের সময় অগ্নিসংযোগের ফলে এর অংশবিশেষ বিনষ্ট ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি আবার এটি নির্মাণ করেন। তবে দুঃখের সাথে বলতে হয় তুলনামূলকভাবে প্রায় আধুনিককালের প্রথম যুগে এ মসজিদটি পুনরায় সংস্কারপ্রাপ্ত হয়েছিল যা মি. কানিংহাম তার প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।[২২] এর পূর্বের তোরণসহ খিলান দরজা একই পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল যা কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের খিলান পর্দায় প্রত্যক্ষ করা যায়। অবশ্য তা এখন ভেঙে গিয়েছে এবং চতুর্ভুজ অঙ্গনটি খিলান শোভিত ও পথ-বারান্দা দ্বারা আচ্ছাদিত এবং ক্রমসরু চূড়া আকাশের দিকে উত্থিত। এ ক্রমসরু হয়ে উপরের দিকে ধাবমান স্থাপত্যকর্ম পদ্ধতি তোঘলকদের চর্চিত স্থাপত্য আদর্শের পরিচয় বহন করে। অন্যপক্ষে মুল মুসাল্লার (sanctuary) উপর পুনর্নির্মিত গম্বুজগুলো মোগল যুগের স্থাপত্য আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। মসজিদের ক্রমসরু প্রভাবযুক্ত অংশ মোহাম্মদ বিন তোঘলক এবং গম্বুজাংশ যে আকবরের আদেশে নির্মিত হয়েছিল তা অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না।

মামলুক সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিসের রাজত্বকালের ১২৩০ খ্রিস্টাব্দে যোধপুরের নাগর শহরের প্রবেশপথে নগর উপকণ্ঠে একটি অত্যুচ্চ তোরণ নির্মিত হয় যা আতর কিন-কা-দরওয়াজা (Atarkin-ka-Darwaza) নামে খ্যাত। এর অলঙ্কারাদি ও নকশাকার্য আজমিরে আড়াই দিন-কা-ঝোঁপড়া মসজিদে খিলান পর্দার অনুরূপ এবং এর কর্ম প্রক্রিয়ায় প্রতিভাসিত হয়েছে যে আজমির মসজিদের স্থপতি ও কারিগরের দল এখানেও নিয়োজিত হয়েছিল। এটিও বদাউনের মসজিদের মতোই তোঘলক সুলতান মোহাম্মদ বিন তোঘলকের শাসনামলে (১৩২৫-৫১ খ্রি.) পুনর্নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য ষোড়শ শতাব্দীতে আর একবার এটি সম্প্রসারিত হয়েছিল বলে জানা যায়।

ভারতের ভরতপুর রাজ্যে একসময়ের বিখ্যাত শহর বিয়ানায় উখহা নামে একটি মন্দির রয়েছে যার স্থাপত্যিক উপকরণ ও নির্মাণ পদ্ধতি মামলুকদের অনুশীলিত স্থাপত্যকর্মের অনুরূপ বলে পণ্ডিত মহল মনে করেন। স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে একে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়। দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের *দালান* এর নির্মাণকার্য নিষ্পন্ন হয়েছিল। এখানেও খিলান নির্মাণে হিন্দু ক্রমপূরণ রীতির প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন ঐ অঞ্চলে মুসলিম প্রভাব স্তিমিত হয়ে যায় তখন একে পুনরায় হিন্দু মন্দিরে রূপান্তর করা হয়।

হাউজ-ই-সামসী একটি নহর। মরুভূমি প্রায় অঞ্চলটিতে প্রজাদের পানির কষ্ট নিবারণ করার মানসে সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিস একটি বিরাট আকারের পুষ্করিণী খনন করেন। এটি খনন করার পর সংরক্ষণের প্রয়োজনে পাকা সোপান ঘাট বেঁধে দেন। বাঁধানো সোপান ঘাটসহ্ পুকুরটি এখন রয়েছে বলে জানা যায়।

মামলুক সুলতানদের স্থাপত্যচর্চার বিরামহীন প্রচেষ্টা ভারত উপমহাদেশের বুকে পরবর্তীকালে এক অনুপম ঐশ্বর্যশালী স্থাপত্যকীর্তি উদ্ভাবন ও সূচনার পথ সুগম করে দিতে পেরেছিল। তাদের অনুসৃত স্থাপত্য, রীতি, ক্রমে ক্রমে নির্ভরযোগ্য স্থায়ী সমৃদ্ধিশালী, মসৃণ ও সুষমামণ্ডিত ইমারত নির্মাণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি. ব্রাউন, *ইণ্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়িড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৯।
২. *তদেব*, পৃ. ১০।
৩. *তদেব*, পৃ. ১০; এস গ্রোভার, *দি আর্কিটেকচার অব ইণ্ডিয়া ইসলামিক* (৭২৭-১৭০৭), দিল্লি (বিকাশ পাবলিশিং হাউজ লি., ১৯৮১), পৃ. ৮।
৪. পি. ব্রাউন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০।
৫. *তদেব*।
৬. জে. ফারগুসন, *হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া এণ্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার*, লণ্ডন, ১৯১০, পৃ. ৫০৫।
৭. এ.বি.এম. হোসেন, *মানারা ইন ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেকচার*, ঢাকা (এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৭০), পৃ. ২৭।
৮. *আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া রিপোর্টস*, ভলিউম-১৪, ১৮৭৫, পৃ. ৪৪।
৯. *তদেব*।
১০. জে. ফারগুসন, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৬।
১১. আর.এন.মঙ্গি, *দি হিস্ট্রি অব দি কুতুব মিনার*, ব্রোম্বে, ১৯১১, পৃ. ৮৪।
১২. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।
১৩. *তদেব*, পৃ. ১২।
১৪. এ.বি.এম. হোসেন, *মানারা*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮।
১৫. *আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া রিপোর্টস*, ভলিউম-১, ১৮৬২, পৃ. ১৯৫।
১৬. কুতুব মিনারের লিপি অলঙ্করণের বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : এস.এম. শফিক উল্লাহ, *ক্যালিগ্রাফি ইন দি সুলতানাত আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া : এ স্টাডি অব অরনামেন্টেশন এন্ড স্টাইলেস্টিক ডেভলপমেন্ট*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৭, পৃ. ৯৮-১০৩।
১৭. জে. ফারগুসন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪১৪, ৪১৬, ৪২১।
১৮. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১২।
১৯. জে. মার্শাল, "দি মনুমেন্টস অব মুসলিম ইন্ডিয়া", *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ভলিউম-৩, দিল্লি, ১৯৫৮, পৃ. ৫৮১।
২০. বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন : পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫।
২১. For in the building for the first time in India we meet with the true arch produced by means of radiating voussoirs; cf : পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫।
২২. *আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে রিপোর্ট*, ভলিউম- ১১, ১৮৭৫-৭৬, প্লেট-৩।

চতুর্থ অধ্যায়
খল্‌জী স্থাপত্য
(১২৯০-১৩২০ খ্রিস্টাব্দ)

মামলুক বংশের সুলতান শামস-উদ-দীন ইলতুৎমিসের স্থাপত্য অনুশীলনের ধাবাবাহিকতা সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সময় প্রকৃত খিলান (true arch) নির্মাণের মধ্য দিয়ে ভারতীয় স্থাপত্যকলায় এক বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্বে পর দিল্লির প্রশাসনিক পটপরিবর্তন হয়ে যায়। ১২৯০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান জালালউদ্দিন খল্‌জী দিল্লিব সিংহাসন হস্তগত করতে সক্ষম হলেও স্থাপত্যশিল্প নির্মাণে তাঁর কোনো ভূমিকা প্রত্যক্ষ করা যায় না। আফগানিস্তানীয় তুর্কি বংশোদ্ভূত জালালউদ্দিন গজনীর নিকটস্থ খল্‌জী গ্রামের অধিবাসী হলেও মামলুকদের আমলেই একজন তরুণ আমির-ওমরাহরূপে কর্মজীবন শুরু করেন এবং বিচক্ষণ আমির ও সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের মৃত্যুর পর যোগ্যব্যক্তিব অভাবে দিল্লি প্রশাসন যখন একেবারে অচল হওয়ার উপক্রম হয়েছিল তখনই দরবাবের সভাসদগণ তাঁকে দিল্লির সিংহাসনে উপবেশনের জন্য আমন্ত্রণ জানায়। প্রকারান্তরে জীবনের অধিকাংশ সময় আমির-ওমরাহরূপে অতিবাহিত করে বার্ধক্যের অন্তিম মুহূর্তে যখন সিংহাসনে সমাসীন হলেন তখন জীবনের অপরাহ্ন বেলায় যৌবনের বলিষ্ঠতা প্রায় স্তিমিত হয়ে পড়েছিল।

মানব-মনের প্রকৃতি বিশেষ একটা অনুকূল পরিবেশে কেবলমাত্র রোমাঞ্চিত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সে রোমাঞ্চ তার পুরোনো মনকে নতুন ভাবরসে প্লাবিত করে তুলতে পারে নি। তাই শিল্প বা পাথরখণ্ডে নিজের নাম বিধৃত করার মতো বিস্ময় তিনি রেখে যেতে পারেন নি। এর সকল দায়িত্বভার ভ্রাতুষ্পুত্র, বিশাল হৃদয়াবেগের উচ্ছ্বাসময়তার আধার অসমসাহসী বীরযোদ্ধা সুলতান আলাউদ্দিনের স্কন্ধে অর্পিত হয়।

এদিকে ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্য ইতিহাসে ৭৫ বছর সময়ের মধ্যে কোনো অগ্রগতির সুস্পষ্ট ছাপ মুদ্রিত হতে পারে নি। সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জী সিংহাসনে (১২৯৬ খ্রি.) আরোহণের পর ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ বছরে স্থাপত্যকর্মের সূচনা লক্ষ করা যায়। ফলত তাঁর সময়েই স্থাপত্য কার্যক্রমে নিশ্চিত অগ্রগতির সূত্রপাত ঘটে। এ শাসকের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনার মধ্যে ছিল দিল্লির কুতুব মসজিদ চত্বরে প্রকাণ্ড একটা জামে মসজিদ নির্মাণ করা (চিত্র নং-৯)। উল্লেখ্য যে, এ চত্বরে ইতোপূর্বে কুতুবউদ্দিন আইবেক কর্তৃক নির্মিত মসজিদটি সুলতান ইলতুৎমিস কর্তৃক পরিবর্ধিত হয়েছিল।

যাহোক উক্ত পরিসীমার উত্তর দিকে তাঁর স্থাপত্য কার্যক্রমের ক্ষেত্ররূপে গৃহীত হয়। উত্তরের এ বিস্তৃত অংশেই অসাধারণ আকারত্বে বিরাট একটি মিনার নির্মাণের পরিকল্পনা

গ্রহণ করেন, যার নির্মিত গোড়াটাই (নিম্নাংশ) প্রায় তখন হতে এক শ বছর পূর্বে মামলুক সুলতানদের দ্বারা নির্মিত কুতুব মিনারের চেয়ে দ্বিগুণ আকৃতির ছিল।

এটি যে কোনো দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ স্পষ্টত উপলব্ধি করতে পারে যে, এ ধরনের একটি দৈত্যরূপ স্থাপত্য প্রকল্প একক জীবনে সম্পাদন করার যথাযথভাবে আশা করা একটি অতিরিক্ত সঠিকতার উদ্ভট ধারণা ছিল মাত্র। তাঁর স্থাপত্য অনুশীলনের চিন্তাভাবনা কতকটা দিগ্বিজয়ের নেশার মতো মনকে ব্যাকুল করে তুলেছিল, হয়তো অনুপ্রেরণা এভাবে তাঁর হৃদয়ে জাগ্রত হয়েছিল; তবে দুটির সমাপ্ত হওয়ার পরিবেশ ভিন্নতর ছিল। এর পরিণতিতে তাই তুলনামূলকভাবে নির্মাণ কাজটির শৈশব অবস্থাতেই প্রকল্পকারীর ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে স্থাপত্যকর্মের অগ্রগতি চিরতরে থেমে যায়। আলাই মিনারের প্রস্তাবিত উচ্চতা ছিল ১৪১.৭৫ মি. (৪৬৫ ফুট)। প্রস্তাবিত আকারে নির্মিত হলে উচ্চতার দিক থেকে এটি কুতুব মিনারকেও ছেড়ে যেত।

যাহোক তাঁর মসজিদের ভিত্তি এবং দেয়াল এখনো প্রত্যক্ষ করা যায়। এ অসমাপ্ত কাজের অংশবিশেষ ভিত্তি বা মঞ্চের সমান উচ্চতা পর্যন্ত গেঁথে তোলা হয়েছিল। মিনারটি কেবলমাত্র নুড়ি পাথর দ্বারা গেঁথে একতলা সমান উচ্চতায় উন্নীত করা হয়েছিল। এ প্রবল শক্তিমান এবং কঠোর প্রকৃতির সুলতানের আকাঙ্ক্ষিত স্থাপত্য পরিকল্পনা অবলোকন করা যেতে পারে। তাঁর বিশাল স্থাপত্য পরিকল্পনার সাথে অসমাপ্ত স্থাপত্যকর্মের বৈসাদৃশ্য প্রতীয়মান হচ্ছে। কেননা তুলনামূলকভাবে পরিকল্পনার সামান্য অংশই বাস্তবায়িত ও সুসম্পন্ন হতে পেরেছিল মাত্র। তবে যেটুকু স্থাপত্য পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পেরেছিল সে উদাহরণ মন্থনে তাঁর সমস্ত স্থাপত্য পরিকল্পনার পদ্ধতি ও রীতি সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

সুলতানের সমাপ্ত স্থাপত্য কাঠামো হচ্ছে মসজিদ প্রাঙ্গণের দক্ষিণের প্রবেশ কক্ষটি। এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ইমারত যা আলাই দরওয়াজা বা আলাউদ্দিনের প্রবেশ তোরণ নামে পরিচিত। এটি ১৩০৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এর স্থাপত্যিক নির্মাণ প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য; বিশেষভাবে গঠন কৌশল ও আকারত্ব অবলোকনে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে এখানে এক নতুন স্থাপত্য প্রযুক্তি ও কৌশল কার্যকর হয়েছিল। এর নির্মাণ কাজে একদল দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অভিজ্ঞ, গভীর প্রজ্ঞাবান, দক্ষ স্থপতি ও কারিগরবৃন্দ আত্মনিবেদিত অনুপ্রেরণা নিয়ে নিয়োজিত হয়েছিলেন। তারা হয়তোবা ইতঃপূর্বে স্থাপত্য নির্মাণ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে কিছুটা বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে পেরেছিলেন। আর এ কারণেই তাদের পক্ষে এ ধরনের একটি নিখুঁত ও সর্বাঙ্গীণ সুন্দর কালজয়ী স্থাপত্য নিদর্শন নির্মাণ করা সম্ভব হয়েছিল।

এসব দক্ষ কারিগরদের হাতে নির্মিত এ ইমারতে (আলাই দরওয়াজাতে) যেসব বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (১) আকারত্ব, (২) নতুন ধরনের খিলানের উদ্ভাবন, (৩) গম্বুজের অস্তিত্ব প্রসূত কম্পন, (৪) দেয়াল নির্মাণ প্রণালী, (৫) গম্বুজের ভারবহন কৌশল, (৬) দেয়ালগাত্রে ও উপরিভাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধিকরণ এবং (৭) নকশা অঙ্কন পরিকল্পনা।

দৃশ্যত প্রকল্পের সকল কাজই একটা অনিশ্চয়তার মাঝে নিষ্পন্ন হয় নি; বরং গভীর আত্মবিশ্বাসী ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের অনুশীলিত হস্তের নিরাপদ প্রতিশ্রুতির আলোকে সব কিছু সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়েছে। অতএব এ অসাধারণ স্থাপত্য পদ্ধতির আদিত্ব ও স্বাতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে স্বাভাবিকভাবে মনে প্রশ্ন জাগ্রত হয় যে কোথা হতে তিনি এ নতুন অনুপ্রেরণার উৎসপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। এর সুস্পষ্ট জবাব স্থাপত্য কাঠামোর প্রতি অংশে সন্দেহাতীতভাবে অন্তর্নিহিত হয়ে রয়েছে।

যুগসন্ধিক্ষণে নির্মাণ শিল্পে যে স্থাপত্য সংস্কৃতি পরিচয় বিধৃত হয়েছে তা মূলত এশিয়া মাইনরে একাদশ শতাব্দীতে বহুদূর প্রসারিত সেলজুকদের পার্শ্বশাখা হতে উদ্ভূত হয়েছিল। এ তুর্কীয় বংশোদ্ভূত সেলজুকদের মসজিদ ও অন্যান্য ইমারতাদি অবলোকন করলে একটি সূত্র প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে যে তারা আরবীয় খলিফাদের ঐতিহ্য ও ক্ষমতার উত্তরাধিকার লাভে সমর্থ হয়ে দক্ষ কারিগর ও অত্যন্ত শিল্পবোধসম্পন্ন স্থপতি দ্বারা তাদের রাজধানী আনাতোলিয়াব প্রাচীন নগর কোনিয়াকে (konya) সূক্ষ্ম কারুকার্য খঁচিত চমৎকার সুরুচিসম্পন্ন স্থাপত্যকর্মের দ্বারা সমৃদ্ধিশালী করতে পেরেছিল। সৃষ্টিশীল শিল্পকলা বা সংস্কৃতির যাত্রাপথ কখনই বাধাপ্রাপ্ত হয় না। তাই সেলজুকদের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে গিয়েছিল বটে; কিন্তু তাদের শিল্প চেতনা তখনো পর্যন্ত টিকে ছিল।

সেলজুকদের প্রশাসনিক প্রভাব-প্রতিপত্তি পশ্চিম এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলের উপর বিস্তার লাভ করেছিল। তারা হিন্দুকুশ পর্বত হতে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলের মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তাদের অধীনে একত্রিত কবে স্থাপত্যশিল্পের প্রসাব ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল। এমনকি তাদের এলাকার বাইরে নিকটবর্তী অঞ্চলেও স্থাপত্য আদর্শ বিস্তার লাভ করেছিল। তাই ভারতীয় স্থাপত্যে এ ক্ষমতাবান শাসকদের প্রস্তর ও মর্মরে তৈরি প্রাসাদগুলোর সাথে স্থাপত্য চরিত্র ও চেহারার সাদৃশ্য বিদ্যমান।

বাস্তবে হয়তোবা সামান্য কিছু যোগাযোগ থাকলেও থাকতে পারে। তবে ভাবতীয ইমারতের ঐ একই সাধারণ শিল্পগঠন, বয়ন বিন্যাস, নির্মাণ প্রণালী, প্রাণচাঞ্চল্য, উদ্দীপনা ও প্রাণবন্ততা দেখা যায়, যা পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্য উদ্যমশীলতায় (প্রাণরসের সঞ্চারণ) ঘটেছিল। অবশ্য কীভাবে স্থাপত্যশিল্প চেতনা ভারতের মুসলিম রাজধানীতে এসে পৌঁছেছিল তা ইতিহাসের বিষয়বস্তু।

ঐতিহাসিকভাবে সত্য যে ঠিক এরূপ সময়ই মোঙ্গলদের উপর্যুপরি আক্রমণের মুখে সেলজুক সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হলে অধিবাসীবৃন্দের দেশত্যাগের কাবণ সৃষ্টি হযেছিল। তখন তারা অন্য দেশে নিবাপত্তা ও ভাগ্যান্বেষণে গমন করেছিল। মোঙ্গল আক্রমণের ভীতিপ্রদ লক্ষণ ভারতে দেখা দিয়েছিল এবং আংশিকভাবে আক্রান্তও হয়েছিল। কিন্তু মোঙ্গল আক্রমণের হাত হতে রেহাই পাওয়ার সুযোগে দিল্লির শাসকবর্গ এসব বাস্তুত্যাগী মোহাজেরদের আশ্রয়দান করতে সমর্থ হয়েছিল। তাদের মধ্যে অনেকেই এ পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়ে খল্জী সুলতানদের প্রতিরক্ষা ও নিবাপত্তা কামনা করেছিল। এসব শিক্ষিত এবং বিভিন্ন শিল্পদক্ষ জনগোষ্ঠী প্রকারান্তরে সেলজুকদের কলাকৃষ্টি ও সংস্কৃতি এমনকি স্থাপত্য মনীষা সাথে করে ভারতীয় উপমহাদেশের রাজধানী দিল্লিতে আগমন করেছিল।

আপেক্ষিকভাবে সামান্য হলেও প্রতীয়মান হয় যে সে যুগের দিল্লিতে নির্মীয়মাণ স্থাপত্যশিল্পে পশ্চিম এশিয়ার অসাধারণ প্রস্তর স্থাপত্য ইমারত নির্মাণ পদ্ধতির চূড়ান্ত ও পরিপক্ব রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। এ স্থাপত্য গাঁথুনি পদ্ধতি দুটি ভিন্নতর নিয়মে; যেমন- হেডাব (header) নামের সংকীর্ণ রীতি এবং স্ট্রেচার (stretcher) নামের অপেক্ষাকৃত প্রশস্তরীতির সাথে পর্যায়ক্রমে সমন্বয় সাধন করে গঠিত হয়েছিল।[১] এভাবে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়ার ফলে উভয়ের মধ্যে একটা সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি হয়েছিল।

অনুরূপ পদ্ধতির নির্মাণকার্য দ্বিতীয় শতাব্দীর ইরাকের পারসিক প্রাসাদ হাট্টায় (hatta palace) প্রত্যক্ষ করা যায়। অতঃপর এ পদ্ধতি সিরিয়ার স্থাপত্য নির্মাণ কাজেও দেখা গিয়েছে। অন্যপক্ষে এটি আশ্চার্যের বিষয় যে পারসিক প্রাসাদ ও খল্জীদের আলাই দরজার

সময়ের ব্যবধান হাজার বছরের। তাছাড়া ইরাক হতে দিল্লির দুরুত্বও কম নয়। এ তথ্যপ্রাপ্তি সংক্রান্ত মতবাদ নিয়ে আর বেশি দূর অগ্রসর হওয়ার সুযোগ নেই। তবে এটি স্মরণ রাখা কর্তব্য যে এ ভূভাগে স্থাপত্য নির্মাণ প্রণালী দু'টি আলাদা সভ্যতার নিরিখে প্রধানত ইট ও নুড়ি পাথরের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ভারতের নিকটবর্তী দেশগুলোতে মসৃণ ও নুড়ি পাথর এবং পারস্য ও সিরিয়ায় প্রধানত ইট নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হত।

এর আদিতে যাই থাকুক এ সুনির্দিষ্ট দেয়াল নির্মাণ পদ্ধতি তখন একটি নতুন রীতি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। অন্যপক্ষে এটি আরো প্রণিধানযোগ্য যে এ রীতি স্থাপত্য নির্মাণ আদর্শরূপে স্বীকৃতি লাভে সক্ষম হয়েছিল এবং ক্রমাগত উন্নতি সাধন করে একটি বিশেষ যুগকে অতিক্রম করে পরবর্তী সময়েও সক্রিয় ছিল। তাই মোগল স্থাপত্যেও ঐ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে।

সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জী কর্তৃক সম্প্রসারিত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ :

সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জী শুধুমাত্র একজন দিগ্বিজয়ীই ছিলেন না; বরং নির্মাতা হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর তিনি বেশ কিছু নির্মাণ পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের সংস্কার সাধন। তিনি মূল মসজিদ পরিকল্পনা ও ইলতুৎমিসের সম্প্রসারিত অংশ অক্ষত রেখে পূর্ব-উত্তর পার্শ্বে তার সম্প্রসারণ কার্যক্রম পরিচালনা করেন। সম্প্রসারিত অংশ ইলতুৎমিস কর্তৃক সম্প্রসারিত অংশেব প্রায় তিনগুণ। এ বিশালাকৃতির সম্প্রসারিত মসজিদ নকশায় পূর্ব রিওয়াকে দুটি, উত্তর ও দক্ষিণ বিওয়াকে একটি করে মোট চারটি প্রবেশপথের ব্যবস্থা রাখা হয় (ভূমি নকশা নং-৬)। এগুলোর মধ্যে শুধুমাত্র দক্ষিণের তোরণ পথই পূর্ণ অবয়বে নির্মিত হয়েছিল। সম্প্রসারিত অংশে বৃহদাকৃতির আলাই মিনার নির্মাণ প্রকল্প আলাউদ্দিন খল্‌জীর একটি উচ্চাভিলাষী কর্মপরিকল্পনা হিসেবে চিহ্নিত। কুতুব মিনারের দ্বিগুণ আকৃতির ব্যাস ও উচ্চতা নিয়ে এ প্রকল্পের যাত্রা শুরু এবং একতলা উচ্চতা পর্যন্ত অসম নুড়ি পাথবে তৈরিব পর কোনো অজ্ঞাত কারণে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুলতান আলাউদ্দিনের সম্প্রসারিত অংশের জুল্লাহ্ ও রিওয়াকের প্রশস্ত তা পূর্ববর্তী নির্মাণ অংশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বাস্তবায়ন করা হয়। কিন্তু তার অকাল মৃত্যুতে সম্পূর্ণ নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায়। মসজিদের এ বর্ধিত অংশের তেমন কিছু আজ আর অবশিষ্ট নেই। তবে অলঙ্করণ সম্পর্কে কিছু তথ্য অবগত হওয়া যায়। এর আলঙ্কারিক সৌন্দর্য সম্পর্কে ঐতিহাসিক আমীর খসরু মন্তব্য করেছেন যে খিলান পর্দার গাত্র বেয়ে পবিত্র কুরআনের বাণী স্বর্গপানে যেমন উত্থিত হয়েছে তেমনি আবার পাহাড়ি ঝরনার ন্যায় ক্রমআস্ফালন করতে করতে নিপতিত হয়েছে। এ স্পন্দন শুধুমাত্র নয়নে পর্যবেক্ষণ করা যায় ভাষায় প্রকাশ দুরূহ।

আলাই দরওয়াজা :

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামি স্থাপত্যের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তনের সূচনায় আলাউদ্দিন খল্‌জীর মসজিদ তোরণ পথ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রাদেশিক বা ভারতীয় দিল্লিভিত্তিক স্থাপত্যিক আকারত্বপ্রাপ্তিতা সেলজুক স্থাপত্যের একটা স্থির নিশ্চিত অনুবর্তিতা ও পরিণতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ ভারতীয় স্থাপত্য নির্মাণে উক্ত বংশের স্থাপত্যরীতি যথাযথভাবে অনুসৃত হয়েছে। তবে সময়ের প্রয়োজনে, পরিস্থিতি অনুসারে
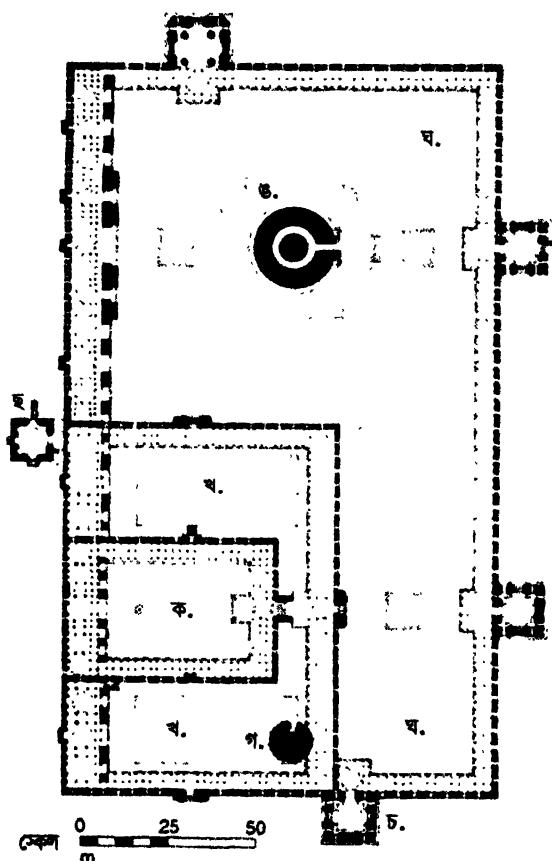
ক. কুতুব উদ্দিন আইবক কর্তৃক নির্মিত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ
খ. সুলতান ইলতুৎমিশ কর্তৃক সম্প্রসারিত অংশ
গ. কুতুব মিনার
ঘ. সুলতান আলাউদ্দিন কর্তৃক সম্প্রসারিত কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ
ঙ. আলাই মিনার
চ. আলাই দরওয়াজা
ছ. সুলতান ইলতুৎমিশের সমাধি

ভূমি নকশা নং-৬ : সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জী কর্তৃক সম্প্রসারিত কুয়াতুল ইসলাম মসজিদ

স্বাভাবিক এ পদ্ধতিগুলোর পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও অভিযোজন করতে হয়েছিল। যদিও পশ্চিম এশিয়ার স্থাপত্যশিল্পের স্বরূপের প্রভাব খল্‌জী স্থাপত্যশিল্পে নিষিক্ত হওয়ার আভাস পাওয়া যায় তথাপি অভিন্নতা বা ব্যক্তিগত পরিচয় অস্পষ্ট, দুর্বোধ্য এবং অজ্ঞাত। কারণ একই ধরনের স্থাপত্য অভিব্যক্তি ও প্রকাশ পরস্পরাক্রমে আর একটির প্রভাব দ্বারা অনুসারিত হয়েছে।

তা সত্ত্বেও এ স্থাপত্য আন্দোলনের কিছু কিছু মূলসূত্র ও উপাদান প্রতিকূল অবস্থাতেও প্রকটভাবে বিদ্যমান তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বর্শাফলক (spear head) নকশার কথা বলা যায়। এর সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যসূচক গুণাবলীর স্বতন্ত্রতা ধীরে ধীরে এ দেশের স্থাপত্যধারার সাথে মিশে গিয়েছে।

আলাই দরওয়াজার একটা বিশেষত্ব হল এর নির্মাণকার্যে যারা নিয়োজিত ছিলেন তারা কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেন না যে ইমারতটি নির্মাণে কোনো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল। এর প্রধান চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অবলোকনে দেখা যায় যে অনেকগুলো বহিরাগত বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও কিছু কিছু খাঁটি দেশীয় উপাদান ও বৈশিষ্ট্য এতে নিষিক্ত হয়েছে, যেমন—ইমারতের সর্বাঙ্গ ভারতীয় আঙ্গিকে রচনা, আবার কোনো সময়ে কেবল কিনারার আকারে এবং কোনোখানে নমুনা নকশা হিসেবে বহির্ভারতীয় বৈশিষ্ট্য সংযুক্ত হয়েছে। এ ইমারতে দক্ষতা সহকারে দু প্রণালী ও রীতির উৎকৃষ্ট মিশ্রণে এরূপ একটি বিশিষ্ট শিল্পকর্ম রূপায়িত হতে পেরেছিল।

প্রসঙ্গক্রমে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে আলাই দরজা আলাউদ্দিনের পরিকল্পিত জামে মসজিদের চারটি দরজার মধ্যে অন্যতম প্রবেশদ্বার হিসেবেই নির্মিত হয়েছিল। পরিকল্পনা অনুযায়ী এর দুটি প্রবেশপথ পূর্ব রিওয়াকে, একটি উত্তর রিওয়াকে এবং চতুর্থটি দক্ষিণ রিওয়াকে নির্মাণের সিদ্ধান্ত ছিল। কিন্তু বাস্তবে কেবলমাত্র দক্ষিণের প্রবেশপথটির নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছিল।

মূলত এটি সম্পূর্ণ পরিকল্পনার একটি বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ। অবস্থানুসারে একে এখন একটি নিঃসঙ্গ স্থাপত্য কাঠামো হিসেবে চিহ্নিত করা যায় এবং বর্তমানে এর কোনো উপযোগিতা আছে বলে মনে করা হয় না; বরং এটি একটি বিস্ময় যে পরিকল্পনার অধীনে যখন প্রায় সবগুলো স্থাপত্য কাঠামো অসমাপ্ত রাখা হল তখন এ সম্পূরক বা সহায়ক ইমারতটি অন্য অংশের আগেই সুসম্পন্ন করা হল কেন ? তবে এর একটি সম্ভাব্য কারণ অনুমান করে পি. ব্রাউন বলেন, সুলতান এ পথ দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে পরিকল্পনার অগ্রগতি অবলোকন করার প্রয়োজনে এত দ্রুততার সাথে এ প্রবেশদ্বারটির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করানো হয়েছিল।[২] কেননা সুলতান মসজিদের দক্ষিণ দিকের প্রাসাদে অবস্থান করতেন। ঐতিহাসিকগণ অন্য আর একটি কারণ অনুমান করে বলেন যে একে স্থাপত্য আদর্শরূপে উপস্থাপন করে সমগ্র পরিকল্পনার অভিপ্রায় স্পষ্টতর করে তুলতে চেয়েছিলেন।

তবে যেভাবেই হোক এরপর অবশিষ্টাংশ এ উদাহরণের নিরিখে পরীক্ষিত পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করে বাস্তবে কর্মসম্পাদন সহজতর হওয়ার প্রয়াস নিশ্চিত করতে পেরেছিল বলে মনে করা যায়। এতে পদ্ধতির পরিপক্বতা সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ আর থাকতে পারে না। তবে দুঃখের বিষয় সুলতানের ভাগ্যে সমগ্র পরিকল্পনার শুভ বাস্তবায়ন দেখার সুযোগ হয় নি। আলাই দরওয়াজা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলা চলে যে সমগ্র মুসলিম শাসনাধীন ভূভাগগুলোর মধ্যে এত সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক স্থাপত্যশিল্পের আর বিকাশ ঘটে নি।

আলাই দরওয়াজার বাহ্যিক অবয়ব পর্যবেক্ষণে প্রতীয়মান হয় যে কেবল মজবুত ও বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে নির্মাণের কারণে এটি সাড়ে ছয় শ বছর অতিবাহিত হওয়ার পরেও নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত হয়ে এখনো টিকে রয়েছে। মূলত এটি মসজিদ প্রাঙ্গণের অভ্যন্তরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নির্মিত হয়েছিল এবং ছোট একটি গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত রয়েছে। ইমারতের অভ্যন্তরভাগ অধিক সৌষ্ঠবপূর্ণ ও আড়ম্বরতায় নির্মাণ করা হয়েছে।

ইমারতটি একটি বর্গাকৃতি স্থাপত্য কাঠামো যার প্রতি পার্শ্ব ১৬.৮০ মি. (৫৫ ফুট) এবং গম্বুজ চূড়াসহ উচ্চতা ১৮.৩০ মি. (৬০ ফুট)। প্রত্যেক পার্শ্বের মাঝখানে দরজা এবং পার্শ্বদেশে পাথরের জালিকাটা জানালা বিদ্যমান। এ হলঘরের প্রতি পার্শ্ব ১১ মি. (৩৬ ফুট) এবং ছাদ হিসেবে একটি অনুচ্চ গম্বুজ ধারণ করে রয়েছে। আলাই দরওয়াজার পরিমাপই (দৈর্ঘ্য+প্রস্থ+বেধ) এর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সুষমতা ও অনুপাত সম্পর্কে একটা ধারণা সৃষ্টি করতে পারে। সাথে সাথে ইমারতের পরিমিত আকারত্বের কথাও বুঝার অবকাশ সৃষ্টি করছে।

এখানে আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার রীতিতে ইমারতের অংশগুলোকে স্থাপত্যিক দৃষ্টিতে সমন্বয় করার দায়িত্ব দক্ষ ও অভিজ্ঞ হস্ত দ্বারা সম্পাদিত হয়েছিল। নকশা পরিকল্পনার সময় তিনটি বহির্মুখ প্রায় দেখতে একই ধরনের। প্রতিটি দীর্ঘ খিলানপথ ক্রমোন্নত সোপান দিয়ে অভ্যন্তরের উঁচু মেঝেতে গিয়ে পৌছেছে। নিম্নে মেঝে যার খাড়া পার্শ্ব বিভিন্ন প্রকারের বন্ধনীর মনোজ্ঞ ও চমৎকার খোদাই কাজে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। অন্যপক্ষে উপরের দেয়াল মুখ দু তলায় বিভক্ত। নিচের দুটি বন্ধ খিলান (recesses) প্রস্তর জালি দ্বারা সজ্জিত। এ সমস্ত অঙ্কন ও কারুকার্য প্রজ্ঞা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দ্বারা লাল বেলে পাথর ও শ্বেতমর্মরের মিশ্রিত ব্যবহারের মাধ্যমে সম্পাদিত। এর পাশাপাশি আরব্য নকশা ও সৌন্দর্যবর্ধক অলঙ্করণ ও খোদাইলেখ দ্বারা আড়ম্বরশালী করে সুসজ্জিত করা হয়েছে (চিত্র নং-১০)।

সুসজ্জিতকরণের মধ্য দিয়ে একে একটি অনুপম স্থাপত্যকর্মরূপে প্রকাশিত করতে খিলানের দৈহিক সৌন্দর্যতাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। এর বিশিষ্ট স্বাভাবিক মাধুর্যপূর্ণতা সম্মুখ দেয়ালের (facades) খিলানের আকারত্বে প্রকাশমান হয়েছে। বিশেষভাবে কেন্দ্রীয় দরজার বক্রতায় আরোপিত গুণ ও বৈশিষ্ট্যে এবং প্রস্থের উচ্চতার মাত্রায় ও সুসমতায়। এ ধরনের সুশোভিতকরণ পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের মধ্য দিয়ে ইসলামি স্থাপত্যের চরম বিকাশের নজির সৃষ্টির প্রয়াস আর কোথায় দৃষ্ট হয় না।

এখানে যে ধরনের খিলান ব্যবহৃত হয়েছে তা সূক্ষ্মাগ্র অশ্বখুরাকৃতি খিলান (pointed horse-shoe arch) নামে পরিচিত। এর ব্যবহারের দৃষ্টান্ত অতীব বিরল। অবশ্য খলজী স্থাপত্যের পরবর্তী কোনো স্থাপত্যে এর ব্যবহার তেমন দৃষ্ট হয় না। অধিকন্তু এর নির্মাণকার্যে ভূঁসোয়া পদ্ধতি (voussoir) ব্যবহৃত হয়েছে। এ খিলানে মসৃণ সমতল পাথর ব্যবহৃত হয়েছিল।

এতকাল খিলান প্রস্তুত করতে অসমান নুড়ি পাথর ব্যবহার করা হত। কিন্তু এবার মসৃণ পাথর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে খিলান নির্মাণ প্রযুক্তিতে অগ্রগতি দেখা দিয়েছে। আলাই দরজায় ব্যবহৃত খিলানের আকারত্ব এবং এর সাজসজ্জায়ন, অলঙ্করন ও চিত্রাঙ্কণ প্রণালী জোরালোভাবে এর সৌন্দর্যের প্রতিরূপকে আকারত্বে ও বৈশিষ্ট্যতায় প্রকাশিত হতে সহায়তা দান করেছে। এর বহির্ভাগস্থ চতুর্দিকের সীমারেখার শ্বেতমর্মরের বন্ধনী (band), খোদাই ও খচিত হস্তলেখ দ্বারা অলঙ্কৃত এবং খিলানের তলদেশ (soffit) বর্শাফলক (spear-head) নকশা দ্বারা পরিশোভিত। খিলানের ত্রিকোনাকার ভূমিতে কোঠরযুক্ত (sockets) নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। এ জাতীয় উদ্গত নকশা অলঙ্করণ ইতঃপূর্বে সৌন্দর্য বৃদ্ধির প্রয়োজনে সেলজুক স্থাপত্যে ব্যবহৃত হত। তা ছাড়া খোদিত ও ছাঁচে কাটা নকশা বর্গাকার ফ্রেমে সম্পূর্ণ আচ্ছাদন করে কিনারায় শ্বেতমর্মর পাথরের প্যাটার্ন ও নকশা অলঙ্করণে সুশোভিত রয়েছে।

এখানে সৌন্দর্য বৃদ্ধির মানসে রঙিন নকশা প্রকল্প দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে সুসমন্বয় করে তার সাথে দে'য়ালের উপরিভাগ জটিল ও বিজড়িতভাবে খোদাই করা হয়েছে। এর

কিছু অংশে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করার মানসে উপরিতলা হতে অভিক্ষিপ্তাবস্থায় অঙ্কিত। অন্যগুলো আবার গভীর নিম্নগামী করে অঙ্কিত হয়েছে। তবে এটি দর্শনে চোখে অবসন্নতা ও মানসিক ক্লান্তি আনয়ন করে না। এতে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ ও গবেষণার জন্য মনোনিবেশ করার অঢেল উপকরণ রয়েছে।

এটি কেবলমাত্র খিলান পর্দার উপরিভাগে অঙ্কিত কমনীয় অলঙ্করণ নকশার খেলা ছিল না বা উপরতলা হতে অভিক্ষিপ্তাবস্থার নকশা অথবা বিভিন্ন প্রকারের নকল ছাঁচ বা শিল্পায়িত পদ্ধতির চলতি রীতিসম্মত অথবা কেবল বাহ্যিক রূপবিশিষ্টতায় তৃপ্তিদায়ক ছিল না; যা এক শ বছর পূর্বে কুতুবউদ্দিন এদেশীয় কারিগর দ্বারা মসজিদের খিলান পর্দায় প্রাণরসের সঞ্চারণ ঘটিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে আলাই দরজার নকশার অভিনবত্ব ছিল অন্যভাবে; এর অনেক কিনারায় একই প্রকারের নকশালঙ্কার বারংবার প্রত্যাবর্তন করেছে এবং যা পরিষ্কাররূপে ভারতীয় উদ্ধৃতি বা নিষ্কর্ষণ ও প্রযুক্তি, প্রায়োগিক দিক হতে এটি ছিদ্রময় পথে আঁকা ছবির ন্যায় আরোপিত ছিল। কিন্তু এটি এত অভিনব কৌশলের সাথে প্রয়োগ করা হয়েছে যে এর স্বাভাবিকতায় প্রয়োজনীয় ও নির্দিষ্ট স্থানের উপযোগী বলেই মনে হয়েছে। এখানে ভারতীয় অলঙ্করণ আদর্শকে পরিপক্ব হাতের ছোঁয়ায় বাস্তবে রূপ লাভ করেছে।

আলাই দরওয়াজার তিনটি বহির্মুখ ইসলামি স্থাপত্য রীতির আদর্শে মোটামুটি সুসম্পন্ন হয়েছে। কিন্তু অভ্যন্তরীণ উত্তরের চতুর্থ পার্শ্ব হারিয়ে যাওয়া বা নিরুদ্দিষ্ট স্তম্ভশোভিত বারান্দায় সুস্পষ্ট ধর্মীয় গোঁড়ামি হতে প্রস্থানের আভাস লক্ষ করা যায়। এ সুনির্দিষ্ট প্রবেশপথের নকশা পরিকল্পনায় পরিষ্কারভাবে দেশীয় কারিগরের হস্তচিহ্ন পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এখানে সূক্ষ্মাগ্র খিলান ব্যবহার না করে অর্ধ-বৃত্তাকারের খিলান নির্মাণ করা হয়েছে এবং এর বহির্ভাগস্থ দেহরেখায় অগভীর ত্রিপত্র সংবলিত নকশা অঙ্কিত হয়েছে। এটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদনশীলতায় বিশদভাবে মন্দিরে ব্যবহৃত নকশা বৈশিষ্ট্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে অলঙ্কৃত।

আলাই দরওয়াজার বহির্গাত্রের সূক্ষ্ম শিল্প নিদর্শনগুলো অধিক তথ্যবহুল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। বাইরে থেকে এ ইমারতের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করলে লাল বেলে-পাথরের অবয়বের মাঝখান দিয়ে শ্বেতমর্মরের বেল্ট বা ডোরা ঘুরানো অবস্থায় দেখা যাবে। ভিত্তিমূল উঁচু বলে দীর্ঘ সোপান ধাপ অতিক্রম করে উপরে উঠে কক্ষের মেঝেতে পৌঁছতে হয়। তা ছাড়া উঁচু ভিটির খাড়াধার খুব সুচারু, মার্জিত ও সারিবদ্ধভাবে পাথর খোদাই করে বিভিন্ন নকশা অঙ্কিত হয়েছে, এ নকশা পরিকল্পনার নাম সায়মা। বক্রাকারে এ খোদাই কার্য আবার ক্যাভেটো (cavetto) নামেও পরিচিত। কলসির মুখ উল্টিয়ে মাটিতে রাখলে যেরূপ দেখা যায়; তখন কলসির গলাকে সায়মা-রেক্টা এবং মোটা পেটকে সায়মা-রিভার্সা মনে করা যেতে পারে।[৩] মেঝে হতে ছাদ পর্যন্ত একতলা বিশিষ্ট এ ইমারতকে দ্বিতল আকৃতি প্রদানের জন্য লাল বেলে পাথরের স্ফীত আলঙ্কারিক বন্ধনী দ্বারা বিভক্ত করা হয়েছে এবং অতি নিখুঁতভাবে আয়তাকার লাল বেলে পাথরের খোপগুলো অনুরূপ আকারবিশিষ্ট শ্বেতমর্মর প্যানেলে শোভিত রয়েছে। এ অলঙ্করণ পদ্ধতি ওপাস-সেক্টাইল (opus-sectile) নামে পরিচিত।

এ পদ্ধতির ব্যবহার ভারতীয় স্থাপত্যে এর পূর্বে দেখা যায় নি। পরবর্তীকালে এদেশের স্থাপত্য অনুশীলনে এর ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অন্যপক্ষে খিলান চাপের বাইর দিয়ে শ্বেতমর্মর গাত্র খোদাই বা কেটে সারিবদ্ধ উৎকীর্ণ লিপিমালা ও সামান্য ভিতর জুড়ে বর্শাফলক ভারতীয় ইসলামি স্থাপত্যে একটা নতুন নকশালঙ্কারের সংযোজন ছিল। এটি

পরবর্তীকালে এদেশের স্থাপত্য নির্মাণ কাজে ব্যবহার হতে দেখা গিয়েছে। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের সমাধিসৌধের দরজায় এ পদ্ধতির নির্মাণকার্য দৃষ্ট হয়। তা ছাড়া প্রাদেশিক স্থাপত্য নির্মাণেও এ রীতি অনুসৃত হয়েছে। জৌনপুরের এবং বাংলাদেশের ছোটসোনা মসজিদে এর ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

আলাই দরওয়াজার অভ্যন্তরীণ অংশ বাইরের অংশের চেয়ে স্থাপত্য কলাকৌশলের অনেক রহস্য কৌতূহলী মানুষের জন্য জমা করে রেখেছে। এর গম্বুজ ছাদ যে বৈজ্ঞানিক রীতিতে নির্মিত হয়েছিল ঠিক সে রীতিতেই খিলানগুলো নির্মিত হয়েছিল। ইমারতের অন্যান্য অংশের মতোই খিলানগুলো নির্মাণেও ভূঁসোয়া পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এ নির্মাণ যেভাবে সম্পন্ন হয়েছিল তা পরমোৎকৃষ্ট। বাইরের ন্যায় ভিতরেও প্রত্যেক কোনায় কুলঙ্গি খিলান (alcove vault) দ্বারা একাধিক ক্রমহ্রাসমান ধাপ বা তল সৃষ্টি করে গম্বুজের নিম্নাংশের ফাঁকা স্থান পূরণ করা হয়েছে। মূলত এটি স্কুইঞ্চ (squınch) খিলান পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে অভ্যান্তর দেয়াল গাত্রস্থ কুলঙ্গি একটার মধ্যে আর একটা নির্মাণ করে ভারবহনের প্রক্রিয়া সৃষ্টি করা হয়। ফলে এ ভারবাহী বেড়টির সাহায্যে পর্যায়ক্রমে বর্গাকার বা আয়তাকার ক্ষেত্র অষ্টভুজে রূপান্তরিত হয়। পর্যায়ক্রমিক নির্মাণের ফলে বেড়টি সর্পফণাকৃতি রূপ পরিগ্রহ করে (চিত্র নং-১১)।

মধ্যপ্রান্তে অবস্থিত বিরাট দবজার উভয় পার্শ্বে জানালা অবস্থিত। উক্ত জানালার উপরের দিকে আর এক প্রস্থ জানালার স্থলে সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ এবং কতকটা কুলঙ্গি বা তাকেব অনুরূপে রচিত। নিচের জানালা; দুটি করে দবজার দুপার্শ্বে মোট চারটি যা পাথবের জালি বা জাফরি দ্বারা সজ্জিত। এটি লাল বেলে পাথর ও শ্বেতমর্মরের সংমিশ্রণে গঠিত। এর উপরে আরব্য নকশালঙ্কার ও সৌন্দর্যবর্ধক খোদাই লিপিমালা প্রয়োগে সুশোভিত। মোট কথা আলাই দরওয়াজা সামগ্রিকভাবে অতি কমনীয় সৌন্দর্যবোধ, চিরন্তনী গুণাবলীসম্পন্ন ও শিল্পবোধের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শনরূপে কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

দিল্লির দ্বিতীয় নগরী সিরি :

সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জী দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করার পর সবচেয়ে যে ভয়াবহ ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা হচ্ছে মোঙ্গল আক্রমণেব সম্ভাবনা এবং এরই নিরিখে স্বীয় রাজধানী দুর্ভেদ্য করে নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। মূলত মামলুক সুলতানদের রাজধানী কিলা-ই-রাঁও পিথাউরা বা লালকোট এলাকা নিয়ে গঠিত যা ছিল দিল্লির প্রথম নগরী। কিন্তু দিল্লির দ্বিতীয় নগরী সিরি সম্পূর্ণভাবে মুসলিম আদর্শে গড়ে তোলা হয়েছিল। অবশ্য এরপরেও দিল্লির আশেপাশে আর পাঁচটি শহর গড়ে উঠেছিল।

এ শহরের প্রাচীরের সামান্য অংশ জরাজীর্ণরূপে বিদ্যমান এবং অবশিষ্টাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়ে অতীতের গৌরব স্মৃতি বহন করছে। যেটুকু টিকে রয়েছে তার সাহায্যে এর প্রকৃত স্বরূপের একটা অস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। শহরটি পাশাপাশি দেয়াল গেঁথে (দ্বিজ দেয়াল) সুরক্ষিত করা হয়েছিল। এর মধ্য দিয়ে গুপ্তপথের ব্যবস্থা ছিল এবং প্রাচীরের বপ্রে তীর নিক্ষেপ করার ছিদ্র সংযুক্ত ছিল; আক্রান্ত হলে শত্রু মোকাবিলা করাব ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

এ দুর্গ প্রাকার নির্মাণে দুটি নতুন বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় যা ভারতে ইতঃপূর্বে ছিল না। একটি হচ্ছে সুরঙ্গ পথে দুর্গ নগরীর শীর্ষে আরোহণ করে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ করা, অন্যটি তাদের প্রতি তীর, গোলা বা অনুরূপ মারাত্মক দ্রব্য নিক্ষেপ করার ব্যবস্থা। এ বর্ধিষ্ণু শহরটি

ধীরে ধীরে এর গুরুত্ব হারাতে থাকে। ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে লোদী বংশের দ্বিতীয় সুলতান সিকান্দার লোদী দিল্লি হতে রাজধানী আগ্রায় স্থানান্তর করার সাথে সাথে এর গুরুত্বলোপ পায়। ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে শেরশাহ্ মোগল সম্রাট হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লির সিংহাসন দখল করার পর দুর্গ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং আলাউদ্দিন কর্তৃক নির্মিত সিরি নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে মালমসলা সংগ্রহ করেন। ফলে এ শহরটি বিরান ভূমিতে পরিণত হয়।

জামাতখানা মসজিদ :

সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর রাজত্বের শেষের দিকে সে যুগের বিখ্যাত সাধক হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজারের পার্শ্বে জামাতখানা মসজিদটি নির্মিত হয়। ভারতে হয়তো এটিই প্রথম মসজিদ যা হিন্দু অট্টালিকা হতে সংগৃহীত মালমসলা ছাড়াই একান্তভাবে মসজিদ নির্মাণ মানসে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করার পর নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছিল। এটি আদি মসজিদ নকশার সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্মিত। লাল বেলে পাথরের তৈরি এ মসজিদটি তিনটি কক্ষে বিভক্ত; মাঝখানের কক্ষটি বর্গাকার ও উভয় পার্শ্বের কক্ষদ্বয় আয়তাকার। ফাসাদের বা সম্মুখভাগের প্রত্যেকটি খিলানকৃত প্রবেশদ্বার প্রশস্তভাবে নির্মিত। তিনটি প্রধান প্রবেশপথের সাথে আবার দুটি অনুরূপ ছোট প্রবেশপথ, বড় দুটির ঠিক মাঝখানে একটি করে অবস্থান করছে এবং ঐগুলো উপরে ফ্রেমের (খোপ) আকারে এক বন্ধনী রেখায় পবিত্র কুরআনের বাণী উৎকীর্ণ এবং খোদাই করে তৎসহ পদ্ম ফুলের অভিনব গাত্রালঙ্কার দ্বারা সৌকর্য বর্ধন করা হয়েছে। খিলানের তলার দিকে বর্শা ফলকের অলঙ্করণ ঠিক আলাই দরওয়াজার মতোই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক।

মসজিদের অভ্যন্তরে নকশা পরিকল্পনায় (design) আলাই দরওয়াজা মিলনায়তনের অনুরূপই। কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠটির প্রতিপার্শ্বের পরিমাপ ১১.৬০ মি. (৩৮ ফুট)। গম্বুজের ভার কোনায় অবস্থিত অর্ধ-গম্বুজাকৃতির স্কুইঞ্চ খিলান বহন করছে। আলাই দরওয়াজার পদ্ধতির মতোই এ গম্বুজের ভিতরের দিকের গোড়ায় আটটি ছোট কুলঙ্গি রয়েছে যার মধ্যে চারটি বদ্ধ, আর চারটি দেয়ালের গাঁথুনিরূপে পুরু অবস্থায় অনুপ্রবিষ্ট হয়ে এর সাথে মিশে গিয়েছে। পার্শ্বস্থিত কক্ষ দুটি এর মধ্যখানে দ্বিজ খিলান দ্বারা বিভক্ত হযেছে এবং গম্বুজ ছাদরূপে শোভা পাচ্ছে।

কেন্দ্রস্থ কক্ষের উভয় পার্শ্বে অবস্থিত দুটি ছোট কক্ষের দেয়াল আস্তরকৃত ভগ্ন বেলে-পাথরে নির্মিত এবং মাঝখানেরটি বেলে-পাথরের গোটা গোটা সাইজ করা মাপসই খণ্ডে তৈরি। পার্শ্ববর্তী কক্ষদ্বয়ের গম্বুজের ভার ত্রিকোণ পান্দানতিফ্ পদ্ধতিতে (triangular-pendentive) তৈরি খিলান বহন করছে, গম্বুজার্ধ খিলানের সাহায্যে নয়। পি. ব্রাউনের মতে[৪] এ মসজিদের উন্নয়নের প্রেক্ষাপটে প্রতীয়মান হয় যে আলাই দরওয়াজায় ব্যবহৃত স্থাপত্যিক পদ্ধতির চেয়ে দু-একটি বৈশিষ্ট্যে অগ্রগামিতা অর্জিত হয়েছে, যেমন-মধ্যবর্তীতলা বা ট্রাইফরিয়াম (triforium) যা মিলনায়তনের দেয়াল ও গম্বুজের ভূমিতে আরোপিত। মসজিদের অভ্যন্তরে অনেক শিক্ষামূলক তথ্যের নিদর্শন রয়েছে। বাস্তবে এ দু'টি স্থাপত্যকর্মের গঠনমূলক বৈশিষ্ট্যের খুব বিভিন্নতা না থাকলেও পরেরটির তথ্যকথা সুবিধাজনকভাবে উচ্চারিত হয়ে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে পদ্ধতির বৈসাদৃশ্যতা ও পরিবর্তনশীলতার আভাস লক্ষ করা গেলেও এদের নির্মাণ কাজে সময়ের ব্যবধান ছিল প্রায় একযুগ। তবে এ কথা ঠিক যে আলাই দরওয়াজা নির্মাণের মধ্য দিয়ে স্থাপত্য কার্যক্রমে

পদ্ধতিগত যে অগ্রগতি এসেছিল তা এ মসজিদের নির্মাণে স্থবির হয়ে পড়ে। খল্‌জী স্থাপত্যের প্রাথমিক যুগে যে প্রবল কর্মশক্তি ছিল মসজিদ নির্মাণকালে তা দৃষ্ট হয় নি। দেশীয় কারিগর দ্বারা কর্ম নিষ্পন্নের কারণে সম্ভবত এ ধরনের ক্রমাবনতি। সুতরাং এটি অনুমানসাপেক্ষ যে বিশেষজ্ঞ দল ও কারিগরবৃন্দ আলাই দরওয়াজার নকশা প্রস্তুত ও কর্মসম্পাদনে নিয়োজিত হয়েছিল জামাতখানা মসজিদ নির্মাণের সময় হয়তো বা তাদেরকে পাওয়া যায় নি অথবা যাদেরকে মসজিদের কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল তারা আলাই দরওয়াজার প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কৌশল ও পদ্ধতি সম্পর্কে ছিল অজ্ঞাত।

মসজিদের খিলানগুলোর আকারত্ব ও আলাই দরওয়াজার খিলান নির্মাণ দক্ষতার তুলনা করলেও শিল্প সাধনার অবনতি উপলব্ধি করা যায়। এখানে অশ্বখুবাকৃতি খিলানে যে আদি বক্রতা অর্জিত হয়েছিল তা হ্রাস পেয়েছে। খিলানের যে স্থানে বক্রতা শুরু হয় সে উত্থান বিন্দুতেই খিলানের আকার চেপ্টা হয়ে গিয়েছে; আর খিলানের মাঝের উঁচু বিন্দু বা মুকুট বিন্দুতে (crown) এস (s) এর আকার ধারণ করেছে। সুতরাং এটি নিঃসন্দেহে বলা যায় যে জামাতখানা মসজিদের খিলান এ দেশীয় কারিগর দ্বারা দেশীয় প্রভাবে নির্মিত।

বস্তুত এ মসজিদের নির্মাণকার্য সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর সময় শুরু হলেও তৎপুত্র খিজির খান খল্‌জীর সময় সম্পন্ন হয়েছিল। তিনি মসজিদটিকে শেখ নিজামউদ্দিন আউলিয়ার মাজাররূপে নির্মাণ করেছিলেন, মসজিদ হিসেবে নয়। তখন এর কেন্দ্রীয় কক্ষটি ছিল মাত্র। পরবর্তীকালে তোঘলক যুগ শুরু হওয়ার প্রথম লগ্নে যখন একে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয় তখনই পার্শ্ব কক্ষ দুটি এর সাথে সংযুক্ত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এ মসজিদেব আরো পরিবর্তন ও সম্প্রসারণ ঘটেছিল। মোগল সম্রাট আকবর এর বর্তমান রূপটি দিয়েছিলেন। মসজিদ গাত্রে বিশেষ কতকগুলো স্থাপত্যিক নিদর্শনের কথা বিবেচনা করে বলা চলে যে, মোগল স্থাপত্য উৎকর্ষতার স্মৃতিচিহ্ন এটি ধারণ করে রয়েছে। পার্শ্ববর্তী কক্ষদ্বয়েব অলঙ্করণ কার্য, কেন্দ্রীয় কক্ষের অভ্যন্তবে চিত্রিত সৌন্দর্যালঙ্কার ইত্যাদি মোগল স্থাপত্যের বলিষ্ঠ উদাহরণ। পার্শ্ব পর্দার স্থাপত্যকর্মেব নমুনাটি মসজিদ নির্মাণের অনেক পরের তা প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। এ পর্দা নির্মাণের কৌশল এমনভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে যে কোনোভাবেই বুঝা যায় না এটি অনেক পরের, অথচ এটি পূর্বের অনুকরণে নির্মাণ করা হয়েছে। মনে হয় শিল্পচাতুর্যের নিপুণতা এ সৃষ্টির ভ্রমকে কুণ্ঠিতচিত্তে ম্লান করে দিতে সহায়তা করেছে। পুরাতন গাত্রালঙ্কার বা অন্য বহির্সৌন্দর্যালঙ্কারকে এমন নিখুঁতভাবে অনুকরণ করে পুরাতনের সাথে নতুনকে মিশে দেয়া হয়েছে যে, মসজিদের কোনো অংশ পুরাতন বা নতুন সাধারণ মানুষের পক্ষে পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ। নিখুঁত শিল্পের এখানেই সার্থকতা ও যথার্থতা (চিত্র নং-১২)।

আলাউদ্দিন খল্‌জীর অন্যান্য স্থাপত্যকর্ম :

কুতুব এলাকার পশ্চিম কোণের বাইরে কিছু ভাঙাচোরা স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। এগুলো খল্‌জীদের সময় নির্মিত হয়েছিল। এ স্থাপত্য কীর্তিগুলো বর্তমানে এমনভাবে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে যে পদ্ধতিগত উন্নয়ন বা ঐতিহাসিক তথ্য অনুমান করা কঠিন। তবে এগুলো অবলোকন করে ধারণা করা যায় যে উদ্যমশীল সুলতান যথেষ্ট স্থাপত্য অনুরাগী ছিলেন। তাঁর স্থাপত্য কাঠামো ও বৈশিষ্ট্য, ছাদের ভার বহন কৌশল, গম্বুজের নিমাণ পদ্ধতি ইত্যাদি সম্পর্কে নানা যুক্তিযুক্ততা ও উপযোগিতা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এ ধ্বংসপ্রাপ্ত স্থাপত্যকর্মগুলোতে ক্রমপূরণ রীতিতে দোলায়মান খিলানের উপস্থিতি লক্ষ

করা যায় যা আদিতে ইট দ্বারা নির্মাণ কৌশল হতে গৃহীত হয়েছিল। এটি স্কুইঞ্চ পদ্ধতির সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। এগুলো দেখে অনুমান করা যায় যে, স্থাপত্য অনুশীলনের অবনতির পথ রচিত হয়েছিল, অর্জিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া থেমে গিয়েছিল।

মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে যে স্থাপত্যকীর্তি বিদ্যমান তা খল্‌জী স্থাপত্যরূপে চিনতে অসুবিধা হয় না। খল্‌জী স্থাপত্যের কিছু কিছু নিদর্শন এ ইমারতে এখনো বিধৃত হয়ে আছে। এটি সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর মাদ্রাসা বা মহাবিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত। জ্ঞানের দ্বীপশিখা প্রজ্বলিত করার রাজকীয় প্রচেষ্টার অমোঘ নিদর্শন ভারতে এটিই সর্বপ্রথম। প্রস্তর নির্মিত বিদ্যাপাদপীঠ যা এককালে ছাত্রদের কলকণ্ঠে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে রাখত তা কালের কপোলতলে স্তিমিত হয়ে আজ এক বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এরই একটি কক্ষে কীর্তিমান পুরুষ সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জী চিরনিদ্রায় নিদ্রিত।

সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর নির্মাণ প্রকল্প কেবলমাত্র দিল্লিতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রাজধানীর বাইরেও তার নির্মাণ পরিকল্পনা সম্প্রসারিত হয়েছিল। ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে রাজপুতানার চিতোর দুর্গ অধিকার করার পর তিনি গামব্রী নদীর উপর একটি সেতু নির্মাণ করেন। দুঃখের বিষয় এর প্রধান স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সংবলিত আকৃতি বর্তমানে লুপ্তপ্রায়। এর প্রধান স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হল দু প্রান্তের প্রবেশপথ ও তৎসংলগ্ন বুরুজ। তা ছাড়া দশটি ধূসর চুনাপাথরের নির্মিত ভারী খিলান কালের সাক্ষী হয়ে আজো টিকে রয়েছে। এগুলো সেকালের স্থপতিদের পদ্ধতি ও কৌশলপূর্ণ কর্মপরিকল্পনাকে বিংশ শতাব্দীতেও স্মৃতিবহ করে রেখেছে।

অন্য একটি স্থাপত্যকর্ম হচ্ছে রাজপুতানার ভরতপুর রাজ্যের বিয়ানা শহরের উখা মসজিদ (ukha masjid) নির্মাণ প্রকল্প (মতান্তরে সংস্কাব)। এটি আলাউদ্দিন খল্‌জীর পরবর্তী সুলতান কুতুবউদ্দিন মোবারক খল্‌জী ১৩১৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ করেন। প্রকৃতরূপে এ মসজিদটি দিল্লির রাজকীয় প্রভাবের চেয়ে প্রাদেশিক প্রভাবযুক্ত হয়েছে বলে মনে হয়। এর গঠন ও কর্মনিষ্পন্নের প্রকৃতি অবলোকনে বুঝা যায় যে, স্থানীয় কারিগরগণ এটি নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য দিল্লির কোনো রাজকীয় দক্ষ স্থপতি এর তত্ত্বাবধান কাজে নিয়োজিত ছিলেন। এর খিলানের আকার আদি কীল খিলান (keel) বা অশ্বখুরাকৃতি পদ্ধতির অনুরূপ সুঠাম বক্রতা অর্জিত হয় নি। বর্শা ফলকের নকশালঙ্কার প্রয়োগ হয়েছে সত্যি; কিন্তু পূর্বের সে নৈপুণ্যতা এখানে আনয়ন করতে পারে নি। কাজেই বলা চলে সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর অধীনে স্থাপত্যকর্মের যে মান অর্জিত হয়েছিল তা বংশের সমাপ্তি লগ্নে হ্রাস পেয়েছিল।

সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর স্থাপত্যশিল্প সাধনার বিষয়ে সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করেছিলেন তা হতেও আমরা অনেক কিছু জানতে পারি। এ প্রসঙ্গে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভাষ্যকার জিয়াউদ্দিন বারানি খাজা-ইন-উল্-ফুতুহ (Khaza-in-il-Futuh) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে,[৫] 'সুলতান নির্মাণ প্রকল্প সুসমাপ্ত করার নিমিত্তে ৭০,০০০ (সত্তর হাজার) কারিগর, শ্রমিক ইত্যাদি ব্যক্তিকে নিযুক্ত করতেন এবং একটি রাজপ্রাসাদ দু-তিনদিনের মধ্যে সমাপ্ত করতেন।' বারানির এরূপ বর্ণনা হতে সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর স্থাপত্য প্রেরণা ও এর রূপায়ণে তাঁর মানসিক সজীবতার পরিচয় পাওয়া যায়।

কিরান-উস-সাদাইন[৬] ও মুরাত-উল-কামালে খসরু কিলোর বীর মনোজ্ঞ ও ঐশ্বর্যময়ী প্রাসাদের স্তুতিপূর্ণ গজল রচনা সুলতানকে স্থাপত্য প্রসঙ্গ অমরত্ব দান করেছে। মধ্যযুগীয় লেখকগণ বাস্তব ঘটনার সাথে কাল্পনিক ঘটনা যোগ করে বর্ণনা দিয়ে থাকেন, অনেক সময়

ভাষার প্রয়োগে প্রকৃত ঘটনাই চাপা পড়ে যায়, তবুও এ থেকে প্রকৃত ঘটনার পাঠোদ্ধার করলেও ঐতিহাসিকভাবে সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর স্থাপত্য অনুশীলনের পরিকল্পনার কথা সর্বজনস্বীকৃত।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. A header is a brick laid so that the end only appears on the face of the wall, while a stretcher is a brick laid so that the side only appears on the face of the wall, cf ডি. ইথার্টন, *দি পেঙ্গুইন ডিক্‌শনারি অব আর্কিটেকচার*, লন্ডন, ১৯৬৭, পৃ. ৩৮।

২. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ১৭।

৩. In the Cyma-Recta, or ogee moulding, the upper part is concave and the lower convex, In the Cyma Reversa or Reversa ogee, the upper part is convex and the lower concave, দেখুন : জে. হারিস এন্ড জে. লিভার, *ইলাস্ট্রেড গ্লোসারি অব আর্কিটেকচার*, লন্ডন, ১৯৬৬, পৃ. ২১।

৪. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৯।

পঞ্চম অধ্যায়

তোঘলক স্থাপত্য

(১৩২০-১৪১৩ খ্রি.)

তোঘলক বংশের রাজত্বকাল ১৩২০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে ১৪১৩ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল এবং এ বংশের মোট এগার জন সুলতান সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। তন্মধ্যে মাত্র তিন জন সুলতানের স্থাপত্যচর্চার সাথে সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়। এরা হলেন—সুলতান গিয়াসউদ্দিন তোঘলক (১৩২০-২৫ খ্রি.), মোহাম্মদ বিন তোঘলক (১৩২৫-১৩৫১ খ্রি.) এবং ফিরোজ শাহ্ তোঘলক (১৩৫১-১৩৮৮ খ্রি.)।

তোঘলকাবাদ :

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তোঘলক ১৩২০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৩২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাত্র পাঁচ বছর দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাজনীতিবিদ অপেক্ষা বেশি সমরবিদ ছিলেন এবং তাঁর এ মনোভাব স্থাপত্যকর্মের মাঝে রূপায়িত হতে দেখা যায়। তাঁব স্থাপত্যকর্ম দিল্লির তৃতীয় নগর তোঘলকাবাদ নির্মাণের মাঝেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল।

এখন তোঘলকাবাদের ভীষণ শূন্যতা ও অসহায়তা আমাদের মনকে বিষণ্ন ও হতবাক করে দেয়। সমসাময়িককালের বিশ্ববিখ্যাত পরিব্রাজক ইবনে বতুতার বর্ণনায় এ শহরের চিত্র যে ভাষায় চিত্রিত হয়েছে তা বিশ্বাস করা কষ্টকর। তাঁর বর্ণনায়[১] এখানেই রাজ্যের অগণিত সম্পদ সঞ্চিত হত, বিরাট স্বর্ণপ্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল, যখন সূর্যের কিরণমালা এর উপর পতিত হত তখন প্রাসাদটি ঝলমল করে উঠত। কিন্তু আজ আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। আজকের বিরাট ধ্বংসাবশেষের মাঝে সেরূপ চিত্র দৃষ্ট হয় না। এর অলঙ্কৃত চারিত্রিক ভূষণ বুঝতে সুযোগ দেয় এবং স্মরণ করে দেয় যে নগর নির্মাণ প্রকল্প অতিদ্রুততার সাথে জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য সাদামাটাভাবে নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য মোঙ্গল আক্রমণের বিভীষিকায় একটি ভারী মোটা প্রাচীর বেষ্টিত নগর গড়ার পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল বলে মনে হয়, যার ফলে স্থাপত্যের সঠিক সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটাব কোনো সুযোগ পায় নি।

তোঘলকাবাদ নগর একাধিক অংশ নিয়ে গঠিত ছিল। এটি ছিল নগর দুর্গ ও রাজপ্রাসাদের একটি যৌগিক নির্মাণ কার্যক্রম। যুগের প্রয়োজনে আবাসিক এলাকার পার্শ্বেই সামরিক এলাকা গড়ে উঠেছিল। অবশ্য সুলতানের সমাধিসৌধটি এর অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছিল। দুর্গ নগরায়ন পরবর্তীকালে ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য আদর্শরূপে প্রচলিত

হয়েছিল এবং পারস্য প্রভাবযুক্ত স্থাপত্য আদর্শ মোগলদের দ্বারা চর্চিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত প্রায় দু শ বছর এটি অব্যাহত ছিল।

পি. ব্রাউন বর্ণনা দিয়েছেন যে তোঘলকাবাদ নগরটি রোমান ঢঙে বা কায়দায় নির্মিত। এর দুঅংশের মধ্যে দুর্গ অংশটি ইউরোপীয় রাজাদের সুরক্ষিত দুর্গ প্রাসাদের অনুরূপই ছিল এবং অবশিষ্টাংশ নগর। নগর প্রাকার বাইর ও ভিতর দুটি আলাদা দেয়াল গেঁথে তোলা হয়েছে। বাইরের দেয়াল ক্রমঢালু ছিল এবং দেয়াল দুটি আলাদা আলাদা থাকলেও পরস্পর সংযুক্ত ছিল।

ঐতিহাসিক তথ্যানুসারে বলা যায় যে ক্রুসেড যুদ্ধ পর্যন্ত নতুন কোনো পদ্ধতির সৃষ্টি না হওয়ায় এভাবেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ইউরোপ ও পশ্চিম এশিয়ায় চালু ছিল। অবশ্য এ প্রথা দশম শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। রোমান প্রকৌশলীদের পদ্ধতি তাদের সাম্রাজ্যের সীমানা ছাড়িয়ে গিয়েছিল; এর সঙ্গে আরবদের শিবির নগরের (camp-city) একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পাওয়া যায়।[২]

প্রাচীনকালে প্রতিরক্ষার জন্য দুর্গ প্রাকার নির্মাণে রোদে শুকানো ইট ব্যবহার করা হত; যার গাঁথুনি নিচ হতে ক্রমঢালু হয়ে উপরে উঠে যেত। সুরক্ষিত প্রস্তর দেয়াল টাওয়ারসহ নির্মিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু ছিল। প্রাচীরাদি মজবুত করার জন্য মাঝে মাঝে বুরুজ সংযুক্ত হতো এবং বুরুজ গুলোব সমতল পীঠে যুদ্ধাস্ত্র রাখার ব্যবস্থা থাকতো।

তোঘলকাবাদের ভূমি নকশায় প্রতীয়মান হয় যে এটি অনিয়মিত উঁচুনিচু অসমান সীমানা রেখায় গঠিত ছিল। অবশ্য এর জন্যই ভূ-স্তরের আকৃতি-প্রকৃতি বা ভূমির উপরিভাগের অসমতাই দায়ী বলে বিবেচনা করা যায়। পাহাড়ি অসমতল জমির কারণে মোটামুটি একটি সমান্তরাল ক্ষেত্র নিয়ে এটি গঠিত হয়েছিল। তোঘলকাবাদেব প্রতি পার্শ্ব ২ কি.মি. (২২০০ গজের) কাছাকাছি এবং চতুর্দিকের পরিসীমা ৬.৪৪ কি.মি. (৪ মাইলের) উপরে ছিল। দুর্গের প্রবেশদ্বারে উপদুর্গের মতো বহির্দেয়াল সংলগ্ন প্রহরীদেব চৌকি এবং প্রত্যেক কোণে স্থূলাকার বুরুজ ছিল। বুরুজগুলো দেখতে বৃত্তাকার এবং কোথাও কোথাও এটি দু তলার সমান উঁচু করে নির্মিত (চিত্র নং- ১৩)।

দুর্গ প্রাকারের বহির্দেয়ালের ঢালুতাব সাথে সঙ্গতি রেখে শীর্ষদেশের বপ্রে ছিল চার সারি শরছিদ্র এবং এর সঙ্গে সংযুক্ত ছিল আচ্ছাদনযুক্ত দুটি এবং আচ্ছাদন বিহীন একটি গ্যালারি। সমসাময়িককালে লিখিত নথিপত্র হতে অবগত হওয়া যায় যে আবেষ্টনী প্রাচীরগাত্রে ছিল ৫২টি ফটক (gate ways)।[৩] এগুলোর অধিকাংশই বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত। কথিত আছে যে দক্ষিণ পার্শ্বের টাওয়ার সংলগ্ন দু প্রাচীরের মধ্য দিয়ে প্রশস্ত হস্তী পথের ব্যবস্থা ছিল। এরূপে একটি নগর সুরক্ষার চিত্র প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে। নগরের প্রাচীরের প্রতিটি অংশ অ্যাসলার গ্রানাইট (ashlar granite) জোড়া দিয়ে গেঁথে তোলা হয়েছে। নগর প্রাকারের মূলভিত্তি (lay-out) ভেঙে চুরে এমনভাবে একাকার হয়ে গিয়েছে যে আজ আর তা অনুধাবন করা কোনোভাবেই সম্ভব নয় যে এটি আসলে কত সুন্দর ছিল। পি. ব্রাউন বর্ণনা দিয়েছেন যে নগর দুর্গের অংশটুকু যা সর্বোচ্চতা বিশিষ্ট এবং অন্যান্য অংশের উপর প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল তা পরিখাবেষ্টিত ছিল যার কিছু কিছু অংশ এখনো দৃষ্টিগোচর হয়। এ অংশটুকু দুর্গ ও রাজপ্রাসাদ সম্মিলিতভাবে এবং দুটির মধ্যে বেড়া দিয়ে আলাদা করা ছিল। দুর্গাংশে বোমার আঘাত হতে আত্মরক্ষা করতে সক্ষম ছাদওয়ালা কক্ষ, কামান স্থাপনার্থে প্রাচীরগাত্রে ছিদ্রযুক্ত গ্যালারি এবং পরের অংশে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরে জানানা মহল এবং দর্শনার্থীদের সাক্ষাৎগৃহ বা হলঘর, যার কিছু কিছু কক্ষ কাঠের বিম বা বর্গার

সাহায্যে ছাদ দেয়া ছিল। মাটির নিচে দীর্ঘ করিডোর ও ঘর ছিল, যার দরজা বহির্দিকে উন্মুক্ত ছিল। এর সাহায্যে দুর্গ হতে বিপদে গোপনে নিষ্ক্রান্ত হওয়া যেত। তুলনামূলকভাবে সামান্য হলেও এর সাহায্যে দুর্গের অভ্যন্তরের সাথে বাইরের যোগাযোগ গোপনে আপদকালে রক্ষিত হত। দুর্গাংশ এরূপ স্থাপত্য সৃষ্টি সে যুগের নির্মাণ কাজে বিশেষ একটি প্রযুক্তি চরিত্রগত শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছিল বলে ধারণা করা যায়। সুলতান গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের মাকবারাটি এ তোঘলকাবাদ নগরের সাথে অনুরূপ একটি উঁচু সরু রাস্তার দ্বারা ছিল সংযুক্ত। জন মার্শালের বিবরণ থেকেও তোঘলকাবাদ নগরীর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়[৪]।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের সমাধি :

সুলতান গিয়াস উদ্দিন তোঘলকের দুর্গ নগরী তোঘলকাবাদ কালক্রমে ধ্বংস হয়ে গেলেও তার সমাধিসৌধ প্রায় সম্পূর্ণভাবে অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এতে বিস্ময়ের কিছু নেই হয়তোবা এর স্থাপত্যিক কার্যক্রম ও মালমসলার সাথে অন্যান্য উপকরণাদি অপেক্ষাকৃত উন্নতমানের ছিল। তা ছাড়া সুলতানের অন্তিম ইচ্ছার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে এটি সংরক্ষণের ব্যবস্থা পরবর্তী শাসকগণ গ্রহণ করেছিলেন বলে মনে হয়।

মূলত এটি একটি কৃত্রিম হ্রদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং আড়াই শ গজ দীর্ঘ উঁচু সরু বাঁধানো বাস্তার দ্বারা মূল দুর্গ শহর তোঘলকাবাদেব সাথে সংযুক্ত। একে একটি স্বতন্ত্র দুর্গের আকারে নির্মাণ করা হয়েছে। এটি অসম্ভব নয় যে দুর্গ নগরের পশ্চাৎ বাহির্দিকে প্রহরার কাজের জন্য বাইরের দিকে প্রসারিত অংশে তোরণ নির্মাণের অভিপ্রায় এতে মিশে ছিল। এ মাকবারা নির্মাতাদের মনে হয়তো মামলুকদের সমাধিসৌধ সুলতান ঘারীর নির্মাণ আদর্শের কথা মনে হতে পারে; যাতে এবাদতের জন্য মসজিদ ও প্রতিবক্ষার জন্য দুর্গ প্রাকারের পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সমসাময়িককালে দেশের অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিরিখে নির্মাতাদের অবচেতন মনের ওপর সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রলেপ যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তার বহিঃপ্রকাশ অনুসারে এর নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন হয়েছিল। এর প্রবেশদ্বার স্বাভাবিক সৌষ্ঠবময় মনে হলেও এব নির্মাণ কৌশলে এমন বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ সাধিত হয়েছে যে কেউ বলপ্রয়োগে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করলে তার নিকট এটি মৃত্যুফাঁদরূপে দেখা দিতে পারত। মাকবারা প্রাঙ্গণে মাটির নিচে আয়তাকার কঠিন শক্ত সমর্থ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয়েছিল যা দৃশ্যত মনে হত শবাধারের (mortuary chamber) সাথে এর কোনো সংযোগ নেই। কিন্তু এটি স্পষ্টত ধনরত্ন নিরাপদে রাখার দুর্ভেদ্য প্রকোষ্ঠ ছিল। হয়তো এ কারণেই ইবনে বতুতার বর্ণিত রাজধানী তোঘলকাবাদের সাথে বাস্তবে সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায়—'সেখানে তিনি (সুলতান) ধনরত্ন সঞ্চিত রাখতেন যার সাথে চৌবাচ্চা নির্মাণ করেছেন এবং এখানে গলিত স্বর্ণ ঢালা হত যাতে একক সোনার পিণ্ডে পরিণত হতে পারে।'

এ মাকবারার বহির্নকশার আকার অসমান বা অনিয়মিত পঞ্চভুজ এবং প্রতি কোণে প্রসারিত বুরুজ নির্মিত হয়েছিল। এ বুরুজগুলো একটি হতে অন্যটির দূরত্ব ৯১.৪৫ মি. (৩০০ ফুট) মধ্যে ছিল সীমাবদ্ধ। নকশা অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে একটি ছোট পাহাড়ি দ্বীপ বা টিলার উপর নির্মিত হওয়ার কারণেই এর অসাধারণ আকারত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে। অঙ্গনের বহির্সীমারেখাও অসুষম ও অপ্রতিসম আকৃতির। সমাধিসৌধটি তির্যকভাবে এর

বিস্তীর্ণ এলাকাব্যাপী প্রসারিত এবং মক্কাশরিফের সাথে সঙ্গতি রক্ষা করতে গিয়ে এর ভূমি নকশার অনুরূপ আকারত্ব প্রাপ্তি ঘটেছে বলে মনে হয় (ভমি নকশা নং- ৭)।
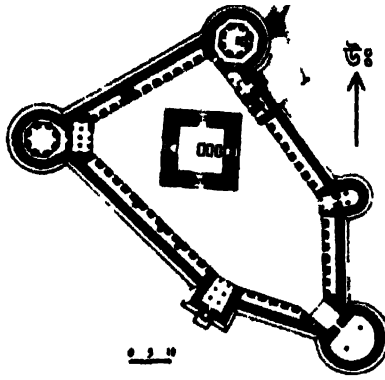
ভূমি নকশা নং-৭ সুলতান গিযাস উদ্দীন তোঘলকেব সমাধি

সমাধিসৌধেব অধিকাংশ স্থান লাল বেলে পাথব দ্বাবা নির্মিত। গম্বুজ ও মাঝে মধ্যে নকশালঙ্কার করার জন্য শ্বেতমর্মর ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এ নির্মাণ কাজেব সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এর বহির্দেয়ালের ঢালুতা। এটি ৭৫ ডিগ্রি কোণ উৎপন্ন করে পিরামিড অনুরূপ ঢালু হয়েছে। অন্যপক্ষে এর মূল ভিত্তিটি প্রতিপার্শ্বে ১৮.৬০ মি. (৬১ ফুট) এবং এর গম্বুজ চূড়াসমেত সৌধের উচ্চতা ২৪.৪০ মি. (৮০ ফুট)। প্রতি পার্শ্বের কেন্দ্রে পশ্চাদপসরণ অবস্থায় দীর্ঘ কৌণিক খিলান নির্মিত হয়েছে এবং তিন পার্শ্বে দেয়ালের মাঝখানে প্রবেশপথ, কিন্তু চতুর্থ বা পশ্চিম পার্শ্বের দেয়াল অভ্যন্তরে মিহরাব নির্মিত হওয়ায় ঐ দরজাটি বন্ধ অবস্থায় রয়েছে।

বহির্ভাগের কিছু অংশে এর পূর্বে নির্মিত আলাই দরওয়াজার নকশালঙ্কার বা কৌণিক খিলান নির্মাণ পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যগত কোনো পরিবর্তন লক্ষ করা যায় না; বরং বর্শাফলকের উপস্থিতি অটুট রয়েছে। কিন্তু অশ্বখুরাকৃতি খিলানের বহির্রেখায় টিউডর খিলানের আকৃতি ধারণ করায় শীর্ষে (crown) সামান্য বক্রতা ছাপ ফুটে উঠেছে। কিন্তু খিলানপথের প্রকৃত পার্থক্য ছিল এর আদি পদ্ধতিগত নির্মাণ প্রকম্পনে।

এখানে দুটি পদ্ধতি একসাথে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে। সর্দল বা চৌকাঠ (lintel) ঠিক খিলানের গোড়া দিয়ে বা খিলান যেখান হতে উত্থিত হয়েছে তার নিচ দিয়ে দেয়ালেব এপাশ-ওপাশ অতিক্রান্ত করানো হয়েছে। ফলে একই সাথে দুটি ভারবাহন খিলান ও কড়ি (arch + beam) প্রয়োগ এ সমাধিসৌধে ব্যবহৃত হয়েছে। এ সময়ের স্থাপত্য নির্মাণ প্রযুক্তিতে কড়ি ব্যবহারে পুনঃআগমনের ঘটনা দেশীয় কারিগরদের ঐতিহ্যবাহী পদ্ধতির সিদ্ধান্ত মনের অজ্ঞাতে টিকে রাখার প্রতি প্রলুব্ধ হওয়ার কথাই প্রকাশ করছে। অবশ্য এটিই প্রমাণ করছে যে দেশী কারিগরগণের মনে খিলানের কার্যকারিতা সম্পর্কে সঠিক কোনো ধারণা জন্মে নি। তাই তাদের মনে আবহমানকাল হতে সঞ্চিত ধ্যান-ধারণা কাজ করেছিল। ফলে তারা তৎপ্রচলিত রীতির সাথে তাদের সনাতনী রীতির প্রয়োগের মাধ্যমে সন্দেহ মোচন করেছিল। তা হলে দেখা যাচ্ছে যে এ সমাধিসৌধে দুটি পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছে—সর্দল

বা বর্গা হিন্দুরীতি এবং খিলাননির্ভর মুসলিম রীতি। ভারতীয় স্থাপত্যচর্চার ক্ষেত্রে উভয় পদ্ধতির এক মহাযৌগিক মিলন এভাবেই এখানে প্রত্যক্ষ করা যায়।

এর পিছনে যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন পরবর্তী সময়ে দুপদ্ধতির সংমিশ্রণ সময় সময় এদেশের স্থাপত্য অনুশীলনে দেখা গিয়েছে। পি. ব্রাউন একে নিয়মবিরুদ্ধ স্থাপত্য আদর্শ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। কেননা যখন এভাবে কোনো ভার আলম্বন ব্যবহার করা হয় তখন সর্দল বা বর্গা (beam) তার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। এ পর্যায়ে এটি তখন কেবলমাত্র আলঙ্কারিক উপকরণ হিসেবে মূল্য বহন করে থাকে। যাহোক সমর্থবান ভারতীয় কারিগরদের হাতে এটি একটি উল্লেখযোগ্য শিল্পজনোচিত উৎকর্ষ লাভ করেছিল। কড়ির (beam) শেষ প্রান্তের নিচে প্রলম্বিত আলম্ব (bracket) সংযোজন একটা পদ্ধতিরূপে পরবর্তী সময়ে ব্যবহারের প্রবণতা প্রবলভাবে চালু হয়েছিল।

সমাধিসৌধটি এক কক্ষবিশিষ্ট যা ৩০ ফুট বর্গাকার। এতে তিনটি উন্মুক্ত খিলানপথে আলো প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে। এর উপরে স্কুইঞ্চ খিলানের সাহায্যে নির্মিত হয়েছে এক খোলসবিশিষ্ট একটি গম্বুজ। কিন্তু এখানে অষ্টভুজ ও ষোড়শভুজের মধ্যে যে কোণেব সৃষ্টি হয়েছে এর উপর তিনখণ্ড পাথর আলম্বন হিসেবে অভিক্ষেপণ হয়েছে। এটি এ দেশের স্থাপত্য ক্রমবিকাশের ধারায় খিলান নিজেই গঠন আকৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছে। এ বৈশিষ্ট্য খিলানের আকারত্বে ও নির্মাণ কৌশলে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে। ভূঁসোয়া পদ্ধতিতে নির্মিত এ খিলানগুলো আকারের দিক হতে কৌণিক বা সূক্ষ্মাগ্র খিলান অথবা দুর্দান্ত ও দুর্বিনীত তাতার আকৃতির খিলান (tartar arch) যা পরবর্তী সময়ে গম্বুজ নির্মাণে ইন্দো-ইসলামি স্থাপত্যে বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যরূপে স্থায়িত্ব লাভ করেছিল।

এ গম্বুজ নির্মাণ পদ্ধতি দুটি সংমিশ্রিত রীতি হেডার ও স্ট্রেচারের (header & stretcher) সমন্বয়ে গঠিত। শ্বেতমর্মর ও সিমেন্ট দ্বারা ইটের সাথে সংযোগ সাধন করে নির্মাণ সম্পন্ন করা হয়েছে। দুদিকে ধাতু নির্মিত ছুঁচালো মুখওয়ালা পেরেক সাঁড়াশি জাতীয় স্ক্রুওয়ালা যন্ত্র দ্বারা আঁটিয়ে ধরে গম্বুজকে স্থিতি দান করেছে। অস্থায়ী সেন্টারিং করে ইট-সিমেন্টের শাঁসে প্রায় এক ফুটের মতো জমিয়ে তার উপর শ্বেতমর্মর বসিয়ে দেয়া হয়েছে। এ গম্বুজ প্রায় ১৬.৮০ মি. (৫৫ ফুট) মতো বিস্তৃত বা প্রসারিতভাবে নির্মিত হয়ে শীর্ষচূড়া ধারণ করে রয়েছে। এ চূড়া কলস ও আমলা নামে দুটি (kalasa and amla) স্থাপত্য অলঙ্করণ দ্বারা গঠিত।[৬] ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যে এ অলঙ্করণ পদ্ধতি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে (চিত্র নং- ১৪)।

এটি যদিও সমচতুর্ভুজক বা চারদিকে সমানভাবে মুখ করে নির্মিত এবং অধিকতর শক্তিশালী, ত্রিমাত্রিক, গুরুভার সম্পন্ন এবং আক্রমণকারীর ন্যায় চেহারাবিশিষ্ট হয়েছে তথাপি এটি একটি অতীব কার্যকর প্রগাঢ় অভিব্যক্তিপূর্ণ স্থাপত্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছে। এতদসত্ত্বেও এতে কিছু কিছু অকার্যকর ঘটনাও রয়েছে; যেমন- (১) কেন্দ্রীয় বারান্দার দুর্বল অভিক্ষেপণ যা খিলানপথ রচনা বা গঠন করেছে এবং (২) এর অনুপাতহীন ছোট মার্লনসহ উন্নত বপ্রের উপর ভীরু সম্প্রসারণ।

সামরিক দুর্গ প্রাকারের কঠিনতা অন্তিমশয্যার পবিত্রতার ওপর অপ্রয়োজনীয় গুরুভার আনয়ন করা হয়েছে বলে মনে হয়। ঢালু দে'য়ালের সাথে সংযুক্ত থামগুলোর মার্লন অত্যন্ত ছোট ও বিসদৃশ এবং প্রবেশপথের বা দরজার চৌকাঠের সমান উঁচু স্থান জুড়ে যে শ্বেতমর্মরের মোটা প্যানেল বা খোপ রেখা খাঁচকেটে বসিয়ে বহির্দেয়ালের যে শোভাবর্ধন করা হয়েছে তাতে কারিগরের কর্মসম্পাদনে অপরিক্বতাই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এ অলঙ্করণ

নিঃসন্দেহে বৈচিত্র্যহীন এবং যখন এটি গাম্ভীর্যপূর্ণ শক্ত সমর্থ মাকবারার মূল কাঠামোর সাথে তুলনা করা যায় তখন একেবারে বেমানান মনে হয়। অবশ্য হ্রদের স্বচ্ছ জলে সমাধিসৌধের প্রতিবিম্ব অবলোকনের পরিকল্পনা ভারতে এটিই প্রথম।

এসব ত্রুটিবিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও এটি একটি দৃঢ় উৎপাদক স্থাপত্য সৃষ্টি যা যোদ্ধা সুলতানের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও বলিষ্ঠ স্বাধীন চেতনার স্মৃতিকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

এটি সুলতান গিয়াসউদ্দিন সূচনা করলেও তৎপুত্র মোহাম্মদ বিন তোঘলক সমাপ্ত করেছিলেন। অদৃষ্টের পরিহাস একইসঙ্গে সুলতান মোহাম্মদ বিন তোঘলক পিতার সাথে চিরশান্তিতে এখানেই শায়িত রয়েছেন।

শাহ্ রুকন-ই-আলমের মাকবারা, মুলতান :

গিয়াসউদ্দিন তোঘলক দিল্লির সুলতান হওয়ার পূর্বে তিনি মুলতানের সুবেদার বা প্রাদেশিক শাসনকর্তারূপে সেখানে বসবাস করতেন এবং তখনই তিনি নিজের জন্য আগাম একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন। যেহেতু পাঞ্জাবের মুলতানে নির্মাণ উপকবণ হিসেবে পাথব পাওযা যায় না সেহেতু স্থাপত্য নির্মাণ কাজে ইটের প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় এবং সে কারণে এ অঞ্চলে নির্মিত স্থাপত্যের বহির্দেয়াল ঢালুভাবে নির্মাণ করা হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে গিয়াসউদ্দিন তোঘলক দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর যখন তিনি তোঘলকাবাদে মাকবারা নির্মাণ করেন তখন তার বহির্দেয়ালও ক্রমঢালুভাবে তৈরি করেন। তাই দেখা যায় যে তোঘলক স্থাপত্য অনুশীলনে ঢালু দেয়াল পদ্ধতির ব্যবহার পরবর্তীকালে ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে গড়ে উঠেছিল।

অন্যপক্ষে সুবেদার গিয়াসউদ্দিন সুলতান হওয়ার পবও তাঁর পীর শাহ রুকন-ই-আলমের সাথে আত্মিক সম্পর্ক রক্ষা করে চলেছিলেন। এ সাধকেব অকস্মাৎ মৃত্যু ঘটলে তাঁর নিজের জন্য নির্মিত মাকবারায় তাঁকে সমাধিস্থ করার আদেশ প্রদান কবেন। এটিই রুকন-ই-আলমের সমাধিসৌধ। পীরের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় এক মহানুভবতার নজিব স্থাপন করে গেছেন।

স্থাপত্যিক দৃষ্টিকোণ হতে এ সমাধিসৌধটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি প্রাদেশিক সৌধমালার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আলোচিত হতে পারত, কিন্তু আঞ্চলিক প্রভাবের চেয়ে কেন্দ্রীয় তোঘলক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্যপুষ্ট বলে রাজধানীকেন্দ্রিক স্থাপত্য অনুশীলনে অবস্থানপ্রাপ্ত হয়েছে। তাই এ দেশের স্থাপত্য ইতিহাসে ক্রমোন্নতির ধারাকে বিশ্লেষণ করার প্রযোজনে কেন্দ্রীয় স্থাপত্যকীর্তি হিসেবে এটি আলোচিত হয়েছে। অনেক সময় এটি তোঘলক স্থাপত্যের প্রাদেশিকরূপ হিসেবেও পরিগণিত হয়ে থাকে।

এ সমাধিসৌধে অনেকগুলো নতুন স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। ভারতে অষ্টভুজ নকশায় সমাধিসৌধ নির্মাণ পদ্ধতির বিকাশের ধারায় এটি তৃতীয়। তখন পর্যন্ত প্রকৃত অষ্টভুজ সমাধিসৌধ নির্মিত হয় নি। তবে এটি প্রকৃত অষ্টভুজ সমাধি নির্মাণের শেষ পূর্ব ধাপ। এ উপমহাদেশে নির্মিত অষ্টভুজ সমাধিসৌধগুলোর মধ্যে এটি সুন্দরতম এবং এ পদ্ধতির সমাধিসৌধ নির্মাণ কৌশলে একটি উজ্জ্বলতাময় বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। এ সমাধিসৌধ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জন মার্শাল বলেছেন, "The tomb of Rukan-i-Alam is one of the most splendid memorials ever erected in honour of the dead".[৭]

মূলত এটি একটি উঁচু ভিত্তি বা মেঝের উপর দুটি স্তরে অষ্টভুজ আকারে নির্মিত হয়েছে। উন্মুক্ত প্রকৃতির মাঝে মুক্ত আকাশের নিচে এর দেয়ালগুলো অত্যন্ত মনোরম।

অষ্টকোনায় আটটি চকচকে মিনার সংযোজন এর শোভাবর্ধন করছে। পাঞ্জাবে পাথর দুর্লভ বলে এর নির্মাণকার্যে ইট ও কাঠ ব্যবহৃত হয়েছে। সমাধির ভিত্তিমূল হতে শীর্ষ পর্যন্ত এর উচ্চতা ১৫.৩০ মি. (৫০ ফুট)। উপরের পিপাটি ৭.৬৫ মি. (২৫ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। প্রতি কোনায় অবস্থিত ছোট ছোট মিনার এবং দেয়ালে পাঞ্জাবে স্থানীয়ভাবে তৈরি উজ্জ্বল টালি ব্যবহৃত হয়েছে। ৭.৬৫ মি. (২৫ ফুট) উচ্চ পিপার প্রত্যেক পার্শ্বের ঠিক মাঝখানে দরজার মতো গবাক্ষ রচিত হয়েছে। গবাক্ষগুলোর খিলান অবস্থানের ঠিক উপরে অর্ধ-বর্গাকার এলাকায় তাক কেটে যে স্থাপত্যিক রূপ দেওয়া হয়েছে তাতে এর শোভা বর্ধিত হয়েছে। দেয়ালগাত্রে নানা রঙের কারুকার্যখচিত টালি স্থাপিত হয়েছে। এর সাথে সর্বশেষে কাঠ নির্মিত বাজু বা নকশালঙ্কার প্রয়োগ করা হয়েছে। পিপা যেখানে শেষ হয়েছে সেখান হতে উপরের দিকে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। এর সাথে চূড়া সংযুক্ত হয়ে গম্বুজকে বিশিষ্টতা দান করেছে (চিত্র নং- ১৫)।

সমাধিসৌধের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য সোপান বয়ে মাটি হতে উর্ধ্বে উঠে এসে একটি গেট ঘর বা ঘুমটি ঘরে পৌছেছে এবং এটিই মূল মেঝে বা সমাধিসৌধের বেদি। এরই সাথে সমাধিকক্ষ অবস্থিত।

সুলতান গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের স্বল্পকালীন পাঁচ বছর রাজত্বকালে নির্মিত স্থাপত্যকর্মের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে।

মোহাম্মদ বিন তোঘলক :

গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের মৃত্যুর পর তৎপুত্র মোহাম্মদ বিন তোঘলক দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পিতাব স্থাপত্য কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখেন। তার সময় দিল্লির চতুর্থ নগরী নির্মিত হয়। দিল্লির চতুর্থ নগরী জাহানপানার অবস্থান প্রথম নগরী ও দ্বিতীয় নগরীর (সুলতান আলাউদ্দিনের সিরি নগরী) ঠিক মাঝখানে। উভয় নগরের মাঝখানে যেটুকু ফাঁকা জায়গা ছিল তার সমুদয় অংশ এর অন্তর্ভুক্ত করে বিশাল অস্বাভাবিক আকারের পুরু দেয়াল নির্মাণ করেন। অবশ্য পূর্বনির্মিত নগবীদ্বয়ের প্রাচীরের ফাঁকে ফাঁকে তিনি নতুন দেয়াল নির্মাণ করে পুরাতনের সাথে নতুনের সংযোগ সাধন করেন। ছোট ছোট নুড়ি পাথর মসলা সহযোগে কোনো কোনো স্থানে ১.২৫ মি. (২ গজ) পুরু করে সুদৃঢ় আবেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করেন। কিন্তু এখন এটি ভূমির সাথে একাকার হয়ে গিয়েছে। অতীতের অনেক কিছু হারিয়ে যাওয়ার পরও মাঝে মধ্যে নগরের চিহ্ন অতীতের সাক্ষী হিসেবে সামান্য অংশ অক্ষত অবস্থায় বিদ্যমান। তন্মধ্যে দুতলা বিশিষ্ট সাত ফাঁকের সেতু (satpul), অলঙ্কৃত স্লুইচ গেট (ornamental sluich gate) এবং এর সাথে সম্পূরক ও অনুপূরক খিলানপথের প্রত্যেক প্রান্তে অবস্থিত বুরুজ যা প্রাচীর অভ্যন্তরে কৃত্রিম জলাশয় হতে জল তুলবার নিয়ন্ত্রণ কক্ষরূপে ব্যবহার হত তা ক্ষণভঙ্গুর অবস্থায় বিদ্যমান।

এর কিছু দূরে আর একটি স্থাপত্যকার্যের নিদর্শন চোখে পড়ে, যা বিজয়মণ্ডল নামে পরিচিত। এটি সমতল ছাদযুক্ত এবং বিশিষ্ট টাওয়ারের মতো যাকে বাজপ্রাসাদের অংশবিশেষ বলে মনে হয়। পি. ব্রাউন একে হাজার স্তম্ভ প্রাসাদ (palace of thousand columns) হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৮] একে হাজার ছাতুনও বলা হয়ে থাকে। এর ভগ্নাবেশ অনুসন্ধান করে অবগত হওয়া যায় যে খল্‌জী যুগের স্থাপত্য আদর্শ অশ্বখুরাকৃতি খিলান একটু বিকৃতি অবস্থায় পুনরায় তোঘলক যুগে ব্যবহৃত হয়েছিল। খল্‌জী স্থাপত্যে খিলানের যে বক্ররূপ এখানে তা অর্জিত হয় নি। অবশ্য এ ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে যে খিলান গঠিত

হয়েছিল এবং যে পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছিল তাই পরবর্তীকালে তোঘলক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য হিসেবে ইন্দো-মুসলিম স্থাপত্যে ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়।

এখানেই আর একটি অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির বর্গাকৃতির মাকবারা দেখতে পাওয়া যায়। এর চতুর্দিকে ভগ্নপাথর, আস্তরকৃত দেয়াল এবং এর উপরে ভাসা ভাসা গম্বুজ রয়েছে। কিন্তু গম্বুজের পিপাটি ছিদ্রায়িত ও ছোট জানালা দ্বারা শোভিত। এর দেয়াল বিভিন্ন প্রকার নকশালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত। এর স্থাপত্য অনুশীলনে তোঘলক আদর্শ রূপায়িত হয়েছে।

মোহাম্মদ বিন তোঘলকের রাজত্বকালের প্রথম দু বছর স্থাপত্য অনুশীলনে দুর্গ নির্মাণের নজির প্রত্যক্ষ করা যায়। এ সময় তিনি আদিলাবাদ দুর্গটি নির্মাণ করেন। মূলত এটি তোঘলকাবাদ নগরের সম্প্রসারণ ও সংস্কার ছাড়া আর কিছু নয় বলে জন মার্শাল মন্তব্য করেছেন।[৯] এখানে স্থাপত্য পদ্ধতির গতানুগতিকতা দৃষ্ট হয়। তাঁর সময়ে এমন কিছু স্থাপত্য ইমারত নির্মিত হয়েছিল যা ভারতীয় স্থাপত্যের অন্য যুগে দেখা যায় নি। ধর্মনিরপেক্ষ নির্মাণ কাজ বলতে দুর্গ ও শাসনকর্তা বা সুলতানের রাজপ্রাসাদকে বুঝায়। কিন্তু এখানে বর্ণিত গৃহাদি পঞ্চদশ শতাব্দীর কম প্রতিপত্তি সম্পন্ন, সম্ভ্রান্তবংশীয় বেসরকাবি সাধারণ ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত আবাসিক ইমারত বলে মনে হয়। স্থানীয়ভাবে এটি বারোখাম্বা (twelve pillars) নামে পরিচিত। তুলনামূলকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও এর স্থাপত্য নিদর্শন বা মৌলিক পদ্ধতিগত আদর্শ বুঝা যায়।

এ বাসগৃহের সাথে একটি আঙ্গিনা রয়েছে যার মাঝখানে কূপ ও স্নানাগার এবং চতুর্দিকে ভৃত্যঘর ও ঘোড়ার আস্তাবল, অভ্যন্তরে সোপান নিচতলা হতে উপরের সমতল খোলাছাদে উপনীত হয়েছে। এর চতুর্দিকে উন্নত বপ্র (parapet) দ্বারা সংরক্ষিত যা গ্রীষ্মের সময় উঁচু ও প্রশস্ত বসার স্থান হিসেবে ব্যবহার করা হত। এ প্রাঙ্গণের সাথেই কক্ষগুলো সংযুক্ত এবং সে জন্যই নামকরণ অনুরূপ (বারখাম্বা) হয়েছিল। সম্ভবত এটুকুই বাড়ির ঘরকন্না বা পারিবারিক গার্হস্থ্যজীবন সম্পৃক্ত অংশ ছিল। এব সাথে ঘরের ছাদের উপর নির্মিত আড়া তলছাদ ধনরত্ন রাখার জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল। বাইরের দিকে কূপসহ বাগান ও বসার জায়গা (chauboutra) এবং সমগ্র এলাকাটা উঁচু ও সুরক্ষিত প্রাচীর বেষ্টিত ছিল। এর সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যময় ছিল বর্গাকার তিনতলাবিশিষ্ট টাওয়ারটি। নিচতলা হতে অনায়াসে সেখানে গমনাগমন করা যেত। নিঃসন্দেহে এখানে পরিবারের প্রবীণ বা প্রধান সদস্যবৃন্দ তাদের অবসর সময় বাতাসের জন্য খোলা কক্ষগুলোতে কাটাতে পারত। এখানে বসে অবসর মুহূর্তে বাইরের দৃশ্যাবলি অবলোকন করা যেত।

টাওয়ারের ঢালু দেয়াল, পিরামিড ছাদ ইত্যাদি তোঘলক যুগের প্রচলিত আদর্শ প্রভাবযুক্ত স্থাপত্য প্রতিকৃতি বহন করে চলেছে। এরূপ আবাসিক এলাকায় আবেষ্টনী প্রাচীর দেয়াল পশ্চাতে প্রতিরক্ষা ও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়াসে অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হত। ভারতের মধ্যযুগে জীবনযাত্রার যে ধারা চালু ছিল তার বৈশিষ্ট্যই অনুরূপ ছিল। কঠোর পর্দা প্রথার নিয়ামক হিসেবে পারিবারিক অবরুদ্ধতা একটা প্রচলিত আদর্শরূপে হিন্দু ও মুসলিম সমাজে স্বীকৃত ছিল। হেরেম শরিফ, অন্তঃপুরবাসিনী, অসূর্যম্পশ্যা ইত্যাদি বিশেষ অর্থবোধক বিশেষণগুলোর ব্যবহার ঐ যুগের সামাজিক জীবনকে অনুভব করে দিতে পারে।

মোহাম্মদ বিন তোঘলকের রাজত্বকালে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হচ্ছে তাঁর খেয়ালি মনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অপচেষ্টার অপঘাতমূলক প্রতিক্রিয়া, যার পরিণাম ছিল রাজধানী দিল্লি হতে ৯.৬৬ কি.মি. দূরবর্তী দক্ষিণ ভারতের দৌলতাবাদে স্থানান্তরের নির্বুদ্ধিতা। তিনি সরকারি-বেসরকারি দিল্লিস্থ সকল অধিবাসীবৃন্দকে দৌলতাবাদে গমনের

বাধ্যতামূলক আদেশ জারি করে প্রজাদের জানমালের শুধু ক্ষয়ক্ষতি করেন নি; বরং এটি গত দেড় শ বছরের অর্জিত স্থাপত্য ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নের ধারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এর ফলে স্থাপত্যরীতির বিবর্তনের ধারায় যে অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল তা গতিহীন হয়ে পড়ে।

ইতিহাসের পাতায় এ দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে ঘটেছিল যখন দিল্লির বৃদ্ধ, পঙ্গু ও আতুরসহ সকল শ্রেণীর অধিবাসীবৃন্দকে তাদের যুগযুগান্তরের গৃহকোণ পরিত্যাগ করে সুদূর অপরিচিত নতুন স্থানে গমনের জন্য বাধ্য করা হয়েছিল। দিল্লির পার্শ্ববর্তী তাদের উর্বরা জমিগুলো অনাবাদী ভূমি হিসেবে পড়ে রইল। দক্ষ কারিগরগণ অন্যত্র জীবিকার সন্ধানে চলে গেল। প্রকৃতপক্ষে রাজকীয় স্থাপত্য-কলাচর্চার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। বিষণ্ন প্রজাবৃন্দ বিশেষ করে রাজকর্মচারীগণ গতিহীন হয়ে পড়ল। এরূপ খামখেয়ালিপনায় সুলতান একদিন অতিমাত্রায় মৎস্য ভক্ষণ করে অসুস্থ হলেন এবং ১৩৫১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর জীবনাবসান হয়।

ফিরোজ শাহ্ তোঘলক (১৩৫১-১৩৮৮) :

সুলতান ফিরোজ শাহ্ তোঘলক দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার পর মোহাম্মদ বিন তোঘলকের বিবেচনাবর্জিত খামখেয়ালিপূর্ণ আদেশ ও নির্দেশের কারণে যে ক্ষতি সাধিত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় ব্রতী হন। তাঁর আগ্রহান্বিত উদ্যমশীল পৃষ্ঠপোষকতায় শিগগিরই স্থাপত্য কার্যক্রমে প্রাণ স্পর্শতা আবার ফিরে আসল। পদ্ধতিগত উন্নয়নের দ্বার পুনরায় উন্মোচিত হল। এটি সত্য যে তোঘলক সুলতানদেব মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে স্থাপত্য অনুরাগী শাসক। তিনি একে এবাদতের অংশ মনে করে সে অনুভূতির আলোকে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এ অনুভূতির স্ফুরণ বাস্তব কার্যক্রমে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে। তিনি তাঁর আত্মচরিত ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহীতে লিপিবদ্ধ করেছেন "আল্লাহ্ তাঁর অফুরন্ত দানের মধ্যে যা আমাকে দিয়েছেন তা খাকসার বান্দা হিসেবে জনসাধারণের নিমিত্তে বেসরকারি বাড়িঘর নির্মাণে প্রত্যাশী।"[১০]

সুদীর্ঘ ৩৭ বছর রাজত্বকালে তিনি বেশ কিছু সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ দালানকোঠা নির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করেন, যার পদ্ধতিগত উন্নয়ন অন্যান্য পূর্বের তোঘলক স্থাপত্য আদর্শ হতে কিছুটা স্বতন্ত্রতার দাবিদার। ফিরোজীয় যুগে তোঘলকদের প্রথম দিকে প্রচলিত স্বাভাবিক স্থাপত্যধারার আদর্শ অনুসারিত না হয়ে অন্যদিকে সরে গিয়ে নতুন পথে ধাবিত হওয়ার পিছনে পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটের কিছু ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা রয়েছে।

ফিরোজীয় যুগে স্থাপত্যের যে নতুন প্রণালীর রীতিবিন্যাস জন্মলাভ করেছিল তা প্রকৃতপক্ষে যুগসন্ধিক্ষণের শাসন ব্যবস্থার প্রতিফলন মাত্র। এ যুগের স্থাপত্যের অনগ্রসরতার কারণ রূপে—(১) দক্ষ প্রস্তর কারিগরের অভাব, (২) অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রকৌশলী ও দক্ষ জনশক্তির অভাব, (৩) মোহাম্মদ বিন তোঘলকের রাজধানী স্থানান্তরের প্রেক্ষাপটে স্থাপত্য অনুশীলন গতিহীন হওয়ার ফলে অবিরত কর্মহীনতার কারিগরি প্রশিক্ষণ অভাবে অদক্ষ ও অনভিজ্ঞ কর্মীর হাতে সুন্দর সৃষ্টির সুযোগ ছিল না এবং (৪) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা চিহ্নিত করা যায়। মোহাম্মদ বিন তোঘলক ২৩টি প্রদেশের সুলতান ছিলেন; কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর অনেক প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবেদারগণ দিল্লি প্রশাসনকে অগ্রাহ্য করে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে ফিরোজ শাহ্ তোঘলক হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের তেমন কোনো তৎপরতা প্রদর্শন করে নি। রাজশক্তির বিয়োগ ঘটলে তার পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া সর্বক্ষেত্রে প্রকাশ হয়ে পড়ে। প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা স্থাপত্যশিল্প সংস্কৃতি বিকাশ ও প্রসারণের সুযোগ সৃষ্টি হতে দেয়

নি; বরং অবনতির দিকে ধাবিত হয়েছিল। সুন্দর টেকসই স্থাপত্য সৃষ্টির জন্য দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রকৌশলীর সাথে প্রচুর অর্থের যোগান প্রয়োজন ছিল। কিন্তু ফিরোজ তোঘলক সে অর্থ সংগ্রহ করার পথ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন নি; বরং রাজস্ব আদায়ের পথ সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল। অর্থনৈতিক পুঙ্গতা অপর একটি প্রধান কারণ ছিল মোহাম্মদ বিন তোঘলকের আমলের রাজকোষ হতে তাম্রনোটের বিনিময় মূল্য ফেরত দিতে বহু অর্থের অপচয় হয়েছিল। কাজেই শূন্য রাজকোষ হাতে নিয়ে রাজ্যভার গ্রহণ করে স্থাপত্য প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে নতুন প্রযুক্তি গ্রহণ করতে হয়েছিল। তাই ফিরোজীয় যুগে তাঁর মানসিক ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও মূল্যবান মালমসলা সংগ্রহ করে দামি ঐশ্বর্যপূর্ণ স্থাপত্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর ছিল না। তাঁকে অপেক্ষাকৃত সস্তা মালমসলা দ্বারা স্থাপত্য নির্মাণ কাজ করতে হয়েছিল।

তবে এ সময়ে সূচিত স্থাপত্য আদর্শ দেশের অনুরূপ অবস্থায় ঠিকই ছিল। কেননা পূর্বের পদ্ধতি ধরে থাকতে চাইলে সম্পদের অভাবে স্থাপত্য কার্যক্রম একেবারে থেমে যেত। পরিস্থিতির নিরিখে তাঁর এ সিদ্ধান্ত ছিল যুগোপযোগী। এ পরিবর্তন মেনে নিয়েই তাঁর স্থাপত্য কর্মসূচি শুরু হয়েছিল। তখন সুন্দর মসৃণ ও সূক্ষ্মভাবে কাটা চমৎকার বেলে পাথর বা বেলে পাথরের টুকরার বদলে মামুলি ধরনের পাথর মালমসলা যা চোখকে পীড়া দেয় না এরূপ উপকরণ ব্যবহার শুরু হয়েছিল।

অবশ্য স্থাপত্য ইমারতের বিশেষ বিশেষ অংশে যেমন; সর্দল, দরজার স্তম্ভ বা পিলারে অমসৃণ সাইজ করা একখানি পাথরে তৈরি স্তম্ভ প্রয়োগ করা হত এবং বিরল ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হিসেবে নকশালঙ্কার ব্যবহৃত হত। অবশ্য সে নকশালঙ্কার পূর্বের মতো পাথর কেটে খোদাই করে নয়, মামুলি ধরনের আস্তরের উপর ঢালাই কাজের অল্পদামি নকশার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। এভাবে যে স্থাপত্য সৃষ্টি করা হয়েছিল তার বহিঃপ্রকাশ ছিল বৈচিত্র্যহীন, অনুজ্জ্বল ও বিষণ্ন যা নিষ্প্রাণতার সাক্ষ্য বহন করেছে। এসব নিরানন্দ মলিন শিল্পকর্ম আনন্দদায়ক ছিল না। একই রঙের বিভিন্ন আভা ফুটিয়ে অঙ্কন এবং বিভিন্ন আকারের বিন্দু দ্বারা অঙ্কিত নকশা পরিকল্পনা বাস্তবে সত্য যে এগুলো স্থাপত্যকর্ম কয়েক শ বছরের আবহাওয়ার ক্ষয়জনিত কারণে বর্তমানে প্রকৃত রূপলাবণ্য জলুস হারিয়ে ফেলেছে। দেয়ালের অধিকাংশতেই রঙ ব্যবহার করে উজ্জ্বল চকচকে ও মনোরম করা হয়েছিল তা আর এখন অবশিষ্ট নেই। অন্যপক্ষে এটি যখন নতুন ছিল তখনো খুব একটা বৈচিত্র্যপূর্ণ ছিল তা মনে করা যায় না। কারণ শুধু চুনকামের মতো সাদা প্রলেপ দ্বারা কতটুকুই বা উজ্জ্বলতা ও চাকচিক্য বাড়ানো সম্ভব। এ সুলতানের ইমারত নির্মাণের কৌশলগত পরিবর্তনের সাথে মালমসলার প্রয়োগ পূর্বের মতো আর হতে পারে নি। এর প্রকৃতিতে কিছুটা স্থবিরতা লক্ষ করা যায়। সংযোগমুক্ত ঢিলা, অনবহিত ধরনের বিজড়িত বয়ন স্থাপত্য আদর্শ দ্বারা তোঘলক স্থাপত্য পুনরায় যাত্রা শুরু করে। স্থাপত্য ইমারতগুলো স্থায়িত্ব ও মজবুত করার জন্য দেয়ালের কোনো অংশ নিচের দিকে যতদূর সম্ভব পুরু এবং উপরের দিকে কিছুটা চিকন করে গেঁথে তোলা হত। এভাবে ইমারতের স্থায়িত্ব দানের প্রবণতা একটা বিভ্রান্তিপূর্ণ ধারণা ছিল মাত্র। ইমারতের কোনাগুলো অযথা পুরুত্বকরণের মাঝে স্থাপত্যে স্থিতি অর্জনের প্রক্রিয়া বাস্তবে অপ্রয়োজনীয় ছিল। এ ঢালুতার বাস্তবায়ন ও প্রয়োগ জোরালোভাবে দেয়ালের বহির্ভাগে পৃষ্ঠে লক্ষ করা যায় এবং দেয়ালকে শক্তিশালীকরণের জন্য আলম্ব ও ক্রমসরু চূড়া ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে। ইমারতের চারকোনায় ভাসা ভাসা অনুন্নত গম্বুজ শোভিত বুরুজের মতো টাওয়ার ইত্যাদির মাঝে তোঘলক যুগের ফিরোজীয় স্থাপত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্যের সঠিক প্রতিকৃতি দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

ফিরোজীয় যুগের কিছু পূর্বে মুলতানে নির্মিত সমাধিসৌধের মধ্যে যে স্থাপত্য আদর্শ ও এর প্রয়োগ পদ্ধতির অনুবর্তন লক্ষ করা যায় তাতে সমকালীনতার মিলন খুঁজে পাওয়া যায়। এটি স্পষ্টত যে দক্ষিণ পাঞ্জাবে এ সময় যে স্বতন্ত্র শক্তিধর তাৎপর্যপূর্ণ স্থাপত্যচর্চা শুরু হয়েছিল এবং যা ইতোমধ্যে গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের মাকবারাতে দৃষ্ট হয়েছে তাই ফিরোজ শাহ তোঘলক অনুসরণ করে চলেছিলেন।

সুলতানি স্থাপত্য ইমারতগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য দেয়ালগাত্র অলঙ্করণযুক্ত করা হত। এ অলঙ্করণ কখনো কখনো খোদাইকৃত নকশা, পোড়ামাটির নকশালঙ্কার অথবা উজ্জ্বল রঙের টালি দ্বারা দেয়াল ঢেকে দেয়া হত। অবশ্য উজ্জ্বল রঙের টালির ব্যবহার মূলত পারস্য স্থাপত্যের অনুকরণে করা হয়েছে এবং এর ব্যবহার মাঝে মধ্যে দিল্লির ইমারতগুলোতে দেখা যায়।

কিন্তু ফিরোজ শাহ তোঘলকের বেসরকারি বা জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ইমারতগুলো সুশোভিতকরণ বা সৌন্দর্যপূর্ণ অলঙ্করণ হতে দূরে রাখা হয়েছিল। যেখানে ভারতীয় স্থাপত্যগুলো ছাঁচে ঢালা সমৃদ্ধিশালী নকশালঙ্কার ও বিভিন্ন প্রণালীর সৌন্দর্যালঙ্কার প্রয়োগের প্রতি আসক্তি দেখা যায় সেখানে আচারনিষ্ঠা, কঠোর বিশুদ্ধতামূলক ও নগ্ন অসজ্জিত, নীরস এবং সঙ্কোচনমূলক কঠোরতাপূর্ণ স্থাপত্য অনুশীলন নীতি পরোক্ষভাবে এদেশীয় আবেগপ্রবণতার স্পর্শ থেকে অবদমিত করে দিয়েছিল। অন্যপক্ষে স্থাপত্য অনুশীলনে এরূপ কঠোর ও পশ্চাৎপূর্ণ পরিবেশ এদেশে অপরিজ্ঞাত ও অপরিচিত ছিল। তবে এসব পরিস্থিতি সে সময়ের চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থার দৃশ্যপট ও পরিচর্যা আমাদের জন্য রেখে গিয়েছে।

সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলকের সময় নির্মিত স্থাপত্যকর্মের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে দিল্লির পঞ্চম নগর ফিরোজাবাদসহ কমপক্ষে চারটি দুর্গ নগরী, গুরুত্বপূর্ণ মাকবারা এবং এটি ছাড়াও অসংখ্য মসজিদ ও পূর্ববর্তী সুলতানদের আমলে নির্মিত স্থাপত্যকীর্তির সংস্কার ও পুনঃসংযোজন কার্য লক্ষণীয়। তাঁর সময়ে নির্মিত সংরক্ষিত শহরগুলোর মধ্যে জৌনপুর, ফাতেহাবাদ ও বিহার বিখ্যাত। তন্মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্ম হচ্ছে যমুনা নদীর তীরে দিল্লির উপকণ্ঠে স্বীয় রাজধানী, যা ১৩৫৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। প্রাচীন আদর্শে দেয়াল ঘেবা সংরক্ষিত, মোহাম্মদ বিন তোঘলকের রাজধানী তোঘলকাবাদের অনুরূপই তিনি নতুন রাজধানী নির্মাণ করেন। তবে এটি তার চেয়ে কিছুটা সম্প্রসারিত ও উন্নতমানের করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন।

ফিরোজাবাদ শহরটি মূলত একটা দুর্গ নগরী ছিল। রাজপ্রাসাদের সাথেই সেনানিবাস বা দুর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল। চতুর্দিকে বিরাট উঁচু দেয়ালে পরিবেষ্টিত ছিল শহরটি। এখানে নগরবাসীর প্রাত্যহিক জীবনধারণের সর্বপ্রকার উপকরণাদি যোগানের ব্যবস্থা ছিল। মোটের ওপর সর্বদিক হতে এটি একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ শহররূপে পরিগণিত হয়েছিল।

কোটলা-ই-ফিরোজ শাহ :

কোটলা ফিরোজ শাহ কথিত নগরটি যমুনা নদীর তীর ঘেঁষে গড়ে উঠেছিল। একটি সমতলক্ষেত্রের উভয়পার্শ্বের মধ্যে পূর্ণসাদৃশ্য রেখে নির্মাণ নকশা প্রস্তুত করা হয়েছিল। স্থপতি বিশেষজ্ঞগণ মনে হয় স্বাধীনভাবে নগর পরিকল্পনায় আদর্শ বাসস্থান হিসেবে গড়ার প্রয়াস পেয়েছিল। অবশ্য এটি নির্মিত হওয়ার দেড় শ বছর পরপরই পরিত্যক্ত হয়েছিল এবং এখন প্রায় একটি ধ্বংসাবশেষ মাত্র। উক্ত ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করে নগরের কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ স্পষ্টভাবে বুঝা যায়।

পি. ব্রাউনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে,[১১] এ শহর একটি সমান্তরাল ক্ষেত্রবিশেষ; লম্বায় .৮০ কি.মি. কম এবং এর চতুরাংশ চওড়া; উত্তর ও দক্ষিণে লম্বালম্বি এবং চতুর্দিকে সচ্ছিদ্র উঁচু প্রাচীর বেষ্টিত ছিল এবং ভিতর হতে তীর বা গোলা নিক্ষেপের ব্যবস্থা সংবলিত হওয়া ছাড়াও আত্মরক্ষার্থে নির্মিত বুরুজ স্বল্প ব্যবধানে স্থাপিত ছিল। উক্ত নগরের প্রধান প্রবেশ ফটক পশ্চিম আবেষ্টনী প্রাচীরে সংযুক্ত ছিল। সদর দরজার মুখ অত্যন্ত মজবুত, সুরক্ষিতভাবে নির্মিত এবং আবেষ্টনী দেয়াল রেখা হতে নগর দুর্গের বহির্দিকে প্রক্ষিপ্ত তোরণের উপর প্রহরী চৌকি স্থাপিত করে (barbican) তা আবার পর্দা দ্বারা নিরাপদ ও সংরক্ষিত করা হয়েছিল। দুর্গ প্রাঙ্গণে প্রহরী ভবন ও স্থায়ী ব্যারাকের অবস্থান লক্ষ করা যায়। সর্বোপরি কোটলার চওড়া পার্শ্ব অতিক্রম করে ও প্রধান ফটকের বিপরীতে বৃহৎ বর্গাকার পরিবেষ্টনে রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় কর্মকর্তাদের আবাসস্থল ও কিছু বেসরকারি বাড়িঘরের অবস্থান লক্ষ করা যায় (চিত্র নং- ১৬)।

এগুলো সারিবদ্ধভাবে বহিঃআবেষ্টনী প্রাচীর হতে অপেক্ষাকৃত সমান উচ্চতায় নির্মিত হয়েছিল যাতে শীতল সমীরণ নদীস্থ জলধারাকে স্পর্শ ও অতিক্রম করে আবাসিক এলাকায় প্রবাহিত হতে পারে। কোটলার আবেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবশিষ্ট জায়গা বর্গাকার ও সমান্তরাল প্রাঙ্গণে বিভক্ত। এর সর্ববৃহৎ অংশটিতে জনসাধারণকে জমায়েতের জন্য একটি হলঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। এর সাথে চতুর্ভুজাকারের খোলা প্রসারিত স্থান স্তম্ভায়িত বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল এবং সেখানে দাপ্তরিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষ্পন্ন হত এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তা পরিচালনা করতেন। এর বাকি অংশে নির্মিত বিভিন্ন প্রকারের অবকাঠমোর মধ্যে- বিলাসপূর্ণ চন্দ্রাতপ, নিকুঞ্জ ঝোপ, ফোয়ারা বা জল বাগান, ভৃত্যনিবাস, স্নানাগার, পুকুর, সেনাশিবির, অস্ত্রাগার ইত্যাদি ছিল উল্লেখযোগ্য। এসব সুন্দর জীবনধারণের উপকরণাদি সুবিধাজনকভাবে আন্তঃসংযোগ রক্ষা করে নির্মিত হয়েছিল। শহরের কেন্দ্রের দিকে এবং নদীর দিকের দেয়ালের বিপরীতে প্রধান জাম মসজিদ অবস্থিত।

প্রকৃতপক্ষে এটি একটি বৃহৎ মনোরম এবাদতখানা যেখানে দশ হাজার মুসল্লি একসাথে নামাজ আদায় করতে পারত। অন্য অংশেও অনুরূপ ছোট নামাজঘর ছিল। প্রাসাদের সাথেও একটি খাস মসজিদ ছিল। মুসলিম ভারতে দুর্গ নগরীর অভ্যন্তরে যে ব্যবস্থাপনার চিত্র বিকশিত হয়েছিল তা মূলত সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলকের কোটলায় পূর্ণাঙ্গভাবে সূচিত হয়েছিল যা দু শ বছরের অধিককাল পরে মোগল বাদশাহ শাহজাহান আগ্রায়, দিল্লির শাহজাহানবাদ, এলাহাবাদ এবং অন্যান্য শহরে নির্মাণ করেছিলেন।

এটি যথার্থ যে ফিরোজ শাহ তোঘলক তাঁর রাজ্যে ঐতিহ্যবাহী অনেক পূর্বকালের অবিকল প্রতিরূপ স্থাপত্য কাঠামো নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন, যা সেদিনের পরিচিত পৃথিবীতে বহু শতাব্দী পূর্ব হতে অনুশীলিত হয়ে এসেছিল। ভারতের বুকে একাধিক অংশ সমন্বয়ে গঠিত প্রাসাদে অনেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ও উপকরণ রয়েছে যা রোমান ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের মিনার ও প্রাকারযুক্ত দুর্গ প্রাসাদ নগরীতে বিকশিত হয়েছিল এবং উদাহরণ হিসেবে স্পেলাটোতে অবস্থিত ডাইওক্লেটিয়ান (diocletian at spalato) প্রাসাদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এ ছাড়াও অন্যান্য প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থাপত্যের কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়।

কোটলার অভ্যন্তরে একটি অনুপম ও অদ্বিতীয় কীর্তি রয়েছে যা মানুষের হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং কল্পনাপ্রবণতায় বিমুগ্ধ করে। এ বিরাট স্থাপত্যকীর্তিটি নগর কেন্দ্রে বিশিষ্টতায়

বিরাজমান। আমবালা শহরের নিকট হতে প্রাচীন যুগের এ অশোক স্তম্ভটি এনে নগর কেন্দ্রে পিরামিডের মতো নিচু হতে উপরের দিকে ধাপে ধাপে সারিবাঁধা খিলানায়িত বর্গাকার উঁচু বেদিব উপর স্থাপন করা হয়। উক্ত বিশালাকারের স্তম্ভটি তখন হতে ছয় শ বছর উৎপীড়িত না হয়ে আপন স্থানে নীরবেই রয়েছে। সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ উক্ত বিরাটকায় স্তম্ভটির অপসারণ, স্থানান্তর ও পুনঃস্থাপন সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। এতে তখনকার প্রকৌশল প্রযুক্তির পরিপক্বতা এবং এর বিকাশ 'শামস-ই-সিরাজ'-এ লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে। এ বিরাটকায় বৌদ্ধ স্তম্ভটি পুনঃস্থাপন কর্মটি তাঁর প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রসঙ্গক্রমে এখানে উল্লেখ করা যায় যে তখন হতে দেড় শ বছর পূর্বে মামলুক সুলতান কুতুবউদ্দিন কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ প্রাঙ্গণে দিল্লির অনতিদূর কুমারাগুপ্ত হতে একটি বিবাটাকার লৌহ স্তম্ভ এনে স্থাপন করেছিলেন। ফিরোজ শাহ্ তোঘলকও তাঁর এ কাজের মধ্য দিয়ে এবং পূর্ববর্তী সুলতানকে অনুসরণ করে তাঁর সমকক্ষ হতে চেষ্টা করেছিলেন।

ফিরোজ শাহ্ তোঘলকের মসজিদ প্রকল্প :

ফিরোজ শাহ তোঘলকের রাজত্বকালে নির্মিত মসজিদগুলো প্রায় সবই দিল্লির আশপাশে অবস্থিত এবং এ মসজিদগুলোর নির্মাণ কাজ ১৩৭০ খ্রিস্টাব্দ হতে শুরু হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে— (১) কালি মসজিদ (১৩৭০ খ্রি.), (২) জাহানপনার বেগমপুবী মসজিদ (১৩৭০ খ্রি.), (৩) তাইমুরপুরীতে নির্মিত শাহ্ আলম দরগা মসজিদ (১৩৭৫ খ্রি.), (৪) জাহানপনার খিরকী মসজিদ (১৩৭৫ খ্রি.) এবং (৫) শাহ্জাহানবাদের কালান মসজিদ (১৩৭৫ খ্রি.)।

তন্মধ্যে কালান ও খিরকী মসজিদের সাধারণ অবয়ব আদর্শ নমুনা, প্রতিচ্ছবি ও বৈশিষ্ট্য অভিন্ন। এগুলো দেখতে মনোরম ও স্নিগ্ধকর; নির্মাণ নকশাও একইরূপ। সমস্ত স্থাপত্যটি প্রায় কোটলার সমান খিলানায়িত উঁচু উপকাঠামোর উপর মূল মসজিদ কাঠামো প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। চেহারায় এদের বাহ্যিক মিল বা সাদৃশ্য কতকটা মামলুক স্থাপত্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সুলতান ঘারী নামের মাকবারার আবেষ্টনী প্রাচীরের সাথে অভিক্ষিপ্ত বলিষ্ঠ ক্রমোন্নত সিঁড়ির মাধ্যমে প্রবেশের ব্যবস্থারূপ এ মসজিদদ্বয়ে রয়েছে। বিশেষভাবে প্রত্যেক কোণ হতে গোলাকার বুরুজ নির্গত ও সংযুক্ত হওয়ার প্রণালী লক্ষণীয়। মসজিদের সমগ্র কাঠামো একটি দুর্গের চেহারার অনুরূপ, যা সাধারণত এবাদতখানার প্রতিকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তবে তখন হতে দেড় শ বছর পূর্বে নির্মিত মাকবারায় বহিস্থ উপকরণাদি ও বৈশিষ্ট্য এ মসজিদদ্বয়ে প্রত্যক্ষ করা যায় না; যেমন যুদ্ধাস্ত্র বিশেষ সজ্জায়নের জন্য ঢালু বুরুজ বা ক্রমসরু চূড়া এ মসজিদদ্বয়ে নির্মাণ করা হয় নি। মোটামুটি এদের নির্মাণ কার্যাবলির গাম্ভীর্যপূর্ণ ও টেকসই প্রকৃতির বলে মনে করা যেতে পারে এবং তোঘলক যুগের স্থাপত্য আদর্শ ও লক্ষণগুলো এতে স্পষ্টভাবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে।

উপরে বর্ণিত মসজিদগুলো ছাড়াও ফিরোজ শাহ্ তোঘলকের সময়ে নির্মিত অন্য মসজিদগুলোর অভ্যন্তর ভাগ পরিদর্শন করলেও তোঘলক স্থাপত্যের ফিরোজীয় শাখার মৌলিকত্ব ও বিশেষ আদর্শ বুঝা যায়। এর খিলান ও কড়ির (arch+beam) অতিক্রম করলেও স্বতন্ত্রতা পরিলক্ষিত হয়। ভিতরে সারিবদ্ধ বর্গাকার স্তম্ভায়িত 'বে' রয়েছে। প্রতিটি কোনায় টিউডর পদ্ধতির খিলান রয়েছে যার উভয় পার্শ্বে ভারী থাম বা পিয়ার (pier) বিদ্যমান। এ পিয়ার বা থাম খিলানের ভারবহন করছে। প্রতিটি 'বে'-এর শীর্ষে পেয়ালা

আকারের গম্বুজ শোভা পাচ্ছে। থাম বা পিয়ারগুলো খাটো, তবে খুব পুরু ও মজবুত। এর দুটি মিলিয়ে একটি সমষ্টি আবার কখনো কখনো চারটি সাজসজ্জাহীন বর্গাকার বিরাটকায় একখণ্ড প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ শক্তিবৃদ্ধির জন্য স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য এ এক খণ্ড প্রস্তর সহযোগে স্তম্ভ প্রয়োগের পিছনে সৌষ্ঠবতা বা সৌন্দর্যবৃদ্ধির নজির দৃষ্ট হয় না।

খিরকী ও কালান মসজিদদ্বয়ের নকশা পরিকল্পনা ক্রুশাকার। দুটি খিলানপথ একে অপরকে দু সমকোণ বা ৯০ ডিগ্রি কোণে অতিক্রম করেছে। খিরকী মসজিদের সমগ্র এলাকা প্রশস্ত ছাউনি বারান্দা দ্বারা আবৃত। তবে এর চারটি উন্মুক্ত চতুষ্কোণ সমতল অংশ ছাড়া এ উন্মুক্ত অংশ ঐ চতুষ্কোণেব প্রতিটিব কেন্দ্রস্থল জুড়ে রয়েছে (ভূমি নকশা নং- ৮)।
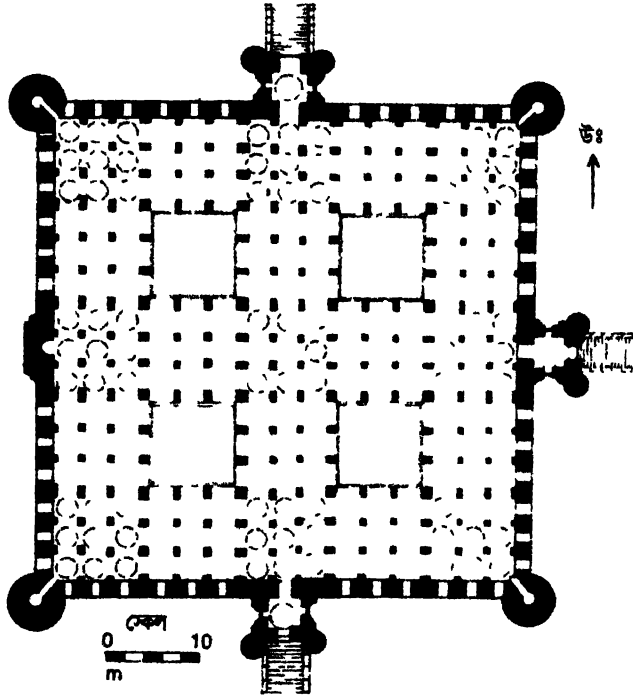
ভূমি নকশা নং-৮ : খিরকী মসজিদ, দিল্লী

মোটামুটি বৈশিষ্ট্যসূচক গাম্ভীর্যতা ও পবিত্রতা খিরকী মসজিদের আবৃত করিডোরে থাকতে পারে। তথাপি এর আবৃত বা অংশত আবৃত অবয়ব ঐতিহাসিক প্রথা বা ঐতিহাসিক সত্যের নিরিখে বিরল। এ জাতীয় ছাউনি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নিরাপদ আশ্রয়রূপে মুসল্লিরা ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু বেগমপুরী মসজিদটি কিছুটা মসজিদ স্থাপত্যের আদি আদর্শ নকশা পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়েছে। সম্মুখের খোলা চত্বরটি বা প্রাঙ্গণটাই মসজিদের মূল বৈশিষ্ট্যরূপে মনে করা যেতে পারে। তবুও বলতে হয় যে এর অধিকাংশ স্থাপত্যবৈশিষ্ট্য পূর্বে উল্লিখিত মসজিদ বৈশিষ্ট্যের মতোই চত্বরের চতুর্দিকে টিউডর পদ্ধতির খিলান দ্বারা খিলান সারি নির্মিত হয়ে ছাউনি বারান্দার চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে।

মসজিদের সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদ কেন্দ্রে বা মাঝখানে দীর্ঘ খিলানায়িত তোরণ (pylon) নির্মাণের ফলে পশ্চিম পার্শ্বে এ খিলান সারি বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এর তিন দরজায় প্রবেশপথটি মুসল্লা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে শেষ হয়েছে এবং শীর্ষদেশে একটি সুষম ও সুন্দর গম্বুজ শোভাবর্ধন করে আছে। সম্মুখ দেয়াল তোরণ (pylon) যে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে তাতে একে খিলান পর্দার বংশধর রূপে প্রতিপন্ন করা হয়েছে। ক্রমসরু চূড়া, ঢালু চেহারা ইত্যাদি তোঘলক যুগের সহজাত বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য করা হয়। মসজিদের সামনের সুদীর্ঘ দেয়াল পিছনের নির্মিত গম্বুজকে ঢেকে দিয়েছে বা আড়াল করে ফেলেছে। এতে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে তাতে এটি প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে যে এ ধরনের স্থাপত্য গঠন অনুপযোগী এবং আরো অর্থ প্রকাশ করে যে ঐতিহ্যবাহী খিলান পর্দার সূত্রপাত এখন একটা মর্যাদাহীন অধঃপতিত প্রথায় নেমে এসেছে এবং মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। প্রকাশ থাকে যে বেগমপুরী মসজিদ জাহানপনা শহরের প্রধান উপাসনালয়। এ মসজিদের আরো একটি লক্ষণীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে প্রার্থনা কক্ষের কেন্দ্রীয় ইওয়ানেব সম্মুখে মোটা পুরু খিলান পর্দার অভিনবত্ব। তবে এটি কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের খিলান পর্দার মতো মসজিদের আঙ্গিক ঐক্যতা দাবি করতে পারে না।

শাহ আলমের দরগাহ সংলগ্ন মসজিদ, তাইমুরপুরী (১৩৭৫ খ্রি.) :

ফিবোজ শাহ তোঘলকের শাসনামলে শাহ আলমের দরগাহসংলগ্ন একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদে যে সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করেছিল তা তখনকার সব মসজিদেই বিকশিত হয়েছিল। তা ছাড়াও বিশেষ কতকগুলো অভিনব বৈশিষ্ট্য এখানে জন্মলাভ করেছিল। এগুলো হচ্ছে মেয়েদের জন্য নামাজ পড়ার নির্দিষ্ট প্রকোষ্ঠ মূল মসজিদ কাঠামোর সাথে সংযুক্তকরণ। অনুরূপ মেয়েদের জন্য ব্যবস্থা সংবলিত মসজিদের অবস্থান এর পূর্বে আর দেখা যায় নি। অবশ্য এর পিছনে বিশেষ একটা কারণ হচ্ছে যে এটি মাজারসংলগ্ন মসজিদ। পীরের মাজারে ওরস শরিফ অথবা বাৎসরিক মিলাদ বা ধর্মীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষে জানানা বা মহিলা মুসল্লির আগমন ঘটে। কাজেই জানানাদের এবাদতের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে মসজিদের সাথে অনুরূপ একটা স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয়েছিল। অবরোধবাসিনীদের জন্য এরূপ ব্যবস্থা কিছুটা বিস্ময়কর।

ইরিচের জামি মসজিদ :

তোঘলক বংশের রাজত্বের শেষ ক্রান্তিলগ্নে ঝাঙ্গির ৬৫ কি.মি. উত্তরে ইরিচে একটি জামি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদে বিকশিত স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য তার কিছু কিছু পূর্ব-প্রচলিত স্থাপত্য মাত্রার সাথে যোগ হয়েছিল। এ মসজিদ বৈশিষ্ট্যে যুগ পরিবর্তনকালের ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাধারণভাবে এ মসজিদের তেমন কোনো গুরুত্ব না থাকলেও কতকগুলো বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন ধারাকে চিহ্নিত করেছে যা তোঘলক ও পরবর্তী সৈয়দ যুগের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের ক্রমবিকাশের ধারায় লক্ষ করা যায়। ক্রমপরিবর্তনের ধাপের মাঝামাঝি অবস্থায় স্থাপত্য বিকাশ কেমন হয়েছিল তা এতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে খিলান অবয়বে এবং এর সংস্থাপনায় কৌশল প্রয়োগ বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এর স্তরবিন্যাস ও পরবর্তী ধাপে অনুগমনের লক্ষণ মুকলিত অবস্থায় এখানে দেখা গিয়েছে। মসজিদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ এর মিহরাব। এ মিহরাবের নকশা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে হিন্দু কারিগর ও স্থপতিগণের দক্ষ হাতের চিহ্ন বিধৃত হয়ে রয়েছে। হিন্দু কারিগরদের হাতে

মসজিদের মতো একটি ধর্মীয় পাদপীঠে পরিপূর্ণভাবে শিল্পনৈপুণ্যের সাথে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সুসম্পন্ন হওয়াটা একটি বিস্ময়কর ঘটনা ছিল। এ পরিবর্তনের ধারা সৈয়দ এবং লোদী বংশের সময় একইভাবে চলতে থাকে এবং ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত এ ধারা অব্যাহত ছিল।

সমাধিসৌধ বা মাকবারা নির্মাণ প্রকল্প :

সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলকের রাজত্বকালে দিল্লি ও তৎনিকটবর্তী এলাকায় মোট তিনটি সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। তন্মধ্যে (১) তাঁর নিজের সমাধিসৌধ, (২) খান-ই-জাহান তেলাঙ্গিনীর সমাধি ও (৩) কবির উদ্দিন আউলিয়া মাজার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

হাউজ-ই-খাস :

সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলকের রাজত্বকালে স্থাপত্য উন্নয়ন কার্যক্রমে মাকবারা নির্মাণ প্রকল্পে বিশেষ কতকগুলো বৈশিষ্ট্য জন্মলাভ করেছিল যা ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে উল্লেখযোগ্য অবদান বলে মনে করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের মাকবারাটির কথা বলা যায় যা একটি সুন্দর স্থাপত্যকর্ম। তাঁর সমাধিসৌধ অন্যান্য অট্টালিকা সম্প্রসারণেব ফলে এর একক অবস্থান লক্ষ করা যায় না; বরং অট্টালিকার অংশবিশেষ বলে মনে হতে পারে। এর অনেক অংশই বর্তমান ধ্বংসাবশেষ মাত্র। হাউজ-ই-খাসের সংলগ্ন যে স্থাপত্যকীর্তিগুলো বিরাজ করছে সেগুলো বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এর অনেকগুলো সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর সময়ে নির্মিত হয়ে পরবর্তী সময়ে সংস্কারপ্রাপ্ত ও সম্প্রসারিত হয়েছিল। এখানেই আলাউদ্দিনের মাদ্রাসা (কলেজ) এবং মাদ্রাসার একটি কক্ষে তিনি চিরনিদ্রায় নিদ্রিত। পরবর্তীকালে এ সব ইমারতের কিছু অংশে ভেঙে যাওয়া নির্মাণসামগ্রী অপসারণ করে সেখানে নিজের সমাধির ভিত্তি স্থাপন করেন। এটিই হাউজ-ই-খাস; সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলকের সমাধিসৌধ। যেহেতু মাদ্রাসা বর্তমানে একটি ধ্বংসস্তূপ, সেহেতু এর অভ্যন্তরের কক্ষগুলোর প্রকৃত নকশা পরিকল্পনা ও এর ব্যাপক বর্ণনা প্রদান কবা অত্যন্ত দুরূহ। তবে চিত্রের ন্যায় এটি স্পষ্ট হয়ে শোভাময় পুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় অবস্থান করছে। সমাধির সাথে আলাউদ্দিনের মাদ্রাসার কক্ষগুলো পশ্চিম দিকে ৭৬.২৫ মি. (২৫০ ফুট) ও ১২১.২৫ মি. (৪০০ ফুট) মতো উত্তর দিকে বিস্তৃত। দিঘির সম্মুখে দ্বিতল ও পিছনের দিকে একতলা বিশিষ্ট ইমারতের অবস্থান। ইমারত দু'টি খিলান ও স্তম্ভ শোভিত এবং বারান্দা সংযুক্ত। মাঝে মধ্যে বর্গাকার কক্ষ শীর্ষে গম্বুজ সংস্থাপিত হয়ে রয়েছে।

খণ্ডবিখণ্ড ও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া ফিরোজ শাহের সমাধিসৌধটির স্তম্ভশ্রেণী ও সর্দলের অবস্থান বুঝতে অসুবিধা হয় না। গম্বুজ, দেয়াল, হিন্দু-স্তম্ভ ও মুসলিম খিলানের সুষম সংমিশ্রণ ও সাধারণ অলঙ্কার ও কারুকার্য স্থাপত্য অনুশীলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। সময়ের নিদারুণ পীড়ন সত্ত্বেও নকশা পরিকল্পনার বিভিন্ন অংশের মাঝে সুষমতা, সংগঠিত অনুপাত এবং সাধারণ নির্মাণ প্রণালীর স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যগুলো বুঝা যায়। এটি একটি বর্গাকার ইমারত যার প্রতিপার্শ্বের পরিমাপ ১৩.৯০ মি. (৪৫ ফুট ৬ ইঞ্চি)। দেয়াল ক্রমশঢালু হয়ে উপরে উঠে গিয়েছে। প্রতি পার্শ্বের দেয়ালপৃষ্ঠ রিলিফ প্রণালীতে রচিত ভাস্কর্য দ্বারা অলঙ্কৃত। বর্গাকার কক্ষ শীর্ষে অষ্টভুজাকার পিপার উপর গম্বুজ সংস্থাপিত হয়েছে। গম্বুজটি অনুচ্চ এবং এর নির্মাণ প্রণালী সূক্ষ্মাগ্র প্রক্রিয়ায় সম্পন্ন। গম্বুজশীর্ষে অলঙ্কৃত মার্লন চূড়া (marlon) শোভা পাচ্ছে। ইমারতের কারনিস নির্মাণে শ্বেতমর্মর ও বেলে পাথর

ব্যবহৃত হয়েছে। দুপার্শ্বে মনোরম দরজা রয়েছে। উন্নত বপ্র ছিদ্রযুক্ত দেয়াল ও মাঝে মধ্যে নকশালঙ্কারে শোভিত।

দক্ষিণের দিকের সম্মুখভাগে প্রসারিত একটা নিচু মঞ্চ বা ছোট বেদির মতো রয়েছে যা খাড়া ও দুটি শোয়ানো দণ্ড সহযোগে মনোরম নকশায় প্রস্তর রেলিং দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সমস্তটা পরিবেষ্টনের মাঝে নির্জন একটা একান্ত ব্যক্তিগত আশ্রয় বলে মনে হয়। সমাধির বর্গাকার অভ্যন্তরের প্রতি কোনায় স্কুইঞ্চ পদ্ধতির খিলান গম্বুজকে ধারণ করে রয়েছে। পশ্চিম দেয়ালে খিলানায়িত মিহরাব সন্নিবেশিত।

সমাধির ভিতর ও বাইরে বেশ কিছু আরব্য নকশালঙ্কারে অলঙ্কৃত। কিন্তু এগুলো সমাধিসৌধ নির্মাণকালীন সময়ের কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। জাফর হাসান, জন মার্শাল এবং পি. ব্রাউন মনে করেন যে ১৫০৭-০৮ খ্রিস্টাব্দে সুলতান সিকান্দার লোদীর শাসনামলে (১৪৯৮-১৫১৭ খ্রি.) সংস্কার কার্য সম্পাদিত হওয়ার সময় এ অলঙ্করণ বিন্যাসের সূচনা হয়ে থাকবে।[১২] ফিরোজ শাহ তোঘলকের এ অপ্রভাবিত সাদাসিদা সারল্যপূর্ণ স্থাপত্যের বাহ্যিকরূপ সংস্কৃতি ও সুরুচির সাথে মর্যাদাপূর্ণ হয়ে তাঁর স্থাপত্য পদ্ধতির পরিপূর্ণ বিকাশের স্মৃতি বহন করছে।

খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধি (১৩৬৮-৬৯ খ্রি.) :

ফিরোজ শাহ তোঘলকের প্রধান উজির (মন্ত্রী) খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনী ১৩৬৮ বা ১৩৬৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হলে তার দেহাবশেষের উপর যে সমাধি বা মাকবারা নির্মিত হয়েছিল তা ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য অনুশীলনে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। ভারতের বুকে এখানেই প্রথম পূর্ণাঙ্গ অষ্টভুজের আবির্ভাব। প্রাক-মুসলিম যুগে রোমান ও বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের এলাকায় অষ্টভুজাকৃতির সমাধিসৌধ, গির্জা ও অন্যান্য অট্টালিকা নির্মিত হয়েছিল। ইসলামের ইতিহাসে খলিফা আব্দুল মালিক কর্তৃক জেরুজালেমে নির্মিত কুব্বাত-উস-সাখরা ইমারতটি অষ্টভুজাকৃতির। কিন্তু ভারতের বুকে অষ্টভুজাকৃতি আদর্শের নমুনা সুলতান ইলতুৎমিসের আমলে সুলতান ঘারীর সমাধিসৌধটি সামান্য আদলে দেখতে পাওয়া যায়। এর পরে সুলতান গিয়াসউদ্দিন বলবনের সমাধিসৌধের গম্বুজের পিপায় অষ্টভুজের ছাপ মুদ্রিত হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু প্রকৃত অষ্টভুজাকৃতির সমাধি নির্মাণ ফিরোজ শাহ তোঘলকের সময় সম্ভবপর হয়েছিল।

এ কারণে ভারতে স্থাপত্য কলাকৌশল চর্চার ইতিহাসে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সমাধিসৌধ নির্মাণে পরবর্তী দু শ বছর ধরে এটি মৌলিক পদ্ধতিরূপে প্রভাব বিস্তার করে রয়েছিল। তবে সমাধিসৌধের বহিস্থ আবেষ্টনী শক্তিশালী করার প্রয়োজনে পূর্ব পদ্ধতির ঈষৎ পরিবর্তনসহ দেয়াল কোনায় বুরুজ (tower) সংস্থাপন অব্যাহত ছিল। এটিই সমাধিসৌধকে প্রতিরক্ষার মজবুত বাঁধনে নির্মিত হওয়ার শেষ নিদর্শন বলে মনে করা যায়। নকশা পরিকল্পনায় যে নব প্রবর্তন এসেছিল তা অভ্যন্তরে প্রয়োগকৃত প্রযুক্তি দেখে বুঝা যায় যে এটি সম্পূর্ণভাবে পূর্ব অনুসৃত ধরন হতে ভিন্ন আকারের।

তিলাঙ্গিনীব সমাধি নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত সমাধিসৌধের নকশা পরিকল্পনায় বর্গাকার অব্যাহত ছিল এবং তিলাঙ্গিনীর মাকবারায় অষ্টভুজের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়। প্রকৃতপক্ষে এটি তখন একটা নতুন কল্পন এবং এতে এ কল্পনাশক্তির বিকাশ ও সফলতা ঘটে। এ মাকবারাতেই অষ্টভুজ নকশা পরিকল্পনা পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করে সফল ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল এমন মনে করা যায় না। কারণ এর বিভিন্ন অংশের অনুপাত ও মাপ

অপরিণত ও কিছুটা অমার্জিত এবং কলাকৌশলে অপরিপক্বতার আভাস বিধৃত হয়ে রয়েছে। পি. ব্রাউন[১৩] এ প্রসঙ্গে মতামত পোষণ করেছেন যে 'ভারতীয় স্থপতিগণ আবিষ্কারের অনুপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এটি সম্পাদনে আত্মনিয়োগ করেছিল এবং সম্ভবত এটি আত্ম-উৎপাদনের মৌলিক উদ্ভাবন প্রসূত ফলাফল ছিল; অন্যপক্ষে এ সমাধিসৌধের আকার এবং এতে প্রয়োগকৃত স্থাপত্য পদ্ধতি ও প্রণালীর ব্যবহারের সাথে সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত জেরুজালেমের বিখ্যাত কুব্বাত-উ-সাখরার সমরূপ মনে করা হয়'। ঐ ঐতিহাসিক পবিত্র স্থাপত্যকর্মটি অষ্টভুজাকৃতিতে নির্মিত হয়েছিল। এর বারান্দা সংযুক্ত এবং শীর্ষে একটা গম্বুজ সংস্থাপিত ছিল। অবশ্য এ সমাধিসৌধে আরো কতকগুলো পদ্ধতি উপ্ত হয়েছে যা একে স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য দান করেছে (ভূমি নকশা নং- ৯)।
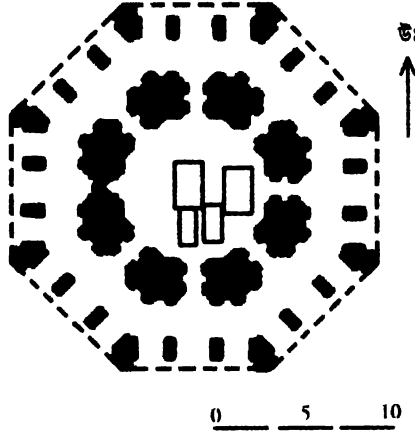
ভূমি নকশা নং-৯ : খান-ই-জাহান তিলাঙ্গীনিব সমাধি

জন মার্শালের মতে খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর মৃত্যুর (১৩৬৮ খ্রি.) দুবছর পর তার পুত্র খান-ই-জাহান জুনান শাহ কর্তৃক এ সমাধিসৌধ নির্মিত হয়।[১৪] এটি হযরত নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগাহের সামান্য দক্ষিণে এবং কালি মসজিদের পার্শ্বে অবস্থিত। এর আবেষ্টনী প্রাচীর লক্ষ করলে কোনায় বুরুজ সংযুক্ত দেখে দুর্গ প্রাকার বলেই মনে হবে। কিন্তু অভ্যন্তরের সমাধিসৌধটি সম্পূর্ণরূপে নতুন পদক্ষেপ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এর শীর্ষে একটি গম্বুজ শোভিত ও প্রত্যেক পার্শ্বে টিউডর পদ্ধতির খিলান সংযুক্ত হয়েছে। খিলানগুলো খুব নিচু এবং এদের উপরে প্রশস্ত প্রলম্বিত ছাঁইচ সংযুক্ত হয়েছে। ছাদের আট পার্শ্বে আটটি কিউপোলা (cupolas) প্রয়োগ পদ্ধতি একটি নতুন আবিষ্কার যা ভারতীয় স্থাপত্য অনুশীলনে ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত হয় নি (চিত্র নং- ১৭)। এগুলো ছাদের উন্নত বপ্রের ভাঁজের উচ্চতা অতিক্রম করে শোভিত হচ্ছে। এখানে খাঁজ সংস্থাপন প্রণালীর যে নতুন প্রয়োগ প্রথা চালু হয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে একটা প্রয়োজনীয় স্থাপত্য উপকরণ হিসেবে স্থায়িত্ব লাভ করেছিল। প্রত্যেক পার্শ্বে ৩টি করে আট পার্শ্বে মোট ২৪টি খিলান রয়েছে। এটি নির্মাণে ধূসর গ্রানাইট পাথর, লাল বেলে পাথর ও শ্বেতমর্মর ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রয়োজনমতো আস্তরকৃত। নির্মাণ কাজের শেষান্তে সাধারণত ইমারত গাত্রে কমনীয়তা ও সৌন্দর্য মূর্ত হয়ে উঠে তা এখানে সাধিত হয় নি। ফিরোজীয় যুগে প্রতিকূল অবস্থার মধ্য

দিয়ে স্থাপত্য অনুশীলনে সৌন্দর্যময়তার প্রতি কোনো প্রকার অনুরাগ ছিল না। প্রাথমিক পর্যায়ে এ ছোট অষ্টভুজের সূচনা হতে পরবর্তীকালে অষ্টভুজাকৃতি সমাধিসৌধ নির্মাণে উত্তর ভারতে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছিল। সৈয়দ ও লোদী বংশের সুলতানগণ ও রাজকর্মচারীর মাকবারার নকশা পরিকল্পনায় এটি অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে এবং প্রতি পদক্ষেপে নকশার বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতির উন্নয়ন ঘটেছে। প্রতি ধাপেই পূর্ববর্তী ভুলভ্রান্তির সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন ঘটেছে। এভাবে এর পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ ও সৌন্দর্যময়রূপে সাসারামে শেরশাহের সমাধিসৌধে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে।

কবিরউদ্দিনের মাকবারা :

তোঘলক আমলে অনেক দরবেশ ফকিরের কবরের উপর স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। তন্মধ্যে সাধক হযরত কবিরউদ্দিন আউলিয়ার মাকবারা সমধিক প্রসিদ্ধ। স্থানীয়ভাবে এটি লাল গম্বুজ নামে পরিচিত। এটি নাসিরউদ্দিন মাহমুদ শাহের (১৩৮৯-৯২ খ্রি.) রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল বলে জন মার্শাল অনুমান করেন।[১৫] এর সাধারণ আকৃতি এবং শ্বেত ও লাল প্রস্তর মালমসলায় গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের সমাধির উপর নির্মিত সৌধের অনুরূপ হলেও দৃশ্যত এর বিকৃত বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তথাপি এটি স্থাপত্য কারুকার্যের জন্য দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এর প্রাণবন্ত রঙ বৈচিত্র্যের অভিনবত্ব সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর আলাই দরওয়াজা বা প্রথম তোঘলক সুলতানদের স্থাপত্য কারুকার্যের মানের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। যদিও তখন হতে ৬০ বছরের অধিককাল পূর্বে উক্ত প্রণালী প্রচলিত হয়েছিল। এ সমাধিসৌধের রূপসজ্জার মধ্য দিয়ে দাসত্বসুলভ পুরোনো আদর্শের অনুকরণ লক্ষ করা যায়। এ সাধকের সমাধিসৌধ একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে বুঝা যায় যে এটি গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের সমাধিসৌধ হতে আকারে প্রায় অর্ধেক। এর গম্বুজ পূর্বটির ন্যায় সম্পূর্ণ গোলাকার নয়। শ্বেতমর্মরের পরিবর্তে সিমেন্ট সহযোগে কোনাকুনির অস্পষ্ট আভাসযুক্ত দুর্বল গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। গম্বুজের বহিরাবরণ কালক্রমে হয়তো নষ্ট হয়ে অনুরূপ অবস্থা ধারণ করেছে, কিন্তু এ স্থাপত্য কাঠামোর প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করে বলা যায় যে তখন স্থাপত্যিক প্রাণস্পর্শতা ও একে যুগোপযোগী করে তোলার অবকাশ এ দু'এর অভাব ঘটেছিল। তাই বলা চলে তৈমুর লঙের দ্বারা তোঘলক রাজত্ব ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়ার পূর্বেই স্থাপত্য অনুশীলনের অবনতির বীজ উপ্ত হয়েছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীতে তোঘলক সুলতানগণ ভারতে এক নতুন বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থাপত্যকলার গোড়াপত্তন ঘটিয়েছিল। যার স্পষ্ট ছাপ সে সময়ের স্থাপত্য ইমারত, মসজিদ, মাকবারা, দুর্গপ্রাকার ও শহর নির্মাণ প্রণালী ও পদ্ধতিতে দেখা যায়। এদের গঠন বৈচিত্র্যে কারিগরি প্রকৌশলে ও অঙ্গসজ্জার কারুকার্যে নতুন নির্মাণ রীতির প্রবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায়। পূর্ব যুগের ইমারত সৌষ্ঠব বৃদ্ধির কায়দা-কানুনের সাথে এর খুব একটা ঘনিষ্ঠতা ছিল না। তোঘলক যুগের প্রায় সব রকম স্থাপত্য নির্মাণ কার্যগুলো দেখতে খুব ভারী ও মোটা আকারের। অনেকগুলো নুড়ি পাথর দ্বারা মসলা প্রয়োগে গেঁথে তোলা হয়েছে। দেয়াল ধীরে ধীরে উপরের দিকে ক্রমঢালু হয়ে উঠে গিয়েছে। ঢালু পোস্তা বা বুরুজ দেয়াল গাত্রের সাথে সংযুক্ত হয়েছে এবং স্থাপত্য নিদর্শনগুলো সারল্যে ভরপুর।

মামলুক ও খল্‌জী স্থাপত্যের জৌলুসপূর্ণ ও দীপ্তময় আকর্ষণ তোঘলক স্থাপত্যে ছিল না। অমিতব্যয়িতার বিলাসপূর্ণ জাঁকালো উজ্জ্বল প্রভাব শূন্যতাই তোঘলক স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়েছে। তোঘলক স্থাপত্যের পূর্বের ইমারতগাত্র কারুকার্য ও প্রাচুর্যের প্রগলভতায় সমাচ্ছন্ন দেখতে পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে পরবর্তী যুগে নির্মিত তোঘলক ইমারতগুলো

সুরুচিসম্পন্ন, আড়ম্বরহীন এবং মিতাচারিতার প্রশান্ত অবয়ব। তোঘলক সুলতানদের রাজশক্তি যতই প্রাচীনত্ব লাভ করেছিল ততই স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য কঠোর ও অতি নৈতিকতাজনিত শুভ্রতার আবরণে শোভিত হয়ে উঠেছিল।

যে কোনো পরিবর্তন ধারাবাহিক নিয়মের মধ্য দিয়ে ঘটে থাকে, আকস্মিকভাবে হয় না। এ পরিবর্তন ঐতিহাসিকভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তোঘলক যুগে অর্থনৈতিক অবনতি অন্যদিকে যুগ সংস্কৃতির দুঃসহ বেদনা; খল্জী যুগের অতিরিক্ত ধনসম্পদের অহেতুক ব্যবহারের প্রতিক্রিয়া রূপ মনোভাবের কার্যকর প্রবাহ এবং আলাউদ্দিন খল্জীর হঠকারিতাপূর্ণ রাজনৈতিক চেতনা সে সময়ের জনমতকে উপেক্ষা, অপমান ও পর্যুদস্ত করার ফলে যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা বাজনৈতিকভাবে কুতুবউদ্দিন মোবারক শাহ ও খল্জীদের বিদ্রোহী সভাসদগণের অন্যতম খসরু শক্তিশালী ও প্রভাবশালী ওমরাহ গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের মসনদ লাভে সহায়তা করেছিল। এভাবে স্থাপত্য গতিধারাতেও পরিবর্তন এসেছিল।

তোঘলক কোষাগারের অর্থশূন্যতা ও অভাবজনিত কশাঘাত স্থাপত্য সাধনাকে প্রাচুর্য হতে সরলতার পথে ধাবিত হতে বাধ্য করেছিল। এ ছাড়া সুলতান মোহাম্মদ বিন তোঘলক ও সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলকের চরম ধর্মীয় গোঁড়ামির কারণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সর্বত্র রক্ষণশীল মনোভাবের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল। স্থাপত্য ইমারতগুলো ধর্মীয় আদর্শপুষ্ট কঠোর আবরণহীন কাঠামোতে পরিণত হয়েছিল। তাতে রস, সুবাস, চাকচিক্য কোনোটাই অভিসিঞ্চিত হতে পারে নি।

অবশ্য আলাউদ্দিন খল্জীর স্থাপত্য ইমারতগাত্রে যে অলঙ্করণ, খোদাই নকশা, নকশালঙ্কার উৎকীর্ণ লিপির প্রয়োগসহ বিচিত্র বর্ণের রঙের ব্যবহার ও কারুকার্যে যে উচ্চমানের কমনীয়তার ছাপ প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল তা সুলতান গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের স্থাপত্য কার্যক্রমে কিছু কিছু ব্যবহার দৃষ্ট হলেও পরবর্তী সুলতানদের সময় স্থাপত্যচর্চার মান একেবারে নিম্নমুখী হয়ে পড়েছিল।

যে কোনো শিল্প সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং এর ধারাবাহিকতা পৃষ্ঠপোষকতার ওপর নির্ভরশীল। স্থপতি ও কারিগরদের অব্যাহত অনুশীলনের পরিবেশ সৃষ্টি না হলে বা সমর্থকদের দ্বারা অনুপ্রাণিত না হলে শিল্পীদের অর্জিত মান ধীরে ধীরে নিম্নগামী হয়ে একসময় আর কিছুই ধরে রাখার মতো অবশিষ্ট থাকে না। তোঘলক যুগে তেমন কোনো উচ্চ বা উন্নতমানের কারিগর, স্থপতি ও প্রকৌশলীর উপস্থিতি লক্ষ করা যায় না। যে সমস্ত স্থপতি কুতুব মিনার বা আলাই দরওয়াজা নির্মাণ করেছিল তাদের মৃত্যু হওয়ার পর তাদের বংশধর বা শিষ্যদের রক্তে শিল্প প্রতিভা মিশিয়ে রইলেও তোঘলক সুলতানগণ তা কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছিল। আর সে কারণেই ঐ যুগের শেষের দিকে শিল্প প্রতিভার অপমৃত্যু ঘটেছিল।

স্থাপত্যশিল্পে অনুশীলন ধারাবাহিকতায় যে মান অর্জিত হয়েছিল তা প্রয়োগের স্থান অভাবে ধীরে ধীরে শিল্পীরা ভুলে গেল; তাদের মৃত্যুর পর এটি ধরে রাখার কোনো উপায় ছিল না এবং একেবারে অবনতির চরম পর্যায়ে নেমে এসেছিল। আর এ বিলীয়মান ক্রান্তিলগ্নে ফিরোজীয় স্থাপত্যগুলো নির্মিত হয়েছিল।

সর্বশেষে যে অভিজ্ঞ ও দক্ষ নগণ্য সংখ্যক স্থপতি সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলকের স্থাপত্যকর্মে নিয়োজিত ছিল তাদের প্রতিনিয়ত নানাপ্রকার বাধাবিপত্তি ও অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ বাধা সাধারণত অর্থনৈতিক দিক হতে আসত। আর্থিক অনটনের কারণে উপযুক্ত মালমসলা ও উপকরণ যোগান অভাবে স্থপতিরা ইচ্ছা অনুসারে তাদের কর্ম নিষ্পন্ন

করতে পারত না। এভাবে শিল্পমান আশানুরূপ অর্জিত হয় নি। এ কারণে তোঘলক স্থাপত্য পূর্বযুগে নির্মিত ইমারতের মতো হৃদয়গ্রাহী হতে পারে নি; যদিও তোঘলক যুগে গাজী শাহ্না ও আব্দুল হকের মতো স্থপতিরা স্থাপত্য প্রকল্প পরিচালনা ও তত্ত্বাবধান করেছিল তথাপি আর্থিক মহার্ঘতাই এসব মনীষা সমৃদ্ধ স্থপতিদের চিন্তাচেতনা সুন্দরের বিকাশকে পূর্ণতা দান করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

একঘেঁয়েমিভাবে একই বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি প্রয়োগ এবং উপকরণসহ শিল্পরীতির পুনঃপুনঃ ব্যবহার কল্পনাহীন গদ্যময় অমসৃণ চিন্তাভাবনায় বহিঃপ্রকাশ স্থাপত্য অবনতির অন্য একটি কারণ। সযত্নে এদেশের অমুসলমান কারিগরদের মেধার ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ অথচ তাদের প্রতিভা লোদী সুলতানদের যুগে বা মোগলদের প্রাণস্পর্শী স্থাপত্য সৃষ্টিকে সার্থক করে তুলেছিল।

ঐতিহাসিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে তোঘলক যুগের স্থাপত্য সৃষ্টি অন্যান্য সুলতানগণের স্থাপত্য ইমাবত নির্মাণের মধ্যে কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায়। ভারতের বাইর হতে তোঘলক সুলতানগণ কারিগর এনে নিয়োগ করতেন এবং এদেশীয় কারিগরদের প্রতিভাকে অবহেলা করত। অথচ এসব বহিরাগত কারিগরদের এ দেশের জলবায়ু ও পরিবেশ সম্পর্কে কোনো মূলীভূত ধারণা বা অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান ছিল না। তারা এখানকাব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় না করেই তোঘলকদের বাঁধাধরা নিয়মে গদ্যময় নির্মাণের ফরমায়েশ মাফিক নির্মাণ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সক্রিয় থাকত। এদেশের আকাশ বাতাসের শিক্ষা যাদের ছিল না তারা এদেশের মাটিতে কোনো ধরনেব স্থাপত্য নির্মাণরীতি ও প্রক্রিয়া মানানসই এবং টেকসই হবে তা বুঝে স্থাপত্য উন্নয়ন সাধনে ব্রতী হতে পারে নি। স্থানীয় প্রথা, সূত্র ও প্রযুক্তি নিষিক্ত করে ভারতীয় চেতনার স্থাপত্য গঠন করার চেয়ে ভারতের বাইরে রপ্ত করা বেশি পরিচিত ইসলামি ফর্মুলার কষ্টিপাথরে তাদের ধ্যান-ধারণাকে তোঘলক অর্থনীতির প্যাঁচের অনুসরণে নির্মাণ কাজ রূপায়িত হয়েছিল।

এ সত্ত্বেও হিন্দু সর্দল ও মুসলিম খিলানের সাথে সমন্বয় সাধন করে গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের সমাধিসৌধের হিন্দু মটিফের অলঙ্করণ উপকরণের ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়, তবে তা ব্যতিক্রম মাত্র। এর কোনো ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় না। এতদসত্ত্বেও সমসাময়িক ঐতিহাসিক বিবরণী ও বর্ণনায় তোঘলক যুগের স্থাপত্য সমৃদ্ধতার যেটুকু আভাস মূর্ত হয়ে উঠেছে তা নগণ্য নয়। শামস্-ই-সিরাজে বর্ণিত অভিমত বা মোহাম্মদ বিন তোঘলকের প্রধান বিচারপতি (কাজী-উল-কুজ্জাত) মরক্কোর অধিবাসী বিশ্ববিখ্যাত পর্যটক ইবনে বতুতার ভ্রমণ কাহিনীতে তোঘলক স্থাপত্য সম্পর্কে তাৎক্ষণিক বর্ণনায় বিশেষভাবে রাজধানীর ইমারত অট্টালিকার যে হৃদয়গ্রাহী চিত্রপট অঙ্কিত রয়েছে তা প্রণিধানযোগ্য।

কবিরউদ্দিন আউলিয়ার সমাধিসৌধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে তোঘলক যুগের স্থাপত্য কার্যক্রমের পতনমুখীতার অন্তর্নিহিত ভাব সত্য প্রকটভাবে বহিঃপ্রকাশিত হয়েছিল। স্থাপত্য আদর্শের যে শক্তি ও সমৃদ্ধতা অর্জিত হয়েছিল তা ম্রিয়মাণ হয়ে তখন প্রাণস্পর্শতা হারিয়ে ফেলেছিল। আর এ অবনতির চরম অবস্থাকে দ্রুততায় এগিয়ে নেয়ার জন্য চতুর্দশ শতাব্দীর ক্রান্তিলগ্নে তৈমুর লঙের অভিযান ছিল শেষ আঘাত। তৈমুর লং দিল্লি নগরী লুণ্ঠন করলেন এবং অধিবাসীবৃন্দকে (আবালবৃদ্ধবনিতা) হত্যা করলেন। সে যুগে আক্রমণকারী বিজয় লাভের পর পরাজিতের ওপর অত্যাচার ও নিপীড়ন একটা স্বাভাবিক রীতি বলেই পরিগণিত হত। তৈমুর লং নিজের বিবরণীতে এটি লিপিবদ্ধ করেছেন যে তিনি শিল্পী, কারিগর, স্থপতি ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগকে মৃত্যু হতে রেহাই দিয়েছিলেন। বিশেষ করে পাথর কাবিগর, মিস্ত্রি,

প্রকৌশলী এবং স্থাপত্য নির্মাণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে তার রাজধানী সমরখন্দে একটি জামে মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনে তাঁর আদেশের অপেক্ষায় থাকার জন্য নির্দেশ জারি করেন।

তৈমুর লঙের আন্তরিক অভিলাষ এরূপ ছিল যে তাঁর নির্মিত স্থাপত্য খুবই উচ্চমানের হবে এবং তার কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে না। তিনি সামান্য কয়েকদিনের মধ্যে দিল্লিকে জনশূন্য নির্জন শ্মশানে পরিণত করলেন যেরূপ একদা বেবিলন নগরীর ভাগ্যে ঘটেছিল। অবরুদ্ধ দিল্লি নগরী হতে শুধুমাত্র কারিগর ও প্রকৌশলীরা তাঁর সঙ্গে অনুগমন করতে বাধ্য হল না; বরং সাথে নির্মাণসামগ্রীও লুণ্ঠন করে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হল যাতে তার নির্মাণ কাজে কোনো প্রকার ত্রুটি না হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী হতে জানা যায় যে ৯০টি হস্তী সহযোগে লুণ্ঠিত পাথর ও অন্যান্য নির্মাণসামগ্রী নিজ প্রাসাদ নির্মাণের জন্য দিল্লি হতে সমরখন্দে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

প্রায় দু শ বছর যাবৎ দিল্লি ভারতের রাজধানী হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ জনপদে পরিণত হয়েছিল এবং এর আশপাশে পাঁচটি নগরী গড়ে উঠেছিল। এসব নগর দুর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে বহু সুরম্য-হর্ম্য ও ইমারত গড়ে উঠেছিল। কিন্তু তৈমুর লঙের লোমহর্ষক বিজয় শেষে প্রত্যাবর্তন প্রাক্কালে এগুলো সব ধূলিসাৎ হয়ে যায়। এর সাথে সাথে ভারতীয় স্থাপত্য ইতিহাসে তোঘলক বংশ আর স্থাপত্য অনুশীলনের নজির সৃষ্টি করতে পারে নি। তাদের স্থাপত্যধারা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী ৫০ বছরে এ ধ্বংসলীলার আবেশ ধীরে ধীরে কেটে উঠে নবযাত্রার সূচনা সৈয়দ ও লোদী বংশের সুলতানদের আমলে সীমিত মাত্রায় হয়েছিল। তবে ফুতুহুত-ই-ফিরোজশাহী বা সীরাত-ই-ফিরোজশাহীর স্থাপত্য বর্ণনার মতো স্থাপত্য ঐ যুগে আর আসে নি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ২০।

২. *তদেব*।

৩. অবশ্য *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া* (ভলিউম-৩) নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, এ দুর্গ প্রাচীরে ২৮টি প্রবেশপথ ছিল।

৪. Its (Tughluqabad) cyclopean walls, towering gray and somber above the smiling landscape; colossal, splayed out-bastions; frowning battlements, tiers on tier of narrow loophdes; steep entrance ways; and lofty narrow portals : all these contribute to produce an impression of unassailable strength and melancholy grandeur; দেখুন ঃ জন মার্শাল, "দি মনুমেন্টস অব মুসলিম ইন্ডিয়া", *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া,* ভলিউম-৩, দিল্লি, ১৯৫৮, পৃ. ৫৮৫।

৫. গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের সমাধিতে সর্দল ও খিলানের সমন্বয়ে প্রবেশপথ নির্মাণে বহু পূর্বেই এ উভয় রীতির সংমিশ্রণে প্রবেশপথ নির্মাণের দৃষ্টান্ত মুসলিম স্থাপত্যে রয়েছে যার উদাহরণ হল জেরুজালেমের কুব্বাত-উস-সাখরা (৬৯২); দেখুন এ.বি.এম. হোসেন, *আরব স্থাপত্য,* ঢাকা (শিল্পকলা একাডেমী, ১৯৭৯), পৃ. ৬০।

৬. শীর্ষদণ্ড হিসেবে আমলকীর সঙ্গে প্রাথমিক যুগের ভারতীয় শিল্পকলার অমল 'শিলা' বা 'বিশুদ্ধ প্রস্তর'-এর একটা সম্পর্ক হয়তোবা থাকতে পারে। আবার কলসের ব্যবহারের পিছনে হয়তোবা

এরূপ ধারণা কাজ করতে পারে যে, মৃত ব্যক্তির তৃষ্ণার্ত আত্মা জলপান করে তৃষ্ণা নিবারণ করবে। এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে নাবাতিয়ান আরবরা প্রস্তর সমাধিগাত্রে জল পাত্র বা কলসের নকশা খোদিত করত। অবশ্য ভারতীয় মন্দিরের চূড়াতেও এ ধরনের প্রতীকের ব্যবহার দেখা যায় যার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত হল খাজুরাহের মন্দির। তবে শীর্ষদণ্ড হিসেবে হিন্দু স্থাপত্যে কলসকে দেবতার পানীয় রসের পাত্রের প্রতীক হিসেবে গণ্য করা হলেও মুসলিম স্থাপত্যে কেবলমাত্র আলঙ্কারিক উপকরণ হিসেবেই সংযোজন ঘটে; দেখুন : পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (বুদ্ধিস্ট এন্ড হিন্দু পিরিয়ডস), বোম্বে, ১৯৫৯, পৃ. ১১; আর.এ.জয় রাজভর, *এ্যান আউট লাইন অব ইসলামিক আর্কিটেকচার*, নিউইয়র্ক, ১৯৭২, পৃ. ২৯৩; এ. কে. কুমারশামী, *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়ান এন্ড ইন্দোনেশিয়ান আর্ট*, ১৯ নিউইয়র্ক, ১৯৬৫, আলোকচিত্র-৭৪।

৭. জন মার্শাল, "দি মনুমেন্টস অব মুসলিম ইন্ডিয়া", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯৯।

৮. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২।

৯. Adılabad, which was merely an outwork of the large city of Tughluqabad and almost ıdentıcal with it in style, calls for no comment; cf: জন মার্শাল, "দি মনুমেন্টস অব মুসলিম ইন্ডিয়া", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৮৭।

১০. ফুতুহাত-ই-ফিরোজশাহী (ইলিয়ট কর্তৃক ইংরেজি অনূদিত), ভলিউম-৩, পৃ. ৩৮২।

১১. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫।

১২. জাফর হাসান, *লিস্ট অব মোহামেডান এন্ড হিন্দু মনুমেন্টস ইন দি প্রভিন্স অব দিল্লি*, ভলিউম-৩, কলিকাতা, ১৯২২, পৃ. ১৭৮-১৭৯; জন মার্শাল, "দি মনুমেন্টস অব মুসলিম ইন্ডিয়া", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯১; পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৪।

১৩. Such formation was self originated, initiated by an Indian builder with an instinct for invention; on the other hand the shape and architectural treatment bear a resemblance to one of the most sacred monuments of Islam, the so-called the mosque of Omar in Jerusalem, originally built in the seventh century, cf: পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫।

১৪. জন মার্শাল, "দি মনুমেন্টস অব মুসলিম ইন্ডিয়া", *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯১।

১৫. *তদেব*, পৃ. ৫৯৩; তবে পি. ব্রাউন মনে করেন যে, এটি দ্বিতীয় গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের শাসনামলে (১৩৮৮-৮৯ খ্রি.) নির্মিত হয়েছিল। আবার আর.নাথ এবং ওয়াই.ডি. শর্মার মতে এর নির্মাণকাল ছিল ১৩৭৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত; দেখুন : পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৫; আর.নাথ., *হিস্ট্রি অব দি সুলতানাত আর্কিটেকচার*, দিল্লি, ১৯৭৮, পৃ. ৭৭; ওয়াই. ডি. শর্মা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৪।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সৈয়দ স্থাপত্য (১৪১৪ - ১৪৫১ খ্রি.) ও লোদী স্থাপত্য (১৪৫১ - ১৫২৬ খ্রি.)

তৈমুর লঙের ভারত অভিযানের পর উত্তর ভারতের দিল্লিভিত্তিক রাজ্যের প্রদীপ শিখা কোনো রকমে ধিক্‌ধিক্ করে জ্বলছিল। এটি যুগের প্রভাবশালী সাম্রাজ্যের ছায়ামাত্র ছিল। দিল্লির আশপাশ নিয়ে একটি অল্প পরিসরের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে এটি কোনো রকমে টিকে ছিল। সাম্রাজ্য নামের যথেষ্ট বৈভব ও প্রতাপ এটির ছিল না। যাহোক পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম আড়াই দশকে সৈয়দ বংশ (১৪১৪ - ১৪৫১ খ্রি.) ও লোদী বংশ (১৪৫১ - ১৫২৬ খ্রি.) দ্বয়ের পর্যায়ক্রমিক রাজত্বকালে দিল্লিভিত্তিক কিছু স্থাপত্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল।

তাদের স্থাপত্য তৎপরতার উদ্যম ও উদ্যোগ ছিল না; নিস্তেজ ও জরাগ্রস্ততা বিরাজ করছিল। এ সময়ে যে সামান্যতম স্থাপত্যকর্ম গড়ে উঠেছিল তা প্রশমিত মননের প্রাণচাঞ্চল্যহীন অবদানরূপে প্রতিভাসিত হয়েছে। তেমন কোনো বড় রকমের ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য পূর্বযুগের মতো সৃষ্টি হয় নি। রাজপ্রাসাদ, দুর্গ, উচ্চমানের মসজিদ, বিদ্যাপাদপীঠ বা কোনো নগর বা বেসরকারি ভবন নির্মিত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক বিবরণীতে লিপিবদ্ধ নেই। মনে হয় এ যুগসন্ধিক্ষণে শাসক ও প্রজাদের মানসিক প্রবণতা ছিল মৃতের কবরের উপর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের প্রতি বেশি সক্রিয়তা।

বাস্তবিকপক্ষে স্থাপত্য পরিসরে এটি ছিল মাকবারা নির্মাণের যুগ। সম্ভবত ইতঃপূর্বে কবরের উপর সৌধ নির্মাণের প্রতি মতো আন্তরিক স্পৃহা দেখা যায় নি; যেরূপ সৈয়দ ও লোদী সুলতানদের সময়ে দেখা গিয়েছিল। যেহেতু দিল্লি ছিল প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু সেহেতু সমাধিসৌধ নির্মাণের এটিই উপযুক্ত স্থানরূপে বিবেচিত ও মনোনীত হয়েছিল। তাই দেখা যায় দিল্লির চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা সে সময় বিরাট গোরস্থানে পরিণত হয়েছিল। সমাধি নির্মাণের বিশেষ কোনো স্থান নির্দিষ্ট করা না থাকলেও দু নগরীর সীমানার মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাগুলোতে ছোটবড়ো নানা ধরনের সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। এমনকি এ পরিসীমার বাইরেও গোরস্থান সম্প্রসারিত হয়েছিল। এ সময় দিল্লির আশপাশে গুরুত্বপূর্ণ পঞ্চাশের অধিক মাকবারা নির্মিত হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে তিনটি বৃহৎ আকারের সমাধিসৌধ গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রয়েছে। এ তিনটি সমাধিসৌধই দিল্লির শাসকদের সৈয়দ এবং লোদী বংশীয়। এ ইমারতগুলোর সাথে আর যেসব সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল তা প্রভাবশালী আমির-ওমরাহদের সমাধি বলে চিহ্নিত হয়েছে।

এ সমাধিসৌধগুলো বিভিন্ন আকারের এবং স্থাপত্যিক গঠনও একইরূপ ছিল না। এর কোনোটি সাধারণ উন্মুক্ত স্তম্ভায়িত কারুকার্যময় চন্দ্রাতপ ও প্রদর্শনরূপে মূল কবরাংশ, আবার কোনটি জাঁকজমকপূর্ণ আবেষ্টনী প্রাচীর ঘেরা কাঠামোর সাথে সুউচ্চ তোরণ দরজা সংযুক্ত। এসব সমাধিসৌধের সাথে অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে মসজিদ ও পশ্চিম পার্শ্বে সাময়িকভাবে শবদেহ (mortuary) রাখার নির্ধারিত স্থানের ব্যবস্থা ছিল।

সমাধিসৌধ নকশায় চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশনে ছোট দুর্গের আকারত্ব আর পূর্বের মতো ছিল না; বরং কেন্দ্রস্থলে মুল সমাধিরেখে খিলানায়িত উদ্যান ছাউনি (cloister) চতুর্দিক হতে পরিবেষ্টিত হয়ে শোভাবর্ধন করত। এভাবে মৃতের আত্মার জন্য পবিত্র ও শান্তিময় পরিবেশ সৃষ্টির প্রয়াস দৃষ্ট হয়েছে। এসব সমাধিসৌধের বিশেষ গুরুত্ব হচ্ছে এগুলো প্রধানত দুটি আকারে নির্মিত হয়েছিল- কোনোটি অষ্টভুজ, আবার কোনোটি বর্গাকার এবং এদের ব্যবহারের প্রথাভিত্তিক স্বাতন্ত্রতা ছিল।

অষ্টভুজ নকশা পরিকল্পনায় নির্মিত মাকবারা একতলা উচ্চতাবিশিষ্ট খিলানশোভিত স্তম্ভসারি অথবা ছাঁইচযুক্ত বারান্দা দৃষ্ট হয়; পক্ষান্তরে বর্গাকার মাকবারা কোনো বারান্দা ছাড়াই ত্রিতলসম উচ্চতাবিশিষ্ট হয়ে থাকে। অবশ্য উভয় প্রকারের সমাধি শীর্ষে গম্বুজ শোভিত হয়েছে। অনেক সময় অষ্টভুজের উন্নত বপ্রের (parapet) উপর দিয়ে ছত্রী শোভিত (kiosk) সারি নির্মিত হতে দেখা যায়। অন্যপক্ষে বর্গাকার সমাধিসৌধের চার কোনায় বিভিন্ন ধরনের ছত্রী সংযুক্ত হয়ে থাকে।

সৈয়দ ও লোদী সুলতানদের সমাধিসৌধরূপে যে তিনটি ইমারত চিহ্নিত হয়েছে এগুলো সবই অষ্টভুজ ইমারত। এটি অসম্ভব নয় যে অষ্টভুজাকার নকশা পরিকল্পনায় নির্মিত মাকবারাগুলো সুলতানদের চিরনিদ্রার স্থানরূপে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছিল, আর বর্গাকার নমুনার মাকবারাগুলো আমির-ওমরাহ বা উচ্চপদস্থ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের সমাধি নকশারূপে নির্ধারিত ও পরিগণিত হয়েছিল।

অষ্টভুজাকারের সমাধিসৌধ পূর্ববর্তী তোঘলক যুগের শেষ ক্রান্তিলগ্নে খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীর সমাধির উপর নির্মিত হয়েছিল। এখানে মাকবারা স্থাপত্য অষ্টভুজের প্রারম্ভিক সূচনা হয়ে এটি দেশের উচ্চ পর্যায়ের প্রথম শ্রেণীর ব্যক্তিদের মাকবারার ঐতিহ্যবাহী নকশারূপে ব্যবহার হতে দেখা গিয়েছে। এ ধরনের মাকবারার সূত্রপাত ১৩৬৮-৬৯ খ্রিস্টাব্দে হওয়ার পর হতে প্রায় দু শ বছর যাবৎ এ আদর্শে মাকবারা নির্মাণ কার্যক্রম অব্যাহত ছিল।

অষ্টভুজ সমাধিসৌধগুলোর মধ্যে দিল্লিতে তিনটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কাঠামো সুলতানদের সমাধি এবং এ ছাড়া বিহারের সাসারামে অবস্থিত শেরশাহের মাকবারায় অনুরূপ নকশার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। দিল্লিতে কমপক্ষে আরো দু'জন প্রখ্যাত ব্যক্তির কবরের উপর এ ধরনের স্থাপত্য কাঠামো গড়ে উঠেছিল। তিলাঙ্গিনীর মাকবারায় অষ্টভুজের সূচনা হলেও প্রতি পর্যায়ে এর ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন ঘটেছে। সৈয়দ ও লোদী যুগে অষ্টভুজের অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ সম্প্রসারণ ঘটে, সুর শাসনামলে এটি সর্বোচ্চ সীমায় পৌছে এবং মোগল যুগের প্রথম দিকে আদম খানের মাকবারায় এসে এ অষ্টভুজাকৃতি সৌধের পরিসমাপ্তি ঘোষিত হয়। এরপরে অষ্টভুজের ব্যবহার তেমন আর লক্ষ করা যায় না।

উপরে বর্ণিত তিনটি রাজকীয় অষ্টভুজ সমাধিসৌধের মধ্যে দুটি সৈয়দ সুলতানদের এবং একটি লোদী সুলতানের। প্রথমটি মোবারক সৈয়দ (মৃত্যু ১৪৩৪ খ্রি.),

দ্বিতীয়টি মোহাম্মদ সৈয়দের (মৃত্যু ১৪৪৪ খ্রি.), এবং তৃতীয়টি সিকান্দার লোদীর (মৃত্যু ১৫১৭ খ্রি.)। অবশ্য সমাধিসৌধগুলো সংশ্লিষ্ট সুলতানদের মৃত্যুর বছরে বা দু বছরের মধ্যে অথবা মৃত্যুর পূর্বে বা পরে নির্মিত হয়েছিল।

প্রথম দুটি সমাধিসৌধ এখনো মোটামুটি নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন স্থাপত্য কাঠামো। সম্পূরক কোণবিশিষ্ট আদিতে এদের মাঝে থাকলেও এখন আর তা বিদ্যমান নেই। পক্ষান্তরে সিকান্দার লোদীর মাকবারা একটি দৃষ্টিনন্দন সমাধিসৌধ। এটি একটি বৃহৎ আবেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত এবং দক্ষিণ পার্শ্বে অলঙ্কৃত তোরণ ও পশ্চিম পার্শ্বে মসজিদ। এর প্রত্যেক কোণে অষ্টভুজাকার চূড়া নির্মিত হয়েছে। এখানে সমাধির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থায় ব্যাপক যুগ পরিবর্তনের একটা সুনির্দিষ্ট ধাপ চিহ্নিত করছে। সুলতানি যুগের সংরক্ষিত দেয়াল পরিবেষ্টনের মাঝে কবর ও বিপুল আকারের উচ্চ বেদিসংলগ্ন উদ্যান শোভিত যা পরবর্তীকালে মোগল যুগের সমাধিসৌধের বহিঃপ্রকাশিত অবয়বের মধ্যবর্তী রূপটাই এখানে বিধৃত হয়ে রয়েছে।

এ তিনজন সুলতানের মাকবারার নকশা পরিকল্পনা, বিভিন্ন অংশের সুষমতা ও সঙ্গতি একইরূপ। তবে মোবারক শাহ সৈয়দের মাকবারার গম্বুজটি পরবর্তী অন্য দুটি মাকবারাব গম্বুজের উচ্চতা হতে ১.২৫ মি. (৪ ফুট) ছোট। এদের অষ্টভুজের প্রতি বাহুর মাপ ৯.২০ মি. (৩০ ফুট) ও প্রশস্ততা ২২.৬০ মি. (৭৪ ফুট) এবং গম্বুজের উচ্চতা ১৬.৫০ মি. (৫৪ ফুট)। এ মাপ অবশ্য গম্বুজের চূড়া বাদ দিয়ে। এ প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ্য যে মোবারক শাহ সৈয়দের সমাধির গম্বুজের উচ্চতা ১৫.২৫ মি. (৫০ ফুট)। এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে মোবারক শাহ সৈয়দের মাকবারা প্রথম নির্মিত হয়েছিল। এর নকশা পরিকল্পনায় আদি নকশা তেলাঙ্গিনীব সমাধির আকার হতে উল্লেখযোগ্য উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল। তবে এর গঠন কাঠামো তখনো গবেষণার বিষয় ছিল। কেননা গম্বুজ পিপার চতুষ্পার্শ্বে গম্বুজ ও ছত্রীর অবস্থান সুষম ছিল না। এটি সহজেই প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে যে যারা এটি নির্মাণ করেছেন তারা একটি সাধারণ ভুল অনুধাবন করতে সক্ষম হন নি। মাকবারা কাঠামোর উপর অংশটুকু মানুষের সাধারণ দৃষ্টি রেখার গড় অনুপাতের উপর লক্ষ রেখে দৃষ্টিগোচর করানো হয় নি। এ অসামঞ্জস্যপূর্ণ আঙ্গিক অবস্থান একটি অংশ অপর একটি অংশকে ঢেকে চাপকিয়ে দেয়ার ফলে পরিকল্পনার উদ্দেশ্য প্রতিবিম্বিত হয়ে সৌন্দর্যমাত্রা সৃষ্টি করতে পারে নি। সম্পূর্ণ কাঠামোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে মনে হয় যেন এর ফলে সামান্য মাত্রায় আঘাত দ্বারা সৃষ্ট হত-চেতনা উচ্চতা অষ্টভুজ অংশের উপর ছত্রী ও গম্বুজসহ সঙ্কুচিত অবস্থায় মুচড়িয়ে জড়িয়ে এটি ধরে রয়েছে (চিত্র নং- ১৮)।

যাহোক প্রাথমিক পর্যায়ের এ ভুলত্রুটি দশ বছর পরে নির্মিত মোহাম্মদ সৈয়দের মাকবারা নির্মাণকালে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিল এবং এখানে ভুলের সংশোধন করা হয়েছিল। কেননা নির্মাতারা ইতোমধ্যে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জনে সমর্থ হয়েছিল। এ উদাহরণে দেখা যায় যে গম্বুজ পিপা কয়েক ফুট উঁচু করা হয়েছে এবং আনুপাতিক হারে ছত্রীও উঁচু করা হয়েছে। এ কল্পন বিষয়বস্তু বাস্তব প্রভাবে সার্থকভাবে রূপ লাভ করে যাতে প্রতিটি অভ্যন্তরীণ অংশগুলোর অনুপাত, সুষমতা ও বিন্যাস মনোরমভাবে সংস্থাপিত হয়ে প্রয়োজনীয়তার সকল শর্ত পূরণ করেছিল। এ শ্রেণীর অষ্টভুজের মধ্যে সকল বৈশিষ্ট্য নিয়ে এটি একটি উৎকৃষ্টতম আদর্শ নমুনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

পরবর্তী শতাব্দীতে অষ্টভুজ নকশায় এর চেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী বৃহৎ আকারের মাকবারা নির্মিত হয়েছিল। মোহাম্মদ সৈয়দের মাকবারা পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য বা মূল নকশা অপরিবর্তিত

থেকে পরবর্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত কিছু প্রশংসনীয় উৎকৃষ্টতা এবং বর্ণনা করার মতো অনুপমের সংযোজন অষ্টভুজে ঘটেছিল। এটি প্রতীয়মান হয় যে অষ্টভুজের বাহুর প্রসারতা ৯.২০ মি. (৩০ ফুট) যা এর উচ্চতার সমান। অবশ্য এ মাপের মধ্যে বুনিয়াদ ভিত্তি ও কোনায় অবস্থিত চূড়া অন্তর্ভুক্ত। অন্যপক্ষে এ মাপটাই আবার লতাপাতা কারুকার্যসহ সমগ্র মাকবারার অর্ধেকের সমান।

প্রতিটি অষ্টভুজ বাহু মুখে তিনটি খিলানায়িত দরজা যা স্তম্ভ দ্বারা বিভাজিত। তিনটি দরজার মধ্যে মাঝের দরজা অন্য দুটি হতে অপেক্ষাকৃত প্রসারিত। এখানে এটি অবগত হওয়া যায় যে, উচ্চতার সকল রেখা ৯০ ডিগ্রিতে স্থাপিত হয়েছে। তবে একমাত্র ব্যতিক্রম যে গথিক্ পদ্ধতি সাদৃশ্য দেয়াল বহির্ভাগে প্রতি কোনায় ঢালু আলম্ব নির্মিত হয়েছিল। এ স্থাপত্য অঙ্গের ঢালুতা সর্বত্র পরম্পরায় বিদ্যমান ছিল। কবর প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরভাগ অষ্টভুজাকার নকশায় নির্মিত যার ব্যাস ৭.২০ মি. (২৩.৫ ফুট)। অন্যপক্ষে একই সাথে খিলান ও কড়ি ব্যবহারের মাধ্যমে প্রত্যেক পার্শ্বের প্রবেশপথের উপরটা গঠন করা হয়েছে। এরূপ বৈশিষ্ট্য সংবলিত কবরই অষ্টভুজের পূর্ণরূপ ছিল। অবশ্য ৭৫ বছর পরেও অনুরূপ অষ্টভুজ নকশায় সিকান্দার লোদীর সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। তবে এতে উচ্চতার ক্ষেত্রে ঈষৎ পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। লোদী সুলতানের সমাধিতে ছত্রী ছিল না এবং গঠন কাঠামোতে কিছু গুরুত্ব ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়েছিল। এ সময় পর্যন্ত গম্বুজ কেবলমাত্র পাথর গাদাগাদি করে নির্মাণ করা হত। কিন্তু এ সমাধিসৌধ নতুনের প্রবর্তন দেখা যায়। এ নব পরিবর্তনটা ছিল গম্বুজ নির্মাণে। এর গম্বুজ ভিতর ও বাইরের আলাদা আলাদা খোল বা খোলস (shell) দ্বারা গঠিত ছিল এবং দু খোলসের মাঝে খানিকটা ফাঁকা বা ফাঁপা ছিল। ভারতীয় স্থাপত্যে এ ধরনের দ্বি-গম্বুজ নির্মাণ প্রথম এখানেই কিছুটা সফলতা লাভে সক্ষম হয়।

গম্বুজ নির্মাণে এ জাতীয় প্রচেষ্টা এর কিছু পূর্বে ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে শিহাব উদ্দিন তাজ খানের সমাধিসৌধে প্রয়োগ করা হয়েছিল। অবশ্য ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার লোদীর সমাধিসৌধ দ্বি-গম্বুজ নির্মাণের প্রচেষ্টা ভ্রূণাবস্থায় স্থিত বা প্রাথমিক অবস্থায় স্থির ছিল। এটি পরীক্ষামূলক অবস্থা হতে পরবর্তী সময়ে ভারতীয় স্থাপত্য কার্যক্রমে একটি পরিপূর্ণ বিকাশমান স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যরূপে চিহ্নিত হয়েছিল (চিত্র নং- ১৯)। এ ধরনের গম্বুজের ব্যবহার ও অনুশীলন পারস্য, ইরাক, জেরুজালেম ও পশ্চিম এশিয়ার অন্য দেশগুলোতে পূর্ব হতেই অব্যাহত ছিল।[১]

গম্বুজ গঠন প্রণালীর এরূপ পদ্ধতির প্রয়োগ হঠাৎ শুরু হয় নি। নতুন পদ্ধতির প্রবর্তনের পিছনে যে বর্ধিত ঝোঁক ও অনুরাগ দেখা যায় তা প্রকৃতপক্ষে গম্বুজের অবস্থানকে উচ্চ করে বাইর দিক হতে একে চিত্তাকর্ষক ও মনোরম করে দেখানোর প্রয়োজনে করা হয়। এরূপ ক্রিয়া প্রণালী স্বাভাবিকভাবে ভিতর বা তলছাদের উচ্চতা বৃদ্ধি হতে সহায়তা করে। এভাবে ভিতরের উচ্চতা অনুপাতহীনভাবে প্রকোষ্ঠের আকারের তুলনায় দৃশ্যমান হয়। কিন্তু এরূপ পরিস্থিতিতে ভিতর ও বাইরের গড় উচ্চতার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে ফাঁকা রেখে ভিতর ও বাইরে একটি করে গম্বুজ খোল গঠন করে অবশেষে দুটি মিলিয়ে একটি গম্বুজ গড়ে ওঠে। এতে প্রকোষ্ঠ অভ্যন্তরে উচ্চতার অনুপাত মানানসই করা হয়। প্রকোষ্ঠের বাইর হতে গম্বুজের উচ্চতা যতই মনে হোক না কেন দ্বি-গম্বুজের কারণে ভিতরের দিক থেকে ততটা উচ্চ মনে হয় না। পরবর্তীকালে বৃহৎ আকারের গম্বুজ নির্মাণে একই রীতি ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছিল।

সৈয়দ ও লোদী যুগে আরো যেসব সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল তা বর্গাকার নকশায়। তবে একটা ব্যতিক্রম ছাড়া সবই পঞ্চদশ শতাব্দীর উদাহরণ। কিন্তু এ সময়েও অনুরূপ মাকবারা এবং বৃহৎ আকারের রাজকীয় অষ্টভুজ মাকবারার চেয়ে উৎকৃষ্ট মনোরম ধরনের মাকবারা নির্মিত হয়েছিল। দিল্লির আশপাশে কমপক্ষে সাতটি এ ধরনের স্মৃতিসৌধ রয়েছে। এ মাকবারাগুলো অতি উচ্চমানের। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাদের স্মৃতি রক্ষার্থে নির্মাণ করা হয়েছিল তাদের নামের উল্লেখ উক্ত মাকবারা গাত্রে উল্লিখিত হয় নি। তাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে এদের সঠিক পরিচিতি উদঘাটন সম্ভবপর হয় নি। কাজেই এসব মাকবারা কেবলমাত্র স্থানীয় নাম দ্বারা আখ্যায়িত হয়েছে। স্থানীয়ভাবে এগুলো গম্বুজ নামেই পরিচয় বহন করছে। তবে গম্বুজ শব্দটির সাথে সুবিধামতো নাম জুড়ে দিয়ে এগুলোকে বিভিন্ন নামে পরিচিত করিয়ে দেয়া হচ্ছে। এ সমাধিগুলো হলো- (১) বড় খান-কা-গম্বুজ, (২) ছোট খান-কা-গম্বুজ, (৩) বড় গম্বুজ (১৪৯৪ খ্রি.), (৪) শীষ গম্বুজ, (৫) শিহাব উদ্দিন তাজ খান-কা-গম্বুজ (১৫০১ খ্রি.), (৬) দাদী-কা-গম্বুজ এবং (৭) পলি-কা-গম্বুজ। এদের অধিকাংশই নিঃসঙ্গ ও বিচ্ছিন্ন কাঠামো, কোনো আবেষ্টনী প্রাচীর নেই। হয়তো আদিতে নির্মাণ প্রাক্কালে বা পরবর্তী সময়ে ছিল। সময়ের পীড়নে ভেঙে পড়েছে। এখানে দু ধরনের সমাধিসৌধের তুলনামূলক আকারত্বের ধারণা এভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যেতে পারে যে অষ্টভুজ সমাধির গড় পরিমাপ বর্গাকার সমাধিসৌধ হতে এক-তৃতীয়াংশ বৃহৎ; অন্যপক্ষে বর্গাকাব সমাধিসৌধগুলো অষ্টভুজ সৌধগুলো হতে এক-তৃতীয়াংশ অধিক উচ্চতাবিশিষ্ট।

উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে সর্ববৃহৎ বড় খান-কা-গম্বুজ মাকবাবাটির গম্বুজ শীর্ষ পর্যন্ত ২৪.৪০মি. উচ্চতাবিশিষ্ট। তবে গম্বুজ চূড়াটি ভেঙে যাওয়ায় এর পরিমাপ কিছুটা অনুমানসাপেক্ষ। এ বর্গাকার সমাধিসৌধগুলো অষ্টভুজ হতে গঠনগত পার্থক্য রয়েছে; যেমন বর্গাকার সমাধিসৌধের দেয়ালগাত্রে কোনো ঢালুতা নেই এবং সমস্ত নকশা ও রেখা যথাযথ লম্বমান। এগুলো দু এবং তিনতলা উচ্চতাবিশিষ্ট এবং সঠিক কোনো মেঝে নেই। তবে খিলানশ্রেণী শোভিত এবং সামনের দেয়াল স্থাপত্যিক নকশালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত। এদের সম্মুখভাগ এমনভাবে নকশায়িত করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় অংশটুকু বা মাঝের এলাকাটুকু সমান্তরাল ক্ষেত্রের আকার ধারণ করেছে এবং বিরাট বদ্ধ খাঁজ খিলান সমগ্র কাঠামোর উচ্চতার কাছাকাছি স্থান দখল করে রয়েছে এবং এটি প্রায় উন্নত বপ্র পর্যন্ত সম্প্রসারিত।

এ খাঁজ খিলানে কড়ি ও প্রলম্বিত আলম্ব রীতিতে দরজা সংযুক্ত এবং এর ঠিক উপরের ফাঁকা জায়গায় খিলানায়িত জানালা অবস্থিত। সম্মুখ দেয়াল সংলগ্ন তলাগুলোতে কুলঙ্গি খিলান ভিতরে ঢোকানো বা প্রশমিত সমান্তরাল খোপ খোপ আকার ধারণ করেছে। এ খিলানগুলো দরজার প্রতি পার্শ্বে খোলা জানালার মতো আকার ধারণ করেছে। এ প্রক্রিয়ার ফলে অভ্যন্তরভাগে আলো প্রবেশ করতে পারে।

উন্নত বপ্র ও গম্বুজসহ সমগ্র অবকাঠামো অষ্টভুজের মতো একই স্থাপত্যিক প্রণালী ও রীতিতে নির্মিত। এক কক্ষ বিশিষ্ট কামরার অভ্যন্তরভাগ বর্গাকার নকশায় নির্মিত এবং প্রতি পার্শ্বে ভিতরে ঢুকানো খিলানপথ রচিত ও পশ্চিম পার্শ্বে মিহরাব নির্মিত হয়েছে। গম্বুজের ভার বহন করার জন্য প্রত্যেক কোনায় স্কুইঞ্চ পদ্ধতির চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয় এবং কারনিসের উপর দিয়ে বদ্ধ খিলানশ্রেণী ধাবিত।

বর্গাকার সমাধিসৌধ নির্মাণ প্রক্রিয়া ত্রয়োদশ শতাব্দীতে উদ্ভূত হয়ে অব্যাহত ছিল। অবস্থিত স্কুইঞ্চ খিলানের সাথে সম্পর্কের বিন্যাস ঘটেছে। এ বিন্যাসে দেখা যায় যে মামলুক স্থাপত্যের সুলতান ইলতুৎমিসের সমাধি নকশা ও পদ্ধতির বহু ক্ষেত্রে সাদৃশ্য রয়েছে। তবে

এ সমাধিগুলো নিঃসন্দেহে আদি আদর্শ এবং কাঠামোর বিভিন্ন অংশের রূপায়ণে যে শৈল্পিক উৎকর্ষ অর্জিত হয়েছিল তা হতে দূরে সরে গিয়েছিল। তবে ইমারত নির্মাণে ঐ উৎস হতে অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা গ্রহণ করেছিল তা সমর্থনযোগ্য। মোটের ওপর এসব স্মৃতিসৌধ বিরাট আকারের ও আপাত চিত্তাকর্ষক হওয়া সত্ত্বেও মৌলিকত্বের বিচারে এগুলো ছিল বৈশিষ্ট্যহীন ও নবপ্রবর্তনহীন অনাকর্ষণীয় সৃষ্টি। সম্মুখ দেয়াল প্রধান বিবেচিত বৈশিষ্ট্য খিলানের খোপ বা প্যানেলের ব্যর্থ ও অক্ষম আবির্ভাব এবং প্রকাশ ছিল অনুপ্রেরণাহীন চেটালো একঘেঁয়ামিপূর্ণ।

দিল্লিতে সৈয়দ ও লোদী যুগে কোনো জামে মসজিদ সরকারিভাবে শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয় নি। তবে বেসরকারিভাবে ব্যক্তিগত উদ্যোগে সমাধিসৌধের পাশাপাশি অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। সিকান্দার লোদীর প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নির্মিত এরূপ একটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ হল মট-কি-মসজিদ। পরবর্তী অর্ধ-শতাব্দীর মধ্যে বিশেষ ধরনের নকশা পরিকল্পনায় যে মসজিদগুলো নির্মিত হয়েছিল তার প্রাথমিক সূচনা হয়েছিল এখানেই। এভাবে যে আদর্শ জন্মলাভ করেছিল তার পরিণাম ছিল সুদূরপ্রসারী। তাৎক্ষণিকভাবে সামান্য এ প্রভাব মসজিদ নির্মাণের কার্যক্রমে পরবর্তী সময়ে অনুকরণীয় হয়ে উঠেছিল। তুলনামূলকভাবে এটি ক্ষুদ্র হলেও একটি বেসরকারি ব্যক্তিগত মসজিদ নকশা হতে রাজকীয় মসজিদের জন্মলাভ সম্ভবপর হয়েছিল। কেননা শেরশাহের প্রাচীর বেষ্টিত দুর্গ নগবীর পুরোনো কেল্লার কিলা-ই-কুহনা মসজিদটি এ আদর্শের অবদান।

এ আদর্শে নির্মিত মসজিদগুলো হল- (১) বড় গম্বুজ সংলগ্ন মসজিদ (১৪৯৪ খ্রি.), (২) মট-কি-মসজিদ (১৫০৫ খ্রি.), (৩) জামালিয়া মসজিদ (১৫৩৬ খ্রি.) এবং (৪) কিলা-ই-কুহনা মসজিদ (১৫৫০ খ্রি.)। এখানে প্রথম তিনটি মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করা হল এবং চতুর্থটি সুর স্থাপত্যের সাথে আলোচিত হওয়ার অবকাশ রইল।।

বড় গম্বুজ মসজিদ :

একই আদর্শে নির্মিত চারটি মসজিদের প্রথম উদাহরণ হচ্ছে বড় গম্বুজ মসজিদ। পারিবারিক মসজিদ হিসেবে এটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মসজিদের দক্ষিণ দিকের মিহরাবের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে এটি ৯০০ হিজরি মোতাবেক ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে সিকান্দার লোদীর রাজত্বকালে (১৪৮৯-১৫১৭ খ্রি.) নির্মিত।[২] সম্ভবত মাখদুমা-ই-জাহান সিত্তি মুগলাবুয়া নামক জনৈক মহিলা কর্তৃক এটি নির্মিত হয়েছিল।[৩] এ মসজিদটি নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বযুগে ব্যবহৃত স্থাপত্য আদর্শের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য স্পষ্টত এখানে বিকশিত হতে দেখা গিয়েছে। এখানকার বিকাশমান পর্যায়কে পি. ব্রাউন যুক্তিসম্মত শিল্পসত্তার বিকাশ (logical development) বলে আখ্যায়িত করেছেন।[৪]

মসজিদ কাঠামোর বহির্দিকের পিছন দে'য়ালে নির্মিত ক্রমসরু চূড়া এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক উপাদানগুলোর প্রয়োগ প্রতীয়মান হয় যে ফিরোজীয় যুগের প্রভাব পুনরায় ফিরে এসেছে। তা সত্ত্বেও এর সাথে কিছু নবপ্রবর্তন ও সজ্জায়ন দৃশ্যমান হয়েছে। নবপ্রবর্তনে এ ধারণা সৃষ্টি করে যে এর নির্মাতারা তাদের স্মৃতি হতে কালির লেপন মুছে ফেলে পুরোনো রীতির পুনরুজ্জীবন করতে চেয়েছিলেন; অথবা মসজিদের নতুন নকশা ফর্মুলার অনুসন্ধান করেছিলেন; বিশেষ করে সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদের অংশ গঠনে পূর্ব অবস্থা হতে প্রস্থান বা ভিন্ন পথে গমন লক্ষ করা যায়। এ নবপ্রবর্তনটা ছিল খিলানায়িত পাঁচটি দরজার বৈশিষ্ট্য। এগুলো একই উচ্চতাসম্পন্ন, কিন্তু অসাধারণ বা অস্বাভাবিক আকারত্ব সংবলিত। তবে

আঙ্গিক সুষমতা ও বৈশিষ্ট্যসূচক চিহ্ন বহন করলেও খিলানের দুর্বল বক্রতা তুলনামূলকভাবে উচ্চতা অনুসারে অধিক প্রসারতা এবং বহির্ভাগস্থ দেহরেখায় ঢালাইকৃত ছাঁচের স্থলে সমতল মসৃণে ফিরে যাওয়ার বেমানান প্রকাশ প্রতিভাসিত করছে যে নির্মাতা বা নকশা পরিকল্পনাকারীদের যে উদ্দেশ্যই থাকুক না কেন তা শেষ পর্যন্ত সফল হয় নি। তাদের মনের মাঝে প্রশংসনীয় আদর্শ সুন্দরভাবে দানা বেঁধে থাকলেও বাস্তবে বিকাশের ক্ষমতা তাদের ছিল না। কেননা এটি সমানভাবে স্পষ্ট যে তারা দৃঢ়প্রত্যয় উৎপাদক ফলাফল সৃষ্টি করার মতো প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ছিলেন না।

মট-কি-মসজিদ :

বড় গম্বুজ মসজিদের দশ বছর পর মট-কি-মসজিদ, নির্মিত হয়েছিল। মসজিদটি সিকান্দার লোদীর প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক সম্ভবত ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়[৫]। অবশ্য মি. স্টিফেনের মতে, এটি ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দে[৬] এবং পি. ব্রাউনের মতে, ১৫০৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।[৭] এ মসজিদ কাঠামো প্রত্যক্ষ করলে অনুধাবন করা যায় পূর্বের অস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন কল্পন বিষয়বস্তুকে কীভাবে একটা পূর্ণাঙ্গ অবয়বে রূপায়িত করা হয়েছিল যা কোনোক্রমেই কম সৌষ্ঠবময় ও মাধুর্যপূর্ণ শক্তির পরিচয় বহন করে না। স্থাপত্যশিল্পের এ অগ্রসরমানতা স্মরণ করিয়ে দেয় যে প্রথম মসজিদের নকশা পরিকল্পনাটি ছিল একটা খসড়া, অপরিপক্ব প্রাথমিক সূচনামূলক ধারণা এবং এ ধাবণার ভ্রূণ বাস্তবায়িত হয়ে ওঠার জন্য অভিজ্ঞ পারদর্শী ও প্রজ্ঞাবান কারিগরের প্রয়োজন ছিল, যারা প্রকারান্তরে একটা অপরিমার্জিত ও অশোধিত বস্তু অবস্থা হতে একটা সুন্দর ও সুসম্পন্ন স্থাপত্যকর্মে পরিণতি ঘটাতে সক্ষম হয়েছিল।

এ মসজিদটি তুলনামূলকভাবে প্রথম মসজিদ অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ। এর নামাজগৃহের দৈর্ঘ্য ৩৮ মি. (১২৪ ফুট ৬ ইঞ্চি) এবং প্রস্থ ৮.৩৫ মি. (২৭ ফুট ৩ ইঞ্চি)। এরূপ বৃহৎ আকারের প্রসারিত মসজিদের কারণে কারিগরদের শিল্পদক্ষতা প্রয়োগ ও প্রদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। ফলে এখানে অনেকগুলো দৃষ্টি আকর্ষণীয় বিশেষ বৈশিষ্ট্য জন্মলাভ করেছিল; যেমন- মসজিদের সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদের (facade) প্রধান পাঁচটি খিলানের আকারত্ব ও বিভিন্ন অংশের সুষমতা ও অসমানুতা। 'বে'গুলোর প্রাধান্য ও গুরুত্ব আরোপকরণ। খিলানের ব্যবধান বৃদ্ধি, বিন্যাস ও তিনটি গম্বুজের আয়তন ও গঠন, পিছনের দেয়ালের ক্রমসরু চূড়ার পরিমার্জন, প্রবেশপথের নকশা পরিকল্পনা এবং এর পার্শ্বের দিকে উন্মুক্ত ঝুলানো আনন্দদায়ক ব্যালকনি বা বারান্দা। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য হচ্ছে এর পিছনের কোনায় দুতলা বিশিষ্ট টাওয়ারের মানানসই অবস্থান, যা ইমারতের প্রাণরস এনে দিয়েছে। এতগুলো বৈশিষ্ট্য সুষ্ঠু সমন্বয়ের ফলে এ মসজিদটি আনন্দদায়ক, মনোরম ও পরিপূর্ণ প্রাণবন্ততা সৃষ্টি করেছিল। এ ছাড়া এতে নানা রঙের ব্যবহারের প্রাধান্যতা স্থাপত্য নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণ ও উপাদানসামগ্রীর মানের গ্রহণযোগ্যতা ও উৎকৃষ্টতা এবং এর চেয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে গম্বুজের রকমারি ওজন ধারণ করে থাকার পদ্ধতির উদ্ভাবন ও পরিবর্তনশীলতা।

গম্বুজ নির্মাণের ক্ষেত্রে অবস্থান্তর পর্যায়ে পূর্ববর্তী মসজিদগুলোতে স্কুইঞ্চ পদ্ধতির আনুকূল্য বা প্রাধান্য দেখা গিয়েছিল। কিন্তু এ মসজিদের অনুরূপ পর্যায়ে প্রচলিত স্কুইঞ্চ পদ্ধতির পরিবর্তে স্ট্যালেকটাইট পান্দানতিফ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে অবস্থান্তর পর্যায়ে পরিবর্তনশীলতা আনয়ন করা হয়েছে। পক্ষান্তরে এটি স্থাপত্য কাঠামোগত বৈশিষ্ট্য ও

অলঙ্করণের সম্মিলিত প্রাচুর্যতাপূর্ণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি বললেও ভুল হবে না এবং এ দু সম্মিলিত গুণে মসজিদটি লক্ষণীয়, মার্জিত, আকর্ষণীয় ও সুরুচিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এখানে আড়ম্বরশীলতার প্রভাবে পূর্বের মসজিদ হতে উন্নতমানের হতে পেরেছিল বলে মনে করা যায়।

প্রচলিত খোদাই কাজের পরিবর্তে আদর্শ নকশা, কারুকার্য, ঢালাই নকশা বা পলেস্তারার মাধ্যমে খিলানের উপর দিয়ে সীমানা বর্ডার এবং বৃহদাকার মেডেল বা গোলাকার নকশা বিশেষ খিলানের ত্রিকোনাকার ভূমিতে সন্নিবেশিত হয়েছে। এ ছাড়া ইসলামি রীতিতে ও ইসলামি প্রতিনিধিত্বমূলক নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ সৌন্দর্যময় আরব্য নকশালঙ্কার ছাঁচে ঢালাইয়ে উপরিতলা হতে অভিক্ষিপ্তভাবে অনুচ্চ রিলিফ কারুকার্য (low-relief) এবং উজ্জ্বল রঙের অঙ্কন দৃষ্ট হয়।

এসব দেখে মনে করা যেতে পারে যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে একদল প্রতিভাবান শিল্পী ও কারিগর মসজিদের নির্মাণ কাজে নিয়োজিত ছিল। এটি প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না যে ধর্মীয় পাদপীঠগুলো সুন্দর রুচিশীলভাবে সাজানোর একটা প্রবণতা কার্যকর ছিল। মসজিদের শিল্পমূলক কাজের অস্তিত্বের মধ্য দিয়ে স্মৃতিপথে উদ্ভাসিত করে যে ঠিক একই সময়ে স্পেনের আল-হামরা প্রাসাদগাত্রে একই কৌশলে অনুরূপ নকশালঙ্কার ও শিল্পচর্চার নজির স্থাপনের বিস্ময়কর ঘটনা প্রত্যক্ষ করা যায় এবং এ স্মৃতি অনন্ত ও অবিরামভাবে মানুষের মনোজগতে চিরন্তনত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ ক্রমধাবার তৃতীয় মসজিদটি হচ্ছে জামালিয়া মসজিদ। এর নির্মাণ কাজ ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্তির মধ্য দিয়ে এ প্রসঙ্গে নবযুগ সৃষ্টিকারী একটা ঘটনা ইতিহাসের পৃষ্ঠায় চিরদিনের জন্য লিপিবদ্ধ হয়ে যায়। এর দশ বছর পূর্বে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়েছে। মীমাংসাত্মক যুদ্ধে লোদী বংশের পতন ও মধ্য এশিয়ার ফারগানার মোগলদের বিজয়ের সাথে সাথে দিল্লির সুলতানি যুগের অবসান ঘটে।

একজন সুলতানের পর আর একজন মিত্র শাসক; এক বংশ আর এক বংশের উত্তরাধিকারী হয়েছে; একটা রাজপরিবারের উত্থান, সম্প্রসারণ এবং অন্য একটির পতন হয়েছে। কিন্তু দিল্লিতে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় শক্তি নিজেদের মাঝে উত্থান-পতনের অটল ও সঙ্গতিপূর্ণ থেকে তিন শ বছরের বেশি সময় ধরে প্রশাসনিক কার্যক্রম অব্যাহত ছিল। কোনো হৃদয়বান সুধী এ ঐতিহাসিক মুসলিম রাজধানীর যে কোনো ধ্বংসাবশেষের পার্শ্বে দাঁড়ালে তার মনোজগতে এ অতীত বিজড়িত স্মৃতিগুলোর নাটকীয় রোমান্স পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে একে দোলায়িত, প্রভাবিত ও উদ্বেলিত না করে পারে না। এ নাটকীয় মনোমুগ্ধকর উচ্ছ্বাস কিছুটা রাজনৈতিক, কিছুটা চারুকলা ও স্থাপত্যশিল্প সাধনার উদ্দীপনায় উচ্চাভিলাষী কামনার অন্তিম বহিঃপ্রকাশ। তা ছাড়া পুরাতন দিল্লির স্তব্ধ পরিবেশে সুদীর্ঘকালব্যাপী শক্তিধর শাসকদের চলার ভঙ্গিমা, পদচিহ্ন ও গতিপথের মুছে যাওয়া ছায়ার অস্তিত্ব হৃদয়ে অনুভব করা যায় নিবিড়ভাবে। কুতুবউদ্দিনের প্রত্যাদিষ্ট ও অনুপ্রাণিত দর্শন দৃষ্টি ও দূরদর্শিতাপূর্ণ স্থাপত্য অনুরাগশীলতা তাঁর স্থাপত্যকর্মের সফলতা এনে দিয়েছিল। তাঁর স্থাপত্যকর্মসূচিতে কুতুব মিনারের মতো বিশ্ববিখ্যাত স্তম্ভ বা টাওয়ার জন্মলাভ করেছিল।

সুলতান আলাউদ্দিনের দাম্ভিকতাপূর্ণ আত্মকেন্দ্রিক চেতনার কল্পিত ফসল বৃহৎ মসজিদ ও অতিকায় আকারের মিনার যা জীবনব্যাপী প্রচেষ্টায় সমাপ্ত করা যায় নি। গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের ধনরত্ন সঞ্চয় স্পৃহায় গলিত স্বর্ণের ভাণ্ডার রক্ষণের ভূগর্ভস্থ কক্ষ তোঘলক

সুলতানদের উন্মাদনাপ্রসূত স্থাপত্য পরিকল্পনা ও তার অবিচলিত ফলাফল। অনেক সুলতান, বাদশাহ ও রাজা থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ নিজেদের স্মৃতিকে অমরত্ব দান করানোর জন্য শহর, দুর্গ, মসজিদ ও স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করেছিলেন যেগুলো আজ কালের কপোলতলে বিস্মৃতির অতলগহ্বরে নিমজ্জিত। এভাবেই একদিন সুলতানি যুগের দৃশ্য নাটকের অবসান ঘটেছিল। তবে নাট্যমঞ্চ শূন্য থাকে নি। তৈমুর বংশীয় মোগলরা নাট্যমঞ্চে অবতীর্ণ হল। জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবর কাবুল হতে এসে দিল্লীর মসনদ অধিকার করে নতুন আঙ্গিকে সমৃদ্ধিশালী ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যচর্চা শুরু করেন।

ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে বিরাট একটা পরিবর্তন আসতে শুরু হয় মোগলদের ক্ষমতা গ্রহণের সাথে সাথে। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণের বা হস্তান্তরের দ্রুততার সাথে তৎপ্রচলিত স্থাপত্যধারা থেমে যায়নি বা রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের দ্বারা এটি তাৎক্ষণিকভাবে প্রভাবিত হয় নি। মোগলদের ক্ষমতা গ্রহণের পরেও স্থাপত্যে লোদী সুলতানদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ইমারত নির্মাণ প্রক্রিয়া পরবর্তীকালে কমপক্ষে ৫০ বছর অব্যাহত থাকতে দেখা গিয়েছে।

কারণ হিসেবে পি. ব্রাউন উল্লেখ করেছেন যে, বিগত পুরোনো শাসক বংশধর ও জ্ঞাতি সম্প্রদায়ের আত্মসম্মান ও গর্ববোধ মানসিকতা, বংশের আদি অভ্যাসগত শৈল্পিক চেতনাবোধ, অন্যপক্ষে মোগলদের রাজ্য সংগঠন ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণের প্রয়াসে অধিক মনোনিবেশ করায় শিল্প সংস্কৃতিমূলক বা স্থাপত্য কার্যক্রমে জোরালোভাবে আত্মনিয়োগ করার অবকাশ সৃষ্টি না হওয়া। তাই মোগল প্রশাসন চালু হওয়ার পরও পূর্ববর্তী স্থাপত্য আদর্শ বাধাহীনভাবে চলমান থাকতে অসুবিধা হয় নি। তবে মোগল স্থাপত্য যে একেবারে শুরু হয় নি তা নয়। পুরোনো স্থাপত্যধারা তখনো বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত স্থাপত্য ইমারত সৃষ্টি করে চলেছিল। সৈয়দ ও লোদী বংশের রাজত্ব না থাকলেও তাদের অনুচরদের স্থানীয় প্রভাব প্রতিপত্তি মোটেই কম ছিল না।

জামালিয়া মসজিদটি মোগল সম্রাট হুমায়ূনের (১৫৩০-১৫৪০ খ্রি. এবং ১৫৫৫-১৫৫৬ খ্রি.) আমলেই নির্মিত হয়েছিল। জামালিয়া মসজিদের নির্মাণের মধ্য দিয়ে বুঝা যায় যে রাজ্যেব পরিস্থিতি তখনো স্থিতিশীল অবস্থায় আসতে পারে নি এবং মোগলদের রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারে শিথিলই ছিল। সামাজিক জীবনে তারা নেমে আসতে পারে নি এবং স্থাপত্যের পূর্বরীতি নিরুৎপাতে স্বাভাবিকভাবে অব্যাহত ছিল।

মসজিদের নকশা পরিকল্পনা অনুসারে প্রতীয়মান হয়েছে যে, নির্মাতারা পুনরায় খল্জী যুগের অলঙ্কারযুক্ত স্থাপত্য আদর্শের প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। স্থাপত্য নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত উপাদান-উপকরণ ও অন্যান্য দ্রব্যাদির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তোঘলক যুগের ভাঙা নুড়ি বেলে পাথর ও প্লাস্টার ব্যবহারের পরিবর্তে মসৃণ সাইজ করা (ashlar) পাথর ইমারত নির্মাণে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এ মসজিদে তুলনামূলকভাবে পূর্বে নির্মিত মসজিদগুলোর স্থাপত্য প্রকৃতি ও রীতি হতে নিশ্চিতভাবে অতিশয় পরিমার্জিত ও সূক্ষ্ম শৈল্পিক কাজের দিকে অগ্রসরমানতা লক্ষ করা যায়। নির্মাতাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল উত্তম উপাদান ও নিঁখুত শিল্পকাজের সমাবেশকরণ।

যদিও এ মসজিদের কর্মপ্রণালী ও স্থাপত্য কৌশল ইত্যাদি পূর্বের মসজিদগুলো অপেক্ষা অগ্রসরমান ও অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরনের ছিল; আসলে কিন্তু এ ক্রমিকের তৃতীয় মসজিদের সকল স্থাপত্য নির্মাণ পদ্ধতি ক্রমিকের শেষ মসজিদ পুরোনো কেল্লার (দিল্লি) কিলা-ই-কুহ্না মসজিদের কেবলমাত্র নির্মাণের প্রস্তুতি পর্ব ছিল। শেরশাহের রাজকীয় মসজিদটাই এ পর্বের চূড়ান্ত ও শেষ উদাহরণ। এটি ভারতের স্থাপত্য অঙ্গে এক নবদিগন্তের

সূচনা করেছিল। অন্যপক্ষে এটি মন্তব্য করা চলে যে কিলা-ই-কুহনা মসজিদের বৈশিষ্ট্যগুলো মোটামুটিভাবে দিল্লি সালতানাত যুগের সাথে নবাগত মোগলদের স্থাপত্য অনুশীলনের সংযোগকারী মধ্যবর্তী ক্রান্তিকালরূপে চিহ্নিত করা যায়।

এখানে আপাতত সুলতানি আদর্শ অনুসরণ করে মোগল যুগে যে স্থাপত্য কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল তা আলোচনা করা গেল। দিল্লিতে এ সময়ে দু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল—প্রথমটি ঈশা খানের সমাধিসৌধ (মৃত্যু ১৫৪৭ খ্রি.) এবং দ্বিতীয়টি আদম খানের সমাধিসৌধ (মৃত্যু ১৫৬১ খ্রি.)।

এ সময়েই দিল্লির বাইরে বুন্দেলখন্দের কাল্পি ও ঝান্সি জেলার লালিতপুরে দুটি সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল যাদের স্থাপত্য আদর্শ ও পদ্ধতি পূর্বানুরূপ ছিল। এদের প্রথমটি চৌষট্টি গম্বুজ নামে পরিচিত। ধারণা করা যায় যে এটি কোনো লোদী শাসকের সমাধিসৌধ; অবশ্য পরেরটি একটি জামে মসজিদ।

১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে গোয়ালিয়ারে মোহাম্মদ গউছের সমাধির উপর এ সৌধটি নির্মিত হয়েছিল। এটি লোদী স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। এতে যথেষ্ট পরিমাণে নকশালঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে ব্যবহৃত নকশার ধরন গুজরাটে গড়ে উঠা স্থাপত্য প্রভাব মিশ্রিত বলে মনে করা যায়। তবে এটি বিশ্লেষণে দেখা যায় যে পন্থার সংশ্লেষণ বা সমন্বয় (synthesis of the mode) একই ধরনের। আবার স্থাপত্য প্রণালীর পরিচর্যার স্বরূপ অন্যরকম। এর কারণ হিসেবে পি. ব্রাউন ভৌগোলিক অবস্থানের কথা উল্লেখ করেছেন।

পরিশেষে বিশেষ গুরুত্বসহকারে বর্ণনা করা যায় যে ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিহারে লোদী পদ্ধতির কয়েকটি সমাধি নির্মাণের উদাহরণ দৃষ্ট হয়। প্রকারান্তরে এগুলো লোদী বৈশিষ্ট্যের ও রীতির সর্বশেষ সমাধিসৌধ যা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ বটে। এ স্বতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্যসংবলিত গম্ভীর প্রকৃতির দূরবর্তী স্থাপত্যকর্মগুলো যে সময়ে নির্মিত হয়েছিল তখন মোগল সম্রাট হুমায়ূনকে পরাজিত করে শেরশাহ দিল্লির সিংহাসন দখল করেছিলেন। যদিও এগুলো শেরশাহের রাজত্বকালে নির্মিত হয়েছিল তথাপি সমাধিগুলোর নির্মাণকৌশল, অন্যান্য গুণাগুণ ও বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ এবং যাচাই করে শেরশাহের স্থাপত্য আদর্শ হতে এগুলো যথেষ্ট পরিমাণে স্বকীয় স্বাধীন সত্তার অধিকারী ছিল বলে প্রতীয়মান হয়। সূর স্থাপত্যের আদর্শ অনুসরণ না করেই এগুলো নির্মিত হয়েছিল।

দিল্লিস্থ ঈশা খান ও আদম খানের সমাধিসৌধ দ্বয়ে কিছু গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যিক প্রকাশ ভঙ্গিমা ও নিদর্শন রয়েছে। প্রকারন্তে এগুলো অপরিহার্য মৌলিক উপাদানে সমৃদ্ধ এবং স্থাপত্য কৌতূহলী মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করতে পারে। ঈশা খানের সমাধিসৌধের কোনায় পিল্লা গঠনে ফিরোজীয় ঢালুতা ও অন্যান্য ফিরোজীয় স্থাপত্য আদর্শের মধ্যে আলম্ব নির্মাণ করে দেয়ালের বহির্পৃষ্ঠ শক্তিশালীকরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ জাতীয় সমাধিসৌধের মধ্যে এটি সর্বশেষ নিদর্শন হিসেবে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

সমাধি ভবনের পশ্চিম পার্শ্বের আবেষ্টনী প্রাচীরসংলগ্ন একটি মসজিদ রয়েছে, যা ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। অর্থাৎ জামালিয়া মসজিদ নির্মাণের কয়েক বছর পরের ঘটনা। এটি শেরশাহ সূরের কিলা-ই-কুহনা মসজিদের মাঝে যে স্থাপত্যিক আদর্শগুলো বিকাশ লাভ করে পরিপূর্ণ সত্তার সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল ঠিক তার আগের শেষ চূড়ান্ত ধাপ বা পর্যায় এখানে বিকশিত হয়েছিল। অন্যপক্ষে ঈশা খানের সমাধিসৌধে গড়ে ওঠা বৈশিষ্ট্যগুলো সর্বদিক হতে সুষমতাপূর্ণ ও সুসামঞ্জস্যপূর্ণ। এর গঠন কাঠামো সৌষ্ঠবময়। এর প্রায় সমস্ত অংশ বিশদ ও বিস্তৃতভাবে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছিল। তবে এর উচ্চতার

মাত্রায় আরো কিছু যোগ হওয়া প্রয়োজন ছিল। অবশ্য ভারতের সবর্ত্রই অষ্টভুজ স্থাপত্য কাঠামোতে এ ত্রুটি বিরল নয়। অষ্টভুজের এ ত্রুটিমুক্ত করার প্রয়াস আদম খানের মাকবারায় লক্ষ করা যায়। পূর্বের সমাধিসৌধটি (ঈশা খান) এর (আদম খান) ১৪ বছর আগে নির্মিত হয়েছিল।

আদম খানের সমাধিসৌধ চৌদ্দ বছর পরে নির্মাণের মধ্য দিয়ে যে বৈশিষ্ট্যগুলোর অভাব ছিল তা এখানে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল এবং সমস্ত সৌধ অবয়বে কল্পনাগুলো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পেরেছিল। গম্বুজের পিপাটি প্রয়োজনানুরূপ উচ্চতায় উন্নীত করে উচ্চতাহীনতায় যে অসামঞ্জস্যতা ঈশা খানের মাকবারায় ছিল তার সংশোধন করা হয়।

অনুরূপভাবে গম্বুজ পিপাকে মধ্যবর্তী তলায় রূপান্তরকরণ সমগ্র প্রকল্পের মধ্যে কম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে নি। পিপার ষোল পার্শ্বের মুখ বরাবর বদ্ধ খিলান বা কুলঙ্গি স্থাপন করা হয়েছে। এ পরিকল্পিত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে স্থাপত্য কাঠামোর পিপায় একফালি ছায়া অতিক্রমণের আনন্দদায়ক (pleasing passage of shadow) মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হতে পেরেছিল।

এতদসত্ত্বেও মাকবারার আরোপিত প্রভাব সম্পূর্ণভাবে গতানুগতিক, নীরস ও প্রেরণাদায়কের ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়েছে। এ স্মৃতিসৌধে প্রণিধানের বিষয় হচ্ছে যে এটি লোদী স্থাপত্যের শেষ উদাহরণ। এতে ব্যবহৃত পদ্ধতি ও উদ্ভাসিত মৌলিক উপাদানগুলো দিল্লি এলাকার মধ্যেই চূড়ান্তভাবে দানা বেঁধে উঠেছিল। পি. ব্রাউন এ প্রসঙ্গে মতামত ব্যক্ত করেছেন যে, 'যদিও এ প্রচেষ্টা এ আঙ্গিকের চূড়ান্ত বা সর্বশেষ উদাহরণরূপে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে বলে মনে করা যায় তথাপি এরূপ মন্তব্য উচ্চারণের অপেক্ষা রাখে।'

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ২৭।
২. ওয়াই. ডি. শর্মা, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৯৩।
৩. জেড.এ. দেশাই, *ইন্দো-মুসলিম আর্কিটেকচার*, দিল্লি, ১৯৭০, পৃ. ১৬।
৪. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮।
৫. আর.নাথ., *হিস্ট্রি অব সুলতান আর্কিটেকচার*, বোম্বে, ১৯৭৮, পৃ. ১০৯।
৬. মি. স্টিফেন, *দি আর্কিওলজি এন্ড মনুমেন্টাল রিমেইন্স অব দিল্লি*, লুধিয়ানা, ১৮৭৬, পৃ. ১৬৬।
৭. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৮।

সপ্তম অধ্যায়

প্রাদেশিক স্থাপত্যকীর্তি

পাঞ্জাব স্থাপত্য

(১১৫০-১৩২৫ খ্রি.)

অঞ্চলভিত্তিক গড়ে ওঠা স্থাপত্যগুলো আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ছিল। এগুলো বিমুগ্ধকর, সুন্দর ও নিশ্চিতরূপে সৃজনী শক্তিসম্পন্ন। এসব স্থাপত্যকীর্তির বৈশিষ্ট্যে মৌলিক উদ্ভাবনের নজির চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয়ভাবে যে বৈশিষ্ট্য বিকশিত হয়ে উঠেছে তা দিল্লিতে উদ্ভূত ও প্রচলিত স্থাপত্যরীতি হতে সম্পূর্ণরূপে আলাদা, বিচ্ছিন্ন ও প্রভাবমুক্ত। প্রাদেশিক স্থাপত্য স্বতস্ফূর্তভাবে স্বকীয় সকল বাসনা, কামনা ও এদের নিজস্ব প্রাকৃতিক অনুভূতির সাথে সৌন্দর্যবোধ যোগ হয়েছে। অবশেষে এ স্থাপত্য সমীকরণ যুগ প্রভাবের সাথে একত্রিত ও মিলিতভাবে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্থাপত্য পদ্ধতিরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

তবুও বলা চলে যে, বিশেষ পরিস্থিতিতে দিল্লি স্থাপত্যের কতকগুলো উপাদান প্রাদেশিক স্থাপত্যশিল্পকে প্রভাবিত করেছিল। তুলনামূলকভাবে ভারতের যেসব অঞ্চল বহুদিন ধবে দিল্লির কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ছিল সেসব অঞ্চলে দিল্লির কেন্দ্রীয় প্রভাব প্রকটভাবে লক্ষ করা যায়। অন্যপক্ষে দিল্লি হতে দূরবর্তী অঞ্চল বা দিল্লির সঙ্গে যেসব অঞ্চলের সরাসরি যোগাযোগ তেমন ছিল না সেসব অঞ্চলের স্থাপত্যকর্মগুলোতে দিল্লির রাজকীয় স্থাপত্য প্রভাব স্বল্পমাত্রায় দৃষ্ট হয়।

প্রাদেশিক স্থাপত্য অনুশীলন সচরাচর বিশেষ অঞ্চলের স্থানীয় বৈশিষ্ট্যগুলোর চর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে এবং এসব স্থাপত্যকর্মে স্থানীয় কারিগর ও স্থপতিরা অতীতকাল হতে বিশেষ ধারা অনুসরণ ও অনুশীলন করে তার মধ্য দিয়ে দক্ষতা অর্জন করেছিল। এর ফলে দেখা যায় যে যারা অতীতে স্থানীয় মন্দির নির্মাণ কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল তারাই অতি চমৎকারভাবে মসজিদ ও মাকবারা এবং অন্যান্য স্থাপত্য ইমারত নির্মাণ করে চমক সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

অন্যপক্ষে যেখানে স্থানীয়ভাবে স্থাপত্যিক রীতিকৌশল তেমন উৎকর্ষ লাভ করে নি সেখানে নিকটবর্তী মুসলিম শাসকদের চর্চিত স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যগুলোর অনুসরণ করা হত। প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা তাদের স্বাধীন পরবর্তী বংশধরগণ নিজেদের স্ব স্ব রাজধানীতে বিদেশী প্রকৌশলী ও কারিগরদেরকে এনে স্থাপত্যকর্মে নিয়োজিত করত। এসব কারিগরগণ তাদের দেশীয় স্থাপত্যরীতি ও বৈশিষ্ট্য প্রয়োগে সে অঞ্চলে স্থাপত্য ইমারত গড়ে তুলত।

আবার জলবায়ুর বিভিন্নতার কারণে স্থাপত্য নির্মাণকৌশল ও প্রয়োগবিধি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। কারণ স্থাপত্যকর্ম জলবায়ুর সাথে তাল মিলিয়ে টিকে থাকার জন্য নির্মিত রীতিবিন্যাস একান্তভাবে আবশ্যক। স্থাপত্য নির্মাণ উপকরণ, মালমসলা এক অঞ্চলে যা প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আবার তা অন্য অঞ্চলে একেবারে বিরল। কাজেই নির্মাণ উপকরণাদির সহজ প্রাপ্যতা স্বাভাবিকভাবে স্থাপত্য আকারত্বে, বৈশিষ্ট্য গঠন ও সাজসজ্জায়নের ওপর প্রভূত প্রভাব বিস্তার করেছে।

প্রাদেশিক স্থাপত্যগুলোর মধ্যে সর্বপ্রাচীন হচ্ছে পাঞ্জাবের আঞ্চলিক স্থাপত্য ইমারত। কারণ পাঞ্জাব এলাকাটাই সর্বপ্রথম ইসলামের পতাকাতলে এসেছিল। পাঞ্জাবের দুটি শহর একই সাথে মুসলিম শাসনাধীনে না আসলেও অনেকটা কাছাকাছি সময়ে মুসলমানদের পদানত হয়েছিল। পাঞ্জাবে ইসলামি সভ্যতা মুলতান ও লাহোর নগরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। অবশ্য মুলতান হতে লাহোরের দূরত্ব ছিল প্রায় ৩২২ কি.মি.। তাই শহর দুটিতে ইসলামের প্রভাব আলাদা আলাদা পথে এসেছিল।

সর্বপ্রথম মুলতানই সরাসরি ইসলামি প্রভাবের আওতায় এসেছিল। ইরাকের শাসনকর্তা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সেনাপতি ও জামাতা মোহাম্মদ-বিন-কাশিম ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু অধিকার করার এক শ বছর পর মুলতান একটি স্বাধীন আরব রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হয়েছিল। প্রাথমিকভাবে তারা ভারতে প্রবেশ করতে সক্ষম হওয়ার ফলে পরবর্তী সময়ে দক্ষিণ পারস্যের সাথে একটা সম্বন্ধ গড়ে তুলতে পেরেছিল। এ যোগাযোগ সমুদ্র, নদী ও স্থলপথে হয়েছিল। ফলে মুলতানে যে সংস্কৃতি বা স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল তা ভারত অপেক্ষা ইরানি বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল অধিকতর।

পক্ষান্তরে লাহোর নগর ইসলামি সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল অনেক পরে। লাহোরে যে ইসলামি প্রভাব এসেছিল তা সরাসরি পারস্য হতে নয়, এটি এসেছিল আফগানিস্তানের মধ্য দিয়ে। কারণ দশম শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদের বংশধরেরা লাহোরকে তাদের রাজ্যের স্থায়ী রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। তখন এ প্রাদেশিক রাজধানীই গজনী শাসকদের আবাসভূমি হিসেবে অনেক প্রাসাদ-অট্টালিকা নির্মাণের অবকাশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং দ্বাদশ শতাব্দীতে এখানে ইসলামি স্থাপত্য প্রসার লাভ করেছিল।

তবে লাহোরে গজনী সুলতানদের স্থাপত্যচর্চার তেমন কোনো নজির অবশিষ্ট নেই। কারণ দ্বাদশ শতাব্দীর মধবর্তী সময়ে আলাউদ্দিন ঘোরের অভিযানের পর এর অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও যেটুকু নিদর্শন পাওয়া যায় তা গজনী বৈশিষ্ট্যানুরূপ ছিল বলে মনে হয়। সামান্য যেটুকু স্থাপত্য সংস্কৃতির খণ্ডাংশ ইতস্ততবিক্ষিপ্তভাবে এ অঞ্চলের নগরীতে পাওয়া যায় তা প্রাচীন কাষ্ঠ নির্মিত স্থাপত্য যা অতি দ্রুততার সাথে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এর কিছু কিছু ইমারত দ্বাদশ শতাব্দীর সেলযুগ আদর্শ নমুনায় গড়ে উঠেছিল।

এগুলোর তারিখ ও সময় অনুসন্ধানে দেখা যায় যে এ স্থাপত্যগুলো অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের। এগুলোর মূল গঠন কাঠামোয় স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ লক্ষ করা যায়। অবশ্য এতে প্রচুর পরিমাণে দরজা-কপাট প্রভৃতি সংলগ্ন স্থানে উদ্‌গত বা দেয়ালগাত্র হতে উঁচু গোলাকার অলঙ্করণ এবং বিশেষ ধরনের খোদাই কাজ প্রত্যক্ষ করা যায় যা স্পষ্টভাবে সেলযুগ সংস্কৃতির নিষ্কর্ষণ। এসব নির্মাণকার্যে ব্যবহৃত কাষ্ঠ উপকরণ বার (bar) নামে পরিচিত।

অতএব ধারণা করা যায় লাহোর ও মুলতানে গড়ে ওঠা মুসলিম স্থাপত্যকর্মগুলো বিভিন্ন উৎস দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে লাহোরের যেসব স্থাপত্যশিল্প ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তা গজনী ও সেলযুগ উৎস হতে নিসৃত। অন্যপক্ষে যা মুলতানে সৃষ্টি হয়েছিল তা আরব ও পারস্যের মিলিত উৎস হতে প্রাপ্ত। এ সম্পর্কে জি. মিচেল বলেন, "The architecture of Multan blossomed from a blending of indigenous Indian building tradition and culture likes with southern Iran maintained by the ruling dynasties."[১] তবে সমগ্র ইন্দো-ইসলামিক সংস্কৃতির সাধারণ রূপ এ দুটি শহরে গড়ে ওঠা বৈশিষ্ট্যের মাঝেও প্রত্যক্ষ করা যায়। ঠিক এ কারণেই লাহোর ও মুলতানে গড়ে ওঠা স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে পাঞ্জাব স্থাপত্য হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে।

এ অঞ্চলে গড়ে ওঠা ইমারতগুলোর অবয়ব ও নির্মাণ উপকরণ বিশ্লেষণে বলা যায় যে মধ্যযুগে পাঞ্জাব স্থাপত্যের প্রধান নির্মাণ উপকরণ ছিল ইট। কারণ পঞ্চনদীর পাঞ্জাবে সরাসরি পাথর সংগ্রহ করা ছিল দুরূহ। তাই এখানে ইষ্টক নির্মাণ নিপুণতা অর্জিত হয়েছিল। তবে রোমানরা যে পদ্ধতিতে ইট নির্মাণ করত তদ্রূপ মানের ইট পাঞ্জাবে নির্মিত হত না।

ইট দ্বারা ইমারত নির্মাণ পদ্ধতিতে যে প্রযুক্তি গড়ে উঠেছিল তা ইট গাঁথুনি করার কৌশলের মাঝে নিহিত ছিল। এটি প্রশস্ত কিন্তু পাতলা আবার যখন প্রয়োজন হত তখন সোজা খাড়া পরল (upright course) ইট গেঁথে অতিরিক্ত মজবুত করা হত। ইট দ্বারা যখন ইমারত গাঁথা হত তখন একে আরো শক্তিশালী করার জন্য কাঠের কড়ি বা বর্গা দেয়ালের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়ার রীতি প্রচলিত ছিল। অনেক সময় সমগ্র ইমারতটা কাঠের কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত হত এবং এতে কোনো খিলান বা বর্গা ব্যবহার করা হত না। দেয়াল যখন কাঠ ও ইট দ্বারা নির্মাণ বা গঠন করা হত তখন একে শক্তিশালী করার জন্য দেয়াল ঢালু করে গাঁথা হত। দেয়ালগাত্র ঢালু করার প্রথম প্রচেষ্টা অতি প্রাচীনকালে কর্দম দ্বারা দেয়াল নির্মাণে সূচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে এটি আদর্শ পদ্ধতিরূপে চালু হয়েছিল।

ইমারত নির্মাণে আনুভূমিক সমতল কড়ি বা বর্গা ইটের সাথে প্রয়োগ করা ছাড়াও নির্মাণ কাজে বৃহদায়তন কাঠের উপকরণের ব্যবহার লক্ষণীয়। দরজা ও কপাট এবং উপরের দিকে জানালা তার সাথে ঝুলন্ত বারান্দা বা ব্যালকনি নির্মাণের জন্য বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ড ব্যবহৃত হত। সর্বোপরি এর সাথে কিছু কিছু স্থাপত্যকর্মে সম্মুখ কাঠের দেয়াল সুন্দর শিল্পগুণে সমৃদ্ধ করে নির্মাণ করা হয়েছিল। কাঠ ও ইট সহযোগে নির্মিত ইমারতের বিশেষ অংশ আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রকারের রং ও আস্তরের (প্লাস্টারের) সাহায্যে সজ্জিত করা হত। আবার অনেক সময় উজ্জ্বল রঙের চকচকে টালি দ্বারা দেয়ালগাত্র খোপ খোপ করে (প্যানেল) গাঁথা হত। এ নকশা পরিকল্পনার স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি ব্যবহারের রীতিই এ স্থাপত্যের অবশেষকে টিকে রেখেছে। বিশেষভাবে কাঠ দ্বারা ইমারত নির্মাণে যে সৌকর্য ও পরিচালন ব্যবস্থা তা প্রণিধানযোগ্য। প্রকারান্তরে মুসলিম স্থাপত্যে এরূপ সচরাচর নির্মাণ কাজে কাঠের ব্যবহারের খুব একটা প্রচলন দেখা যায় না। তা ছাড়া ইমারতের শোভাবর্ধনে গেরো দিয়ে ঝুলানো ঝালর দরজার ফ্রেমে বা কাঠামোতে নকশাঙ্কন প্রত্যক্ষ করা যায়। এটি সাধারণত দরজার উভয় পার্শ্বে কাঠের বিস্তারিত কাঠামোর (ফ্রেমের) অংশের উপর দক্ষ হাতে শিল্পায়ন সম্পন্ন করা হত। তাঁবুর দরজার উভয় পার্শ্বে যে ঝালর নকশা অঙ্কন রীতি প্রথম চালু হয়েছিল তা মনোজ্ঞ পরিকল্পনায় ও অভিনব শিল্পদক্ষতায় স্থাপত্য দেয়াল অলঙ্করণেও প্রয়োগ করা হত। এর ফলে অনেক সময় ইমারতগাত্রে তাঁবুর মতোই ঢালুতা এসে যেত। এ শিল্প চেতনা একদা মরুভূমি অঞ্চলে যাযাবর জাতির মানুষের

মাঝে সৃষ্টি হয়েছিল কেননা তারা মরুভূমিতে অনুরূপ তাঁবুতে বসবাস করত। অতঃপর তাদের মাঝে প্রচলিত এ শৈল্পিক চেতনা কালক্রমে গৃহনির্মাণ কাজে প্রয়োগ করে স্থাপত্যের একটা প্রচলিত বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি করেছিল। মূলত এ কাষ্ঠ নির্মিত কাজগুলো ইসলামিক স্থাপত্যের আওতাভুক্ত হলেও আদিতে স্থানীয় কারিগরদের প্রতিভাময় ও কল্পনাপ্রবণতার জোরে একটা চলমান জীবন্ত নকশালঙ্করণ রীতিতে পরিণত হয়েছিল।

লাহোরে সামান্য কিছু কাষ্ঠ নির্মিত গৃহাদি ছাড়া আর কোনো প্রকারের স্থাপত্য নির্মাণ কাজের উদাহরণ দৃষ্ট হয় না। তবে মুলতানে পাঁচটি প্রাচীন সমাধিসৌধের গাত্রে তারিখের উল্লেখ থাকায় এদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের উৎস সম্পর্কে আলোকপাত করা সম্ভব। এসব সমাধিসৌধে যাঁরা শায়িত রয়েছেন তাঁদের জীবনের সাথে শহরের ইতিহাস জড়িত রয়েছে। এসব স্মৃতিসৌধের নির্মাণকার্য দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় হতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভিককাল পর্যন্ত মোট ১৭৫ বছর ধরে অব্যাহত ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় এগুলোর কোনো কোনোটি বিভিন্ন সময়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পর এর মেরামত প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল এবং এ কারণে এগুলোর অধিকাংশের গঠন কাঠামোতে পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। মোটের ওপর ইমারতের আদি নকশা পরিকল্পনার প্রতি সকলেই শ্রদ্ধার সাথে মান্য করে থাকে এবং আরো বিশ্বাস করা হয় যে বর্তমানের সমাধিসৌধের অবয়ব আদি গঠন কাঠামোতে যেমনটি তৈরি হয়েছিল তা হতে এখন তেমন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় না।

এ সমাধিসৌধগুলো হচ্ছে—(১) শাহ ইউসুফ গারদিজি (মৃত্যু ১১৫২ খ্রি.), (২) শাহ্ বাহা-উল-হক (মৃত্যু ১২৬২ খ্রি.), (৩) মাদনা শহীদ (মৃত্যু ১২৭০ খ্রি.), (৪) শাহ্-সামস্ উদ্দিন তাব্রিজী (মৃত্যু ১২৭৬ খ্রি.) এবং (৫) শাহ্-রুকন-ই-আলম (১৩২০-১৩২৪ খ্রি.)। বলা বাহুল্য সবগুলো সমাধিসৌধ ইট দ্বারা নির্মিত। তবে সৌধের বিশেষ অংশে কাঠের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। অন্যপক্ষে সৌধ সজ্জায়নের জন্য চকচকে টালির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। স্থাপত্যকর্মের সাধাবণ বৈশিষ্ট্যগুলো সব মাকবারাতেই দেখা যায় এবং এগুলো একটা নির্ধারিত মানে উপনীত হতে পেরেছিল। তবে পাঁচটি মাকবারার মধ্যে প্রথম চারটির নকশা পরিকল্পনা বর্গাকার এবং পঞ্চম মাকবারাটি অর্থাৎ রুকন-ই-আলমের সমাধিসৌধ অষ্টভুজাকাব এবং নিম্নতলার বহির্দেয়াল ঢালুভাবে নির্মিত যা তোঘলক স্থাপত্যের কথাই স্মবণ করিয়ে দেয়।

এ ক্রমিকের সর্বপ্রাচীন সমাধিসৌধটি হচ্ছে শাহ ইউসুফ গারদিজির সমাধি এবং দ্বাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে তাঁর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই এটি নির্মিত হয়েছিল। এর স্থাপত্যিক অবকাঠামো প্রারম্ভিক অবস্থাতেই এখনো বিদ্যমান বলে ধারণা করা হয়ে থাকে। এটি এ ক্রমিকেই অন্যান্য সৌধ হতে এ কারণে স্বতন্ত্রতার দাবি করতে পারে যে এর গঠন কাঠামো একতলা ও সমতল ছাদ এবং এটি ঘন ক্ষেত্রবিশিষ্ট। এটি আবেষ্টনী প্রাচীর ঘেরা প্রাঙ্গণের মধ্যে অবস্থিত। এর উচ্চতা প্রায় চার দেয়াল পৃষ্ঠ খাড়া করে যে উচ্চতা পাওয়া যাবে তাব সমান।

ইমারতের আয়ত চতুষ্কোণ অংশে ঈষৎ অভিক্ষিপ্তভাবে দরজা পথের (door-way) কাঠামো বাস্তবায়নে দৃষ্টি নন্দনীয় বৈচিত্র্য সৃষ্টি লক্ষণীয় এবং অভ্যন্তরভাগে অনুরূপ আয়ত চতুষ্কোণের মধ্যে মিহরাব নির্মাণের ব্যবস্থা কারিগরি দক্ষতার পরিচায়ক। এটি প্রতীয়মান হয় যে পারস্যের এ জাতীয় স্থাপত্য ইমারতে যেসব মৌলিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছিল তার সাথে এখানে উৎপাদিত সাধারণ সূত্রগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ মাকবারার সৌন্দর্য ও সুষমা গঠন-কাঠামোর চেয়ে এর সুশোভন কাজের ওপর বেশি নির্ভরশীল। এতে

ইমারতের চমৎকারিত্ব এসেছিল। স্থাপত্য ইমারতের অঙ্গ গঠনের যে বৈশিষ্ট্যের সচরাচর প্রয়োগ করা হয়ে থাকে, যেমন—নানা ধরনের প্রকল্প নকশা, আলোছায়ার সংঘাত বা বৈসাদৃশ্য সৃষ্টিকারক ঢালাইকৃত ছাঁচ নকশা ইত্যাদির ব্যবহার দৃষ্ট হলেও এর পরিপূর্ণতা ও সৌষ্ঠব মাধুর্যতা এসেছিল ইমারতের দেয়ালপৃষ্ঠ অলঙ্করণের মধ্য দিয়ে। অতিশয় উজ্জ্বল দীপ্তিমান রঙিন টালি ইমারতের বহির্দেয়ালের বিশেষ অংশে বা প্রয়োজনবোধে সম্পূর্ণ অংশ টালি দ্বারা মোড়াই করে অলঙ্করণ কাজ সুসম্পন্ন করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, পরবর্তীকালে ইমারতের দেয়াল মেরামতেব সময় কিছু কিছু টালির পরিবর্তনের ফলে মূল সৌন্দর্য কিছুটা নিষ্প্রভ হয়েছে। তা সত্ত্বেও এতে ব্যবহৃত নকশা নমুনার আকারত্ব প্রধানত জ্যামিতিক সংক্রান্ত কিছু কিছু খচিত অন্তলিখন শিলালিপি দৃষ্ট হয়। কিন্তু পুষ্পসংক্রান্ত নকশার ব্যবহার ছিল বিরল। হয়তো ধর্মীয় বিধিনিষেধের কারণে এ ধরনের পুষ্প নকশালঙ্কার ব্যবহারে অনীহা প্রকাশ পেয়েছে। এখানে ব্যবহৃত টালিগুলোর পৃষ্ঠভাগ রঞ্জিত ও কখনো বা রঙ মাখিয়ে শোভিত। দে'যালের কোনো কোনো অংশে সমতল হতে অভিক্ষিপ্ত নকশালঙ্কার ঢালাই ছাঁচ আকারে প্রয়োগ পদ্ধতিও দেখা যায় যা উক্ত শিল্পকলাব প্রাথমিক স্তবে বিকশিত হয়েছিল।

মুলতানের পরবর্তী তিনটি সমাধিসৌধের উদাহবণগুলো পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে স্থাপত্য গঠনে পূর্বের অনুসৃত রীতি হতে ভিন্নতর রূপে দৃষ্ট হয়। বাস্তবিকপক্ষে এগুলো আয়তাকার নকশায় নির্মিত। তবে এগুলোর গঠন সাদৃশ্যতায় ব্যবধান লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে এ কাবণে যে এগুলো তিনটি পর্যায়ে বা ধাপে নির্মিত হয়েছিল। ইমারতগুলোর সর্বনিম্ন অংশ বর্গাকাব, দ্বিতীয় তলা অষ্টভুজ এবং এর সর্বশেষ ধাপ বা শীর্ষভাগ গোলার্ধ গম্বুজে পরিবৃত।

এ পদ্ধতির মাকবারাগুলোর মধ্যে বাহাউল হকের মাকবারা একটি প্রতিনিধিত্বকারী ইমারত হিসেবে চিহ্নিত। কেননা তাঁর স্মৃতিসৌধটি সর্বপ্রথম নির্মিত হয়েছিল এবং এটি কম স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল না। ইমারতটি ৪০ ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট সুউচ্চ মঞ্চের উপর নির্মিত। কোনো প্রকার অলঙ্করণ ছাড়াই নির্মাণ করা সত্ত্বেও কেবলমাত্র বিভিন্ন গঠনাংশের চমৎকারিত্বপূর্ণ অনুপাত ও সুষমতার মাঝে এর সৌন্দর্য প্রকাশমান হতে পেরেছে। সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদ (facade) একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রয়েছে তা হচ্ছে সুন্দর নকশার খিলানায়িত দরজা-পথ। এ দরজা পিছনের দিকে একটু হটে যাওয়া বা অনুসৃত (receding planes) হওয়া অবস্থায় নির্মিত হয়েছে। এ তলায় সচ্ছিদ্রযুক্ত উন্নত বপ্র (parapet) হতে আড়ম্বরশালী অষ্টভুজ পিপা উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। অষ্টভুজের প্রত্যেক মুখে খিলানায়িত দরজা সুরুচিপূর্ণ ও মার্জিত স্থাপত্যকর্মরূপে শোভাবর্ধন করে আছে এবং পিপার উপরে প্রশস্ত ডিম্বাকৃতির গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। যদিও এ স্মৃতিসৌধের সাজসজ্জাহীন কঠোর আত্মসংযমতা লক্ষ করা যায় তথাপি এর অবকাঠামোয় দৃঢ়তা ও সহজ-সরল আস্তরণে শিল্পরীতির এক অপূর্ব মিলন সমগ্র সৃষ্টিকে মহৎ করে তুলেছে।

উল্লিখিত তিনটি সমাধি নির্মাণের প্রায় পঞ্চাশ বছর বিরতির পর পুনরায় মুলতানে স্থাপত্য ইমারত নির্মাণের উদাহরণ দৃষ্ট হয়। এখানে যে স্থাপত্যকর্মটি নির্মিত হয়েছিল তা মুলতানের স্থাপত্য ইতিহাসে একটি পরিপূর্ণ, পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দরতম নিদর্শন বলে স্বীকৃত। এটি হল রুকন-ই-আলমের সমাধিসৌধ যা স্থাপত্য ইতিহাসে একটি সর্বোৎকৃষ্ট উপহার বলা চলে। দিল্লির তৎকালীন সুলতান গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের আদেশে (১৩২০ খ্রি.-১৩২৪ খ্রি. এর মধ্যে) এ সৌধটি নির্মিত হয়েছিল। তখন তোঘলকাবাদ শহরে রাজকীয় মাকবারার

(সুলতান গিয়াসউদ্দিনের) নির্মাণ কাজ চলছিল। উক্ত মাকবারাটি নির্মিত হয়েছিল একদল অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কারিগর ও স্থপতিদের দ্বারা। মাকবারার নকশা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে যারা অংশগ্রহণ করেছিল তারা ইতঃপূর্বেই এ কারিগরি কাজে দক্ষতা অর্জন করেছিল। এটি নিখুঁত ও সুন্দর স্থাপত্যকর্মরূপে আত্মপ্রকাশের মূলে ছিল পরিপক্ক হস্তের সুস্থ, ধীরস্থির কর্মসম্পাদন ও রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা। তাই বলা চলে বিগত দিনের সকল প্রকার অভিজ্ঞতা, প্রযুক্তি ও ইতঃপূর্বে নির্মিত মাকবারাগুলোর গঠন প্রণালী, কায়দা-কৌশল হতে চয়ন করা উপাদান একত্রিত করে এটি নির্মিত হয়েছে।

এ সমাধিসৌধ পূর্ববর্তী সৌধগুলোর মতো বর্গাকার ছিল না; এটি অষ্টভুজ নকশা পরিকল্পনায় নির্মিত। এ প্রসঙ্গে পি. ব্রাউন উল্লেখ করেছেন যে 'একেবারে গোড়ার দিকে নয় তবে প্রথমের দিকের মাকবারায় এরূপ আকারত্ব ভারতীয় ইসলামিক স্থাপত্যে ছিল না'।[২]

১৩৬৮ খ্রিস্টাব্দে ফিরোজ শাহ তোঘলক খান-ই-জাহান তিলাঙ্গিনীব সমাধির উপর অষ্টভুজ পবিকল্পনায় মাকবারা নির্মাণ করেছিলেন। এটি হতে প্রতীয়মান হয় যে প্রায় ৫০ বছর পূর্বেই অষ্টভুজ নকশা নমুনা রাজকীয়ভাবে গৃহীত হয়েছিল। এর বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক; মাকবারার উচ্চতার সাথে পার্শ্ব দেয়ালগুলোর ঢালুতা সম্পর্ক বিদ্যমান। এটি গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের মাকবারাতেই দৃষ্ট হয়েছে। কিন্তু মুলতানে নির্মিত এ মাকবারার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উক্ত ঢালুতার সাথে প্রতি কোনায় ক্রমসরু চূড়া যোগ হওয়ার ঘটনা। মাকবারার প্রতি কোনায় ক্রমসরু চূড়ার নমুনা ফিরোজশাহ তোঘলকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হযেছিল এবং প্রায় ২৫ বছর পর তিনি তার স্থাপত্য পরিকল্পনাগুলোতে এ প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

মুলতানে ব্যবহৃত এ প্রযুক্তি পরবর্তীকালে ভারতীয় ইসলামি স্থাপত্যে সর্বত্র ব্যবহৃত হয়েছিল। তবে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে এর ব্যবহার থেমে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ধীরে ধীবে এ প্রযুক্তির নবায়ন, সংস্কাব, পরিবর্তন ও পুনর্বিন্যাস প্রতিস্তরে হতে থাকে।

সাধারণত প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্থাপত্য দিল্লিভিত্তিক রাজকীয় স্থাপত্য দ্বারা প্রভাবিত ও অনুসারিত হয়ে থাকে। তবে এ ঘটনা হতে নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়েছে যে এর বিপরীত পরিস্থিতি এখানে সৃষ্টি হয়েছিল। এটি বরং দিল্লির রাজকীয় স্থাপত্য আদর্শের মাঝে মুলতানের প্রাদেশিক আদর্শ অবদান রাখতে সমর্থ হয়েছিল। কেননা এ স্থাপত্যকর্মে এর নিজস্ব শক্তিশালী ভিত্তি ছিল যা সকল পরিস্থিতিতে অবিচল স্বকীয়তা বজায় রাখতে পেরেছিল।

মুলতানের রুকন-ই-আলমের সমাধিসৌধটি নেহায়ত ছোটখাটো সামান্য ইমারত ছিল না। কারণ এর অষ্টভুজ মূলভিত্তিই ২৭.৪৫ মি. (৯০ ফুট) ব্যাস সংবলিত ছিল এবং মাকবারার সর্বোচ্চ অংশে লতাপাতার কারুকার্যখচিত শীর্ষচূড়াসমেত ৩৫.১০ মি. (১১৫ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। প্রথম তলার উচ্চতা ১৫.৩০ মি. (৫০ ফুট), দ্বিতীয় তলার উচ্চতা ৭.৬৫ মি. (২৫ ফুট) এবং গম্বুজ অভ্যন্তরের প্রসারতা হচ্ছে ১৫.৩০ মি. (৫০ ফুট)। এর ভিত্তি ভূমি যদিও ইটে নির্মিত তথাপি একে আরো শক্তিশালী করার জন্য সুবিধামতো দূরত্বে কাঠের নকশায়িত বেড়ি দেয়ালের ভিতরে প্রবেশ করে দেয়া হয়েছে। সুন্দর অঙ্গবিন্যাস ছাড়াও দেয়ালের উপরিভাগে স্নিগ্ধতা আনয়নের জন্য রঙ করা ইটের কাজে বাটালির ব্যবহার করে স্থাপত্য তনুতে চমৎকারিত্ব ও মসৃণতা সৃষ্টি করা হয়েছে।

এখানে টালির কাজও লক্ষণীয়। উজ্জ্বল চকচকে টালি মাকবারার দেয়ালের বিশেষ অংশে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। যেহেতু স্থপতি ও কারিগরগণের মানসিক আদর্শ ও পরিস্থিতি জ্ঞান স্পষ্টভাবে পরিচ্ছন্ন ছিল সেহেতু সৌধের ঢালুতা সম্পর্কে যে বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা পিরামিডের ঢালুতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ। এ ছাড়া এ স্থাপত্যকর্মকে দীর্ঘস্থায়ী ও স্থিতিশীল করার জন্য দেয়ালের প্রতি বহির্কোনায় বুরুজ প্রয়োগ করা হয়েছে।

সমাধির ব্যাপক উচ্চতা প্রসঙ্গে বলা যায় যে একে একটি উচ্চ বেদির উপর স্থাপন করার পিছনে যে মানসিকতা কাজ করেছিল তা হচ্ছে একে উক্ত স্থানের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় দিগন্ত বিস্তৃত এলাকার মাঝে দৃষ্টি আকর্ষণীয় ইমারত হিসেবে অন্যান্য ইমারতগুলোর উপরে প্রাধান্য বিস্তার করানো। অন্যপক্ষে দৃষ্টিসীমার মাঝে নির্মিত ইমারতগুলোর দিকে তাকালে যে একঘেয়েমিতা মনে হয় তা আড়াল করে একটা দৃষ্টিনন্দন আবেশ সৃষ্টির প্রয়াসমাত্র।

টালিগুলো প্রয়োগের উদ্দেশ্য ছিল অনুজ্জ্বল, নিষ্প্রভ একঘেয়ে মরুময়তার মাঝে উজ্জ্বল রঙিন, আলোকিত ও সুন্দর করা। এর দেয়ালের ৪ মি. (১৩ ফুট) উচ্চতা পর্যন্ত অটুট নিয়তাকার ইটের কাজ যার মধ্য দিয়ে অভ্যন্তর গুহায় আলো প্রবেশ করতে পারে এবং জুল্লাহর মধ্যে সে যুগের আউলিয়া ও সাধকের শেষ বিশ্রামের স্থানটি বাইরের প্রখর রৌদ্র তাপের হাত হতে রক্ষা পেয়ে আর্দ্রতায় অবগাহন করতে পারে এবং স্থপতিদের এ প্রচেষ্টা বৃথা যায় নি; একটা সফল স্থাপত্যকর্মরূপে চিরসমাদৃত হয়ে আসছে।

পি. ব্রাউনের মতে, এ সমাধিসৌধ নির্মাণকালে যে নববৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে এবং যেসব পদ্ধতিগুলো প্রয়োগ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে এখানে তিনটি সংস্কৃতি নমুনার সমন্বয় বা মিলন ঘটেছে। এগুলো হচ্ছে- (১) আরবীয়, (২) পারসিক এবং (৩) ভারতীয়।[৩] অন্যপক্ষে এটি আরও পরিষ্কাররূপে বলা যায় যে উক্ত তিন সভ্যতার স্থাপত্যরীতির সমন্বয়ে স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে যে পরিপক্বতা এসেছিল তারই সবচেয়ে ভালো আদর্শের অংশটুকু এখানে এসে মিলিত হতে পেরেছে। এর ফলে তিনটি সেকালের উদীয়মান জাতির জারক রস উক্ত স্থাপত্যকর্মে সঞ্চিত হয়ে রয়েছে। তাই অপূর্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও উৎকৃষ্ট স্থাপত্যনিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত এ সমাধিসৌধটি পাঞ্জাব স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য অবদানরূপে স্বীকৃত হয়ে রয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. জি. মিছেল (সম্পা.), *আর্কিটেকচাব অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড*, লন্ডন, ২০০০, পৃ. ২৭৮।

২. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার (ইসলামিক পিরিয়ড)*, দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৩৩।

৩. In the style the mausoleum represents three pattern of culture Arabıan, Iranıan and Indıan; দেখুন : পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৪।

অষ্টম অধ্যায়

বাংলার মুসলিম স্থাপত্য

(১২০২-১৫৭৫ খ্রি.)

বাংলার মুসলিম স্থাপত্য অনুশীলন ও ক্রমবিকাশের ধারায় সন তারিখ নিয়ে কিছুটা গরমিল পরিলক্ষিত হলেও এ দেশের বিভিন্ন অংশে বিক্ষিপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়া রাজবংশগুলো অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্যশিল্প গড়ে তুলেছিল। সমকালীন ঐতিহাসিকগণের তথ্যবিবরণী হতে জানা যায় প্রতিষ্ঠিত রাজবংশগুলোব পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানীসহ অন্যান্য নগরগুলোতে স্থাপত্য ইমাবত গড়ে উঠেছিল। বাংলার অধিকাংশ স্থাপত্য ইমারত পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা ও বাংলাদেশের রাজশাহী জেলাব বিস্তৃত অংশে নির্মিত হয়েছিল।

নদীমাতৃক বাংলায় প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ও অর্ধ-স্বাধীন মুসলিম রাজবংশগুলো তাদের সুবিধামতো রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রশাসনিক কেন্দ্র গড়ে তুলেছিল। এ অঞ্চলে তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত স্থাপত্য ইমারতগুলো বর্তমানে অতি জীর্ণশীর্ণ অবস্থায় বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংস্কার ও সংবক্ষণের অভাবে এগুলো ক্রমান্বয়ে স্মৃতিব অতল গহ্বরে হারিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতোই দুর্গ, দুর্গনগরী, বাঁধ, উচ্চ নগর-প্রাকার, মিনার, টাওয়ার, খিলানায়িত বিজয়তোরণ, প্রাসাদ, মসজিদ ও মাকবারা ইত্যাদি এখানে গড়ে উঠেছিল। প্রাপ্ত স্থাপত্য নিদর্শন, পরিত্যক্ত ভাস্কর্য ও অন্যান্য পুরাকীর্তি প্রমাণ করে যে এতদাঞ্চলে পরপর কয়েকটি সংস্কৃতি পাদপীঠ রচিত হয়েছিল।

এসব ধ্বংসস্তূপের মাঝে প্রথমটি বাংলার সর্বপ্রাচীন রাজধানী লক্ষ্মণাবতী। এখানে বাংলার দুটি স্বাধীন হিন্দু রাজা পাল ও সেন বংশের শাসনকেন্দ্র ছিল। পরের দুটি নগর গৌড় ও পাণ্ডুয়া, নবাগত মুসলিম সুলতানদের রাজত্বকালে রাজধানী ছিল। বাংলার মুসলিম স্থাপত্য বিশেষত গৌড়-পাণ্ডুয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

বাংলায় গড়ে ওঠা মুসলিম স্থাপত্যের নির্মাণরীতি ও গঠনশৈলীর ওপর ভিত্তি করে একে প্রধানত দুটি পর্বে বিভক্ত করা যায়-(১) সুলতানি স্থাপত্য (১২০২ - ১৫৭৬ খ্রি.) ও (২) মোগল স্থাপত্য (১৫৭৬ - ১৭৫৭ খ্রি.)। প্রাথমিক পর্বে নির্মিত স্থাপত্যগুলো ক্রমোন্নয়ন ধারা বিশ্লেষণ করে পুনরায় তিনটি ধাপে আলোচনা করা যেতে পারে; প্রথম ধাপ- ১২০২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে নির্মিত স্থাপত্য ইমারত যার অধিকাংশই গৌড় নগরীতে অবস্থিত; দ্বিতীয় ধাপ- ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে পাণ্ডুয়া কেন্দ্রিক নির্মিত স্থাপত্যকর্ম এবং তৃতীয় ধাপ-পাণ্ডুয়া হতে ১৪৪২ খ্রিস্টাব্দে রাজধানী

পুনরায় গৌড়ে স্থানান্তরিত হওয়া থেকে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত।

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের প্রথম ধাপ (১২০২-১৩৪০ খ্রি.) :

বাংলায় মুসলিম স্থাপত্য অনুশীলন বা স্থাপত্য নির্মাণ কাজ ঠিক কখন হতে শুরু হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা দুরূহ। তবে এটি নির্দ্বিধায় বলা যায় দিল্লিভিত্তিক ইসলামি সাম্রাজ্য ভারতের বুকে মামলুক সুলতানদের দ্বারা দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় সাথে সাথে ১২০২ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বখতিয়ার খল্‌জী বাংলা বিজয় করেন[১] এবং বিজিত অঞ্চলে বিজেতাগণ ধর্মীয় কারণে নিজেদের প্রয়োজনে কিছু কিছু ইমারত নির্মাণ করেছিলেন। এটি বললে অত্যুক্তি হবে না যে বাংলার রাজধানীসহ বিস্তীর্ণ এলাকা মুসলমানদের অধিকারে আসলেও বাংলায় প্রকৃত মুসলিম স্থাপত্য গড়ে উঠতে প্রায় এক শ বছর অপেক্ষা করতে হয়েছিল।

যে কোনো স্থাপত্য পদ্ধতির উন্মেষ, বিকাশ, পরিপূর্ণতা ও উৎকর্ষতা অর্জন সময়সাপেক্ষ। যারা এ নতুন ভূখণ্ডে এসেছিল তাদের বিভিন্ন প্রকার অভিজ্ঞতা; যেমন- জলবায়ু, ভূমির চরিত্র, দালানকোঠা নির্মাণ উপকরণ বা মালমসলা যোগানোর সুবিধা, শ্রম ও কর্মনিপুণতা, অভ্যাস, রুচি ও নকশা পরিকল্পনা প্রভৃতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তা ছাড়া স্থাপত্যকর্মের বৈশিষ্ট্য সৃষ্টিকারী নকশালঙ্কার, কারুকার্য, সাজসজ্জায়ন ইত্যাদি সৌন্দর্যবর্ধক উপকরণগুলো রপ্ত করতেও বেশ কয়েক যুগ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল। তার পরেই এ অঞ্চলে স্থাপত্য একটা শিল্প হিসেবে ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিল।

প্রাথমিক পর্বের ইমারতগুলো ত্রিবেণী, সপ্তগ্রাম (সাতগাঁও) এবং হুগলি জেলার ছোট পাণ্ডুয়ায় নির্মিত হয়েছিল। এ পর্বের বহু গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদগুলো অত্র অঞ্চলের আঞ্চলিক বিশেষ রীতিতে ইট ও প্রস্তর দ্বারা নির্মিত হলেও এগুলোর কোনায় বুরুজ ছিল না; এমনকি বক্র কারনিসের ব্যবহারও ছিল অনুপস্থিত। এ ইমারতগুলোর সম্মুখস্থ খিলান সারি অতি স্থূলাকায় পিয়ার হতে উত্থিত হয়েছিল যা কোনোক্রমেই দৃষ্টিনন্দন ছিল না। আর আলঙ্কারিক উপকরণ হিসেবে টেরাকোটার ব্যবহার কেবলমাত্র মসজিদের মিহরাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

১৩৪০ খ্রিস্টাব্দের দিকে হুগলি ও বর্ধমান জেলায় মুসলমানগণ স্থায়িভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল। ছোট পাণ্ডুয়া গ্রামে মুসলমানেরা যে মসজিদ নির্মাণ করেছিল বর্তমানে তা এতই জরাজীর্ণ যে এটি হতে স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুসন্ধান করে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্য বা মৌলিক উপাদান সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা অত্যন্ত কষ্টকর। তবে এটুকু জানা যায় যে এর দেয়াল ও খিলানগুলো ইষ্টক নির্মিত এবং স্তম্ভগুলো ছিল প্রস্তর নির্মিত। ধারণা করা হয় প্রস্তর স্তম্ভগুলো কোনো হিন্দু ইমারত হতে সংগ্রহ করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় খিলানপথ (nave) কিছুটা কম ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে। প্রধান মিহরাবের ডানে অবস্থিত মিম্বরটি খোদাইকৃত প্রস্তরে নির্মিত।

পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন[২] যে যদি এটি চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের আগে নির্মিত হয়ে থাকে তবে এটি বিশালতার দিক হতে বাংলার রাজধানী পাণ্ডুয়ায় নির্মিত আদিনা মসজিদের পূর্ববর্তী আদর্শ স্থানীয় হিসেবে মনে করা যেতে পারে। ধ্বংসপ্রাপ্ত এ মসজিদের মধ্য দিয়ে বাংলার মুসলিম স্থাপত্য সাধনার স্বরূপ উপলব্ধি করা যেতে পারে। কারণ

বহুসংখ্যক গম্বুজের ব্যবহারে চতুর্ভুজাকার নকশায় সর্বপ্রাচীন মসজিদ বলে একে মনে করা যায়।

এ ধ্বংসাবশেষের নিকটই অন্য একটি স্থাপত্যকীর্তি সৌভাগ্যবশত অপেক্ষাকৃত ভালো অবস্থায় রয়েছে। এটি পরবর্তীকালে সংস্কারপ্রাপ্ত হলেও কিছু কিছু মূল্যবান স্থাপত্যিক মৌলিক নিদর্শন রয়েছে। এটি একটি বিজয়স্তম্ভ যা জনশ্রুতি অনুসারে এক মুসলিম সাধক কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এ সাধকের নাম শাহ্ সুরি উদ্দিন। তিনি ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে পাণ্ডুয়ার রাজাকে পরাজিত করে তাঁর বিজয় স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এটি নির্মাণ করেছিলেন। এটি ৩৬.৬০ মি. (১২০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। এর উচ্চতা অনুসারে প্রস্থের অশোভনতা উপেক্ষা করা যায় না। কিন্তু এর পৃষ্ঠ ও চতুষ্পার্শ্বের প্রলম্বিত কানা (flanges) এবং এর বিভিন্ন তলার অলঙ্করণ,দিল্লির কুতুব মিনার দ্বারা অনুপ্রাণিত ও প্রভাবিত হয়েছিল যা তখন হতে দেড় শ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। এ উদাহরণে প্রতীয়মান হয় সুদূর বাংলাতেও রাজকীয় মামলুক ও খল্জী স্থাপত্য আদর্শের চর্চার ধারা অব্যাহত ছিল।

বাংলায় সর্বপ্রথম যে প্রথম মুসলিম উপনিবেশ ত্রিবেণীতে স্থাপিত হয়েছিল সেখানে একটি মসজিদ ও মাকবারা নির্মিত হয়েছিল। উক্ত মসজিদে ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দের একটি খোদাইকৃত উৎকীর্ণ লিপি সংযুক্ত ছিল। কিন্তু উক্ত লিপি মসজিদে থাকলেও কোনোভাবেই মসজিদের সময়কালের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে মনে করা যায় না। কারণ মসজিদটি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে সংস্কার সাধনের চিহ্ন ধারণ করে রয়েছে।

এর নিকটবর্তী একজন প্রথম মুসলিম বঙ্গ বিজেতার কবরের স্মৃতিবহ স্থাপত্যকীর্তি রয়েছে যার নাম জাফর খান গাজী। যদিও এ মাকবারাটি সময়ের প্রেক্ষাপটে প্রকৃতির নির্মম কশাঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত তথাপি এটি পরিষ্কাররূপে প্রাথমিক যুগের বলে নিশ্চিতভাবে বুঝতে অসুবিধা হয় না। এ মাকবারাটির নির্মাণ উপকরণ পার্শ্ববর্তী ধ্বংসপ্রাপ্ত হিন্দু মন্দির হতে সংগৃহীত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মন্দিরের বিভিন্ন অংশ ভেঙে এনে পুনঃসংযোজন করে মুসলিম পদ্ধতিতে কবর প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি পুনঃনির্মাণকালে কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর ইটের সাথে দেয়াল নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। এ ইমারতে সূচ্যগ্র খিলান ব্যবহার দৃষ্ট হয়। যদি এ দৃশ্যমান সূচ্যগ্র খিলানের অবস্থান আদিতে না হয়ে থাকে অর্থাৎ মাকবারা নির্মাণের প্রাক্কালে না হয়ে থাকে তা হলে বাংলার স্থাপত্যে ঐ জাতীয় খিলানের ব্যবহার এখানেই প্রথম হয়েছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

ইসলামিক স্থাপত্যে সূচ্যগ্র খিলান ব্যবহারের উদাহরণ খুব একটা গুরুত্ব বহন করে না কেননা ইতঃপূর্বে অন্যত্র এটি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে এর গুরুত্ব এখানেই যে বাংলার স্থাপত্যে নতুন শাসকবৃন্দ এ পদ্ধতির ব্যবহার এখানে প্রথম করেছিল। এ সময়ের স্থাপত্যকর্মের সঠিক তথ্য জানার মতো উপাদান যতই সামান্য হোক ত্রিবেণীর মাকবারা কিন্তু একটা প্রধান স্মৃতি বিবরণী বলে মনে করা যেতে পারে। এ মাকবারা অবলম্বনে সে যুগে বাংলার মুসলিম স্থাপত্য কতটা অগ্রসর হতে পেরেছিল তার একটা সঠিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এত স্পষ্টভাবে আর কোথাও মৌলিক উপকরণগুলোর সমাবেশ লক্ষ করা যায় না।

পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন[৩] যে 'প্রাচীন স্থাপত্য ইমারতগুলোর অঙ্গে আদি তথ্যমূলক কোনো চিহ্ন না থাকায় তিনি ধরে নিয়েছেন যে জাফর গাজীর মাকবারার মতোই এদেশে প্রথম অভিযানকারীরা তাদের ইমারত নির্মাণের প্রয়োজনবোধে হিন্দুদের স্থাপত্যকীর্তিগুলো সমূলে রূপান্তর করাটাই একান্তভাবে অভ্যস্ত নিয়ম ছিল'। তবে কোনো ঐতিহাসিক সত্যতার

নিশ্চয়তা ছাড়া সূত্র ধরে একটি ঘটনার বিন্যাস অন্যটি দ্বারা প্রমাণ করা সঠিক নাও হতে পারে।

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের দ্বিতীয় ধাপ (১৩৪০-১৪৩০ খ্রি.) :

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের দ্বিতীয় ধাপে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন ঘটেছিল। এ উন্নয়নের মাঝেই স্পষ্টত মুসলিম নির্মাতাদের স্বতঃস্ফূর্ত নিজস্ব আবেগের প্রতিফলন বিধৃত হয়ে রয়েছে। তারা নিজেদের ধ্যান-ধারণা সংবলিত নকশা পরিকল্পনায় চিত্তাকর্ষক কীর্তি নির্মাণ করেছিল। এ স্থাপত্য সৌধগুলোর নির্মাণের সাথে সময়ের দিক হতে একই সাথে সংঘটিত হয়েছিল যখন লক্ষ্মণাবতী বা গৌড় হতে বাংলার রাজধানী পান্ডুয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছিল যা গৌড় হতে প্রায় ২৮ কি.মি. উত্তরে অবস্থিত। পাণ্ডুয়ায় এটিই প্রথম ইসলামি স্থাপত্যকর্ম নয়, কেননা (পাঁচ বর্গ মাইল) বিস্তৃত এলাকা জুড়ে মাটির ঢিবি ও স্তূপের অবস্থান প্রমাণ করে যে এখানে পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান, খনন কাজের ফলে কিছু কিছু কীর্তির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া গিয়েছে।

আদিনা মসজিদ :

পাণ্ডুয়াতে প্রথম রাজধানী স্থাপনের পর মুসলমানেরা একটি এবাদতখানা বা মসজিদ নির্মাণের আবশ্যকতা অনুভব করেছিল। সিকান্দার শাহ্ ১৩৫৮-১৩৮৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলার এ নতুন রাজধানীতে রাজত্ব করেন। তিনি রাজধানীর কেন্দ্রস্থলে ১৩৬৪ খ্রিস্টাব্দের দিকে একটি জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এটি আদিনা মসজিদ নামে পরিচিত। এ মসজিদের আকারত্ব দেখে তৎকালীন সময়ে পাণ্ডুয়া শহরে কী পরিমাণ মুসলমান বসবাস করত তার একটা ধারণা পাওয়া যায়।

আদিনা মসজিদের প্রাঙ্গণটি সুবিস্তৃত আয়তাকার এবং অসংখ্য খিলানায়িত পথ দ্বারা পরিবেষ্টিত। বর্তমানে এদের অনেকগুলো ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে মাটিতে পড়ে গিয়েছে। এ মসজিদের বাহ্যরূপ দেখে একটি সুসম্পন্ন মুসলিম এবাদতখানার চেয়ে প্রাচীনকালে রোমের আদালত ভবন বা সাধারণ আলোচনার দরবার হল বলে মনে হয়। এর পশ্চিম পার্শ্বের অংশ উচ্চ খিলান ছাদযুক্ত জুল্লাহ বা মুসল্লা যেন ছদ্মবেশধারী রাজকীয় বিজয়তোরণ; জনসাধারণের আনন্দ উৎসব উপলক্ষে নির্মিত কারুকার্যময় খিলানপথ। তবে দেখতে যে রকমই মনে হোক না কেন এটি ধর্মীয় প্রয়োজনে পরিকল্পিতভাবে নির্মিত হয়েছিল।

এর অঙ্গনের পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ১২২ মি. (৪০০ ফুট) ও প্রস্থে ৩৯.৬৫ মি. (১৩০ ফুট)। সারিবদ্ধ স্তম্ভায়িত খিলানপথ (aisles) যা ইসলামের আদি মসজিদ নকশা অনুসারে নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের জুল্লাহ বা এবাদতখানা যা পশ্চিমাংশে অবস্থিত তা পাঁচটি আইলে বিভক্ত এবং সাহনের তিন দিকের বারান্দা তিন আইলে বিভক্ত। মসজিদের ছাদের সমস্ত ভার ২৬০ টি স্তম্ভ বহন করছে এবং সম্মুখ অংশ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্ঠিত। এ মসজিদের সামগ্রিক দৈর্ঘ্য ১৫৪.৭০ মি. (৫০৭.৫ ফুট) ও প্রস্থ ৮৭.১০ মি. (২৮৫.৫ ফুট)। এটি অষ্টম শতাব্দীর দামেস্কে নির্মিত আদর্শ মসজিদের প্রায় সমান। প্রাঙ্গণ বা সাহনের অভ্যন্তরে একটানা ফাসাদ খিলান পর্দা দ্বারা গঠিত; এদের স্তম্ভের সংখ্যা ৮৮ টি। ভূমি হতে উন্নত বপ্রের উচ্চতা ৬.৭৫ মি. (২২ ফুট)। উন্নত বপ্রের উপর দিয়ে ছাদ দৃষ্ট হয়। এ ছাদ মূলত গম্বুজের সমাহার। প্রতিটি 'বে'-বর্গের উপর একটি করে গম্বুজ সংস্থাপিত এবং গম্বুজের সংখ্যা ৩০৬ টি (ভূমি নকশা নং-১০)।
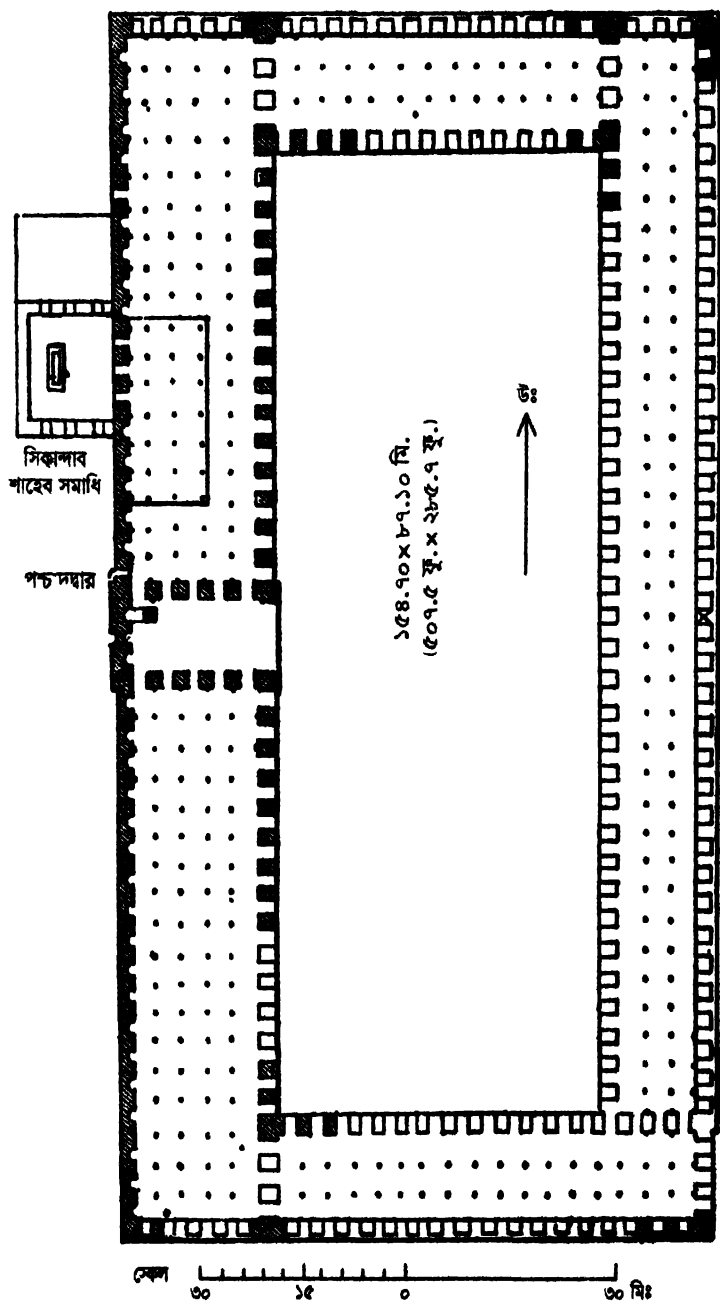
ভূমি নকশা নং ১০ আদিনা মসজিদ

মসজিদের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় তিনটি খিলানায়িত প্রবেশ দরজা বাইরের দিকে উন্মুক্ত এবং এটিই মসজিদের প্রধান প্রবেশপথ। তবে এ প্রধান প্রবেশপথটি মসজিদের বিরাটত্বের সাথে মানানসই নয়। এর পরিকল্পনাকারীরা দুর্ভাগ্যজনকভাবে মসজিদের পূর্ব পার্শ্বের মধ্যখানে একটা উচ্চ আড়ম্বরশালী তোরণ দরজার পরিকল্পনা করতে ব্যর্থ হয়েছিল যা করলে মসজিদের ঠিক মাঝ অংশের দুপার্শ্বের সমান ভারসাম্য বজায় থাকত এবং পশ্চিম অংশে অবস্থিত বিরাট জুল্লাহ বা মুসল্লার সাথে যোগাযোগ সুন্দরভাবে রক্ষিত হতে পারত।

অবশ্য আরো তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে, তবে সেগুলো অত্যন্ত ছোট আকারের। এগুলো পশ্চিম দেয়ালের উত্তরাংশের শেষ মাথায় অবস্থিত। এ দরজা দুটি উপর তলায় গিয়ে পৌঁছেছে। উপরের এ প্রকোষ্ঠটি জুল্লাহর উত্তর খিলানপথের উপর অবস্থিত যা বাদ্‌শা-কা-তখত্ নামে পরিচিত। প্রকৃতপক্ষে এ অংশটুকু সুলতানের ব্যক্তিগত উপাসনার জন্য নির্ধারিত অংশ বলে মনে হয়। কিন্তু পশ্চিমা ঐতিহাসিকগণ ভ্রমবশত এ স্থানটিকে রাজপরিবারের মহিলাদের এবাদতখানা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন।

এ অংশের নকশা পরিকল্পনা এবং নির্মাণশৈলী বিশেষ কতকগুলো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করেছে। কেননা এর উপর তলাটা সারিবদ্ধ খিলান ও তার নিচে অসাধারণ আকারের স্তম্ভ সারির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এগুলো খুবই হ্রাস ও ভারী ধরনের এবং এগুলোকে স্তম্ভের চেয়ে থাম (piers) বলা যায়। এগুলো অস্বাভাবিকভাবে পুরু চতুষ্কোনাকৃতির এবং এদের উপরের দিকে গুরুভার আলম্ব বা ভারবহনকারী স্তম্ভশীর্ষ। এ জাতীয় স্তম্ভ বাংলার অন্যান্য স্থাপত্য ইমারতের দৃষ্ট হলেও ভারতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। বলা বাহুল্য এগুলো অনুপম ও অদ্বিতীয় বাংলার স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

পক্ষান্তরে যে স্তম্ভগুলো উপর তলা গঠন করেছে বস্তুত তারা অধিক সুষমতাপূর্ণ; কেননা এর উপর ও নিচ সুশোভন খাঁজকাটা দণ্ড এবং প্রসারিত স্তম্ভ দ্বারা গঠিত। অবস্থাদৃষ্টে স্বাভাবিকভাবে মনে হয় যে এ পদ্ম নকশাসংবলিত স্তম্ভ শীর্ষগুলো ও অন্যান্য খুচরা অংশগুলো কোনো ব্যতিক্রমধর্মী হিন্দু ইমারত হতে সংগ্রহ করে মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। রাজকীয় এবাদতখানার এবং সমগ্র পশ্চিম দেয়ালের ভিতর মুখে অবস্থিত চোরকুঠরির ন্যায় মিহরাবগুলো সন্নিবেশিত রয়েছে। মিহরাবগুলোর মোট সংখ্যা ৩২টি। এগুলো প্রতিটি 'বে'-এর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। মিহরাবগুলো মনোজ্ঞ নকশা ও কারুকার্য দ্বারা সজ্জিত ।

মসজিদের জুল্লাহর কেন্দ্রীয় অংশটুকু যা এখন ছাদবিহীন অবস্থায় রয়েছে তা সবচেয়ে মসজিদের উৎকৃষ্টতম অংশ। এ উৎকৃষ্টতার আদি কিছু কিছু রূপ এখনো প্রকাশমান। এটি সুষমতায় গঠিত একটি মিলনায়তন যা একইভাবে পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত। অতএব মিলনায়তনটি আড়াআড়িভাবে পাঁচ সারি খিলানপথের সাথে অবস্থিত। অন্যপক্ষে খিলানপথ বা আইলগুলো এর পার্শ্ব হতে প্রসারিত।

এটি দৈর্ঘ্যে ২১.৪০ মি. (৭০ ফুট) ও প্রস্থে ১০.৪০ মি. (৩৪ ফুট); পরিবৃত মেঝে হতে সূচ্যগ্র ঢেউছাদ প্রান্তরেখা পর্যন্ত সম্ভবত ১৫.৩০ মি. (৫০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল। এটি গথিক্ পদ্ধতির গির্জার মধ্যে অবস্থিত মহিলাদের প্রার্থনা প্রকোষ্ঠের প্রায় সমমাপ বিশিষ্ট। এর সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদ এখন যা প্রায় সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে তা আয়তাকার ১৫.৩০ মি. (৫০ ফুট) লম্বা ও ১৮.৩০ মি. (৬০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট পর্দা ধারণ করেছিল। অবশ্য এ উচ্চতা উন্নত বপ্রের অলঙ্করণযুক্ত মার্লন পর্যন্ত বিস্তৃত। মসজিদের সম্মুখ পর্দার ভিতর দিয়েই জুল্লাহতে প্রবেশের পথ রচিত হয়েছে। এ সূচ্যগ্র খিলানায়িত পথ ১৫.৩০ মি. (৫০ ফুট) উচ্চতা ও ১০.১০ মি. (৩৩ ফুট) প্রসারিত। এ জাঁকালো চিত্তাকর্ষক

তোরণ দ্বারটি মিলনায়তনের বিস্তার অনুপাতের সমান এবং এ হলঘরে প্রবেশের পথ রচনা করেছে।

সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদের নকশা বা ছক ছোট খিলানপথ নির্মাণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে এবং এটি উন্নত বপ্র পর্যন্ত বিস্তৃত। এর সাথে ধারণকৃত বা নির্মিত সোপানশ্রেণী দ্বারা দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের মতোই উচ্চ মিনারে মোয়াজ্জিন আজান দিতে পারত।

এ মিলনায়তনের অভ্যন্তরভাগের নকশা পরিকল্পনাও সমানভাবে দৃষ্টি আকর্ষণীয়। কেন্দ্রীয় নেভের প্রত্যেক পার্শ্বে দীর্ঘ পাঁচটি সূচ্যগ্র খিলানপথ প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে এবং এদের মধ্য দিয়েই পথের অসীম একটানা দীর্ঘ ব্যাপ্তি রচনা করেছে। ফলে থামগুলোর (piers) দৃষ্টিগোচর চেহারা ক্রমে ক্রমে হ্রাস প্রাপ্ততায় দেখা যায়। যাহোক উপরের ছাদের রচনাশৈলীও বিশেষভাবে আকর্ষণীয়। এটি এখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেও সেখানে এটি জাঁকজমকভাবে সূচ্যগ্র খিলানাকৃতির ঢেউ ছাদ আকারে রচিত ছিল বলে মনে হয়। যদি এটি সঠিক হয় তবে এটিই প্রাথমিক ইসলামি যুগের একটা বিরল উদাহরণরূপে চিহ্নিত কবা যায় এবং এ ধরনেব নির্মাণ কাজ ভারতীয় স্থাপত্য ইতিহাসে কদাপি দৃষ্ট হয়।

কেন্দ্রীয় নেভের অভ্যন্তরভাগের নির্মাণ কাজ সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে বিশেষ কিছু বলা যায় না। তবে এব সমগ্র বিশাল স্থাপত্য অবকাঠামো অবলোকনে মনে হয় এটি বেশ কয়েক মিটার ইট গেঁথে পুরু ও ভারী করা হয়েছিল এবং এটি অসম্ভব নয় যে অতিরিক্ত ভার সহ্য করতে না পেরে ভেঙে বা ধসে পড়েছে (চিত্র নং-২০)।

এ জুল্লাহর বর্ণনা পূর্ণাঙ্গ বা সম্পূর্ণ হবে না যদি এর পশ্চিম পার্শ্বের দেয়ালপৃষ্ঠ নির্মাণ প্রণালীর বিবরণ না দেওয়া যায়। এখানে নামাজঘরেব পূর্ণাঙ্গতাব জন্য তিনটি উপাদান বিশেষভাবে প্রয়োজন তা হচ্ছে কেন্দ্রীয় মিহরাব এবং তাব পার্শ্বে আর একটি অতিরিক্ত মিহরাব ও মিম্বর। এগুলো রিলিফ প্রণালীতে কারুকার্যের মাধ্যমে দেয়ালেব সমতলপৃষ্ঠ শোভিত হয়েছে।

এ অলঙ্করণের উপর দিয়ে উল্লম্বভাবে জড়িয়ে গাঁথা বা বুনানো অন্য একটি অলঙ্করণ প্যানেল রয়েছে যা জমিনের উপর দাঁড়িয়ে স্পষ্ট সুন্দবভাবে দেখা যায়। সমস্ত কারুকার্যই নিখুঁত ও চমৎকারভাবে নিষ্পন্ন হওয়ার পরও মানুষের সাধারণ দৃষ্টিসীমা এখানকার চেয়ে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য সমৃদ্ধ মিহরাবের নকশা পরিকল্পনায় নিবদ্ধ হয়েছে। এটি হচ্ছে তিন ফালিযুক্ত খিলানায়িত চোরকুঠরি আকারের যা আয়তাকৃতির কাঠামোর মধ্যেই সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। এর উপরের দিকে কয়েক প্রস্তর ধাপে ঢালাই কাজ ও চিকন খোপ খোপ মিহি অলঙ্করণ, আরব্য নকশা ও কোরানের বাণীর সুন্দর হস্তলেখ (callıgraphy) দ্বারা সাজানো রয়েছে।

মসজিদ গঠনকারী উপকরণগুলোর মধ্যে চোরকুঠরিটাই অতি সৌষ্ঠবময় করে নির্মিত। এর অঙ্গসজ্জার মধ্য দিয়ে যা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তা বাংলার স্থাপত্যশিল্পে আর কোথাও বিকশিত হতে দেখা যায় না। এটি মানব-মনের সৌন্দর্যবোধকে চেতনার উপর আলোকপাত কবতে সমর্থ হয়েছে। খুব সম্ভব মিহরাবটি বাংলা বিহার অঞ্চলের কোনো প্রাচীনকীর্তির ধ্বংসাবশেষের মাঝে প্রাপ্ত। অনুরূপ মিহরাব বৌদ্ধ বা হিন্দু দেবতাদের পবিত্র বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য বৌদ্ধ স্তূপা বা হিন্দু মন্দিরে দেখতে পাওয়া যায়। পি. ব্রাউন মনে করেন যে, 'তুলনামূলকভাবে সামান্য রদবদলের পর বৌদ্ধ স্তূপার ডিঙি নৌকার মতো কুলঙ্গি বা হিন্দু মন্দিরের অলঙ্কৃত ডিভাগোস্তাকে (devagosta) মুসলিম মিহরাব হিসেবে আদিনা মসজিদে স্থাপন করা হয়েছে'।[৪]

মসজিদ নির্মাণে মূলত আড়ম্বর পূর্ণতার দিকে বিশেষ আগ্রহ ও মনোযোগ দেওয়া হয়েছে; আদিনা মসজিদ নিশ্চিত গাম্ভীর্যতা ও রাজকীয় মর্যাদাপূর্ণ উৎকর্ষতা উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে। একদিকে এর বিশাল আকারত্ব, অন্যদিকে অবয়বের পিণ্ডত্ব একে অমরত্ব দান করেছে। মোটের ওপর এতবড় একটা গঠন কাঠামোতে সর্বত্রই বৈশিষ্ট্যের সুষমতা প্রতীয়মান হয়েছে।

এ স্থাপত্যকীর্তির জীবনীশক্তির দীর্ঘতা সম্পূর্ণভাবে উপকরণের উৎকৃষ্টতা এবং তা প্রয়োগকরণের কৌশল ও দক্ষতার কারণে সম্ভবপর হয়েছিল। মসজিদের উপরাংশের খিলান ও গম্বুজসহ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইটই প্রধান উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু সম্মুখ দেয়ালের উপকাঠামোগুলো মসৃণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণের সাইজ করা প্রস্তর দ্বারা গঠিত হয়েছে এবং এ কাজে ব্যবহৃত কোনো প্রস্তর খণ্ডই নতুনভাবে সংগৃহীত হয় নি। মনে করা হয় যে এসব প্রস্তর খণ্ড লক্ষ্মণাবতী বা নিকটবর্তী কোনো স্থানের হিন্দু স্থাপত্য কাঠামো হতে সংগৃহীত হয়েছিল।

আরো সন্দেহ করা হয় যে প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম শাসকগণ আদৌ কখনো রাজমহলের পাথর খনি হতে এসব নির্মাণ উপকরণ সংগ্রহ করেছিল কি না ? কার্যত তাদের সমস্ত স্থাপত্য নির্মাণ কাজে প্রস্তুত করা প্রস্তর সামগ্রী ব্যবহৃত হত। আদিনা মসজিদের বিভিন্ন অংশে ব্যবহৃত মালমসলার প্রয়োগ এ কথার সত্যতা প্রমাণিত করেছে। খোদাইকৃত পাথর খণ্ডে মূর্তি ছাপযুক্ত হওয়া অবস্থায় অভ্যন্তর দেয়ালে দৃষ্ট হচ্ছে; বিশেষভাবে জুল্লাহর মিম্বরে এটি প্রত্যক্ষ করা যায়। মসজিদের সবগুলো দরজাই প্রয়োজন অনুসারে এখানে এনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে; 'বাদশা-কা-তখত'-এর উত্তর দিকের প্রবেশদ্বারটি অনুরূপ একটি। আরো বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে ঐ তিন শ স্তম্ভ হিন্দু স্থাপত্য কাঠামো হতে সংগৃহীত হয়েছিল। অনেক মন্দির ও রাজপ্রাসাদ ভেঙে এ মসজিদের মালমসলা ও উপকরণাদি যোগাড় করা হয়েছিল এবং ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণী হতে জানা যায় লক্ষ্মণাবতীর অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ধ্বংস করে ঐগুলো হতে মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগৃহীত হয়।

এ মসজিদ কাঠামোয় অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ লক্ষ করা যায়। তার মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য যা বাংলার স্থাপত্যের অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে কাঠামোর সৌন্দর্যময় কান্তিক চেহারা, দ্বিতীয়টি হচ্ছে অবকাঠামো নির্মাণ প্রকৌশলের অপূর্ব সমন্বিতা। ইমারতের গঠন কাঠামোর নির্মাণ বিভিন্ন উপাঙ্গের নকশা প্রণয়ন, নির্মাণ কৌশল, অলঙ্করণ ও সুষমতা আনয়নে নির্মাতার সৌন্দর্যবোধ মানসিকতাই ফুটে উঠেছে।

দ্বিতীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কী পদ্ধতি অবলম্বনে স্থাপত্য কাঠামোর ছাদ নির্মিত হয়েছে? মসজিদের ছাদ নির্মাণে খিলান পদ্ধতির নকশা পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়েছে। এ নির্মাণ প্রযুক্তির মাধ্যমে ছাদের ভার সুচারুরূপে নির্মিত খিলানের মধ্য দিয়ে সঞ্চারিত হচ্ছে। কেন্দ্রীয় নেভের ছাদ নির্মাণে দীর্ঘাকৃতির রিবড ভল্ট (elongated ribbed vault) ব্যবহৃত হয়েছে। অপরপক্ষে প্রতিটি 'বে'-বর্গের উপর ছাদ হিসেবে গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে, যার ভারবহনের জন্য পান্দানতিফ্ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। এ পদ্ধতি গঠনে প্রতি পর্যায়িত স্তরগুলোতে ইট তির্যকভাবে (diagonally) ও সমান্তরালভাবে (horizontaly) স্থাপন করে বর্গাকার হতে বৃত্তাকার পরিবর্তন প্রক্রিয়া সাধিত হয়েছে।

এ প্রক্রিয়া দিল্লির স্থাপত্য ইমারতে এমনকি মুলতান স্থাপত্যেও প্রয়োগ হয়েছে। এ পদ্ধতি প্রাথমিক যুগে সিরিয়ার রাক্কা মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটি অষ্টম শতাব্দীর কথা

এবং মনে করা যায় যে এটি যে কোনোভাবে অনুরূপ মূল স্থাপত্য উৎসাহ হতে ভারতীয় পদ্ধতি আদিতে গ্রহণ করেছিল।

চতুর্দশ শতাব্দীর পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ ছাড়া সেখানে কোনো গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য ইমারত আর নির্মিত হয় নি এমনটি নয়; তবে ঐগুলো কালক্রমে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। পক্ষান্তরে গৌড়ে কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ টিকে রয়েছে যার মধ্য দিয়ে স্থাপত্য আদর্শের পদ্ধতি সম্পর্কে সামান্য অবগত হওয়া যায় এবং স্থাপত্য অনুশীলন যে অব্যাহত ছিল তা বুঝা যায়। এ সমস্ত স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে আকহি মুরাদ উদ্দিন মসজিদ ও মাকবারা উল্লেখযোগ্য। এ স্থাপত্য ইমারত দুটি সম্ভবত একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু উভয় স্থাপত্যকর্ম পরবর্তীকালে পুনঃনির্মাণের ফলে অবয়বের পরিবর্তন ঘটেছিল। এ মসজিদের নকশা পরিকল্পনা অবলোকন করে মি. কানিংহাম যথার্থ একে মসজিদের চেয়ে সরাইখানারূপে বেশি মানানসই বলে মন্তব্য করেছেন।[৫]

অপর একটি উদাহরণ হচ্ছে কোতওয়ালি দরওয়াজা। এটি ভীষণভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপত্য স্মৃতিচিহ্ন। এটি গৌড় নগরে প্রবেশের দক্ষিণ দিকের তোরণদ্বার হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। এটি একটি সুউচ্চ খিলানপথ যার উচ্চতা ৯.৫০ মি. (৩১ ফুট); প্রস্থ ৪.৯০ মি. (১৬ ফুট) এবং দৈর্ঘ্য ৫.৩৫ মি. (১৭ ফুট ৪ ইঞ্চি)। এটি বাহ্যত ঐ একই সময়ে নির্মিত বলে মনে হয়। কারণ এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতি দিল্লিতে ফিরোজ তোঘলক (১৩৫১-৮৮ খ্রি.) যুগীয় স্থাপত্যে দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে দোলায়মান বা উদ্‌গত চূড়া যা সূচ্যগ্র খিলানায়িত তোরণপথের প্রত্যেক পার্শ্বে আলম্ববাহী দেয়ালের সাথে নির্মিত হয়েছে এবং এটি ক্রমসরু হয়ে উপরে উঠে যাওয়ার কৌশল দিল্লিতে নির্মিত ইমারতগুলোর সাথে সাদৃশ্যমান। বাংলার স্থাপত্য অনুশীলনে দিল্লিভিত্তিক নির্মিত স্থাপত্যকীর্তির মাঝে যে বৈশিষ্ট্য ও নির্মাণরীতির প্রভাব দৃষ্ট হয়েছে তাই পরবর্তীকালে স্থানীয় নির্মাণরীতির সাথে একাকার হয়ে বাংলার স্থাপত্যকে সমৃদ্ধিশালী করতে যথেষ্ট অবদান রেখেছিল।

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের তৃতীয় ধাপ (১৪৪০-১৫৭৬ খ্রি.) :

বাংলার স্থাপত্যশিল্প বিকাশের তৃতীয় পর্যায়ে যে সৌধমালা, প্রাসাদ, মসজিদ, মাকবারা ইত্যাদি নির্মিত হয়েছিল তা অবলোকন করলে মনে হয় ইতোমধ্যে স্থাপত্য অনুশীলনে যথেষ্ট পরিপক্বতা এসেছে। ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে যে স্থাপত্য অনুশীলন লক্ষ করা যায় কেবল তাতে শুধু পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হয়েছিল তা নয়; বরং অতীত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে নতুনভাবে স্থাপত্য যাত্রা শুরু করেছিল। তাই পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে স্থাপত্য আদর্শ ও পদ্ধতি চিহ্নিত করা যায় তা পরিবেশ ও জলবায়ুর সংঘাতকে মেনে চলার জন্য স্থানীয় পদ্ধতি গ্রহণ করে তাই অনুশীলন করতে থাকে।

বাংলা বিদেশী শাসনকর্তাদের হাতে চলে গেলেও প্রাকৃতিক পরিবেশের যে আধিপত্য তার নিগূঢ়ে স্থাপত্য আন্দোলন সঞ্চালিত হয়েছিল। প্রকৃতির সাথে সখ্যতা স্থাপনের মধ্য দিয়ে স্থাপত্য গঠন ও অবয়ব পরিবর্তনের জন্য মাটি ও জলবায়ুর প্রভাবকে অন্যতম কারণ বলে মনে করা যায়।

মাটির প্রকৃতি অধিবাসীদের জীবন-জীবিকা ও চিন্তা-চেতনার প্রতিফলনে প্রতিবিম্বিত হয়। এটি তাদেব নানাবিধ কর্মের মধ্যে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে ক্রিয়াশীল। তাই সব ধরনের স্থাপত্য অনুশীলনের মাঝে একই এদের গুরুত্ব অপরিসীম। তবে এটি স্বীকার্য যে

নির্মাতার প্রধান উদ্দেশ্য থাকে স্থাপত্যকর্মকে অধিক স্থায়িত্বদানের উপযোগী করে নির্মাণ করা।

বাংলার আর্দ্রতাপুষ্ট জলবায়ুতে উৎকৃষ্ট স্থাপত্য নির্মাণের সুযোগ সীমিত। বদ্বীপ গঠিত বাংলার ভূমি সব সময় নির্দয়। নদীর সতত গতি পরিবর্তন ও তীর ভূমির ক্ষয়, পলিমাটিতে নদীগর্ভের ভরাট হওয়া এবং বন্যার প্রকোপ অধিবাসীবৃন্দকে প্রকৃতি সম্পর্কে অভিজ্ঞ করে তুলেছিল। এ পরিস্থিতিতে স্বল্পকাল স্থায়ী পদ্ধতির বাড়িঘর নির্মাণের প্রতি মানুষ আগ্রহশীল ছিল। এ ঘরবাড়িগুলো বাঁশ, কাঠ বা অনুরূপ উপকরণ দ্বারা নির্মাণের প্রথা চালু হয়েছিল যাতে প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা অন্য যে কোনো কারণে জরুরি পরিস্থিতির উদ্ভব হলে অনায়াশে স্থানান্তর করা যায়।

বাংলার আর্দ্রতা ভাবাপন্ন জলবায়ু স্থাপত্য পদ্ধতিকে সুদীর্ঘকাল হতে নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। অবিরাম বর্ষণ বছরের বেশ কয়েক মাস স্থায়ী হয়, গ্রীষ্মের কাঠফাটা রৌদ্র, আবার শীতের কুহেলিকা ইত্যাদির যে আপেক্ষিক প্রভাব তাই স্থাপত্য নির্মাণ কাজে পথনির্দেশনা দিয়েছে। ঘরের চালা হতে দ্রুত পানি অপসারণ হওয়ার উপযোগী করে ছাদ বা ছাউনি নির্মিত হত। ছোট বা বড় কাঠামোর ঘর নির্মাণে বাঁশের কড়ি, রুয়া বক্র করে বেঁধে তার উপর ঘরের ছাউনি দেয়া হয়ে থাকে। ঘরের মাঝামাঝি ছাদ ছাউনি হতে ধীরে ধীরে উভয় পার্শ্বে নিচু হয়ে নেমে গিয়েছে। আদিকালের এ সূচনা বা রীতি কালক্রমে একটা স্থায়ী নির্মাণ পদ্ধতি বা কৌশলে পরিণত হয়েছে।

তাই এ তৃতীয় পর্যায়ের মুসলিম স্থাপত্যে নির্মাণরীতি বিশেষ কতকগুলো আঙ্গিকের গোড়াপত্তন হয়েছিল। নির্মাণে যে উপকরণই প্রয়োগ করা হোক না কেন ঐ একই পদ্ধতির রীতি অনুসৃত হয়েছিল। স্থাপত্য গঠন কর্মের ক্ষেত্রে বক্র কারনিসের সংযোজন ঘটেছিল। এসব প্রতিষ্ঠিত কারণ ছাড়াও অন্যান্য কতকগুলো সম্পূরক ও মৌলিক কারণ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্থাপত্যের আকার ও গঠনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ প্রভাবটা হচ্ছে আঞ্চলিক ইসলামিক পদ্ধতির প্রত্যক্ষ ফল। এ প্রভাবপুষ্ট ইমারতগুলোর মধ্যে একলাখি সমাধি (১৪২৫ খ্রি.), ষাট গম্বুজ মসজিদ (১৪৫৯ খ্রি.), দাখিল দরওয়াজা (১৪৫৯-৭৪ খ্রি.), মাহীসন্তোষ মসজিদ (১৪৬৩ খ্রি.), তাঁতিপাড়া মসজিদ (১৪৭৫ খ্রি.), দরসবাড়ীমসজিদ (১৪৭৯ খ্রি.), গুণমান্ত মসজিদ (১৪৮৪ খ্রি.), ফিরোজ মিনার (১৪৮৭-৮৯ খ্রি.), ছোটসোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), সুরা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), মহাস্থানগড় মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী), বাঘা মসজিদ (১৫২৩ খ্রি.), বড়সোনা মসজিদ (১৫২৬ খ্রি.), কদম রসুল মসজিদ (১৫৩০ খ্রি.) এবং কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮ খ্রি.) অন্যতম।

একলাখি সমাধি :

একলাখি স্মৃতিসৌধটি সুলতান জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৪১৪-১৪৩১ খ্রি.) ১৪২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়েছিল। এ স্মৃতিসৌধ তিনটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, এটি এমন একটা গঠন কাঠামো যা নিজেই একটা স্থাপত্য চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে, দ্বিতীয়ত, এটি স্থাপত্য আকারত্বের বিবর্তনের ছাপ ধারণ করে রয়েছে এবং এ ধরনের ইমারতের প্রথম সূচনা ও সূত্রপাত এখানেই এবং তৃতীয়ত, এটি বাংলার পরবর্তী ইসলামি স্থাপত্যের আদিরূপ হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে।[৬]

এর অবয়ব অতিসাধারণ সুরুচিসম্মত কল্পন। এর উপকাঠামো বর্গাকার; প্রতিপার্শ্ব ২৩.৪০ মি. (৭৬ ফুট ৬ ইঞ্চি) এবং বক্র কারনিস পর্যন্ত ৭.৬৫ মি. (২৫ ফুট) উচ্চতায়

উঠে গিয়েছে এবং উপরের সমস্তটায় সাদামাটা গোলার্ধ আকারের গম্বুজ নির্মিত হয়েছে যার ব্যাস ১২.২৫ মি. (৪০ ফুট)। অষ্টভুজাকৃতির চূড়া প্রতি কোনা হতে অভিক্ষিপ্ত বা প্রসারিত হয়েছে (ভূমি নকশা নং-১১)। সম্মুখ দেয়ালের ঠিক মাঝখান দড়ি নকশা আনুভূমিকভাবে
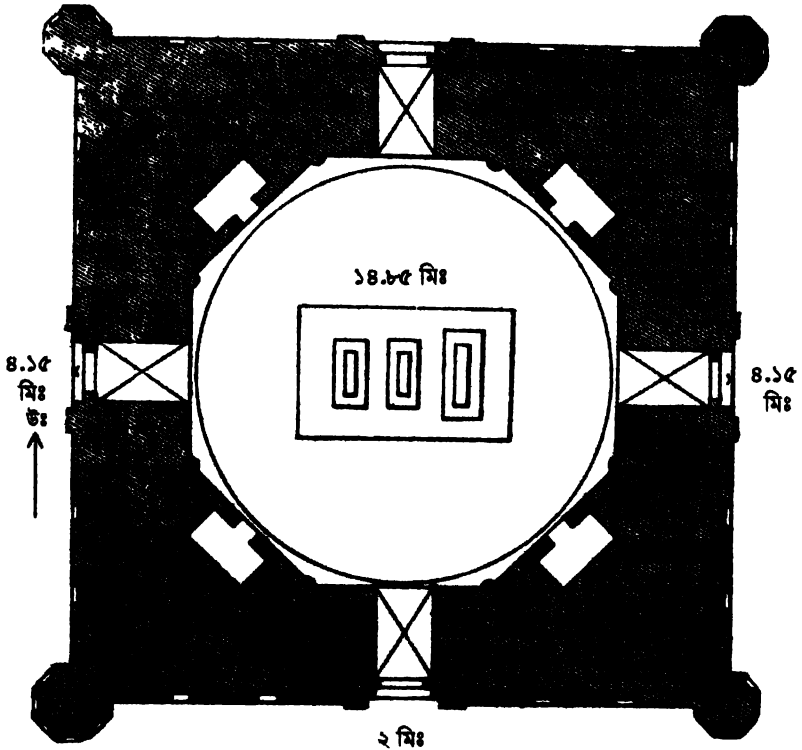
ভূমি নকশা নং-১১ : একলাখী সমাধি

টেনে দেয়া হয়েছে। ফলে এর চেহারা দ্বিতলবিশিষ্ট বলে মনে হয়। অলঙ্কারযুক্ত খোপ খোপ নকশার উপর প্রকোষ্ঠের ফাঁকা জায়গার শোভাবর্ধন করছে। তবে কোনো ত্রিপত্র উদ্ভিদবর্গের নকশা অঙ্কিত হয় নি। প্রত্যেক পার্শ্বের মাঝখানে প্রস্তর নির্মিত দরজা এবং সম্ভবত কোনো হিন্দু মন্দির হতে এটি সংগ্রহ করা হয়েছিল। সর্দলের উপরে সূচালো খিলান প্রয়োগ লক্ষ করার মতো। এ খিলান ও সর্দলের একত্র ব্যবহার রীতি দিল্লির গিয়াস উদ্দিন ও ফিরোজীয় স্থাপত্যরীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

মূল কবর প্রকোষ্ঠ ১৪.৮৫ মি. (৪৮ ফুট ৬ ইঞ্চি) প্রসারের অষ্টভুজাকৃতিতে নির্মিত। এর কোনো জানালা নেই; দরজার উপর দিয়ে আলো প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে। এ ইমারতে আবহমান কাল হতে প্রচলিত বাংলার বাঁশের বক্র কারনিস যা খড়ের কুঁড়েঘর নির্মাণের রীতি-কৌশলরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। তারই প্রথম বিকাশ এ ইমারত নির্মাণের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এখানে কেবলমাত্র বাঁশের বক্র কারনিস বা বৈশিষ্ট্য অনুকরণ করা হয় নি; বরং অন্যান্য সম্পৃক্ত বৈশিষ্ট্য নিষিক্ত হয়েছে, যেমন—ঘরের সম্পূর্ণ দেয়ালের মধ্যে

বিভাজন ও বিভাজিত অংশবিশেষ, অভিক্ষেপণ হয়ে কুলঙ্গি খাঁজ ইত্যাদির রূপ ধারণ করেছে। বলা বাহুল্য কাঠ দ্বারা নির্মিত ঘরের কাঠামো অনুরূপ প্রক্রিয়ার নকশা বাংলায় বহুপূর্ব হতে প্রচলিত ছিল যা বিদেশী শাসকগণ তাদের রুচি অনুসারে স্থাপত্য নির্মাণে ব্যবহার করেছে (চিত্র নং-২১)।

তাই পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আংশিক দেশীয় পদ্ধতিতে স্থাপত্য নির্মাণরীতি গ্রহণের স্পষ্ট প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা যায়। এ প্রসঙ্গে একলাখি মাকবারা এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছে। মূলত মুসলিম শাসকরা এক শ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে বিভিন্ন উপায়ে এ পদ্ধতি অনুসরণ করে স্থাপত্য ইমারত নির্মাণ আভাস অব্যাহত রেখেছিল। তবে বাস্তব ব্যবহারের সময় নির্মাণ প্রক্রিয়ায় এর সম্প্রসারণ, পরিবর্তন ও বিস্তারের গতি প্রকৃতির তারতম্য অনুসারে আকারের বিভিন্নতা এসেছিল।

বলা বাহুল্য মুসলিম রাজত্ব শুরু হলে ইট স্থাপত্য নির্মাণ প্রকল্পে একটা বিশেষ স্থান দখল করে। শাসকদের মনোযোগের ফলে এটি একটা সর্বোৎকৃষ্ট উপকরণরূপে বাংলার স্থাপত্যে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। তবে এটিও লক্ষ করার মতো যে ভারতের আর কোথাও এত সুন্দর ইটের কাজ বাংলার ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য ছাড়া চর্চিত হয় নি। এ প্রসঙ্গে দাখিল দরওয়াজাই একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। এ স্থাপত্য কাঠামোর বিভিন্ন অংশ অবলোকনে প্রতীয়মান হয় যে যারা এর নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছিল তাদের অধিকাংশ স্থপতি ও কারিগর বংশগত অনুশীলন অভিজ্ঞতা ও দক্ষ হওয়ার ফলে বিশেষ কোনো অসুবিধার সম্মুখীন না হয়ে অত্যন্ত পারদর্শিতার সাথে চমৎকার শিল্পকর্মের কালজয়ী নিদর্শন সৃষ্টি করতে পেরেছিল।

এ শতাব্দীতেই নির্মিত আর একটি বিশেষ স্মৃতিসৌধ আলাদা অবস্থায় বিদ্যমান। এর কারণ অনুসন্ধানে উক্ত সৌধের ভিন্নতর অভিপ্রায় ও স্বতন্ত্রতা সূচক চরিত্রই দায়ী। এটি নির্মাণে উপকরণ হিসেবে ইটের ব্যবহারটাই বেশি হয়েছে। কাঠামোর অধিকাংশ নির্মাণ কাজ ইট দ্বারা সম্পাদিত। কেননা বাংলার প্রধান নির্মাণ উপকরণ হিসেবে বহু শতাব্দী ধরে ইট ব্যবহৃত হচ্ছে। এর প্রমাণস্বরূপ ময়নামতি, পাহাড়পুর, এমনকি মহাস্থানেও ইটের নির্মিত প্রাকার ও ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এ অঞ্চলে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহার, স্তূপা, চৈত্যগৃহ ইত্যাদি বিগত দিনের আদি নিদর্শন হিসেবে এখনো টিকে রয়েছে।

ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট :

একই স্থাপত্য রীতি ও পদ্ধতির অনুসরণ করে বাংলার রাজধানী হতে বেশ দূরে খুলনা জেলার বাগেরহাট শহরে উপকণ্ঠে নির্মিত হয়েছিল ষাট গম্বুজ মসজিদ। আয়তাকার এ মসজিদটির পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ৪৮.৮০ মি. (১৬০ ফুট) এবং প্রস্থে ৩৩ মি. (১০৮ ফুট)। মসজিদটির জুল্লাহ্ সাতটি দীর্ঘ খিলানায়িত আইল (aisles) এবং এগারটি 'বে'-তে (bay) বিভক্ত (ভূমি নকশা নং- ১২)। আড়াআড়িভাবে নির্মিত খিলানগুলোর সরু প্রস্তরস্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্তম্ভের দ্বারা সৃষ্ট বর্গাকার 'বে'-বর্গগুলো অর্ধ-বর্তুলাকার গম্বুজে পরিবৃত। কেন্দ্রীয় নেভ্‌টি প্রশস্ত এবং এটি সাতটি চৌচালা খিলান ছাদে আবৃত। গম্বুজ ও খিলান ছাদের নিম্নাংশে অবস্থানান্তর পর্যায়ে পান্দানতিফ্ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

মসজিদের অভ্যন্তরের প্রতিটি 'বে'-এর শেষ প্রান্তে কিবলা দেয়ালে একটি করে অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব রয়েছে; তবে কেন্দ্রীয় মিহরাবের ডান পার্শ্বের 'বে'-টির পশ্চিম প্রান্তে

ভূমি নকশা নং-১২ : ষাটগম্বুজ মসজিদ

একটি খিলানায়িত প্রবেশপথ বিদ্যমান। ধারণা করা হয় রাজপ্রতিনিধির মসজিদে গমনাগমনের জন্য এ পথ ব্যবহৃত হত। কেন্দ্রীয় নেভের শেষ প্রান্তের মিহরাবটি বিভিন্ন প্রকার নকশালঙ্কারে সজ্জিত।

এ মসজিদেব অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ফাসাদ বা সম্মুখ দেয়াল। এগাবটি খিলানপথেব সাহায্যে এটি সাহনের দিকে উন্মুক্ত। এর কেন্দ্রীয় খিলানপথটি অন্যান্য প্রবেশপথ অপেক্ষা বৃহৎ মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেযালেও সাতটি করে মোট চৌদ্দটি খিলানায়িত প্রবেশপথ রয়েছে। মসজিদেব চাব কোনায় চারটি গোলাকাব বুরুজ সংযোজিত। গোলাকৃতিব এ বুরুজগুলো ছত্রী বা কিউপোলাতে আচ্ছাদিত (চিত্র নং-২২)। কোনায ছত্রী পরিবেষ্টিত বুরুজ নির্মাণ চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লির মসজিদের কোনায় নির্মিত টাওয়াররূপী মিনাবেব কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। মসজিদের সম্মুখের বক্র কারনিস নির্মাণেও যথেষ্ট অভিনবত্ব রয়েছে। এটি বক্র না হয়ে সোজাসুজি ছাদের সম্মুখভাগে কারনিসের ত্রিকোনাকার গাঁথুনিসহ কেন্দ্রীয় নেভের মধ্যবিন্দুতে মিলিত হয়েছে; ফলে একটি ত্রিভুজাকৃতিব অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে ফাসাদ বা সম্মুখ দেয়ালের উভয় প্রান্তের বুরুজদ্বয়ের ভিতর দিয়ে বামাবর্ত সোপান শ্রেণী বয়েছে। কুতুব মিনারের আদলে নির্মিত এ সোপানের সাহায্যে মসজিদের ছাদে গমনাগমন করা যায়। উল্লেখ্য যে, এ মসজিদে কোনো মিনার নেই; তবে মনে করা হয় আদি মসজিদের ন্যায় এ মসজিদের ছাদ হতে আজান দেওয়া হত। সাম্প্রতিককালে মসজিদ এলাকায় উৎখননকার্য পরিচালনা করার ফলে উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্বদিকে যিয়াদার ন্যায় আবেষ্টনী প্রাকারের ধ্বংসাবশেষ উন্মোচিত হয়েছে। এ ধবনের আবেষ্টনী প্রাচীর আব্বাসীয় আমলের সামাররা ও আবু দুলাফ মসজিদে পরিদৃষ্ট হয়।

মসজিদটির কোনো শিলালিপি নেই। তবে এর স্থাপত্যিক গঠনশৈলী ও অলঙ্করণ পদ্ধতি দেখে মনে হয় এটি পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগের প্রথম অথবা দ্বিতীয় দশকে নির্মিত হয়েছিল এবং এর নির্মাণকার্যে অত্র অঞ্চলের রাজপ্রতিনিধি খান জাহান আলীর সক্রিয় ভূমিকা অনস্বীকার্য।

দাখিল দরওয়াজা :

মূলত এটি একটি বিজয় তোরণ বা সম্ভাষণ তোরণ দ্বার হিসেবে গৌড় দুর্গের উত্তর প্রাকারের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত। কথিত আছে যে বারবক শাহ সুলতানের (১৪৫৯-১৪৭৪ খ্রি.) আদেশে এটি নির্মিত হয়েছিল। খুব সম্ভব এটি ১৪৬৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়। এর পরিমিতি সম্মুখভাগে ২২.৪০ মি. (৭৩ ফুট ৪ ইঞ্চি) চওড়া, দৈর্ঘ্য ৩৪.৫০ মি. (১১৩ ফুট) এবং উচ্চতা ১৮.৩০ মি. (৬০ ফুট) (ভূমি নকশা নং-১৩)। এ.এইচ. দানি এর গঠন কাঠামো সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, "...from its corner project twelve sided tapering turrets, five stories in height and ordinarily crowned by a 'Firuzian' cupola".[৭] এর নকশা হতে প্রতীয়মান হয় যে এ দরজা কিরূপ বিশাল একটানা পিণ্ডত্ব নিয়ে দণ্ডায়মান। কিন্তু এর স্তূপাকার চেহারা অভিক্ষেপণ ও কুলঙ্গি দ্বারা বিদীর্ণ করা হয়েছে। এটি কোনাকুনি ও বৃত্তাকারে স্থাপিত। সম্মুখের দুটি তোরণ একে অপরের সাথে খিলানপথ দ্বারা সংযুক্ত হয়েছে। এর ফলে গভীর প্রশস্ত স্তম্ভায়িত বারান্দা খিলানায়িত দরজার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। একদা এর উপরে যে পিরামিড আকারেব ছাদ যুক্ত ছিল তার সাথে গম্বুজ ও উপগম্বুজ এক অনন্যসাধারণ দৃশ্যপট সৃষ্টি করেছিল। সম্মুখ দেয়ালপৃষ্ঠের পর্যায়ানুবৃত্তির মধ্য দিয়ে চূড়া ও বুরুজের আলো-ছায়ার আকর্ষণীয় সংঘাত সৃষ্টি করত।
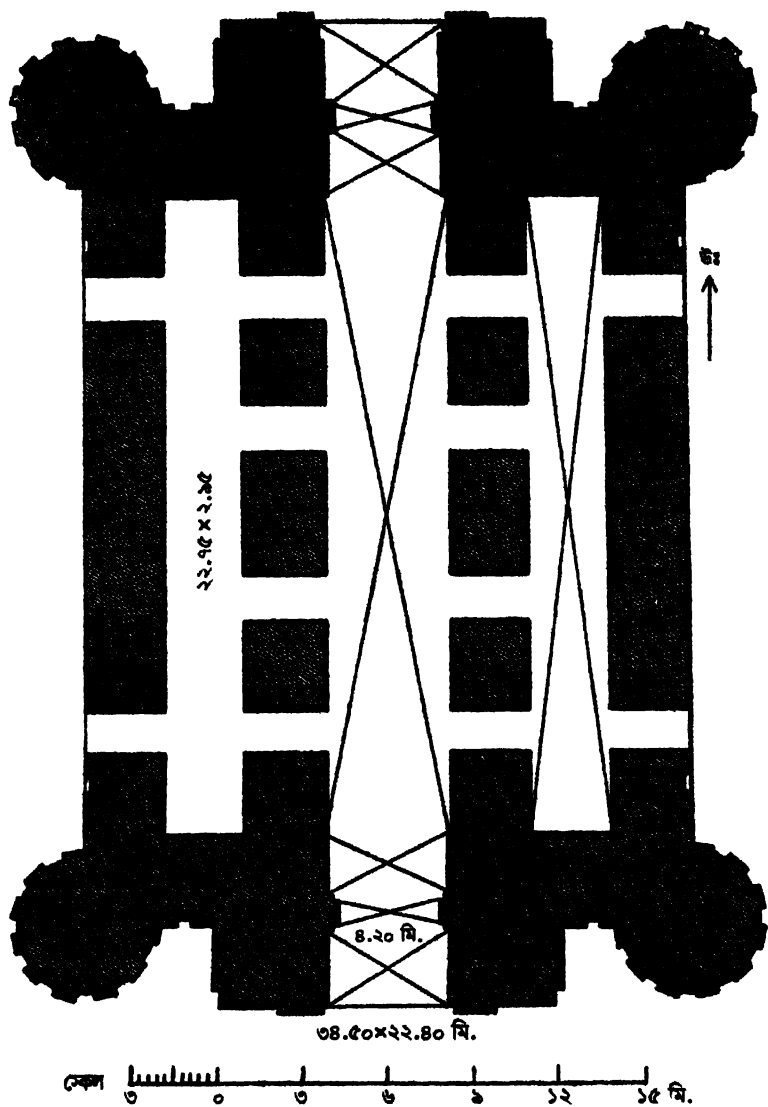
ভূমি নকশা নং-১৩ দাখিল দরওয়াজা

দেয়াল ও চূড়া ছাঁচে ঢালা নকশালঙ্কার টেরাকোটা বা পোড়ামাটির নকশা, ঝুলন্ত সূর্য এবং অন্যান্য অলঙ্করণ যেমন রোজেট বা গোলাপ, ঝুলন্ত প্রদীপ, ছোট ছোট ঢেউ তোলা তরঙ্গ সীমানা নকশা, নকশায়িত কুলঙ্গি ও জটিল খোপ খোপ নকশা, হিন্দু যুগের শিকলঘণ্টা, গোলা নিক্ষেপক ছিদ্র ইত্যাদি সমাবেশিত হয়ে এতে এক অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। দাখিল দরজার নকশা পরিকল্পনার সনাতনী ও রোমান সংস্কৃতির এক আকর্ষণীয়

সমাহার সুন্দরভাবে সমন্বিত হতে পেরেছিল। অন্যপক্ষে এতে দেশীয় বা গ্রাম্য পদ্ধতির নকশালঙ্করণ অত্যন্ত সফলতার সাথে প্রয়োগ করা হয়েছে (চিত্র নং-২৩)।

প্রাচীন আদর্শরূপে গৃহীত বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ হচ্ছে এর বিরাট আকারত্ব, জাঁকালো প্রবেশপথ বা তোরণ দরজা এবং অট্টালিকার সামনের খিলানায়িত স্তম্ভশ্রেণী অংশের সুষমতা ও রোমান্টিক গুণাবলী এর বুরুজের ঢালু অবস্থানের সৌষ্ঠবময়তার মাঝে খুঁজে পাওয়া যায়। অন্যপক্ষে দেশীয় নজিরের প্রভাব পৃষ্ঠদেশে ব্যবহৃত সৌন্দর্য সৃষ্টিকারক পদ্ধতির সফল প্রয়োগে; সোজা খাড়া রেখা এবং ঢালাইয়ের কাজ, যাতে আয়তাকার নমুনায় (প্যাটার্নের) প্রাথমিক অবস্থার সূচনা প্রদর্শিত হয়েছে।

যদিও পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার এক শ বছর পর গৌড়ের এ বিজয় তোরণ নির্মিত হয়েছিল তথাপি এর মধ্য দিয়ে এটিই প্রমাণিত হয়েছে যে তখনো মুসলিম শাসকরা বিরাট বিরাট চমৎকার স্থাপত্যকীর্তি নির্মাণের ক্ষমতা ও মর্যাদা হতে নিজেদের দূরে সরিয়ে না নিয়ে অব্যাহতই রেখেছিল। পরবর্তী ৭৫ বছর ধরে দাখিল দরওয়াজার নির্মাণ আদর্শ অনুসরণ করে এবং একই স্থাপত্য পদ্ধতিতে মসজিদ ও মাকবারা নির্মিত হয়েছিল। এসব মসজিদ স্থাপত্যকর্মে যে ধারাটি অনুসরণ করা হয়েছিল এটিই বাংলার মসজিদ নির্মাণের চূড়ান্ত স্বীকৃত নকশারূপে গৃহীত হয়েছিল।

সাধারণত আদি আদর্শ নকশা অনুসারে মসজিদের নামাজঘরের সম্মুখে প্রাঙ্গণ বা সাহন জুড়ে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ মসজিদ নির্মিত হয়। কিন্তু বাংলায় এ রীতি পরিত্যাজ্য হয়ে মসজিদ নির্মাণ কৌশলে সাহন অংশটুকু পর্যন্ত মূল মসজিদের সাথে আবৃত বা ঢেকে দেয়া হয়। অবশ্য সাহন অংশটুকু ঢেকে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছিল। কেননা বাংলার জলবায়ু ও আবহাওয়াগত কারণেই এ প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হয়েছিল। বর্ষার দিনে মুসল্লিদের সুবিধার জন্য মসজিদের সম্পূর্ণ অংশই ঢেকে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।

এ সমস্ত মসজিদ নকশা আয়তাকার অর্থাৎ প্রস্থের চেয়ে দৈর্ঘ্য অধিকতর। এ মসজিদের বাইরের সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদ দীর্ঘ এবং ঠিক মাঝখান হতে উভয় দিকে ধীরে ধীরে বাঁকা হয়ে গিয়েছে। অবশেষে বক্র কারনিস রচনা করেছে। বক্র কারনিসের নিচ দিয়ে সূচ্যগ্র খিলানপথ রচিত হয়েছে। অনেক সময় সম্মুখ দিয়ে বেজোড় সংখ্যক দরজা এবং পার্শ্ব বা প্রস্থের দিক দিয়ে দুতিনটি দরজা নির্মিত হয়েছে।

প্রতি কোনায় বুরুজ সংযোজিত যা সাধারণত অষ্টভুজাকারে নির্মিত। এটি নানা জাতীয় লতাপাতার কারুকার্য বা পঙ্কের কাজের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছে। এ মোটিফ বা নকশালঙ্কার প্রতীক দিল্লির ফিরোজীয় যুগে ব্যবহার করা হত। দেয়ালগুলোর আয়তাকার খোপ খোপ এবং কখনো কখনো অলঙ্কৃত কুলঙ্গি সংযুক্ত হত। এ ছাড়া স্বর্ণ বা রৌপ্যের ঝালরের কারুকার্য খোদিত করে দরজার চারপাশে এবং খিলানের ত্রিকোনাকার ভূমিতে বিভিন্ন রঙের ছোপ দেওয়া দামি ধরনের বিন্যাস দৃষ্ট হয়। মোটের ওপর এ সময়ে স্থাপত্যকর্মে ইসলামের পরিপন্থী নয় এরূপ সজ্জায়ন সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য সব সময় ব্যবহার করা হত।

অভ্যন্তরে সূচ্যগ্র খিলানশ্রেণী নির্মাণের মধ্য দিয়ে কয়েকটি খিলানপথে বিভক্ত হত। বলা বাহুল্য খিলানের ভার বর্গাকার ইটের থাম বা প্রস্তর নির্মিত স্তম্ভ বহন করত। স্তম্ভগুলো প্রায়ই হিন্দু ইমারত হতে সংগৃহীত হত। এ খিলানপথ (aisles) মসজিদের লম্বভাবে অবস্থানের ফলে গথিক্ চার্চের নেভের মতোই দেখা যেত। এসব খিলানশ্রেণী যখন আড়াআড়িভাবে পরস্পরকে ছেদ করে তখন এগুলো বর্গাকার 'বে' গঠন করে এবং এদের প্রত্যেকটির শীর্ষে গোলার্ধ গম্বুজে পরিবৃত হত। এ অবস্থায় গম্বুজের বৃত্তাকার ভূমির ভার

কোনায় ইট দ্বারা নির্মিত পান্দানতিফ (pendentive) বহন করে। এটি প্রকৃতপক্ষে ঝুলন্ত ঢেউ ছাদের মতো নির্মিত বৈশিষ্ট্যের সবলীকরণ রূপ বা আকার। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের ভিতর পৃষ্ঠের সারিবদ্ধ খিলানায়িত মিহরাব দেয়ালগাত্র হতে গভীরে নির্মিত হয়েছে। এদের সর্ববৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ মিহরাবটি কেন্দ্রীয় 'বে'-এর বিপরীতে অবস্থিত। মিহরাবগুলো খোদাইকৃত নকশা দ্বারা নিপুণ ও নিখুঁতভাবে অলঙ্কৃত করা হত।

মাহীসন্তোষ মসজিদ, নওগাঁ :

বর্তমান নওগাঁ জেলার ধামুরহাট থানার অন্তর্গত আলমপুর ইউনিয়নের চৌবাট মৌজায় মাহীসন্তোষ নামক স্থানে এ মসজিদটি অবস্থিত। ধামুরহাট থানা সদর থেকে প্রায় ৯ কি মি উত্তর-পশ্চিমে এর অবস্থান। এ মসজিদটি সুলতান বারবক শাহের শাসনামলে নির্মিত হয়েছিল বলে প্রাপ্ত শিলালিপি হতে জানা যায়। বর্তমানে মসজিদটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে এর সামগ্রিক অবকাঠামো বিনির্মাণ অত্যন্ত দুরূহ। তথাপিও বিদ্যমান প্রত্ননিদর্শন থেকে এর ভূমি নকশা ও গঠনশৈলীর রূপরেখা নির্মাণ সম্ভব।

আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২৪ মি ও প্রস্থে ১৬ ২০ মি। মসজিদটি ইষ্টক নির্মিত হলেও এর আন্তঃ ও বহির্গাত্র সুখণ্ড প্রস্তর দ্বারা পরিবৃত ছিল যেমনটি লক্ষ করা যায় ছোট সোনা ও কুসুম্বা মসজিদে। মসজিদের পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি প্রবেশপথ রয়েছে যার মধ্যবর্তীটি পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা সামান্য বড। অনুরূপভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও তিনটি করে মোট ছয়টি প্রবেশপথ বিদ্যমান (ভূমি নকশা নং-১৪)।
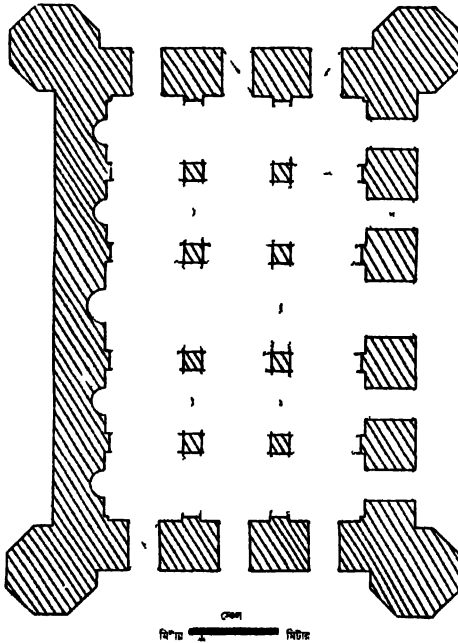
ভূমি নকশা নং-১৪ মাহীসন্তোষ মসজিদ

মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগ দুসারি প্রস্তরস্তম্ভ দ্বারা তিনটি সমান্তরাল আইলে ও পাঁচটি 'বে'-তে বিভক্ত। এর কেন্দ্রীয় 'বে'-টি পার্শ্ববর্তী 'বে'-গুলো অপেক্ষা সামান্য বড়।[৮] মসজিদের অভ্যন্তরভাগে দুসারিতে অবস্থিত আটটি প্রস্তরস্তম্ভ তিনটি করে স্তরে (section) বিভক্ত যার নিম্নাংশ বর্গাকার, মধ্যাংশ দ্বাদশ ভুজাকার এবং উর্ধ্বাংশ ষোড়শ ভুজাকৃতির এবং প্রতিটি অংশ শিকল-ঘণ্টা নকশায় অলঙ্কৃত। নামাজ গৃহের কেন্দ্রীয় 'বে'-বর্গগুলো চৌচালা ছাদে আবৃত ছিল যেমনটি দেখা যায় গৌড়ের দরসবাড়ী মসজিদ, ছোটসোনা মসজিদ, মহাস্থানগড় মসজিদ ও বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদে। তা ছাড়া অন্যান্য 'বে'-বর্গগুলো চাড়ি সদৃশ গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল সংলগ্ন খুঁটি ও অভ্যন্তরীণ আটটি স্তম্ভের উপর নির্মিত আড়াআড়ি খিলানের উপর গম্বুজগুলো প্রতিষ্ঠিত ছিল। গম্বুজের নিম্নাংশের ফাঁকা স্থানগুলো সারিবদ্ধ অথবা কৌণিকভাবে সজ্জিত ইটে রচিত বাংলা পান্দানতিফ্ পদ্ধতিতে ছিল ভরাটকৃত।

মসজিদ স্থাপত্যেও প্রচলিত রীতি অনুসারে পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে পাঁচটি অবতল মিহরাব সন্নিবেশিত এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবটি সামগ্রিকভাবে শিকল-ঘণ্টা, পদ্মফুল ও তালগাছের নকশায় বিশেষভাবে অলঙ্কৃত (চিত্র নং-২৪)। বর্তমানে মিহরাবটি রাজশাহী বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। এস. আহমদ এ মসজিদের অলঙ্করণ সম্পর্কে বলেন, "...the exterior surface of the wall of the mosque was frofusely decorated and the inner face was not completely faced with stone carving. It is also noted here that the chain and bell motif, a similar decorative device of Bengal seen in the mosque like Darasbari, Chhotasona, Kusumba and Nine-Domed mosque".[৯] এ মসজিদের অলঙ্করণ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, "Some ornamented terracotta bricks were also exposed at the time of removing debris. These terracotta bricks contained floral motifs, diaper works and geometric pattern in various designs".[১০] মসজিদের চারকোনায় চারটি অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ ছিল এবং এর কারনিস সমসাময়িককালে নির্মিত মসজিদগুলোর ন্যায় সম্ভবত বক্রাকার ছিল।

ভূমি নকশা পর্যবেক্ষণে দেখা যায় মাহীসন্তোষ মসজিদটি গৌড়ের দরসবাড়ী ও ছোটসোনা মসজিদের ভূমি নকশারই অনুরূপ। বিশেষ করে নামাজগৃহের অভ্যন্তরীণ 'আইল' ও 'বে'-এর বিন্যাস, মিহরাব, স্তম্ভ, প্রবেশপথ, কোনা বুরুজ প্রভৃতি ছোটসোনা মসজিদের সঙ্গে তুলনীয়। আর নামাজগৃহের আচ্ছাদিতকরণ রীতি যেমন- কেন্দ্রীয় নেভ্ চৌচালা ছাদে এবং পার্শ্ববর্তী 'বে'-বর্গগুলো গম্বুজ দ্বারা আবৃতকরণ রীতি বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ।

নির্মাণকাল :

মাহীসন্তোষ থেকে দিনাজপুরের ম্যাজিস্ট্রেট মি. ওয়েস্টম্যাকট দুটি শিলালিপি আলগা অবস্থায় উদ্ধার করেছিলেন। এ শিলালিপিগুলো মাই-সন্তোষ নামক এক সাধুর মাজারে রক্ষিত ছিল। এ দুটোর মধ্যে একটিতে সুলতান বারবক শাহের আমলে ৮৭৬ হি. মোতাবেক ১৪৭১-৭২ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণের বিষয় উল্লেখ রয়েছে; অন্যটিতে উক্ত সুলতানের সময়ই ৮৬৫ হি. মোতাবেক ১৪৬০-৬১ খ্রিস্টাব্দে একটি মসজিদ নির্মাণ তারিখ মুদ্রিত।[১১] এ শিলালিপিগুলো ভূপৃষ্ঠ সংগ্রহ (surface collection) হিসেবে এ মসজিদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়।

১৯১৬ সালে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটি কর্তৃক কথিত জামি মসজিদ টিপিতে খননকার্য পরিচালনার সময় একটি শিলালিপি অনাবৃত হয়। এ শিলালিপির ভাষ্যানুযায়ী এ মসজিদটি আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনামলে ৯১২ হি. মোতাবেক ১৫০৬ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।[১২] এ শিলালিপিটি মসজিদের উত্তর পশ্চিমাংশের একটি মিহরাবের নিকটবর্তী স্থান থেকে অবমুক্ত হয়েছিল।

১৯৯৪ সালে স্থানীয় জনসাধারণ উক্ত মসজিদ টিপির প্রত্নজঞ্জাল পরিষ্কার করত একটি চৌচালা টিনের ঘর নির্মাণ করে এবং এটি মসজিদ-কাম-মাদ্রাসারূপে ব্যবহৃত হতে থাকে। প্রত্নজঞ্জাল পরিষ্কারের সময় কেন্দ্রীয় মিহরাবের অব্যবহিত পূর্বদিক থেকে একটি কৃষ্ণ প্রস্তরের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়। নাসখ পদ্ধতিতে লিখিত এ শিলালিপির ভাষ্যানুযায়ী সুলতান রুকন-উদ্দীন বারবক শাহের শাসনামলে জনৈক উলুগ খান হাসান কর্তৃক ৮৬৭ হি. মোতাবেক ১৪৬৩ খ্রিস্টাব্দে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল।[১৩] যেহেতু এ শিলালিপিটি কেন্দ্রীয় মিহরাবের অতি সন্নিকট থেকে অবমুক্ত হয়েছে সেহেতু মসজিদের তারিখ নির্ণয়ে এর প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অপরিসীম।

তাঁতিপাড়া মসজিদ :

তৃতীয়পর্বে নির্মিত মসজিদগুলোর মধ্যে গৌড়ের তাঁতিপাড়া মসজিদ অন্যতম। এটি ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। মোটামুটিভাবে এ মসজিদে যে পদ্ধতির ব্যবহার ও কর্মসম্পাদনের দক্ষতা দেখা গিয়েছে তা বিবেচনা করলে তুলনামূলকভাবে বলতে হয় যে প্রয়োগবিধিতে দাখিল দরওয়াজার চেয়ে পরিপক্বতা লাভ করেছিল এবং মানের দিক হতেও উৎকৃষ্টতার ছাপ বিদ্যমান। এটি বাইরের দিক দিয়ে ২৭.৮০ মি. (৯১ ফুট) দৈর্ঘ্য ও ১৩.৪৫ মি. (৪৪ ফুট) প্রস্থ অর্থাৎ আয়তাকার। এর দেয়ালের পুরুত্ব ২ মি. (৬ ফুট ৫ ইঞ্চি)। ইমারতের কিনারা চিরাচরিত বক্র কারনিস ধারণ করে রয়েছে। সম্মুখ বা ফাসাদ দেয়ালে পাঁচটি খিলানায়িত দরজা ছাড়াও উভয় পার্শ্বে দুটি করে দরজা রয়েছে। দেয়ালগাত্র প্রচলিত নকশালঙ্কারে সজ্জিত। এ ইমারতে বিভিন্ন উপাঙ্গ অলঙ্করণে যে শৈল্পিক অসমতা লক্ষ করা যায় তা দে'য়ালপৃষ্ঠ সজ্জায়নের মধ্য দিয়ে দূরীভূত হয়েছে। এ সজ্জায়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিষয় যেমন খিলানের উভয় পার্শ্বস্থ এলাকায় খোপ খোপ আকারে নকশা এবং খিলানের সারা অঙ্গ নারীসুলভ কমনীয়তাপূর্ণ ফুল জাতীয় নমুনায় রিলিফ প্রণালীতে উপরিতলা হতে অভিক্ষিপ্তভাবে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির নকশা ব্যবহৃত হয়েছে। হয়তো সে কারণেই মি. কানিংহাম[১৪] কালের করস্পর্শে পতিত ছাদহীন ও বিনষ্ট দেয়াল দেখেও মসজিদ সম্পর্কে বলেছেন যে এটি গৌড়ের সবচেয়ে সুন্দর কীর্তি; এর অনবদ্য ও অভিনব দেয়াল কারুকার্য ও নকশালঙ্কারে বাংলার স্থাপত্য সাধনার চরম শিখরে উন্নীত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করছে। অন্যপক্ষে তিনি আরো মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে, দাখিল দরওয়াজা বীর্যতার প্রতীক, আর তাঁতিপাড়া মসজিদ কোমল মেয়েলি ভাবাপন্ন অঙ্গের স্বরূপ। প্রথমটি স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত আর দ্বিতীয়টি শিষ্টাচারদুরস্ত ও বাহ্যিক আড়ম্বরপ্রিয়তার লক্ষণযুক্ত স্থাপত্যকর্ম।[১৫] পি. ব্রাউন বলেছেন, 'আরো অন্যান্য প্রকারের ঢালাই নকশায় খিলানায়িত দরজাগুলো ভরপুর করা হয়েছে। এ মাত্রাতিরিক্তভাবে অলঙ্করণ বা সজ্জায়ন ভুল হতে পারে, তবে এটি অশোভন বা দেখতে অসুন্দর মনে হয় না'।[১৬]

এর অভ্যন্তরের সুন্দর মিলনায়তনটি ২৩.৮০ মি. (৭৮ ফুট) দৈর্ঘ্য ও ৯.৫০ মি. (৩১ ফুট) প্রস্থ ছিল। এটি দুখিলানপথে বা আইল-এ বিভক্ত ছিল এবং স্তম্ভগুলো প্রস্তর নির্মিত।
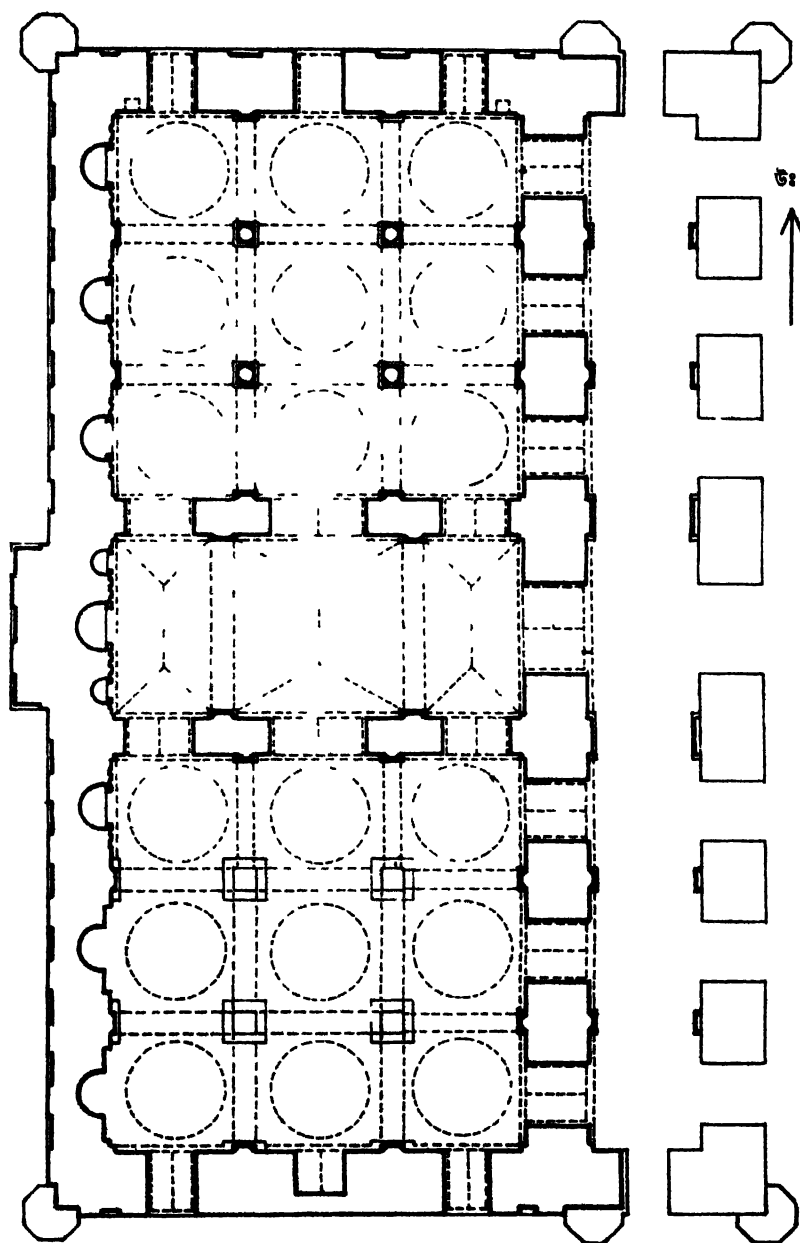
ভূমি নকশা নং-১৫ : দব্‌সবাড়ী মসজিদ

এর মধ্যে বর্গাকার ও গোল করে কর্তিত বা খাঁজকাটা থাম বা স্তম্ভগুলো আদিতে কোনো হিন্দু মন্দিরের অংশবিশেষ ছিল। জুল্লাহর মিহরাবগুলো ও অন্য অংশগুলোর অলঙ্করণ বাইরের অংশের মতোই একই কৌশলে এবং একই রীতি অনুসরণ করে সম্পাদিত হয়েছে।

দরসবাড়ী মসজিদ :

দরসবাড়ী মসজিদ ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান ইউছুফ শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এর নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইট ও পাথর উভয়ই ব্যবহৃত হয়েছে।

আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত মসজিদটির অভ্যন্তরীণ পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ৩০.৩৫ মি. (৯৯ ফুট ৫ ইঞ্চি) এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১১.৯০ মি. (৩৮ ফুট ৯ ইঞ্চি)। প্রধান নামাজঘরের সম্মুখে ৩.৩০ মি. (১০ ফুট ৭ ইঞ্চি) প্রশস্ততা বিশিষ্ট একটি বারান্দা রয়েছে (ভূমি নকশা নং- ১৫)। মসজিদটি মূলত ইট দ্বারা নির্মিত হলেও সংশ্লিষ্ট স্তম্ভসহ জুল্লাহর স্তম্ভগুলো প্রস্তর নির্মিত। নামাজঘরটি দুসারি প্রস্তর স্তম্ভের সাহায্যে তিন আইলে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় নেভটির উভয়পার্শ্বে তিনটি করে 'বে'-তে বিভক্ত এবং উভয় অংশ ৯টি করে মোট ১৮টি গম্বুজে পরিবৃত। এর কেন্দ্রীয় নেভটি চৌচালা খিলান ছাদের সাহায্যে আচ্ছাদিত ছিল। কিন্তু নির্মাণ ত্রুটির জন্য এটি ভেঙে বা ধ্বসে পড়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে প্রতিটি 'বে'-এর বিপরীতে রয়েছে একটি করে মিহরাব যেগুলো টেরাকোটা অলঙ্করণে ছিল সুসজ্জিত।

এ মসজিদের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিবলা দেয়ালের বহির্গাত্রের ঊর্ধ্বাংশে কারনিসের নিম্নে বায়ু-দোলায়িত পতাকা নকশা। টেরাকোটা ফলকে রচিত এ আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য বাংলার স্থাপত্যে বিরল। তা ছাড়া বৃক্ষপত্র নকশালঙ্কার বিশেষভাবে লক্ষণীয় যা অতি মনোযোগের সাথে নিপুণ হাতে নিষ্পন্ন করা হয়েছে (চিত্র নং-২৫)। অনুরূপ চমৎকার শিল্পকর্মের উদাহরণ আহমদাবাদের সিদি সৈয়দের মসজিদে দৃষ্ট হয়। এ নকশা কারুকার্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে "তালগাছ পরভোজী নকশালঙ্কার মোটিভ" (the palm and parasite motif)। এতে কতকটা এরূপ দেখানো হয়েছে যে, তালগাছের গুঁড়ির ফাটল ছিড়ে পরভোজী লতা দেয়ালের ফাঁকা জায়গার উপর দিয়ে বিস্তারিতভাবে উপরের দিকে অগ্রসরমান এবং পরিশেষে বড় বৃক্ষের সাথে লতাপত্রের আলিঙ্গনাবদ্ধ হওয়ার দৃশ্য অতি সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত যা শিল্প মানের বিকাশের কথাই প্রমাণ করছে। বলা বাহুল্য এ দুটি চিত্রকর্মের শিল্পীর মাঝে আদৌ কি কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠার সম্ভাবনা ছিল? শিল্প হিসেবে একটি আর একটির অতি নিকটবর্তী ছিল। কিন্তু এ দুটি ইমারতের একটি হতে আর একটির দূরত্ব ছিল অনেক বেশি। তবে এটি দূর কল্পনামূলক বিষয় বা অনুমানের বিষয়বস্তু মাত্র।

গুণমাত মসজিদ :

গৌড়ের আর একটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ হচ্ছে গুণমাত মসজিদ। এ মসজিদে বিশেষ কতকগুলো শিল্প আদর্শের জন্ম লাভ করেছে যা ইতঃপূর্বে আর কোনো মসজিদে দেখা যায় না। বাংলায় তৎকালে উৎকৃষ্ট মানের টালি পাওয়া যেত না এবং রঙিন টালি মসজিদে ব্যবহার সাধারণ ব্যাপার ছিল না; বরং ফ্যাশন হিসেবে এটি বিলাস সামগ্রী রূপে প্রাচুর্যবান ব্যক্তিবর্গ মসজিদের জন্য সংগ্রহ করত এবং এ মসজিদে চকচকে টালির যথার্থ প্রয়োগ লক্ষ করা যায়।

এখানে বিচিত্র রঙের ব্যবহার, পাথরের উপর রিলিফ প্রণালীর কারুকার্য এবং আস্তর দ্বারা দেয়াল ঢাকার সময় এতে নকশালঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে। জুল্লাহ কক্ষের অভ্যন্তরে

প্রধানত উপরিতলা হতে অভিক্ষিপ্ত ভাবে অর্থাৎ উঁচু করে নির্মিত নকশালঙ্কার বা অনুরূপ কারুশিল্প ও আস্তর দ্বারা শোভিত করে তার সাথে উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ অংশে রঙিন টালি বসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ মসজিদের ভূমি নকশা বা প্রকল্প নকশা আদিনা মসজিদের মতো ছিল না। এবাদতখানার কেন্দ্রীয় অংশ বা নেভ্ খিলান ছাদে আবৃত ছিল । এটি দৈর্ঘ্যে ১৫.৬০ মি. (৫১ ফুট) × প্রস্থে ৫.২০ মি. (১৭ ফুট) হলেও ডান ও বামের দিকে খিলানশ্রেণী শোভিত ও গম্বুজ পরিবৃত সম্প্রসারিত বাহু ছিল। প্রত্যেক বাহুর মধ্যে ১২টি 'বে'-এর সৃষ্টি করেছে। প্রকারান্তরে বহু গম্বুজের সমাহারে এর ছাদটি পরিবৃত হয়েছে। এর সম্প্রসারিত বাহু দুটি স্থাপত্যিক দৃষ্টিতে তেমন আকর্ষণীয় না হলেও এর কেন্দ্রীয় এবাদতখানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এটি প্রস্তর দ্বারা অভিনবভাবে নির্মিত হয়েছিল।

কারুকার্যখচিত রিলিফ প্রণালীতে রচিত কাজগুলো খিলানকৃত ছাদের তলদেশে আটকিয়ে নতুন সুষমা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল। বাংলা স্থাপত্যের এ নতুন কারুকার্য নিশ্চিতভাবে একটা নতুন স্থাপত্যশিল্প কৌশলের দ্বারোদঘাটন এখানেই ঘটেছিল। আদিনা মসজিদে নকশালঙ্কার পদ্ধতি হিসেবে রিলিফ প্রণালীর মাধ্যমে সৃষ্ট কারুকার্য প্রয়োগের ফলে যে ধারার সূচনা হয়েছিল তা পরিপূর্ণরূপে এ মসজিদে বিকশিত হতে দেখা যায় প্রাথমিক পর্যায়ে হিন্দু ইমারত হতে সংগৃহীত প্রস্তর দ্বারা বাংলার মুসলিম স্থাপত্য মসজিদ ও মাকবারা নির্মাণ কবা হত। পরবর্তীকালে প্রস্তরের অভাবে মূল ইমারত ইট দ্বাবা নির্মাণ করে বিশেষ অংশগুলো কেবল পাথর দ্বারা মোড়াই করা হত এবং থাম বা স্তম্ভগুলোতে পাথব ব্যবহৃত হয়। পাথর কেবল ফ্যাশনের উপকরণ হিসেবে এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে। বাংলার সমতল ভূমিতে পাথর অত্যন্ত মহার্ঘ বস্তু এবং এটি সূদুর বালেশ্বর ও রাজমহল পাহাড় হতে সংগৃহীত হয়ে নদীপথে গৌড়ে চলে আসত।

গুণমাত মসজিদে যে রিলিফ পদ্ধতির শিল্পকর্ম দেখা যায় তার অনুপ্রেরণা আদিনা মসজিদ হতে এসেছিল। এটি পুরোনো পদ্ধতির কাজ হতে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে বিকশিত হয়ে উঠেছিল। গুণগতমান বিচারে খোদাই কাজগুলোও শ্রেষ্ঠতম ছিল। গত পাঁচ শ বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যে হিন্দু কৃষ্টির শিষ্টাচার প্রসূত চিত্রণ নিপুণতায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে মন্দির গাত্রে মুদ্রিত হয়ে রয়েছিল তাকে অবলম্বন করে মুসলিম যুগে নানা আঙ্গিক ও ভঙ্গিমায় প্রস্তর খোদাই কাজের সম্প্রসারণ ও পরিবর্ধন ঘটেছিল। অবশ্য কানিংহাম মসজিদের অলঙ্করণ কাজে টালি ব্যবহারের কথা বলেছেন।[১৭] এটি অবশ্য মোটেই হুবহু অনুকরণ ছিল না বরং এটি ছিল অধ্যবসায়ীর সতর্ক অনুশীলন ও উন্নত দৃষ্টিভঙ্গির ছাপযুক্ত নবরূপায়ণ। আর ভাস্কর্যের স্থান অধিকার করে রয়েছে টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলক যা যুগযুগান্তর ধরে নিপুণ শিল্পীর হস্ত কোমল মৃত্তিকার গাত্রে মুদ্রিত করেছে বাঙালি জীবন মানসের চিরায়িত রূপ।

ফিরোজ মিনার :

বাংলার স্থাপত্যে কিছুটা ব্যতিক্রম অথচ একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকীর্তি হল গৌড়ের ফিরোজ মিনার। ফারগুসনের মতে, "শিলালিপির পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে মিনারটি গৌড়ের সুলতান দ্বিতীয় সাইফুদ্দীন ফিরোজ শাহের সময় (১৪৮৭-৮৯ খ্রি.) নির্মিত হয়েছিল"।[১৮] রিয়াজ-উস-সালাতিন গ্রন্থের বর্ণনানুসারে জানা যায় যে গৌড়ের ফিরোজ মিনার ক্ষণস্থায়ী হাবশী বংশের (১৪৮৭-৯৩ খ্রি.) রাজত্বকালে ১৪৮৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়েছিল।

সম্ভবত এটি বিজয়স্তম্ভ ও মসজিদের আজান দেয়ার জন্য মিনার হিসেবে নির্মিত হয়েছিল।[১৯] অবশ্য এর নিকটে কোনো মসজিদের চিহ্ন আজ আর টিকে নেই।

দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের মিনার হিসেবে যেমন কুতুব মিনারের সংযোজন ঘটেছিল অনুরূপ উদ্দেশ্যেই হয়তোবা ফিরোজ মিনারও নির্মিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে এ.এইচ.দানি বলেন, "It (Firoz Minar) is the Bengal version of the Qutb Minar."[২০] তবে এটি কুতুব মিনারের চেয়ে অনেক ছোট আকারের। এটি একটি উচ্চ পাকা ভিত্তির উপর নির্মিত এবং পাঁচ তলাবিশিষ্ট। এর উচ্চতা ২৫.৬৫ মি. (৮৪ ফুট)। নিম্নেব তিনটি তলা একই মাপের ও সমান দ্বাদশ ভুজাকৃতির (doudecagonal)। পরবর্তী উপরের দুতলা গোলাকার এবং একই মাপের; শীর্ষে একটি ফিরোজীয় পদ্ধতির গম্বুজ নির্মিত ছিল যা অনেক আগেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে।

এ মিনারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সজ্জায়ন ও অলঙ্করণ। বহির্গাত্রের একতলা হতে অন্য তলার সীমানা নির্দেশক হিসেবে নকশালঙ্কার রেখা অঙ্কিত হয়েছে। তলাগুলো দেখতে একই রকম বলে সীমানা নির্দেশক নকশালঙ্কার ব্যবহার করা হয়েছে। তিন তলা শেষ হওয়ার সীমানায় ঝুলন্ত বারান্দা বা ব্যালকনি সংযোজিত রয়েছে। সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ খিলানাকৃত গম্বুজ ছাদে আবৃত। এর অভ্যন্তর দিয়ে উপরে ওঠার জন্য পেঁচানো সোপানের ব্যবস্থা রয়েছে। দেয়ালগাত্র গাঁথুনির ইট ও পোড়ামাটির ফলক দ্বারা সজ্জিত কবা হয়েছে। তা ছাড়া সবুজ, নীল ও সাদা রঙের বিচিত্র ঢঙের নকশাকাটা চকচকে টালি ব্যবহারের মাধ্যমে একে আরো সুশোভিত করা হয়েছে (চিত্র নং- ২৬)।

অবশ্য এ জাতীয় রঙের বিচিত্র ব্যবহার ইতঃপূর্বে তাঁতিপাড়া মসজিদ ও লট্টন মসজিদের সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদে দেখা গিয়েছে। পি. ব্রাউন মত পোষণ করেছেন যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশকে দিল্লি হতে এ পদ্ধতির বিকাশ বাংলার স্থাপত্যে চালু হয়েছিল।[২১] অধিকাংশ চকচকে টালি অত্যন্ত কাঁচা হাতের অসাবধানতায় সম্পাদিত কাজের সাক্ষ্য বহন করছে এবং নীরস রঙকরণ পরিস্থিতি এটিই প্রমাণ করে যে কদাপি দক্ষতা সহকারে গড়ার চেষ্টা নেয়া হয় নি। অন্যপক্ষে এর অনুজ্জ্বল লাল রঙের কাজ ইটের কাজের সাথে বৈসাদৃশ্য প্রদর্শন করছে। টেরাকোটা বা পোড়ামাটির ফলক অলঙ্করণ কাজ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়েছে। পোড়ামাটির ফলকে যে অলঙ্করণগুলো মূর্ত হয়ে উঠেছে তা বাংলার অতি প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিল্পরীতির স্পষ্ট প্রয়োগ বলে মনে হয়। উদ্গত প্রণালী বা রিলিফ নকশা সজ্জায়নে চলতি ছাঁচে ঢালাই নকশার পরিবর্তে মৃত্তিকার উপর কাঁচা অবস্থায় নিপুণ হস্তে বিভিন্ন ধরণের নকশা অঙ্কন করা হয় এবং এটি রোদে শুকিয়ে অথবা আগুনে সেঁকে ফলক প্রস্তুত করা হত। এ সমস্ত কাজের পদ্ধতি ও নির্মাণ কৌশল পরীক্ষা করে বলা যায় যে এগুলো দেশীয় বা গ্রাম্য শিল্পকলা। হিন্দু যুগের পবিত্র প্রতীক, অতি প্রাচীন শিল্প-উপাদান, উপকাহিনী এবং প্রাচীনকালের দেবতাদের কাহিনীমূলক ঘটনার চিত্রাদি অঙ্কিত হয়েছে।

মুসলমান শাসনকর্তাদের অধীনে স্থানীয় হিন্দু কারিগরগণ ঐ সমস্ত পুরোনো বিষয়বস্তুকে নতুন আঙ্গিকে রূপায়িত করেছিল। একেই তারা বিমূর্ত ও নির্বস্তুক অবয়বে নতুন শিল্প উপাদান সৃষ্টি করেছিল। একেই তারা বিমূর্ত ও নিবস্তুক অবয়বে নতুন শিল্প উপাদান সৃষ্টি করেছিল। এ ছাড়া জ্যামিতি্যক ও আরব্য নকশালঙ্কার এবং অদ্ভুত আকারের পত্রাদির নকশা অঙ্কিত রীতি প্রচলিত হয়েছিল। তবে প্রস্তর খোদাই কাজ যা আদিতে প্রস্তরের উপর হিন্দু রীতির কারুকার্য অঙ্কিত ছিল এটি মুসলমান শাসকগণ নিজেদের রুচি

অনুসারে কারিগরদের নির্দেশ দিয়ে প্যাটার্ন ও আদর্শলিপি দ্বারা সজ্জায়ন ও অঙ্কন করে ইমারতগাত্রে লাগিয়ে দিয়েছিল। এসব বাঙালি হিন্দু কারিগরগণ আদিকাল হতে এ ধরনের কাজে খুবই দক্ষ ও পারদর্শী ছিল। এরাই পাল ও সেন যুগে ভাস্কর্য বিনির্মানে অনুপম সাক্ষ্য সৃষ্টি করেছিল। কেননা এরা উত্তরাধিকার সূত্রে নবম ও দশম শতাব্দীতে গড়ে ওঠা বৌদ্ধ ও হিন্দু ভাস্কর্য শিল্পরীতির অনুসারী ছিল।

ছোটসোনা মসজিদ :

বাংলার মুসলিম স্থাপত্য অনুশীলন যুগে যে কয়েকটি মসজিদ সৌন্দর্য সুষমায় অতুলনীয় হয়ে নির্মিত হয়েছিল তাদের মধ্যে ছোটসোনা মসজিদ অন্যতম। আয়তনের দিক থেকে এটি বড়সোনা মসজিদের প্রায় অর্ধেক। কিন্তু স্থাপত্যিক দৃষ্টিকোণ হতে এটি কিছুটা বেশি গুরুত্ব বহন করছে। আলাউদ্দিন হোসেন শাহের রাজত্বকালে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) ওয়ালী মোহাম্মদ কর্তৃক ১৪৯৩ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। সামান্য কিছু ভুলত্রুটি থাকলেও এ সময় হতে বাংলার স্থাপতকীর্তির ইতিহাসের নির্ভুল তথ্য ও বিবরণ পাওয়ার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। কেননা মোটামুটি প্রসিদ্ধ ও উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কীর্তিগুলোর গায়ে উৎকীর্ণ লিপি সংবলিত হয়েছিল এবং এ সমস্ত খোদিত ও খচিত লিপিমালা হতে সঠিক পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়েছে। তবুও এতে সংশয় একেবারে দূর হয়েছে তা সঠিক করে বলা যায় না। কেননা পি. ব্রাউন মনে করেন যে মসজিদটি ১৫১০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।[২২]

এর সুনাম কেবলমাত্র চকচকে কারুকার্যের জন্য নয় বরং বিভিন্ন স্থাপত্য কৌশলের সমন্বয়ে যে অপরূপ সমৃদ্ধিশালী স্থাপত্যকীর্তিরূপে পরবর্তীকালে অন্য স্থাপত্যসৌধের অনুকরণ ও অনুসারিত হওয়ার পরাকাষ্ঠা সৃষ্টি করেছিল তাই প্রণিধানের বিষয়বস্তু এবং এখানেই এর মূল্যবোধ ও শ্রেষ্ঠত্ব।

আয়তাকার এ মসজিদের দৈর্ঘ্য ২৫ মি. (৮২ ফুট) ও প্রস্থ ১৫.৯০ মি. (৫২ ফুট)। মসজিদ কাঠামোর চার কোনায় ৪টি তোঘলক পদ্ধতির বুরুজ বা টাওয়ার শোভা পাচ্ছে। তবে বুরুজগুলো অষ্টভুজাকৃতির যা তোঘলক স্থাপত্যের বুরুজ হতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য। পূর্ব বা সম্মুখ দেয়ালে পাঁচটি খিলানায়িত দরজা রয়েছে (ভূমি নকশা নং- ১৬)। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী দরজাগুলো হতে বেশ বড়। পশ্চিম দিকের দেয়ালে পাঁচটি মিহরাব আর দোতলায় জানানা বা লেডিজ গ্যালারিতে একটি ছোট আকারের মিহরাব নির্মিত। দক্ষিণের দরজা সংশ্লিষ্ট সোপান পথ দিয়ে এর উপরে পৌছতে হয়।

এ মসজিদ দামেস্কের আদি আদর্শ মসজিদ নকশা পরিকল্পনা অনুসরণ করে নির্মিত নয় বরং বাংলার জলবায়ুতে টিকে থাকার উপযোগী করে আবৃত ধরনের মসজিদ নকশায় তৈরি হয়েছিল। মসজিদ অভ্যন্তরভাগ পাঁচটি 'বে'-তে বিভক্ত এবং কিবলা প্রাকার সমান্তরাল হয়ে রয়েছে তিনটি খিলান শোভিত আইল। মাঝখানের 'বে' ছাড়া বাকি দুটি করে দুধারে মোট ৪টি 'বে'-বর্গের উপরে তিনটি করে মোট ১২টি গম্বুজ এদের শীর্ষে ছাদ হিসেবে শোভা পাচ্ছে। মাঝখানের 'বে'-বর্গের উপর যে ছাদ নির্মিত হয়েছে এটি বাংলার স্থাপত্যের আদি নকশা কুঁড়েঘরের চৌচালা আকারে নির্মিত।

বাংলার স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ইটকে নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহার। এ বৈশিষ্ট্য এখানে প্রত্যক্ষ করা যায় প্রভূত পরিমাণে। তবে ইট দ্বারা এটি নির্মিত হলেও একে মজবুত করার জন্য ৮টি প্রস্তর থাম প্রয়োগ করা হয়েছে। সম্মুখ দেয়াল ঐশ্বর্যশালী
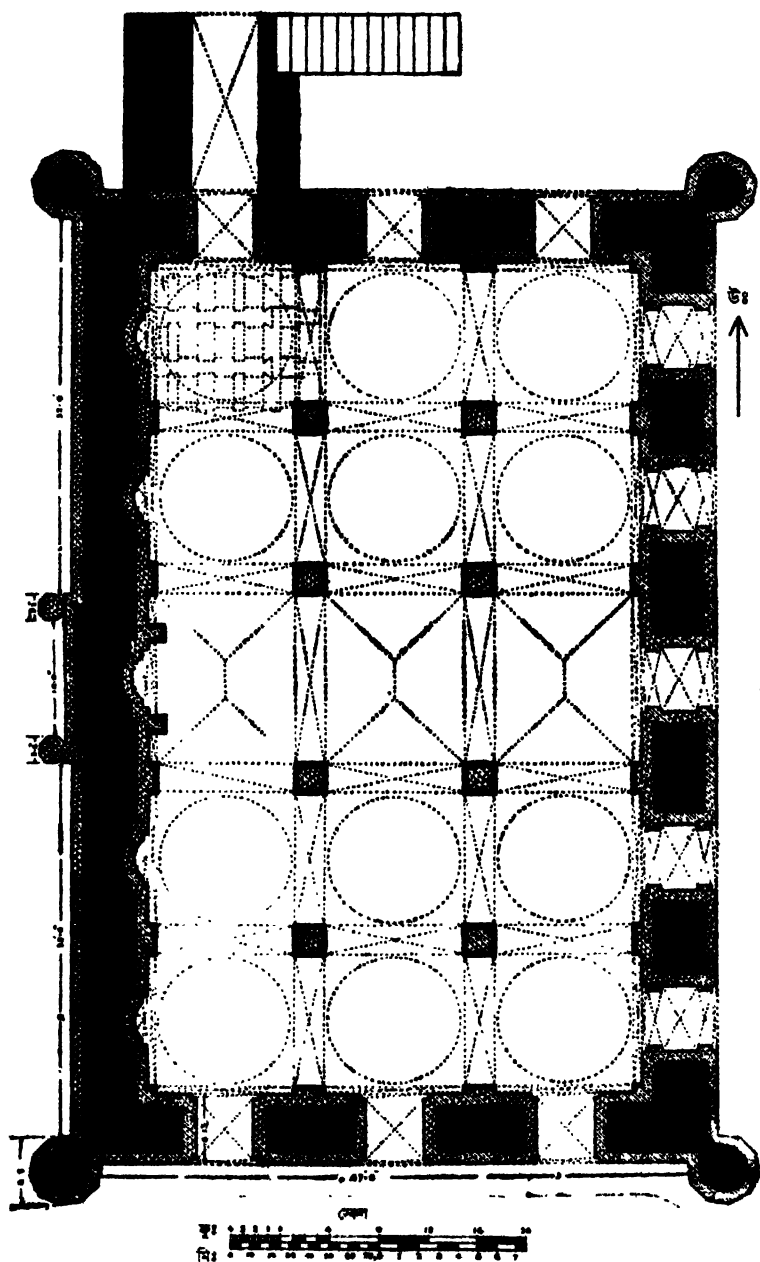
ভূমি নকশা নং-১৬ : ছোটসোনা মসজিদ

কারুকার্যে বিভূষিত। প্রায় সমগ্র নকশা কারুকার্য পাথরের উপর খোদাই করে দেয়ালগাত্রে বসিয়ে দেয়া হয়েছে। নানা ধরনের কারুকার্য মসজিদের প্রবেশ দ্বারে, খিলান, দরজার চৌকাঠ ও সর্দল এবং মিহ্‌রাবে কারিগরের নিপুণ হস্তের স্পর্শে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে (চিত্র নং-২৭)।

বিশেষভাবে থামগুলোতে পেঁচানো ও পাকানো ধরনের নকশালঙ্কার এবং খিলানের ত্রিকোনাকার ভূমিতে নিপুণ হস্তে অঙ্কিত রোজেট বা গোলাপ সদৃশ নকশা এর আলঙ্কারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। মসজিদের সম্মুখ দেয়াল আনুভূমিক রেখার দড়ি নকশালঙ্কার ও ছাঁচে ঢালা নকশালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত। সামনের প্রবেশদ্বারের দুপার্শ্বের বিস্তৃত এলাকার ফাঁকা অংশগুলো প্রস্তরের উপর খোদিত প্রাক-মুসলিম বাংলার প্রচলিত শিকল-ঘণ্টার নকশালঙ্কারে সুশোভিত (চিত্র নং-২৮)। এর সফল প্রয়োগের মধ্য দিয়ে নকশা ব্যবহারের এক ঘেঁয়েমির মাঝে নতুন চমক সৃষ্টি করে অভিনব আদর্শ সৃষ্টিতে স্থপতিরা সক্ষম হয়েছিল।

এ মসজিদের বক্রাকার কারনিস বাংলার স্থাপত্যের ইতিহাসে এক অনন্য উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। এখানে কারনিস খড়ের ঘরের চালা বা চালের মতো ধীরে ধীরে মধ্যবিন্দু হতে উভয় দিকে ক্রমে নিচু হয়ে থেমে গিয়েছে। সে যুগে যতগুলো ইমারত প্রস্তর খোদাই নকশা কারুকার্য ধারণ করে রয়েছে তন্মধ্যে ছোটসোনা মসজিদের প্রস্তর খোদাই নকশালঙ্কার সর্বোৎকৃষ্ট। এর গম্বুজগুলো হিন্দু যুগেব কমলা নকশা প্রতীক ধারণ করে রয়েছে। দেয়ালের কিনারা বা প্রান্তিক রেখা বরাবর ছককাটা বা খাঁজকাটা এলাকা জুড়ে পেঁচানো আকারের নকশায় রয়েছে সজ্জিত।

এ মসজিদ একটি অনুসরণযোগ্য আদর্শ পরবর্তী মসজিদ স্থাপত্যের জন্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। অন্যপক্ষে ছোটসোনা মসজিদের মধ্য দিয়ে আগের অনেক স্থাপত্য কৌশলের উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, নবায়ন ও সংস্কার সাধিত হয়েছিল।

বাংলার ইসলামিক স্থাপত্য পদ্ধতি খুব একটা মনোমুগ্ধকর নয় এবং শিল্প চেতনায় প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমনও নয়। যদিও স্থাপত্যচর্চার প্রথম দিকে সফলতার সোপান বেয়ে কিছুটা অগ্রসর হতে পেরেছিল যা আদিনা মসজিদ বা দাখিল দরওয়াজা নির্মাণে প্রত্যক্ষ করা যায়; তবুও অধিকাংশ ক্ষেত্রে পদ্ধতির অনুশীলন একঘেঁয়েমিপূর্ণ এবং কোনো সৃজনশীলতা বা সৃষ্টিশীলতার অমোচনীয় সাক্ষ্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। আদিনা মসজিদ ও দাখিল দরওয়াজা স্থাপত্যকীর্তি দুটি প্রকারান্তরে অনন্যসাধারণ ছিল। এটি আত্মমহিমান্বিত ও উন্নতির নিজস্ব গতিময়তার উচ্চাকাঙ্ক্ষি লক্ষণযুক্ত হয়ে নির্মিত হয়েছিল।

অন্যপক্ষে মুসলিম শাসনকর্তারা যখন এ দেশের মাটি ও মানুষের সাথে ধীরে ধীরে মিশিয়ে একাত্মতা গড়ে তোলার মানসিকতা নিয়ে অগ্রসর হয়েছিল এবং কিছুটা বাস্তববাদী মনোভাব পোষণ করতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল তখনই তাদের হস্তে মনোমুগ্ধকর স্থাপত্য সৃষ্টির ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছিল। এ পরিস্থিতিতেই কেবলমাত্র সুষম মাত্রাবদ্ধ মোহনীয় স্থাপত্যকর্মের সৃষ্টি হতে থাকে যা বাংলার স্থাপত্যধারায় তৃতীয়পর্বে একটা পরিপক্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ স্থাপত্য হিসেবে দানা বাঁধতে দেখা গিয়েছিল। এ সময়ে নির্মিত স্থাপত্যকীর্তিগুলো সচরাচর চলমান ও বিদ্যমান পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুসারে উন্মেষ ঘটেছিল।

তারা স্থাপত্য নির্মাণে যা অর্জন করেছিল বা মানে উঠতে পেরেছিল তা শিল্প হিসেবে খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে এর গঠনমূলক নির্মাণ কৌশল ও রীতিনীতি অত্যন্ত মজবুত

ও নির্ভুল ছিল। এর বাহ্যিক দৃশ্যমান চেহারায় উদ্ভাবন শক্তি সম্পন্নতার ছবি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল এবং আদি রূপের অভিব্যক্তি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মৌলিকত্বে দৃশ্যমান হয়ে বাংলার স্থাপত্যের চরম বিকাশের পরিচয় বিধৃত করেছে। এটি সঙ্গতভাবে সত্য যে স্বাতন্ত্র্যসূচক বৈশিষ্ট্য জলবায়ুর প্রভাবকে স্বীকার করেই প্রয়োজনীয় রূপ আকারত্ব লাভ করেছিল।

বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের উত্তম পদ্ধতির উন্নয়ন যদিও বাংলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ তা সত্ত্বেও এ স্থাপত্যের প্রভূত প্রভাব বাংলার বাইরে আসাম ও বিহার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করেছিল। এর অন্যতম উদাহরণ আসামের শিবসাগর জেলার ডিমাপুরে কাচহারী বাজাদের আদি রাজধানীর প্রবেশদ্বার যা ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল। এটি গৌড় ও পাণ্ডুয়ার মসজিদ সম্মুখভাগের অনুরূপ এর কেন্দ্রীয় সূচ্যগ্র খিলানায়িত তোরণের প্রতি কোনায় অষ্টভুজ চূড়া ও গম্বুজ, বাংলার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বক্র কারনিস ব্যবহাব করা হয়েছে। এ সমস্ত স্থাপত্য লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য বাংলার মুসলিম স্থাপত্যের চরিত্রই নির্দেশিত করছে। অবশ্য ডিমাপুরের স্থাপত্যকার্যটি আদৌ মুসলমানদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল কি না তা প্রণিধানেব বিষয়বস্তু।

সুরা মসজিদ :

সুলতানি আমলে কেবলমাত্র রাজধানী শহরেই উল্লেখযোগ্য ইমারত গড়ে ওঠে নি বরং দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলেও নির্মিত হয়েছিল অসংখ্য স্থাপত্যকীর্তি। সে ধরনেব একটি স্থাপত্যকীর্তি হল সুরা মসজিদ যা দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট থানার উসমানপুর বাজার থেকে ৩ কি.মি. পশ্চিমে ঘোড়াঘাট-হিলি রাস্তার উত্তর পার্শ্বে অবস্থিত। ঐতিহাসিক ঘোড়াঘাট দুর্গ থেকে এ মসজিদের দূরত্ব পশ্চিমে ৭ কি.মি.। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা একটি বৃহৎ দীঘির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় মসজিদটি অবস্থিত।

মসজিদটি ১.৫২ মি. উচ্চতাবিশিষ্ট একটি বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদিটির পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ২১.৯০ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৮.৭০ মি.। পূর্ব দিকে একটি সিঁড়িপথ বেয়ে এ বেদিতে উঠতে হয়। বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের নামাজগৃহের প্রতি বাহুর অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ৪.৯০ মি.। নামাজগৃহটি আবার ইষ্টক নির্মিত সুবিশাল গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত। গম্বুজের ভার বহনের জন্য প্রতি দেয়ালে দুটি করে মোট আটটি প্রস্তরস্তম্ভ এবং কোণগুলোতে স্কুইঞ্চ পদ্ধতির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এ মসজিদের নামাজগৃহের সম্মুখে একটি প্রশস্ত বারান্দা সন্নিবেশিত যার দৈর্ঘ্য ৪.৯০ মি. ও প্রস্থ ১.৮২ মি. এবং বারান্দার উপরে তিনটি উল্টানো চাড়িসদৃশ গম্বুজ সরাসরি ছাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। মসজিদে প্রবেশের জন্য বারান্দায় দ্বিকেন্দ্রিক খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে যার মধ্যবর্তীটি অপেক্ষাকৃত বড়। এ প্রবেশপথগুলো বরাবর নামাজগৃহের পূর্ব দেয়ালে অনুরূপ খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান এবং প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে রয়েছে প্রস্তর নির্মিত তিনটি অবতল মিহরাব। তা ছাড়া নামাজগৃহের উত্তব ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত দরজা রয়েছে যা বর্তমানে জানালা হিসেবে ব্যবহৃত। অনুরূপভাবে বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও একটি করে খিলানপথ বিদ্যমান (ভূমি নকশা নং-১৭)।

মসজিদের নামাজগৃহের চার কোনায় চারটি এবং বারান্দার উভয় কোনায় দুটি মোট ছয়টি অষ্টভুজাকৃতি বুরুজ রয়েছে যেগুলো ব্যান্ড দ্বারা বিভক্ত এবং মসজিদের ছাদ বরাবর

উত্থিত। কোনার বুরুজগুলো একদা প্রস্তর আস্তরণে আবৃত ছিল যার চিহ্ন এখনো লক্ষ করা যায়। মসজিদের কারনিস বক্রাকার এবং প্রবেশপথের স্থলে বিযুক্ত একটি আনুভূমিক প্রস্তর বন্ধন (stone string-course) মসজিদের বহির্গাত্রকে মোটামুটি দুটি অংশে বিভক্ত করেছে (চিত্র নং-২৯)।

মসজিদের আবেষ্টনী প্রাচীরের পূর্ব দিকের প্রবেশপথের উভয়পার্শ্বে পোড়ামাটির ফলক নকশা বিদ্যমান। এর খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোণাকার ভূমি পদ্মফুল নকশায় সুশোভিত। কোণ বুরুজগুলো ব্যান্ড নকশায় অলঙ্কৃত। মসজিদের নামাজগৃহের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের বহির্গাত্রে যে প্যানেল আকৃতির পোড়ামাটির ফলক নকশা পরিলক্ষিত হয় তাও বিভিন্ন ফুল,
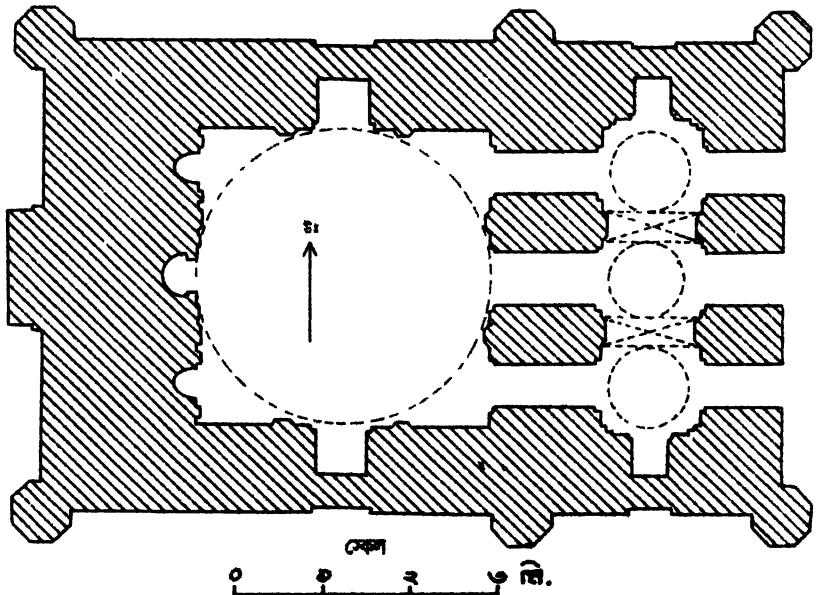
ভূমি নকশা নং-১৭ : সুরা মসজিদ

লতা-পাতার অলঙ্করণ সমৃদ্ধ। মসজিদের কারনিসের মোল্ডিঙের নিচে এবং উপরে বিশেষ ধরনের জ্যামিতিক নকশা সমগ্র দেয়ালের দৈর্ঘ্য বরাবর রচিত। এর উপরিভাগ দিয়ে একধরনের সর্পফণা নকশা বিদ্যমান। মসজিদের অভ্যন্তরে মিহরাবের খাঁজনকশা ও আলঙ্কারিক কোণ দণ্ড বিশেষ আকর্ষণীয়। মিহরাবের ত্রিকোনাকার ভূমিতে নানা ধরনের গাছপালার নকশা পরিদৃশ্যমান। আয়তাকার প্যানেলের অভ্যন্তরে রোজেট নকশা এবং এর উপরে ও পার্শ্বে তারা ফুলের নকশা বিদ্যমান। প্যানেলের উপরে আর এক সারি তারা ফুল সংবলিত পাড় নকশা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এ প্যানেল নকশার উভয়পার্শ্বে তিনটি করে প্রস্তর প্যানেল বিদ্যমান। এ প্রস্তর প্যানেলগুলোর অভ্যন্তরে শিকল-ঘণ্টা নকশা উৎকীর্ণ। আবার প্যানেলগুলোর উপরে যে খিলান নকশা খোদিত তাও কৌণিক ও সম্মুখভাগে বহু খাঁজবিশিষ্ট।

নির্মাণ তারিখ :

এ মসজিদে কোনো শিলালিপি পাওয়া যায় নি অথবা কোনো সমসাময়িক সাক্ষ্য থেকে এর সঠিক কোনো নির্মাণ তারিখ জানা যায় না। তবে গঠনশৈলী ও স্থাপত্যিক রীতি কৌশল যেমন- বক্রাকার কারনিস, কারনিস বরাবর উত্থিত কোণ-বুরুজ, পোড়ামাটির ফলক নকশার ব্যবহার, কোণ বুরুজে ব্যবহৃত প্রস্তর আস্তরণ ও প্রস্তর নির্মিত মিহরাব প্রভৃতি বিচার-বিশ্লেষণে মসজিদটি ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত বলে প্রত্নতত্ত্ববিদগণ মনে করেন। অবশ্য পোড়ামাটির ফলক নকশার ব্যবহার ও প্রস্তর মিহরাবের সূক্ষ্ম কারুকার্য দেখে এ.এইচ. দানি এটি হোসেন শাহী আমলে নির্মিত একটি স্থাপত্যকীর্তি বলে মন্তব্য করেছেন।[২৩]

মহাস্থানগড় মসজিদ :

বর্তমান বগুড়া শহর থেকে প্রায় ১২ কি.মি. উত্তরে বগুড়া-রংপুর মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে মহাস্থানগড় অবস্থিত। ১৯৬৫-৬৬ খ্রি. প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে মাহীসাওয়ারের মাজার থেকে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় ১৮০ মি. দূরে মানকালীর ভিটা নামক স্থানে একটি প্রাচীন মসজিদের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে।

বিদ্যমান নিদর্শন থেকে বুঝা যায় যে মসজিদটি ইষ্টক নির্মিত। তবে এর কোনো কোনো বিশেষ অংশে প্রস্তর খণ্ড ব্যবহৃত হয়েছিল বলে খননকার্যের সময় প্রাপ্ত প্রস্তর খণ্ডের নিদর্শন থেকে অনুমান করা যায়। আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদের নামাজগৃহের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২৬.৬০ মি. ও প্রস্থে ১৫.৮৫ মি. এবং অভ্যন্তরীণ পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ২৩.৬০ মি. ও প্রস্থে ১৩.০৫ মি.। বর্তমানে মসজিদটি এমনভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত যে এর অবকাঠামো নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। তবে অবমুক্ত নিদর্শন থেকে এর ভূমিনকশা সহজেই বিনির্মাণ সম্ভব।

মসজিদের নামাজগৃহ দুসারি স্তম্ভ দ্বারা তিনটি সমান্তরাল আইলে এবং পাঁচটি 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি আইল ৩.৪০ মি. প্রশস্ত। মসজিদের কেন্দ্রীয় 'বে'-টি পার্শ্ববর্তী 'বে'-গুলো অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ। মসজিদের অভ্যন্তরে দুসারিতে চারটি করে আটটি ইষ্টক নির্মিত স্তম্ভের মধ্যে ছয়টি স্তম্ভের অবস্থান ও ভিত এখনো বিদ্যমান (ভূমি নকশা নং- ১৮)। এ স্তম্ভগুলোর পাদমূল বর্গাকৃতির হলেও কিয়ৎদূরে কোনাগুলো কর্তিত হয়ে অষ্টভুজাকৃতি ধারণ করেছে। এ স্তম্ভগুলোর গাত্রে পোড়ামাটির ফলক নকশা ও অলঙ্কৃত ইট শোভা পেত যার নমুনা এখনো লক্ষ করা যায়।

মসজিদ স্থাপত্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে এর পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি প্রবেশপথ রয়েছে এবং এ প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালেও রয়েছে পাঁচটি মিহরাব। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি মসজিদ স্থাপত্যের প্রচলিত রীতি অনুসারে অন্যগুলো অপেক্ষা বড়। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের প্রশস্ততা ২.৪০ মি. অথচ অন্যগুলো ২.২০ মি. প্রশস্ত। বর্তমানে মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে কোনো প্রবেশপথের চিহ্ন লক্ষ করা যায় না। তবে অপরাপর মসজিদগুলোর ন্যায় এ মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে প্রতিটি আইলের সঙ্গে একটি করে মোট তিনটি প্রবেশপথের ব্যবস্থা ছিল। মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপরাপর মিহরাবগুলো অপেক্ষা আকার ও আয়তনে প্রশস্ত এবং এ মিহরাবের খিলান গর্ভের উভয়পার্শ্বে দেয়াল সংলগ্ন দুটি স্তম্ভ অলঙ্কারস্বরূপ নির্মিত হয়েছিল যার ভিত্তিমূল এখনো অস্পষ্টভাবে লক্ষ করা যায়। অনুরূপভাবে পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলোতেও একই ধরনের আলঙ্কারিক প্রান্তিক স্তম্ভ ছিল বলে অনুমান করা যায়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের বিস্তৃতি ৮৪ সে.মি. এবং গভীরতা ৬১ সে.মি.। অপরদিকে অন্যান্য মিহরাবগুলোর বিস্তৃতি ৩০ সে.মি.। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তর পার্শ্বে

১.৭৮ মি. × ১.৬০ মি. পরিমাপের যে ভিতটি পরিদৃষ্ট হয় তা জুমার নামাজে ইমামের খুৎবা বা ধর্মীয় উপদেশ দানের জন্য নির্মিত বক্তৃতা মঞ্চ বা মিম্বরের ভিত্তিমূল। নামাজগৃহের মধ্যবর্তী আইলের পূর্ব পার্শ্বে অবস্থিত দ্বিতীয় বর্গাকৃতির স্তম্ভের সন্নিকটে ১.৮৮ মি. × ১.২৭ মি. পরিমাপের একটি এবং পশ্চিম আইলের উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে দেয়াল সংলগ্ন আরো দুটি
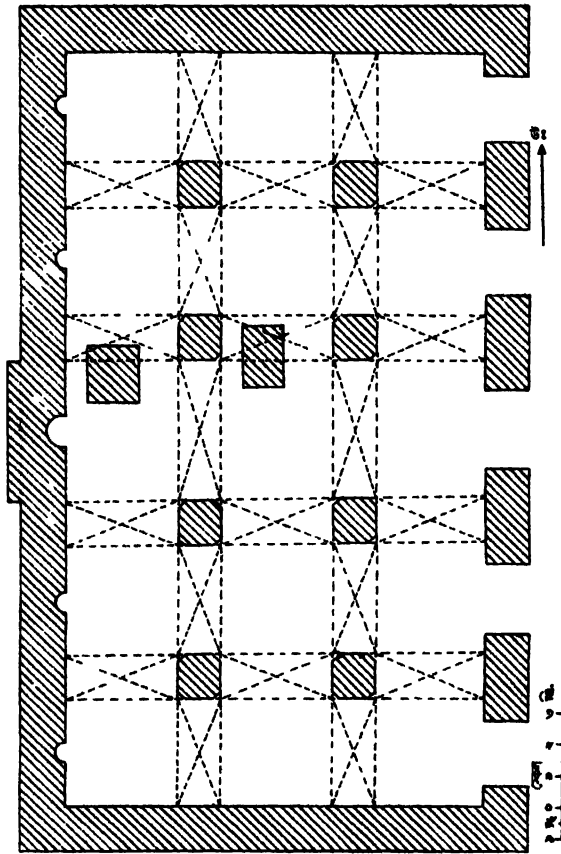
ভূমি নকশা নং-১৮ : মহাস্থানগড় মসজিদ

ভিত পরিদৃষ্ট হয়। অদ্ভুত এ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পণ্ডিত মহলেব ধারণা এই যে পশ্চিম আইলের উভয় প্রান্তের মঞ্চ দুটি নামাজান্তে ছাত্রদের পাঠদানের উদ্দেশ্যে শিক্ষকগণের বসার আসন হিসেবে নির্মিত হয়েছিল এবং তৃতীয়টি ছিল ইমামের সঙ্গে সমস্বরে তকবির দেওয়ার নিমিত্তে মকাব্বিরের জন্য নির্ধারিত স্থান। এখানে উল্লেখ্য যে, মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তর পার্শ্বে দেয়াল সংলগ্ন যে আয়তাকৃতির আবেষ্টনী প্রাচীর লক্ষ করা যায় তা হয়তো কোনো পদস্থ ব্যক্তির নিরাপত্তাজনিত কারণে নির্মিত 'মাকসুরা' হিসেবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের পর্দা দেয়াল তো দূরের কথা দেয়ালের ভিতের চিহ্নটুকুও লক্ষ করা যায় না। তা ছাড়া বাংলার মসজিদ স্থাপত্যে 'মাকসুরার' পরিকল্পনা পরিদৃষ্ট হয় না। অতএব মহাস্থানগড়

মসজিদের ‘মাকসুরার’ ধারণাটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর। খননকার্যের সময় মসজিদের দেয়াল সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি দেয়ালের ভিত উন্মোচিত হয়েছিল এবং এটি একটি বর্গাকৃতির কক্ষ ছিল বলে অনুমান করা যায় যা ইমাম সাহেবের আবাসস্থল হিসেবে নির্মিত হয়েছিল। তা ছাড়া দক্ষিণ দেয়ালের পার্শ্বে অনেকগুলো উঁচু বেদি উন্মোচিত হয়েছিল যা মুসল্লিদের অজুর নিমিত্তে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। নামাজগৃহের সম্মুখে ২৬.৬০ মি. × ৭.৬০মি. বিস্তৃত একটি উন্মুক্ত আঙ্গিনা ছিল যা ঘোড়াঘাট দুর্গ মসজিদ (১৭৪০ খ্রি.) ও কাজী সদর উদ্দীনের মসজিদের (অষ্টাদশ শতাব্দী) ন্যায় প্রাচীরবেষ্টিত ছিল।

মসজিদের নামাজগৃহ কীভাবে আচ্ছাদিত ছিল তা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন। তা সত্ত্বেও নামাজগৃহের অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও স্তম্ভরাজির বিন্যাসের ওপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, আইল ও ‘বে’-তে বিভক্ত অন্তর্বর্তী বর্গগুলো অবশ্যই গম্বুজে পরিবৃত ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ দেয়াল সংলগ্ন প্রোথিত খুঁটি এবং অভ্যন্তরের আটটি স্তম্ভেব উপর নির্মিত আড়াআড়ি খিলানের উপর এ গম্বুজগুলো প্রতিষ্ঠিত ছিল। গম্বুজের নিম্নের কোণের ফাঁকা স্থানগুলো সারিবদ্ধ অথবা কৌণিকভাবে সজ্জিত ইটে রচিত বাংলা পান্দানতিফ পদ্ধতিতে আচ্ছাদিত ছিল বলে ধারণা করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, নামাজগৃহের কেন্দ্রীয় ‘বে’-টি পার্শ্ববর্তী ‘বে’-গুলো অপেক্ষা বৃহৎ হওয়ায় এ ‘বে’-এর উপর চৌচালা রীতি ছাদেব অনুমানও উপেক্ষা করা যায় না; যেমনটি দেখা যায় গৌড়ের দরসবাড়ী মসজিদে (১৪৭৯ খ্রি.), ছোটসোনা মসজিদে (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) এবং বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদে (১৪৫৯ খ্রি.)। মসজিদের কারনিস সমসাময়িককালে নির্মিত মসজিদের ন্যায় সম্ভবত বক্রাকার ছিল এবং এর চারকোনায় চারটি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ সংযোজিত ছিল।

নির্মাণ তারিখ :

এ মসজিদের কোনো শিলালিপি আবিষ্কৃত হয় নি অথবা কোনো সমসাময়িক সাক্ষ্যে এর নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে কোনো সঠিক ধারণা পাওয়া যায় না। কিন্তু এর সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি পর্যালোচনা করলে অনুমান করা যায় যে, এটি একটি প্রাক-মোগল স্থাপত্যকীর্তি। মসজিদটির সম্ভাব্য নির্মাণ তারিখ নির্ধারণের জন্য এর আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যাবলি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। পাঁচটি ‘বে’ ও দু অথবা ততোধিক আইলে বিভক্ত নামাজগৃহ এবং চৌচালা ছাদবিশিষ্ট মসজিদ সাধারণত পঞ্চদশ অথবা ষোড়শ শতাব্দীতে নির্মিত হতে দেখা যায়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত চৌচালা ছাদবিশিষ্ট মসজিদ হল গৌড়ের দরসবাড়ী মসজিদ (১৪৭৯ খ্রি.), গুণমাত (gunmat) মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী), ছোটসোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.) এবং বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ (১৪৭৯ খ্রি.)। আবার নামাজগৃহকে পাঁচটি ‘বে’ ও তিন আইলে বিভক্তকরণ রীতিটি পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে ; যেমন- শাহজাদপুর মসজিদ (পঞ্চদশ শতক), ছোটসোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), নবগ্রাম মসজিদ (১৪৫৮ খ্রি.), মাহীসন্তোষ মসজিদ (১৫০৭ খ্রি.), পীরপুকুর মসজিদ (ষোড়শ শতাব্দী) প্রভৃতি এ ধরনের মসজিদ স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। তা ছাড়া মহাস্থানগড়ের ধ্বংসাবশেষের মধ্য থেকে ইলিয়াস শাহ ও নাসির উদ্দীন মাহমুদ শাহের অনেকগুলো মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে।[২৪] সুতরাং এসব তথ্যের আলোকে অনুমান করা যায় মহাস্থানগড়ের মসজিদটি ইলিয়াস শাহী অথবা হোসেন শাহী আমলে নির্মিত।

বাঘা মসজিদ :

বর্তমান রাজশাহী জেলা সদর থেকে প্রায় ৪৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে বাঘা মসজিদটি অবস্থিত। স্থানীয়ভাবে এটি 'শাহদৌলার মসজিদ' নামে পরিচিত। বৃহৎ এক দিঘির পশ্চিম পাড়ে সুলতান নাসির উদ্দীন নসরত শাহের আমলে হযরত মাওলানা শাহ মোয়াজ্জেম দৌলার সম্মানে এটি নির্মিত হয়েছিল। এর সন্নিকটে এখনো উক্ত সাধু পুরুষ ও তাঁর পরিবারবর্গের সমাধি বিদ্যমান। শিলালিপির ভাষ্য থেকে জানা যায় যে মসজিদটি সুলতান নাসির উদ্দীন নসরত শাহ কর্তৃক ৯৩০ হি. মোতাবেক ১৫২৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত[২৫]।

আয়তাকার পরিসরে নির্মিত এ মসজিদের দৈর্ঘ্য ২৩.১৫ মি. এবং প্রস্থ ১২.৯০ মি.। এর চারকোনায় চারটি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ সংযোজিত এবং এগুলো বপ্র পর্যন্ত উত্থিত হয়ে কিউপোলাতে সমাপ্ত হয়েছে। মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে পাঁচটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ অবস্থিত এবং এগুলো সুসজ্জিত আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সংস্থাপিত (চিত্র নং-৩০)। অনুরূপভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও দুটি করে মোট চারটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান। পূর্বদিকেব প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালের দক্ষিণাংশে তিনটি অলঙ্কৃত মিহরাব বিদ্যমান এবং চতুর্থটি অপেক্ষাকৃত কম অলঙ্করণ সমৃদ্ধ ও পঞ্চম মিহবাবটি দ্বিতীয়তলা বরাবর উঁচুতে অবস্থিত ও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। উত্তর দিকের দুটি প্রবেশপথ বর্তমানে জালিযুক্ত জাফরি দ্বাবা বন্ধ। ধারণা করা হয় যে, মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোনায় একদা 'বাদশাহ-কা-তখ্ত' ছিল।

মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগে একসারি পাথরের স্তম্ভ দ্বারা দুটি আইল বা খিলান সারিতে এবং পাঁচটি সমবর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত। প্রতিটি 'বে'-বর্গের উপর একটি করে অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ সংস্থাপিত এবং গম্বুজের ভার আড়াআড়ি খিলান, মিহরাব ও প্রবেশপথের খিলানের উপর প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজের নিম্নাংশের 'বে'-বর্গাকারের ফাঁকা স্থানগুলো ত্রিভুজাকৃতির পান্দানতিফ্ পদ্ধতিতে আচ্ছাদিত। বাংলার অন্যান্য সুলতানি মসজিদের ন্যায় এ মসজিদেও বক্র কারনিস বিদ্যমান। কারনিসের নিম্নাংশ চারসারি বণ্ড নকশায় বিভক্ত এবং এর মধ্যভাগ নানা ধরনের ফুল-লতাপাতা সমৃদ্ধ পোড়ামাটির ফলক নকশায় অলঙ্কৃত। কেন্দ্রীয় মিহরাব লতা-পাতা ও খাঁজ খিলান নকশায় সজ্জিত। খিলানের ত্রিকোনাকার ভূমি লতাগুল্ম ও তরুরাজির নকশায় সুশোভিত। তা ছাড়া ঝুলন্ত শিকল-ঘণ্টা নকশা ও পোড়ামাটির ফলকে কাঁঠালের প্রতীক নকশা মসজিদের আলঙ্কারিক শ্রীবৃদ্ধি করেছে (চিত্র নং-৩১)।

বড়সোনা মসজিদ :

গৌড়ে নির্মিত মসজিদগুলোর মধ্যে বড়সোনা মসজিদ সর্ববৃহৎ। এ মসজিদের সম্মুখভাগ অর্থাৎ সাহন অংশ ৬১ মি. (২০০ ফুট) বর্গাকার। এর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণের তিন দিকের (উত্তর+দক্ষিণ+পূর্ব দিকে) ঠিক মাঝখানে একটি করে খিলানায়িত তোরণ রচিত হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে মুসল্লিরা মসজিদে প্রবেশ করত। সবগুলো খিলানায়িত দরজা যার মুখ প্রস্তর তক্তা বা স্লাব দ্বারা মোড়ানো হয়েছিল এবং মূল মসজিদের মতোই কারুকার্যে শোভিত। নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইট ও পাথর উভয় উপাদানই ব্যবহৃত হয়েছে।

আয়তাকার এ মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৫১.২৫ মি. (১৬৮ ফুট) এবং প্রস্থে ২৩.২০ মি. (৭৬ ফুট) (ভূমি নকশা নং-১৯)। উন্নত বপ্র পর্যন্ত এর উচ্চতা ৬.১৫ মি. (২০ ফুট) যা ধীরে ধীরে প্রান্তের দিকে ঢালু হয়েছে। মসজিদের নামাজঘর তিনটি খিলানায়িত আইলে বিভক্ত এবং মোট এগারটি 'বে' রয়েছে। এর অভ্যন্তরভাগের দৃষ্টিনন্দন খিলানপথ

সমান্তরালভাবে পশ্চিম দেয়ালের সাথে রচিত হয়েছে। প্রত্যেকটি 'বে'-এর পশ্চিম প্রান্তে কিবলা দেয়ালে একটি করে মিহরাব সন্নিবেশিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি কারুকার্যখচিত। 'বে'-বর্গগুলো অপেক্ষাকৃত উন্নত গম্বুজ দ্বারা আবৃত। এখানেও গম্বুজ নির্মাণে ক্রমপূরণ পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নামাজঘরের সম্মুখে এক আইলবিশিষ্ট একটি করিডোর বা

ভূমি নকশা নং-১৬ : বড়সোনা মসজিদ
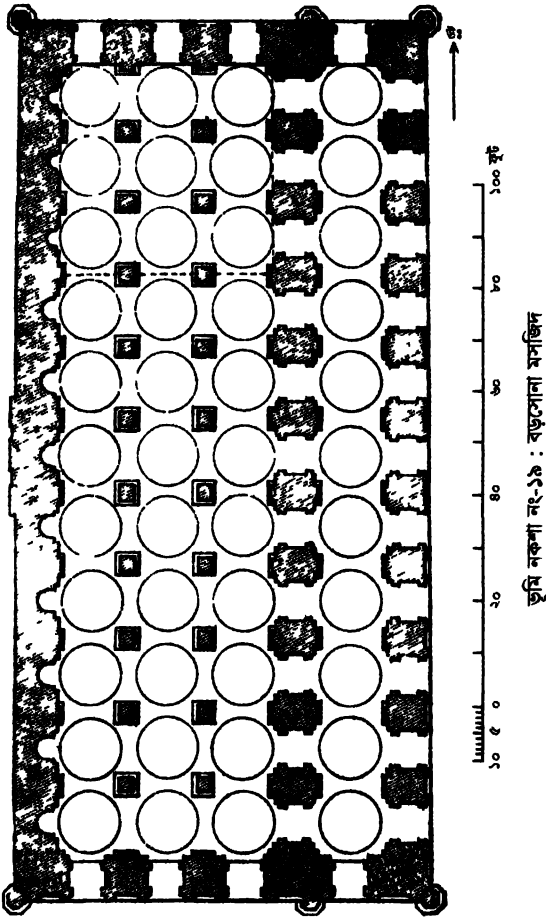
বারান্দা রয়েছে। এটিও নামাজঘরের গম্বুজের ন্যায় গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত ছিল। শুধুমাত্র বারান্দার গম্বুজ ব্যতীত অন্য গম্বুজগুলো ভেঙে পড়েছে। মসজিদের উত্তর পশ্চিম কোনায় তিনটি 'বে' পরিবেষ্টন করে নির্মিত হয়েছে জানানা গ্যালারি। আসলে এটি শাসক বা তার প্রতিনিধির নামাজের জন্য সংরক্ষিত স্থান। উত্তর দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত একটি খিলানায়িত সোপান পথের সাহায্যে এতে উপনীত হওয়া যায়।

মূল মসজিদের অংশবিশেষ কারুকার্য শোভিত ছিল এবং উপকরণ হিসেবে চকচকে মিনা করা সবুজ, নীল, সাদা, হলুদ এবং কমলা রঙের টালি ব্যবহৃত হয়েছে; বিশেষভাবে গম্বুজগুলো চকচকে করার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছিল। বড়সোনা মসজিদের সারল্য,

হৃদয়গ্রাহী ও বিশালতার জন্য দৃষ্টিনন্দনীয়; অন্যপক্ষে যদিও বহিরাঙ্গের প্রলেপ মনোমুগ্ধকর নয় তথাপি অভ্যন্তরীণ রূপসজ্জা মর্যাদাব্যঞ্জক এবং পশ্চিম ও উত্তর ভারতে নির্মিত সে যুগের যে কোনো মসজিদের সাথে তুলনীয়। মি. ফারগুসন যথার্থ বলেছেন যে, বর্তমানে টিকে থাকা গৌড়ের কীর্তিগুলোর মধ্যে বড়সোনা মসজিদ বাংলা স্থাপত্যের একটা সুন্দর ও অনবদ্য হর্ম্য[২৬]। জন মার্শাল মন্তব্য করেছেন[২৭] যে, অনেক স্থপতি ভুল করে একে দ্রাবিড় স্থাপত্যানুরূপ বলে মনে করে। কারণ এ মসজিদেও নকশালঙ্করণে দ্রাবিড় স্থাপত্যে ব্যবহৃত নকশালঙ্কার অনুসরণ করা হয়েছে। এই মসজিদটিতে সংস্থাপিত একটি শিলালিপির পাঠোদ্ধারে জানা যায় যে এটি (মসজিদ) হোসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ্ কর্তৃক ৯৩২ হিজরিতে (১৫২৬ খ্রি.) নির্মিত হয়েছে (চিত্র নং-৩২)।

কদম রসুল মসজিদ :

কদম রসুল মসজিদ একটি বৃহদায়তন মোটা রকমের গঠন কাঠামোযুক্ত ইমারত যার সম্মুখ দেয়ালে তিনটি খিলানযুক্ত হয়েছে। এতে যে স্তম্ভগুলো ব্যবহৃত হয়েছে ঐগুলো খুব খাটো হলেও শক্ত-সমর্থ ও বলিষ্ঠ। এটি অবশ্য বাংলা স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যসম্মত বলে মনে করা যেতে পারে। এগুলো কোনো হিন্দু ইমারত হতে সংগৃহীত হয়েছিল। এ ধরনের ভারী মোটা স্তম্ভ হুগলি জেলার ত্রিবেণীর জাফর খান গাজীর মসজিদে দেখা যায়। এ মসজিদ নির্মাণে ও পুনঃনির্মাণে এ ধরনের প্রস্তরস্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছিল। এ স্থানে নির্মিত ইমারত দুটি খুবই শিক্ষামূলক; মাকবারাটি সূচনায় আর মসজিদটি এ স্থাপত্য পদ্ধতির সমাপ্তি ঘোষণা করছে।

পক্ষান্তরে গৌড়ের কদম রসুল ভারিক্কি ধরনের স্তম্ভ ব্যবহার ছাড়াও সৌন্দর্য বৃদ্ধির অলঙ্করণ ও নকশালঙ্কার দ্বারা সুষমাবর্ধন প্রক্রিয়ার যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তাতে মসজিদ স্থাপত্যের অধঃগতি বা পতনের দিকে ধাবিত হওয়ার ছাপ ফুটে উঠেছে। এর দেয়ালপৃষ্ঠ একঘেয়েমি নকশার খোপ খোপ আকারে বারংবার অর্থহীনভাবে প্রয়োগ খাঁজকাটা অলঙ্করণ পদ্ধতি বা মোটিফ প্রকারান্তরে মসজিদের অবয়বকে গতানুগতিকতায় অশোভন করে তুলেছে এবং শিল্পের রসাত্মকবোধকে স্তিমিত করে দিয়েছে। কদম রসুল মসজিদের উদাহরণ মসজিদ স্থাপত্যধারায় অধঃপতিত হওয়ার প্রথম চিহ্ন বহন করছে। শিল্পকর্মে সৃজনী শক্তিচ্যুতির আভাস এখানেই বিধৃত হয়ে রয়েছে (চিত্র নং- ৩৩)।

এ অধঃপতিত অবস্থার মধ্য দিয়ে পদ্ধতির প্রকৃত বৈশিষ্ট্য ও মৌলিক সৃষ্টিশীলতা হারিয়ে ফেলেছিল; তা মসজিদের কারনিস বক্রতার চেহারার মাঝে প্রকট হয়ে ফুটে উঠেছে। কেননা যে কারনিসের দৃঢ় বক্রতা আদি স্থাপত্য চরিত্রে দৃষ্ট হয়েছিল বা প্রথম মসজিদে এর যে চমৎকারিত্ব ও আনন্দদায়ক সুন্দর বক্রতা ছিল তা এখানে মোটেই আর সৃষ্টি হতে দেখা যায় নি। স্থাপত্যশিল্পের অবনতিশীল পরিস্থিতি কেবল কদম রসুল নয় রাজশাহীর বাঘা মসজিদেও কিছু পরিমাণে দৃষ্ট হয়েছে। যে উপাদানগুলো দ্বারা মসজিদের গঠন সমন্বয়িত ও সমর্থিত হয়েছিল সেগুলোও হৃষ্টতা পুষ্টতা হারিয়ে ফেলেছে। এর ফলে সমগ্র কাঠামোর আকারবিহীন ঢলঢলে, বীর্যহীন ও নিস্তেজ হয়ে মসজিদ স্থাপত্যের বিশেষ ধারাটির সমাধি রচনা করেছিল।

কুসুম্বা মসজিদ :

বৃহত্তর রাজশাহী জেলা (বর্তমান নওগাঁ) মান্দা থানার অন্তর্গত কুসুম্বা নামক স্থানে বিরাট এক দিঘির পশ্চিম তীরে মসজিদটি অবস্থিত। এটি রাজশাহী শহর থেকে প্রায় ৫০

কি.মি. উত্তরে রাজশাহী-নওগাঁ মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক কুসুম্বাকে প্রাক-মুসলিম আমলের কুসুম্বীর সমার্থক বলে মনে করেন। অবশ্য কুসুম্বীর সাথে সম্পর্কিত কুসুম্বার পরিচয় নির্ধারণ বর্তমানে একেবারেই অসম্ভব। যাহোক মসজিদের প্রধান প্রবেশপথের উপরিভাগে সংস্থাপিত একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে মুহাম্মদ শাহের পুত্র গিয়াসউদ্দীন বাহাদুর শাহের শাসনামলে (১৫৫৪-৬০ খ্রি.) এ মসজিদটি জনৈক সুলাইমান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।[২৮] মসজিদটির বর্তমান পারিপার্শ্বিকতা ও অবস্থান দৃষ্টে মনে হয় একদা কুসুম্বা একটি বর্ধিষ্ণু নগরী ছিল এবং এ নগরীতে সুলতানি আমলে উল্লেখযোগ্য প্রশাসনিক কর্মকর্তা বসবাস করতেন। সম্ভবত সুলাইমান ছিলেন এ ধরনের একজন গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কর্মকর্তা।

কুসুম্বা জামে মসজিদটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। এটি ইষ্টক নির্মিত হলেও এর অভ্যন্তরীণ ও বহির্গাত্র সুখণ্ড প্রস্তর দ্বারা আবৃত যা ছোটসোনা মসজিদে লক্ষ করা যায়। তবে খিলান, গম্বুজ ও ছাদ এ রীতির বহির্ভূত। মসজিদটির পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ১৬.৭০ মি. ও পূর্ব-পশ্চিমে ১২.৮০ মি.। এর চারকোনায় চাবটি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ সংযোজিত এবং এগুলো কারনিস পর্যন্ত উত্থিত। নামাজগৃহের পূর্ব প্রাচীরে বহু খাঁজবিশিষ্ট তিনটি খিলানপথ রয়েছে। একইভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও দুটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান। দক্ষিণ দেয়ালের প্রবেশপথ দুটি বর্তমানে জ্যামিতিক নকশায় প্রস্তর জালি দ্বারা বন্ধ। পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে তিনটি প্রস্তর মিহবাব সন্নিবেশিত এবং মিহরাবগুলো অবতলাকৃতির (চিত্র নং-৩৪)।

মসজিদেব নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগ একসাবি প্রস্তরস্তম্ভ দ্বারা দুটি আইলে এবং তিনটি সমবর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং প্রতিটি 'বে'-বর্গের উপর একটি করে গম্বুজ সংস্থাপিত। গম্বুজেব নিম্নাংশের ফাঁকা স্থানগুলো আবার ত্রিভুজাকৃতিব পান্দানতিফ পদ্ধতিতে আচ্ছাদিত। এ মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগের উত্তর-পশ্চিম কোণে জানানা গ্যালারি সংযোজিত। দ্বিতলাকৃতির এ কক্ষটি বলিষ্ঠ প্রস্তর স্তম্ভের উপব প্রতিষ্ঠিত এবং অভ্যন্তরভাগের একটি সোপান শ্রেণী দিয়ে এতে ওঠা যায়। এ ধরনের জানানা গ্যালারি ছোটসোনা ও দরসবাড়ী মসজিদেও রয়েছে। তবে সিঁড়িপথের বিন্যাসের ক্ষেত্রে উক্ত দুটি মসজিদের সাথে আলোচ্য মসজিদের কিছুটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। কারণ দরসবাড়ী ও ছোটসোনা মসজিদের গ্যালারিতে পৌঁছানোর জন্য মসজিদের উত্তর-পশ্চিম কোণে বহির্দেয়াল সংলগ্ন একটি সুউচ্চ সিঁড়িপথ বিদ্যমান। কিন্তু কুসুম্বা মসজিদের মঞ্চে আরোহণের জন্য নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগে সিঁড়িপথ সন্নিবেশিত। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কুসুম্বা মসজিদের এ মঞ্চটি মহিলা গ্যালারি না হয়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের আসনের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল।

সুলতানি আমলের অন্যান্য মসজিদের ন্যায় এ মসজিদের কারনিস ঈষৎ বক্রাকার। এ বক্র কারনিসের বক্র মধ্যভাগ প্রান্তভাগ অপেক্ষা সামান্য উঁচু। এ মসজিদের ছাদ থেকে পানি নিষ্কাশনের জন্য কারনিসের উপরিভাগে নির্দিষ্ট দূরত্বে গার্গোয়েল (gargoyle) নির্মিত হয়েছে।

কুসুম্বা মসজিদের কিবলা দেয়ালে সন্নিবেশিত তিনটি মিহরাব নানা ধরনের ফুল-লতাপাতার নকশায় অলঙ্কৃত। মিহরাবের অবতল প্যানেলসমূহের উপরিভাগ কাল্পনিক দ্রাক্ষালতা ও থোকা থোকা আঙ্গুরের নকশায় শোভিত। খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোনাকার ভূমি পদ্ম নকশায় সজ্জিত (চিত্র নং-৩৫)। এ মসজিদের সামগ্রিক অলঙ্করণ সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রস্তর খোদাই করে ফুল-লতাপাতা, জ্যামিতিক রেখা ও বিভিন্ন ধরনের নকশা এ মসজিদের সৌন্দর্য বর্ধনে সহায়তা করেছে।

বাংলার মোগল স্থাপত্যকীর্তি :

১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে রাজমহলের যুদ্ধে দাউদ খান কররানীর পরাজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মোগল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক পট পরিবর্তনেব পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপত্যিক নির্মাণশৈলী ও আকৃতি-প্রকৃতিতে এক নতুন মাত্রার সংযোজন ঘটে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সুলতানি আমলে প্রতিষ্ঠিত স্থাপত্যিক রীতিনীতি, কলাকৌশল রাতারাতি সম্পূর্ণরূপে নিঃশেষিত হয়ে যায় নি। বরং কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংযোজনের মাধ্যমে এটি আরো পরিপক্কতা অর্জন করে। বলা বাহুল্য সুলতানি আমলে নির্মিত দেশজ প্রভাবে প্রভাবান্বিত স্থাপত্যকলার নির্মাণশৈলী ও আলঙ্কারিক রীতিনীতি মোগলদের নিকট সম্পূর্ণরূপে গ্রহণযোগ্য না হলেও কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য বাংলার প্রাথমিক মোগল স্থাপত্যে পরিদৃষ্ট হয়। এ কথা স্বীকার্য যে সামগ্রিকভাবে বাংলার মোগল স্থাপত্যের নির্মাণ পরিকল্পনা, গঠনশৈলী ও আলঙ্কারিক পদ্ধতির পরিবর্তন ক্রমান্বয়ে চলতে থাকে যার বহিঃপ্রকাশ ইতোমধ্যেই ভারতের কেন্দ্রীয় মোগল স্থাপত্যে দৃষ্ট হয়। দিল্লির মোগল স্থাপত্যের অনুকরণে নির্মিত বাংলার মোগল স্থাপত্যধারা বা রীতি-কৌশল নান্দনিক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ ঘটতে থাকে। বিশ্ব স্থাপত্য ইতিহাসে এক বিশেষ স্থান দখল করে নিয়েছে।

খেরুয়া মসজিদ :

বগুড়া জেলার শেরপুর থানা সদর থেকে প্রায় ১.৬২ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে ঐতিহাসিক এ মসজিদটি অবস্থিত। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর অধিদপ্তর কর্তৃক মসজিদটি সংরক্ষিত। এটি প্রাথমিক মোগল যুগের এক অনন্য স্থাপত্যকীর্তি। মসজিদটি ৯৮৯ হি. মোতাবেক ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে মীর্জা মুরাদ খান কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।[২৯]

ইষ্টক নির্মিত এ মসজিদটি আয়তাকার পবিসবে বচিত। এব পবিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৭.৭০ মি. (৫৮ ফুট) এবং প্রস্থে ৭.৬৫ মি. (২৫ ফুট)। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য এর সম্মুখ দেয়ালে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে (ভূমি নকশা-২০)। বাংলার মোগল স্থাপত্যের চিরাচরিত রীতি অনুযায়ী মধ্যবর্তী খিলানপথটি পার্শ্ববর্তী খিলানপথ অপেক্ষা কিছুটা বড়। অনুরূপভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান। এ প্রবেশপথগুলো আবার আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে সন্নিবেশিত এবং সম্মুখভাগের কেন্দ্রীয় খিলানপথের উভয় পার্শ্বে দুটি করে আয়তাকার প্যানেল নকশা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা ছাড়া খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোনাকার ভূমি গোলাপ সদৃশ নকশায় অলঙ্কৃত। পূর্ব দিকের খিলানপথ বরাবর কিবলা দেয়ালের অভ্যন্তরভাগে খাঁজ খিলানযুক্ত তিনটি অর্ধবৃত্তাকৃতির মিহরাব সন্নিবেশিত এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাব দুটি অপেক্ষা কিছুটা

ভূমি নকশা নং-২০ : খেরুয়া মসজিদ
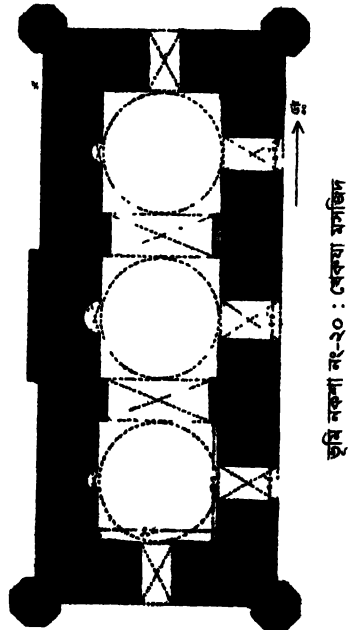
বড় ও পিছন দিকে উদ্‌গত। মিহরাবের খিলানের ত্রিকোনাকার ভূমি গোলাপ ও ফুলের নকশায় সজ্জিত। এর উপরিভাগ বদ্ধ মার্লন নকশায় অলঙ্কৃত।

মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগ দুটি খিলান দ্বারা তিনটি সমবর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত এবং খিলানগুলো বৃহদাকৃতির ইষ্টক নির্মিত স্তম্ভ থেকে উত্থিত। নামাজগৃহের আচ্ছাদন হিসেবে প্রতিটি 'বে'-বর্গের উপর একটি করে গগন সদৃশ গম্বুজ সংস্থাপিত এবং গম্বুজের অভ্যন্তরভাগের উৎক্ষেপণ বিন্দুতে সারিবদ্ধ মার্লন নকশায় সজ্জিত। গম্বুজের ভার আড়াআড়ি খিলানশ্রেণী, প্রবেশপথ ও মিহরাবের খিলানের উপর প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজের নিম্নাংশের ফাঁকা স্থানগুলো সুন্দর বাংলা পান্দানতিফ্ পদ্ধতিতে ভরাটকৃত। মসজিদের চারকোনায় চারটি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ সংযোজিত; যেগুলো ব্যান্ড নকশায় সজ্জিত এবং ছাদ বরাবর উত্থিত। মসজিদের কারনিস বক্রাকার এবং প্রবেশপথের স্থলে বিযুক্ত আনুভূমিক মোল্ডেড ব্যান্ড মসজিদের বহির্গাত্রকে মোটামুটি দুটি অংশে বিভক্ত করেছে (চিত্র নং-৩৬)। এর কারনিসের নিম্নভাগে একসারি ক্ষুদ্র প্যানেল নকশার অলঙ্করণ পরিদৃষ্ট হয়।

মোগল আমলে নির্মিত এ মসজিদটি বাংলার স্থাপত্যের এক অনন্য উদাহরণ। যদিও এটি একটি মোগল স্থাপত্যকীর্তি তথাপি এর কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য যেমন- টেরাকোটার অলঙ্করণ, বক্রাকার কারনিস, দ্বিকেন্দ্রিক কৌণিক খিলান, ছাদ পর্যন্ত উত্থিত অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ প্রভৃতি সুলতানি স্থাপত্যরীতির চলমান ধারারই পরিচায়ক। তবে এর এক কক্ষবিশিষ্ট নামাজগৃহটি তিনটি সমবর্গাকার 'বে'-তে বিভক্তকরণ এবং প্রতিটি 'বে'-বর্গের উপর একটি করে গম্বুজ সংস্থাপন মোগল বাংলার স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য রীতি-কৌশল এ মসজিদটি ছিল বাংলার তিন গম্বুজবিশিষ্ট মোগল মসজিদ স্থাপত্যের অনুপ্রেরণাস্বরূপ

আতিয়া মসজিদ :

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল থেকে প্রায় ১০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে লৌহজঙ্গ নদীর তীরে আতিয়া নামক গ্রামে এ মসজিদটি অবস্থিত। ইষ্টক নির্মিত এ মসজিদটি বাংলার মুসলিম স্থাপত্যেও এক আকর্ষণীয় নিদর্শন। একটি শিলালিপির তথ্যানুসারে জানা যায় যে, আতিয়ায় সমাহিত পীর আলী শাহানশাহ বাবা কাশ্মিরী নামক এক সাধক দরবেশের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে জনৈক বায়েজীদ খান পন্নীর পুত্র সাইয়িদ খান পন্নী কর্তৃক এটি ১৬০৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়[৩০]। ১.৮৫ মি. উচ্চতাবিশিষ্ট আবেষ্টনী প্রাচীরঘেরা এ মসজিদের সামগ্রিক পরিমাপ পূর্ব-পশ্চিমে ১৬.৪৫ মি. এবং উত্তর-দক্ষিণে ১০.৮০ মি.।

এ মসজিদের এক কক্ষবিশিষ্ট নামাজগৃহ বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এবং প্রতি বাহুর অভ্যন্তরীণ পরিমিতি ৭.০৫ মি.। নামাজগৃহের পূর্ব দেয়ালে দ্বিকেন্দ্রিক খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি পার্শ্ববর্তী দুটি প্রবেশপথ অপেক্ষা সামান্য বড়। অনুরূপভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও একটি করে প্রবেশপথ বিদ্যমান। তবে উল্লেখ্য যে, এগুলো খিলানযুক্ত নয় বরং খিলানের স্থলে সর্দলের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। নামাজগৃহের পূর্ব দেয়ালের প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালের অভ্যন্তরভাগে তিনটি অর্ধ-বৃত্তাকৃতির মিহরাব সন্নিবেশিত এবং কেন্দ্রীয় মিহরাবটি কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ন্যায় কিছুটা বড় এবং পিছন দিকে উদ্‌গত। নামাজগৃহটি আবার ইষ্টক নির্মিত সুবিশাল গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত এবং গম্বুজ শীর্ষে পদ্ম ও কলসযুক্ত শিরোচূড়া বিদ্যমান। গম্বুজের ভার অর্ধ-অষ্টভূজাকৃতির পিলাস্টার থেকে উত্থিত খিলানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং কোণের ফাঁকা স্থানগুলোতে বাংলা পান্দানতিফ্ পদ্ধতির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এ মসজিদের নামাজগৃহের

সম্মুখে একটি প্রশস্ত বারান্দা সংযোজিত এবং এর পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৭.৬৫ মি. ও প্রস্থে ৩.০৫ মি.। নামাজগৃহের প্রবেশপথ বরাবর এর পূর্ব দে'য়ালে অনুরূপ দ্বিকেন্দ্রিক খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি নামাজগৃহের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ন্যায় কিছুটা বড়। বারান্দার উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান। বারান্দার ছাদ হিসেবে তিনটি অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ বৃত্তাকার পিপার উপর প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজের নিম্নাংশের ফাঁকা স্থানগুলো বাংলা পান্দানতিফ্ পদ্ধতিতে ভরাটকৃত। মসজিদের চারকোনায় সংযোজিত অষ্টভুজাকৃতির কোণ বুরুজগুলো বপ্র ছেড়ে উপরে উত্থিত হয়ে নিশ্ছিদ্র ছত্রীতে সমাপ্ত। এদের শীর্ষদেশেও পদ্ম ও কলসযুক্ত শিবোচূড়া বিদ্যমান (চিত্র নং-৩৭)।

মসজিদের পূর্ব দিকের কারনিস বক্রাকার; অথচ উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের কারনিস সমান্তরাল। সুতরাং দুএকটি বৈশিষ্ট্য বাদে আলোচ্য মসজিদের ভূমি নকশা ও গঠনশৈলীর দিক থেকে গৌড়ের খানিয়াদীঘি মসজিদ (১৪৩৫-৮৭ খ্রি.), চামকাঠি মসজিদ (১৪৭৫ খ্রি.), লট্টন মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রি.), বারোবাজারের সিংদহ আউলিয়া মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী), গোড়ার মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী), দিনাজপুরের গোপালগঞ্জ মসজিদ (১৪৬০ খ্রি.), সুরা মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দী) প্রভৃতি ইমারতের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে উল্লেখ্য যে উক্ত মসজিদসমূহের কোনাস্থিত বুরুজের সংখ্যা ছয়টি এবং তা বপ্র বরাবর উত্থিত ও ছত্রীবিহীন। কিন্তু আতিয়া মসজিদের কোণ বুরুজ চারটি এবং এগুলো বপ্র থেকে বেশ উপরে উত্থিত এবং শিরাল নিরেট ছত্রী দ্বারা পরিবৃত। তা ছাড়া এসব মসজিদের কারনিস বাংলার কুঁড়েঘরের অনুকরণে বক্র হলেও আতিয়া মসজিদের কেবলমাত্র পূর্ব দিকের কারনিস বক্রাকার; অপরাপর তিনদিকের কারনিস ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল যা বাংলার মোগল স্থাপত্যের একটি চিরাচরিত বৈশিষ্ট্য।

মোগল আমলে নির্মিত এ মসজিদের স্থাপত্যিক ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এ মসজিদের ভূমি নকশা ও নির্মাণশৈলীতে প্রাক-মোগল ও মোগল স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে, যেমন—বপ্র ছেড়ে উত্থিত কোণ বুরুজ, কোণ বুরুজে ছত্রী স্থাপন, পদ্ম ও কলসযুক্ত শিরোচূড়ার সংযোজন, বদ্ধ মার্লন নকশাযুক্ত সমান্তরাল কারনিস, পিপার উপর গম্বুজ স্থাপন, পলেস্তারার ব্যবহার প্রভৃতি মোগল স্থাপত্যের কতকগুলো চিহ্নিত বৈশিষ্ট্য। পক্ষান্তরে এক গম্বুজবিশিষ্ট নামাজগৃহ এবং এর সম্মুখে বারান্দার সংযোজন ও পোড়ামাটির ফলক নকশার ব্যবহার প্রভৃতি সুলতানি বাংলার স্থাপত্যে ব্যাপক জনপ্রিয় ছিল। সুতরাং মসজিদটিকে প্রাক-মোগল ও মোগল স্থাপত্যরীতির সংমিশ্রণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ সমন্বয় হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

ফতেহ খানের সমাধিসৌধ :

বাংলা স্থাপত্য ইতিহাসে ঐতিহ্যবাহী দু চালার কুঁড়েঘরের অনুরূপে বা সাদৃশ্য যে পাকা নির্মাণে কাজের বিকাশ ঘটেছিল তার কালজয়ী নিদর্শক ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে গৌড়ে ফতেহ খানের সমাধির উপর নির্মিত সৌধ যার আর কোনো প্রতিভূ অন্য কোনোখানে দৃষ্টিগোচর হয় না। এর প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে বাংলার দোচালা বংশ-ঘরের উপকরণে নির্মাণের আবহমানকালে প্রযুক্তির সার্থক প্রয়োগ।[৩১] নির্মাণ উপকরণ ও সামগ্রীর পরিবর্তনের সাথে সাথে নির্মাণ কৌশলের পরিবর্তন ঘটে যায়, অথচ এখানে বাঁশ ও খড় উপকরণের পরিবর্তন হওয়ার পরও স্থপতিরা বাঁশের ও খড়ের স্থলে একই প্রযুক্তিতে ইট ও চুন-সুরকির দ্বারা

একটা সমাধিকে সৌধরূপ দেন ফতেহ্ খানের কবরের উপর। কেবলমাত্র এ বৈশিষ্ট্যের জন্য বাংলার স্থাপত্যের একটা স্থায়ী আমল ধরে রয়েছে যা বাংলার স্থাপত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠত্ব (চিত্র নং- ৩৫)।

তাহ্খানা কমপ্লেক্স :

গৌড়ের ছোটসোনা মসজিদ হতে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রায় আধা কিলোমিটার দূরে এ ইমারত কমপ্লেক্স অবস্থিত। ঐতিহাসিক বিবরণী মতে সুবাদার শাহ্ শুজার শাসনামলে (১৬৩৯-১৬৬০ খ্রি.) এটি নির্মিত। মুন্সী এলাহী বকশ্ কর্তৃক লিখিত 'খুরশীদ জাহান নামা'র ভাষ্যানুসারে রাজমহল হতে শাহ্ শুজা তার পীর (ধর্মীয় গুরু) শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ ওয়ালীর সান্নিধ্য লাভের জন্য এখানে এসে এ ইমারতে মাঝে মধ্যে অবস্থান করতেন। এখানে একটি প্রাসাদ, মসজিদ ও শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ ওয়ালীব সমাধি বিদ্যমান (ভূমি নকশা নং-২১)। আযতাকাব নকশা পবিকল্পনায নির্মিত দ্বিতলাকৃতি বিশিষ্ট এ ইমাবতটি একটি বৃহদাকাবেব
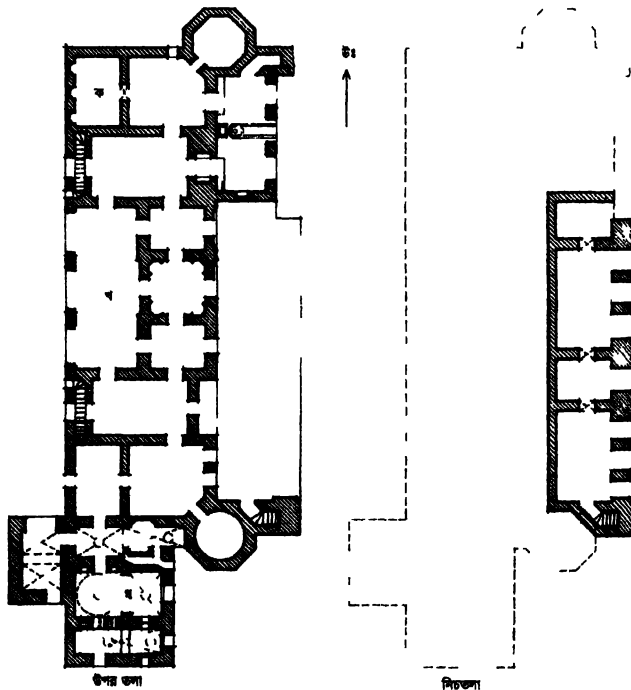
ভূমি নকশা নং-২১ · তাহ্খানা কমপ্লেক্স

দিঘির পশ্চিমপাড় ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে। দিঘির পূর্বপাড় থেকে এটিকে লক্ষ করলে অতি কমনীয় স্থাপত্য হিসেবে গোচরীভূত হয়। নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইটের প্রাধান্য রয়েছে; তবে কিছু কিছু স্থানে প্রস্তরের সামান্য ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। ইমারতে সর্দল ও ছাদ নির্মাণে কাঠের কড়ি বা বর্গা ব্যবহৃত হয়েছে।

উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত এ ইমারতের বাইরের দৈর্ঘ্য ৩১.৭০ মি. × ১০.৩০ মি.। দ্বিতলাকার এ ইমারতটির নিচতলায় চারটি আয়তাকার কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলোর ছাদ চৌচালাকৃতির স্বল্প উচ্চ ভল্ট দ্বারা আবৃত (বর্তমানে ছাদ ধসে পড়েছে)। কক্ষগুলো চতুর্কেন্দ্রিক খিলানের দ্বারা দিঘি অভিমুখে উন্মুক্ত। এগুলো শীতলকক্ষ (frigidarium) হিসেবে পরিচিত। প্রতিটি কক্ষ বিভাজন প্রাকারের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত খিলান পথের দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে ছিল সংযুক্ত। এ কক্ষগুলোর ছাদ দ্বিতীয় তলার বারান্দা হিসেবে ব্যবহৃত হত। এ বারান্দা বা উন্মুক্ত চত্বরের দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় নির্মিত সোপান পথে নিচ তলায় গমনাগমন করা যেত।

ইমারতের দ্বিতীয় তলা প্রধানত তিনটি অংশে বিভক্ত-(১) উত্তরাংশে মসজিদ বা এবাদতখানা, (২) মধ্যবর্তী স্থানে হলঘর ও আবাসন প্রকোষ্ঠ এবং (৩) দক্ষিণাংশে স্নানাগার[৩২]। ইমারতের উত্তর-পশ্চিম কোণের কক্ষটি মসজিদ বা এবাদতখানার বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ। আয়তাকার এ কক্ষটির পশ্চিম দেয়ালের তিনটি অবতল মিহ্‌রাবই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। খুব সম্ভব এটি জানানাদের এবাদত কক্ষ অথবা সুবাদারের ব্যক্তিগত প্রার্থনা কক্ষ রূপে নির্মিত হয়েছিল। কারণ এ এবাদতখানার অতি নিকটেই রয়েছে শাহ নিয়ামত উল্লাহ্ ওয়ালীর মসজিদ। এ ক্ষুদ্র মসজিদের পলস্তারাকৃত দেয়ালগাত্রে নির্মিত হয়েছে কুলঙ্গি, যা সম্পূর্ণ ইমারতগাত্রেরই একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একটি মাত্র প্রবেশপথের সাহায্যে এ কক্ষের অভ্যন্তরে গমনাগমন করা যায়। এ পথটি চতুর্কেন্দ্রিক খাঁজ খিলান দ্বারা শোভিত। নামাজঘরের সামনেই রয়েছে একটি ক্ষুদ্র উন্মুক্ত সাহন। সাহনের উত্তর-পূর্ব কোনার বুরুজটি শূন্যগর্ভবিশিষ্ট। অষ্টভুজাকার ভল্টেড ছাদে আবৃত এর কোনো গবাক্ষ নেই; শুধুমাত্র মসজিদ সাহন থেকে একটি ক্ষুদ্রাকৃতির পথের দ্বারা এর অন্ধকারাচ্ছন্ন অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। খুব সম্ভব এ কক্ষটি খাজাঞ্চিখানা বা কোষাগার হিসেবে ব্যবহৃত হত। ইসলামের প্রাথমিক যুগের মসজিদ স্থাপত্যের সঙ্গে বায়ত-উল-মাল বা কোষাগারের দৃষ্টান্ত রয়েছে।

হলঘর ও আবাসিক প্রকোষ্ঠরূপে পরিচিত ইমারতের মধ্যবর্তী অংশে ৮টি কক্ষ রয়েছে। আয়তাকার বৃহৎ কক্ষটি হলঘর রূপে চিহ্নিত। বর্তমানে এর ছাদ ধসে পড়েছে। অবশিষ্ট কক্ষগুলোর ছাদ কাঠের কড়ি বা বর্গার সাহায্যে ট্রাবিয়েট পদ্ধতিতে তৈরি। খিলানপথের সাহায্যে প্রতিটি কক্ষ পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত। সর্দল ও ছাদ নির্মাণে কাঠের ব্যবহার পারসিক নির্মাণ রীতির কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

তাহখানা ইমারতের সব দক্ষিণাংশ বাথ কমপ্লেক্স বা স্নানাগার। দুটি ছোটবড়ো কক্ষের সমন্বয়ে এ অংশ গঠিত। কক্ষগুলোর ছাদ গম্বুজ, অর্ধ-গম্বুজ, চৌচালা ভল্ট এবং অর্ধ-পিপাকৃতির ভল্ট দ্বারা আচ্ছাদিত। উষ্ণ ও শীতল জলাধারসহ পাকা চৌবাচ্চা এ অংশের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য স্নানাগার সংলগ্ন অষ্টভুজাকার (অভ্যন্তরভাগ গোলায়িত) বুরুজ সদৃশ অবকাঠামোটি প্রধান জল-ভাণ্ডারের ভূমিকা পালন করত। শুধুমাত্র ইমারতের উত্তর-পূর্ব কোনার বুরুজের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার্থে এর বাহ্যিক কাঠামো অষ্টভুজাকারে নির্মিত। উষ্ণ ও শীতল জলাধারগুলো হতে পাকা চৌবাচ্চায় পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের জন্য মৃন্ময় পাইপ বসানো ছিল। তাহখানার ছাদ বেশ উচ্চতাবিশিষ্ট বপ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। হলঘরের পশ্চিম দেয়ালের উভয় কোনায় প্রাকার অভ্যন্তরে নির্মিত দুটি সোপান পথে ছাদে গমনাগমন করা যায়।

ইমারতের বহির্গাত্র আনুভূমিক ও উলম্ব প্যানেলে সজ্জিত। ইমারতের গম্বুজ, অর্ধ-গম্বুজ ও অষ্টভুজাকার কক্ষগুলোর ছাদতল স্ট্যাকো দ্বারা জালাকার নকশায় অলঙ্কৃত। ক্ষুদ্র

মসজিদ অর্ধ-গম্বুজাকার মিহরাব কুলঙ্গি ও অষ্টভুজাকৃতির কক্ষগুলোর দেয়ালগাত্রে নির্মিত কুলঙ্গি মুকার্নাস নকশায় অতি হৃদয়গ্রাহীভাবে অলঙ্কৃত।

তাহখানা ও লালবাগ দুর্গস্থ প্রাসাদ ব্যতীত বাংলার মুসলিম স্থাপত্যে প্রাসাদ স্থাপত্যের নজির বিরল। তাহখানা ইমারতটির নকশা পরিকল্পনা, নির্মাণ রীতি-কৌশল ও আলঙ্কারিক পদ্ধতি দূর প্রদেশে মোগল নির্মাতাদের রুচি ও বৈভবের সাক্ষ্য বহন করছে (চিত্র নং-৩৯)।

শাহ নিয়ামত উল্লাহ্ ওয়ালীর মসজিদ :

তাহখানা ইমারতের উত্তর-পশ্চিম দিকে সামান্য দূরে এ মসজিদ অবস্থিত। ১৬৩৯-৬০ খ্রিস্টাব্দ সময়ের মধ্যে এটি নির্মিত৩৩।

আয়তাকার পরিসরে নির্মিত এ মসজিদটি অন্যান্য মোগল মসজিদের ন্যায় তিন গম্বুজবিশিষ্ট। এক মাইল বিশিষ্ট এ নামাজঘরটি দুটি প্রশস্ত আড়াখিলানের দ্বারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে তিনটি 'বে'-বর্গের রূপ ধারণ করেছে। মধ্যবর্তী 'বে' বর্গটি পার্শ্ববর্তী 'বে' বর্গের চেয়ে সামান্য বড়। প্রতিটি 'বে'-বর্গ একটি করে গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত। গম্বুজ নির্মাণে বাংলা পান্দানতিফ্ পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। 'বে'-বর্গাকারে কোনাগুলো বাংলা পান্দানতিফে ভরাট করত বর্তুলাকার ড্রামে রূপান্তরিত করেছে। গম্বুজ ছাদের ভার এ বৃত্তাকার ড্রামই বহন করছে। গম্বুজের চূড়া প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ও তদুপরি কলসাকৃতির শিরোচূড়া দ্বারা শোভিত। (চিত্র নং-৪০)

মসজিদের ফাসাদে তিনটি প্রবেশপথ চতুর্কেন্দ্রিক খিলান দ্বারা সাহনের দিকে উন্মুক্ত। ফাসাদের মধ্যবর্তী স্থান অভিক্ষিপ্ত অবস্থায় (স্বল্প উদ্‌গত ঈওয়ান টাইপ) নির্মিত এবং এ উদ্‌গত অংশের উভয় কোনায় দুটি খাঁজকাটা ট্যারেট দ্বারা শোভিত। ট্যারেটগুলো বুলন্দ দরওয়াজার ট্যারেটের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত। পরবর্তীকালে বিবি পরীর সমাধিসৌধেও এ জাতীয় ট্যারেট নির্মিত হয়েছে। মোগল মসজিদ ও সমাধি স্থাপত্যের উদ্‌গত অংশের উভয় কোনায় এ জাতীয় বৈশিষ্ট্য অহরহ পরিদৃষ্ট হয়।

মসজিদের প্রবেশপথগুলোর বিপরীত দিকে অর্থাৎ কিবলা প্রাকারে তিনটি মিহরাব রয়েছে; কেন্দ্রীয় মিহরাবটি ষড়ভুজাকার হলেও অন্য দুটি আয়তাকার। মসজিদের চারকোনায় চারটি অষ্টভুজাকার বুরুজ বপ্র অতিক্রম করে উপরে উত্থিত। এগুলো নিরেট গম্বুজ দ্বারা আবৃত এবং কলসাকৃতির ফিনিয়ালে শোভিত। মসজিদের ছাদ স্বল্পোচ্চ বপ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। বপ্রের বহির্গাত্র বদ্ধ মার্লন নকশায় অলঙ্কৃত। নামাজঘরের সম্মুখের সাহনটি একটি অনুচ্চ প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত। প্রাকারের বহির্গাত্র চতুর্কেন্দ্রিক খিলান নকশালঙ্কারে শোভিত।

মসজিদ প্রাকার ও ফাসাদের অভ্যন্তরীণ ও বহির্গাত্রে কুলঙ্গি নির্মাণ, আনুভূমিক ও উল্লম্ব প্যানেল নকশায় বিভক্তিকরণ, মিহরাব ও কুলঙ্গিতে মুকার্নাস ডিজাইন, বপ্রে বদ্ধ মার্লন পান্দানতিফ্ এবং ঘালিবকারি ডিজাইন প্রধান অলঙ্করণ মোতিফ্ হিসেবে চিহ্নিত।

শাহ নিয়ামত উল্লাহ্ ওয়ালীর সমাধি :

তাহখানা হতে ৩০/৩৫ মি. উত্তরে এ সমাধিসৌধ অবস্থিত। প্রায় বর্গাকৃতি (২৪.৪০ মি × ২২.৮০ মি.) একটি স্বল্পোচ্চ মঞ্চের মধ্যবর্তী স্থানে এটি নির্মিত। নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ইট ও প্রস্তর উভয় উপাদানই ব্যবহৃত হয়েছে।

বর্গাকার নকশা পরিকল্পনায় এটি নির্মিত এবং অভ্যন্তরীণ সমাধি কক্ষের চতুর্দিক প্রশস্ত বারান্দায় পরিবেষ্টিত। মূল কক্ষের প্রতি বাহু ৭.৫০ মি. এবং বারান্দাযুক্ত ইমারতের প্রতি বাহু ১৬.২০ মি.। মূল কক্ষটি একটি সুউচ্চ গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত। গম্বুজ নির্মাণে স্কুইন্স পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। তবে স্কুইন্সের কোনাগুলো ভরাটের জন্য বাংলা পান্দানতিফ্ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। প্রতি বছর ছোটখাটো মেরামত, পলস্তারা ও চুনকামকরণের ফলে স্কুইন্স ও পান্দানতিফের সম্মুখভাগ আস্তরণের অন্তরালে ঢাকা পড়েছে।

মূল সমাধি কক্ষের পূর্ব, পশ্চিম এবং দক্ষিণ পরিবেষ্টন প্রাকারের মধ্যবর্তী স্থানে একটি করে মোট তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। অতি নিখুঁত ও মসৃণভাবে ব্যাসল্ট প্রস্তরের দ্বারা দরজার ফ্রেম বা চৌকাঠ তৈরি। উত্তর প্রাকারের মধ্যবর্তী স্থানে একটি পঞ্চভুজাকার বৃহদাকৃতির মিহরাব বা কুলঙ্গি রয়েছে। এটি অর্ধ-গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত। গম্বুজের অবতলভাগ মুকার্নাস অলঙ্করণে শোভিত। এ কক্ষেই চিরনিদ্রায় শায়িত রয়েছেন শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ ওয়ালী। কবর ফলকটি সামান্য উঁচু করে নির্মিত।

সমাধি কক্ষের বারান্দায় প্রতি বাহুতে তিনটি করে মোট ১২টি খিলানপথ রয়েছে। আর এ জন্যই হয়তো মি. কানিংহাম এ সমাধিকে 'বার দুয়ারী' বলে আখ্যায়িত করেছেন। বারান্দার উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব এবং পশ্চিমের কক্ষগুলোর ছাদতল সমতল কিন্তু পার্শ্বগুলো নলাকৃতির দেখতে অনেকটা চৌচালা ভল্টের মতো মনে হয়; কিন্তু চারটি কোনাকক্ষ গম্বুজাকৃতির অবতল ছাদে আবৃত।

ইমারতের চারকোনায় চারটি অষ্টভুজাকার বুরুজ রয়েছে। বুরুজগুলো ছাদ পাঁচিল অতিক্রম করে উপরে উঠেছে এবং শিরাল গম্বুজাকৃতির ছত্রী দ্বারা এগুলো শোভিত। (চিত্র নং-৪১)

ইমাবতের কোনো স্থানে শিলালিপি না থাকায় নির্দিষ্ট কোনো নির্মাণ তারিখ বলা মুশকিল। তবে নির্মাণ উপকরণ, ইমারতের গঠন ও নির্মাণশৈলী পর্যবেক্ষণে এটি মসজিদ ও তাহখানার সমসাময়িককালে নির্মিত বলাই যুক্তি সঙ্গত।

ইরানই মুকার্ণাস অলঙ্করণ পদ্ধতির উপ্ত স্থান। এখানেই এ অলঙ্করণ পদ্ধতির উৎপত্তি হয়ে এবং ক্রমান্বয়ে তা বিকশিত হয়ে সাফাভী শাসনামলে উন্নতির চরম শিখরে উপনীত হয়। পরবর্তীকালে তুরস্ক, মিসর এবং আল-মাগারিব পর্যন্ত এ পদ্ধতি বিস্তার লাভ করে এবং ইসলামিক স্থাপত্যে চর্চিত হয়। ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে বিশেষত মামলুক, খলজী, লোদী এবং সূরীদের ইমারতেও এ অলঙ্করণ পদ্ধতি প্রয়োগ হতে দেখা যায়। কিন্তু মোগল স্থাপত্যে এ পদ্ধতিটি উন্নতির চরম শিখরে পৌছে। ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরওয়াজা, হাকিমের বাথ, আগ্রা ও দিল্লি দুর্গে সম্রাট শাহজাহানের বাথ এবং পরবর্তী সময়ে সফদর জঙ্গ-এর সমাধিসৌধে (১৭৫০ খ্রি.) মুকার্নাস অলঙ্করণ অত্যন্ত নান্দনিক চেহারায় বাস্তবায়িত হয়েছে। বাংলার মোগল স্থাপত্যেও এর প্রভাব পরিদৃষ্ট হয়। তাহখানা, নিয়ামত উল্লাহ্ ওয়ালীর মসজিদ ও সমাধিসৌধ , ঢাকার লালবাগ দুর্গের প্রধান তোরণে এবং অন্যান্য মোগল ইমারতেও এ মুকার্নাস অলঙ্করণ পদ্ধতিটি কমবেশি লক্ষ করা যায়।

লালবাগ দুর্গ কমপ্লেক্স :

মোগল আমলে নির্মিত বাংলার বিদ্যমান ইমারতগুলোর মধ্যে ঢাকা নগরীর অসংখ্য স্থাপত্যকীর্তি কালের সাক্ষী হয়ে কোনোটি অক্ষত আবার কোনোটি জরাজীর্ণ ভগ্নদশাগ্রস্ত অবস্থায় টিকে আছে। এ স্থাপত্যকীর্তিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল লালবাগ দুর্গ বা

আওরঙ্গবাদ কিল্লা এবং এর অভ্যন্তরে অবস্থিত দরবার হল, লালবাগ মসজিদ ও পরী বিবির সমাধিসৌধ (ভূমি নকশা নং-২২)। এটি একটি প্রাসাদ দুর্গ। স্থাপত্য সৌন্দর্য ও

ভূমি নকশা নং-২২ লালবাগ দুর্গ কমপ্লেক্স
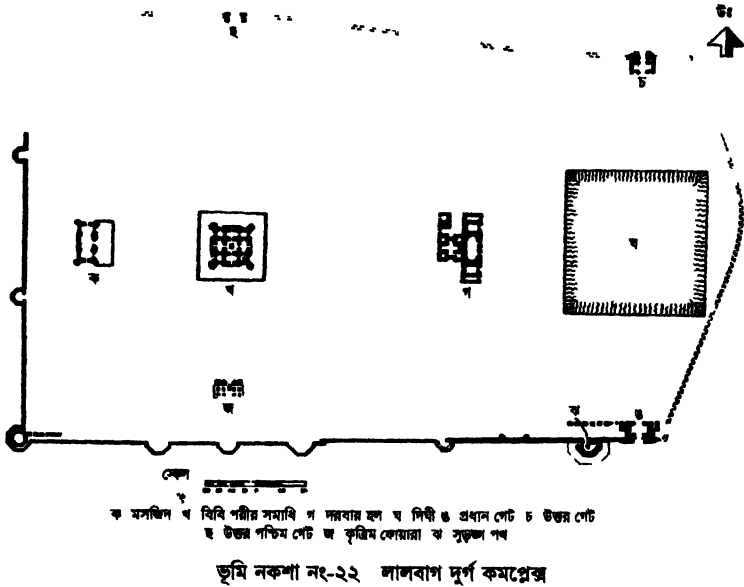
নির্মাণশৈলীব বিচাবে এটি নিঃসন্দেহে মোগল স্থাপত্যের এক অনুপম দৃষ্টান্ত। বুড়িগঙ্গা নদীব উত্তর তীরে অবস্থিত এ দুর্গটির নির্মাণ কার্য সুবাদাব মোহাম্মদ আযম শাহ বাহাদুব কর্তৃক ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয। পরিকল্পনাগত দিক থেকে এটি আয়তাকাব পবিসবে নির্মিত এবং সুদৃঢ় দ্বিতল প্রাচীর বেষ্টিত। আয়তাকাব পবিসবে নির্মিত হলেও এব সকল বাহু সমান নয। উত্তর বাহু ৩২৯.৮০ মি., দক্ষিণ বাহু ৩২২.৭৫ মি., পশ্চিম বাহু ২৩৯.২৫ মি. এবং পূর্ব বাহু ২০০ মি.।

সাম্প্রতিককালে খননের ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে, দুর্গটি পূর্ব দিকে আরো সম্প্রসারিত ছিল। দুর্গের প্রধান তোরণ থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিম কোণ পর্যন্ত একাধিক কক্ষ, কক্ষের ভিত, সুরঙ্গ বা গুপ্তপথ এবং এ এলাকায় মাটিব টিবির উপবে ঝবনা, জলাধার ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। তা ছাড়া দুর্গের অভ্যন্তবে দক্ষিণ প্রাচীর সংলগ্ন এলাকায় একটি পরিকল্পিত মাটির মঞ্চের সন্ধান পাওয়া গেছে। এ মঞ্চের পূর্ব-পশ্চিমে অনেকগুলো ইমারত, উত্তব প্রান্তে জলাধার, ঝরনা এবং মঞ্চেব নিচে কয়েকটি গুপ্ত কুঠবিব ভিত আবিষ্কৃত হয়েছে। মঞ্চেব পাদদেশেও একটি দেয়ালের ভিত উন্মোচিত হয়েছে। দুর্গের প্রধান আকর্ষণ হল এব অভ্যন্তরে পূর্ব-পশ্চিমে একই সারিতে নির্মিত তিন গম্বুজবিশিষ্ট মসজিদ, পরী বিবির সমাধি, হাম্মাম খানা কাম-দববার হল এবং শান বাঁধানো পুকুর। দববার হলটি বর্তমানে জাদুঘবে রূপান্তরিত। অনুরূপভাবে উত্তর-দক্ষিণে একই সারিতে প্রধান ফটক, পুকুর ও উত্তর তোরণ অবস্থিত।

লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তবে দক্ষিণ দেয়ালেব পার্শ্বে দ্বিতল কক্ষবিশিষ্ট সামরিক ছাউনি, পার্শ্বে পশ্চিম দিকে আস্তাবল এবং অসংখ্য আবাসিক কক্ষের সন্ধান পাওয়া গেছে। সুরক্ষিত

এ দুর্গ নগরীর অভ্যন্তরভাগে যে পদস্থ রাজকর্মচারী ও কর্মকর্তাদের আবাসিক ভবনসমূহ বিদ্যমান ছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। কারণ লালবাগ মসজিদের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনা থেকে শুরু করে বুড়িগঙ্গা নদী পর্যন্ত একদা যে ভূগর্ভস্থ পয়ঃনিষ্কাশন প্রণালী ছিল তার কিয়দংশ সাম্প্রতিককালে প্রত্নতাত্ত্বিক খননের ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে। অনন্য এ পয়ঃপ্রণালীর উপরিভাগ ঢালাই করা প্রস্তর খণ্ড দ্বারা আচ্ছাদিত এবং কিয়ৎদূর অন্তর অন্তর গোলাকৃতির নর্দমার দ্বারা ও পানি নিষ্কাশনের জন্য চতুর্দিক থেকে চারটি নালা বিদ্যমান। এগুলো যে নাগরিক জীবনের অতীব প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

প্রধান তোরণ :

লালবাগ দুর্গের সবচেয়ে আকর্ষণীয় স্থাপত্য নিদর্শন দক্ষিণ-পূর্ব তোরণপথ। ত্রিতলাবিশিষ্ট এ তোরণটির উপরিতলার নির্মাণকার্য অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হয়েছিল বলেই মনে হয়। বাংলার মোঘল স্থাপত্যে এরূপ তোরণ দ্বিতীয়টি বিরল (চিত্র নং-৪২)।

আয়তাকৃতির এ তোরণটি পূর্ব-পশ্চিমে ১৮.১২ মি. এবং উত্তর-দক্ষিণে ৯.৭৭ মি.। একখিলান পথবিশিষ্ট এ তোরণটি দূর প্রদেশে মোঘল স্থাপত্যরীতির এক অনন্য নিদর্শন। চতুর্কেন্দ্রিক খিলান দ্বারা এ পথটি উন্মুক্ত। খিলান ফ্রেমটি প্রস্তরে তৈরি এবং উপর অবকাঠামোর ভারবহনে এটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। খিলানপথের উভয়পার্শ্বে খাঁজবিশিষ্ট পিলাস্টার ত্রিতল পর্যন্ত উত্থিত। উভয় পিলাস্টারের পাশেই রয়েছে ঝুলন্ত ব্যালকনি। ব্যালকনিগুলোর আলম্ব হিসেবে অর্ধগম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতলাকৃতির এ ব্যালকনিগুলোর ছাদ শিরাল অর্ধগম্বুজ দ্বারা পরিবৃত। মূল তোরণপথটি অর্ধগম্বুজ দ্বারা আবৃত এবং গম্বুজের অভ্যন্তরভাগে ঘালিবকারি (ghalıbkarı) ডিজাইনে অলঙ্কৃত। ত্রিতলায় গমনাগমনের জন্য উভয়পার্শ্বে দুটি সোপানপথ রয়েছে (বর্তমানে অত্যন্ত জীর্ণশীর্ণ)।

দরবার হল :

দরবার হলটি দিঘির পশ্চিম পার্শ্বে প্রায় ৪০ মি. দূরে অবস্থিত। আয়তাকৃতির দ্বিতলাবিশিষ্ট এ ইমারতটির দৈর্ঘ্য ৩২.৬০ মি. এবং প্রস্থ ৭.৯৫ মি.। এটি প্রায় ০.৩০৪৮ মি. উচ্চ পীঠের উপর নির্মিত। ইমারতটির উপরতলার উভয়পার্শ্ব ৩.০৫ মি. হ্রাসাকারে তৈরি। একসময় উপরতলায় গমনাগমনের জন্য হ্রাসকৃত অংশের কক্ষ দুটিতে পেঁচানো সিঁড়ি ছিল (মিউজিয়ামে রূপান্তরিত করার সময় পেঁচানো সিঁড়ির পরিবর্তে বক্রাকার (dog-leged) সিঁড়ি তৈরি করেছে)।

ইমারতটির নিচতলা তিনটি কক্ষে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় কক্ষটি ৮.১৫×৫.৬০ মি. এবং এটি তিনটি প্রবেশপথের সাহায্যে উন্মুক্ত (বর্তমানে লোহার গ্রিল দ্বারা বন্ধ)। এখানে একসময় কৃত্রিম ফোয়ারার ব্যবস্থা ছিল। উপরের তলাও নিচতলার ন্যায় তিনটি কক্ষে বিভক্ত। কেন্দ্রীয় কক্ষটি দরবার কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হত। উপরতলার ছাদ বাংলা কুঁড়েঘরের ছাদের ন্যায় বক্রাকার এবং কারনিসও ছাদের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বক্রাকারভাবে নির্মিত। ইমারতের ছাঁইচগুলো প্রস্তর বন্ধনীর (stone-brackets) দ্বারা প্রক্ষিপ্তাকারে তৈরি (চিত্র নং-৪৩)।

এ ইমারতটির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল হাম্মাম বা গোসলখানা। নিচতলার কেন্দ্রীয় কক্ষের বিপরীত দিকে (অর্থাৎ পশ্চিম প্রাকার সংলগ্ন) এটি নির্মিত। হাম্মামটি উষ্ণকক্ষ, প্রসাধনীকক্ষ, শৌচাগারকক্ষ এবং অবগাহন চৌবাচ্চার সমন্বয়ে গঠিত। উষ্ণকক্ষের অভ্যন্তরীণ গঠন প্রণালী মাচানের ন্যায়। ইষ্টক নির্মিত খুঁটি বা ঠেক্‌নার উপর এ কক্ষের মেঝেটি প্রতিষ্ঠিত। একসময় মেঝেটি রঙবেরঙের সুন্দর টাইলস্‌ দ্বারা পরিপাটি করে মোড়ানো ছিল (বর্তমানে আধুনিককালের টাইলস্‌ দ্বারা পরিবৃত)। এ কক্ষটির ছাদ স্বল্প উচ্চ গম্বুজে পরিবৃত এবং গম্বুজের অভ্যন্তরভাগ ঘালিবকারি ডিজাইনে অলঙ্কৃত। উত্তর-পশ্চিম কোনায় অবস্থিত একটি চুল্লি (hearth) থেকে মৃন্ময় নলের সাহায্যে ঠাণ্ডা ও উষ্ণ পানি হাম্মামের চৌবাচ্চায় মজুদের ব্যবস্থা ছিল। পরবর্তী সময়ে এ মজুদ চৌবাচ্চা থেকে অবগাহন চৌবাচ্চায় প্রয়োজনমতো ঠাণ্ডা ও উষ্ণ পানির সংমিশ্রণ করানো হত। অনুরূপভাবে পাইপের সাহায্যে গরম বাষ্পও অভ্যন্তরীণ সুবঙ্গে প্রবিষ্ট করিয়ে উষ্ণকক্ষের উষ্ণতা বজায় রাখা হত।

লালবাগ দুর্গ মসজিদ :

নির্মাণশৈলীর দিক থেকে শায়েস্তাখানী স্থাপত্যের অনুকবণে রচিত লালবাগ দুর্গ মসজিদটি দুর্গ অভ্যন্তরে নির্মিত পরী বিবির সমাধিথেকে কয়েক গজ পশ্চিমে অবস্থিত। জনশ্রুতি অনুসারে এ মসজিদটি ১৬৭৮-৭৯ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন বাংলার সুবাদার মোহাম্মদ আযম কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।[৩৪] পরিকল্পনাগত দিক থেকে মসজিদটি আয়তাকার পরিসরে নির্মিত। মসজিদটির বহির্দেয়ালের পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ১৯.৮৫ মি. (৬৫ ফুট) এবং প্রস্থে ৭.০৫ মি. (২৩ ফুট)। এর চারকোনায় চারটি অষ্টভুজাকৃতির বুরুজ কারনিস ও বপ্র ছেড়ে কিয়ৎদূর পর্যন্ত উত্থিত। বুরুজগুলো আবার ব্যান্ড নকশায় অলঙ্কৃত এবং এগুলোর উপরিভাগ ছত্রী ও শীর্ষদণ্ডে সমাপ্ত। এ মসজিদের কারনিস ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল এবং এর নিচ দিয়ে চতুর্দিকে সারিবদ্ধ মার্লন নকশা এর বহির্দৃশ্যের শোভাবর্ধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

মসজিদের পূর্ব দিকে তিনটি প্রবেশপথ বিদ্যমান যার মধ্যবর্তীটি পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা সামান্য বড় এবং সম্মুখ দিকে উদ্‌গত। এ উদ্‌গত অংশেব উভয় পার্শ্বে আবার আলঙ্কারিক সরু ট্যারেট সংযোজিত। অনুরূপভাবে উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও একটি করে প্রবেশপথ বিদ্যমান এবং বর্তমানে এগুলো জানালা হিসেবে ব্যবহৃত। প্রবেশপথের খিলানগুলো চতুর্কেন্দ্রিক পদ্ধতিতে নির্মিত এবং বহু খাঁজ নকশায় সজ্জিত। পূর্ব দিকের প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব সন্নিবেশিত যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পার্শ্ববর্তী মিহরাবগুলো অপেক্ষা বৃহৎ এবং পশ্চাৎভাগে দেয়াল থেকে কিছুটা উদ্‌গত। এ উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বেও আলঙ্কারিক সরু ট্যারেট সংযোজিত।

মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগে দুটি আড়াখিলানের মাধ্যমে যে তিনটি 'বে'-এর সৃষ্টি হয়েছে তার প্রত্যেকটির উপরিভাগে অষ্টভুজাকৃতির পিপার উপর প্রতিষ্ঠিত তিনটি গম্বুজ এ মসজিদের সমগ্র নামাজগৃহের ছাদকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। তিন গম্বুজবিশিষ্ট এ মসজিদের কেন্দ্রীয় গম্বুজ অপেক্ষাকৃত বড় এবং ঠিক একইভাবে কেন্দ্রীয় 'বে'-টি পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা কিছুটা বড়। গম্বুজ ও পিপার ভার আড়াআড়ি খিলান, মিহরাব ও প্রবেশপথের খিলানের উপর প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজের উপরিভাগে পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম পাপড়ির উপর কলস নকশায় অলঙ্কৃত শিরোচূড়া বিদ্যমান। আর নিম্নাংশের কোণের ফাঁকা স্থানগুলো

আচ্ছাদিতকরণের জন্য সুন্দর বাংলা পান্দানতিফ্ পদ্ধতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তা ছাড়া মসজিদের গম্বুজগুলো শিরাল নকশায় বিশেষভাবে অলঙ্কৃত (চিত্র নং-৪৪)। এ ধরনের শিরাল গম্বুজ ৮৩৬ সালে যিয়াদত আল্লাহ্ কর্তৃক পুনঃনির্মিত কায়রাওয়ান মসজিদ, মিসরের আল-হাকিমের মসজিদের মিনার দ্বয়ের (৯৯০-১০০৩ খ্রি.) শিরাল গম্বুজ এবং সমরখন্দের গোর-ই-মীরের (১৪০৪ খ্রি.) কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

বিবি পরীর সমাধি :

বাংলাদেশের মোগল স্থাপত্যশিল্পের মধ্যে লালবাগ দুর্গাভ্যন্তরে বিবি পরীর সমাধি স্থাপত্যশিল্পকলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। হিন্দু-মুসলিম নির্মাণ রীতির সমন্বয়ে যে দুর্লভ স্থাপত্য সৃষ্টি হয়েছে তা বাড়িয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না। আগ্রার তাজমহল গভীর প্রেমের নিদর্শন রূপে যেমন দাঁড়িয়ে আছে, তেমনি অনন্ত স্নেহের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বিবি পরীর সমাধি। সুবাদাব শায়েস্তা খান কর্তৃক এটি ১৬৮৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।

বিবি পরীর সমাধিটি একটি বর্গাকৃতি স্বল্প উচ্চ মঞ্চের উপর অবস্থিত। বর্গাকৃতির বেদিব প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ৩৩.২৫ মি. (১০৯ ফুট ১০ ইঞ্চি)। মঞ্চটি বেলে প্রস্তর ও কৃষ্ণ প্রস্তর দ্বারা আবৃত (অবশ্য স্থান বিশেষের প্রস্তর খণ্ড দুষ্কৃতকারী কর্তৃক অপহৃত হওয়ায় বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব ও জাদুঘর বিভাগ তা কংক্রীটদ্বারা পুনঃ মেরামত করেছে)। মঞ্চের উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিমের উন্মুক্ত স্থানে রয়েছে সমআযতনের তিনটি আয়তাকার জলাধার। জলাধারগুলোর পরিমাপ হচ্ছে ৬.১০ মি. × ৩.৪০ মি. × .৯৫ মি. (২০ ফুট × ১১ ফুট ১০ ইঞ্চি × ৩ ফুট)। প্রতিটি জলাধারে একটি নলের সাহায্যে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা আছে। কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য সৃষ্টি নয়তো মাজার জিয়ারতকারীদের অজুর পানি রাখার জন্য এগুলো নির্মিত হয়েছিল।[৩৫]

উল্লিখিত মঞ্চের মধ্যে বিবি পরীর বর্গাকার সমাধি সৌধটি অবস্থিত। এর প্রতি বাহুব দৈর্ঘ্য ১৮.৬০ মি. (৬০ ফুট ৯ ইঞ্চি) এবং প্রতি কোনায় রয়েছে একটি করে উদ্গত বুরুজ। বুরুজগুলো অন্তঃপ্রবিষ্ট প্যানেলে বিভক্ত এবং নিরেট ছত্রী দ্বারা শোভিত। অষ্টভুজাকৃতির ছত্রীগাত্রে অন্তঃপ্রবিষ্ট রয়েছে বহু খাঁজবিশিষ্ট খিলান।

সমাধি ভবনের প্রতিটি দেয়ালই সমস্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রধান প্রবেশপথ (প্রতি পার্শ্বের) একটি উদ্গত স্থানের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। উদ্গত অংশের উভয় পার্শ্বে রয়েছে খাঁজবিশিষ্ট পিলাস্টার এবং এর অন্তর্বর্তী অংশটি তিনটি আয়তাকার ফ্রেমে বিভক্ত। ফ্রেমটির উল্লম্ব প্যানেলগুলো অন্তঃপ্রবিষ্ট বহু খাঁজ খিলানে অলঙ্কৃত। ফ্রেমের দু কোনা রয়েছে ফুলের অলঙ্করণে শোভিত। অন্য ফ্রেম দুটি সম্পূর্ণ নিরলঙ্কার। প্রধান প্রবেশপথটি এ আয়তাকার ফ্রেমের মধ্যে একটি অর্ধ-গম্বুজের নিচে নির্মিত এবং এটি চতুর্কেন্দ্রিক খিলান দ্বারা উন্মুক্ত। প্রধান প্রবেশপথের দু পার্শ্বে অপেক্ষাকৃত ছোট দুটি প্রবেশপথ অনুরূপভাবে একটি ফ্রেমের মধ্যে অর্ধ-গম্বুজের নিচে নির্মিত। এ দরজাগুলোর উপর সর্দলের ব্যবহার দেশীয় নির্মাণ রীতির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। দরজার চৌকাঠগুলো কৃষ্ণ প্রস্তরের তৈরি এবং এ দরজাগুলোর টেম্পানামে রয়েছে খিলানবিশিষ্ট গবাক্ষ। সমাধি ভবনের দেয়ালের উচ্চতা ৪.৩০ মি. (১৪ ফুট ৩ ইঞ্চি) এবং পুরুত্ব ১.৬০ মি. (৫ ফুট ৬ ইঞ্চি) এবং .৯৫ মি. (৩ ফুট ৬ ইঞ্চি) প্যারাপেট দ্বারা ছাদ রয়েছে পরিবেষ্টিত। তবে উদ্গত অংশে প্যারাপেটসহ দেয়ালের উচ্চতা ৫. ৮৫ মি. (১৯ ফুট ১০ ইঞ্চি)। প্যারাপেট ও দেয়ালের সঙ্গমস্থলে একটি অর্ধ-গোলাকার ব্যান্ড দেয়ালকে করেছে পরিবেষ্টন। (চিত্র নং-৪৫)

অভ্যন্তরীণ দিক থেকে সমাধিটি নয়টি কক্ষে বিভক্ত। চারটি সমআয়তনের প্রবেশ কক্ষ চারটি বর্গাকৃতি কোনা কক্ষ এবং একটি বর্গাকৃতি কেন্দ্রীয় কক্ষ। প্রবেশ কক্ষ চারটি সমস্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রতিটি কক্ষের দেয়ালের গোড়ার দিকে .৯৫ মি. (৩ ফুট ৮ ইঞ্চি) পর্যন্ত শ্বেতমর্মর প্রস্তরে পরিবৃত এবং প্রতি দেয়ালে রয়েছে আটটি কুলঙ্গি ও আটটি অন্তঃপ্রবিষ্ট প্যানেল। কক্ষগুলোর ছাদ আয়তাকার কাঠামোর ছয় স্তরে কর্বেল পদ্ধতিতে তৈরি। কোনার কক্ষ চারটি বর্গাকার। প্রতি কক্ষের পরিমাপ ৩.১০ মি. × ৩.১০ মি. (১০ ফুট ৮ ইঞ্চি × ১০ ফুট ৮ ইঞ্চি)। প্রতিটি কক্ষের দেয়ালগাত্র আটটি করে কুলঙ্গি ও প্যানেল নকশায় অলঙ্কৃত। তবে এ কক্ষগুলোর ছাদ কর্বেল পদ্ধতিতে অষ্টভুজাকৃতির কাঠামোয় তৈরি। কেন্দ্রীয় কক্ষটি ৫.৮০ মি. (১৯ ফুট ৩ ইঞ্চি) বর্গাকৃতি এবং চারদিকে রয়েছে চারটি প্রবেশপথ। একমাত্র দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথ ছাড়া অন্য তিনটি প্রবেশপথ শ্বেতমর্মর প্রস্তরের জালি দ্বারা বন্ধ। প্রবেশপথের চৌকাঠগুলো কৃষ্ণ প্রস্তরের তৈরি। তবে চাইনিজ ক্রস পদ্ধতিতে নির্মিত চন্দন কাঠের দরজাটি চৌকাঠের সঙ্গে সংযুক্ত নয়। বিশেষ উপায়ে উপরে ও নিচে ছিদ্র করে আটকানো রয়েছে কপাটদ্বয়। অভ্যন্তরীণ দিক দিয়ে কক্ষটির কারনিস পর্যন্ত শ্বেতমর্মর প্রস্তরে আবৃত এবং মাঝে মাঝে কৃষ্ণ প্রস্তরের প্যানেল এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে। মেঝেটি নয়টি বর্গাকার ভাগে বিভক্ত এবং তিনটি নকশায় সজ্জিত। কক্ষের মেঝে তারা ও ফুলের অলঙ্করণে শোভিত। কেন্দ্রীয় কক্ষের ছাদ অষ্টভুজাকৃতির কাঠামোর তের স্তরে কর্বেল পদ্ধতিতে তৈরি। সমকালীন স্থাপত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা তথা সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ছাদের উপরে স্থাপিত হয়েছে তাম্রপাতের তৈরি কন্দাকৃতি বিশিষ্ট ৩.০৫ মি. (১০ ফুট) ব্যাসের একটি অপ্রকৃত গম্বুজ (false dome), যার শীর্ষদেশ প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর .৯৫ মি. (৩ ফুট ৬ ইঞ্চি) দৈর্ঘ্যের শিরোচূড়া দ্বারা শোভিত। একসময় গম্বুজটি উজ্জ্বল ধাতব পদার্থে ছিল পরিবৃত। শীর্ষ দণ্ডটি দুটি কলস, তিনটি নটাই ও একটি পদ্মকুঁড়ি দ্বারা অলঙ্কৃত।

কেন্দ্রীয় কক্ষের মধ্যস্থলে বিবি পরীর দেহাবশেষ সমাহিত রয়েছে। শবাধারটির শ্বেত-মর্মরের তিনটি স্তরে নির্মিত। প্রতিটি স্তরের পরিমাপ .০৫ মি. (৯ ইঞ্চি)। স্তরের প্রান্ত ও উল্লম্ব অংশ ফুল এবং কার্টুশ অনুকরণে সজ্জিত। সমাধির কোনা কক্ষে ব্যবহৃত টালির বর্ণনা দিতে গিয়ে কানিংহাম বলেছেন যে আসলে টালিগুলো ছিল গাঢ়নীল, কমলা, সবুজ এবং হলুদ পটের উপর রক্ত বেগুনি।

বিবি পরীর সমাধি ছাড়াও দক্ষিণ-পূর্ব কোনা কক্ষে রয়েছে শামসাদ বেগমের কবর এবং দক্ষিণের উন্মুক্ত মঞ্চে রয়েছে খোদাবন্দা খান ওরফে মীর্জা বাঙ্গালির পৌত্র সরবুলন্দ খাঁনের কবর।

বিবি পরীর সমাধি আলগা অবস্থায় .৯৫ মি. × .৬৫ মি. (৩ ফুট ১০ ইঞ্চি × ২ ফুট) আয়তাকার একটি শিলালিপি রক্ষিত ছিল (বর্তমানে জাদুঘরে সংরক্ষিত)। শিলালিপিটি দুটি উল্লম্ব সারিতে বিভক্ত এবং উভয় সারিই পুনরায় পাঁচটি করে আয়তাংশে খণ্ডিত। উৎকীর্ণ লিপিগুলো ফারসি ভাষায় তুঘ্‌রা পদ্ধতিতে লিখিত। এটি অনুবাদ করলে দাঁড়ায়-

'ধর্মের খুঁটি, ধরার সম্রাট জানাই তোমায় সম্ভাষণ,
সিন্দ-হিন্দ-স্কিথিয়ার উত্তরাধিকারী তোমারে অভিবাদন।
যে বিরাট সাম্রাজ্য তব পূর্বপুরুষ করেছে শাসন,
প্রভুর কৃপায় সেথায় তোমার প্রতিষ্ঠিত আসন।।
যতোই ঢাকো হুরীর জ্যোতি যেমন হবেই বিচ্ছুরিত,

তোমার পূর্ণকর্ম তেমন এ রাজ্য করছে অলঙ্কৃত।।
মহত্ত্ব তোমার উদ্ভাসিত যতই রাখো সঙ্গোপনে,
জ্ঞানী-দরবেশ সবাই (আজ) মুগ্ধ তোমার মহৎ গুণে।।
'অবহেলিত এ প্রাচীন শহর' তোমার ইচ্ছায় পেলোতার,
তোরণ ও হর্মে সেজে বেহেস্তীরূপ পুনর্বার।।'

কাসিদাটি এমন একজন সম্রাটের গুণকীর্তনে পঞ্চমুখ যার পূর্বপুরুষ সিন্দ্-হিন্দ্ ও স্কিথিয়ার ওপর স্বীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করেছিলেন। তবে শেষ চরণে "কাস্তে আয়না বেলাদানহ্ আজ গহ্‌ঙ্গীনে বুদ" অবহেলিত প্রাচীন এ 'শহর' বলতে ঢাকা শহরকেই বোঝান হয়েছে। সম্রাট আওরঙ্গজেবের প্রতিনিধিগণ সম্ভবত এ শহরকে 'আওরঙ্গাবাদ' শহরে (যেমন লালবাগ দুর্গের প্রকৃত নামকরণ ছিল কিল্লা আওরঙ্গাবাদ) রূপান্তরিত করে এর তোরণে উক্ত শিলালিপি স্থাপন করতে প্রয়াসী ছিলেন। কিন্তু সম্রাট জীবনের অধিকাংশ সময় মারাঠাদের বিরুদ্ধে নিয়োজিত থাকায় তাঁর এ অভিপ্রায় বাস্তবে রূপ লাভ করে নি। আর সে কারণেই এ শিলালিপিটি যথাস্থানে স্থাপিত না হয়ে মাজারে আলগা অবস্থায় রয়ে যায়।

মুসলিম স্থাপত্যশিল্পে বর্গাকার সমাধি নির্মাণ পরিকল্পনা দশম শতাব্দীর প্রারম্ভে সূচিত হয়। ইরানীয় স্থাপত্যে কোনায় স্থূল স্তম্ভবিশিষ্ট বর্গাকার সমাধি নির্মাণ পরিকল্পনা শাহ ইসমাইলের সমাধিতে রূপ লাভ করে । ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যশিল্পে বর্গাকার সমাধি নির্মাণ পরিকল্পনার প্রথম সূচনা ইলতুৎমিসের সমাধিসৌধে। মোগল স্থাপত্যশিল্পেও চতুষ্কোণ নির্মাণ রীতি অনুপ্রবেশ করে একে ষোলকলায় উন্নীত করে। হুমায়ুনের সমাধি ও আগ্রার তাজমহল এর উৎকৃষ্ট নিদর্শন। কেন্দ্রীয় স্থাপত্য নির্মাণ রীতি প্রাদেশিক স্থাপত্য নির্মাণ রীতিকেও সম্ভবত প্রভাবিত করেছিল যার ফলে সুদূর বাংলায় বিবি পরীব মাজারে অনুরূপ নির্মাণ পরিকল্পনার পুনরাবৃত্তি হয়।

প্রাথমিক পর্যায়ে চতুর্কেন্দ্রিক সুচালো খিলান ও সর্দলের ব্যবহার ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে গিয়াস উদ্দিনের সমাধিতে দেখা গেলেও তা পববর্তী সময়ে মোগল স্থাপত্যে পূর্ণতা লাভ করে। সম্রাট আকবর ও শাহজাহানের সময় চতুর্কেন্দ্রিক খিলানের বহুল ব্যবহার হয়েছে। তা ছাড়া ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে খাঁজকাটা মিনারের উৎপত্তি স্থাপত্যের জন্মলগ্নেই আড়াই-দিন-কা ঝোপড়া মসজিদ ও কুতুব মিনারে শুরু হয়। বহির্ভারতীয় স্থাপত্যে বিশেষ করে আফগানিস্তান ও ইরানীয় স্থাপত্যে খাঁজবিশিষ্ট পিলাস্টারের ব্যবহার অপ্রতুল নয়। কিন্তু বিবি পরীর মাজারের খাঁজবিশিষ্ট পিলাস্টার সুলতানি আমলে নির্মিত জামালা মসজিদ, কিলা-ই-কোহনা মসজিদ এবং মোগল আমলে নির্মিত বুলন্দ দরজার খাঁজকাটা পিলাস্টারের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত। উপরন্তু তাজমহলের বহির্রাঙ্গনের ফোয়ারাই সম্ভবত বিবি পরীর মাজার নির্মাতাকে কৃত্রিম ফোয়ারা তৈরিতে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সাত গম্বুজ মসজিদ :

ঢাকার মোগল স্থাপত্যের অতি সুপরিচিত কীর্তি সাত গম্বুজ মসজিদটি শায়েস্তা খান কর্তৃক ১৬৮০ খ্রিস্টাব্দে মুহাম্মদপুর এলাকায় নির্মিত।[৩৬] দৃশত মসজিদটি ঢাকার অপরাপর মসজিদ থেকে অনেকটা স্বতন্ত্র রীতিতে নির্মিত এক অনন্য স্থাপত্যকীর্তি। বুড়িগঙ্গা নদীর

উত্তর পার্শ্বে এ মসজিদটি অবস্থিত। আয়তাকৃতির এক অনুচ্চ বেদির পশ্চিম প্রান্তে এটি নির্মিত। বেদিটির পরিমিতি ২৬.৮৫ মি. × ২৫.৬০ মি.। মসজিদটি একটি অনুচ্চ আবেষ্টনী প্রাচীর ঘেরা এবং প্রাচীরের পূর্ব দিকে একটি প্রবেশ তোরণ বিদ্যমান। এ তোরণের উত্তর ও দক্ষিণ দিক হতে সোপান শ্রেণী উত্থিত হয়ে শীর্ষবিন্দুতে মিলিত হয়েছে। এরূপ সিঁড়িপথ দেখে অনুমান করা যায় যে এ তোরণের উপর থেকে মোয়াজ্জিম আজানের মাধ্যমে বিশ্বাসীদেরকে নামাজের আহ্বান জানাতেন। (চিত্র নং-৪৬)

ইষ্টক নির্মিত এবং চুন-সুরকির দ্বারা পলস্তারাকৃত এ মসজিদটি আয়তাকার পরিসরে নির্মিত। এর পরিমাপ উত্তর-দক্ষিণে ১৫.৮৫ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৮.২৫ মি.। নামাজগৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে একটি করে চতুর্কেন্দ্রিক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। পূর্ব দিকের প্রবেশপথের খিলানগুলো দ্বিস্তরবিশিষ্ট যার বহিস্থ খিলান অভ্যন্তরীণ খিলান অপেক্ষা আকার ও আয়তনে সামান্য বড়। খিলানগুলো আবার বহু খাঁজ নকশায় বিশেষভাবে অলঙ্কৃত। পূর্ব দিকের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ পার্শ্ববর্তী প্রবেশপথ অপেক্ষা সামান্য বড় এবং সম্মুখ দিকে উদ্‌গত। এ উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বে আলঙ্কারিক ট্যারেট সংযোজিত এবং ট্যারেটগুলো বপ্র অতিক্রম করে উপরে উত্থিত নিরেট ছত্রীতে সমাপ্ত হয়েছে। এ উদ্‌গত পরিকল্পনা উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথেও দেখা যায় এবং এদের উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ন্যায় আলঙ্কারিক ট্যারেট সংযোজিত। পূর্ব দিকের প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালের অভ্যন্তরভাগে তিনটি সমাকৃতির মিহরাব সন্নিবেশিত। মিহরাবগুলো খাঁজ নকশায় সজ্জিত এবং উভয় পার্শ্বে কুলঙ্গি নকশা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তবে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ন্যায় পশ্চাৎ দিকে উদ্‌গত। এ উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বে আলঙ্কারিক ট্যারেট সংযোজিত। নামাজগৃহের অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয় মিহরাবের উভয় পার্শ্বে তিন ধাপ বিশিষ্ট মিম্বর রয়েছে।

দুটি খিলান দ্বারা এক আইলবিশিষ্ট নামাজগৃহটি তিনটি 'বে'-তে বিভক্ত যার মধ্যে কেন্দ্রীয় 'বে'-টি পার্শ্ববর্তী 'বে' অপেক্ষা কিছুটা বড় এবং নামাজগৃহের আচ্ছাদন হিসেবে প্রতিটি 'বে'-এর উপর সংস্থাপিত হয়েছে একটি করে বাল্বাকৃতির গম্বুজ। কেন্দ্রীয় গম্বুজ পার্শ্ববর্তী গম্বুজ অপেক্ষা কিছুটা বৃহৎ যা উত্তর ভারতীয় মোগল স্থাপত্যরীতি থেকে অনুসৃত। গম্বুজগুলো আবার অষ্টভুজাকৃতির পিপার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পিপার ভার ফাসাদ প্রাকার, কিবলা প্রাকার সংশ্লিষ্ট থাম ও আড়াআড়ি খিলানের উপর প্রতিষ্ঠিত। পিপার নিম্নাংশের ফাঁকা স্থানগুলো ত্রিভুজাকৃতির পান্দানতিফ্ পদ্ধতিতে ভরাটকৃত। স্তরে স্তরে সজ্জিত পান্দানতিফের ইটগুলো এমনভাবে সজ্জিত যা মসজিদের আলঙ্কারিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছে। এ প্রাকারের নির্মাণ কৌশল সুলতানি আমলে গৌড়ে নির্মিত দরসবাড়ী মসজিদ, খানিয়াদিঘি মসজিদ এবং ছোটসোনা মসজিদে দৃষ্ট হয়। গম্বুজের বহির্গাত্রের গোড়াতে বদ্ধ মার্লন পদ্ধতির অলঙ্করণ এর সৌন্দর্য বর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। গম্বুজের শিরোচূড়ায় পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম নকশা যার উপরে কলস ও পদ্মকুঁড়ির অলঙ্করণ বিদ্যমান। একটি অনুচ্চ বপ্র মসজিদের ছাদকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে এবং কারনিস ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল আকারে নির্মিত।

মসজিদের চারকোনায় চারটি অষ্টভুজাকার ও দ্বিতল আকৃতির অবকাঠামোকে প্রায় সকল ঐতিহাসিকই কোণ বুরুজ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। মসজিদের কোনা সংলগ্ন এ বুরুজগুলো অষ্টভুজ পরিকল্পনায় নির্মিত এবং উভয় তলায় প্রবেশের জন্য অক্ষবিন্দুতে চারটি

করে প্রবেশপথ বিদ্যমান। এর প্রতি কোনায় একটি করে সংলগ্ন খুঁটি এবং তলা শেষে একটি করে কারনিস অবস্থিত। এদের উপরিভাগে মূল মসজিদের ন্যায় অষ্টভুজাকার পিপার উপর সংস্থাপিত একটি করে গম্বুজ এবং গম্বুজের শীর্ষবিন্দুতে পদ্ম পাপড়িযুক্ত শীর্ষদণ্ড এবং পিপা পরিবেষ্টন করে রেখেছে বদ্ধ মার্লন নকশা। এ ধরনের দ্বিতল আকৃতির কোণ বুরুজের ব্যবহার ঢাকার হুসাইনী দালান (১৬৪২ খ্রি.), বড় কাটরা (১৬৪৪ খ্রি.), খাজা শাহবাজ মসজিদ (১৬৭৯ খ্রি.) এবং মুসা খান-কি-মসজিদে (সপ্তদশ শতাব্দী) পরিদৃষ্ট হয়। যাহোক উপরিতলার কক্ষগুলোকে আজানের জন্য মিনার হিসেবে এবং নিচ তলার কক্ষগুলো ইমাম, মোয়াজ্জিন এবং খাদেমদের আবাসন কক্ষ হিসেবেও কল্পনা করা যেতে পারে।

ভাঙ্গনী মসজিদ :

রংপুর জেলার মিঠাপুকুর উপজেলার অন্তর্গত উপজেলা সদর থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে ১৫ কি.মি. এবং পায়রাবন্ধ বাজার থেকে ৫ কি.মি. দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ভাঙ্গনী গ্রামে মসজিদটি অবস্থিত। একটি প্রাচীন দিঘির উত্তর পাড়ে অবস্থিত এ মসজিদটি বর্তমানে সংস্কার কার্যের ফলে সম্পূর্ণ সুরক্ষিত অবস্থায় দণ্ডায়মান।[৩৭]
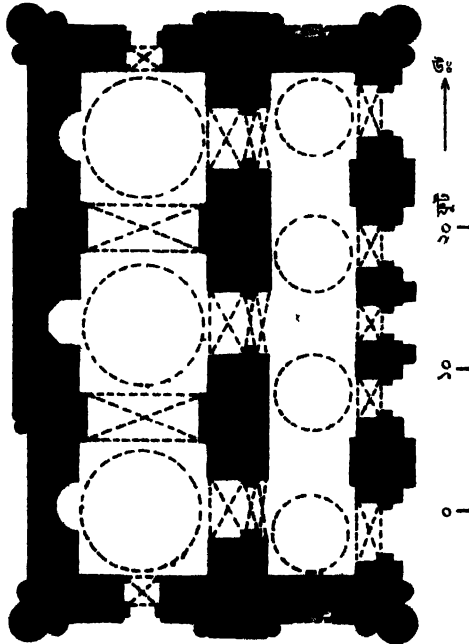
ভূমি নকশা নং-২৩ : ভাঙ্গনী মসজিদ

ইষ্টক নির্মিত ও সিমেন্ট-বালির সংমিশ্রণে পলস্তারাকৃত এ মসজিদটি একটি উঁচু বেদির পশ্চিমাংশে অবস্থিত। এর অনুচ্চ আবেষ্টনী প্রাচীরের পূর্ব দিকে একটি প্রবেশপথ বিদ্যমান যা বর্তমানে সংস্কারের মাধ্যমে নতুনভাবে নির্মিত। মসজিদটি উত্তর-দক্ষিণে ১৪ মি. দীর্ঘ এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৯.২০ মি. প্রস্থ (ভূমি নকশা নং- ২৩)। এ মসজিদের চারকোনায় চারটি

গোলাকৃতির বুরুজ রয়েছে এবং প্রতিটি বুরুজ আবার একটি করে গোলাকৃতির আলঙ্কারিক ট্যারেট দ্বারা বেষ্টিত। কৌণিক এ বুরুজগুলোর মধ্যভাগেও অধীনস্থ ট্যারেট বিদ্যমান। এ বুরুজগুলো ও ট্যারেটসমূহ বপ্রের উপরিভাগ পর্যন্ত উত্থিত এবং কিউপোলা দ্বারা মণ্ডিত। প্রতিটি কিউপোলার শীর্ষবিন্দুতে আবার কলসাকৃতির শিরোচূড়া বিদ্যমান। নামাজগৃহে প্রবেশের জন্য পূর্ব দেয়ালে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দেয়ালে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশপথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণের খিলানপথ দুটি বর্তমানে জানালা হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। নামাজগৃহের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথ এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশপথ সম্মুখদিকে উদ্‌গত এবং এ উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বে গোলায়িত সরু ট্যারেট সংযোজিত। প্রবেশপথগুলোর বিপরীতে কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহ্‌রাব সন্নিবেশিত যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবটি অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির এবং পার্শ্ববর্তী দুটি অর্ধ-বৃত্তাকৃতির। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের ন্যায় কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবও পশ্চাৎ দিকে উদ্‌গত এবং এর উভয় পার্শ্বে দুটি গোলায়িত সরু ট্যারেট সংযোজিত। পার্শ্ববর্তী মিহ্‌রাব দুটির খিলানগর্ভ সাদামাটা হলেও মধ্যবর্তী মিহ্‌রাবটির খিলান বহু খাঁজবিশিষ্ট নকশায় সজ্জিত (চিত্র নং-৪৭)।

মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরীণ পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ১০.৮০ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২.৯০ মি.। নামাজগৃহটি দুটি খিলান দ্বারা তিনটি সমবর্গাকার 'বে'-তে বিভক্ত। প্রতিটি 'বে'- এর উপর প্রতিষ্ঠিত তিনটি গগন সদৃশ গম্বুজ সমগ্র নামাজগৃহকে আচ্ছাদিত করে রেখেছে। গম্বুজগুলোর ভার বহন আবার আড়াআড়ি খিলান, ফাসাদ প্রাকার ও কিবলা প্রাকারের উপর ন্যস্ত। গম্বুজের কোনাগুলো আচ্ছাদিতকরণের জন্য ত্রিভুজাকৃতির পান্দানতিফ্ রীতির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। মসজিদের নামাজগৃহের সম্মুখভাগে সংযোজিত বারান্দাটির পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ১৪ মি. ও প্রস্থে ১.৯৫ মি.। এ বারান্দায় প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকের দেয়ালে যে পাঁচটি প্রবেশপথ রয়েছে সেগুলোর মধ্যে উভয় পার্শ্বের প্রবেশপথ দুটি মধ্যবর্তী তিনটি অপেক্ষা বৃহৎ। বারান্দার ছাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত চারটি অর্ধ-বৃত্তাকৃতির গম্বুজ তিনটি সমান্তরাল খিলানের উপর প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজগুলোর নিম্নভাগের কোনাগুলি ত্রিভুজাকৃতির পান্দানতিফ্ পদ্ধতিতে পূর্ণ। এ মসজিদের সকল গম্বুজের উপরে সূক্ষ্ম পদ্ম নকশা ও কলসযুক্ত শিরোচূড়া এর বহির্দৃশ্যকে সুষমামণ্ডিত করেছে। এ মসজিদের কারনিস ও বপ্র সামগ্রিকভাবে ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল।

অলঙ্করণ : কৌণিক বুরুজগুলো ও আলঙ্কারিক ট্যারেটসমূহের নিম্নাংশ কলস নকশায় সজ্জিত। বপ্রের শিরোভাগ একটানা পাড় নকশায় সমৃদ্ধ। কিন্তু এর গম্বুজগুলোর নিম্নাংশ ফুল, লতা-পাতার অলঙ্করণে সুশোভিত। মসজিদের দেয়ালের আন্তঃ ও বহির্গাত্র একদা সামগ্রিকভাবে পলস্তারার অলঙ্করণে নিখুঁতভাবে সজ্জিত ছিল যার নমুনা উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দরজা ও মিহ্‌রাবগুলোতে অদ্যাবধি লক্ষ করা যায়। পার্শ্ববর্তী মিহ্‌রাবগুলোর গহ্বরে ক্ষুদ্রাকৃতির বৃক্ষ লতানো চারাগাছ ও রোজেট নকশা পরিলক্ষিত হয়। আর কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবের অভ্যন্তরভাগে অনেকগুলো প্যানেল নকশা সন্নিবেশিত যেগুলোর বিষয়বস্তু হিসেবে লতা-পাতা, রোজেট ও অন্যান্য নকশা খোদিত। পূর্ব দেয়ালের উপরিভাগে তিন সারি আয়তাকৃতির প্যানেল নকশা বিদ্যমান। এ প্যানেলগুলো আবার ফুল, লতা-পাতা, রোজেট ও দ্রাক্ষালতার নকশায় সমৃদ্ধ। বারান্দার উভয় পার্শ্বের দেয়ালগাত্রে খিলানাকৃতির বদ্ধ প্যানেল নকশা সন্নিবেশিত এবং এদের উপরিভাগের ত্রিকোনাক্ষেত্র ফুল, লতা-পাতা ও রোজেট নকশায় সুশোভিত। প্যানেল খোদিত খিলানগুলোর সম্মুখভাগে বহু খাঁজবিশিষ্ট নকশা বিদ্যমান।

নির্মাণ তারিখ :

ভাঙ্গনী মসজিদে কোনো লিপিফলক বা কোনো বিবরণ থেকে এর সঠিক কোনো নির্মাণ তারিখ জানা যায় না। স্থানীয় জনসাধারণের বিবরণ অনুযায়ী এ মসজিদটি এনায়েত করিম নামক এক স্থানীয় ভূস্বামী কর্তৃক নির্মিত। কিন্তু স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যাবলি দৃষ্টে মনে হয় যে মসজিদটি রাজশাহী জেলার বাগদানী মসজিদ (১৭৯১ খ্রি.) এবং রংপুর জেলার মিঠাপুকুর মসজিদের (১৮১০ খ্রি.) রীতি কৌশলে নির্মিত। আর এরই উপর ভিত্তি করে মসজিদটিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অথবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে নির্মিত একটি স্থাপত্যকীর্তি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. বাংলা বিজয়ের তারিখ নিয়ে ঐতিহাসিকদেব মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর পণ্ডিতগণেব মধ্যে চালর্স স্টুয়ার্ট নদীয়া বিজয়ের তারিখ ১২০৩-০৪ খ্রি. নির্ধারণ করেছেন। এডওয়ার্ড টমাস প্রাথমিকভাবে এ ঘটনার তারিখ ১২০২-০৩ খ্রি. নির্ধারণ করেছেন; কিন্তু পরে তিনি তা পরিবর্তন করে ১২০৩-০৪ খ্রি. নির্ধাবণ করেছেন। মেজর রেভার্টি ১১৯২ খ্রি. নদীয়া বিজয় সংঘটিত হয় বলে মনে করেন এবং এইচ. ব্লকম্যান ১১৯৮-৯৯ খ্রি. এই ঘটনাব তারিখ নির্ধারণ করেছেন। বিংশ শতাব্দীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে মনমহন চক্রবর্তী, আর.ডি. ব্যানার্জী, এন. কে. ভট্টাশালী এবং কে. আব. কানুনগো হিন্দু ও বৌদ্ধ উপাত্ত বিশ্লেষণ করে নদীয়া বিজয়ের তাবিখ ১১৯৯-১২০০ খ্রি. নির্ধারণ করেছেন। কিন্তু এ.এইচ. দানী সমস্ত উপাত্ত বিশ্লেষণ করে দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, নদীয়া বিজয় হিঃ ৬০০ মোতাবেক ১২০৪ খ্রি. সংঘটিত হয়েছে যা আব্দুল মুমিন চৌধুরী ও সুখময় মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সমর্থিত হয়েছে। কিন্তু আব্দুল করিম এ বিজয় ১২০৪ খ্রি. শেষের দিকে অথবা ১২০৫ খ্রি. প্রথম দিকে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে মনে করেন। পরমেশ্বরী লালগুপ্ত আব্দুল করিমের মতকে সমর্থন কবে বলেছেন যে নদীযা বিজয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯শে রমজান ৬০১ হি. মোতাবেক ১২ই মে ১২০৫ খ্রি.; দেখুন : সি. স্টুয়ার্ট, *হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, অক্সফোর্ড, ১৯১০, পৃ. ৬১; আই.এইচ.কিউ. ভলিউম-৩০, ১৯৫৪, পৃ.১৩৩-৪৫; জে.এ.এস.বি. ভলিউম- ২৪-২৬, ১৯৭৯-৮১, পৃ. ৩-১০; এ.এম. চৌধুবী, *ডাইনেস্টিক হিস্ট্রি অব বেঙ্গল*, ঢাকা, পৃ. ২৫২-৫৮; সুখময় মুখোপাধ্যায়, *বাংলায় মুসলিম অধিকারের আদিপর্ব*, কলিকাতা, ১৯৮৮, পৃ. ১১-১২, জে.ভি.আর.এম., ভলিউম-৪, ১৯৭৫-৭৬, পৃ. ২৪-৩৪।

২. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৩৫।

৩. *তদেব*, পৃ. ৩৬।

৪. *তদেব*, পৃ. ৩৭।

৫. উদ্ধৃতির জন্য দেখুন : জন মার্শাল, "দি মনুমেন্টস অব মুসলিম ইন্ডিয়া", *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ভলিউম-৩, দিল্লি, ১৯৫৮, পৃ. ৬০৩।

৬. পি. ব্রাউন, পুর্বোক্ত, পৃ. ৩৮।

৭. এ.এইচ.দানী, *মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল*, ঢাকা (এশিয়াটিক সোসাইটি অব পাকিস্তান, ১৯৬১), পৃ. ১০০।

৮. কেন্দ্রীয় 'বে'-বর্গের পরিমাপ ৪.১০ মি. অথচ পার্শ্ববর্তীগুলোর পরিমাপ ২.৯০ মি.।

৯. এস. আহমদ, *আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে ইন দি নর্দান ডিসট্রিক্টস অব বাংলাদেশ*, এ প্রজেক্ট রিপোর্ট, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, পৃ. ৯০।

১০. *তদেব।*
১১. এস. আহমদ, "এ নিউ লাইট অন দি জামি মসজিদ অব মাহীসন্তোষ", *জে.পি.এইচ.এস.*, ভলিউম- ৪৬, ১৯৯৮।
১২. *তদেব*, পৃ. ৬৪।
১৩. *তদেব।*
১৪. *আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া*, ভলিউম-১৫, ১৮৭৮-৭৯, পৃ. ৬২।
১৫. উদ্ধৃতির জন্য দেখুন : জন মার্শাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০৫।
১৬. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩৯।
১৭. টালি অলঙ্করণ সম্পর্কে কানিংহাম বলেন, Apparently the back and side walls, as well as the front wall above the spring of the arches, were all faced with glazed tiles; cf. *আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৬।
১৮. জে. ফারগুসন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬০।
১৯. *রিয়াস-উস-সালাতিন* (ইংরেজি অনুদিত), পৃ. ১২৫।
২০. এ.এইচ.দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫।
২১. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪০।
২২. *তদেব।*
২৩. এ.এইচ.দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ।
২৪. পি.সি. সেন, *মহাস্থান এন্ড ইটস ইনভার্নস*, রাজশাহী, ১৯২৯, পৃ. ৬-৭।
২৫. এ.এইচ.দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ ১৫৯।
২৬. জে. ফারগুসন, *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এন্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার*, ভলিউম-২, লন্ডন, ১৯১০, পৃ ২৫৭।
২৭. জন মার্শাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬০৮।
২৮. এ.এইচ.দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ ১৬৩।
২৯. *তদেব*, পৃ. ১৭৬।
৩০. জি. মিচেল (সম্পা.), *ইসলামিক হেরিটেজ অব বেঙ্গল*, প্যারিস, ১৯৮৪, পৃ. ৪০।
৩১. এ সম্পর্কে এ.এইচ.দানী বলেন, It (the mausoleum of Fath-khan) is of the type of bungalow roof, and resembles exactly the Dochala hut-roof of Bengal; cf. *মুসলিম আর্কিটেকচার ইন বেঙ্গল, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৮৬।
৩২. এ.বি.এম. হোসেন (সম্পা.), *গৌড়-লক্ষণাবতী*, এশিয়াটিক সোসাইটি অব বাংলাদেশ, ঢাকা, ১৯৯৭, পৃ. ১১১।
৩৩. *তদেব*, পৃ. ১১৭।
৩৪. এ.এইচ.দানী, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২১।
৩৫. *তদেব*, পৃ. ২১২-২১৭।
৩৬. *তদেব*, পৃ. ২০০।
৩৭. এ. টি. এম. রফিকুল ইসলাম, *ঘোড়াঘাট : ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব*, এম.ফিল. থিসিস, পৃ. ১৪৮-১৫১।

নবম অধ্যায়

জৌনপুর স্থাপত্য

(১৩৯৪-১৪৭৯ খ্রি.)

ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য অনুশীলনে জৌনপুর স্থাপত্যধারার ক্রমবিকাশের সূচনা ১৩৬০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল এবং ১৪৮০ খ্রিস্টাব্দে রাজবংশের পতনের সাথে সাথে সমাপ্তি ঘটেছিল। দিল্লিব লোদী বংশীয় সুলতান সিকান্দার লোদী জৌনপুর দিল্লি সাম্রাজ্যভুক্ত করেছিলেন। যদি সিকান্দার লোদী ধর্মনিরপেক্ষ ইমারতগুলোর ন্যায় ধর্মীয় ইমারতগুলোও নির্দয় ও নৃশংসভাবে ধ্বংস করতেন তা হলে এ অঞ্চলে গড়ে ওঠা স্থাপত্য নির্মাণ কাজের উৎকর্ষ বা উন্নয়ন সম্পর্কে কিছুই অবগত হওয়ার সুযোগ থাকত না।

মূলত জৌনপুর দিল্লি সাম্রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গরাজ্য ছিল এবং এর সুবাদারকে তোঘলক সুলতানেরা মালিক-আস-শারক 'প্রাচ্যের রাজা' বলে সম্বোধন করত। বলা বাহুল্য এ রাজপ্রতিনিধি দিল্লির অধীনতা অস্বীকার করে জৌনপুরে স্বাধীনভাবে শারকী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এ শহরটি গুমতী নদীর তীরে এবং বারানসি (ব্যানারস) শহর হতে প্রায় ৫৫ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। এ শহরটি, ফিরোজ শাহ তোঘলক প্রতিষ্ঠা করলেও পরবর্তীকালে শারকী সুলতানদের আমলেই এর স্থাপত্যিক শ্রীবৃদ্ধি ও সমৃদ্ধতা এসেছিল।

তাই বলা চলে যে এখানে যে স্থাপত্য ইমারত নির্মিত হয়েছিল এতে তোঘলক স্থাপত্য পদ্ধতি ও পরিচর্যার অনুসরণ ঘটেছিল। এ স্থাপত্য ইমারতগুলোর বিশেষ কোনো স্বকীয় স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ছিল না; তবে তখনকার সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে গড়ে উঠেছিল। জৌনপুর স্থাপত্য বলতে দুর্গ এবং কয়েকটি মসজিদের অস্তিত্ব ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর কোনো ইমারত দৃষ্ট হয় না।

এ দুর্গের কেবলমাত্র পূর্বাংশের তোরণ দরজা এবং দুর্গের মধ্যে অবস্থিত একটি মসজিদ কালের সাক্ষী হয়ে টিকে রয়েছে। জৌনপুরের শাসক ইব্রাহীম নায়েব বারবাক এটি ১৩৭৬-১৩৭৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মাণ করেছিলেন। এ মসজিদটাই পরবর্তীকালে অটলা মসজিদ রূপে পরিচয় লাভ করে। এ মসজিদটি নির্মাণ প্রক্রিয়া বিভিন্ন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়ার কারণে এটি সমাপ্ত হতে পরবর্তী বংশের পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছিল।

এ মসজিদের স্থাপত্য গঠনের মাঝে তেমন কোনো শৈল্পিক নিদর্শনের সূত্রপাত হয়েছিল এরূপ কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এ শহরের বাইরের কয়েক মাইল দূরবর্তী স্থানে

একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল যা এখানকার প্রকৃত স্থাপত্যকর্ম শুরু হওয়ার পূর্বেই নির্মিত বলে মনে করা যায়। মসজিদটি শেখ বারহা নামে পরিচিত এবং এটি জাফিরাবাদ গ্রামে অবস্থিত। এ গ্রামকেই মুসলিম অধিবাসীবৃন্দ তাদের আবাসস্থল হিসেবে বেছে নিয়েছিল। আর ধর্মীয় কারণে এখানে একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্যানুসারে অবগত হওয়া যায় যে ১৩১১ খ্রিস্টাব্দের আগে এটি নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদের নির্মাণশৈলী দেখে বুঝা যায় যে নিকটস্থ হিন্দু মন্দির হতে উপকরণাদি সংগ্রহ করে এ মসজিদে ব্যবহার করা হয়েছিল।

এ মসজিদের আকার-প্রকার সাধারণ মসজিদের চেয়ে কিছু স্বাতন্ত্র্যতার দাবিদার। এটি একটি বর্গাকার ১৮.৩০ মি. (৬০ ফুট) পার্শ্ববিশিষ্ট স্তম্ভ সংবলিত মিলনায়তন। এর সমতল ছাদটি ৬.১০ মি. (২০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট যা ৬৫টি জঙ্গলারূপ স্তম্ভের সারির উপর প্রস্তর কড়ির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত। এর সম্পূর্ণ অবয়ব অত্যন্ত সুঠামভাবে নির্মিত। কিন্তু এর অমার্জিত কলাকৌশলহীন নীরস চেহারা মানুষের দৃষ্টিকে ততটা আকৃষ্ট করে না। তথাপি মসজিদের সম্মুখভাগের অংশবিশেষ ৩.১০ মি. (১০ ফুট) পুরু করে গাঁথুনি দ্বারা নির্মাণ করার ফলে খুবই মজবুত হয়েছে। এ মসজিদ জৌনপুরের মসজিদ স্থাপত্যের যে প্রাথমিক স্থাপত্যরীতির ধারণা সৃষ্টি করেছিল তা পরবর্তীকালে ঐ অঞ্চলে মসজিদ নির্মাণে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনাতেই জৌনপুর শাসক বংশের দুটি ঘটনার সুযোগের সদ্ব্যবহার করার সৌভাগ্য হয়েছিল। প্রথমত, তৈমর লঙের দিল্লি অধিকার করে তোঘলক সুলতানকে পদানত করার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে স্বাধীনতা ঘোষণা করে স্বীয় রাজবংশকে প্রতিষ্ঠা করানো, দ্বিতীয়ত, পরিত্যক্ত দিল্লি নগরীর ওপর কিছু প্রাধান্য বিস্তার করার মতো একটা অরাজকতাপূর্ণ অবস্থা তাদের অনুকূলে এসেছিল। এ বংশের শাসক সামস-উদ-দীন ইব্রাহীম (১৪০২-১৪৩৬ খ্রি.) একজন অত্যন্ত দক্ষ ও সার্বভৌম শাসকরূপে পরিচিত ছিলেন। তাঁর স্বল্পকালীন শাসনামলে জৌনপুরের পুরোনো ঐতিহ্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে স্তুতিপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল এবং জৌনপুর শারকী রাজ্যের রাজধানীরূপে গৌরব লাভ করেছিল।

শারকী বংশের সংস্কৃতিমান ও কৃষ্টির প্রতি আগ্রহশীল শাসকবৃন্দ তাদের রাজধানীতে সংস্কৃতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জমায়েত করতে অত্যন্ত যত্নবান হন। সেদিনের উত্থান ও পতনোন্মুখ পরিস্থিতিতে দিল্লি বা অন্য কোথাও হতে ভাগ্য পরিবর্তনে ইচ্ছুক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিদের জৌনপুর আগমন ঘটে। জৌনপুরের শাসকগণ এখানে স্কুল, কলেজ নির্মাণ করে একে পারস্যের সিরাজের মতো ভারতের সিরাজ নগরে পরিণত করেন। তারা এখানে একটি শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়ও স্থাপন করতে সক্ষম হন।

জৌনপুর কেবলমাত্র বিদ্যাশিক্ষা ও সংস্কৃতি সাধনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় নি; বরং একই সাথে স্থাপত্য অনুশীলনের পাদপীঠরূপে চিহ্নিত হতে পেরেছিল। জৌনপুরের শাসকরা প্রজাদের প্রতিভা ও জ্ঞান বিকাশের উৎসাহ দান করত। তাই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সুন্দর সুন্দর প্রাসাদ, মসজিদ, মাকবারা ইত্যাদি নির্মাণের মধ্য দিয়ে রাজধানীর বাহ্যিক সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এসব স্থাপত্য কাঠামোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত হচ্ছে অটলা মসজিদ। এ মসজিদটি তখন হতে ৩০ বছর পূর্বে সুলতান ফিরোজ শাহ তোঘলক কর্তৃক ভিত্তি স্থাপিত হলেও শামসুদ্দীন ইব্রাহীম কর্তৃক ১৪০৮ পুনঃনির্মিত হয়।[১]

অটলা মসজিদ :

সুলতান শামসুদ্দীন ইব্রাহীমের সময়ে নির্মিত স্থাপত্য ইমারতে যে বৈশিষ্ট্যের উন্নয়ন ঘটেছিল এর দৃষ্টান্ত অটলা মসজিদের নির্মাণশৈলীতে প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে এর সবিস্তারিত শিল্পকর্ম অনুধাবন করে মসজিদটিকে বিরাট বা অত্যন্ত চমৎকার একটি স্থাপত্যকর্মরূপে চিহ্নিত করা যায় না। অন্যপক্ষে এতে পদ্ধতির সঞ্জীবতা ও প্রাণশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এটি পরবর্তীকালে জৌনপুরের মসজিদ স্থাপত্য আদর্শরূপে গৃহীত হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে ভারতের অন্যান্য স্থানের মসজিদ স্থাপত্য অপেক্ষা কোনো বৈচিত্র্যময় পরমোৎকৃষ্ট নকশা পরিকল্পনা এখানে দৃষ্ট হয় নি।

অটলা মসজিদের নাম হতে বুঝা যায় যে এটি অটলাদেবী নামের কোনো মন্দিরের মালমসলার সাথে ঐ এলাকার আর দু-চারটি মন্দিরের কাঠামো হতে উপকরণ সংগ্রহ করে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল। তবে নির্মাণ কৌশল হিসেবে মসজিদের সাধারণ আয়োজিত ব্যবস্থা ঐ একই ঐতিহ্যবাহী মসজিদ স্থাপত্য আদর্শ অনুসৃত হয়েছিল। এটি ৫৪ মি. (১৭৭ ফুট) ব্যাসযুক্ত বর্গাকার অঙ্গন নিয়ে গঠিত। এর চতুষ্পার্শ্বে বিভিন্ন আকারের স্থাপত্য সংযুক্ত হয়েছে।

এর তিন পার্শ্বে ছাউনি বারান্দা এবং নিয়মিত চতুষ্পার্শ্ব অর্থাৎ পশ্চিমের অংশে জুল্লাহ অবস্থিত। এ ছাউনি বারান্দা খুবই প্রশস্ত। এর এক পার্শ্ব হতে অপর পার্শ্ব ১২.৮০ মি. (৪২ ফুট) এবং পাঁচ খিলানপথ গভীর ও দুতলাবিশিষ্ট। তবে এর নিচের তলায় দু খিলানপথ স্থান জুড়ে ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ স্তম্ভযুক্ত বারান্দার সাথে নির্মিত হয়ে রাস্তার দিকে মুখ করে রয়েছে। এগুলো দর্শনার্থীদের জন্য বাইরের দিকের জায়গা সঙ্কুলান করে দিয়েছে। মসজিদ এলাকা ৭৮.৭০ মি. (২৫৮ ফুট) পার্শ্ব নিয়ে বর্গাকার পরিসরে গঠিত (ভূমি নকশা নং-২৪)। ছাউনি বারান্দার প্রতি পার্শ্বের মাঝখানে অতি চমৎকার প্রবেশ তোরণ রচিত
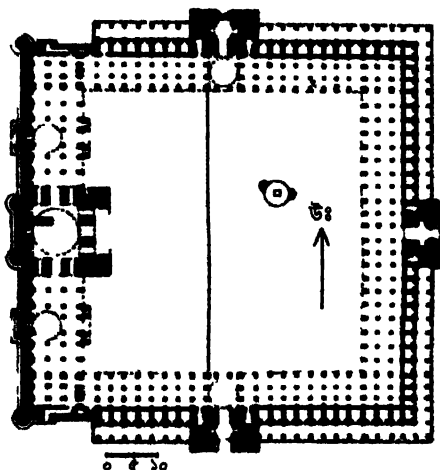
ভূমি নকশা নং-২৪ : অটলা মসজিদ

হয়েছে। মসজিদের রিওয়াকে তিনটি প্রবেশপথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণের তোরণ পথ দুটি জাঁকালোভাবে নির্মিত। এগুলো সম্মুখের দিকে কিছুটা প্রলম্বিত এবং শীর্ষে গম্বুজ ধারণ করে

রয়েছে। এ মসজিদের নকশায় সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে এর জুল্লাহ বা নামাজঘর। এর সম্মুখ দেয়াল জৌনপুরের কারিগর ও প্রকৌশলীরা অত্যন্ত নৈপুণ্য ও দক্ষতা সহকারে মৌলিক উদ্ভাবনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ করে নির্মাণ করেছিল। মধ্যপ্রান্তে সুউচ্চ প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকারত্বের তোরণ সংযোজন পিরামিড যুগের দেবতাদের মন্দিরের সুউচ্চ তোরণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এটি অবশ্য ঐ মন্দির তোরণের মতোই ঢালুতো সংবলিত। তোরণটি ২২.৯০ মি. ৭৫ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট এবং গোড়ার দিকে প্রশস্ত। এ তোরণের অভ্যন্তরে যে খিলান কুলঙ্গি গঠিত হয়েছে এটি ৩.৪০ মি. (১১ ফুট) গভীর এবং ভিতরের নেভ বারান্দার দিকে প্রবিষ্ট হয়েছে।

এতে আবার খিলান সংবলিত জানালাগুলোর উন্মুক্ত স্থান দিয়ে ভিতর আলোকিত হয়ে থাকে। এ খিলান তোবণ (arched-pylon) একটি স্বতন্ত্রসূচক কাঠামো এবং সমস্ত মসজিদের উপাঙ্গগুলোর অংশ। এর উভয় পার্শ্বে অনুরূপ ক্ষুদ্র আকারের তোরণের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। পুনরায় এ ছাউনি বারান্দায় তিনটি দরজা সন্নিবেশিত হয়েছে। এব ফলে দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগে সামগ্রিক স্থাপত্যিক সুষমতা ও ছন্দিত গতি আনয়ন সম্ভবপর হয়েছে। ইমারতের কুলঙ্গি এবং অভিক্ষিপ্ত অংশ নিয়তকাব ও ফাঁকা বায়ুবীয় (solıd voıd) অংশ এমনভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে যে এ ছন্দিত গতিময় প্রক্রিয়ায় বিশেষ জোব দিয়ে পর্যায়ানুক্রমে প্রখর আলো ও গভীর ছায়ার মিল বিশিষ্টভাবে নিষ্পন্ন হতে পেরেছে।

ইমাবতেব অভ্যন্তরভাগও সমানভাবে উত্তম ব্যবস্থায় বিন্যস্ত। এর জুল্লাহ্ অংশ প্রচলিত কেন্দ্রীয় নেভ দ্বারা গঠিত যার উভয় পার্শ্বে স্তম্ভ সংবলিত আড়াআড়ি অংশ বাবান্দা (tranꞩept) সংযুক্ত রয়েছে এবং এর মধ্য দিয়ে জুল্লাহতে প্রবেশ করা যায়। নেভ্ অংশ ১০.৭০ মি. (৩৫ ফুট) × ৯.২০ মি. (৩০ ফুট) আয়তাকার মিলনায়তন নিয়ে গঠিত। এর শীর্ষে একটি অতি উচ্চ গোলাকার গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। নেভের মধ্যে যে অলঙ্কাব পবিচর্যা করা হযেছে তা ব্যবধান বক্ষা করে খাড়াভাবে তিন ধাপে সম্পন্ন হয়েছে। প্রতিটি ধাপের খিলান ও খিলান সারির আয়োজনের উপর বাহ্যিক সৌন্দর্য নির্ভরশীল।

সর্বনিম্ন প্রকোষ্ঠে তিনটি মিহরাব ও একটি উচ্চ মিম্বার ধাপসহ নির্মিত হয়েছে। এর পার্শ্বদিকে খিলান দরজা মধ্যবর্তী সংযোগ বারান্দার দিকে উন্মুক্ত রয়েছে। এর উপরে দ্বিতীয় পর্যায় বা ধাপে আটটি অলঙ্কৃত খিলান নির্মিত হয়েছে। এর মধ্যে চারটি স্কুইঞ্চ পদ্ধতির খিলান কোণ অতিক্রম করে সেতুর মতো অবস্থান নিয়েছে। এ জাতীয় খিলান অষ্টভুজে উপনীত হতে সহায়তা করেছে। এব খিলান পর্দার উন্মুক্ত অংশের মধ্য দিয়ে উপরাংশে আলো প্রবেশ করতে পারে। এর তৃতীয় ধাপ সর্বোচ্চ পর্যায়ে আলম্বের সাহায্যে প্রতিকোনার ষোলপার্শ্ববিশিষ্ট তলা গঠিত হয়েছে। আবার এর প্রতিপার্শ্বে যে খিলান বহমান রয়েছে তা তিনপত্রবিশিষ্ট বা তিনমুখওয়ালা খিলানশ্রেণী (trıforıum) গঠন করেছে। মূলত এটিই গম্বুজের ভার বহন করছে।

এ গম্বুজ ভিতর দিক দিয়ে ১৬.৮০ মি. (৫৫ ফুট) উচ্চতায় উপনীত হয়েছে। এর নিচের পৃষ্ঠায় মনোজ্ঞভাবে মজবুত কড়িকাঠ (rıbbed) বৃত্তাকার প্রস্তবে নির্মাণ কবা হয়েছে এবং এর বাইর পার্শ্ব পুরু সংযোগ মসলা দ্বারা আবৃত করে প্রায় উপগোলাকার বক্র চেহারার বাইরের অংশ গঠিত হয়েছে। নেভের প্রতিপার্শ্বে স্তম্ভ সংবলিত দীর্ঘ মিলনায়তন এবং কেন্দ্রীয় দরজা অষ্টভুজ 'বে' অথবা পার্শ্ব এবাদতখানার সাথে সংযুক্ত হয়েছে যা অপেক্ষাকৃত ছোট গম্বুজ ছাদে ঢেকে দেওয়া হয়েছে এবং সর্বশেষ প্রান্ত অংশ দুতলার সমাপ্ত করা হয়েছে। উপরের প্রকোষ্ঠ প্রস্তরের সচ্ছিদ্র পর্দা দ্বারা আবৃত এবং এটি মহিলাদের এবাদতের জন্য সংরক্ষিত।

অটলা মসজিদের ভূমি নকশা পরিকল্পনা অবলোকনে প্রতীয়মান হয় যে এটির অনেক উপাঙ্গ গঠন প্রক্রিয়া সরাসরি দিল্লির তোঘলক স্থাপত্য আদর্শ ও পরিচর্যা অনুসরণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে খিলান কুলঙ্গি, ঝালর অলঙ্করণ, খিলানের আকারত্ব এবং দেয়ালের পার্শ্বে নির্মিত ঢালু আলম্বগুলোর পুনরায় আগমন। অবশ্য অটলা মসজিদে যা অনুকরণ করে নির্মিত হয়েছিল তা তোঘলকাবাদের মোহাম্মদ শাহের মাকবারায় অনেক পরিণত ও মসৃণভাবে নির্মিত হয়েছিল।

এ মসজিদে কিছু অযৌক্তিক রীতির কড়ি ও আলম্বের (beam and brackets) ভার বহন প্রক্রিয়াও ঐ একই উৎস হতে গৃহীত হয়েছিল। বলা যায় যে স্তম্ভের মধ্যবর্তী অংশ যাকে দণ্ড বলা হয় তা বর্গাকাররূপে সাজসজ্জাহীনভাবে গঠন করা হয়েছে। বিশেষভাবে ক্রমসরু চূড়া যা পশ্চিম দেয়ালের বহির্পার্শ্ব দিয়ে রয়েছে এটি একেবারে ফিরোজ শাহ তোঘলকের স্থাপত্য হুবহু অনুকরণে নির্মিত হয়েছে বলে পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন[২] (চিত্র নং-৪৮)।

এটি আরো মনে করা যায় যে অটলা মসজিদ নির্মাণকালে দিল্লি হতে স্থাপত্য প্রযুক্তি আমদানি করা হয়েছিল। এ পদ্ধতির স্থাপত্য অনুশীলনে নিয়োজিত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ শ্রমিক, কারিগর ও স্থপতি জৌনপুরে আনয়ন করে তাদের দ্বারা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করা হয়েছিল এবং এরা শারকী শাসকদের অধীনে কর্মরত ছিল।

পক্ষান্তরে যে প্রকারের উপকরণগুলো নকশা প্রকল্পের অধীনে মিলিত ও সমন্বয় সাধিত হয়েছিল তাতে মনে হয় তোঘলক স্থাপত্য আদর্শের আদিরূপের অবয়বে গঠিত হওয়ার পিছনে কিছু প্রতিভাবান দক্ষ স্থপতির দূরদৃষ্টি বাস্তব বোধগম্যতা ও অতি উচ্চমানের প্রশিক্ষণপ্রাপ্তির পরই সম্ভবপর হয়েছিল। বলা বাহুল্য শারকী শাসকদের স্থাপত্যকর্ম সৃষ্টিতে প্রচুর পরিমাণে হিন্দু কারিগর যে নিয়োজিত ছিল তা ঐতিহাসিক শিলালিপিতে প্রমাণ রয়েছে। এসব স্থানীয় কারিগরবৃন্দ তাদের ঐতিহ্যবাহী প্রথা হতে বিমুক্ত হয়ে পদ্ধতিতে অনেক নবপ্রবর্তন আকারত্বের পরিপূর্ণতা ও সজীব স্থাপত্য প্রযুক্তি ও প্রেরণা আনয়ন করে উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য প্রণালীর সংশ্লেষণ (synthesis) করেছিল।

অটলা মসজিদের দৃষ্টি আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে জুল্লাহর পিছন দেয়াল। এতে স্থাপত্যিক পরিচর্যার অনেক মূল্যবান তথ্য নিহিত রয়েছে। প্রথাগতভাবে মসজিদ কেবলা ভারত হতে পশ্চিমের দিকে নির্দেশিত হয়ে থাকে। তাই জুল্লাহর পশ্চিম দেয়াল একটানা বিস্তৃতভাবে কোনো প্রকার উন্মুক্ত অংশ বা দরজা না রেখেই নির্মাণ করা হয়ে থাকে।

পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন[৩] যে এতে মসজিদ নির্মাতাদের এ জাতীয় ইমারতে অতিরিক্ত অসুবিধার কারণ সৃষ্টি হতে দেখা গিয়েছে। জৌনপুরের উদাহরণে বিরাট সমতল মসৃণ দেয়ালের একঘেঁয়ামি ভঙ্গ করে বৈচিত্র্য আনয়নের জন্য তিনটি বলিষ্ঠ অভিক্ষিপ্ত অঙ্গ বা অংশ সংযোজন করা হয়েছে। এদের প্রতিটি অভ্যন্তরের প্রধান প্রকোষ্ঠের অবস্থানের সাথে মানানসই এবং এভাবেই উপরে অবস্থিত গম্বুজের সাথে মিলবিশিষ্ট। প্রতি অভিক্ষিপ্ত পৃষ্ঠের কোনাগ্র জোরালো বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির নিমিত্তে ক্রমসরু চূড়া সংযুক্ত রয়েছে। সমস্ত বন্দোবস্তটাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে কৌশল পরিহার করে তারা কারিগরি দক্ষতা সুলভে সমাধান করেছে।

মসজিদের পশ্চাৎ অংশের বন্দোবস্ত প্রক্রিয়া বিষয় হতে প্রতীয়মান হয় যে এর বাইরের প্রধান দুটি উপাঙ্গ গম্বুজ ও ফাসাদ তোরণ মূলত মসজিদের বেমানান অবস্থারই উপহার

দিয়েছে। এটি অত্যন্ত নির্দেশপূর্ণভাবে পশ্চাৎ তোরণের অনাবৃত ও অরক্ষিত চেহারা দৃষ্টিগোচর করেছে। দর্শকদের মনে এতে যে প্রতিক্রিয়াই হোক না কেন এ ইমারত স্থাপত্যিক নির্মাণ কৌশল এর কতিপয় গাঁথুনিক উপাদানের মধ্যে নিহিত রয়েছে যা যুক্তিমূলক পারস্পরিক বিভিন্ন অংশের মাঝে সম্পর্কের অপরিহার্যতা প্রকাশ করছে।

মসজিদের গম্বুজের দিকে তাকালে মনে হয় এটি যেন প্রবল শক্তি দ্বারা পরাজিত ও বৈশিষ্ট্যহীন হয়ে পড়েছে এবং তোরণের কারুকার্যহীন পশ্চাৎ দেয়াল দ্বারা প্রায় ঢেকে গিয়েছে। এটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে এ ধরনের মসজিদগুলোর এটিই মূল ত্রুটি ও সমস্যা। তবুও পার্শ্ব হতে দূরত্বে প্রাতঃকালীন সূর্যের রক্তিমাভাবর্ণ এবং তোরণের সমতল কোনাকুনি ধূসর ছায়া গম্বুজের গোলাকার পৃষ্ঠে এসে পতিত হয়। যাহোক এর প্রতিফলন অভিপ্রেত অপেক্ষা দৈব সংঘটন বলে মনে হয়।

খালেছ মোখলেছ মসজিদ ও জাহাঙ্গীরি মসজিদ :

অটলা মসজিদের নির্মাণকার্য সমাপ্তির পর অত্র অঞ্চলে আরো দুটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে খালেছ মোখলেছ মসজিদ ও জাহাঙ্গীরি মসজিদ। এ দুটি মসজিদই ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। প্রথমটি দুজন নগর শাসনকর্তার আদেশে নির্মিত হয়েছিল। তাদের নাম ছিল মালিক খালেছ ও মোখলেছ। এটি অত্যন্ত সাদাসিধা সাজসজ্জাহীন সাধারণ ধরনের কাঠামো বিশিষ্ট মসজিদ।

এর সম্মুখ দেয়াল সংলগ্ন গম্বুজ সংবলিত মিলনায়তন ও মিলনায়তনে প্রবেশ করার জন্য প্রশস্ত সংযোগ বারান্দা পথ (trancept) অটলা মসজিদের অনুরূপ করে নির্মিত হয়েছিল। তবে এখানে নকশা পরিকল্পনার কঠোর কারুকার্যহীনতা ভঙ্গ করে সামান্য কিছু অলঙ্করণের চেষ্টা দেখা যায়। এ কঠোরতা বৈসাদৃশ্যে জাহাঙ্গীরি মসজিদ বেশ কিছুটা চমৎকার সৌন্দর্যময় বৈশিষ্ট্যের কারুকার্যে শোভিত করা হয়েছে। এর আদি নির্মাণ কাজের কিছু কিছু টুকরা ভগ্নাংশ দেখে তাই মনে হয়। বাস্তবে যখন এটি সুসম্পন্ন হয়েছিল তখন এটি একটি রত্নদৃশ্য স্থাপত্যকর্মরূপে প্রতিভাসিত হয়েছিল।

বর্তমানে এর কেবলমাত্র সম্মুখ দেয়ালের শুধু মাঝের অংশটুকু অবশিষ্ট রয়েছে। এ মসজিদের খিলান তোরণ অনুরূপ মসৃণ পর্দাযুক্ত বাহ্যিক চেহারার কারণে এর নামকরণ হয়েছে জাহাঙ্গীবি বা পর্দা। তবে এর সামান্য প্রত্ন নিদর্শন (অবশিষ্ট কাঠামো) দ্বারা মসৃণ ইমারতের প্রকৃত অবস্থায় এটি কী ছিল তা সঠিকভাবে মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়।

এ মসজিদের প্রবেশপথ নির্মাণ বিচার করে দেখলে বুঝা যায় যে কড়ি ও আলম্বরীতির অনুসরণে খিলানের পরিবর্তে স্তম্ভ দ্বারা তিনটি তোরণ গঠিত হয়েছে। এ প্রয়োগ প্রক্রিয়া বিচার করে বলা চলে যে দেশীয় পদ্ধতির প্রভাব এখানে কার্যকর হয়েছে। এতে অবশ্য আরো একটি ছাপ পরিস্ফুট হয়েছে যে এর নির্মাণ কার্যে নিয়োজিত কারিগরবৃন্দ ও স্থপতিরা ইমারতের সমুদয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সুষমতার দিকে কোনো দৃষ্টিপাত করে নি; বরং তারা অধিকহারে ইমারতপৃষ্ঠে ঢালাই বা ছাঁচ অনুযায়ী গঠিত নকশানমুনার পরিচর্যা দ্বারা অলঙ্করণ করার দিকে বেশি আগ্রহশীল ছিল। তা সত্ত্বেও একটি সৌন্দর্য সুষমায় মসৃণভাবে নির্মিত স্থাপত্য উদাহরণ হিসেবে জৌনপুরে এটি ব্যতীত আর কোনো দ্বিতীয় নজির নেই।

বলাবাহুল্য এ মসজিদের সৌন্দর্যময়তার সাথে কাঠামোর সুঠামতা অর্জিত হয় নি। এর ফলে পরবর্তীকালে হয়তো অনেক মসজিদ এর অনুকরণে নির্মিত হত। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ার দৃষ্টান্তই লক্ষ করা যায়। এর প্রাথমিক যৌবনের জৌলুস ও প্রাণস্পর্শতা প্রচুর পরিমাণে এখনো প্রত্যক্ষ করা গেলেও এটি যে শক্তিমত্তা ও বীর্যতা ছাড়াই সৌষ্ঠবময় ও আড়ম্বরপূর্ণ করা হয়েছিল তা বুঝা যায় এবং এভাবেই ফলত এর পতনোন্মুখিতার দিকে আগাবার ভবিষ্যদ্বাণী ঘোষণা করেছিল।

লাল দরওয়াজা মসজিদ :

জাহাঙ্গীরি মসজিদ নির্মাণের পরবর্তী বিশ বছরের মধ্যে তেমন কোনো স্থাপত্য প্রকল্প বাস্তবায়নের নজির দেখা যায় না। ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে লাল দবওয়াজা মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এটি প্রকৃতপক্ষে একটি নির্মাণ প্রকল্পের অংশবিশেষ ছিল মাত্র। কারণ এর সাথের অংশটি ছিল একটি রাজপ্রাসাদ যা যথাসময়ে প্রকৃতির কোলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এটি মাহমুদ শাহের (১৪৩৬-১৪৫৮ খ্রি.) রানী বিবি রাজা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল।[৪]

টিকে থাকা এ মসজিদকে রাজপ্রাসাদের সংলগ্ন একটি খাস এবাদতখানারূপে চিহ্নিত করা যায়। এতে একটি সিন্দূর রঙে রঞ্জিত করা সুউচ্চ দরজার ভিতর দিয়ে অভিগমন করতে হয়। হয়তো সে কারণে মসজিদটির অনুরূপ নামকরণ হয়েছে। এটি অটলা মসজিদের সহজতর করা নকশার অবিকল প্রতিলিপি এবং আকারে এর তিন ভাগের দুভাগ। এর অভ্যন্তরভাগে খিলান গঠন ভঙ্গিমায় ভিন্নতা রয়েছে। এখানে মহিলাদের পর্দা শোভিত উপরের প্রকোষ্ঠের অবস্থান কেন্দ্রীয়ভাবে 'নেভ' নির্মাণ করা হয়েছে। অটলা মসজিদের মতো সংযোগ প্রকোষ্ঠের সর্বশেষ প্রান্তে মহিলাদের জন্য আয়োজন নির্বাসিত করা হয় নি। মসজিদের অভ্যন্তর উপাঙ্গের স্থান পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটি প্রতীয়মান হয়েছে যে রানীর একটা প্রবল প্রভাব বিদ্যমান ছিল যা বংশের ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। সে সময় মহিলাদের একটা বিশেষ প্রভাব প্রাধান্য পেয়েছিল। হয়তোবা এটি প্রভাবময় ব্যক্তিত্বের জন্যই সম্ভবপর হয়েছিল।

এ ছাড়াও সে সময়ের জৌনপুরে নির্মিত মসজিদগুলোর গঠন কাঠামে মহিলাদের এবাদত সুবিধা প্রদানের জন্য বিশেষ দৃষ্টি দেয়া হয়েছিল। তাই গ্যালারিগুলোতে মহিলাদের নামাজ ব্যবস্থা সংরক্ষিত রাখা হত। জৌনপুরে সৌন্দর্যময় উন্মুক্ত কাজ দ্বারা পর্দার আবরণে মসজিদের বিশেষ অংশের চতুর্দিকে পরিবেষ্টন করা একটা প্রচলিত পদ্ধতিতে পরিণত হয়েছিল।

কথিত আছে যে বিষাদ্রুর পুত্র কাময়ু নামের এক হিন্দু স্থপতি লাল দরওয়াজা মসজিদ নির্মাণ করেছিল। অথচ এতে কোনো দেশীয় স্থাপত্য প্রভাবের চিহ্ন ফুটে ওঠে নি। এটি বাহ্যিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে অন্য মসজিদগুলোও একইভাবে একই স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করে নির্মিত হয়েছিল। নকশা পরিকল্পনায় প্রতীয়মান হয় যে এটি ৪০.৩০ মি. (১৩২ ফুট) পার্শ্ববিশিষ্ট বর্গাকার অঙ্গন নিয়ে গঠিত (ভূমি নকশা নং- ২৫) এবং তিনটি দরজা পথ সম্মুখ দেয়ালের তোরণ পর্যন্ত এগিয়ে গিয়েছে। তবে এখানে একটি ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় যে জুল্লাহর সম্মুখস্থ তোরণ (pylon) নির্মাণ পরিহার করা হয়েছে। পি. ব্রাউন এর কারণ অনুমান করেছেন যে যেহেতু এ মসজিদের আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র সেহেতু তোরণ নির্মাণ মসজিদের চেহারায় অশোভন হত। এ মসজিদে অটলা মসজিদের মতো বিভিন্ন উপাঙ্গের

মাঝে কোনো সুষমতা এবং ওজন ভার অর্জিত হয় নি। এ মসজিদ সম্পর্কে এস. গ্রোভার বলেন, The edifice may only partly be classified as an "archaeological micellany".[৫]
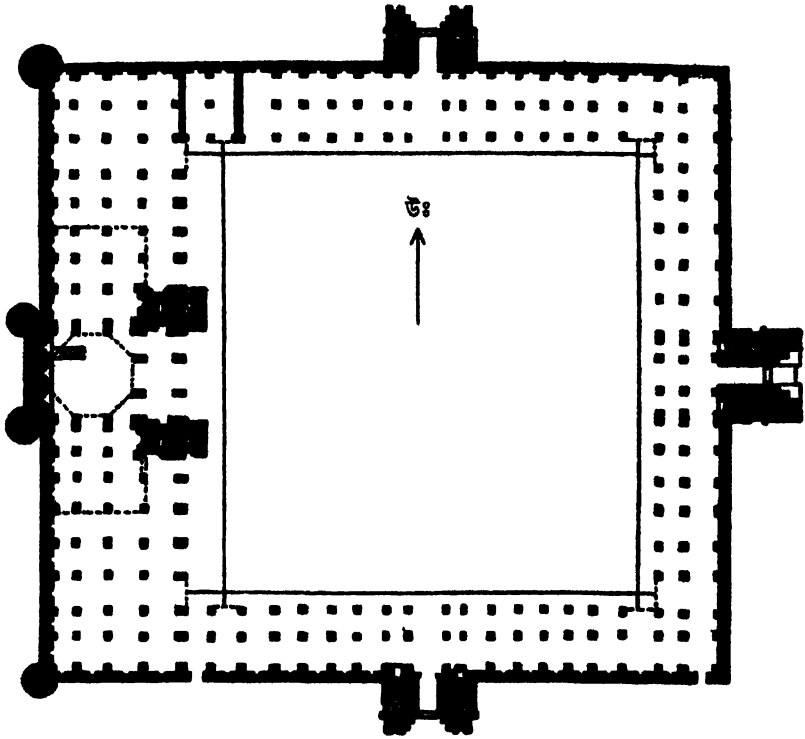
ভূমি নকশা নং-২৫ লাল দরওয়াজা মসজিদ

জৌনপুর জামে মসজিদ :

জৌনপুবের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী উৎকৃষ্ট স্থাপত্যকর্ম হচ্ছে জৌনপুব জামে মসজিদ। এর নির্মাণ কার্য শাবকী বংশের সর্বশেষ শাসনকর্তা হোসাইন শাহেব বাজত্বকালে ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়েছিল। তিনি জৌনপুবের শাসক হিসেবে ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং দিল্লির লোদী সুলতানদের দ্বারা জৌনপুর দিল্লি সাম্রাজ্যভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত রাজত্ব কবেছেন। অবশ্য সতীশ গ্রোভাবের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ মসজিদেব নির্মাণ কার্য সম্পন্ন হতে এক যুগেরও বেশি সময় লেগেছিল।[৬]

এ মসজিদ প্রকল্পে দেখা যায় যে অটলা মসজিদের অনেক স্থাপত্য বীতি ও পদ্ধতিব পুনরাগমন এখানে ঘটেছে। যদিও এ মসজিদ আকাবেব দিক দিয়ে অটলা মসজিদ হতে বৃহৎ তবুও এর অনেক প্রয়োজনীয় উপাদান বৈশিষ্ট্য ও পরিচর্যা প্রণালী অটলা মসজিদের অনুকবণে করা হয়েছে। এ ছাড়াও বিশেষ কতকগুলো ক্ষেত্রে এটি নির্মাণে কিছু ত্রুটি লক্ষ করা যায়। এ মসজিদের সাধারণ বাহ্যিক দৃশ্যমান চেহারা অত্যন্ত দৃষ্টি আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যময়।

এব সমগ্র কাঠামোটাই চতুষ্পার্শ্বস্থ স্থান হতে প্রায় ৬.১৫ মি. (২০ ফুট) উচ্চতাসম্পন্ন বেদিব উপব প্রতিষ্ঠিত। ফলে মসজিদের অভ্যন্তরে অনুগমনের পথ ক্রমোন্নত সোপানের মধ্য দিয়ে রচিত হয়েছে। এ সোপান নির্মাণ ধারণা ফিরোজ শাহ তোঘলকের শাসনামলে দিল্লিতে নির্মিত উচ্চতাসম্পন্ন মসজিদ মেঝে বা ভিত্তিমূল হতে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। এর অঙ্গনটি ৬.৪০ মি. (২১ ফুট) পার্শ্ববিশিষ্ট বর্গাকারে নির্মিত। এর ছাউনি বারান্দা দুতলা পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। তবে এটি দু খিলানপথ বিশিষ্ট অথচ অটলা মসজিদ পাঁচ খিলানপথ বিশিষ্ট। প্রতি পার্শ্বেব (কিবলা দিক ব্যতীত) মাঝখানে অবস্থিত তিনটি প্রবেশপথ একই পবিমাপে নির্মিত (ভূমি নকশা নং- ২৬)। মসজিদের নামাজঘরের সম্মুখে একটি বৃহদাকৃতির প্রবেশ তোরণ অবস্থিত। এটি ২৬ মি. (৮৫ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট ও গোড়ার দিকে ২৩.৫০ মি. (৭৭ ফুট) প্রশস্ত বা চওড়া।
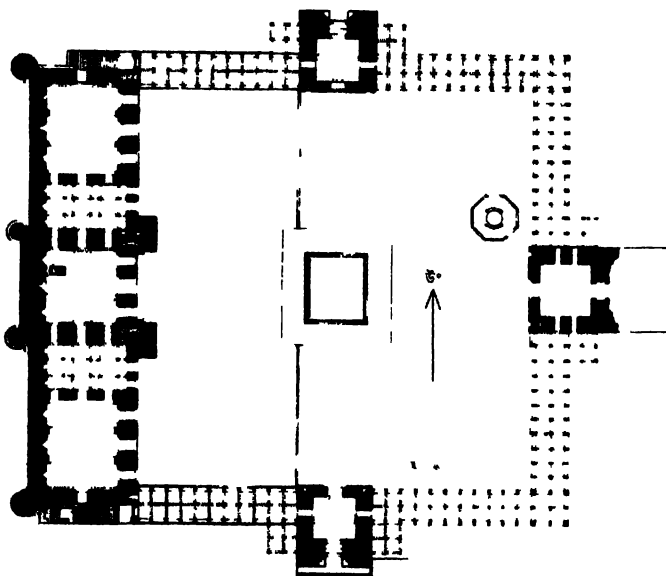
ভূমি নকশা নং-২৬ জৌনপুর জামি মসজিদ

মসজিদের অভ্যন্তরভাগ বর্গাকার মাপের নেভ নিয়ে গঠিত। এর ব্যাস ১১.৬০ মি. (৩৮ ফুট) এবং নকশা পরিকল্পনায় অটলা মসজিদের প্রত্যক্ষ প্রভাব দৃষ্ট হয়। তবে এর বৃহৎ আকারত্বের জন্য উক্ত নকশার সামান্য কিছু বদবদল লক্ষ করা যায়। মসজিদের ছাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একটি মনোরম আকৃতির গম্বুজ। এ মসজিদে নতুন প্রবর্তনগুলোতে দেখা যায় যে ক্লেরেস্টবি খিলান সারি (clerestory arcade) উন্মুক্ত ধরনের যার ফলে গম্বুজের ভিতরে আলো প্রবেশ করতে পারে। কেন্দ্রীয় মিলনায়তনের প্রতি পার্শ্বে উন্মুক্ত খিলান সংযুক্ত যা খিলানায়িত পার্শ্ব খিলানপথ (aisles) আড়াআড়িভাবে জুল্লাহব সাথে দীর্ঘ অক্ষরেখায় অবস্থান নিয়েছে। এর প্রতিটি দ্বিতল বিশিষ্ট ও উপরে প্রকোষ্ঠ ধারণ করেছে এবং ফাঁকা জায়গাগুলোতে ছিদ্রযুক্ত প্রস্তর জালি পর্দা দ্বারা পূরণ করে রাজপবিবারের মহিলাদের নামাজের বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য মসজিদের নকশা পরিকল্পনায় পূর্ব মসজিদের নকশা প্রকল্প হতে কিছুটা ভিন্নতা ও ব্যতিক্রম অবস্থা পরিদৃষ্ট হয়েছে এটি অবশ্য ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে; তবে এখানে পার্শ্ব খিলানপথ বাদে অবশিষ্ট প্রসারিত স্থান পরিচর্যায় নকশা পরিকল্পনাকারক নতুন ও সজীব প্রযুক্তি এবং পটভূমির আয়োজন ও প্রবর্তন করেছে তা সম্পূর্ণভাবে এ জাতীয় ইমারতে ইতঃপূর্বে ব্যবহৃত হয় নি বলে পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন।[৭] এ নতুন পরিচর্যায় স্থপতি প্রতি পার্শ্বে ঢেউ ছাদযুক্ত মিলনায়তন যোগ করেছে। এর সাথে মানানসই বরাবর সহযোগ প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়েছে। এদের প্রতিটি ১৫.৩০ মি. (৫০ ফুট) দীর্ঘ, ১২.২৫ মি. (৪০ ফুট) প্রসার ও ১৩.৭৫ মি. (৪৫ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। এর অভ্যন্তরের প্রশস্ত পরিসরে কোনো প্রকার আলম্ব বা ভারবহনকারী স্তম্ভ নির্মাণ দ্বারা বাধা সৃষ্টি করা হয় নি। অধিকন্তু অঙ্গনের দিকে খোলা খিলান দরজাগুলোর মধ্য দিয়ে প্রচুর পরিমাণে আলো মসজিদ অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। এ মসজিদে তিনটি মিহরাব নির্মিত হয়েছে।

এ মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠে যদি কিছু অনুপম ও সৌন্দর্যময় অংশ নির্মিত হয়ে থাকে এবং চমৎকারিত্ব সৃষ্টি হয়ে থাকে তা হচ্ছে এর আকারত্ব ও ছাদ নির্মাণের অভিনবত্ব। এটি প্রশস্ত কৌণি ধনুকাকৃতির অবকাঠামোয় নির্মিত। এর অবয়ব গথিক্ কলেজ মিলনায়তনের কিছু কিছু পদ্ধতির পুনঃআবির্ভাব ঘোষণা করছে। জৌনপুব মসজিদ স্থাপত্যেব ইতিহাসে এর ট্রান্সসেপ্ট বা কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠ অনেক শিক্ষামূলক আকর্ষণীয় উপকরণ উপহার দিয়েছে (চিত্র নং- ৪৯)।

এর অভ্যন্তরভাগ স্তম্ভ বা অন্য যে কোনোবকম আলম্ব নির্মাণের দ্বারা ভারাক্রান্ত নয়; বরং বাধাহীন খোলামেলা ফাঁকা পরিসর ভারতীয় স্থাপত্য নির্মাণ কাজে বিরল ঘটনা এবং অন্য কোথাও এরূপ উন্নয়ন কদাপি দৃষ্ট হয় নি। অবশ্য অনুরূপ মৌলিক স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য সংবলিত উপাঙ্গ সৃষ্টির প্রচেষ্টা বাংলার স্থাপত্যের পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদে প্রত্যক্ষ করা যায়। আদিনা মসজিদে এ নির্মাণ প্রচেষ্টা তখন হতে এক শ বছর পূর্বে করা হয়েছিল। এটি অবশ্য ইট দ্বারা নির্মিত ছিল এবং প্রকৃতির কোলে ঢলে পড়েছিল, কিন্তু জৌনপুরের ধনুকাকৃতির ছাদ এখনো অক্ষত রয়েছে।

এ মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু হতে শেষাবধি যত্নসহকারে যথাযথ প্রণালীতে নিপুণভাবে সম্পাদন করা হয়েছিল। অভ্রান্ত বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও পদ্ধতি এর নির্মাণে প্রয়োগ করা হয়েছিল। এরূপ অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য স্থপতি প্রথমে আড়াআড়িভাবে এপার হতে ওপার ১২.২৫ মি. (৪০ ফুট) পরিসরে চার বিন্দুযুক্ত খিলান কাঠামো গঠন করেন অথবা দুটি আড়াআড়ি পোলিন্দ সমন্বয়ে গঠিত কাঠামোর মাঝখানেব নির্দিষ্ট ব্যবধান দু দেয়াল পোলিন্দ প্রতি প্রান্তে স্থাপন করা হয়েছে। এ পদ্ধতি ব্যবহারের ফলে একটি স্থায়ী সেন্ট্রারিং ব্যবস্থা উৎপাদিত হয়ে পোলিন্দ বা কড়িকাঠের পিছন দিক দিয়ে সমতল আকারের পাথরে পূরণ করে নির্মাণ করা হয়েছে। এর ফলে এক নিখাদ ও মজবুত প্রস্তর খোলস সমশ্রেণীভুক্ত সমরূপ পদার্থের দ্বারা বৃহৎ মোটা আকারে তৈরি করা গিয়েছে। এরূপ আকারের ধনুকাকৃতি ছাদ পর্যাপ্ত পরিমাণে বাইরের ধাক্কা সহ্য করতে সক্ষম হয়ে এখনো টিকে রয়েছে। অন্যপক্ষে অভ্যন্তর দেয়ালও প্রতিকূলতা এড়ানোর জন্য যথেষ্ট শক্তি যুগিয়ে দিয়েছে। এক কথায় খিলান ছাদের উপর হতে নিচে মসজিদের ভিত্তি পর্যন্ত অসম্ভব রকমের শক্তিশালী ও নিখুঁতভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি মতো মজবুত হওয়ার আর একটি কারণ হচ্ছে যে ৩.১০ মি. (১০ ফুট) পুরু করে স্থাপত্য অংশ গাঁথুনি করা হয়েছিল।

পি. ব্রাউন[৮] এর আকারত্ব সম্পর্কে মতো পোষণ করেন যে 'বাস্তবিক পক্ষে মসজিদের এ ট্রান্সসেপ্ট বা কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরভাগের নকশা পরিকল্পনায় যদি আরো ৩.১০ মি. (১০ ফুট) বৃদ্ধি করে শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা যেত অর্থাৎ যদি ১৮.৩৫ মি. (৬০ ফুট) দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট করা হত তা হলে এটি আরো একটা চমৎকার মনোজ্ঞ স্থাপত্যকর্মে পরিণত হতে পারত।' বলা বাহুল্য এ ইমারতের দীর্ঘতা বৃদ্ধি না করার তেমন কোনো সঠিক কারণ জানা যায় না; বরং এ সম্প্রসারণ সাধিত হলে দেয়ালের শেষ মাথা ছাউনি বারান্দার ভিতর মুখের সাথে সারিবদ্ধ হতে পারত।

কিন্তু এ অংশের সমস্তটাই ছিল প্রকল্পের একটা প্রাথমিক পরীক্ষামূলক উদ্যোগ; নির্মাতা এর মধ্য দিয়ে প্রযুক্তির নবপ্রবর্তনের ফলাফল সন্দেহাতীতভাবে নির্ণয় করতে চেয়েছিল যা অবশেষে সফলও হয়েছিল। একে বলা চলে যে এটি সবল ও অবান্তর বিষয়ের অবতারণাহীন খানিকটা প্রশংসনীয়কর্মের ঐতিহাসিক নিদর্শন। জৌনপুর জামে মসজিদ নির্মাণের মধ্যদিয়েই জৌনপুর স্থাপত্য অনুশীলনকর্মের পরিসমাপ্তি ঘটেছে।

শারকী স্থাপত্যকর্মের পর্যালোচনা করতে গেলে এ বংশের প্রথম দিকের নির্মিত স্থাপত্যের সাথে পরবর্তী যুগের নির্মাণ কার্যের তুলনা করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে অটলা মসজিদই শারকী স্থাপত্য পদ্ধতি অনুশীলনের কষ্টিপাথর। প্রায় ষাট বছর ব্যবধানে অটলা মসজিদ ও জৌনপুর জামে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। সুতরাং এটি পরিষ্কার যে এ দুটি স্থাপত্যকর্ম নির্মাণে যেসব কারিগর বা স্থপতি অংশগ্রহণ করেছিল তারা একসময়ের মন ও মানসিকতায় সমৃদ্ধ ছিল না; বরং তারা ভিন্ন দুটি যুগের মানুষ ছিল।

তথাপি দেখা যায় জামে মসজিদের নকশা পরিকল্পনায় শেষাবধি প্রমাণ করেছে যে অটলা মসজিদের নির্মাণকালীন সময়ে তখনকার স্থপতি কারিগরবৃন্দ যে নকশা পরিকল্পনা বেঁধে দিয়েছিল তাই ৬০ বছর পরে অবিচল ও দৃঢ়ভাবে অনুসৃত হয়েছে।

বাস্তবিকপক্ষে অটলা মসজিদে কিছু কিছু কর্ম পরিচর্যার অটলা মসজিদে কর্মদক্ষতা বা উচ্চমান অর্জিত হয়েছিল যা জৌনপুর জামে মসজিদে অর্জিত হয় নি বলে ধারণা করা হয়। অটলা মসজিদের অভিক্ষিপ্ত অংশের গভীরে ও খিলানায়িত প্রশস্ত কুলঙ্গি নির্মাণে দৃষ্ট আকর্ষণীয় পরিচালনা ও বিশেষভাবে বৃহৎ তোরণ পরিচর্যার রকমারিত্ব ভুলার মতো নয়। তা সত্ত্বেও তুলনামূলকভাবে জৌনপুরের সমস্ত স্থাপত্য নির্মাণ কাজ পরখ করে বলা চলে যে জৌনপুর জামে মসজিদ নির্মাণ কাজে অধঃপতিত অবস্থা ও প্রগতিশীল মৌলিক সৃষ্টির অভাব ঘটেছিল। কাজের এ অপরিপূর্ণতা চোখে পড়ে মসজিদ ইমারতের প্রধানত সম্মুখ দেয়ালের উচ্চতা যথাযথ পরিমাপ করার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য অনুভূতির অবাস্তবতায়। এটি হয়তোবা প্রকল্প প্রণয়নকারীদের বাস্তব ধ্যান-ধারণার অভাবজনিত কারণে তাদের সাধ্যের বাইরে কিছু একটা সৃষ্টির চেষ্টা করতে গিয়ে যা তারা প্রকৃতপক্ষে সম্পন্ন করেছিল তাতে আশানুরূপ সাফল্য অর্জিত হতে পারে নি। তারা দুটি বৃহৎ ঢেউ ছাদ যুক্ত মিলনায়তন দ্বারা গঠিত ট্রানসেপ্টের ধারণা পোষণ করেছিল; কিন্তু সুবিধাজনকভাবে বা সন্তোষজনকভাবে বহিস্থ অন্যান্য উপাঙ্গ ও উপকরণের সাথে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছিল। এর ফলশ্রুতিতে দেখা গিয়েছে যে প্রকল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশটাই একটি অসম্পূর্ণতা প্রাপ্ত অসংযুক্ত আলাদা চেহারায় বহিঃপ্রকাশিত হয়েছে।

জৌনপুর জামে মসজিদের নির্মাণশৈলী বিচার করে বলা চলে যে একটি বলিষ্ঠ এবং প্রায় নির্ভীক গঠন সংক্রান্ত মৌলিক উদ্ভাবন বা সৃজনশীল শক্তি সম্পন্নতা হওয়া সত্ত্বেও দক্ষ কারিগরবৃন্দের শ্রম আয়াস সাধ্যতায় এরূপ একটা কাজের ফল শেষ পর্যন্ত সুদূরপ্রসারী

প্রত্যয়ে আনয়ন করতে পারে নি। পি. ব্রাউন সমকালীন ঐতিহাসিকদের মতামতের সাথে সুর মিলিয়ে মন্তব্য করেছেন যে মনে হয় তারা প্রকল্পের সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্টতা নিয়ে প্রকৌশলীক প্রসঙ্গব চেয়ে বেশি মনোযোগ দিতে গিয়ে মসজিদ নির্মাণ প্রক্রিয়াকে অতিসাধারণ মানের স্থাপত্য গুণবিশিষ্ট হওয়ার অবকাশ হতে নিবৃত করতে সমর্থ হয় নি অর্থাৎ খুব উচ্চমান সংবলিত স্থাপত্যকার্যে পরিণত করতে পারে নি।

এ মসজিদে খিলান নির্মাণে বারংবার অবদমিত বা অবনত চতুর্কেন্দ্রিক বা টিউডর খিলানের সাথে বর্শাফলক নকশা অনুকরণে নির্মিত হওয়া সত্ত্বেও তা পরে পুষ্পবিশেষ রূপে দেখা গিয়েছে এবং তা কখনো বাদ দেয়া হয় নি। তবে নির্মাতারা এর ব্যবহারে কদাচিৎ ও বড় একটা নয় এমনভাবে সুখী ছিল। তারা মাঝে মধ্যে এর বক্রতা ও নকশানুরূপ স্বরূপ সম্পর্কে অনিশ্চিত ছিল। অপেক্ষাকৃত বৃহৎ উদাহরণে দুর্বলভাবে আন্দোলিত ও কম্পমান দেখা গিয়েছে, কোনো প্রকার অটলতা বা স্থিরতা ছিল না। এভাবে পদ্ধতির যতই অগ্রগতি হয়েছে ততই এর চেহারার আকারত্বে পরিবর্তন ও পরিপূর্ণতা এসেছে। এটি জামে মসজিদের কেন্দ্রীয় তোরণের বৃহৎ খিলানে এবং ট্রানসেপ্ট মিলনায়তনের ধনুকাকৃতির ঢেউ ছাদের আকারত্বে জ্ঞাপনীয় হয়ে উঠেছে।

অন্যপক্ষে কারিগরবৃন্দ একটি দেশীয় পদ্ধতির প্রযুক্তি ফাঁকা পরিসরের সেতুবন্ধ সৃষ্টির জন্য কড়ি ও ঠেকনা ব্যবহাবে স্পষ্টভাবে অধিক আগ্রহশীল ছিল এবং সে সময়ের ইমারতগুলোতে নজির প্রচুর পরিমাণে দেখা গিয়েছে। পক্ষান্তরে এটি কোনোভাবেই দাবি করা যায় না যে এ সময়ের মসজিদ নির্মাণে কারিগরবৃন্দ খুব একটা দক্ষতাপূর্ণ সূক্ষ্মতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিল। অধিকাংশ বলিষ্ঠ এবং শক্তিসম্পন্ন কাজগুলোই অমসৃণ ও অবশিষ্টভাবে সম্পাদিত হয়েছিল। এদের বৈশিষ্ট্য বীর্যতাপূর্ণতায় বা অভীষ্ট লক্ষ্যজনিত অভিপ্রায়ণে অকৃত্রিমতা কতখানি আন্তরিক ছিল তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা খুবই দুরূহ। তবে সূক্ষ্ম কমনীয় সুরুচিপূর্ণ চমৎকার সৌন্দর্যমণ্ডিত কাজ যা ইতঃপূর্বে মন্দির স্থাপত্যে প্রত্যক্ষ করা গিয়েছিল তার সামান্য চিহ্নই এখানে বিধৃত হয়েছে।

এর স্তম্ভগুলো এক খণ্ড পাথর হতে বর্গাকার মাপে কেটে স্তম্ভ দণ্ড প্রস্তুত করে মাঝখানে ছাঁচে ঢালাই নকশাবন্ধনী অতিক্রম করে অলঙ্করণ করা হয়েছে। এতে স্তম্ভগুলো সৌন্দর্যময় হয়েছে এবং অনুরূপ ছাঁচে ঢালাই নকশায় স্তম্ভশীর্ষ মূলত এখান হতে ভারী আলম্বের ঝাড় নির্গত হয়েছে। এর কিছু কিছু আলম্ব মনোজ্ঞ গঠনাকৃতির, বিশেষভাবে যেখানে একটি আর একটি হতে শাখা বিস্তার করে নির্মিত হয়েছে সেখানে ততটা অমার্জিত বা অসংস্কৃতভাবে সম্পাদিত হয় নি।

অত্যন্ত সতর্কতা সহকারে স্রোতের ন্যায় নকশা নমুনা দ্বারা জানালা-কপাট, খিলানশ্রেণী এবং ছিদ্রযুক্ত পর্দা অলঙ্করণ করে সজ্জায়ন কাজ সম্পাদিত হয়েছে। বিশেষ করে অটলা মসজিদে অনেক জটিল জ্যামিতিক নকশা অঙ্কিত হয়েছে; তবে দুঃখের বিষয় নিখুঁতভাবে সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য খুব দক্ষতা সহকারে রেন্দা করে চাঁছিয়ে মুছে মসৃণ ও মিহিভাবে সম্পন্ন করা হয় নি। তথাপি এসব অকৃত্রিম ভেজালহীন হস্তশিল্পজাত কাজ কল্পনা শক্তি সম্পন্ন ধারণায় সমৃদ্ধ ও সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। কেননা মোটের ওপর এগুলো জীবনীশক্তি, বীর্যবান, তীক্ষ্ণ ও সূক্ষ্ম খোদাইযুক্ত কাঠামো হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছিল। এগুলো সমখোলা, অকপট ও অনুপদিষ্ট এবং নিশ্চিতরূপে প্রতিশ্রুতি জ্ঞাপক যা এতে মুদ্রিত হতে অপেক্ষা রাখে নি।

শারকী শাসক বংশের ইমারতে যে পদ্ধতি দানা বেঁধে উঠেছে তা উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের মাঝেই সীমাবদ্ধ এবং অধিকাংশ জৌনপুর মসজিদের মাঝে পরিপূর্ণভাবে বিধৃত হয়েছে।

বলা বাহুল্য একই সাথে এর অনুশীলনের প্রভাব কিছু পরিমাণে অন্য স্থানের স্থাপত্যকর্মেও দৃষ্ট হয়। এটি বারানসির (ব্যানারস) আড়াই কাঙ্গুরা মসজিদ, কনৌজ ও ইটাওয়া শহরের মসজিদগুলোতে অনুসরণ লক্ষ করা গিয়েছে। এ প্রভাবের উপস্থিতি ঐসব মসজিদের খিলান সম্বলিত তোরণ সম্মুখ দেয়ালের মাঝখানে গঠিত হতে দেখা যায়। অবশ্য পূর্বেই ব্যাখ্যায়িত হয়েছে যে এ পদ্ধতির প্রধান মর্মবাণী অন্য কোনো ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যে বিন্যাসপূর্বক প্রকাশ ঘটে নি। এটি অসম্ভব নয় যে খিলান তোরণের সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যময় এখানকার স্থপতিদের নিজস্ব উদ্ভাবন।

নির্মাতাদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাজনিত প্রযুক্তি মূলত দিল্লি হতে আমদানি করা হয়েছিল এবং স্থানীয় দক্ষ কারিগরদের উদ্ভাবনী প্রতিভা সমানভাবে এতে সংযুক্ত হয়ে অনুরূপ কৌশলযুক্ত ললাটের সামনাসামনি অংশে স্থাপত্যের ফলাফল অর্জিত হয়েছে। পক্ষান্তরে তোরণসহ এর বৃহৎ খিলানপথ তাদের নিজেদেরই আহরণ।

এর সাথে দুর্গের ফটকপথের সামঞ্জস্যতা রয়েছে; তবে এর চেয়ে অধিক কিছুটা এর সমকালীনতা। ইসলাম ধর্মের নৈতিকতাবোধ সংগ্রামশীলতাব গতিদায়ক এবং এর প্রথম দিকে যেখানেই অতর্কিত আক্রমণাদি প্রতিরোধার্থে ফাঁড়ি নির্মাণ কবেছে সেখানেই এর (ইসলামের) অনুসারীরা সাবধানতা অবলম্বন কবে প্রতিরক্ষা দেয়ালের পিছনে আশ্রয় গ্রহণ করেছে এবং দুর্গ তাদের পুনরায় একত্রিত হওয়ার জায়গা। বলা বাহুল্য দুর্গ তোরণ এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

ঐতিহ্যই তাদের আত্মসচেতনতার প্রচ্ছন্ন পটভূমি এবং পবিণামে সংরক্ষিত ফটক দরজা বা তোরণ তাদের প্রতীকে ও আকারে পরিণত হয়েছে। তাদের ঐকান্তিক অভিলাষই তাদের ধর্মীয় স্থাপত্যের মনোহারিত্ব বৃদ্ধিতে মসজিদের সম্মুখ দেয়ালের কেন্দ্রীয় প্রত্যঙ্গরূপে অবস্থান নিয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. জি. মিচেল (সম্পা.), *আর্কিটেকচাব অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড*, লন্ডন, ২০০০, পৃ. ২৭২।
২. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচাব* (ইসলামিক পিবিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৪৩।
৩. *তদেব*, পৃ. ৪৩।
৪. *তদেব*, পৃ. ৪৪।
৫. এস. গ্রোভার, *দি আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া ইসলামিক* (৭২৭-১৭০৭ খ্রি.), দিল্লি, ১৯৮১, পৃ. ৫১-৫২।
৬. This is apprent from the form and shape of the great Jami Masjid of Jaunpur that took over a generation (from 1438 A D. to 1478 A.D.) to complete. cf: *দি আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া ইসলামিক; পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৬।
৭. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৪।
৮. *তদেব*, পৃ. ৪৫।

দশম অধ্যায়

গুজরাট স্থাপত্য

(১৩৯১-১৫৮৩ খ্রি.)

ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাদেশিক স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে গুজরাট স্থাপত্য। পূর্বে এ অঞ্চলটি বোম্বাই প্রেসিডেন্সির উত্তরাংশ ছিল। বর্তমানে গুজরাট ভারতের একটি রাজ্য এবং এর রাজধানী গান্ধীনগর। এ অঞ্চলের ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য দুটি কারণে বিশিষ্টতা লাভ করেছে—প্রথমত, শাসক বংশের অবিরাম স্থাপত্য সাধনা ও পৃষ্ঠপোষকতা এবং স্থাপত্যশিল্প গড়ার আকাঙ্ক্ষা, দ্বিতীয়ত, স্থানীয় অধিবাসীদের সনাতনী অগাধ স্থাপত্য চেতনার অনুশীলন স্পৃহা, অভ্যাস ও প্রবৃত্তি।

১৪০৭ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মোজাফফর শাহ স্বাধীনতা ঘোষণা করে গুজরাটে একটি স্বাধীন রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। ইতিহাসে এটি মোজাফফর শাহী বংশ নামে পরিচিত। আবার অনেক ঐতিহাসিক এ রাজবংশকে আহমদ শাহী বংশ বলে আখ্যায়িত করেছেন। এ বংশের সুলতানগণ প্রায় এক শ পঁয়ষট্টি বছর গুজরাটে রাজত্ব করেছেন। এ বংশের শাসকবৃন্দ খুবই ক্ষমতাবান ছিলেন এবং তাদের চারধারে ক্ষমতা বুঝানোর মতো সাজসরঞ্জামাদির সাক্ষ্য বা চিহ্ন রাখতে উৎসাহ বোধ করতেন। এ ক্ষেত্রে তারা অন্যের সাথে সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টায় অতি ব্যয়বহুল স্থাপত্য নির্মাণে ছিলেন অত্যন্ত যত্নবান।

শুধুমাত্র সৌন্দর্যবোধের কারণে তারা স্থাপত্য অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়েছিল ঠিক তা নয় বরং শক্তিতাড়িত ও সমৃদ্ধিশালী রাজত্ব তাদের মাঝে আত্মগরিমা ও অহমিকা সৃষ্টি করেছিল এবং তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে সুরম্য ও জাঁকালো ইমারত নির্মাণের অব্যাহত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে। অন্যপক্ষে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে গুজরাটের মুসলিম স্থাপত্য আদর্শ সৃষ্টিতে চরম শিখরে আরোহণ করতে সক্ষম না হলেও এটি ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

সুলতানগণ বিজিত অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের অপ্রতিদ্বন্দ্বীহীন সৌন্দর্যবোধক চেতনালোকে উদ্দীপ্ত হয়ে অনিন্দ্য সুন্দর স্থাপত্যকীর্তি নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। মুসলিম শাসকরা সর্বত্রই তাদের পরিকল্পিত কাজের জন্য স্থানীয় কারিগর ও শ্রমিকদের ওপর নির্ভরশীল হত। তারা স্থাপত্য বা অন্য যে কোনো ধরনের কাজে স্থানীয় শিল্পীদের সহযোগিতা গ্রহণ করত। সৌভাগ্যবশত ভারতের সবচেয়ে পারদর্শী কারিগর ও স্থপতি গুজরাটের অধিবাসীবৃন্দ এবং তাদের স্থাপত্যশিল্প গড়ার আকাঙ্ক্ষাই নতুন শাসকগণ কাজে লাগিয়েছিল। তারা যুগ যুগান্তর হতে স্থাপত্য নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে কারিগর

হিসেবে দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। মূলত অতীতে হিন্দু মন্দির ও জৈন মন্দিরগুলো তারাই নির্মাণ করেছিল। মন্দিরগুলোর কেবল গাঁথুনি কাঠামোই গড়ে তোলেনি বরং ঐগুলো যথেষ্ট পরিমাণে সুশোভন ও অলঙ্কৃত করে সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে স্থাপত্য এবং শিল্পজাত চারুবিদ্যা তাদের চেতনাকে বহু পূর্ব হতে বিকাশমান করে তুলেছিল। যখন মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন স্থানীয় অধিবাসীদের সামনে প্রভু হিসেবে এসব শাসক স্থাপত্যকর্ম নির্মাণে সুযোগের সদ্ব্যবহার করে। কেবল করেই নি বরং নতুন পরিস্থিতিকে নিজেদের শিল্প বাসনাকে রূপায়িত করতে কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হতে হয় নি।

এটি উল্লেখ্য যে নতুন শাসকদের আগমনের সময় পর্যন্ত স্থানীয় কারিগরগণ তাদের স্থাপত্য অনুশীলনের নিজস্ব নিয়ম ও প্রণালী কঠোরভাবে অনুসরণ করে নির্মাণ প্রকল্প সম্পাদন করত। তারা শীলপাস (silpas) নামক নিজস্ব স্থাপত্য অনুশাসনমালা মেনে চলত। আবহমানকাল হতে বংশ পরম্পরায় নিজস্ব স্থাপত্য অনুশাসনমালায় অভিজ্ঞ স্থানীয় কারিগরগণ যখন মন্দির বা অনুরূপ স্থাপত্য ইমারতের বাইরে অন্যরকম স্থাপত্য নির্মাণের জন্য নির্দেশিত হয়েছিল তখন তারা প্রথমে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পতিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তারা মসজিদ ও মাকবারা নির্মাণে যথেষ্ট দক্ষতা প্রদর্শনে সক্ষম হয়। কিন্তু তারা তাদের প্রাচীন স্থাপত্য অনুশাসন বা প্রথা একেবারে বাতিল করতে পারেনি।

অন্যপক্ষে মুসলিম শাসকদের স্থাপত্যকর্ম তদারকিতে স্থানীয় কারিগর ও স্থপতিদের সাধারণ ধরনের কার্যক্রমে অসুবিধা হত না বা তাদের কারিগরি দক্ষতা প্রয়োগে বাধাপ্রাপ্ত হত না। যখন মুসলিম শাসকবৃন্দ তাদের ধর্মীয় সীমাবদ্ধ অনুশাসনের স্থাপত্যকর্ম বা প্রকল্পের মাপ ও আকারত্বসহ নির্দেশ প্রদান করত তখনো তারা তাদের আবহমানকালের অভিজ্ঞতাপুষ্ট চারুকলা ও সৌন্দর্যবোধক জ্ঞান নিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে নির্মাণ কৌশল প্রয়োগের চেষ্টা করেছিল। ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্য নির্মাণ কার্যক্রমে গুজরাটের স্থাপত্য কারিগরগণ এ বাধ্যবাধকতা হতে নিজেদের ক্রমে ক্রমে মুক্ত করে স্থাপত্যকর্ম অব্যাহত রাখতে পেরেছিল। অবশ্য তাদের নিজস্ব স্থাপত্যরীতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে তা অনুসরণ করে স্থাপত্য নির্মাণ কাজ করেছিল।

ইমারত নির্মাণ কাজে স্থানীয় স্থপতিদের নিয়োগের ফলে মুসলিম শাসকদের অধীনে সকল প্রাদেশিক স্থাপত্য পদ্ধতি গুজরাটের মতো ভারতীয় চরিত্র নিষিক্ত হয়ে নির্মিত হয়েছিল তা নয়, বরং প্রতিটি প্রাদেশিক স্থাপত্য প্রকল্প নির্মাণে যে স্পৃহা ও ইচ্ছা দেখা গিয়েছে তা কঠোরভাবে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুসরণ করে ইসলামি নমুনায় বা রীতির ব্যবহার স্থাপত্যকর্মে প্রতিফলিত হতে দেখা গিয়েছে। তা সত্ত্বেও বাস্তবে অনেক ইসলামি সুরম্য অট্টালিকার উদাহরণে মোটামুটিভাবে স্থাপত্যকর্মের অধিক অংশ জুড়ে বা প্রায় সম্পূর্ণ গঠন কাঠামোতে হিন্দু বা জৈন মন্দিরের স্থাপত্য আদর্শের আগমন ঘটেছে। অনেক সময় মন্দিরের মালমসলা বা উপকরণাদি ব্যবহারের সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও এদের আগমন ইসলামি ইমারতে সম্ভব হয়ে উঠেছিল।

উল্লেখ্য যে মুসলিম শাসকবৃন্দ কোনো অঞ্চলে স্বীয় শাসন প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে তারা নিজেদের স্থাপত্য প্রক্রিয়া নিজস্ব রীতিতে ইসলামি প্রথার সমর্থনে স্থাপত্য ইমারত নির্মাণে ব্রতী হত। কিন্তু গুজরাটই একমাত্র ব্যতিক্রম যেখানে স্থানীয় কারিগর ও স্থপতি বা তাদের নিজস্ব স্থাপত্য প্রতিভা ও উর্বর মেধা মুসলিম স্থাপত্য প্রয়োগের প্রয়াস পেয়েছিল। পি. ব্রাউন[১] অনুরূপ ঘটনা ইংল্যান্ডের ইতিহাসে ঘটেছিল বলে মন্তব্য করেছেন। ইংল্যান্ড বিজয়ী

উইলিয়ামের রাজত্ব শুরু হলে গথিক্ পদ্ধতির গির্জা নির্মাণকালে এ নরম্যান বিজয়ীকে স্থানীয় ইংরেজ স্থপতি ও কারিগরদের মর্জির ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করতে হয়েছিল। অনুরূপভাবে মুসলিম বিজেতাদেরকে স্থানীয় গুজরাটের স্থপতি ও কারিগরদেব ওপর নির্ভরশীল হয়ে তাদের মসজিদ ও মাকবারা নির্মাণ করতে হয়েছিল। আবার এসব স্থাপত্যকর্ম বাস্তবায়নের সময় অজ্ঞাতানুসারে তাদের নিয়ন্ত্রিত প্রভাব সত্ত্বেও নতুন পরিস্থিতিতে অনন্যসাধারণ সৌন্দর্যময় ও মজবুত স্থাপত্য ইমারত নির্মিত হল যা বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গিতে পৃথিবীর স্থাপত্য কোষাগার ঐশ্বর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

গুজবাটে ইসলামি পদ্ধতির স্থাপত্যধারা আড়াই শ বছর ধরে প্রায অবিরত গতিতে গড়ে উঠেছিল। এর যাত্রাপথের সূচনা হয়েছিল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যখন দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খল্‌জীর প্রাদেশিক শাসনকর্তা উলুগ খানের হাতে শাসনভার ন্যস্ত হয়েছিল। উক্ত শাসনকর্তা গুজরাটের তদানীন্তন রাজধানী আনাহিলওয়াড় পাটন শহবকে কেন্দ্র কবে স্থাপত্য গড়তে শুরু করেন। এ স্থাপত্যায়ন ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে আহমদ শাহী বংশের রাজত্ব মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অবিরাম গতিতে চলতে থাকে। দিন যতই এগিয়ে গিয়েছে ততই গুজরাটের স্থাপত্যধারার গুণাগুণ ও বচনাশৈলীব উন্নয়নে উৎকর্ষ লাভ করেছিল অবলীলাক্রমে।

গুজরাটে গড়ে ওঠা ইসলামিক স্থাপত্যধারাকে মোটামুটি তিনটি পর্বে বিভক্ত করা যায়। প্রথম পর্ব শুরু হয় চতুর্দশ শতাব্দীতে। ঐ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশকে বহিবাগত শাসক সম্প্রদায় তাদের অভ্যাস ও রীতিগতভাবে পূর্বনির্মিত ইমাবতগুলো ভেঙে ফেলে সেখান থেকে তাদের ইমাবত নির্মাণের উপকরণ সংগ্রহ করত অথবা প্রয়োজনমতো পূর্ণ রূপান্তব ও অবয়বের পরিবর্তন করে নিত। এ স্তরে স্থাপত্যকর্মগুলোকে নির্দিষ্ট আকাবে বিন্যাস বা সংগঠিত করতে পূর্বের কাঠামোব কিছু যোগ-বিয়োগ কবে পরীক্ষামূলকভাবে মসজিদ নির্মাণ করেছিল। প্রাথমিক স্তরে এভাবেই স্থাপত্যকর্মে চমক সৃষ্টিব মধ্য দিয়ে উৎকর্ষতা সাধনে শাসকরা ব্রতী হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পদ্ধতিগুলো তখন যুগ পবিবর্তনের অতিক্রম রেখায় অবস্থান করছিল; স্থাপত্যশিল্পের যুগসন্ধিক্ষণেব ক্রান্তিলগ্নে আদর্শ থমকে দাঁড়িয়েছিল। কেননা পূর্ব ও পরের স্থাপত্য আদর্শ বা পদ্ধতি একটি অপরটি হতে দূরে দূরে অবস্থান করছিল; এক সঙ্গে এসে একত্রীভূত হতে পারে নি। কাজেই তখন পর্যন্ত স্থাপত্যের সঠিক ও সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয় নি। আপাতদৃষ্টিতে অগ্রসরমান মনে না হলেও পরিস্থিতি অনুকূলে এসেছিল। এটিই প্রাথমিক বা প্রস্তুতি যুগ। এ প্রান্তিকের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ক্যাম্বের জামি মসজিদ (১৩২৫ খ্রি.)।

গুজরাট স্থাপত্যের দ্বিতীয় পর্ব বা স্তরে যে সময়কাল অতিবাহিত হয়েছিল তা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশক। এ সময়ে স্থাপত্যশিল্প প্রাথমিক অবস্থা পূর্ণ করে নিষ্পাদিত বা নিখুঁত যুগের দিকে অগ্রসর হচ্ছিল; যদিও তখন পর্যন্ত ঈষৎ পরীক্ষামূলক বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল মাত্র এবং তা কর্তৃপক্ষের অর্থাৎ শাসকদের পরামর্শ ও নির্দেশনার প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে অগ্রসরমান ছিল। এ সময়ের স্থাপত্যকর্মের উন্নয়নশীলতার আপতিক উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে আহমদাবাদের জামি মসজিদ। এ মসজিদ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় কিছুটা নতুনত্বের আভাস পাওয়া যায়। পূর্বের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের মাঝেই তারা দক্ষতার সাথে নিজেদের প্রয়োজনীয় রূপ পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে সক্ষম হয় এবং উদ্ভাবিত প্রযুক্তি প্রয়োগ করে স্থাপত্য কর্মকাণ্ডকে উন্নতির চরম সীমায় প্রায় পৌছে দিতে সক্ষম হয়েছিল। বলা বাহুল্য স্থাপত্য কার্যক্রমের এ যুগ আহমদ শাহী যুগ হিসেবে সমধিক পরিচিত।

গুজরাট স্থাপত্যের তৃতীয় পর্ব বা স্তরের ব্যাপ্তি ছিল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাঁচ দশক হতে শুরু করে ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টদশক সময়কাল পর্যন্ত। কেননা এ সময়ে নির্মিত স্থাপত্য ইমারতের বৈশিষ্ট্য লক্ষণাদি অবলোকনে প্রথম মাহমুদ বেগড়া (১৪৫৮-১৫১১ খ্রি.) ও তার উত্তরাধিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতার প্রভাব বিদ্যমান বলে মনে হয়। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পদ্ধতির বিশ্লেষণ করলে চমৎকার মনোরম বৈশিষ্ট্যময় স্থাপত্যকর্মগুলো বেগড়া যুগের অনুকূল পরিবেশে নির্মিত হতে পেরেছিল। এ যুগের প্রতিনিধিত্বমূলক স্থাপত্য ইমারত হচ্ছে চম্পানির জামে মসজিদ।

গুজরাট স্থাপত্যের প্রথমপর্ব (১৩০০-১৪১১ খ্রি.) :

প্রথম পর্বে পাটন, ভারুচ, ক্যাম্বে ও ধোলকায় গুজরাটের মুসলিম স্থাপত্য ১৩০০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৪১১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অনুশীলন অব্যাহত ছিল। এ পর্বে বিস্তৃতভাবে মৌলিক স্থাপত্যের নিদর্শন অতীব বিরল। স্থাপত্য বিবরণী ও নথিপত্রে প্রধানত পূর্ব স্থাপত্যকর্মের কাঠামোগুলোকে পরিবর্তন করে মুসলিম ইমারতের রূপান্তর ঘটেছিল বলে জানা যায়। দশম শতাব্দী হতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত টিকে থাকা সোলাঙ্কি (solanki) হিন্দু রাজবংশের প্রাচীন নগরী আনাহিলওয়াড়ের অতি নিকটে পাটন শহর অবস্থিত। এখানেই অনুরূপভাবে স্থাপত্য রূপান্তরের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায়। নানা কারণে এ শহরটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কেননা গুজরাট যখন দিল্লির মুসলিম সুলতানের শাসনাধীন চলে যায় তখন দিল্লির রাজ প্রতিনিধি এখান হতেই শাসনকার্য পরিচালনা করেছিলেন।

এ স্থানে নির্মিত বা রূপান্তরিত স্থাপত্যকর্মগুলো সে সময়ের রাজনৈতিক অস্থিতিশীল পরিস্থিতির ইঙ্গিত প্রদান করে। ভারতের অন্য প্রদেশগুলোতে নবাগত মুসলিম শাসকরা যেভাবে স্থাপত্যশিল্প গড়ে তুলেছিল গুজরাটেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। অবশ্য এর সাথে গুজরাটের স্থানীয় স্থাপত্য ইমারতগুলো যোগ হয়েছিল মাত্র। প্রথম যুগে যে সমস্ত স্থাপত্য ইমারত গড়ে উঠেছিল তন্মধ্যে শেখ ফরিদের সমাধিসৌধ অন্যতম। এটি ১৩০০ খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে পাটনে সরস্বতী নদীর বামতীরে নির্মিত হয়।

দেখলেই বুঝা যায় যে এর অধিকাংশ মালমসলা হিন্দু মন্দির থেকে সংগৃহীত হয়েছিল এবং কিছু নতুন উপকরণ সংযোজন করে মাকবারা নির্মাণ করা হয়েছিল। পাটনে আদিনা মসজিদ নামে আর একটি ইমারত নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদ নির্মাণেও মালমসলা পরিত্যক্ত হিন্দু মন্দির হতে সংগৃহীত হয়েছিল। শাসকবৃন্দ অতি দ্রুততায় মালমসলা সংগ্রহ করে এ মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। ফলে ইমারতের কাঠামো মজবুত হতে পারে নি এবং কালক্রমে এটি সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে নির্মিত অসংখ্য হিন্দু মন্দির ভেঙে সেখান হতে সংগৃহীত মালমসলা বা উপকরণ চতুর্দশ শতাব্দীতে মুসলিম মসজিদ ও মাকবারা নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছিল। এ থেকে অপর একটি তথ্য অবগত হওয়া যায় যে অঞ্চলটি হিন্দু ও জৈন মন্দির স্থাপত্যে সমৃদ্ধ ছিল এবং এ নির্দয় ধ্বংসলীলার পরও প্রাথমিক যুগের অনেক মন্দির টিকে থেকে মন্দির শিল্পের বিপুল অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে।

ভারুচের জামি মসজিদ (১৩২১ খ্রি.) :

গুজরাট স্থাপত্যের প্রথম পর্বে যখন আদি স্থাপত্য ইমারতগুলো অর্থাৎ হিন্দু বা জৈনদের নির্মিত মন্দিরগুলো উপস্থিত পূর্বাহ্নে প্রস্তুত না হয়ে বা প্রস্তুতিহীন অবস্থায় মুসলিম স্থাপত্য

গঠন করেছিল তার প্রথম উদাহরণ হচ্ছে সামুদ্রিক বন্দর ভারুচে (bharuch) নির্মিত জামি মসজিদ।[২] সম্ভবত এটি চতুর্দশ শতাব্দীতে গুজরাট মুসলিম শাসনাধীনে আসার পরপরই এ মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের অবয়ব দেখলেই এটি প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে যে মন্দির হতে সংগৃহীত উপাদান সহযোগে মসজিদের অধিকাংশ কাঠামো গঠিত হয়েছে। তবে ঐতিহাসিকদের মতে পূর্বনির্মিত কোনো মন্দিরকে মসজিদে রূপান্তর করা হয় নি বা কোনো অবিকল মন্দির অংশ উৎপাটিত করে এনে এখানে সংযুক্ত করা হয় নি। বিচূর্ণ মন্দিরের মালমসলা একত্র করে নতুনরূপ দেওয়া হয়েছিল মাত্র।

এ মসজিদ প্রকারান্তরে আদি আদর্শ মসজিদ নকশায় নির্মাণ করা হয়েছিল। ফলে উক্ত মসজিদের জুল্লাহ অংশ উন্মুক্ত স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটি দেখতে প্রায় সম্প্রসারিত বারান্দার মতো মনে হয়। সাধারণত মসজিদের সম্মুখভাগ দিয়ে খিলানশ্রেণী শোভাবর্ধন করে থাকে। কিন্তু এ মসজিদে কিছুটা ব্যতিক্রম অবস্থা লক্ষ করা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে মসজিদের মোটামুটি দু প্রকারের কাঠামো দৃষ্ট হয়ে থাকে। এ কাঠামোর বিভিন্নতা স্থানীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতি দ্বারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত।

মসজিদ গঠন কাঠামোর একটি হচ্ছে সম্মুখ দেয়ালে খিলান পর্দা এবং তার সাথে খিলানায়িত তোরণ থাকে এবং স্তম্ভগুলো জুল্লাহর ভিতবে অবস্থান করে যা বাইরে থেকে দেখা যায় না। অন্যটি হচ্ছে উন্মুক্ত স্তম্ভশ্রেণী ও খিলান বাইর হতে ভিতরের স্তম্ভ বা থামগুলো দেখা যায়। এ মসজিদটি উন্মুক্ত শ্রেণীর মসজিদ স্থাপত্যের অন্তর্ভুক্ত।

মসজিদের গঠন প্রণালী সম্পূর্ণরূপে স্থানীয় প্রভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে এরূপ ধারণা ঠিক নয়। কেননা মসজিদের গঠন প্রণালীতে দু ধরনের পদ্ধতি অনুসরণের পিছনে প্রাচীন দু টি ঐতিহ্যগত কারণ দৃষ্ট হয়। প্রথমত, রসুলে খোদা হযবত মোহাম্মদ (দঃ) এর হাতে নির্মিত তাঁর হুজুরা খানা সমেত মদিনার প্রথম মসজিদ স্তম্ভ বা থাম ঘেরা বৃহৎ বারান্দার সমাহার ছিল; অন্যপক্ষে তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান বিন আফফান (বাঃ) উক্ত মসজিদের সম্মুখে পর্দা জুড়ে দিয়ে গোপনীয়তার প্রয়াস সৃষ্টি করেছিলেন। মোটের ওপর পরবর্তীকালে বা ভারতীয় উপমহাদেশে মসজিদ স্থাপত্য উন্নয়নে যে কোনো একটি মসজিদ নকশা আঞ্চলিক শাসনকর্তাগণ স্থানীয় পরিবেশে ও আবহাওয়ার অবস্থার সাথে সন্ধি করে ব্যক্তিগত পছন্দ অনুসারে তা প্রয়োগ করতেন। ঠিক সে কারণে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে উভয় প্রকারের নকশা পরিকল্পনার মসজিদ গড়ে উঠেছিল।

ভারুচের এ আয়তাকার মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৩৮.৪০ মি. এবং প্রস্থে ১৫.৮৫ মি.। নামাজঘরটি পাঁচ 'আইল' ও তের 'বে'-তে বিভক্ত। 'বে' এবং আইলগুলো সমপরিমাপের নয় (ভূমি নকশা নং- ২৭)। সম্পূর্ণ নামাজঘর ১৩টি গম্বুজে পরিবৃত। মাঝের গম্বুজগুলো বড় হলেও পশ্চিম ও পূর্ব আইলের উপর অবস্থিত গম্বুজগুলো ক্ষুদ্রাকৃতির। সবগুলো গম্বুজই কৌণিক। ট্রাবিয়েট পদ্ধতিতে গম্বুজগুলো নির্মিত হলেও এগুলোর তলদেশ অতি মোলায়েমভাবে অলঙ্কৃত।

ভারুচ (ব্রোচ) শহরে নির্মিত মসজিদ উন্মুক্ত আদলের অন্তর্ভুক্ত। এর খোলা দেয়ালের সাথে স্তম্ভগুলো সাজানো হয়েছে। এর সম্পূর্ণ অভ্যন্তরভাগ তিনটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত এবং এতে ধারণা করা হয় যে তিনটি মন্দির-মণ্ডপ বা স্তম্ভায়িত মিলনায়তনকে অন্যত্র হতে উৎপাটিত করে এনে এখানে পুনঃএকত্রিত করার ফলে নতুন একটা মসজিদের অবয়ব প্রাপ্তি ঘটেছিল। এর ৪৮টি স্তম্ভই আলম্ব ধরনের এবং প্রচুর পরিমাণে খোদাই কাজে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। এটি স্পষ্টত বুঝা যায় যে অন্য ইমারত হতে উৎপাটিত করে না আনলে ঐরূপ

চেহারার প্রাপ্তি ঘটত না। অবশ্য মজবুতভাবে নির্মিত জুল্লাহ্ অংশের দেয়ালগুলো পাথর কেটে মাপমতো সাইজ বা আকার দিয়ে তার পরে লাগানো হয়েছে। এ পদ্ধতিতে নির্মিত প্রথম মসজিদে কাঠামো গঠন প্রণালী বা প্রকৃতি এরূপই পরিলক্ষিত হয় (চিত্র নং- ৫০)।

গুজরাট স্থাপত্যেব প্রথম মুসলিম যুগে যে ইমারতগুলো হিন্দু মন্দির বা জৈন মন্দির হতে রূপান্তর ঘটেছিল সেখানে প্রথাগত বা অভ্যাসগতভাবে ধরে নেওয়া যেতে পাবে যে মসজিদ স্তম্ভগুলো বিনা দ্বিধায় যে কোনো মন্দির হতে সংগ্রহ করা হয়েছিল অথবা বলা চলে যে স্তম্ভ হিন্দুর আর দেয়াল মুসলমানের। এ ঐতিহাসিক তথ্যের ওপর ভিত্তি করে বা বিশেষ
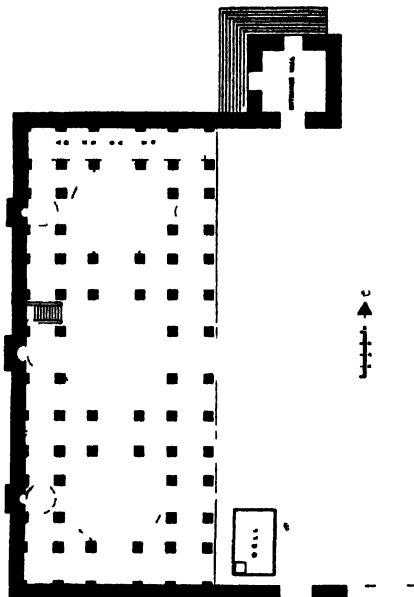
ভূমি নকশা নং-২৭ . ভারুচেব জামি মসজিদ

বিশেষ ক্ষেত্রে একে সঠিক বলে গণ্য কবলে দেখা যায় যে মসজিদের স্তম্ভগুলো আদি মূল আকারত্বেই মসজিদ স্থাপত্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অনেক সময় প্রয়োজনবোধে আকার পরিবর্তন করে পুরোনো জিনিসকে নতুন বিভাজন দিয়ে তা মজবুতভাবে মানানসই করে দে'য়ালে লাগানো হয়েছিল।

তবে স্থাপত্য অঙ্গ গঠন অবলোকনে বুঝা যায় যে মালমসলার সহযোগে দেয়াল গাঁথুনি করে ইমারত নির্মাণ কবা হয়েছে। এ পর্যায় মুসলিম স্থাপত্য ইমারতের গাঁথুনি করা অংশটুকু মৌলিক উৎপাদিত বা উপাদান বলে মনে করা যায়। মসজিদ ও মাকবারা নকশা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নানা ধরনের ও আকারের প্রস্তর খণ্ড ও আকারপ্রাপ্ত প্রস্তর এনে প্রয়োজনবোধে তা পুনরায় মাপ দিয়ে চাহিদা অনুসারে নির্মাণ কাজে প্রয়োগ করা হত। ভারূচ মসজিদের দেয়াল মসজিদ নির্মাণের সময়ে নির্মিত হয়েছিল এবং আদিতে এটি কোনো ইমারতের অংশ ছিল না। তখনকার মুসলিম ইমারতের মতোই মন্দিরের মালমসলা

ব্যবহার করা হয়েছিল। মসজিদের অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব নির্মিত হয়েছিল। জুল্লাহর অন্যান্য অংশে খিলানায়িত জানালার সারিতে পাথরের নির্মিত সুন্দর জালি নকশা দ্বারা আবৃত। এ মসজিদের ইসলামি রীতির প্রতি দৃষ্টি রেখে নির্মাণ কাজ করার চেষ্টা নেওয়া হলেও এতে পরিপূর্ণ ইসলামিক আদর্শ মূর্ত হয়ে ওঠে নি।

মসজিদের দৃশ্যপটের নকশা বা ব্যবহৃত ডিজাইন সম্পূর্ণভাবে স্থানীয় রীতির স্পর্শতা মসজিদ অঙ্গে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে। বিশেষভাবে মসজিদের মিহরাবের আকৃতিতে তা প্রত্যক্ষ করা যায়। এটি মন্দির স্থাপত্যের সাধারণ কুলঙ্গির আকৃতি নমুনায় নির্মিত হয়েছিল। অন্যপক্ষে ইসলামি সূচ্যগ্র খিলান সর্দলের সাথে ব্যবহৃত হয়েছে। হিন্দু বা জৈন স্থাপত্যের কোনো ধর্মীয় প্রতীক চিহ্ন এবং পশু ও পাখির বাহন সযত্নে পরিহার করে তার স্থলে তৌহিদি ভাবমূলক নির্বস্তুক অলঙ্করণ প্রয়োগ করা হয়েছে।

জুল্লাহর ছাদ গঠনে কড়িকাঠের উপর (beams) তিনটি বড় গম্বুজ ও দশটি ছোট গম্বুজ নির্মিত হয়েছিল এবং এগুলোর তলদেশ (celıngs) বৃক্ষ পত্রাদির সুচালো ডগা ও জ্যামিতিক নকশালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করা হয়, যা মন্দির সজ্জায়নের অংশবিশেষ ছিল বলে পি. ব্রাউন মনে করেন।[৩] কিন্তু কোনো তলছাদ বা তলছাদে খোদাইকৃত কোনো অংশ অন্যত্র হতে খুলে এনে কীভাবে মসজিদের তলছাদের জায়গায় বা অংশে লাগানো সম্ভবপব হতে পারে, বড়জোর উক্ত নকশার বা অলঙ্করণের অনুকরণে বা নমুনা অনুসারে মসজিদ তলছাদ নকশায়িত করা যেতে পারে।

এ ধরনের চতুষ্কোণ আকারে ভিতবে ঢুকানো আড়াআড়ি প্রণালীতে নির্মিত তলছাদ গুজরাট স্থাপত্যের প্রথম পর্বে সর্বত্র ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে। এতে যেহেতু কোনো দেব-দেবীর বা তাদের বাহনেব প্রতীক চিহ্ন বহন করত না সেহেতু এটি ইসলামি তমদ্দুন বা তৌহিদের পরিপন্থী ছিল না। তাই এটি তখন হতে গুজরাট মুসলিম স্থাপত্যে অত্যন্ত কার্যকরভাবে প্রচলিত হয়েছিল এবং এর ব্যবহার বাধা প্রাপ্ত হয়নি।

ভারুচ শহরের জামি মসজিদের আকারতত্ত্ব ও পদ্ধতি অবলোকনে প্রতীয়মান হয়ে ওঠে যে এটি নির্মাণকালে বিশেষ কতকগুলো নির্দেশনা ও তত্ত্বাবধান ছাড়া মুসলমান তদারককারীদের তেমন কোনো ভূমিকা পালনের হয়তো কোনো অবকাশ ছিল না। সমস্ত নির্মাণ কাজই স্থানীয় স্থপতি ও কারিগরবৃন্দ সম্পাদন কবেছিল। বলা বাহুল্য স্থপতি ও কারিগরবৃন্দ ইতঃপূর্বে অনুরূপ কোনো স্থাপত্যিক কাঠামোর সাথে পরিচিত ছিল না।

ক্যাম্বে জামি মসজিদ :

১৩২৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে প্রায় ২৫ বছর বিরতির পর যখন প্রশাসনিক কেন্দ্রবিন্দু ভারুচ হতে প্রাচীন সামুদ্রিক বন্দর ক্যাম্বে শহরে স্থানান্তরিত হয় এবং এখানে একটি জামি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এ মসজিদটির নির্মাতা ছিলেন জনৈক দৌলত শাহ্ মুহাম্মদ বুতমারী। ইনি মুহাম্মদ বিন তোঘলকের আমলে অত্র অঞ্চলের প্রাদেশিক গভর্নর ছিলেন।

আয়তাকার নকশা পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদটির উত্তর-দক্ষিণে ৭৬.৮০ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ৬৪.৬০ মি.। মসজিদের মূল নামাজগৃহ সাত 'আইল' ও সাতাইশ 'বে'-তে বিভক্ত এবং এর ছাদ ১৪টি গম্বুজে পরিবৃত (ভূমি নকশা নং- ২৮)। এ গম্বুজগুলোও কৌণিক আকৃতির এবং ছাদতল অতি নিখুঁতভাবে অলঙ্কৃত। ফাসাদে তিন খিলানের সমন্বয়ে একটি পর্দা ব্যতীত উভয়পার্শ্বের অবশিষ্ট অংশ সাহনের দিকে উন্মুক্ত। মসজিদের প্রায়

বর্গাকৃতি সাহনের তিনদিকে চার আইল গভীর রিওয়াক রয়েছে। রিওয়াকের ছাদও কৌণিক গম্বুজে পরিবৃত। মসজিদে প্রবেশের জন্য উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ রিওয়াকে তিনটি প্রবেশপথ
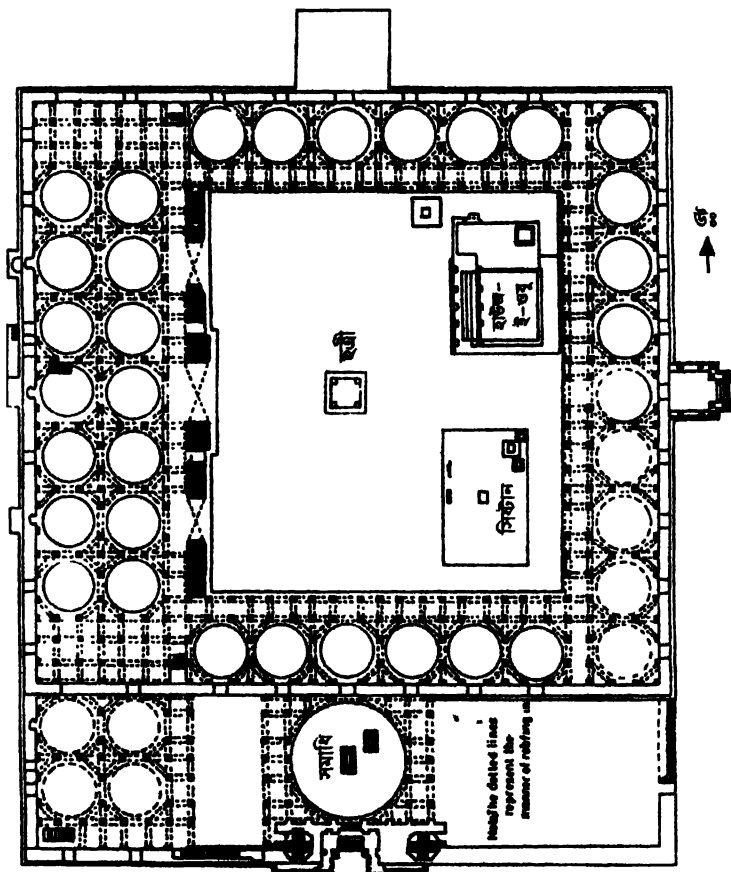
ভূমি নকশা নং-২৮ : ক্যাম্বে জামি মসজিদ

রয়েছে। এ পথগুলোর মধ্যে পূর্ব ও দক্ষিণের প্রবেশ পথ দুটোই মনোরম স্থাপত্য অবয়ব নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

ক্যাম্বে জামি মসজিদের নকশা পরিকল্পনা অবলোকন করলে প্রতীয়মান হয় যে কেবল স্থানীয় মন্দির নির্মাণলব্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্থপতি ও কারিগর এটি নির্মাণ করে নি; বরং দিল্লি হতে একদল মসজিদ নির্মাণে অভিজ্ঞ দক্ষ স্থপতি ও কারিগর আনয়ন করা হয়েছিল। তারা স্থানীয় কারিগর ও স্থপতিদের সাথে একযোগে মসজিদ নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। মসজিদের জুল্লাহ্ অংশের কাজে যথেষ্ট অভিনবত্ব রয়েছে, যা গুজরাটের স্থানীয় কারিগরদের দ্বারা করানো কোনোভাবেই সম্ভব ছিল না। এ কাঠামো পূর্বের মতো খোলামেলা কাঠামো

ছিল না। এর সম্মুখ দেয়াল দিল্লির কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদ বা আড়াই দিন-কা-ঝোঁপড়া মসজিদের অনুরূপ ছিল। এর সম্মুখ দেয়ালে অনেকগুলো সারিবদ্ধ খিলান সহযোগে নির্মিত খিলান পর্দা সংযোজন করা হয়েছিল।

তাছাড়া মসজিদের খিলানের আকারত্ব, এর অবস্থা এবং গাঁথুনির কৌশল বৈশিষ্ট্য বা প্রণালী যথা- পর্যায়ক্রমে প্রস্থ ও সংকীর্ণ প্রক্রিয়া বা ধারায় গঠিত হওয়ার সুযোগ প্রভৃতি দেখে বলা যায় সমস্ত কাঠামোর স্থাপত্যিক গঠন প্রণালী ঘোষণা করছে যে এর নির্মাণকার্যে কেবল দিল্লির প্রশিক্ষিত স্থপতি ও কারিগর অংশগ্রহণ করে নি বরং তারা স্থানীয় কারিগরগণকে সাথে নিয়ে নির্মাণ কাজ সুসম্পন্ন করেছিল। তবে স্থানীয় কারিগরদেরকে কাজ করার মতো প্রশিক্ষণ দেয়ার পর তাদের সাথে একত্রে এ কাজ সম্পাদন করা হয়েছিল। উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় একটা নান্দনিক শিল্প সৃষ্টি হয়েছিল।

ক্যাম্বে জামে মসজিদের নির্মাণশৈলী ও পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে এটি খল্‌জী স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যকে অনুসরণ করে নির্মিত। কেননা দিল্লির নিজামউদ্দিন আউলিয়ার দরগা শরিফের জামাতখানা মসজিদে ব্যবহৃত সম্মুখ দেয়ালের গঠনের প্রক্রিয়া ও কৌশল ক্যাম্বে জামে মসজিদে প্রয়োগ করা হয়েছে।[৪] পক্ষান্তরে আবো বলা যায় যে মসজিদের অভ্যন্তরের সামনের দিকে দেয়ালে নির্মিত খিলানপথগুলোর গঠনে কিছুটা আজমির মসজিদের কৌশল অনুকরণ লক্ষ করা যায়। এ মসজিদের কেন্দ্রীয় খিলানে ব্যবহৃত স্তম্ভগুলোর সাথে আজমীর মসজিদের স্তম্ভগুলোর সাদৃশ্য রয়েছে।

অলঙ্কৃত খিলানের অংশবিশেষ কোনো মন্দির হতে খুলে এনে লাগানোর ফলে ক্যাম্বে মসজিদের স্তম্ভগুলো তুলনামূলকভাবে আরো সৌন্দর্য ও সুষমামণ্ডিত হতে পেরেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে এ স্থাপত্য আদর্শ প্রতীক লক্ষণীয়ভাবে পরবর্তীকালে অতি দ্রুততার সাথে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে তা সৌন্দর্যময় ঝুলন্ত খিলান (flying arch) রূপে বা নামে গুজরাট মসজিদের সম্মুখ দেয়ালের কেন্দ্রীয় দরজায় নির্মিত হতে দেখা গিয়েছে (চিত্র নং- ৫১)।

এ ছাড়া ক্যাম্বে মসজিদের অংশবিশেষের সুষম গঠন ও সুবিন্যস্ত মর্যাদাপূর্ণ বহিঃপ্রকাশ এবং অতি সাধারণ বোধগম্য নকশা পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে গুজরাট মসজিদ স্থাপত্যকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং এটি তৎকালে অনুসরণীয় আদর্শরূপে পরিগণিত হয়েছিল। অন্যপক্ষে ক্যাম্বে মসজিদ নির্মাণকালীন পরিস্থিতির স্থাপত্যকর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে বুঝা যায় কীভাবে বিশেষ ধরনের গঠন আকৃতির সূচনা ধীরে ধীরে সুষমামণ্ডিত হয়ে উঠতে পেরেছিল। এতে কী গ্রহণ করা হয়েছিল বা কী বাদ দেওয়া হয়েছিল তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে পরবর্তীকালে এটি হতে একটি সংগঠিত উচ্চমানের স্বাতন্ত্র্য স্থাপত্য পদ্ধতি রূপান্তর হতে পেরেছিল।

ধোলকা শহরের স্থাপত্যকার্যক্রম :

গুজরাটে এ সময়ে নির্মিত মসজিদগুলোর প্রায় একই বৈশিষ্ট্যসংবলিত হয়ে গড়ে উঠেছিল। অবশ্য ১৩৩৩ খ্রিস্টাব্দে ধোলকায় যে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এতে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এ মসজিদটি হেলাল খান কাজীর মসজিদ নামে পরিচিত। এ ক্ষুদ্র আয়তনের সাদাসিধা মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে কেন্দ্রীয় খিলানপথের উভয়পার্শ্বে একটি করে মোট দুটি দীর্ঘ নকশারীতি মিনার চূড়া সংযোজিত রয়েছে। এ সংযোজনের মধ্য দিয়ে গুজরাট স্থাপত্যে একটা বৈশিষ্ট্যের নবপ্রবর্তন ঘটেছিল। বলাবাহুল্য এ মিনার চূড়াদ্বয় স্থানীয় পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল এবং এতে সুনির্দিষ্ট কোনো ইসলামি

কারিগরি প্রভাবের স্পর্শতা ছিল না। কেননা এতে মিনার নির্মাণের যে কৌশল ইসলামি স্থাপত্যে দানা বেঁধে একটা প্রথা হিসেবে অনুসারিত হয়ে এসেছিল তা হতে এটি প্রায় মুক্ত ছিল। প্রকারান্তরে মসজিদের মিনারের আকৃতিতে একটা উপাঙ্গ নির্মাণের চেষ্টা করা হয়েছিল মাত্র। যারা এ মিনার নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিল তারা গুজরাটের স্থানীয় মন্দির নির্মাণে অভিজ্ঞ কারিগর। তারা মিনার নামের মসজিদ উপাঙ্গ প্রকৃতপক্ষে কী অর্থ বহন করত তা জানত না। এ উপাঙ্গ নির্মাণের পিছনে কী উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে তাও তারা বোঝেনি। কাজেই তারা এ প্রসঙ্গে কোনো প্রকার বাস্তব জ্ঞান বা নির্মাণ অভিজ্ঞতা ছাড়াই নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়েছিল। অন্যপক্ষে মুসলিম শাসকবৃন্দের নিকট এটি নির্মাণ করানোর পিছনে একটাই যুক্তি ছিল যে পূর্বাহ্নেই মিনারের চাহিদা এসব কারিগরদের দ্বারা পূরণ করে নেওয়ার প্রবল ইচ্ছা। এ সময় ভারতে মুসলিম স্থাপত্য নানা ধরনের নতুন অভিজ্ঞতা সঞ্চায়নের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছিল। যাহোক ত্রুটি-বিচ্যুতির মধ্য দিয়ে পরবর্তীকালে গুজরাট মসজিদ নকশা একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভে সক্ষম হয়েছিল।

১৩৬১ খ্রিস্টাব্দের দিকে ধোলকায় আর একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল যা তঙ্কা বা তনকার[৫] মসজিদ নামে পবিচিত। এটি উন্মুক্ত বা খোলা আকারে নির্মিত। এ মসজিদের জুল্লাহ নির্মাণে অনন্য সাধারণ বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক শ বা তার চেয়ে বেশিসংখ্যক স্তম্ভ প্রয়োগ করা হয়। মসজিদের অংশবিশেষ অত্যন্ত সৌষ্ঠবময় অলঙ্করণে সজ্জিত। এসব অলঙ্করণ প্রকৃতপক্ষে হিন্দু প্রভাবিত শিল্পজাতক ছিল। তবে স্থাপত্যধারায় উন্নয়ন সব সময়েই বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছে; এটি অন্য একটি পর্যায়ে মুসলিম স্থাপত্যকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য ধাপ হিসেবে এর গুরুত্ব ছিল। চলমান বাহন ছাড়া বিবর্তন গতিহীন ও নিষ্ফল হয়ে যায়।

তন্‌কার মসজিদের সজ্জায়ন কাজের মধ্যদিয়ে প্রতীয়মান হয়েছিল যে মন্দির স্থাপত্য যে অবদান সৃষ্টি করেছিল তার প্রভাব তখন পর্যন্ত সক্রিয় ছিল এবং মুসলমানেরা না চাইলেও একে উপেক্ষা করতে পারেনি। অন্যপক্ষে এ মসজিদটা স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে গুরুত্বপূর্ণ না হলেও চতুর্দশ শতাব্দীতে গুজরাটে নির্মিত সর্বশেষ্ঠ স্থাপত্যকর্ম হিসেবে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণীয় হয়ে রয়েছে। এটি এ অঞ্চলে স্থাপত্যশিল্পের প্রগতির একটা বিরতি চিহ্নিত করছে।

অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে স্থাপত্যশিল্পের শ্রীবৃদ্ধি গভীরভাবে সম্পৃক্ত। এ সময়ে সারা ভারতের মুসলিম উপনিবেশগুলোয় রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজ করছিল; বিশেষভাবে দিল্লিভিত্তিক কেন্দ্রীয় প্রশাসনের ক্ষমতা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছিল। কেন্দ্রের সাথে ক্ষমতার স্থিতি, সম্প্রসারণ বা বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার ওপর প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের আঞ্চলিক স্থাপত্যে সমৃদ্ধি বা অবনতির প্রত্যক্ষ কারণ সৃষ্টি হয়েছিল। স্থাপত্য উন্নয়নের প্রধান উৎস ও অনুপ্রেরণা শাসকের ব্যক্তিগত অর্থনৈতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

গুজরাট স্থাপত্যের দ্বিতীয় পর্ব (১৪১১-৫৮ খ্রি.) :

বাস্তবে দেখা যায় যে চতুর্দশ শতাব্দী গুজরাটের মুসলিম স্থাপত্য উন্নয়ন ও বিকাশের প্রস্তুতি পর্ব ছিল মাত্র। কারণ এ সময়ে রাজ্যে অস্থিতিশীলতা, অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ বিরাজ করছিল। ফলে স্থাপত্য কার্যক্রমে মন্থর গতি পরিলক্ষিত হয়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য একজন শিল্পানুরাগী ব্যক্তির প্রয়োজন বেশি করে অনুভূত হচ্ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে (১৪০৭ খ্রি.) গুজরাটে আহমদ শাহী বংশ ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে স্থাপত্যশিল্পচর্চার পরিবেশ ফিরে এসেছিল। বিশেষভাবে প্রথম আহমদ শাহ (১৪১১-১৪৪২ খ্রি.) যখন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে রাজত্ব শুরু করেন তখনই গুজরাট স্থাপত্যের নবযাত্রা পর্ব রচিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে গুজরাট স্থাপত্যের দ্বিতীয় পর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে সুলতান প্রথম আহমদ শাহের অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্বের ফলে স্থাপত্যশিল্পে ব্যাপক উন্নয়নের সূচনা হয়েছিল। তিনি ১৪১১ খ্রিস্টাব্দে তাঁর নিজ নামে আহমদাবাদ শহর নির্মাণপূর্বক স্বীয় রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করেন। এ রাজধানী নির্মাণের মধ্য দিয়ে স্থাপত্য স্বর্ণযুগের দ্বার উন্মোচিত হয়। তিনি স্থাপত্য অনুশীলনে উৎসাহিত হয়ে ব্যাপক কর্মসূচির স্পৃহাকে বাস্তবায়নে মনোনিবেশ করেন। এ ছাড়া তাঁর দরবারের আমির-ওমরাহ, রাজ-কর্মচারী, প্রখ্যাত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ রাজধানীতে মসজিদ, মাকবারা এবং অনুরূপ ধরনের স্থাপত্য কার্যক্রম বাস্তবায়নে ব্রতী হন। তাদের এ আগ্রহের পিছনে একটা গোপন মানসিক ইচ্ছা ছিল যে আহমদাবাদ রাজধানী শহর হিসেবে সুরম্য অট্টালিকায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক এবং তারা সুন্দর সুন্দব প্রাসাদ ও হর্ম্যরাজি ভরা শহরে বসবাস করে অন্যান্য শহরের অধিবাসীবৃন্দের চেয়ে অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ মনে করতে পারে।

শহর এলাকার মধ্যে ছোটবড়ো কমপক্ষে ৫০টি মসজিদ নির্মিত হযেছিল। এ ছাড়া অসংখ্য মাকবারাও নির্মিত হয়েছিল। তাঁর সমস্ত স্থাপত্যকর্ম অনন্যসাধাবণ ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিল এবং এগুলো ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যধারায় অর্থবহ স্থান অধিকার করে রয়েছে। আহমদাবাদ শহরটা সাবারমতি নদীর বাম পার্শ্বে গড়ে উঠেছিল। এ দুর্গ নগরীটি রাজপ্রাসাদসহ প্রথা অনুসারে আয়তাকার পরিবেষ্টনে নদীর তীর দিয়ে প্রলম্বিত ও অভিক্ষিপ্তভাবে অবস্থান নিয়েছে। দুর্গ প্রাকার হতে দূরে শহরের কেন্দ্রেব দিকে আহমদ শাহ এক বৃহৎ জামে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন।

এ মসজিদের সাথে তাঁর সুরক্ষিত দুর্গের প্রধান ফটক হতে সরাসরি একটা প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণ করে সংযোগ রক্ষার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ রাজপথটি দুর্গের প্রধান ফটক ভদ্রাগেট হতে পূর্বদিকে ধাবিত হয়ে জামে মসজিদের উত্তর পার্শ্ব দিয়ে রানী কা-হুজরা পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে।

দুর্গের প্রধান ফটকের (ভদ্রাগেট) অনতিদূরেই রাজকীয় বিজয় তোরণ নির্মিত হয়েছিল। এটিই তিন দরজা নামে পরিচিত। রাজকীয় দরবারের বহির্প্রাঙ্গণে প্রবেশের এটিই প্রধান ফটক। এখানেই কেন্দ্রীয় উচ্চ বেদিতে রাজসিংহাসন বসানো ছিল। সম্মুখের বেদির দিকে দৃষ্টিপাত করলে তাঁর ঐশ্বর্যময় জাঁকালো দরবার দৃষ্ট হত। এ নকশা দেখে নগর পরিকল্পনার একটা সুষ্ঠু ধারণা অনুভব করা যায় এবং বুঝা যায় যে কী ধরনের উচ্চ দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অভিপ্রায় নিয়ে কেমন নিখুঁত স্থাপত্য পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং যার সাথে আনুষ্ঠানিক বাহ্যিক সমারোহ পালন করার ব্যবস্থাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

পূর্বেই বলা হয়েছে প্রথম আহমদ শাহ আহমদাবাদ শহর নির্মাণ করেন এবং তার সাথে সাথে যে চারটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ নির্মাণ করেন এগুলো স্থাপত্য উন্নয়নের বিশিষ্ট পরিচয় বহন করে। এগুলো হচ্ছে- (১) সাইয়িদ আলমের মসজিদ (১৪১২ খ্রি.), (২) আহমদ শাহ মসজিদ (১৪১৪ খ্রি., (৩) হায়বৎ খানের মসজিদ (১৪২৪ খ্রি.) এবং (৪) আহমদাবাদ জামি মসজিদ (১৪২৪ খ্রি.)।

সাইয়িদ আলমের মসজিদ :

গুজরাট স্থাপত্যের দ্বিতীয় পর্বের প্রথম দিকে নির্মিত মসজিদটি হচ্ছে সাইয়িদ আলমের মসজিদ। এ মসজিদের কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবের উপরে সংযোজিত একটি শিলালিপির ভাষ্যমতে এটি সুলতান প্রথম আহমদ শাহের শাসনামলে জনৈক সাইয়িদ আলম আবু বকর হুসাইন নামক এক ব্যক্তি ১ রজব ৮১৫ হিজরিতে (১৪১২ খ্রি.) নির্মাণ করেন।* প্রকৃতপক্ষে এ মসজিদটি আহমদ শাহের সময় নির্মিত মসজিদ স্থাপত্য পদ্ধতি ও আদর্শের অগ্রদূত। এখানে এ পর্বের মসজিদ স্থাপত্যের একটি চূড়ান্ত আকারত্ব ও নির্মাণশৈলীর ওপর যে পরীক্ষা-নিরীক্ষার যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল তা পরবর্তী সময়ে বৃহৎ জামে মসজিদ নির্মাণ অবকাঠামোর আদর্শ হিসেবে উপস্থাপিত হওয়ার প্রয়াস পায়।

আয়তাকার নকশা পবিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদটি দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে যথাক্রমে ১৮.০৮ মি. ও ৭.৮৫ মি.। নামাজঘরটি তিনটি গম্বুজে পরিবৃত। কেন্দ্রীয় নেভের উপর নির্মিত গম্বুজটি উভয়পার্শ্বস্থ গম্বুজ দুটি অপেক্ষা বৃহদাকৃতির। গম্বুজ নির্মাণে কেন্দ্রীয় নেভে সুবিধামতো অষ্টভুজাকার পরিসর সৃষ্টি করে প্রতি কোনায় যুগল স্তম্ভ নির্মিত হযেছে। স্তম্ভের উপব কড়ি বা বর্গা স্থাপন পূর্বক তদুপরি অবস্থান্তর প্রবৃত্তির পর্যায়ক্রমিক স্তরগুলো সাজিয়ে বর্তুলাকার আকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং এরই উপর গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজের তলদেশ সুষম আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যে শোভিত।

সাইয়িদ আলমের মসজিদ আহমদাবাদের অন্যান্য মসজিদের মতোই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো ধারণ করে থাকলেও এ ইমারতে বিশেষ কতকগুলো উপকরণ লক্ষণীয়। এর মিনাব ধ্বংস হয়ে গেলেও ভিত্তিটি এখনো অক্ষত রয়েছে যার সাহায্যে এর মধ্যে যে বৈশিষ্ট্যের বিকাশ ঘটেছিল তা অবগত হওয়া যায়। ফাসাদ নিজেই বিশেষ কতকগুলো স্থাপত্য উপাদান ধারণ করে রয়েছে, যেমন- সম্মুখস্থ স্তম্ভশ্রেণী, ঝুলন্ত কারনিস, অলঙ্কৃত আলম্ব ও বিভিন্ন প্রকারের বিস্তারিত সুশোভন সজ্জায়ন। এ ছাড়া মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার জন্য অতি দক্ষতা সহকারে পূর্বাহ্নে মসজিদের বিভিন্ন অংশের মাঝে সুষমতা আনয়নের বাস্তব ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। আহম্মদাবাদের জামে মসজিদে এ আদর্শ ও কৌশলগুলো আরো পরিপক্কতা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছিল।

সাইয়িদ আলমের মসজিদ অভ্যন্তরে যে শিল্প চেতনার প্রকাশ ঘটেছিল তা পরবর্তীকালে সময়মতো পরিপক্ব অবস্থায় অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সমন্বিত হয়ে জামে মসজিদে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে নেভের আকৃতির উন্নতি বিধানপূর্বক মধ্যবর্তী অতিরিক্ত তলা বা ট্রিফোরিয়ামের (triforium) ভ্রূণ সৃষ্টি করা যা একজন দক্ষ ও অভিজ্ঞ কারিগরের হাত দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য অপেক্ষমাণ অবস্থায় ছিল।

আহমদ শাহ্ মসজিদ :

দুর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে আহমদ শাহ্ মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে স্থাপত্য প্রকল্পের সূচনা হয়েছিল। মসজিদটি দুর্গের অভ্যন্তরে দক্ষিণ প্রাকার ঘেঁষে নির্মিত। দুর্গাভ্যন্তরে নির্মিত ইমারতগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র জামি মসজিদটি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় এখনো টিকে আছে। এটি ক্যাম্বে জামে মসজিদের অনুরূপ অবকাঠামো ও একই শিল্প চেতনায় নির্মিত। কেন্দ্রীয় মিহ্‌রাবের উপরিভাগে সংযোজিত এবং নাসখ রীতিতে লিখিত একটি শিলালিপির ভাষ্যে জানা যায় যে, মসজিদটি ৮১৭ হি. মোতাবেক ১৪১৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আহমদ শাহ্ কর্তৃক নির্মিত।

আয়তাকার পরিসরে নির্মিত এ মসজিদটির পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ৪৭.৮০ মি. ও পূর্ব-পশ্চিমে ১৬.৫০ মি.। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য ফাসাদে পাঁচটি বৃহদাকৃতির খিলানপথ রয়েছে এবং খিলানগুলো অর্ধবৃত্তাকৃতির। কেন্দ্রীয় খিলানপথটি আবার পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা সামান্য বড় এবং এর উভয়পার্শ্বে নিরেট সরু খাঁজকাটা মিনার সংযুক্ত (ভূমি নকশা নং- ২৯)। মসজিদের নামাজগৃহ আট সারি স্তম্ভ দ্বারা নয়টি 'আইল' ও পঁচিশটি 'বে'-তে বিভক্ত। আইল ও 'বে'-গুলো এমনভাবে বিন্যাসিত যে গম্বুজের নিম্নাংশ
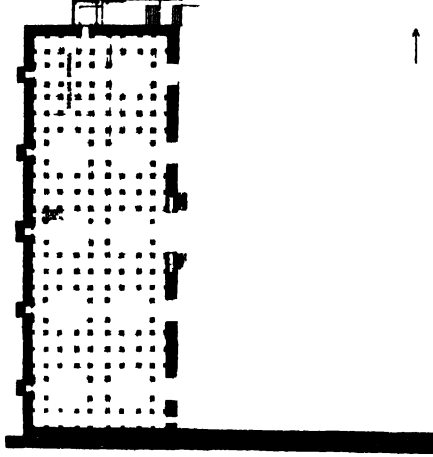
ভূমি নকশা নং-২৯ আহমদ শাহ মসজিদ

অষ্টভুজাকার ধারণ করেছে। নামাজগৃহের ছাদ দশটি বৃহদাকৃতির গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত এবং গম্বুজগুলো ১৫২টি স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এখানে উল্লেখ্য যে গম্বুজদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশ স্তম্ভ সর্দল রীতিতে (trabeate system) আচ্ছাদিত। অনুরূপ নির্মাণ রীতি কৌশল ক্যাম্বের জামে মসজিদে পরিদৃষ্ট হয় (চিত্র নং-৫২)।

নামাজঘর বা জুল্লাহর উত্তর-পশ্চিম কোনায় একটি মুলুকখানা রয়েছে। এটি ২৫টি স্বতন্ত্র এবং উত্তর ও পশ্চিম দেয়ালের সাথে যুক্ত ১১টি স্তম্ভের উপর সংস্থাপিত। এর পূর্ব ও দক্ষিণ দিক ছিদ্রযুক্ত প্রস্তর পর্দা দ্বারা আবৃত। উত্তর দেয়ালে নির্মিত একটি সর্দল পরিবেষ্টিত প্রবেশপথের মাধ্যমে এ কক্ষে যাওয়া যায়। প্রবেশপথের সম্মুখে একটি গাড়ি বারান্দা রয়েছে। নয় ধাপবিশিষ্ট সিঁড়িপথ বেয়ে এ গাড়ি বারান্দার পীঠদেশে উঠা যায়। গাড়ি বারান্দাটি একটি ছত্রী দ্বারা শোভিত। এ মসজিদের গম্বুজগুলো কৌণিক এবং গম্বুজ তলছাদ অতি নিখুঁতভাবে বিভিন্ন খোদাইকৃত নকশায় অলঙ্কৃত। ক্যাম্বে জামি মসজিদেও মুলুকখানার উপস্থিতি দেখা গেছে। পরবর্তীকালে আহমদাবাদ জামি মসজিদ ও চম্পানির জামি মসজিদেও মুলুকখানা নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশের দরসবাড়ী, ছোটসোনা ও কুসুম্বা মসজিদে অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

মসজিদের কিবলা দেয়ালের অভ্যন্তরভাগে ছয়টি মিহরাব সন্নিবেশিত যার মধ্যে পাঁচটি মূল নামাজঘরের কিবলা প্রাকারে এবং একটি মুলুকখানাতে সন্নিবেশিত। কেন্দ্রীয় মিহরাব

ব্যতীত অপরাপর মিহরাবগুলো শ্বেতমর্মর দ্বারা নির্মিত এবং উন্নত খোদাই কার্যে শোভিত। তবে কেন্দ্রীয় মিহরাবটিতে সাদা, হলুদ ও কৃষ্ণ বর্ণের মার্বেল পাথরের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উত্তর পার্শ্বে নয় ধাপবিশিষ্ট সাদা মার্বেল পাথরের একটি মিম্বর অবস্থিত। মিম্বরের উপরের ধাপ চারটি পিলারের উপর প্রতিষ্ঠিত চাঁদোয়া ছাদে আচ্ছাদিত।

মসজিদের অভ্যন্তরে আলো প্রবেশের জন্য ১৮টি বাতায়ন পথ রয়েছে যার মধ্যে ৮টি কিবলা দেয়ালে, ৩টি উত্তর দেয়ালে এবং অবশিষ্টগুলো সম্মুখ দেয়ালে অবস্থিত। প্রতিটি বাতায়ন পথ আবার প্রস্তর জালি দ্বারা আবৃত। মসজিদের সাহনের অভ্যন্তরে অজুর জন্য নির্মিত একটি চৌবাচ্চা অবস্থিত। মসজিদের ছাদে উঠার জন্য প্রধান প্রবেশদ্বারের উভয়পার্শ্বে বামাবর্ত সিঁড়িপথ রয়েছে।

হায়বৎ খানের মসজিদ :

হায়বৎ খানের মসজিদটি নগরীর দক্ষিণ প্রাকারের জামালপুব প্রবেশপথের সন্নিকটে অবস্থিত। এটি আহমদ শাহ মসজিদেব অনুকরণে এবং প্রায় সমসাময়িককালে নির্মিত। কে.ভি. সুন্দর রাজনের মতে, মসজিদটি ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হযেছিল।

পরিকল্পনাগত দিক থেকে মসজিদটি আয়তাকার পবিসরে নির্মিত। এর পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ২৪ মি. ও প্রস্থে ৯.৬০ মি.। মসজিদেব সম্মুখ দেয়ালে তিনটি কৌণিক খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান। এ মসজিদের কেন্দ্রীয় প্রবেশপথও আহমদ শাহ মসজিদেব মতো পার্শ্ববর্তী দুটি অপেক্ষা সামান্য বড়। মসজিদের সম্মুখ দেয়ালেব সাথে এক জোড়া ক্রমসরু ট্যারেট সংযুক্ত এবং এগুলো মার্লনযুক্ত বপ্রেব উপরিভাগ পর্যন্ত ধাবিত। নামাজগৃহটি তিনটি বৃহদাকৃতিব কৌণিক গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত এবং কেন্দ্রীয় গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজদ্বয় অপেক্ষা ২.৪৪ মি. উঁচুতে অবস্থিত যা মসজিদটিকে আহমদ শাহ মসজিদ হতে কিছুটা স্বাতন্ত্র্য দান কবেছে। মসজিদের তিনটি প্রবেশপথ বরাবর কিবলা দেয়ালে তিনটি মিহরাব সন্নিবেশিত। এগুলো বহির্ভাগ প্রক্ষিপ্তাকারে নির্মিত এবং গাত্র অতি সাদামাটাভাবে তৈরি। কেন্দ্রীয় মিহবাবের উত্তব পার্শ্বে সাত ধাপবিশিষ্ট মিম্বর অবস্থিত। মসজিদের অভ্যন্তরে আলো প্রবেশের জন্য প্রতিটি দেয়ালগাত্রে (চার দেয়ালে) একটি করে বাতায়নপথ বিদ্যমান। এর কিবলা দেয়ালেব বহির্ভাগে প্রক্ষিপ্তাবস্থায় পাঁচটি গোলাকার বুরুজ সংযুক্ত। এ ধরনের চূড়া সংযোজনের ফলে এ মসজিদের নির্মাণকার্যে কিছু ব্যতিক্রমের ছাপ প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে।

আহমদাবাদ জামি মসজিদ :

আহমদাবাদ জামি মসজিদ ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে সুসম্পন্ন হয়েছিল। সাধারণভাবে এটি বিবেচিত হয়ে থাকে যে এ মসজিদের স্থাপত্য নির্মাণ কৌশল এবং সজ্জায়নে ব্যবহৃত অলঙ্কারাদি অত্যন্ত উচ্চমানের ছিল। সে সময় পর্যন্ত অন্যান্য স্থাপত্য নিদর্শনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতে না হোক পশ্চিম ভারতে নির্মিত সকল মসজিদের মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি বলে পরিগণিত হতে পেরেছিল। এটি স্থাপত্যশিল্প উন্নয়নের চরম শিখরে আরোহণের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। বাস্তবেও এটি সঠিকভাবে যুক্তিসঙ্গত কারণে বলা যায় যে তৎসময় পর্যন্ত স্থাপত্যকর্মে অর্জিত সাফল্যের যে নজির সৃষ্টি হয়েছিল তা আবিষ্কারার্থক ও উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্নতার উদাহরণ। আবার অন্যগুলো পরীক্ষামূলকভাবে কৃত অথবা নির্মিত, অন্যপক্ষে নির্মাতারা তাদের কর্মফল সম্পর্কে নিজেরা সঠিক বা নিশ্চিত থাকায় এরূপ থাকায় অবয়ব ধারণ করতে পেরেছিল।

এ যুগসন্ধিক্ষণে সুসংহত ও মনোজ্ঞ ইমারতের নির্মাণ সাফল্য এটিই প্রমাণ করে যে গুজরাট স্থাপত্যশিল্প একটা সুদৃঢ় অবস্থানে উপনীত হতে পেরেছিল এবং স্থাপত্য পদক্ষেপ ধীরে ধীরে নিম্নমান হতে উচ্চমানে উন্নীত হয়। এ স্থাপত্য উন্নয়ন নিয়ে সংশয়াপন্নতা ছিল না যে এটি নিখুঁত পরিপূর্ণতায় উপনীত হতে পারে নি। অন্যপক্ষে একে ত্রুটিহীন পূর্ণাঙ্গ স্থাপত্য আদর্শরূপে অন্তর দিয়ে অনুভব করা হয়েছিল।

বলা বাহুল্য এ মসজিদ একটা চূড়ান্ত উন্নয়নের ধারণা বহন করে এবং বাহ্যত ত্রুটিহীন ও জীবন্তের প্রতীক শ্রীবৃদ্ধি যার চলমান স্পর্শতা ঘোষণা করছে। এ ছাড়া প্রতীক্ষিত সম্ভাবনাময় পদ্ধতি পরবর্তী স্থাপত্য উদাহরণে ব্যাখ্যায়িত হয়েছে। অন্যপক্ষে কেবলমাত্র ধারণা করা যায় যে একটা নির্দিষ্ট সময়ে এ বিরল মুহূর্ত পূর্ব হতেই নির্ধারিত হয়ে স্থাপত্য প্রতিভার বিস্ময়কর মৌলিক মানসিক শক্তি ও ক্ষমতা উৎপাদনে অবকাশ সৃষ্টি করেছিল যাতে স্থাপত্য কাজ সাধারণ ঢালাই ও গাঁথুনি জাতীয় সাধারণ কাজের চেয়ে অনেক উন্নতমানে পরিণত হয়ে এটি পরবর্তী সময়ে একটা শক্তির উৎসরূপে অনাদিকালের জন্য অবস্থান নিতে পারে। ইমারত যেন সে কথাই ঘোষণা করছে প্রস্তরের মধ্যে মানুষের আত্মার নিস্তব্ধ ও নিঃশব্দ পুষ্পায়ন, যা জীবন ও চিন্তা-চেতনায় প্রবাহিত হয়েছিল তা অবশেষে শিল্পীদের হাতে সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রকারান্তরে এ মসজিদের উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন কাজগুলো জুল্লাহর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। বিশেষত এর সম্মুখ দেয়ালের অংশে। অন্যপক্ষে এর নিস্তেজ সম্মুখ প্রাঙ্গণ বা সাহন যা দৈর্ঘ্যে ৭৭.৭৫ মি. (২৫৫ ফুট) ও প্রস্থে ৬৭.১০ মি. (২২০ ফুট) বিশিষ্ট। এর বিস্তৃতি ও সবল প্রসারতা মসজিদ গঠন কাঠামোর আকারত্বে ঐশ্বর্যতা অনুধাবন করানোর একটা উপায় ছিল মাত্র। এর একটি হচ্ছে খিলান পর্দা, অপরটি স্তম্ভ সহযোগে পোর্টিকো বারান্দা। প্রথমটির অবস্থান দ্বিতীয়টির বাহুর কেন্দ্রস্থলে। এ স্থাপত্য পদ্ধতি ইতঃপূর্বে কিছুটা সাইয়িদ আলমের মসজিদে প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু এ মসজিদে পরিকল্পনাটি স্থপতি অতি দক্ষতার সাথে এ দুটির মাঝে মোটামুটি আরো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সার্থকভাবে আনয়ন কবতে সক্ষম হয়েছিল। এখানে পাশাপাশি পর্দার সাথে স্তম্ভের সহাবস্থানের ফলে তাৎক্ষণিকভাবে কাঠামোর ঘনত্ব ও দেয়ালপৃষ্ঠের শক্তির মাঝে একটা তুলনামূলক সাদৃশ্য বৈষম্য অভিপ্রায়ণ হয়েছিল এবং এব সাথে স্তম্ভশ্রেণীর গভীরতায় বায়ুময় লঘুতা এসে যোগ হয়েছিল। মসজিদ ফাসাদে গড়ে ওঠা নিরেট নিখাদ অংশের সাথে শিল্পজাত কারুকার্যের রূপায়ণ মিলিতভাবে অতীব সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছিল। এর সাথে তিনটি তোরণ দরজা খুবই সমশক্তিসম্পন্ন এবং চমৎকার সুষমামণ্ডিত ছিল। বৃহৎ কেন্দ্রীয় খিলানায়িত পথটি বিশেষ অভিব্যক্তিসূচক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং এর ভার দেয়ালবহির্ভূত মিনারের নিপুণ ছাঁচে ঢালা আলম্ব বহন করছে।

মিনারের উপরের অংশ এখন আর অতীতের সাক্ষী হয়ে টিকে নেই। ঐসব খিলানের মনোজ্ঞ বক্রতাই অভ্যন্তরের অন্ধকারাচ্ছন্নতায় আলো প্রবেশের বাহ্যিক সীমারেখা। এর সম্মুখস্থ স্তম্ভগুলোর মাঝে আলো ও ছায়ার পর্যায়ানুবৃত্তি ও পরস্পরের ওপর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সুশোভিত খিলানের পাতলা দণ্ডের মাঝে মিহি সজ্জায়ন গথিক্ গির্জার সম্মুখভাগে ধূসর প্রস্তরে খিলানশ্রেণীর অলঙ্করণের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এটি বিশ্বের মসজিদ স্থাপত্যের অন্যতম চিত্তাকর্ষক অবদান। সাধারণত দেখা যায় যে বড় বড় মসজিদগুলোর নির্মাণ কৌশলে একঘেঁয়েমি ও একই ছক বারংবার মসজিদের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত হয়েছে, যেমন-বাংলা স্থাপত্যে পাণ্ডুয়ার আদিনা মসজিদ। কিন্তু আহমদাবাদের মসজিদ বৃহৎ আকারের হলেও একঘেঁয়েমির পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে না। এ

মসজিদের মূল এবাদতখানা ৬৪ মি. (২১০ ফুট) দৈর্ঘ্য ও ২৯ মি. (৯৫ ফুট) প্রস্থ (ভূমি নকশা নং-৩০)। এর বিভিন্ন অংশ বিচিত্ররূপে সংস্থাপিত হয়ে অবশেষে পূর্ণাঙ্গ মসজিদের যে নকশা সৃষ্টি হয়েছে তাতেও অংশবিশেষ নিজস্ব ভঙ্গিমায় সমানভাবে প্রকাশমান হয়েছে এবং কোনো অংশই অশোভন মনে হয় না। তাই এ মসজিদের বিশালতা কেবল সৌন্দর্য সৃষ্টি করতে সহায়তা করে নি বরং হৃদয়ের গভীরে আত্মতৃপ্তির সুখানুভূতি জাগ্রত করে। এব সুগঠিত ও বিস্তৃত খিলানগুলোও একই নকশায় নির্মিত। জোড়া মিনারের সৌন্দর্য, খোদাই ও ছাঁচে ঢালা নকশালঙ্কার, দেয়ালগাত্রে দড়ি নকশা, গোলা নিক্ষেপের সছিদ্রযুক্ত প্রাচীব যা গুজবাট স্থাপত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সর্বত্র প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে।
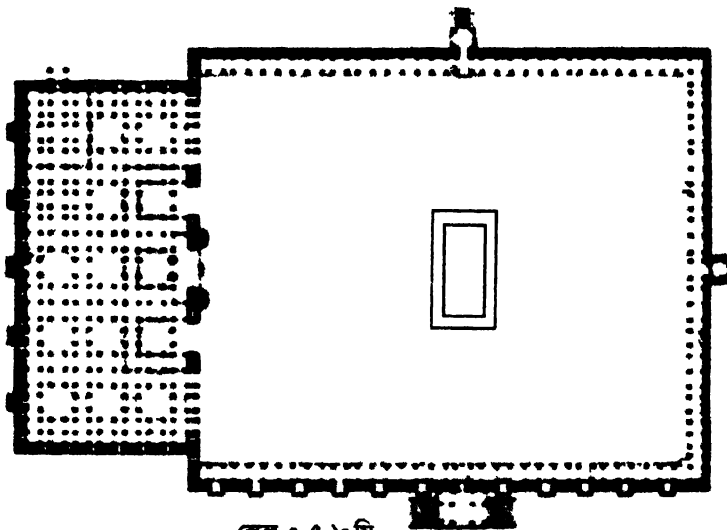
ভূমি নকশা নং-৩০ আহমদাবাদ জামি মসজিদ

জন মার্শালেব বিবরণ থেকে জানা যায় যে এ মসজিদ অভ্যন্তরে ২৬০টি স্তম্ভ রয়েছে। অবশ্য পি. ব্রাউন ৩০০টি স্তম্ভের কথা উল্লেখ করেছেন।[৬] কিন্তু এস. আহমদ ২৫২টি স্তম্ভের কথা বলেছেন[৭]। স্তম্ভগুলোকে রূপালী পাইন গাছের গুঁড়ি সদৃশ বলে মনে হয়। তবে খুবই সতর্কতা অবলম্বন করে এগুলোকে স্থাপন করা হয়েছে যাতে বাস্তবে কোনো প্রকার অসুবিধা না হয়। যাহোক একাধিক স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত এর নামাজঘরটি ১৫টি 'বে'-তে বিভক্ত। প্রতিটি 'বে'-বর্গের উপর একটি গম্বুজ সংস্থাপিত। কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠ নেভ তিন তলার সমান উচ্চতাবিশিষ্ট কিন্তু পার্শ্ব আইল বা খিলানপথ দু তলার সমান ও অবশিষ্টগুলোর উচ্চতা অবশ্য এক তলাবিশিষ্ট (চিত্র নং- ৫৩)।

মসজিদ অভ্যন্তরে অধিক ঈষৎ পরিবর্তিত কাঠামোর গাঠনিক ফল পাওয়া গিয়েছে তিন তলাবিশিষ্ট নেভের ট্রানসেপ্টের মিলনে। পরেরটা গঠনে পূর্বের রীতি অনুসৃত হয়েছে, তবে তফাত শুধু এদের তুলনামূলক উচ্চতার কমবেশি। মসজিদের নেভ স্তম্ভায়িত গ্যালারি দ্বারা গঠিত। এর একটি গ্যালারি নিচে এবং এর উপরে আর একটি সমস্ত গঠন কাঠামো নিচের

হলঘরের দীর্ঘ স্তম্ভগুলোর উপর ভর করে রয়েছে।

এ গ্যালারিগুলো কেন্দ্রীয় প্রশস্ত দণ্ডের সাথে সংযুক্ত যাকে রোটেন্ডা[৮] নামে অভিহিত করা হয়। কেন্দ্রীয় নেভের নিচের গ্যালারি বর্গাকার ও উপরেরটি অষ্টভুজাকার। এ রোটেন্ডো দু তলা পর্যন্ত উপরের দিকে উঠে গিয়ে একটি গম্বুজ দ্বারা আবৃত হয়েছে। প্রত্যেক ধাপে প্লাটফরম বা মঞ্চসহ ব্যালকনি অবস্থিত, যেখান হতে রোটেন্ডা দৃষ্ট হয়। এখানে ঢালু আসন রচিত হয়েছে যা মন্দিরের আসনার (asana) সঙ্গে তুলনা করা যায়।

গ্যালারিগুলোর বাইরে দিয়ে স্তম্ভ সহযোগে বারান্দা নির্মিত হয়েছে। দু স্তম্ভের মধ্যবর্তী খিলান জালিকাটা প্রস্তর পর্দা বসানো এবং এ পর্দার ভিতর দিয়ে গ্যালারিগুলোকে আলোকসজ্জিত করা হত এবং পাথরের জালিগুলো এমনভাবে সাজানো হয়েছিল যে সোজাসুজি ভিতরে আলো প্রবেশ করতে পারত না। তবে আলো প্রবেশের বন্দোবস্ত যে কৌশলে করা হয়েছিল তাতে আলোকে প্রথমে ভিন্নপথগামী করা হত এবং প্রতিফলিত হওয়ার পূর্বেই এটি অভ্যন্তরে চারদিকে বিকিরিত হত এবং ছড়িয়ে অস্পষ্ট আভাযুক্ত আলোকে প্লাবিত করত।

এ মসজিদ নির্মাণে অধিক মাত্রায় মন্দির স্থাপত্য প্রভাব বিস্তার করেছে। এর নকশা হতে প্রতিভাসিত হয়ে উঠে যে গুজরাটের স্থানীয় পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়েছে। তবে নেভ ও খিলানপথ নির্মাণের পদ্ধতি দেশীয় ছিল না। পি. ব্রাউন মনে করেন জুল্লাহ্ বা কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠ নির্মাণে মন্দির স্থাপত্যের অনুসরণ ঘটেছে।[৯] এখানে মণ্ডপ বা খিলানায়িত হলঘব গঠন করে তার সাথে উপরের তলাগুলো যোগ করে দেওয়া হয়েছে মাত্র এবং কেন্দ্রে অবস্থিত রোটেন্ডা বা প্রায় গোলঘর নির্মাণ করা হয়েছে যা পশ্চিম ভাবতে সোপান বাঁধানো কূপ নির্মাণ পদ্ধতির অনুরূপ।

সারিবদ্ধ স্তম্ভায়িত মণ্ডপ বা উপরের অতিরিক্ত তলা নির্মাণ পদ্ধতি তখন হতে কিছু পূর্বে দেশের কিছু কিছু অংশে চালু ছিল। অধিক উচ্চতায় অতিরিক্ত আলো সম্প্রসারণের পদ্ধতি স্থাপত্যশিল্পের প্রাথমিক যুগের মন্দির স্থাপত্যের সাথে সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়; যেমন- দশম শতাব্দীর গোয়ালিয়ারে নির্মিত সামবাহু মন্দির, দ্বাদশ শতাব্দীব সিদ্ধাপুরের রুদ্রমালা মন্দির এবং আহমদাবাদের উত্তর-পূর্বে প্রায় ২৬০ কি.মি. দূরত্বে ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে মাদবিতে নির্মিত বৃহৎ জৈন মন্দির এ অনুকরণেব উদাহরণ।[১০] মাদরির জৈন মন্দির একই দেশীয় প্রক্রিয়ার ওপর প্রকোষ্ঠের স্তম্ভ সারির মাঝে আলোকমালা বিস্তারের প্রচেষ্টা স্থানীয় স্থপতিগণ নিয়েছিল। কিন্তু আহমদাবাদ জামে মসজিদে এটি ছিল অভ্যন্তরের কল্পন, এখানে সমস্যাটি ছিল অধিক উচ্চতায় কেমন করে অপেক্ষাকৃত সুন্দর আলোক দ্বারা সজ্জায়ন করা যায়। এ উপায়টা আরো দক্ষতার সাথে খাড়া রেখায় কৃত্রিমভাবে আলোবিচ্ছুরণের মধ্য দিয়ে সুসম্পন্ন করা হয়েছিল।

মসজিদের অভ্যন্তরে আলো বাতাস সঞ্চালন করার পদ্ধতি মুসলিম গুজরাট স্থাপত্যের এটি ছিল একান্তই নিজস্ব জাতীয় উদ্ভাবন, তবে কোনোক্রমে অনুকরণ ছিল না। এ সমস্যার সমাধান ভারতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এ ব্যবস্থায় উপরের ছাদের নিচের অংশ হতে কিছুটা বর্ধিত করা হয়েছে এবং সে বর্ধিত অংশ গ্যালারির বাইরে থাম স্তম্ভের উপর স্থাপিত হয়ে ফাঁকা জায়গার সৃষ্টি করেছে এবং এ পথেই ভিতরের কক্ষগুলোতে আলো বাতাস পৌঁছতে পারত। এ ফাঁকা স্থানে ছিদ্রযুক্ত পর্দা এমনভাবে বসানো হয়েছিল যে সোজাসুজি ঐ পথের মধ্যে সূর্যরশ্মি বা বৃষ্টির পানি ভিতরে অনুপ্রবিষ্ট হতে পারত না। পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবনের যুগ ছিল। সে দিনের বিশ্বে কেবলমাত্র

রাজনৈতিক বিজয়ের মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না; এ মহান জাতির বিজয় কেতন সমানভাবে শিল্প, সাহিত্য, প্রযুক্তি, বিজ্ঞান, স্থাপত্য এবং সর্বপ্রকারেব সুকুমার ও কলা বিদ্যায় উড্ডীন হয়েছিল।

তিন দরওয়াজা :

আহমদ শাহের রাজত্বকালে চারটি মসজিদ ছাড়াও একটি লৌকিক স্থাপত্য কাঠামো নির্মিত হয়েছিল। এটি মূলত: তিন দরজা নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এটি দুর্গের প্রধান ফটক হতে রানী-কা-হুজরা পর্যন্ত প্রলম্বিত রাজপথের উপর নির্মিত।

তিন দরজা হচ্ছে প্রাসাদের বহির্প্রাঙ্গণে প্রবেশের সদর দরজা; যেখানে সমস্ত রাজন্যবর্গ, বৈদেশিক বাষ্ট্রদূতগণ বা অন্যান্য বহিরাগত গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ রাজদরবারে প্রবেশের পূর্বে অপেক্ষা করতেন। এর ঘনত্ব ও বেড় ১১.৩০ মি. (৩৭ ফুট) এবং বিশাল উন্মুক্ত দ্বারটি ৫.৪০ মি. (১৭.৫ ফুট) প্রসার ছিল। এখানে একটি আর একটির সাথে আড়াআড়িভাবে সংযুক্ত। এ সম-আকারের প্রধান তিনটি দরজা অত্যন্ত চমৎকার ও সুষমামণ্ডিত। কেন্দ্রীয় দরজাটি সুন্দর ও মজবুতভাবে ঢালাইকৃত মিনার ও আলম্ব দ্বারা সমর্থিত। এ তোরণে সবচেয়ে আকর্ষণী ও আনন্দদায়ক অংশ হচ্ছে খিলান চাপের আলম্বের সাথে সংযুক্ত মধ্যবর্তী বর্ধিত ঠেস থামের কৌশলপূর্ণ স্থাপত্যিক কারুকার্য। তা ছাড়া এব সমসৌষ্ঠব সম্পন্নতা, পরিণতি ও তৃপ্তিদায়ক মিহি নিপুণ কারুকার্যখচিত ছককাটা খিলান অবযব যা অতি উঁচুদবেব নকশালঙ্কারের সাথে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে। এটি দর্শককে ক্ষণিকের তরে হতবাক করে দেয়। অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে ঠেস থামের কারুকার্য নকশা পরিকল্পনাব সাথে অন্য অংশের নকশালঙ্কার অঙ্গীভূত নয়।

এককালের এ রাজপথ এখন একটা বাজারের অংশবিশেষ ছাড়া আর কিছু নয়। বাজপথের বাজকীয় সৌষ্ঠবময় বৈশিষ্ট্য অধিকাংশে হারিয়ে গিয়েছে। তবুও এর আদি বিন্যাস ও স্থাপনা চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেশের মাঝেও দুর্লভ স্থাপত্যিক মর্যাদা কোনো রকমে টিকে বয়েছে। এ বিজয় তোরণেব উপাঙ্গ গঠন প্রক্রিয়া রোমানদের এ জাতীয় স্থাপত্যকর্মের আদর্শের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আহমদাবাদের এ স্থাপত্যকীর্তিটি তিনটি খিলানপথের সমন্বয়ে গঠিত। এটি তৃতীয় শতাব্দীর সেপ্‌টিমাস সিভিরাস (septimus severus) ও চতুর্থ শতাব্দীর কনস্টান্টাইন (constantine) স্থাপত্য আদর্শে গড়ে ওঠা কিছু উপকরণের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ বলে পি. ব্রাউন মনে করেন।[১১] তিন দরজা বড় বেশি হলে ১১.৩০ মি. (৩৭ ফুট) মতো উচ্চতাবিশিষ্ট, পক্ষান্তরে সেপ্‌টিমাস সিভিরাস ২০.৭৫ মি. (৬৮ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। কিন্তু অন্যান্য উপাঙ্গ গঠনে রোমান স্থাপত্যকর্মকে অতিক্রম করেছে। কেননা এটি ২৪.৪০ মি. (৮০ ফুট) প্রসার এবং ১৩.৭৫ মি. (৪৫ ফুট) গভীর।

এর নকশায় কিছুটা ত্রুটির আভাস পাওয়া যায় যখন এর তিনটি খিলানপথের তুলনামূলক মাপের পর্যালোচনা করা হয়। যখন ঐ সব খিলানপথ একই উচ্চতাবিশিষ্ট তখন পার্শ্ব খিলানপথ দুটি মধ্যবর্তী খিলানপথ অপেক্ষা ছোট আকারের হলে মানানসই হত। ফলে এখানে ছন্দিত গতিময় ধারা প্রতিফলিত হতে পারে নি। এ প্রকল্পের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এর বলিষ্ঠ খিলানের মনোজ্ঞ আকারত্ব এবং দক্ষতার সাথে আয়োজিত উন্নত বপ্রের উপর গঠিত চমৎকার আলম্বের উপর স্থাপিত তিনটি ঝুলন্ত বাতায়ন (oriel window)। প্রতিটি বাতায়ন অভিক্ষিপ্ত আলম্ব বা পোস্তার সাহায্যে নির্মিত এবং অতি নিখুঁত

খোদাইকার্যে শোভিত। এছাড়া সবচেয়ে অধিক মসৃণ সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্টতায় খিলানগুলোর উপর নকশা ও রেখার কাজ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এরূপ সূক্ষ্মাগ্র খিলানের সুনিপুণ সৌন্দর্যমণ্ডিত কাজের তুলনা সারা ভারতে যে কয়টি সৃষ্টি হয়েছে নিঃসন্দেহে তিন দরজা এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্টতম (চিত্র নং-৫৪)।

সুলতান মোহাম্মদ শাহের স্থাপত্যকার্যক্রম (১৪৪২-৫১ খ্রি.) :

আহমদ শাহের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গুজরাট স্থাপত্যের গতিধারা কিছুটা স্তিমিত হলেও পরবর্তী সুলতান মোহাম্মদ শাহ (১৪৪২-৫১ খ্রি.) ও কুতুব উদ্দিন শাহের (১৪৫১-৫৮ খ্রি.) সময় পুনরায় চালু হয়েছিল। প্রায় ১৬ বছর বিরতির পর যে স্থাপত্যকার্যক্রম শুরু হয়েছিল তাতে পূর্ব স্থাপত্য পদ্ধতি ও গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল। মোহাম্মদ শাহ তাঁর পিতা আহমদ শাহের মাকবারা পূর্বনির্ধারিত পারিবারিক গোরস্থানেই (জামি মসজিদেব পূর্ব প্রান্তের প্রবেশপথের সামনে গেটের অতি নিকটে) নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন।

সুলতান আহমদ শাহের সমাধি :

বর্গাকাব এ মাকবারাটির প্রতি পার্শ্বের মাঝখানে স্তম্ভ সহযোগে অভিক্ষেপণ বাবান্দা নির্মিত রয়েছে এবং দক্ষিণ দিকে প্রধান প্রবেশপথ অবস্থিত। মাকবারার বাইরের কাঠামোর প্রত্যেক কোনায় একটি বর্গাকার প্রকোষ্ঠ এবং এর মধ্যবর্তী কেন্দ্রেব প্রতিমুখে স্তম্ভায়িত প্রস্তর জালি দ্বারা পরিবেষ্টিত বারান্দা রচিত হয়েছে এবং এটি এমনভাবে সম্পন্ন হয়েছে যা সমগ্র কবর প্রকোষ্ঠকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। এ কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের শীর্ষে বিরাট একটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে এবং কোনায় ছোট গম্বুজ সংযুক্ত। স্তম্ভগুলোর ফাঁকে ফাঁকে ছিদ্রযুক্ত বর্গাকার মাপের পর্দার আচ্ছাদন বয়েছে। এ স্থাপত্য সমাধিসৌধে তেমন কোনো বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্য আদর্শগত উপাদান সৃষ্টি হয় নি।

কিন্তু তা সত্ত্বেও এটি একটি মাকবারা হিসেবে খুবই গুরুত্ব বহন করছে; কারণ গুজরাট অঞ্চলে এটিই প্রথম ঐ প্রকারের একটি সমাধি স্থাপত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে একে অনুসরণ করে অনেক সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছে। এটি ছিল গুজরাটের বর্গাকার পরিকল্পনায় মাকবারা নির্মাণের আদর্শ নকশা।

রানী-কা-হুজরা :

সুলতান আহমদ শাহ নির্মিত গোরস্থানের চৌহদ্দির বাইরে আর একটি অপেক্ষাকৃত ছোট্ট গোরস্থান রচিত হয়েছিল যেখানে আহমদ শাহী বংশের রানীদেরকে কবরস্থ করা হয়েছিল। এটি রানী-কা- হুজরা নামে পরিচিত। এ মাকবারাটি তাঁর নিজের সমাধিসৌধের অনুরূপই একই পদ্ধতিতে এবং প্রায় একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল। এটি একটি বর্গাকার মাপের মাকবারা প্রকল্প। এটি ৩৬.৬০ মি. (১২০ ফুট) ব্যাসের আবেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত। মোটামুটি এটি খিলানায়িত পর্দা দ্বারা গঠিত এবং যার সাথে স্তম্ভায়িত আচ্ছাদিত বারান্দা (cloisters) ভিতর ও বাইরে বিস্তৃত হয়েছে। অভ্যন্তর ভাগ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ (open court) যা এ বংশের রানীদের কবর ফলকে (cenotaphs) পরিপূর্ণ। কেন্দ্রীয় মার্বেল শবাধারটি আহমদ শাহের পত্নীর। এ শবাধারটি সুন্দররূপে খোদাই কাজে শোভিত করা হয়েছে। একে মূল্যবান ধাতু ও মণিমুক্তা, ঝিনুক, মার্বেল পাথর কেটে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং একইভাবে সমগ্র এলাকাটির সজ্জায়ন কাজ নিষ্পন্ন করা হয়েছিল। স্থপতি যেভাবে

সমগ্র কল্পনাকে রূপদান করেছেন তাতে বিন্দুমাত্র ভাবপ্রবণ তাৎপর্য ছিল না; বাস্তবিকপক্ষে নারী কবরের গোপনীয়তার প্রতি গুরুত্বারোপ করে রমণীসুলভ কমনীয় স্রোতের স্বরূপে স্বচ্ছ অলঙ্কৃত খিলানশ্রেণীর দ্বারা পরিবেষ্টন কবা হয়েছিল। এর প্রণয়োদ্দীপক আমন্ত্রণময় সূক্ষ্ম পরিমার্জিত ছককাটা উন্মুক্ত প্রস্তর কারুকার্যগুলো প্রকৃতপক্ষে সমগ্র পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত উপকরণের নিখুঁত পরিসমাপ্তির উজ্জ্বলতা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

সারখেজের মুসলিম স্থাপত্যকর্ম :

মোহাম্মদ শাহের বাজত্বকালে প্রকল্প সূচনার উল্লেখযোগ্য পবিবেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল। গুজরাট স্থাপত্য নির্মাণ এ সময়ে নানাভাবে সমৃদ্ধতা লাভ করেছিল। তাব সময় একটা যৌগিক স্থাপত্য প্রকল্প গড়ে উঠেছিল। এর মধ্যে সারখেজে নির্মিত স্থাপত্য প্রকল্পগুলো সমধিক প্রসিদ্ধ। আহমদাবাদ হতে প্রায় ১০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে সারখেজ নামক স্থানে শেখ আহমদ খাত্তু নামে এক বিজনবাসী সাধু বসতি স্থাপন কবেন এবং সেখানে তিনি ১৪৪৬ খ্রিস্টাব্দে পবলোক গমন করেন।

তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে দুটি স্থাপত্যকীর্তি সুলতান মোহাম্মদ শাহ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে মাকবারা, অপরটি মসজিদ। এ ইমাবতদ্বয় বৃহৎ এবং অতীব ব্যয়বহুল ছিল। অন্যপক্ষে মোহাম্মদ শাহের স্থাপত্যকার্যক্রম এতই ব্যাপক ও বিরাট আকাবের ছিল যে তা একক জীবনে সম্পন্ন করা সম্ভব ছিল না। বাস্তবে এ দু'টি স্থাপত্যকর্ম তাঁব উত্তরাধিকাবী সুলতান কুতুব উদ্দিন দ্বিতীয় আহমদ শাহেব রাজত্বকালে (১৪৫১-৫৮ খ্রি.) সুসম্পন্ন হয়েছিল।

সারখেজ ভূমিতে পবিত্র সমাধিসৌধ নির্মাণের মধ্য দিযে এব গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তির গোড়াপত্তন হয়ে অদূরভবিষ্যতে এটি গুজবাটের সুলতানদের নির্জন আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল এবং এটি একটি রাজকীয় গোরস্থানে পরিণত হয়। এর ফলে উক্ত স্থানে পরবর্তীকালে শেখ আহমদ খাত্তুর মাকবারা ছাড়াও বাজপ্রাসাদ, উদ্যান, চন্দ্রাতপ, তোরণ, গ্রীষ্মাবকাশ কেন্দ্র, বৃহৎ কৃত্রিম জলাশয় ইত্যাদি নির্মিত হয়। এখানকার স্থাপত্য প্রকল্পগুলো প্রায় সবই একই পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগে নির্মিত ও সজ্জায়িত।

শেখ আহমদ খাত্তুর মসজিদ ও মাকবারা :

শেখ আহমদ খাত্তুর মাকবারা নির্মাণের মধ্য দিয়ে সারখেজের স্থাপত্যকর্মের দ্বারোদ্ঘাটন হয় এবং তাঁরই স্মৃতির তর্পণে পরবর্তীকালে এখানে প্রথম মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এ বিশাল মসজিদটি নির্মাণে বিভিন্ন প্রকারের অতি চমৎকার স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছিল। ধীরে ধীরে এখানে বৈচিত্র্যময় স্থাপত্য অট্টালিকা নির্মিত হয়; যা অতিশয় মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন। আর তৈরি হয় রাজপথ যার দু ধার ছিল বৃক্ষরাজি শোভিত; ফলে একটা শান্ত ও গুরুগম্ভীর পরিবেশ স্থানটিকে মোহনীয় করে তুলেছিল।

এ মসজিদ নির্মাণেব সময় সুউচ্চ কিছু কাঠামো বা আনুষ্ঠানিক সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদ নির্মাণের চেষ্টা করা হয় নি বরং লক্ষণীয়ভাবে বাহ্যিক অবয়বে একটা স্বাভাবিক সীমাবদ্ধরূপ সৃষ্টির প্রয়াস ছিল এবং তার ফলও দৃঢ়প্রত্যয়ে উৎপাদিত হয়েছিল। তাই মনোজ্ঞ আকারের অসংখ্য স্তম্ভ একটানা বিস্তারে দলবদ্ধভাবে সাজিয়ে প্রতি কোনা হতে বিরামহীন অশেষ বৈচিত্র্যে বিভূষিত করে তুলতে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। এ মসজিদটি যে কত বড়

ছিল তা এর বাহ্যিক নকশা অনুধাবন করলে সমক্ষ উপলব্ধি করা যায়। এটি দৈর্ঘ্যে ৭৭.৭৫ মি. (২৫৫ ফুট) ও প্রস্থে ৪৭.৯০ মি. (১৫৭ ফুট)। জুল্লাহ বা নামাজঘরটির অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ৪৫.৭২ মি. × ২০.১২ মি.। বস্তুত জুল্লাহ অংশটি একটি হাইপো পদ্ধতির মিলনায়তনে পরিণত হয়েছিল। ৫টি বৃহৎ আকৃতির ও ৪০টি ছোট গম্বুজের সাহায্যে জুল্লাহর ছাদ ছিল পরিবৃত। ১২০টি স্তম্ভের দ্বারা ছাদের ভার বাহিত হচ্ছে। স্তম্ভগুলো এতই নিখুঁত ও পরিপাটি করে তৈরি যে এগুলো আগ্রা দুর্গে নির্মিত মতি মসজিদের স্তম্ভের সাথে তুলনা করা যায়। মসজিদের ফাসাদ সম্পূর্ণরূপে সাহনের দিকে উন্মুক্ত। সাহনের তিন দিকে (উত্তর,দক্ষিণ ও পূর্ব) এক আইল বিশিষ্ট রিওয়াকে পরিবেষ্টিত। রিওয়াকের বহির্প্রাকার সচ্ছিদ্র জালি দ্বারা আবৃত। মসজিদের খোলা আকারের বৈশিষ্ট্যের বিপরীত কবর সৌধটি, কিন্তু আবৃত ও আবেষ্টনী প্রাচীরে বেষ্টন করে নির্মিত করা হয়েছিল। এটি সুদীর্ঘ খিলান সারির সাথে সচ্ছিদ্র পরর্দা সংযুক্ত হয়ে সজ্জিত হয়েছে।

মাকবারার অভ্যন্তরেও হাইপো পদ্ধতির মিলনায়তন স্তম্ভায়িত ছাউনি আকারে নির্মিত হয়েছিল। এটি চার খিলানপথ গভীর বা প্রশস্তবিশিষ্ট ছিল এবং পরিবেষ্টনে কেন্দ্রীয় কবর অবস্থিত। এ সৌধটি ৩১.৭৫ মি. (১০৪ ফুট) বর্গাকার এবং গুজরাটে এ জাতীয় ইমারতের মধ্যে এটিই সর্ববৃহৎ। এর কেন্দ্রীয় গম্বুজ সজ্জিত কবর প্রকোষ্ঠটির প্রতি পার্শ্ব ১১ মি. (৩৬ ফুট)। এ বৃহদাকৃতির গম্বুজটি ১২টি যুগল স্তম্ভের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত। অতি মনোমুগ্ধকরভাবে এ প্রকোষ্ঠটি জালিকার্য দ্বারা পরিবৃত। সাধারণত এ জাতীয় নির্মাণ কাজে সারিবদ্ধ সচ্ছিদ্র মার্বেল পরর্দা বা জালি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে তার পরিবর্তে পিতলের খোপ খোপ ছককাটা নকশা করা কাজ ও বিভিন্ন আকারের মনোজ্ঞ নমুনা (প্যাটর্ন) দ্বারা সুশোভিত (চিত্র নং-৫৫)।

সুলতান কুতুব উদ্দিনের স্থাপত্যকার্যক্রম (১৪৫১-৫৮ খ্রি.) :

গুজরাটের পরবর্তী সুলতান কুতুব উদ্দিনের স্বল্পকালীন শাসনামলে সামান্য কিছু ইমারত নির্মিত হয়েছিল। তবে তিনি ব্যক্তিগতভাবে এসব নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্রথমে তিনি তার নিজ নামেই একটি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এ মসজিদে স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয় নি। তিনি আহমদাবাদের রাজাপুর নামক শহরে তার রানী সাইয়িদ-বুদ্ধা-বিন সাইয়িদ ইয়াকুতের স্মরণে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন এবং পার্শ্বেই রানীর মাকবারাও নির্মিত হয়েছিল। এ দুটি স্থাপত্যকর্ম মিলিতভাবে রওজার রূপ ধারণ করেছিল। এগুলো ১৪৫৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য মসজিদ নির্মাণে কিছু নতুন কৌশল প্রবর্তনের আভাস সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদে দৃষ্ট হয়। গুজরাট মসজিদ স্থাপত্যে এ আকর্ষণীয় স্থাপত্যিক কৌশলটা ছিল নব আবিষ্কার। এটি ত্রয়ী খিলান আকারত্বের অভ্যাসগত বা প্রথা অনুযায়ী কাঠামোর বাহুতে খোলা স্তম্ভের বদলে প্রবর্তিত হয়েছিল। উক্ত রওজায় এ ব্যতিক্রম বা প্রস্থান ছাড়া তেমন কোনো অভিনবত্ব ছিল না বরং একে অত্যন্ত ভারী ও অননুপ্রাণিত স্থাপত্যে পরিণত করেছিল।

এ রাজকীয় প্রকল্প ছাড়াও দুটি কীর্তি ঠিক একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য এগুলো বাহ্যত দরবারের পদস্থ রাজকর্মচারীদের আদেশে নির্মিত হয়েছিল। এ স্থাপত্য কর্মদ্বয়ের নকশা ও প্রয়োগকৃত কৌশল ঐ সময়ে নির্মিত অন্যান্য স্থাপত্যকর্ম হতে ভিন্নতর ছিল। এগুলো বহিরাগত দূরবর্তী প্রভাব দ্বারা অভিষিক্ত হয়েছিল বলে মনে করা যায়। এ দুটি স্থাপত্য ইমারত

আবার এক স্থানে নির্মিত হয় নি। এর একটি আহমদাবাদের দরিয়া খানের মাকবারা, অপরটি ধোলকায় নির্মিত মসজিদ। মাকবারা ও মসজিদ একটি হতে অপরটি বেশ দূরে অবস্থিত। কিন্তু ঐগুলো যে একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল তা স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় এবং কারিগরিক দৃষ্টিকোণ হতে বলা যায় যে এরা একই স্থাপত্য আদর্শে একই স্থপতির দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। মসজিদ গাত্রের শিলালিপি অনুসারে এটি ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।

গুজরাট স্থাপত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এতে নির্মাণ উপকরণ হিসেবে প্রস্তরই প্রধান অবলম্বন। কিন্তু এ স্থাপত্যকর্মে এ রীতির পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। এখানে প্রস্তর ব্যবহার না করে কেবলমাত্র ইটকে নির্মাণ সামগ্রী হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। ইট দ্বারা ইমারত নির্মাণের ফলে কোনো কড়ির স্তম্ভ ব্যবহার তাদের ডিজাইন বা নকশায় দৃষ্ট হয় না এবং এর স্থলে খিলানেও নিখাদ ও নিরেট ইট নির্মিত থাম (piers) ব্যবহৃত হয়েছে। এ স্থাপত্যকর্মের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য কাঠামো গাঠনিক পদ্ধতি অবলোকন করে পরিষ্কার রূপে প্রতীয়মান হয় যে এ দুটি ইমারত বিদেশী পদ্ধতির উদাহরণ যা ঐ সময় গুজরাটে অনুপ্রবেশ করেছিল।

এ বিশেষ ধরনের স্থাপত্য আদর্শগত পদ্ধতি কোথা হতে গুজরাটে অনুপ্রবেষ্টিত হয়েছিল তা সুনির্দিষ্টভাবে বলা না গেলেও এটি মনে করা হয়ে থাকে যে সম্ভবত এটি দক্ষিণ পারস্যের প্রচলিত একটা প্রাদেশিক পদ্ধতি এবং ঐস্থান হতেই সুযোগমতো গুজরাটে আনীত হয়েছিল। কারণ পশ্চিম ভারতের গুজরাট অঞ্চলের সমুদ্র তীরস্থ শহর ক্যাম্বে ও পোরবন্দরের সাথে পারস্যের বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। একদল কারিগর ও স্থপতি তাদের স্বদেশীয় স্থাপত্য পদ্ধতির প্রযোগ প্রথমে ধোলকায় এবং পরে আহমদাবাদে স্থাপত্য ইমারত নির্মাণের মধ্য দিয়ে সুযোগ করে নিয়েছিল। পরবর্তীকালে অনুকূল পরিবেশে সুলতান কুতুব উদ্দিনের রাজদরবারে তারা চাকরি গ্রহণ করেছিল।

দরিয়া খানের সমাধি, আহমদাবাদ :

আহমদাবাদে নির্মিত দরিয়া খানের মাকবারা কিছুটা সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান। এ মাকবারাটি বৃহৎ আকারের এবং একটি আকর্ষণীয় নকশা কাঠামো। এটি বর্গাকার নকশা পরিকল্পনায় নির্মিত। এর প্রতি বাহুর পরিমাপ ৩৬.৬০ মি. (১২০ ফুট) বর্গাকার এবং কেন্দ্রীয় কবর প্রকোষ্ঠটি প্রতিপার্শ্বে ১৫.৩০ মি. (৫০ ফুট) এবং প্রকোষ্ঠের শীর্ষে পিপার উপর মনোজ্ঞ গম্বুজ সংস্থাপিত হয়েছে। ভূমি হতে গম্বুজের চূড়া পর্যন্ত উচ্চতা ২৬.৩০ মি. (৮৬ ফুট)। কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের চতুর্দিকে আন্তঃসংযোগকারী ১৬টি ছোট্ট প্রকোষ্ঠ নির্মিত হয়ে ছোট্ট গম্বুজ শীর্ষে ধারণ করে রয়েছে (ভূমি নকশা নং- ৩১)। এরূপে প্রতিপার্শ্বে চারটি করে ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ (cell) মিলিতভাবে একরকম (করিডোর) ভিতর সংযোগ স্থাপক পথ রচনা করেছে। প্রত্যেক ছোট্ট প্রকোষ্ঠের বহির্পার্শ্বে দরজা পথ সম্মুখ দেয়াল ফাসাদের দিকে উন্মুক্ত। এখানে বৃহৎ ও ক্ষুদ্র গম্বুজগুলোর ভার স্কুইঞ্চ পদ্ধতির খিলান ধারণ করেছে এবং প্রতিটি দরজা অর্ধগোলাকার সূচ্যগ্র খিলানে পরিশোভিত। গুজরাট স্থাপত্যে এখানেই সর্বপ্রথম খিলাননির্ভর (arcuate) স্থাপত্য পদ্ধতির ব্যবহার প্রাণবন্ত হয়ে পরবর্তীকালে গুজরাট স্থাপত্যধারায় একটা পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছিল। তবে পশ্চিম ভারতে বহুদিন হতে প্রচলিত স্থাপত্যধারার প্রভাব একে সহজে গ্রহণীয় হয়ে উঠতে দেয় নি।

কার্যত খিলান নির্ভরশীল বা ধনুকাকৃতির (vault) পদ্ধতির ইসলামি কাঠামোর অনুসরণে অত্র স্থাপত্যকর্ম সম্পন্ন করা হয়েছিল যা সে সময় পর্যন্ত নির্মিত গুজরাটের অন্যান্য

অট্টালিকার সাথে অসাদৃশ্যতা লক্ষণীয়ভাবে বিরাজ করেছিল এবং এ কাজে প্রকারান্তরে ঐসব কারিগর ও স্থপতিগণ অংশগ্রহণ করেছিল যারা আবহমানকাল হতে পৈতৃক সূত্রে নিজস্ব রীতি অনুসরণ করে স্থাপত্য নির্মাণ কাজে অভ্যস্ত ছিল।
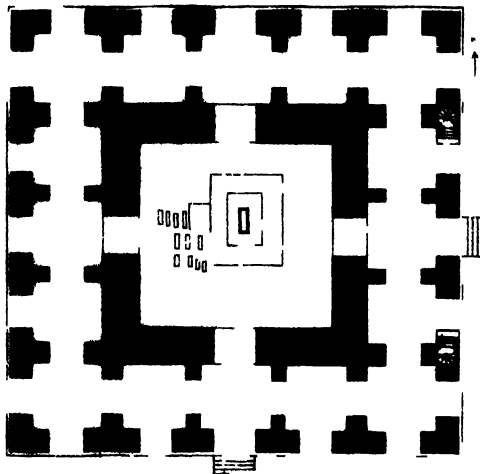
ভূমি নকশা নং-৩১ . দরিয়া খানের সমাধি, আহমদাবাদ

যাহোক নতুন রীতিতে অধিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অনুসরণে এর বিস্তার ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে পেরেছিল। কেননা স্থানীয় স্থপতি ও কারিগরবৃন্দ অত্যন্ত রক্ষণশীল ছিল। তারা তাদের ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যরীতি ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতি হতে সরে আসতে চায় নি বা উক্ত পদ্ধতির মাঝে কোনো পরিবর্তন আনতে চায় নি। তা ছাড়া নির্মাণ কাজে কখনই ইটের ব্যবহার জনপ্রিয় ছিল না। অত্যন্ত ধীর গতিতে এ খিলান পদ্ধতি সমর্থিত ছিল। এমনকি যখন এ পদ্ধতি উন্নতি লাভ করতে থাকে তখনো স্থানীয় কারিগরদের মাঝে বাস্তবে আগ্রহ সহকারে গ্রহণের স্পৃহা দেখা যায় নি।

এটি দেখে মনে হয় যে মুসলিম শাসকগোষ্ঠীকে এটি প্রবর্তনের জন্য একটা অলিখিত সীমিত অনুমতি স্থানীয় কারিগরবৃন্দকে প্রদান করেছিল। এটি পরিষ্কারভাবে পরিলক্ষিত হয় যে নির্মাতার হাত যখন খিলান পদ্ধতির দিকে অগ্রসরমান হয়ে প্রকল্পের নির্মাণরীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিল তখনই স্থানীয় কারিগর বা স্থপতিবৃন্দের মন কড়ি ও ক্রমপূরণ পদ্ধতির মধ্যে আবদ্ধ থাকে এবং খিলান নির্মাণরীতির জটিলতায় জড়িয়ে পড়া হতে নিজেদেরকে বিরত রাখে।

অন্যপক্ষে এতকাল খিলান নামেমাত্র তৌহিদি বা মুসলমানদের এবাদতখানার প্রতীক চিহ্নরূপে ব্যবহার হয়ে এসেছিল। কিন্তু এখানে এটি ইসলামি স্থাপত্য কৌশলরূপে ব্যবহার হয়ে মুসলিম স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দ্বারা গুজরাট অঞ্চল মুসলিম স্থাপত্যচর্চার ক্ষেত্ররূপে সম্প্রসারিত হতে পেরেছিল এবং যেখানে পাথরের লম্বা খণ্ড পাওয়া যেত না সেখানেই এর বেশি প্রচলন লক্ষ করা যায়। পদ্ধতি হিসেবে উপযোগী এবং প্রযুক্তির দিক হতে এটি কিছুটা সুবিধাজনক

গুজরাট স্থাপত্যের তৃতীয়পর্ব (১৪৫৮-১৫৭৫ খ্রি.) :

গুজরাট স্থাপত্যের তৃতীয়পর্বের সূচনা হয় সুলতান মাহমুদ বেগড়ার শাসনামলে (১৪৫৮-১৫১১ খ্রি.)। তাঁর সুদীর্ঘ রাজত্বকালে দেশে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় থাকায় শিল্প ও স্থাপত্যকলার উন্নয়নে তিনি গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। তিনি চম্পানীর, মাহমুদাবাদ এবং জুনাগড় শহর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং এ শহরগুলো অত্যুৎকৃষ্ট ইমারত দ্বারা শোভিত করেন। এমনকি রাজধানী শহর আহমদাবাদেও তিনি অসংখ্য ধর্মীয় ও লৌকিক ইমারত নির্মাণ করেন। তাঁর চিরনিদ্রা স্থান সারখেজকে গ্রীষ্মাবকাশ প্রাসাদ, অনিন্দ্য সুন্দর মসজিদ, মাকবারা, উদ্যান, ফোয়ারা, রাজকীয় প্যাভিলিয়ন ইত্যাদি নির্মাণের মাধ্যমে শোভিত করেন। এখানে নির্মিত স্থাপত্যকর্ম তাঁর স্থাপত্য অনুরাগের সাক্ষ্য বহন করছে।

আহমদাবাদ শহরের উত্তর-পশ্চিম উপকণ্ঠে নির্মিত সুফি সাধক সৈয়দ উসমানের মসজিদ ও সমাধি বেগড়া আমলের প্রথম প্রকল্প হিসেবে চিহ্নিত। এ ইমারত দুটি ১৪৬০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত। উভয় ইমারতের নির্মাণে হাইপো স্টাইল নীতি অনুসারিত। আহমদাবাদ মসজিদ স্থাপত্যের নির্মাণ অবকাঠামো ও অলঙ্করণ পদ্ধতিতে ইতঃপূর্বে চর্চিত উপকরণ ও উপাদানের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। তবে ফাসাদের মিনার দুটি কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের পার্শ্ব থেকে এর উভয় প্রান্তে স্থানান্তরিত হয়েছে। পরবর্তীকালে এ নির্মাণ বৈশিষ্ট্যই রানী শিপ-রাই বা শিব্রাই-এর মসজিদ, শাহ আলমের রওজা মসজিদ ও বাবা লুলুর মসজিদে (১৬৬০ খ্রি.) অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু শাহ আলমের রওজা মসজিদের মিনার দুটি মসজিদ ফাসাদের প্রান্তিক স্থান থেকে প্রায় ২.৭৫ মি. দূরে অবস্থিত।

সৈয়দ উসমানের রওজা বা সমাধি নির্মাণে বর্গাকার ভূমি নকশা পরিকল্পনা প্রাধান্য পেয়েছে। তবে কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের গম্বুজের ভার বহনের জন্য বর্গাকার সমাধি ইমারতের মধ্যে দ্বাদশ কোনা সৃষ্টি করত প্রতি কোনায় যুগল স্তম্ভ সংযোজিত হয়েছে। এ নির্মাণ পরিকল্পনা অবশ্য প্রথমে সারখেজের শেখ আহমদ খাত্তুর মাকবারায় সূচিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সৈয়দ উসমানের মাকবারা, রানী শিব্রাই-এর মাকবারা এবং শাহ আলমের রওজায় এ রীতি পরিদৃষ্ট হয়।

চম্পানারের স্থাপত্যকর্ম :

মোজাফফর শাহী বংশের অন্যতম সুলতান আহমদ শাহ্ ১৪১৮ খ্রিস্টাব্দে চম্পানারে অভিযান পরিচালনা করে সেখানকার হিন্দু নৃপতি ত্রিম্বাকভূপকে পরাজিত করে করদানে বাধ্য করেন। *জাফর-উল-ওয়ালিহ-বি-মুজাফফর ওয়াআলিহি-* এর বর্ণনানুসারে ১৪৪৯-৫০ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মুহাম্মদ শাহ্ চম্পানারের আক্রমণ করে রাজা গঙ্গাদাসকে পরাজিত করেন। প্রাথমিক গুজরাট সুলতানগণ চম্পানার ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে গুজরাট ও মালওয়া সুলতানদের মধ্যে অন্তর্বর্তী অর্থাৎ বাফার রাষ্ট্র হিসেবে জিইয়ে রাখতেই সচেষ্ট ছিলেন এবং সে জন্যই তাঁরা চম্পানারের হিন্দু রাজাদের বারবার পরাজিত করেও এ ক্ষুদ্র রাজ্যটিকে নিজেদের রাজ্যভুক্ত করে নি। ১৪৭৩-৭৪ খ্রিস্টাব্দে সুলতান মাহমুদ বেগাড়া চম্পানার আক্রমণ করেন এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল লুণ্ঠন করেন। পুনরায় তিনি ১৪৮৩-৮৪ খ্রিস্টাব্দে রসুলাবাদ হতে চম্পানারের উপকণ্ঠে লুণ্ঠন অভিযান পরিচালনা করে বিপুল ধনরত্নসহ আহমদাবাদ প্রত্যাবর্তন করেন। এদিকে চম্পানারের রানা পাতাই রসুলাবাদ আক্রমণ করে তথাকার শাসক মালিক সোধাকে হত্যা করে লুণ্ঠনের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। মাহমুদ বেগাড়া এ খবর অবগত হলে অনতিবিলম্বে সসৈন্যে চম্পানার আক্রমণ করে রানা পাতাইকে পরাজিত ও বন্দি করেন (১৪৮৪ খ্রি.)। চম্পানারের প্রাকৃতিক দৃশ্য

সুলতানকে মুগ্ধ করে। তিনি এ মনোরম পরিবেশে একটি দুর্গ নগরী প্রতিষ্ঠা করেন এবং নাম দেন মুহাম্মদাবাদ। 'শহর-ই-মুকাররাম' পবিত্র শহর হিসেবেও তিনি একে করেন আখ্যায়িত। মিরাত-ই-সিকান্দারীর বর্ণনা অনুযায়ী তিনি সুন্দর সুন্দর ইমারত দ্বারা শোভিত করেছিলেন এ শহরটিকে। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট হুমায়ুন গুজরাট সুলতান বাহাদুর শাহ্কে (১৫২৬-১৫৩৭ খ্রি.) চম্পানারে আক্রমণ করেন। বাহাদুর শাহ্ ক্যাম্বে পলায়ন করেন। সম্রাটের আদেশে চম্পানার শহরটির শুধুমাত্র ধর্মীয় ইমারত ব্যতীত অন্যান্য ইমারত ধূলিসাৎ করা হয়। চম্পানার ধ্বংসযজ্ঞের কবল থেকে রক্ষা পাওয়া এ ইমারতগুলো আজ কালের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চম্পানার জামি মসজিদ :

গুজরাট স্থাপত্যের সর্বোৎকৃষ্ট ইমারত হল চম্পানার জামি মসজিদ। এতদিন গুজরাট মসজিদ স্থাপত্য অবকাঠামোর যে অনবদ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল তারই পরিপূর্ণতা লাভ করে চম্পানার জামিতে। এটি হিসার-ই-খাসের গোদ্রা গেট থেকে প্রায় ১৫ মি. উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। কেবলমাত্র উত্তর-পূর্ব কোণের বুরুজ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব রিওয়াকের কিয়দংশ ব্যতীত সমগ্র ইমারতটি এখনো সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান। কেন্দ্রীয় মিহরাবের উপরিভাগে সংযোজিত একটি শিলালিপির ভাষ্যে জানা যায় যে, মসজিদটি ৯২৪ হি. মোতাবেক ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।[১২]

মসজিদটি একটি উঁচু বেদির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং পার্শ্ববর্তী সমতল ভূমি থেকে এর উচ্চতা প্রায় ২.৮০ মি.। এ মঞ্চের চতুর্দিক দিয়ে দন্ত নকশা, ডায়মন্ড নকশা এবং বর্শাফলক নকশা পরিবেষ্টন করে রয়েছে। নামাজ গৃহটি আয়তাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। এর পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ৫১.৬০ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৪.২৫ মি.। এটি বহু স্তম্ভবিশিষ্ট একটি কক্ষ এবং ১১টি গম্বুজ দ্বারা সমগ্র নামাজগৃহটি আচ্ছাদিত যার মধ্যে চারটি করে গম্বুজ সম্মুখ ও পিছন সারিতে এবং অবশিষ্ট তিনটি মধ্যবর্তী সারিতে অবস্থিত (ভূমি নকশা নং- ৩২)।

নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগ দশটি স্তম্ভ সারি দ্বারা ১১টি আইলে বিভক্ত এবং আইলগুলো বিভিন্ন পরিমাপের।[১৩] গম্বুজের নিম্নাংশকে অষ্টভুজাকার রূপ দানের জন্য মূলত আইলগুলো বিভিন্ন পরিমাপে তৈরি। এ ধরনের রীতি-কৌশল আহমদ শাহ এবং আহমদাবাদ জামি মসজিদে লক্ষ করা যায়।

মসজিদের নামাজগৃহের অভ্যন্তরে উত্তর-পশ্চিম কোণে একটি 'মুলুকখানা' অবস্থিত এবং এর পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ১৩.৫০ মি. ও প্রস্থে ৮.৬০ মি.। এর দক্ষিণাংশ প্রস্তর জালি পর্দা দ্বারা বেষ্টিত এবং আর পূর্ব দিকে মার্লনযুক্ত উঁচু প্রাচীরে ঘেরা। এ দিকের প্রাচীরের উচ্চতা ২.৭৩ মি.। 'মুলুকখানার' অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য দুটি প্রবেশপথ রয়েছে-একটি উত্তর দেয়ালের মধ্যাংশে এবং অপরটি 'মুলুকখানার' পূর্ব প্রাকারের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। পূর্ব দিকের প্রবেশপথের পরিমিতি উচ্চতায় ১.৭০ মি. ও প্রসারতায় .৮০ মি.। আর উত্তর দিকের প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বের সিঁড়ি পথ বেয়ে এর উপরে উঠা যায়। মুলুকখানার মেঝেতে গম্বুজের অব্যবহিত নিচে অষ্টপত্র বিশিষ্ট তারকা নকশায় শোভিত।

মসজিদের সম্মুখভাগে অর্থাৎ পূর্ব দেয়ালে পাঁচটি খিলানযুক্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান যার মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি আকার ও আয়তনে পার্শ্ববর্তীগুলো অপেক্ষা বৃহৎ। এ প্রবেশপথগুলো অর্ধ-বৃত্তাকৃতির কৌণিক খিলানযুক্ত এবং আয়তাকার কাঠামোর মধ্যে সংস্থাপিত। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের উচ্চতা ৪.০৫ মি. অথচ অপরাপর খিলানপথের উচ্চতা

২.২০ মি.। কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের সম্মুখে ছয় ধাপবিশিষ্ট সোপানপথ রয়েছে এবং এ সিঁড়িপথ বেয়ে প্রবেশপথের মধ্য দিয়ে জুল্লাহতে প্রবেশ করা যায় (চিত্র নং- ৫৬)।
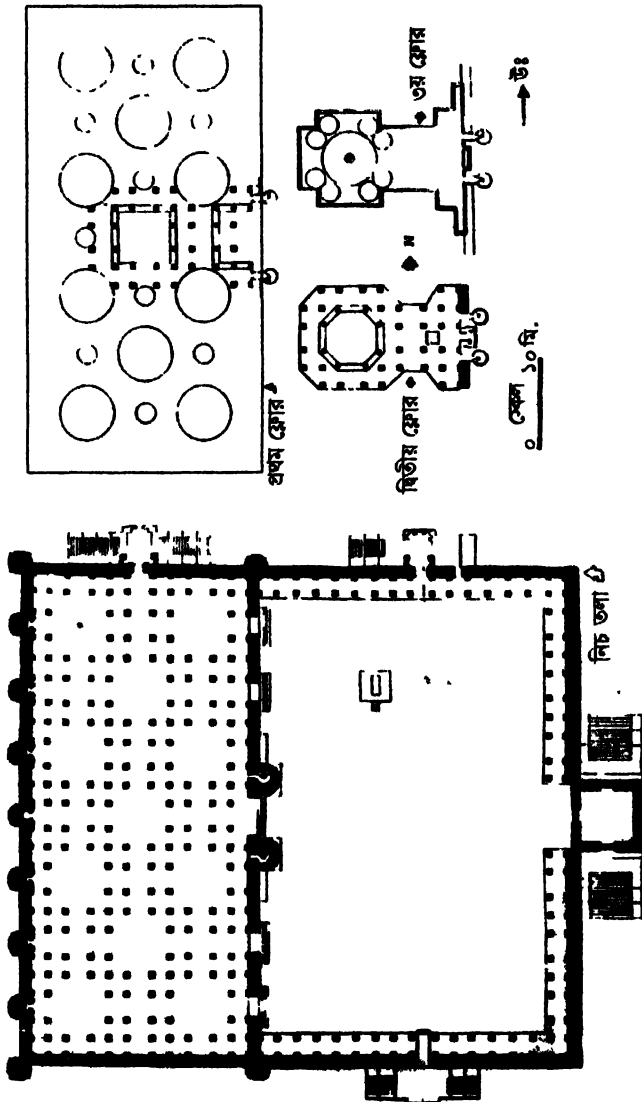
ভূমি নকশা নং-৩২ : চম্পানীর জামি মসজিদ

মসজিদের কেন্দ্রীয় অংশ ত্রিতলাবিশিষ্ট। এর প্রথম তলার উচ্চতা ৮.৯০ মি., দ্বিতীয় তলা ৩.৭০ মি. এবং তৃতীয় তলা দ্বিতীয় তলার পরিমাপের অনুরূপ উচ্চতাবিশিষ্ট। তৃতীয় তলার কেন্দ্রবিন্দুতে ৬.৯০ মি. ব্যাসযুক্ত একটি গগনসদৃশ গম্বুজ সংস্থাপিত। গম্বুজের

অভ্যন্তরভাগ উন্নত খোদাইকার্যে অলঙ্কৃত। বিভিন্ন তলা সংযোজনের ফলে মসজিদটি পিরামিডের আকৃতি ধারণ করেছে (চিত্র নং- ৫৬ ক)।

নামাজগৃহের অভ্যন্তরভাগের কিবলা দেয়ালে সাতটি মিহরাব সন্নিবেশিত (মুলুকখানার মিহরাবসহ) যার মধ্যে কেন্দ্রীয় মিহরাবটি পঞ্চভুজাকৃতির। শ্বেতমর্মরে নির্মিত এ মিহরাবটি উন্নত খোদাই কার্যে অলঙ্কৃত। কেন্দ্রীয় মিহরাবের তলছাদ সুন্দর অ্যাকান্থাস পত্রে সজ্জিত (চিত্র নং- ৫৬ খ)। তা ছাড়া তলছাদের বিভিন্ন অংশে ফুল, লতাপাতা ও জ্যামিতিক নকশালঙ্কার পরিদৃষ্ট হয়। প্রতিটি মিহরাবের পশ্চাৎভাগ উদ্‌গত এবং এ উদ্‌গত অংশের উভয় পার্শ্বে সরু পোস্তা সংযোজিত। মসজিদের প্রতি কোনায় একটি করে সুউচ্চ বুরুজ অবস্থিত। পোস্তা ও বুরুজের শীর্ষদেশ স্তূপা ডিজাইনে অলঙ্কৃত।

নামাজগৃহের অভ্যন্তরে আলো প্রবেশের জন্য ৩০টি বাতায়ন পথের ব্যবস্থা রয়েছে তন্মধ্যে ১৬টি কিবলা দেয়ালে, চারটি উত্তর প্রাকারে, পাঁচটি দক্ষিণ প্রাকারে এবং অবশিষ্ট পাঁচটি সম্মুখ দেয়ালে অবস্থিত। প্রতিটি বাতায়ন পথ আবার প্রস্তর জাফরি দ্বারা আবৃত। জাফরিগুলোব অলঙ্করণে প্রধানত বর্তুলাকার জ্যামিতিক নকশা, পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে গোলায়িত জ্যামিতিক নকশা, ষড়ভুজাকৃতির ডায়মন্ড নকশা, ত্রিভুজাকার নকশা, চতুর্ভুজাকার নকশা এবং ফ্রেট প্যাটার্ন অন্যতম। এ ধরনের কারুকার্য সারখেজে অবস্থিত শেখ আহমদ খাত্তুর মসজিদ ও রওজা এবং মাহমুদ বেগড়ার সমাধির জাফরির কারুকার্যের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।

মসজিদের নামাজগৃহের সম্মুখে একটি উন্মুক্ত সাহন রয়েছে এবং এর পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ৪৭ মি. ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩৩.৩০ মি.। সাহনের তিন দিকে (কিবলা দিক ব্যতীত) এক আইলবিশিষ্ট রিওয়াক বা বারান্দা সংযোজিত এবং রিওয়াকের সম্মুখভাগ সাহনের দিকে উন্মুক্ত। সাহনের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের প্রাচীরের মধ্যবর্তীস্থানে একটি করে প্রবেশ তোরণ বিদ্যমান। প্রতিটি তোরণপথই আবাব সম্মুখ দিকে উদ্‌গত এবং এদের উভয় পার্শ্বে সিঁড়িপথ সংযুক্ত। তবে পূর্ব দিকের প্রবেশ তোরণটি ছিল অত্যন্ত জাঁকালোভাবে নির্মিত। এটি বর্গাকার পরিসর নিয়ে গঠিত (প্রতি বাহু ৫.৯০ মি.)। এর উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম প্রাকারে একটি করে প্রবেশপথ বিদ্যমান এবং পূর্ব প্রাকারে রয়েছে একটি ঝুলন্ত ব্যালকনি। একসময় এ প্রবেশ তোরণটি একটি গম্বুজে আবৃত ছিল। গম্বুজ নির্মাণে খিলান ও সর্দল উভয় পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। বর্গাকার কক্ষের প্রতি কোনায় স্কুইন্স নির্মাণের ফলে অষ্টভুজাকারে রূপান্তরিত হয়। এর উপর এক স্তর প্রস্তরের কড়ি বা বর্গা ব্যবহার করে ষোড়শভুজে পরিণত করা হয়েছে। অতঃপর পর্যায়ক্রমে দুস্তর কড়ি বা বর্গা স্থাপন পূর্বক ষোল কোনাকে বত্রিশ কোনা এবং তৎপর বৃত্তাকার রূপ লাভ করলে গম্বুজের পাদমূল এর উপরে সংস্থাপিত হয়েছে। গাড়ি বারান্দার কারনিসে বিদ্যমান আলম্ব থেকে ধারণা করা যায় যে, একদা এর কারনিস প্রশস্ত ছাইচ দ্বারা আবৃত ছিল এবং এর চার কোনায় চারটি ছত্রী ইমারতের সৌন্দর্যবর্ধনে নিয়োজিত ছিল। চম্পানারে উক্ত মসজিদ ছাড়াও আরো কতিপয় ইমারত নির্মিত হয়েছিল।[১৪]

নাগিনা মসজিদ :

চম্পানারের মসজিদ স্থাপত্যে এক অত্যুৎকৃষ্ট নিদর্শন নাগিনা মসজিদ। এ মসজিদটি চম্পানার জামি মসজিদ হতে উত্তর-পশ্চিমে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। শুধুমাত্র মিনার ব্যতীত সম্পূর্ণ ইমারতটি অক্ষত অবস্থায় টিকে রয়েছে।

প্রায় দুমিটার (১.৯৫) উঁচ বেদির উপর নির্মিত আয়তাকার এ মসজিদটির নামাজঘর উত্তর-দক্ষিণে ২৮.৮০ মি. দৈর্ঘ্য এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১১.২৫ মি. প্রস্থ। চার সারি স্তম্ভ দ্বারা

নামাজঘরটি পাঁচটি আইলে বিভক্ত। এর আইলগুলো সমপরিমাপের নহে। কিবলা প্রাকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আইল ১.৯৫ মি. প্রস্থ পরবর্তী আইল দুটি যথাক্রমে ১.১৫ এবং ১.৯৩ মি.। চতুর্থ ও পঞ্চম আইলাংশ যথাক্রমে ১.৯৫ এবং ১.৯৫ মি. প্রস্থ। অনুরূপভাবে 'বে'-গুলোও বিভিন্ন পরিমাপের। মসজিদের নেভটি ১.৯৫ মি. প্রশস্ত। নেভের ডান পার্শ্বস্থ 'বে'-গুলো পর্যায়ক্রমে ১.৯৫, ১.৯৫, ১.৯৪, ১.২০ এবং ১.৯৪ মি. প্রশস্ত। ডান পার্শ্বস্থ মাপেরই প্রতিফলন ঘটেছে বাম পার্শ্বস্থ 'বে'-গুলোর পরিমাপে। মসজিদে ব্যবহৃত স্তম্ভগুলো বর্গাকৃতির এবং অত্যন্ত নিখুঁত ও মসৃণভাবে তৈরি। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় যেন মার্বেল পাথরে তৈরি (ভমি নকশা নং- ৩৩)।
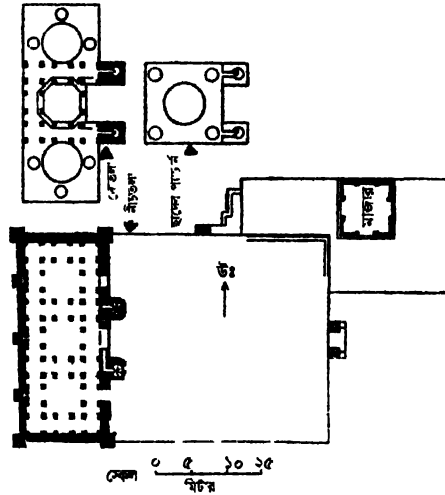
ভূমি নকশা নং-৩৩ : নাগিনা মসজিদ, চম্পানার

মসজিদ কিবলা প্রাকারে মিহরাব তিনটি পূর্ব প্রাকারের প্রবেশ পথগুলোর বিপরীতেই অবস্থিত। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত বড়। সাদামাটা মিহরাবে শুধুমাত্র শিকল ঘণ্টার অলঙ্করণে অলঙ্কৃত, আর ঘণ্টার দু'পার্শ্বে ছড়িয়ে আছে পত্রালঙ্কার।

মসজিদটির কেন্দ্রীয় অংশটি দ্বিতল। চম্পানার জামে মসজিদের মতোই এর নির্মাণকার্য। তবে জামে মসজিদের প্রধান গম্বুজের আড়কাঠগুলো অতি সূক্ষ্মভাবে খোদাইকৃত, কিন্তু নাগিনা মসজিদের আড়কাঠগুলো সাধারণ অলঙ্কারে ভূষিত।

মসজিদের প্রধান প্রবেশপথের দুধারে রয়েছে দুটি প্রক্ষিপ্ত মিনার। মিনার দুটি দ্বিতলের ছাদ বরাবর। উর্ধ্বাংশ ভগ্ন। অনুরূপ ভাঙা মিনার রয়েছে আহমদাবাদের উপকণ্ঠে রাজপুরে 'বিবিজি কা মসজিদে'। শেষোক্ত মসজিদটির ঝুলন্ত মিনারের প্রকৃত রহস্য উদঘাটনে ইংরেজরা একে একে খুলেছিল এর প্রস্তর। কে জানে নাগিনা মসজিদের মিনারের ভাগ্যেও এমন কিছু ঘটেছিল কি না (চিত্র নং- ৫৭)!

মসজিদের বিরাট আঙ্গিনা (৩১ মি. x ৩২.৩০ মি.) সম্পূর্ণ উন্মুক্ত। কোনো একসময় এটি ক্লোয়েস্টার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল; তা আঙ্গিনার ত্রিধারের উচ্চ ভিত্তি থেকে সহজেই অনুমান করা যায়। আঙ্গিনায় প্রবেশের জন্য পূর্ব-পরিসীমার মধ্যস্থলে রয়েছে পাঁচ ধাপের একটি সোপান।

নীলা গম্বুজ মসজিদ :

জামি মসজিদ হতে উত্তর-পূর্ব দিকে এক কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। নীলা গম্বুজ মসজিদ শহরের জল-নিষ্কাশন নালার ধারে অবস্থিত বলে এ মসজিদটি প্রায় তিন মিটার উঁচু বেদির উপর নির্মিত। নির্মাণকার্যে বেলে পাথর ও ব্যাসল্ট পাথর ব্যবহৃত হয়েছে।

নাগিনা মসজিদের প্রায় সম-আয়তনের এ আয়তাকার মসজিদটির নামাজঘর উত্তর-দক্ষিণে ২৯.৩০ মি. দৈর্ঘ্য এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১১.২০ মি. প্রস্থ। এ মসজিদের স্থাপত্যশৈলীর সঙ্গে নাগিনা মসজিদের স্থাপত্যশৈলীর যথেষ্ট মিল রয়েছে। উপরন্তু মসজিদটিব অভ্যন্তরে নীলাভ আলো-আঁধার সৃষ্টিতে স্থপতি অতুলনীয় নির্মাণ কৌশলের পবিচয় দিয়েছে। প্রায় পাঁচ শ বছর পূর্বে নির্মিত এ মসজিদটিতে নীলাভ আলো-ছায়ার খেলা দেখতে ভিড় জমায় শত শত স্থাপত্য অনুরাগী। স্থপতি প্রতিটি প্রস্তরখণ্ডকে পালিশকালে নীল কণিকায় মিশ্রিত আঠালো পলস্তাবার অনুপ্রবেশের ফলে সৃষ্টি হয়েছে ঈষৎ নীল বর্ণের; আব সে জন্যই ভিতবে সূর্যালোক প্রবেশে সৃষ্ট হয় চমকপ্রদ দৃশ্যেব (ভূমি নকশা নং- ৩৪)।
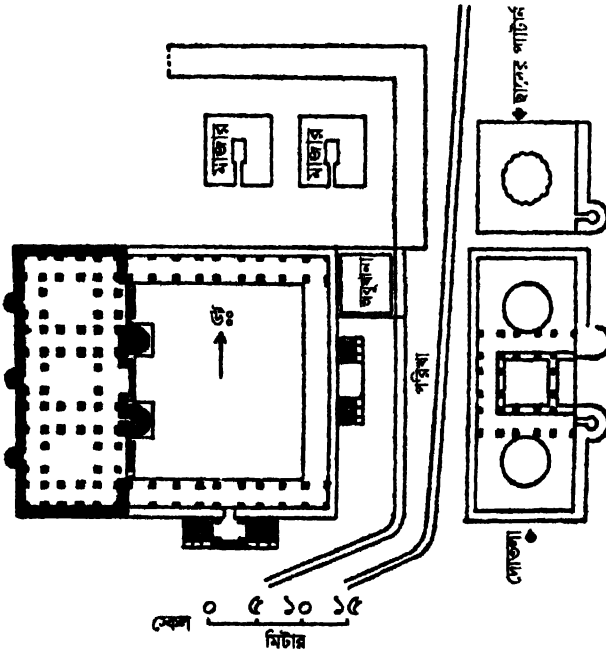
ভূমি নকশা নং-৩৪ : নীলা গম্বুজ মসজিদ, চম্পানার

পারস্য প্রভাবে তৈরি এ মসজিদের গম্বুজগুলো শিরাল। তৈমুর লঙের সমাধি ও বলখের আবু নসর পার্সার সমাধি মসজিদের গম্বুজের সঙ্গে এর যথেষ্ট সাদৃশ্য বিরাজমান। বিশেষত আবু নসর পার্সার সমাধি মসজিদের গম্বুজের প্রভাব প্রাধান্য পেয়েছে। মিসর ও উত্তর আফ্রিকার মুসলিম স্থাপত্যেও শিরাল গম্বুজ দেখা যায়। মিসরের সানজার আল-গাওলী ও সালারের মাদ্রাসা সমাধি (নির্মাণকাল ১৩০৩ খ্রি.), আল বন্দুকধারীর খানকা (নির্মাণকাল ১২৮৩-৮৪ খ্রি.) -এর গম্বুজ এবং উত্তর আফ্রিকার কায়রোয়ানের জামি মসজিদের কেন্দ্রীয়

মিহ্‌রাবের (আগলাবীয়দের সময় নির্মিত) গম্বুজের নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে ঢাকাস্থ খান মৃধা মসজিদের গম্বুজ ও লালবাগ কিল্লাস্থ মসজিদের গম্বুজগুলোও সমশ্রেণীভুক্ত (চিত্র নং- ৫৮)।

মসজিদের আঙ্গিনা এক আইলবিশিষ্ট ক্লোয়েস্টার দ্বারা ছিল পরিবেষ্টিত। বর্তমানে শুধুমাত্র স্তম্ভপদ স্ব-স্ব স্থানে রয়েছে। দক্ষিণ পরিবেষ্টনীর মধ্যস্থলে সাত ধাপের একটি সিঁড়িপথের সাহায্যে আঙ্গিনায় প্রবেশ করা যায়। পূর্ব ও উত্তর বেষ্টনী দ্বয়ের মাঝে সিঁড়িপথের চিহ্ন থাকলেও ঐ সিঁড়ি দুটির অবস্থা জরাজীর্ণ। চম্পানার জামি মসজিদের অজুখানার ন্যায় নীলা গম্বুজের অজুখানাও মসজিদের বাইরে অবস্থিত। বিশ বর্গফুটের এ অজুখানার চারধার ব্যাসল্ট প্রস্তরে সুন্দররূপে ছিল বাঁধানো।

শাহী মসজিদ :

এ মসজিদটি হিসার-ই-খাসের হলল দরজা হতে মাত্র পঞ্চাশ গজ পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। চম্পানার মসজিদ স্থাপত্যে এটি একটি ব্যতিক্রমধর্মী মসজিদ। এ শহরের অন্যান্য মসজিদের দৈর্ঘ্য-প্রস্থের অনুপাত যেখানে ২ঃ১ থেকে ৫ঃ৩ সেখানে শাহী মসজিদের এ অনুপাত হার ৪ঃ১।

দেড় মিটার উঁচু পীঠে নির্মিত আয়তাকার এ মসজিদটির নামাজঘর উত্তর-দক্ষিণে ৪৬.৫০ মি. এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১১.৩০ মি. (ভূমি নকশা নং - ৩৫)। নাগিনা, কেওড়া এবং
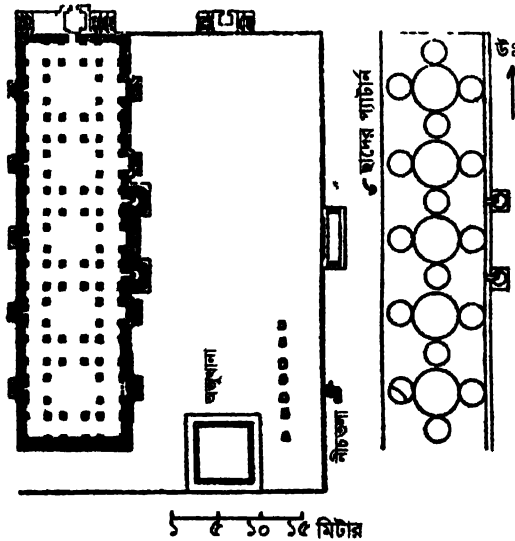
ভূমি নকশা নং-৩৫ : শাহী মসজিদ, চম্পানার

নীলা মসজিদের ন্যায় এ মসজিদের নামাজঘরটি চারসারি স্তম্ভ দ্বারা পাঁচ আইলে বিভক্ত। চম্পানারের বিশিষ্ট মসজিদগুলো একাধিক তলাবিশিষ্ট হলেও শাহী মসজিদটি একতলা। তাই হয়তো এর ছাদ নির্মাণ কৌশল ব্যতিক্রমধর্মী। সর্দল ও খিলানশ্রেণীর (trabeate & arcuate systems) সমন্বয়ে তৈরি ছাদটিতে ফুটে উঠেছে একুশটি অর্ধ-বৃত্তাকার গম্বুজ।

গম্বুজ নির্মাণে কড়ি বা বর্গা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে। গম্বুজের অভ্যন্তরীণ অলঙ্করণে প্রস্ফুটিত সূর্যমুখী পুষ্পকে অর্ধ-গোলাকার হার দ্বারা পরিবেষ্টন প্রাধান্য পেয়েছে। গুজরাটের মন্দির স্থাপত্যে এ জাতীয় অলঙ্করণ নেহাত কম নয়। এ ছাড়াও রয়েছে দাবা বোর্ডের ছক, ক্রমহ্রাসমান পেবেকের মাথা, দন্তনকশা এবং শিকল-ঘণ্টা অলঙ্করণ। বড় গম্বুজ পাঁচটির বিপরীতেই কিবলা প্রাকারে রয়েছে পাঁচটি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি উন্নত খোদাইকার্যে অলঙ্কৃত। কিন্তু অপব মিহরাবগুলো পঞ্চখাঁজ খিলান নকশায় সজ্জিত এবং অভ্যন্তরে রয়েছে শুধুমাত্র শিকল-ঘণ্টা অলঙ্করণ।

কেন্দ্রীয় প্রবেশপথের দুধারে প্রক্ষিপ্ত মিনার দুটিও চম্পানারের অন্যান্য মসজিদের মিনারের তুলনায় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। মসজিদের কারনিসও মনোরম কারুকার্য খোদিত। এ মিনারের নিম্নাংশ অন্য মিনারের সাথে তুলনীয় হলেও ঊর্ধ্বাংশ সম্পূর্ণ নিরেট পাথরে গড়া; অভ্যন্তরীণ পেঁচানো সিঁড়িপথ ছাদে গিয়ে থেমে গেছে। মিনারের ঊর্ধ্বাংশ চার অংশে বিভক্ত—প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ অষ্টভুজাকৃতি, তৃতীয় অংশ বহুভুজাকার (ষোড়শভুজ) এবং শেষাংশ গোলায়িত। মিনাবের শীর্ষদেশ ক্রমহ্রাসমান পেঁচানো বেড় দ্বারা শোভিত (চিত্র নং- ৫৯)।

মসজিদের আঙ্গিনা ক্লোয়েস্টার দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল কি না বর্তমানে বুঝা যায় না। তবে আঙ্গিনা যে স্বল্পোচ্চ দেয়াল ঘেরা ছিল তা আঙ্গিনাব উত্তর-পূর্ব কোণের বিদ্যমান দেয়াল অংশ দেখে অনুমান করা যায়। আঙ্গিনার দক্ষিণ-পূর্ব কোনায় ভগ্নাবস্থায় রয়েছে অজুখানা। অজুখানাটি ছিল ফোয়ারা শোভিত।

বাবামান মসজিদ :

নাগিনা ও লীলা গম্বুজ মসজিদের প্রায় সম আয়তনের এ মসজিদটির নামাজঘর উত্তর-দক্ষিণে ২৯.৭০ মি. দৈর্ঘ্য এবং পূর্ব-পশ্চিম ১১.৩০ মি. প্রস্থ। নামাজঘবটি চাবসারি স্তম্ভের সাহায্যে পাঁচ আইলে বিভক্ত। এ নামাজঘবের বৈশিষ্ট্য হল গম্বুজযুক্ত ছাদটিতে আড় খিলানের উপস্থিতি। এটি যেমন কক্ষের অভ্যন্তরীণ শোভা বাড়িয়েছে, তেমনি সংযোজন করেছে চম্পানার মসজিদ স্থাপত্যে একটি নতুন নির্মাণ রীতি। পাটনে মুহাম্মদ শাহের মাজার সংলগ্ন মসজিদেও অনুরূপ আড় খিলান পরিদৃষ্ট হয়।

বাবামান মসজিদের কিবলা প্রাকারে রয়েছে তিনটি মিহরাব। কেন্দ্রীয় মিহরাব ব্যতীত অন্য দুটি পঞ্চভুজাকার। কেন্দ্রীয় মিহরাবটি আয়তাকার এবং মিহরাবটিতে শিকল-ঘণ্টার অলঙ্করণসহ রয়েছে সূর্যমুখী ফুল ও লতা-পাতায় ঘেরা একটি পাত্র। কেন্দ্রীয় মিহরাবের ডান পার্শ্বে রয়েছে সাত ধাপবিশিষ্ট একটি মিম্বর। চম্পানারের অন্যান্য মসজিদে অনুরূপ মিম্বর বিরল।

মসজিদের আঙ্গিনা উত্তব-দক্ষিণে ৩১.৯০ মি. দৈর্ঘ্য এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৭ মি. প্রস্থ। আঙ্গিনাটি ২.৫০ মি. উঁচু দেয়ালে ঘেরা। আঙ্গিনার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে রয়েছে ২৪ বর্গমিটারের অজুখানা।

মাকাই কোঠার :

গুজরাট সুলতানদের ভাণ্ডারাগার হিসেবে কথিত 'মাকাই কোঠার' একটি সুন্দর ইমারত। দুর্গের পঞ্চম পরিসীমারেখার মধ্যে এটি অবস্থিত। আয়তাকার এ ইমারতটি উত্তর-দক্ষিণে ৩৫.৩০ মি. দৈর্ঘ্য এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১২.৮০ মি. প্রস্থ।

দুটি দেয়ালের সাহায্যে ইমারতটি তিনটি কক্ষে বিভক্ত। প্রতিটি কক্ষই বৃহদাকার গম্বুজ দ্বারা আবৃত। গম্বুজ নির্মাণে, প্রায় বর্গাকৃতি (৯.৫০ × ৯.৩০ মি.) কক্ষের প্রতি কোনায় স্কুইন্স নির্মাণ করে বর্গাকারকে পরিণত করা হয়েছে বর্তুলাকারে। বর্তুলাকার ড্রাম অংশটি প্রায় দেড় মিটার উঁচু এবং এ ড্রামের উপরই গম্বুজ নির্মিত হয়েছে। গম্বুজগুলো ইটের হলেও প্রয়োজনীয় আলোর জন্য রয়েছে 'ডরমার' জানালা। ভৌগোলিক অবস্থানের প্রতি দৃষ্টি রেখে কক্ষের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণকরণই ছিল অবশ্য এ জানালাগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য।

ইমারতের পশ্চিম দেয়ালে প্রতিটি কক্ষের মধ্যস্থলে রয়েছে একটি করে প্রবেশপথ। সমতল ছাদের বারান্দা হতে এ পথের সাহায্যে ভিতরে প্রবেশ করা যায়। বারান্দাটি অশ্বপাদুকাকৃতি খিলানের সাহায্যে উন্মুক্ত; আর এ খিলানশ্রেণী বর্গাকার স্তম্ভেই অবস্থান করছে।

নওলাখি কোঠার :

ইমারতটি দুর্গের সপ্তম সীমারেখাব মধ্যে অবস্থিত। এটিও গুজরাট সুলতানদের শস্যাগার বা ভাণ্ডারাগার হিসেবেই পরিচিত। ইমারতটি ইংরেজি 'এল' অক্ষরের মতো। ইমারতটির দীর্ঘ বাহুটি উত্তর-দক্ষিণে ৩৯.৪০ মি. এবং খর্ব বাহুটি পূর্ব-পশ্চিমে ২৩.৮০ মি.। এটি সাতটি বর্গাকার কক্ষে বিভক্ত। প্রতিটি কক্ষ একটি বৃহদাকার গম্বুজের সাহায্যে পরিবৃত। মাকাই কোঠারের অনুরূপ, কক্ষে আলো প্রবেশের জন্য গম্বুজের শীর্ষে রয়েছে 'ডরমার' জানালা।

ইমারতের প্রতিটি কক্ষে প্রবেশের জন্য রয়েছে এক একটি করে প্রবেশপথ। প্রবেশপথের শীর্ষদেশে সর্দলের ব্যবহার স্বদেশী নির্মাণরীতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেয়। উত্তর-দক্ষিণে লম্বা বাহুর সম্মুখে ছিল ২ মি. প্রশস্ত বারান্দা। বর্তমানে বারান্দায় স্তম্ভপদ ব্যতীত অন্য কিছু অবশিষ্ট নেই।

আলোচিত ইমারতগুলো চম্পানারের জামি মসজিদ বা আহমদাবাদের জামি মসজিদের ন্যায় জাঁকালো ইমারত না হলেও স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ও নির্মাণ কৌশলের দিক থেকে গুজরাট রীতির সমশ্রেণীভুক্ত। ইমারতগুলো শুধুমাত্র চম্পানার স্থাপত্য ইতিহাসের কলেবর বৃদ্ধিতে সহায়তা করেনি বরং ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে অবদান রেখেছে। প্রতিটি ইমারতই স্বদেশী নির্মাণরীতির পাশাপাশি বিদেশী বিশেষত পারস্য নির্মাণ পদ্ধতির সাক্ষ্য বহন করছে।

সিদি সৈয়দের মসজিদ :

আহমদাবাদ মসজিদ স্থাপত্যের মধ্যে বিরল প্রকৃতির আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ সিদি সৈয়দের মসজিদটি আহমদ শাহের দুর্গের উত্তর-পূর্ব কোনায় অবস্থিত। নয়নাভিরাম, চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী জালিকার্যের জন্য মসজিদটি বিশ্ব বিখ্যাত।

সিদি সৈয়দের পরিচয় সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ নানা গল্পের অবতারণা করেছেন। টি.সি. হোপ বলেছেন যে ইনি প্রথম আহমদ শাহের একজন ক্রীতদাস ছিলেন। মেধা, অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফলে ইনি প্রচুর ধনসম্পদের মালিক হওয়া ছাড়াও রাজানুগ্রহে বিশিষ্ট মর্যাদাপূর্ণ আসনে সমাসীন হওয়ার গৌরব অর্জন করেছিলেন। কিন্তু মসজিদটির স্থাপত্যিক ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যদৃষ্টে তাকে আহমদ শাহের শাসনামলের ব্যক্তি বলে মনে হয় না। কারণ সিদি সৈয়দের মসজিদের নির্মাণ রীতি-কৌশল ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যের সাথে বিখ্যাত সুফি দরবেশ শাহ আলমের রওজায় নির্মিত মসজিদের যথেষ্ট সাদৃশ্য

বিদ্যমান। জে.বার্জেস মসজিদের শিল্প-রীতি ও নির্মাণ কলাকৌশল পর্যবেক্ষণ পূর্বক এটিকে শাহ্ আলমের রওজায় নির্মিত মসজিদের সমসাময়িক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। উল্লেখ্য যে দরবেশ শাহ্ আলমের রওজায় নির্মিত মসজিদসহ অন্য ইমারতগুলো সুলতান তৃতীয় মোজাফফর শাহের সময় (১৫৬১-১৫৭৩ খ্রি.) পুনঃনির্মিত হয়েছিল।

ঐতিহাসিক কোমিশারিয়েট বলেছেন যে সিদি সৈয়দের প্রকৃত নাম ছিল শেখ সৈয়দ আল-হাবসী সুলতানী। প্রাথমিক জীবনে তিনি রুমী খানের ক্রীতদাস ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি সুলতান তৃতীয় মাহমুদের (১৫৩৭-১৫৫৪ খ্রি.) অধীনে চাকরি গ্রহণ করেন। সুলতান মাহমুদ ইন্তেকাল করলে তিনি সুলতানের দরবারেব বিশিষ্ট আমত্য ঝুঝার খানের তত্ত্বাবধানে চলে যান এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে তার বিশ্বস্ততা অর্জন করেন। ঝুঝার খান তাঁকে ভ্রাতৃতুল্য স্নেহ করতেন এবং তিনি (ঝুঝার খান) সুলতান তৃতীয় আহমদ শাহকে প্রভাবিত করে সিদি সৈয়দের জন্য একটি জায়গিরের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে সিদি সৈয়দ অগাধ ধনসম্পত্তির মালিক হন। এ মসজিদটি তাঁরই স্থাপত্যকর্মের নিদর্শনরূপে আজো দাঁড়িয়ে আছে।

আয়তাকার নকশা পরিকল্পনায় নির্মিত প্রতীকী (typical) বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ এ মসজিদটির অভ্যন্তরীণ পরিমাপ ২০.৭০ মি. × ১০.৯৫ মি. (ভূমি নকশা নং- ৩৬)। প্রাথমিক মসজিদ
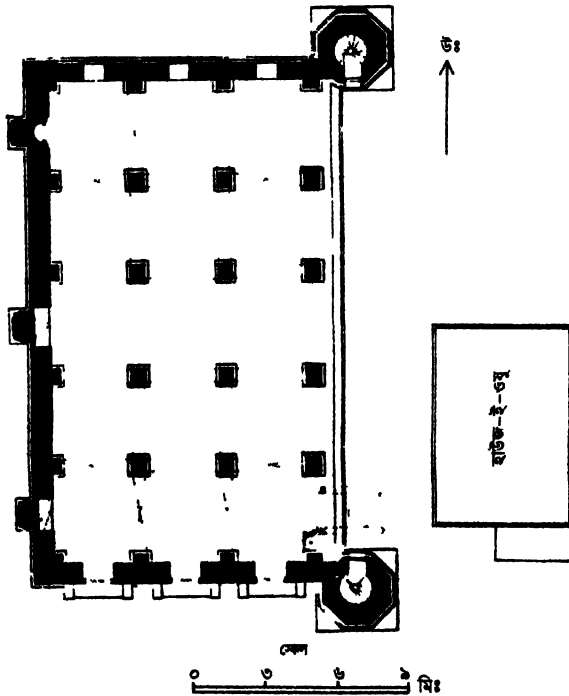
ভূমি নকশা নং-৩৬ সিদি সৈযদের মসজিদ, আহমদাবাদ

স্থাপত্যের ন্যায় এক সারি খিলানশ্রেণীর দ্বারা মসজিদের জুল্লাহ্ সাহনের দিকে উন্মুক্ত। চারটি বৃহদাকৃতির পিয়ার এবং উভয় প্রান্তের প্রাকার সংশ্লিষ্ট স্তম্ভই খিলানশ্রেণীর

ভার বহন করছে (চিত্র নং- ৬০)। খিলানগুলো অর্ধ-বৃত্তাকার এবং তলদেশ ও পৃষ্ঠদেশ অলঙ্কারবিহীন।

দুসারি পিয়ার আয়তাকার নামাজঘরটিকে তিন আইলে বিভক্ত করেছে। আবার পাঁচটি 'বে' আইলগুলোকে বিভাজন করে ১৫টি 'বে' বর্গাকার সৃষ্টি করেছে। প্রতিটি 'বে' বর্গ একটি নিচু তলছাদবিশিষ্ট গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত। ছাদ ও গম্বুজ নির্মাণে ট্রাবিয়েট ও আর্কুয়েট উভয় নির্মাণ কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে। নামাজঘরের পশ্চিম প্রাকার তিনটি মিহ্রাব ধারণ করে রয়েছে। মিহ্রাবগুলো প্রস্তর খোদাইকার্যে অতি নিখুঁতভাবে অলঙ্কৃত।

এ মসজিদটি এর অত্যুৎকৃষ্ট ও হৃদয়গ্রাহী জালি কার্যের জন্য বিশ্ব বিখ্যাত। কিবলা প্রাকারে সর্দলোপরি নির্মিত খিলানশ্রেণীর প্রতিটি খিলানগর্ভ বিরল প্রকৃতির প্রস্তরজালি দ্বারা আবদ্ধ। জালিগুলো প্রাকৃতিক তরু লতায় পরিপূর্ণ। ফলবান খর্জুর বৃক্ষ, পত্র পল্লব ও ফুলে ফলে সুশোভিত দ্রাক্ষা লতার সর্পিল গতি এক অপূর্ব মনোহারিত্ব ও নান্দনিক দৃশ্যের অবতারণা করেছে (চিত্র নং-৬১)। দৃশ্যগুলো সৃষ্টিতে শিল্পী অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। অতীব পরিতাপের বিষয় যে পাঁচটি খিলানগর্ভের অলঙ্কৃত জালিগুলোর মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর কোনো একসময়ে ব্রিটিশ সরকার মধ্যবর্তী খিলানগর্ভের জালিকর্মটি পাচার করে নিয়ে গেছে।[১৫]

গুজরাটের সোপান কূপ[১৬] :

সোপান কূপকে হিন্দি বা উর্দুতে বলা হয়ে থাকে 'বাওলি'। সাধারণ বর্তুলাকার কূপ থেকে এ কূপের নির্মাণ পদ্ধতি সম্পূর্ণ ভিন্নতর। প্রোটো ঐতিহাসিক প্রত্নস্থল খননে গোলায়িত কূপ হর-হামেশাই অনাবৃত হলেও সোপান কূপের নজির অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নি। ভারতীয় স্থাপত্যে প্রাক-মুসলিম যুগে সোপানকূপের সংখ্যা নেহায়েত কম নয়। প্রাক-মুসলিম কূপসমূহ পশ্চিম ভারতেই বেশি দেখা যায়। এগুলো সাধারণভাবে দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নির্মিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতবর্ষে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে যেমন নব অধ্যায় সূচিত হয় তেমনি কূপ-স্থাপত্যেরও বিকাশ সাধিত হয়। এ বিকাশ প্রধানত উত্তর-ভারত ও পশ্চিম ভারতেই লক্ষ করা যায়। তবে উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলে যে সোপান-কূপের নমুনা নেই তা বলা যুক্তিযুক্ত হবে না।

এনসাইক্লোপিডিয়া অব ইসলামের লেখকগণের মতে এ উপমহাদেশের সোপান-কূপগুলোকে দু শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :

(ক) **উত্তরাঞ্চলীয় প্রকরণ** (northern variety) এবং

(খ) **পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রকরণ** (western variety)।

ক) উত্তরাঞ্চলীয় প্রকরণ : এ শ্রেণীর কূপ সাধারণত উত্তর প্রদেশ, বিহার, দিল্লি, আগ্রা, ফতেপুর সিক্রি, জয়পুর, আজমীর ও রাজস্থানে দেখা যায়। এ কূপের নির্মাণ রীতি জটিল নয়। একটি বর্তুলাকার কূপের যে কোনো এক পার্শ্বে একটি সিঁড়িপথ নির্মাণই এ শ্রেণীর কূপের প্রধান বৈশিষ্ট্য। কূপ বিশেষে পাঁচ ও সাত ধাপ অন্তর অন্তর রয়েছে মঞ্চ। মঞ্চসমূহ একতল, দ্বিতল ও ত্রিতল সমতল ছাউনিতে আচ্ছাদিত। মেহরাওয়ালীতে খাজা বখতিয়ার কাকির দরগার সোপান কূপটির সিঁড়িপথ পূর্ব-পশ্চিমে প্রলম্বিত এবং এ সিঁড়িপথটি সমাধিকেন্দ্রিক নয়। প্রলম্বিত এ সিঁড়িপথের পূর্ব প্রান্তে রয়েছে মঞ্চ। কিন্তু হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার দরগায় নির্মিত কূপটির সিঁড়িপথ সমাধিকেন্দ্রিক করে তৈরি।

সমাধিসৌধের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এ কূপের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত। সিঁড়িপথ ছাড়াও এ কূপগুলোতে কপিকলের সাহায্যে পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা ছিল। ফতেপুর সিক্রিতে বুলন্দ দরজার সন্নিকটে সেলিম চিশতির নাম বহনকারী সোপান-কূপটি উত্তরাঞ্চলীয় প্রকরণের একটি ব্যতিক্রমধর্মী সৃষ্টি। এ সোপান-কূপের প্রধান কূপটি অনিয়মিত বহুভুজাকারে নির্মিত এবং এ কূপটিব সিঁড়িপথ কোনো দিকবলয় অথবা সেলিম চিশতির সমাধিসৌধকে কেন্দ্র করে তৈরি নয়। কূপটি একটি খিলানশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। সিঁড়িপথে জানানাদের গোপনীয়তা বক্ষার জন্য বিশেষ পরদা-প্রাকারের ব্যবস্থা রয়েছে। সৈয়দ মুহাম্মদ লতিফের মতে এ স্থান রাজকীয় জানানা মহলের স্নানাগাররূপে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে কূপটির অবস্থা অত্যন্ত জীর্ণ এবং নোংরা।

খ) পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রকরণ : ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিমাঞ্চলীয় জোনেব (western zone) আওতাভুক্ত কূপসমূহই এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। বৃহত্তর গুজরাট, রাজস্থানের দক্ষিণাংশ, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং মহারাষ্ট্রের উত্তর-উত্তর-পশ্চিমাংশেই এ শ্রেণীর কূপ উল্লেখযোগ্যসংখ্যক নির্মিত হয়েছে। এ বিরাট অঞ্চলেব মধ্যে গুজরাটেব সোপান-কূপই স্থাপত্যিক ও শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ।

পানীয় জলের উৎস হিসেবে নির্মিত হলেও স্থাপত্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুজরাটের সোপান-কূপকে প্রাথমিক পর্যায়ে দুভাগে বিভক্ত করা যায় .

১. গ্রীষ্মাবকাশ সোপান কূপ (summer palace stepwell) এবং

২. সাধারণ সোপান কূপ (ordinary stepwell)।

১) গ্রীষ্মাবকাশ সোপান কূপ : স্থাপত্যিক রীতি কৌশল পর্যবেক্ষণে গ্রীষ্মাবকাশ সোপান কূপকে গ্রীষ্মপ্রাসাদ কূপও বলা যেতে পারে। এ জাতীয় কূপে কূপ-গহ্বর ছাড়াও গ্রীষ্মাবকাশ কক্ষ বয়েছে। উদাহবণস্বরূপ মাহমুদাবাদের নিকটবর্তী ভামারিয়া কূপের নামোল্লেখ করা যায়। গুজরাট স্থাপত্যের কিংবদন্তিব স্থপতি সুলতান মাহমুদ বেগাড়া কর্তৃক এ কূপটি হয়েছে নির্মিত। আস্ত পাথব কেটে কেটে এর মূল নকশা বাস্তবায়িত। প্রায় বর্গাকৃতি (২৩.৮০ × ২৪.৫০ মি.) জায়গা নিয়ে এর নির্মাণকার্য পরিচালিত। পাঁচটি সমব্যাসের বর্তুলাকার বলয় 'আড়াআড়ি'ভাবে সজ্জিত করেই কূপের মূল নকশা সম্পাদিত। কেন্দ্রীয় বলয়টি অষ্টভুজাকারে প্রধান কূপ সুগভীর করে খনিত। কূপের প্রতিটি ভুজ ৩.২০ মি. দীর্ঘ এবং কূপের ব্যাস ৭.৫০ মি. (ভূমি নকশা নং- ৩৭)। বর্তুলাকার কক্ষ চতুষ্টয়ের চারদিক বলয়ে প্রধান কূপ থেকে প্রক্ষিপ্তাকারে সজ্জিত। কোণা কক্ষগুলোতে সিঁড়িপথের মাধ্যমে সহজেই গমনাগমন করা যায়। এ কক্ষগুলো সমতল ছাদে আচ্ছাদিত। সুতরাং
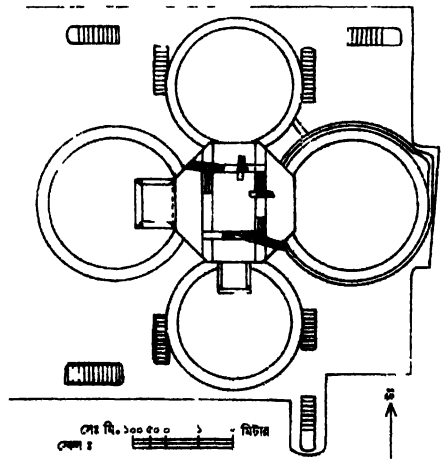
ভূমি নকশা নং-৩৭ : ভামারিয়া কূপ, মাহমুদাবাদ

কূপের সমতল ছাদ থেকে কপিকলের সাহায্যে পানি উত্তোলন যেমন সহজতর হয়েছে তেমনি কক্ষাভ্যন্তরে অবস্থানকারীদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও গোপনীয়তাও রক্ষা পেয়েছে।

গ্রীষ্মকালে (বিশেষত এপ্রিল-মে মাসে) গুজরাটে তাপমাত্রা ভীষণ বৃদ্ধি পায়। ৪৬০ ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে ৪৮০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা প্রায় পক্ষকাল যাবৎ অপরিবর্তিত থাকে। উত্তাপের ফলে অনেকের শরীরেই ফোসকা পড়ে। এ সময় সামান্য শীতল স্থানের জন্য জনসাধারণকে ছুটাছুটি করতে দেখে যায়। গ্রীষ্মকালে সরকারি আমলা অথবা বিত্তশালীগণ এ জাতীয় প্রাসাদ-কূপে ক্ষণিকের জন্য অবস্থান করতেন।

সুলতান মাহমুদ বেগাড়া তাঁর রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় শহর চম্পানারকে টাঁকশাল শহরের মর্যাদায় উন্নীত করায় এ শহরের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। আহমদাবাদ হতে চম্পানার গমনাগমনের মধ্যবর্তী শহর হিসেবে মাহমুদাবাদও সুলতানের দৃষ্টি এড়ায় নি। সুলতান এ শহরের শ্রীবৃদ্ধিতে নজর দিয়েছিলেন। তাইতো শহরের উপকণ্ঠে সুলতানের জন্য নির্মিত হয়েছিল প্রমোদোদ্যান। এ প্রমোদোদ্যানেই সুলতানের নির্দেশে তৈরি হয়েছিল ভামারিয়া কূপ। ভামারিয়া কূপেব অনুরূপ কূপ মান্দায় দেখা যায়। কিন্তু মান্দায় কূপ আকারে ছোট। এখানেও গ্রীষ্মাবকাশ কক্ষ রয়েছে।

গুজরাটের অধিকাংশ মধ্যযুগীয় শহবেই সোপান-কূপ রয়েছে। আঞ্চলিক ভাষায় এ সমস্ত কূপকে 'ভাব' (vav) বা 'ভাপি' (vapi) বলা হয়ে থাকে। অধিকাংশ 'ভাব'-এ গ্রীষ্মাবকাশ কক্ষ রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ পাটন আনহিলওয়াড়ের 'রানী-কি-ভাব' আহমদাবাদের (আস্রবায়) 'মাতাভবানী-কি-ভাব' এবং বরোদার 'নওলাখী ভাব' ইত্যাদির নামোল্লেখ করা যায়। তবে ভামারিয়া কূপে অবকাশ যাপনের জন্য যেমন ব্যবস্থা রয়েছে তেমনি এগুলোতে নেই। অন্য স্থানের কূপের সিঁড়িপথের দুধারে আয়তাকার বা বর্গাকার ছোট ছোট কক্ষ রয়েছে প্রধান কূপ গহ্বরকে পরিবেষ্টন করে নয়।

২) সাধারণ সোপান কূপ : গুজরাটে সাধারণ সোপান কূপের সংখ্যাই বেশি। এ শ্রেণীর কূপের গঠন প্রকৃতি ও নির্মাণ প্রকৌশল পর্যবেক্ষণে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায়—

১. অন্তরস্থ পেঁচানো সিঁড়ি কূপ (a vav with spiral staircase inside),
২. প্রান্তস্থ পেঁচানো সিঁড়ি কূপ (a vav with descending staircase on its outer periphery) এবং
৩. এক পার্শ্বীয় দীর্ঘ সিঁড়ি কূপ (a vav with a long staircase from outside)

১. অন্তরস্থ পেঁচানো সিঁড়ি কূপ : এ শ্রেণীর কূপ সাধারণত সংকীর্ণ সিঁড়ি সমন্বয়ে নির্মিত। সিঁড়িটি বর্তুলাকার কূপের সামান্য দূরে আরম্ভ হয়ে ক্রমান্বয়ে কূপের অন্তরাভিমুখে নীত এবং কূপের ভিতর 'স্ক্রু'-এর মতো পেঁচানোভাবে তৈরি। সিঁড়ির এক প্রান্ত কূপের প্রান্তস্থ প্রাকারের সঙ্গে সংযুক্ত এবং অপর প্রান্ত উন্মুক্ত হওয়ায় পানি-বাহক যে কোনো সময় কূপের মধ্যে পড়ে যেতে পারে। চম্পানার শহরের "হেলিকল ভাব" এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত কূপ। এ কূপের বর্তুলাকার কূপ গহ্বরটি ৭.৫০ মি. ব্যাসের কিন্তু সিঁড়িপথ মাত্র ১১.৪০ মি. দূর থেকে আরম্ভ হয়ে কূপ গহ্বরে এসে মিশেছে (ভূমি নকশা নং- ৩৮)।

প্রতি নয় ধাপ অন্তর এক মিটার প্রশস্তের একটি মঞ্চ রয়েছে। খুব সম্ভব এগুলো পানি-বাহকদের সুবিধার্থে তৈরি। সিঁড়ি ছাড়াও এখানে কপিকলের সাহায্যে পানি উত্তোলনের

ব্যবস্থা রয়েছে। পানি-বাহকদের জন্য এ শ্রেণীর কূপ নিরাপদ নয় বলে এ শ্রেণীর কূপের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

ভূমি নকশা নং-৩৮ বীবপুব ভাব, বীবপুব, আহমদনগব
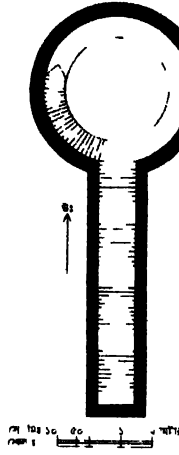
২. প্রান্তস্থ পেঁচানোসিঁড়ি কূপ ঃ এ শ্রেণীর কূপগুলো গোলাযিত কূপেব ন্যায় প্রধান কূপ-গহ্বরটি বর্তুলাকাব। বর্তুলাকার কূপেব প্রান্তস্থ প্রাকারে একটি পেঁচানো সিঁড়িপথ রয়েছে। বামাবর্ত এ সিঁড়িপথটিতে নয় ধাপ অন্তর একটি ছোট মঞ্চ। সিঁড়িপথ ও কূপের মধ্যবর্তী প্রাকারে সোপানপথের প্রতিটি মঞ্চে একটি খিলানপথ নির্মাণেব ফলে কূপ ও সিঁড়িপথের সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এ পথ দিয়ে যেমন কূপ থেকে পানি উত্তোলন করা যায় তেমনি খিলানপথে পানি সিঁড়িতে প্রবেশের ফলে সিঁড়ি থেকেও পানি সংগ্রহ কবা যায়। মধ্যবর্তী প্রাকারের ফলে পানি-বাহকদের জন্য এ জাতীয় কূপ নিরাপদ (ভূমি নকশা নং-৩৯)।
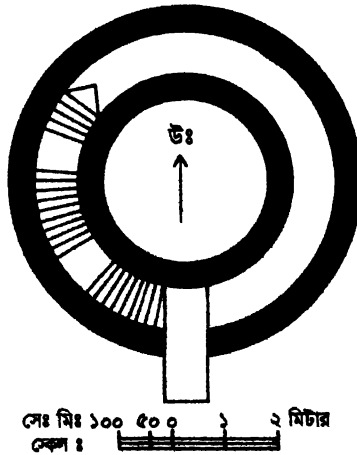
ভূমি নকশা নং-৩৯ : হেলিকল ভাব, চম্পানার

উত্তর গুজরাটের বীরপুরে প্রাপ্তস্থ পেঁচানো সিঁড়ি কূপ পরিদৃষ্ট হয়। কূপটির ব্যাস ৮.১০ মি.। ১.২৫ মি. স্বল্প প্রশস্ত একটি সিঁড়িপথ 'স্ক্রু'র ন্যায় কূপটিকে পেঁচিয়ে রয়েছে। এ কূপের মধ্যবর্তী প্রাকার .৫৫ মি. পুরু। ইট ও প্রস্তরখণ্ডই কূপের প্রধান নির্মাণ উপকরণ। কূপের নির্মাণ উপকরণ, স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য, এবং খিলানেব প্রকৃতি পর্যবেক্ষণে পঞ্চদশ শতকের তৈরি বলে মনে হয়। স্থানীয় জনসাধারণের ভাষ্যানুযায়ী এ জাতীয় কূপ উত্তর গুজরাটের আহমদনগর ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকাতে বেশ কিছু নির্মিত হয়েছিল।

৩. এক পার্শ্বীয় দীর্ঘ সিঁড়ি কূপ : গুজরাটের কূপ স্থাপত্যে এ শ্রেণীব কূপই সংখ্যাধিক। এ কূপগুলোতে একটি সিঁড়িপথ যে কোনো একদিক থেকে এসে বর্তুলাকার, অথবা অষ্টভুজাকার কূপ গহ্বরে মিশেছে। সিঁড়িপথটি কূপেব প্রায় এক-চতুর্থাংশ স্থান নিয়ে তৈরি। উত্তরাঞ্চলীয কূপের সঙ্গে এ কূপের সাদৃশ্য বয়েছে। তবে উত্তবাঞ্চলীয় কূপসমূহ যেমন সাদামাটাভাবে তৈরি তেমনটি গুজরাটের কূপসমূহ নয়। গুজরাটেব এ কূপগুলো স্থাপত্যিক ও আলঙ্কাবিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। আনহিলওয়াড় পাটনের রানী-কি-ভাব (১০২২-৬৩ খ্রি.), আস্রবার মাতা-ভবানী-ভাব (১১শ শতাব্দী), আহমদাবাদের বাই হরির ভাব (১৫৫০ খ্রি.), আদালজের-ভাব (১৫৫৮ খ্রি.), রোহাব সোপান কূপ (১৫৬০ খ্রি.), ভিয়াদের সোপান কূপ (১৫শ শতাব্দী), মান্দার সোপান কূপ (১৫শ শতাব্দী) এবং ইছানপুরের সোপান কূপ (ঊনবিংশ শতাব্দীব গোড়াব দিকে) এ শ্রেণীর কূপের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ কূপগুলো নির্মাণে স্থপতি স্থাপত্য অবকাঠামোকে সুন্দব অলঙ্করণে করেছেন শোভিত। আর অলঙ্কারকার্যে বিশেষ কোনো ধর্মীয শ্রেণীর অলঙ্করণ নীতি অনুসৃত হয় নি। অলঙ্কাবকার্যে শিল্পীর স্বাধীনতাব ফলে আদালজের কূপ হিন্দু নির্মাতা হওয়া সত্ত্বেও মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্কবণের বিশেষত মিম্বাব এবং মিহরাব অলঙ্কবণের যথেষ্ট প্রভাব পড়েছে (ভূমি নকশা নং- ৪০)।
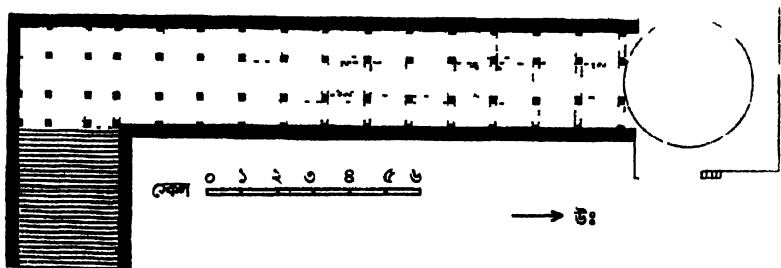
ভূমি নকশা নং-৪০ নওলাখি ভাব, ববোদা

এক পার্শ্বীয় প্রলম্বিত সোপান পথ এ কূপসমূহের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলেও কোনো কোনো কূপের নির্মাণ রীতিতে পার্থক্য লক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ আদালজ ও নওলাখি কূপের নামোল্লেখ করা যায়। উভয় কূপই দীর্ঘ সিঁড়িপথবিশিষ্ট হলেও অন্যান্য অবকাঠামোয় বিশেষ ফাবাক রয়েছে। আদালজের মূল কূপটি অষ্টভুজ কিন্তু নওলাখি বর্তুলাকার। আদালজের সোপানপথের সম্মুখে রয়েছে একটি উঁচু মঞ্চ এবং এ মঞ্চের সম্মুখস্থ কোনায় দুটি অষ্টভুজ প্যাভেলিয়ন নির্মাণ শুধুমাত্র মঞ্চের সৌন্দর্যই বর্ধন কবে নি ববং বাড়িয়েছে স্থাপত্য অবকাঠামোর গুরুত্ব। প্যাভেলিয়ন দুটিব মধ্যে অশ্মাসনেব ব্যবস্থা থাকায় দর্শনার্থীরা কিয়ৎক্ষণের জন্য শ্রান্তি লাঘব কবতে পারে। এ মঞ্চে তিন দিক থেকেই উঠার ব্যবস্থা

রয়েছে। কূপের সোপান পথের মঞ্চগুলো ছত্রী দ্বারা শোভিত। এ ছত্রীগুলো রাজপুত স্থাপত্যের ছত্রীর ন্যায় তৈরি। পক্ষান্তরে বরোদার নওলাখী কূপে উঁচু মঞ্চের স্থলে বক্র সিঁড়িপথ রয়েছে। এ বক্রপথ কূপের প্রধান সোপানপথের সঙ্গে মিলনস্থলে সৃষ্টি করেছে একটি চতুষ্ক কক্ষের। কর্বেল পদ্ধতিতে নির্মিত এ কক্ষের উপরে স্থাপিত রয়েছে একটি ছোট গম্বুজ। গম্বুজের অভ্যন্তরীণ কর্বেল স্তরগুলোতে বিভিন্ন জ্যামিতিক নকশা, ফুল, লতা-পাতা ইত্যাদি দ্বারা শোভিত। এ অলঙ্করণরীতি গুজরাটের সমসাময়িক মুসলিম স্থাপত্য অলঙ্করণ পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। বরোদার পীর-গোরার মাজার এবং কুতুব উদ্দিনের সমাধিতে এ অলঙ্করণ পদ্ধতি বহুল ব্যবহৃত।

সুদূর বাংলাদেশেও এক পার্শ্বীয় সিঁড়ি কূপ নির্মিত হয়েছিল। এ কূপগুলো মুর্শিদাবাদ প্রকরণের অনুকরণে তৈরি। জলস্তর উপরে হওয়ায় বাংলাদেশের কূপগুলোর সিঁড়িপথ তুলনামূলকভাবে হ্রস্ব। ঢাকাস্থ কারতলব খানের মসজিদ এবং চক মসজিদের কূপ দুটি এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। কারতলব খানের মসজিদের কূপটি ভরাটকরত কিয়দংশে ব্যবসায়ীদের দোকান এবং কিয়দংশে আবাসিক গৃহ উঠেছে। শুধুমাত্র সিঁড়িব সামান্য অংশ এবং কূপের বেষ্টনী প্রাকার অতি কষ্টে নজরে পড়ে। চক মসজিদের কূপটির অবস্থাও তথৈবচ।

গুজরাটের সোপান কূপগুলো সুপেয় ও মিঠা পানিব অভাব মেটানোব পাশাপাশি কৃষিকার্যেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। এ সমস্ত সোপান কূপ হতে চক্রোপরি চামড়ার থলি কিংবা ধাতব পাত্র বিশেষ কায়দায় বেঁধে বা সেঁটে দিয়ে পানি উত্তোলনের ব্যবস্থা করা হয়। আনহিলওয়াড় পাটনের রানী-কি-ভাব, আস্রবার মাতা-ভবানীব কূপ, ববোদার নওলাখী কূপসহ বেশ কিছু কূপে কপিকলের সাহায্যে পানি উঠানোর পাশাপাশি বলদের সাহায্যে পানি উত্তোলন করে কৃষি কাজে ব্যবহার করা হত। এ উত্তোলন পদ্ধতি অনেকটা কলুদের ঘানি ব্যবস্থার অনুরূপ।

বেশ কটি সোপান কূপ গ্রীষ্মাবকাশ কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হত। এ সমস্ত কূপে প্রধান কূপ গহ্বর অথবা সিঁড়িপথের দুধারে অবকাশ যাপন কক্ষ রয়েছে। ভামারিয়া কূপে প্রধান কূপ গহ্বরকে ঘিরে এবং নওলাখি ভাবে সিঁড়িপথের উভয় পার্শ্বে অবকাশ কক্ষ বিদ্যমান। এ সমস্ত কূপে নির্মাণ প্রযুক্তিগত দিক থেকে স্থপতির ইচ্ছারই প্রতিফলন ঘটেছে, অবকাঠামোর নয়।

ঐতিহাসিক তথ্য প্রদানেও বেশ ক'টি সোপান কূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার অধিকারী। এ সমস্ত কূপে ঐতিহাসিক তথ্য সংবলিত শিলালিপি রয়েছে। রানী-কি-ভাব, নওলাখি ভাব, বাই হরির ভাব এবং আদালজের ভাবে প্রাপ্ত শিলালিপির ভাষ্য ঐতিহাসিক তথ্যসমৃদ্ধ। বরোদার নওলাখি ভাব গুজরাটের মুজাফফরশাহী বংশের প্রথম শাসক সুলতান মুজাফফর শাহের অনুদানে নির্মিত। এ কূপের দ্বিভাষিক শিলালিপিটি (৮০ সে.মি.-৬০ সে.মি.) নয়টি আনুভূমিক সারিতে উৎকীর্ণ। এ শিলালিপিতে সুলতান মুজাফফর শাহকে জায়গিরদার হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৩৯৮ খ্রিস্টাব্দে তৈমুর লং কর্তৃক দিল্লি আক্রান্ত হলে তোঘলক বংশের সুলতান মাহমুদ শাহ পলায়ন পূর্বক গুজরাটের মুজাফফর শাহের দরবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এ সময় মুজাফফর শাহের পুত্র তাতার খান বারবার পিতাকে স্বাধীনতা ঘোষণায় উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু মুজাফফর শাহ স্বীয় পুত্রের কথায় কর্ণপাত না করে দিল্লি রাজের প্রতিই আনুগত্য প্রকাশ করতে থাকেন। ৩ জানুয়ারি, ১৪০৫ খ্রিস্টাব্দে মুজাফফর শাহের অধীনস্থ বরোদার জায়গিরদার মালিক আদম নওলাখি কূপ নির্মাণ করেন এবং শিলালিপিতে এ তথ্য লিপিবদ্ধ করে যান।

হিন্দু নির্মাতাগণ সোপান কূপে বৈদিক সাহিত্যের যশ-গাথা সম্পন্ন কাহিনী স্বল্প রিলিফে প্যানেল আকারে উৎকীর্ণ করেছে। কখনো কখনো রাশিচক্র ও নবগ্রহের তথ্য সংবলিত প্যানেল নজরে পড়ে। জনসাধারণকে পৌরাণিক কাহিনী সম্পর্কে অবহিত করানোই এ সমস্ত প্যানেলের মুখ্য উদ্দেশ্য।

স্থাপত্যিক অবকাঠামো, আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, বহুমুখী কার্যক্রম সম্পাদনে সহায়তা তথা ঐতিহাসিক তথ্য নির্দেশনায় উত্তরাঞ্চলীয় কূপের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলীয় বিশেষত গুজরাটের সোপান কূপগুলো বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। প্রাক-মুসলিম ও মুসলিম আমলে নির্মিত এ কূপগুলো কূপ স্থাপত্যের অত্যুজ্জ্বল নিদর্শন এতে সন্দেহ নেই।

সুরাটের মোঘল সরাই :

সম্রাট আকবর ১৫৭৩ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট সুলতান তৃতীয় মুজাফফর শাহকে পরাজিত করে এ অঞ্চলে মোঘল কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। আর এ বিজয়ের ফলে মোঘলদের কর্তৃত্বে আসে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নদীবন্দর—ক্যাম্বে, ভারুচ এবং সুরাট। প্রথমটি সাবরমতি-মাহী ও ক্যাম্বে উপসাগরের সঙ্গমস্থলে, দ্বিতীয়টি নর্মদা নদীর ডান তীরে এবং শেষোক্তটি তাপ্তী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। এ বন্দরগুলোর মাধ্যমে তদানীন্তনকালে পশ্চিম ভারতীয় নৌ-বাণিজ্য যেমন প্রসারিত হয়েছিল তেমনি তীর্থযাত্রীদের (বিশেষত হজযাত্রী) ট্রানজিটস্থল হিসেবেও বন্দরগুলো লাভ করেছিল সমধিক প্রসিদ্ধি। ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহানের নির্দেশে সুরাটের গভর্নর হকিকত খান বিখ্যাত মোঘল সরাই নির্মাণ করেন[১৭]। এটি খোদাবান্দা খানের দুর্গ হতে অর্ধ কিলোমিটার উত্তরে এবং তাপ্তী নদীর পূর্বতীরে অবস্থিত।

আয়তাকৃতির এ ইমারতটির দৈর্ঘ্য ১১৫ মি. এবং প্রস্থ ১০৫ মি. (ভূমি নকশা নং-৪১)। প্রতিটি বাহুর মধ্যস্থলে রয়েছে একটি প্রবেশপথ।
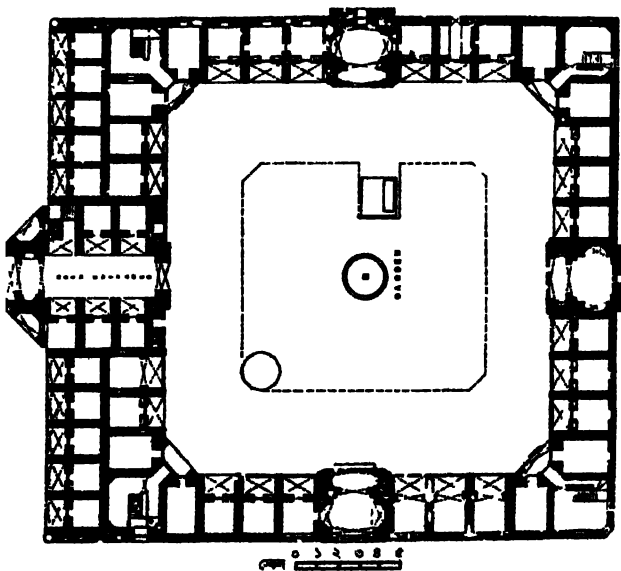
ভূমি নকশা নং-৪১ : সুরাটের মোগল সরাই

প্রধান প্রবেশপথ প্রক্ষিপ্তাকারে নির্মিত। প্রক্ষিপ্তাংশটি একটি অর্ধ গম্বুজ এবং একটি স্বল্পোন্নত গম্বুজের সাহায্যে পরিবৃত। ত্রিতল বিশিষ্ট এ অংশটির উপরতলা চৌচালা ভল্টের সাহায্যে আচ্ছাদিত। অর্ধ গম্বুজের বহির্মুখ চতুর্কেন্দ্রিক খিলান দ্বারা শোভিত। গম্বুজের পশ্চাতেই রয়েছে বহুভাঁজীয় খিলান। দিল্লির লাল কিল্লায় নাগিনা মসজিদ, দিওয়ান-ই-খাস, দিওয়ান-ই-আম এবং আগ্রা ফোর্টের দিওয়ান-ই-আমে এ জাতীয় খিলান বহুল ব্যবহৃত। এ খিলান অতিক্রম করলে একটি আয়তাকৃতির পরিসরে প্রবেশ করা যায়। এ পরিসরের উভয় পার্শ্বে অর্ধ গম্বুজ নির্মাণের ফলে পরিসরটি বর্গাকৃতিতে রূপান্তরিত হয়েছে এবং ছাউনিতে ব্যবহৃত হয়েছে স্বল্পোন্নত গম্বুজ। গম্বুজটির অভ্যন্তরীণ ভাগ সুন্দর জালের ন্যায় ঢেউ খেলানো কারুকার্যে খচিত। বাংলাদেশের লালবাগ কিল্লার প্রধান তোরণের কারুকার্যের সাথে এই কারুকার্যের হুবহু মিল রয়েছে। প্রধান তোরণের ইমারত অংশটি খিলানছাদে আবৃত। এ পথের উভয় পার্শ্বে মোট ছয়টি (৩+৩) অর্ধ গম্বুজ নির্মাণের ফলে এদের পশ্চাতে নির্মিত ছয়টি কক্ষের সুষ্ঠু সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সম্রাট হুমায়ূনের সমাধিস্থ উত্তোলিত পীঠের চতুর্দিকে লক্ষণীয়। সম্ভবত এইসব কক্ষ প্রহরীরা ব্যবহার করত। এখানে উল্লেখ্য যে, অভ্যন্তরীণ কক্ষগুলোর উত্তর-পশ্চিমের কক্ষটিতে সিঁড়ির ব্যবস্থা আছে এবং সিঁড়ির সাহায্যে উপরস্থ তলাগুলোতে আরোহণ করা যায়।

প্রধান প্রবেশপথের উভয় পার্শ্বে আটটি করে দুসারিতে মোট ষোলটি কামরা রয়েছে। প্রথম সারির কক্ষগুলো সমআয়তনের; কিন্তু দ্বিতীয় সারিব কক্ষগুলো অন্যান্য বাহুর কক্ষের ন্যায় ভিন্ন ভিন্ন আয়তনের। অভ্যন্তরীণ ছাদ নির্মাণে অর্ধ-ব্যাবেল ভল্ট পদ্ধতি অনুসৃত হলেও ব্যারেলের উপরিভাগ দ্বিতলের মেঝে রূপে ব্যবহৃত হওয়ায় সমতল। দ্বিতলের ছাদেরও নির্মাণ পদ্ধতি একই রূপ। ইমারতটির কর্নার রুমগুলোতে সিঁড়ি নির্মাণের ফলে উপর-নিচ যোগাযোগ সহজতর হয়েছে।

দ্বিতলের ছাদ উঁচু বপ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। বপ্রের পাশেই রয়েছে বন্ধনীর সাহায্যে নির্মিত প্রক্ষিপ্তাকারে ছাইচ। ছাদ ও ছাদ-পাঁচিলের সংযোগস্থলে মার্লন অলঙ্কবণে সজ্জিত। মার্লনের নিচেই রয়েছে দন্তমোতিফ্।

অভ্যন্তরীণ আঙ্গিনায় কেন্দ্রবিন্দুতে পানির ফোয়ারার ধ্বংসাবশেষ আজো দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একসময় আঙ্গিনাটি পরিকল্পিত বাগান দ্বারা শোভিত ছিল।

ইমারতটিতে একটি মর্মর পাথরের শিলালিপি ছিল যা বর্তমানে মুম্বাইর বিখ্যাত প্রিন্স ওয়ালস্ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। গদ্য-পদ্যের সমন্বয়ে রচিত এবং নাস্তালিক পদ্ধতিতে লিখিত এ শিলালিপিটি সরাইখানার ব্যবস্থাপনা বিধিনিষেধ ও নির্মাতা-নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে তথ্য বহন করছে। এতে লেখা রয়েছে—

"১. যিনি চন্দ্র-সূর্যকে আলোকিত করেন সেই (আল্লাহর) নামে, সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে।

২. সুপ্রিয় অন্তরঙ্গখান (হকিকত খান) স্বর্গতুল্য এ সরাইখানা নির্মাণ করেছেন।

৩. (স্বর্গীয়) আশীর্বাদপুষ্ট (এ) সরাইখানা ১০৫৪ হিজরিতে হকিকত খানের (তত্ত্বাবধানে) নির্মাণ (১৬৪৪ খ্রি.)।

বিজয়ী সম্রাট শাহজাহান যিনি সেই মহাপরাক্রম ও পবিত্র প্রভুর ছায়ারূপে ধরণীতে আবির্ভূত। ইসহাক বেগ ইয়াজদি যিনি হকিকত খান উপাধিতে ভূষিত (তিনি) এ সরাইখানার নির্মাতা এবং মহাপরাক্রমশালীর ওপর (এই) নির্মাণ সোপর্দ করত এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে পবিত্র প্রভুর পথে জ্ঞানী, ধার্মিক, দরবেশ এবং মক্কা-মদিনার হজযাত্রীদের

নিকট হতে কোনো অবস্থাতেই কোনো (কর) আদায় করা যাবে না এবং এতদ্ব্যতীত অন্যান্য পর্যটকদের নিকট হতে যে আদায় হবে তা কর্মচারীদের বেতন এবং এর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতায় ব্যয় করা হবে; (এবং) উদ্বৃত্ত অর্থ অবশ্যই মক্কা-মদিনা (গমনেচ্ছু) হজযাত্রীদের প্রদান করা হবে। অশ্বারোহী এবং পদাতিক বাহিনীকে কোনো অবস্থাতেই (সরাইখানায়) কক্ষ বরাদ্দ দেওয়া হবে না কারণ সরাই শব্দের অর্থ হল পরিভ্রমণকারীদের বিশ্রামাগার। (সরাইখানার) তত্ত্বাবধায়ক কর্মকর্তা অবশ্যই বর্ণিত শর্তানুযায়ী দায়িত্ব পালন করবেন, এবং (দায়িত্ব পালনের জন্য) তিনি মহান প্রভুর অসংখ্য অনুকম্পা ও দয়া লাভ করবেন; এবং আল্লাহর অভিসম্পাত ও যৎপরোনাস্তি যন্ত্রণা ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গের ওপর নিপতিত হবে যারা বর্ণিত শর্তের বরখেলাপ (কাজ) করবে এবং যিনি (শর্ত) সীমালজ্ঞন করবেন পাপ অবশ্যই সীমালজ্ঞনকারীর ওপর নিপতিত হবে।"

শিলাটির ডান প্রান্তে রয়েছে "হে আল্লাহ তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে ক্ষমা কর" এবং বাঁ প্রান্তে আছে "লেখক মুহাম্মদ আমিন মাশহাদী।"[১৮]

মুসলমান তাজেরগণ সপ্তম শতাব্দী হতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত পূর্ব ইউরোপীয় বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। কি সামুদ্রিকপথে কি স্থলপথে মুসলিম বণিকেরা ভারতীয় পণ্য ইউরোপীয় বাজারে সরবরাহ করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করত। সুতরাং মুসলিম বাণিজ্য কাফেলার সুষ্ঠু গমনাগমনের নিশ্চয়তা বিধানে সরাইখানার গুরুত্ব ছিল অপরিসীম।

এ ছাড়া ইসলাম তার অনুসারীদের জন্য তীর্থযাত্রা উৎসাহিত করেছে। পবিত্র কুরআন শরিফে মুসলমানদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে "তোমাদের মধ্যে যাঁহাদের (রাহ্ খরচের) সঙ্গতি আছে তাঁহারা যেন আল্লাহর গৃহে হজপালন করে।" এসব নানা কারণে পর্যটক, পরিব্রাজক এবং মুসাফিরগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং তাদের হিতার্থে সবকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে বহু সরাইখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এমনকি সরাইখানার রক্ষণাবেক্ষণ ও সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে নবম শতাব্দীর প্রথমদিকে 'ওয়াকফ্ এস্টেট'-এর সূচনা হয়।

মুসলিম পরিব্রাজকদের মধ্যে নাসির-ই-খসরু এবং ইবনে বতুতা সরাইখানা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পরিবেশন করেছেন। উমাইয়া খিলাফতকালে নির্মিত 'কসর আল হাইর' (৭২৭ খ্রি.) প্রাথমিক মুসলিম আমলের সরাইখানারূপে চিহ্নিত। আব্বাসীয় খলিফা আল মনসুরের সময় চাহ-ই-মিয়াহ সরাইখানা নির্মিত হয়। এ সরাইখানার ভূমি নকশার সঙ্গে 'মোঘল সরাই'-এর ভূমি নকশার যথেষ্ট মিল রয়েছে।

সুলতানি আমলে ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে সরাইখানা নির্মাণ হয়েছিল কি না তা গবেষণা সাপেক্ষ। তবে মোঘলদের শাসনামলে সম্রাট আকবর কর্তৃক ফতেপুর সিক্রিতে কারওয়ান সরাই নির্মিত হয়। সম্রাট শাহজাহান আকবরী সরাইখানা নামে লাহোরে একটি সরাইখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কারওয়ান সরাই-এর ভূমি নকশার সঙ্গে সুরাটের মোঘল সরাই-এর ভূমি নকশার যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে।

এটা অতীব আশ্চর্যের বিষয় যে ঠিক একই সময় বড় কাট্‌রা নামে সুদূর বাংলাদেশেও অনুরূপ একটি সরাইখানা নির্মিত হয়। এ সরাইখানাটি ঢাকা শহরের তদানীন্তন কালের ব্যস্ততম স্থান চকবাজারে বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরে অবস্থিত ছিল। শাহ শুজার অনুদানে জনৈক আবুল কাসেম আল হোসাইন আল তাবৃতাবা আস সিম্‌নানি কর্তৃক ১৬৪৪ খ্রিস্টাব্দে এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এই ইমারতে প্রাপ্ত দুটি

শিলালিপি ভাষ্য থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে ইমারতটি তৈরিতে দুবছর সময় লেগেছিল।

সুরাটের সরাইখানার ন্যায় এটাও চতুর্ভুজাকৃতির এবং প্রতি বাহুর দৈর্ঘ্য ছিল ৩৮ মি. (২২৩ ফুট)। ত্রিতল অবয়বের প্রধান তোরণটি চারকেন্দ্রিক খিলানের সাহায্যে উন্মুক্ত। তোরণপথটি ৮.২৫ মি. (২৭ ফুট ৩ ইঞ্চি) ব্যাসের একটি গম্বুজ দ্বারা পরিবৃত। গম্বুজের অভ্যন্তরীণ কারুকার্যের সাথে সুরাটের সরাইখানার কারুকার্যের যথেষ্ট মিল রয়েছে।

সুবেদার শায়েস্তা খান বড় কাট্‌রার প্রায় ২০০ গজ পূর্বে ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে ছোট কাট্‌রা নামে আর একটি সরাইখানা নির্মাণ করেছিলেন। এই ইমারত বড় কাট্‌রা অপেক্ষা আকারে ছোট হলেও স্থাপত্যিক ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যে প্রথমটিরই নকলরূপ।

সুতরাং সুরাটের অবহেলিত এ সরাইখানাটি দূর-প্রদেশে মোঘল নির্মাণ কৌশল রীতির সাক্ষ্য হয়ে যেমন দাঁড়িয়ে আছে তেমনি এর অবয়বে রয়েছে অনুসন্ধিৎসু গবেষকদের জন্য অফুরন্ত গবেষণা উপকরণ। বহির্ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যে সরাইখানা সামরিক, বাণিজ্যিক, ধর্মীয় এবং সুষ্ঠু যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে উদ্ভূত ও বিকশিত হয়েছিল কিন্তু সম্রাটের এ সরাইখানায় পরিভ্রমণকারীরাই প্রাধান্য পেয়েছে। এ ইমারতেব শিলালিপি পরিবেশিত সরাইখানার বিধিনিষেধ আমাদেরকে মধ্যযুগীয় আইনশৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্তিতার সাথে সমক্ষ পরিচয় করিয়ে দেয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি ব্রাউন, *ইন্ডিযান আর্কিটেকচাব* (ইসলামিক পিবিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ ৪৭।

২. This was the Jamı Masjıd ın the ancıent and prosperous seaport of Bharoach (ancıent Bharukachcha on the rıver Narmada), দেখুন : এস. গ্রোভাব, *দি আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া ইসলামিক* (৭২৭-১৭০৭), দিল্লি, ১৯৮১, পৃ. ৮৬।

৩. এ সম্পর্কে পি. ব্রাউন বলেন, " . .. ... the ceılıng are elaborately decorated wıth cusped and other geometrıcal patterns, whıch had prevıously adorned some temple roof, cf *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৪৯।

৪. জন মার্শাল, *"দি মনুমেন্টস অব মুসলিম ইন্ডিয়া"*, *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ভলিউম-৩, দিল্লি, ১৯৫৮, পৃ. ৬০৯।

৫. The Tanka Masjıd socalled from a water tank whıch ıs close to the east entrance

* কে.ভি. সুন্দরাবাজন, *আহমদাবাদ*, নিউ দিল্লি, ১৯৮০, পৃ. ১৬।

৬. জন মার্শাল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১১; পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।

৭. The sanctuary ıs a pıllared hall The pıllars are arrenged ın twelve rows from north to south. Of these sıx are contınuous rows and each rows contaıns 2o pıllars whıle the remaınıng sıx rows contaın 96 pıllars – sıxten ın each row Thus there are ın the sunctuary 252 free standıng pıllars wıth pılasters on the walls correspondıng to each row, দেখুন : এস. আহমদ, *আর্কিওলজি অব দি মুসলিম টাউনস অব গুজরাট উইথ স্পেশাল রেফারেন্স টু দেয়ার মনুমেন্টস*, অপ্রকাশিত পিএইচ.ডি. থিসিস, বরোদা, ১৯৮২, পৃ. ১৩০।

৮. Rotenda —A building or internal space, circular or oval in plan and often domed; দেখুন: জে. হারিস এন্ড জে. লিভার, *ইলাস্ট্রেড গ্লোসারি অব আর্কিটেকচার*, লন্ডন, ১৯৬৯, পৃ. ৫৭, প্লেট-১৪৫।
৯. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।
১০. *তদেব*।
১১. "......... as the Ahmedabad example contains three openings, resembling in this particular the triple archways of Septimus-Severus and of Constantine of the third and fourth centuries", দেখুন : *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫১।
১২. এস. আহমদ, "চাম্পানার জামি · এ ফুলার ডেস্ক্রিপশনস এন্ড অ্যানালাইসিস", শিল্পকলা, ভলিউম- ১, ১৯৮৬, পৃ. ৪৯।
১৩. বিস্তাবিত দেখুন : *তদেব*, পৃ. ৪৮।
১৪. নাগিনা মসজিদ, লীলা গম্বুজ মসজিদ, শাহী মসজিদ, বাবামান মসজিদ, মাকাই কোঠাব ও নওলাখি কোঠার প্রভৃতি ইমারতের বিবরণ এস.আহমদ, "চাম্পানার কতিপয় অনালোচিত ইমাবত", *ইতিহাস পবিষদ পত্রিকা*, ১৯৮৭, প্রবন্ধ থেকে গৃহীত।
১৫. এম.এফ. কোমিশারিয়েট, এ হিস্ট্রি অব গুজরাট, ভলিউম- ১, পৃ. ৫২৭।
১৬. এস. আহমদ, "গুজরাটের সোপান কূপ : একটি পর্যালোচনা", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ১৯৯১, পৃ. ৬২-৬৭।
১৭. এস. আহমদ, "গুজরাটের মোগল সরাই", *ইতিহাস পরিষদ পত্রিকা*, ১৯৯০, পৃ. ২৩-২৭।
১৮. *ইপিগ্রাফিয়া ইন্দো-মুসলেমিকা*, ১৯২৫-২৬, পৃ. ১১-১২।

একাদশতম অধ্যায়

মালোয়া স্থাপত্য : ধর ও মান্দু

(১৪০১-১৫৩১ খ্রি.)

ইন্দো-ইসলামিক স্থাপত্যে মালোযার প্রাদেশিক স্থাপত্য পদ্ধতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দিল্লিতে তোঘলক সুলতানদের রাজত্বকালে কেন্দ্রের দুর্বলতার সুযোগে যখন একে একে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করছিল সে সময়ে জৌনপুরের শারকী বংশের সুবেদার বা শাসনকর্তাদের মতোই মালোয়ার সুবেদার দেলোয়ার খান ঘুরী ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে শাহ্ উপাধি ধারণ করে নিজেকে স্বাধীন সুলতান রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। বলা বাহুল্য তিনি উক্ত রাজ্যে ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দ হতে দিল্লির তোঘলক সুলতানদের অধীনে একজন সুবেদার ছিলেন।

১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে দেলোয়ার খানের মৃত্যু হলে তদীয় পুত্র আলপ খান 'হুসাং শাহ' উপাধি ধারণ করে মালোয়ার সিংহাসনে অরোহণ করেন। স্থাপত্য অনুশীলনের পটভূমিতে সুলতান হুসাং শাহের রাজত্বকাল সর্মধিক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যে স্থাপত্য নির্মাণ ধারা সূচনা করেন তা ১৫৬৯ খ্রিস্টাব্দে এ রাজ্য সম্রাট আকবর কর্তৃক মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অব্যাহত গতিতে চলতে থাকে। এখানে দুটি নগরে স্থাপত্য অনুশীলন অব্যাহত ছিল- একটি ধর অপরটি মান্দু।

প্রকৃতপক্ষে ধর মধ্যযুগের প্রথম দিকে কয়েক শতাব্দী ধরে পারামা বংশীয় হিন্দু রাজাদের রাজধানীরূপে গড়ে উঠেছিল। এ রাজবংশ এতই পরাক্রমশালী ছিল যে তারা এক বিরাট সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল এবং বলা হত পৃথিবীটাই 'পারামারাজের'। তারা সাহিত্যনুরাগী ও জ্ঞানচর্চায় যথেষ্ট উৎসাহী ছিল। তবে তারা শিল্পকলার চর্চা বিশেষ করে স্থাপত্য ইমারত নির্মাণে তেমন কোনো উদাহরণ সৃষ্টি করতে পারে নি। এমনকি তাদের প্রজাবৃন্দ অনুরূপ জ্ঞানচর্চার অধিকারী ছিল বলে তেমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। অথচ এর পাশাপাশি রাজ্য গুজরাটে সফল শিল্পকলার উৎকর্ষতা লাভ করেছিল। অন্যপক্ষে তারা ধর্মবিশ্বাস পালন করার জন্য মন্দির নির্মাণ করেছিল এবং এ মন্দিরগুলোতে প্রচুর পরিমাণে স্থাপত্য উপকরণ সমাবেশিত ছিল যা প্রথম যুগের মুসলিম স্থাপত্য ইমারতের নির্মাণ উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।

বলা বাহুল্য যে ধর-এ স্থাপত্য অনুশীলনের ধারাবাহিকতা না থাকায় স্থপতি ও কারিগর বা স্থাপত্য কাজে পারদর্শী কোনো জনবল গড়ে ওঠে নি। মুসলমানগণ যখন সেখানে ইমারত নির্মাণে ব্রতী হয়েছিল তখন তাদেরকে বাইরের কোনো জনপদ হতে অভিজ্ঞ স্থপতি সংগ্রহের চেষ্টা করতে হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবে এটি মনে করা যায় যে তাদের পার্শ্ববর্তী আর একটি

মুসলিম রাজ্য গুজরাটে যেসব স্থপতি বা কারিগর অবস্থান করত তাদের মাধ্যমে তারা এ অভাব দূরীভূত করতে পারত। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে এ দুটি রাজ্যের সম্পর্ক মিত্রতার বদলে শত্রুতা ভাবাপন্ন ছিল বিধায় এ সুবিধা আদায় করতে তারা ব্যর্থ হয়েছিল।

আর সে জন্যই মালোয়ার ঘোরী বংশীয় শাসনকর্তাদেরকে অন্যদিকে চেষ্টা করতে হয়েছিল। তারা দিল্লি হতে প্রয়োজনীয় দক্ষ কারিগর ও জনশক্তি সংগ্রহ করেছিল। এ সময় অন্য আর একটি কারণে তাদের পক্ষে বিশেষজ্ঞ স্থপতি ও কারিগর পেতে অসুবিধা হয় নি। কেননা তৈমুর লঙের আক্রমণের ফলে দিল্লির কেন্দ্রীয় তোঘলক সুলতানদের রাজনৈতিক ক্ষমতা ও আর্থিক অবস্থা একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। সম্পদের অভাবে তারা আর কোনো স্থাপত্যকর্ম নতুনভাবে শুরু করতে পারে নি।

এসব কর্মহীন কারিগর তাদের জীবিকার অন্বেষণে মালোয়ার রাজধানী ধর-এ পাড়ি জমাতে বাধ্য হয়েছিল এবং তারাই এখানকার স্থাপত্য ইমারত গড়ে তুলেছিল। পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন[১] যে 'জনশক্তির এ স্থানান্তরের কোনো তথ্য বিবরণী নেই, তবে মালোয়ার রাজধানীতে যেসব স্থাপত্য পদ্ধতি ও প্রণালীর ব্যবহার হয়েছিল এটি কিছু পূর্বে দিল্লিতে অনুশীলিত হয়েছিল'। অন্যপক্ষে ধর-এ যে শৈল্পিক মেধার প্রয়োগ ঘটেছিল তা প্রায় দিল্লিতে চর্চিত স্থাপত্যকর্মের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ও একই আদর্শের। এটি দ্বারা বলা চলে যে দিল্লির প্রযুক্তি এখানে ঐসব বাস্তুত্যাগী কারিগরদের দ্বারাই আমদানি হয়েছিল ।

এসব কারিগর ও স্থপতি তাদের অভিজ্ঞতার আলোকে দিল্লির স্থাপত্যচর্চার বাস্তবায়ন এখানে শুরু করেছিল। এসব কৌশলপূর্ণ স্থাপত্য উপাঙ্গগুলোর প্রয়োগ এখানকার স্থাপত্য ইমারতে জীবন্ত হয়ে উঠেছিল, যেমন- অবনমিত সংবলিত শক্ত মজবুত দুর্গ প্রাকার ও দেয়াল (battering wall), তোঘলকদের প্রথম যুগের বর্শাফলক ঝালরযুক্ত সূক্ষ্মাগ্র খিলান, খিলান ও সর্দলের একত্রে ব্যবহার, লোদীদের চেপ্টা তালিযুক্ত নৌকা আকারে গম্বুজ (boat keel) এবং পিরামিড আকারের ছাদ ইত্যাদি ছাড়াও অন্যান্য স্থাপত্য প্রক্রিয়ার অনুশীলন ও স্থাপত্যপৃষ্ঠ সজ্জায়ন করার জন্য বিভিন্ন প্রকারের অলঙ্করণ ব্যবহার প্রচলিত হয়েছিল।

মোট কথা সে সময়ে মুসলিম শহরগুলোতে যেসব স্থাপত্যরীতি যা বিভিন্ন সময়ে উদ্ভব হয়েছিল তার ব্যবহার এখানে নিশ্চিত হয়েছিল। মালোয়ার বিকাশমান স্থাপত্যে যে উপাদানগুলোর সমাবেশ ঘটেছিল তা অবলোকনে নির্ভুলভাবে মন্তব্য করা যায় যে দিল্লির দক্ষ কারিগরগণই এখানকার স্থাপত্য নির্মাণকার্যে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরই ফলে মূল উপকরণসহ স্থাপত্য অলঙ্করণ মালোয়ার ইমারতগুলোতে সুস্পষ্ট আকারত্বে প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছিল।

এসব নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কারের মধ্যে আকর্ষণীয় ছিল দুটি গঠন কাঠামো সমন্বয় সাধন পদ্ধতি। খিলানের সাথে স্তম্ভ এবং কড়ি বা বর্গার একত্রীকরণ প্রক্রিয়া। এটি মন্দির হতে সংগৃহীত উপাদানে আকারত্ব প্রাপ্ত হয়েছিল। প্রথম যুগে অন্য কোথাও মসজিদ এত শৈল্পিক নিপুণতায় সমস্যার সমাধান করা হয় নি যা এখানে হয়েছে।

মালোয়া স্থাপত্য ইমারতগুলোর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দীর্ঘ ও সোজাসুজি শূন্যে ধাবন এবং ক্রমোন্নত সোপানশ্রেণী প্রবেশদ্বারে উপনীত হয়েছে। এর ফলে ইমারতের মেঝে অপেক্ষাকৃত উঁচু করে নির্মিত হয়েছে এবং এ উঁচু কাঠামোর উপর প্রধান ইমারত গড়ে উঠেছে। অবশ্য এ সুউচ্চ চত্বর সমগ্র কাঠামোকে একটা আলাদা অভিজাতময় মর্যাদা দান করেছিল। বলা বাহুল্য স্থাপত্য কাঠামোর সাথে সুষমতায় সোপানপথের অংশ গঠন মনোজ্ঞ ও কারুকার্যে বিভূষিত হয়ে সমাপ্ত করা হয়েছিল। এর মাধ্যমে একটা চমৎকার পরিচয় জ্ঞাপক পথ নির্মাণ পদ্ধতির প্রবর্তন হয়েছিল।

অন্যপক্ষে ধর ও মান্দুর নির্মিত স্থাপত্যকার্যে মনে দাগ কাটার মতো উপলব্ধির বিষয়বস্তু এর কাঠামো গঠনে নয়, বরং তা এর অলঙ্করণ ও অলঙ্কার প্রয়োগের গুণবৈশিষ্ট্যের মাঝে নিহিত রয়েছে। বলা চলে যে রঙের কারুকার্যই স্থাপত্য প্রকল্পে প্রধান ভূমিকা রেখেছিল। জলবায়ু ও আবহাওয়ার কারণে বিভিন্ন রঙের অলঙ্করণগুলো এখানকার ইমারত হতে প্রভূত পরিমাণে উঠে গিয়েছে বা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে গিয়েছে; তবুও যেটুকু এখনো সংরক্ষিত রয়েছে তা হতেই এর মৌল বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়।

এ প্রসঙ্গে আরো বলা চলে যে এখানে কর্মরত কারিগরবৃন্দ ও স্থপতিগণ কর্মসম্পাদনে অত্যন্ত পারদর্শী ছিল। তারা রং ব্যবহারের পরিমাণ ও মিশ্রণমাত্রা সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিল। তাঁদের অভিজ্ঞতার আলোকে সজাগ দৃষ্টিতে যা করে গিয়েছে তা মালোয়া স্থাপত্যের অমূল্য সম্পদ। এ রঙ কার্যক্রম দুপদ্ধতি অবলম্বনে সম্পাদিত হত। প্রথমত, রকমারি রঙের পাথর ও মার্বেল পাথর ব্যবহার দ্বারা স্থাপত্য ইমারতের অলঙ্করণ করত, দ্বিতীয়ত, দহন বা পুড়িয়ে টালিকে রঙ সংবলিত করা হত। পরে ঐ টালি দেয়ালগাত্রে বসিয়ে দিয়ে ইমারতের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করা হত।

ইমারত নির্মাণে মূল উপকরণ হিসেবে বেলে পাথর ও স্নিগ্ধ লাল আভাযুক্ত বেলে পাথর ব্যবহৃত হত। এ জাতীয় পাথর বিজবার (bijawar) খনি হতে সংগৃহীত হত। তা ছাড়াও এর আশপাশে বিভিন্ন ধরনের মার্বেল পাথর এবং বিভিন্ন রঙের ও বুননের পাথর পাওয়া যেত। নির্মাণকারীরা এসব প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহ করে প্রয়োজনমতো দক্ষ কারিগরদের দ্বারা স্থাপত্য নির্মাণে উৎকর্ষতা আনয়ন করেছিল। স্থপতিরা স্বচ্ছন্দে কালো, হলুদ, স্লেট বা অন্য কোনো রঙের মার্বেল পাথরখণ্ড মূল স্থাপত্য গাঁথুনির উপর আচ্ছাদন হিসেবে ব্যবহার করত।

অন্যপক্ষে ইমারত অভ্যন্তরে দেয়াল সজ্জায়নের জন্য মূল্যবান পাথর যথা- মার্বেল, জাসপার (jasper), আকিক (agate), কার্নেলিয়ান (cornelian) ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় রঙের বলিষ্ঠ প্রক্রিয়ায় প্রভাব বিস্তারের জন্য চকচকে প্রলেপ ব্যবহারের দৃষ্টান্তও লক্ষ করা যায়। কিনারা ও খোপ খোপ এলাকায় প্রধানত সুস্পষ্ট শক্ত সমর্থ ও উজ্জ্বল নমুনায় দেখা গেলেও মিল বিশিষ্ট নীল ও হলুদে রঙ করা টালি ইমারতের সর্বত্র শৈল্পিক বৈশিষ্ট্য ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল; ফলে স্থাপত্যে একটা সজীব, প্রাণবন্ত ও মনোমুগ্ধকর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল।

সে সময় কোনো ব্যক্তি বা কোনো ঘটনার স্মৃতি রক্ষার নিমিত্তে কিছু কিছু বিস্ময়কর ও আকর্ষণীয় স্থাপত্যকর্মের সূচনা হয়েছিল। এগুলো সৃজনী শক্তিসম্পন্ন ও মৌলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, পরিমিত গাম্ভীর্য, প্রশান্ত ও সুসংহত সৌষ্ঠবপূর্ণ মার্জিত স্থাপত্য ইমারত হিসেবেই চিহ্নিত। এসব ইমারত নির্মাণের তাৎপর্য এটিই ছিল যে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা দৃঢ়তার সাথে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং দেশ শাসনের জন্য সংবিধান প্রদানের বা আইন জারি করার স্বীকৃত ক্ষমতা বা অধিকার অর্জন করেছিল। মূলত এটি ছিল স্থাপত্য গঠনের দ্বিতীয় পর্ব বা স্তর। একে শ্রেষ্ঠ বা অত্যুত্তম আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

চূড়ান্ত বা তৃতীয় পর্বে স্থাপত্যকর্মের প্রকৃতিতে কিছুটা উগ্রতা ও কঠোরতা কমিয়ে এসেছিল এবং সে স্থলে কল্পনাপ্রবণতা, আবেগ, রুচি ও আলঙ্কারিক পদ্ধতির ইমারত নির্মাণের কাজ প্রচলিত হয়েছিল। এর প্লবমান বা প্রাণবন্ত প্রতিফলনে দেখা যায় যে জীবনটা তখন কঠোরতার পরিবর্তে সহজ ও আনন্দদায়ক বিলাসপূর্ণ প্রাচুর্যময় পরিবেশে ফিরে এসেছিল। এর বহিঃপ্রকাশ ঘটে চন্দ্রাতপ, ছত্রী, স্তম্ভায়িত দরবার গৃহ, ঝুলন্ত মিনার চূড়া এবং স্তম্ভায়িত উচ্চ চত্বর ইত্যাদি স্থাপত্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে।

মালোয়ার ঘোরী বংশের শাসকদের স্থাপত্যচর্চার চরম উৎকর্ষতা তাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা রোমান্টিকভাবে যথাস্থানে স্থাপনের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে মালোয়া স্থাপত্যের প্রথমপর্ব পঞ্চদশ শতাব্দীর সূচনাতেই শুরু হয়েছিল। সে সময় চারটি মসজিদ মন্দিরের অভিযোজিত উপকরণের সাহায্যে নির্মিত হয়েছিল। এর দুটি ধরে এবং দুটি মান্দুতে।

ধরের মসজিদ দুটি যথাক্রমে (১) কামাল মওলা মসজিদ (১৪০০ খ্রি.) এবং (২) লাট মসজিদ (১৪০৫ খ্রি.); অন্যপক্ষে মান্দুর মসজিদ দুটি যথাক্রমে (১) দেলোয়ার খানের মসজিদ (১৪০৫ খ্রি.) ও (২) মালিক মুগিস মসজিদ (১৪৫২ খ্রি.)। এ মসজিদগুলো একই সাধারণ রীতিতে নির্মিত হয়েছিল এবং একই উপায়ে উপস্থিতমতো জরুরি অবস্থায় হাতের কাছে পাওয়া উপকরণগুলো ব্যবহারের উপযোগী করা হয়েছিল মাত্র। তবে এদের কিছু স্থাপত্য কাঠামো অবস্থার সাথে মিলিয়ে মীমাংসাকর চেহারায় প্রকাশমান হয়েছে। অপরপক্ষে কিছু আবার সঠিকভাবে মন্দির কাঠামোর চেহারা পরিষ্কারভাবে গোপন করে প্রতিবিম্বিত হয়েছে।

অবশ্য এসব কাঠামোর সঠিক আকারত্ব প্রাপ্তিতে যথেষ্ট পরিমাণে নতুন উপাদান উপস্থিত করতে হয়েছিল। এর ফলে পূর্বরূপ হতে স্থানচ্যুত হয়ে এর বাহ্যিক অবয়ব ইসলামি আদর্শের সাথে সামগ্রিকভাবে অধিক সম্পর্কযুক্ত হয়ে সমশ্রেণীভুক্ত হতে পেরেছিল। এটি মনে হয় যেন সাময়িকভাবে জোড়াতালি দিয়ে গঠিত স্থাপত্যের বেমানান কাজে নির্মাতারা শিল্পজনোচিত সংবেদনশীলতা ও ভাবপ্রবণতা দিল্লি হতে প্রাপ্ত হয়েছিল। কাজেই এতে তারা তাদের স্থাপত্যে দিল্লির সাদৃশ্য উৎকর্ষতা আনয়নের চেষ্টায় সফলতা এসেছিল বলে মনে করে উৎসাহিত হয়ে আরো অগ্রসর হয়েছিল।

এসব পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান অংশ ছিল প্রকল্পের কেন্দ্রীয় অংশের থামের মধ্যবর্তী (অর্থাৎ উভয় পার্শ্ব) স্থলে সূক্ষ্মাগ্র খিলান সংস্থাপন। এরূপে অভ্যন্তরের স্তম্ভ ও থাম শ্রেণীর আকৃতিতে অধিকতর উৎকর্ষতা সাধন করা হয়েছিল। অবশ্য তাই বলে এটি মনে করার অবকাশ ছিল না যে খিলানশ্রেণীর যোগ হওয়ার ফলে কাঠামোগত কোনো মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছিল। কারণ এগুলো অত্যন্ত পলকা বা রোগা ধরনের হওয়ায় প্রকৃত আলম্বনস্বরূপ কাজ করার কোনো ক্ষমতা ছিল না।

অবশ্য এগুলো একবাচনাত্মকভাবে অত্যন্ত সূক্ষ্ম সুরুচিসম্মত আকারে গঠিত ও খিলান প্রসারের দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পেরেছিল। দক্ষতা ও নিপুণতার সাথে মনোজ্ঞপূর্ণ সর্বোৎকৃষ্ট সফলতার প্রমাণ ধরের লাট মসজিদে ও মান্দুর মালিক মুগিস মসজিদের সম্মুখস্থ সমান সমান ব্যবধানে স্থাপিত স্তম্ভ শ্রেণীতে মূর্ত হয়ে রয়েছে। এখানে খিলানের নিচের সংযুক্ত পাথর খণ্ডগুলোর সাথে স্তম্ভের পাদদেশ ও শীর্ষের মধ্যবর্তী অংশে কোঠরযুক্ত করে বা গর্তের সাথে দণ্ড লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাতে এগুলো এক স্তম্ভ হতে অপর স্তম্ভের সাথে এক হয়ে বায়বীয় চেহারায় সৌষ্ঠবময়রূপে দৃষ্টিগোচর হতে পারে।

তবে এগুলোর প্রকৃত কাঠামো বাস্তব অস্তিত্বে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থার মাঝেও মনোমুগ্ধকর আকর্ষণীয় হয়ে ইমারত কাঠামোতে দৃষ্ট হয়েছে। অবশ্য এ নতুন উপাদান সংযোজনের জন্য মূল আদর্শের মন্দির উপকরণ ঘষে তুলে ফেলার নজির পাওয়া যায়। কেননা এগুলো সম্পূর্ণভাবে দুটি আলাদা সচেতনশীল মানসিক প্রবৃত্তির অভিজ্ঞতার মাঝে জন্মলাভ করেছিল; এর একটি হিন্দু অপরটি মুসলিম।

সনাতনী ধ্যানধারণাকারী কারিগরগণ তাদের পার্থিব পরিবেশের সাথে একত্রিত হয়ে মুসলমানদের পরিকল্পনার সাথে সন্ধি করে। এবং নতুন শাসকদের বহির্দুনিয়ার কর্মে

নিজেদের নিয়োজিত করার সুযোগ গ্রহণ করে। এর ফলে পূর্বের স্থাপত্য প্রায় নতুন অবয়বে রূপান্তরিত হয়েছিল। নির্মাণ প্রণালীর ধারা প্রত্যক্ষ করলেও তা বুঝা যায়। এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে নতুন কার্যক্রমে সুবিধাজনক উপায়ে তারা স্থাপত্য কৌশল প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে পাথরকে পুনরায় খোদাইকরণ, পাথরের আকারত্বের ক্রটিবিচ্যুতি মোচনকরণ ইত্যাদি এবং তা কৌশলে সমস্যা সাধন করে বেমানান উপকরণাদি ও অংশবিশেষ পুনরায় ব্যবহারের উপযোগী করা হয়েছিল।

মালিক মুগিস মসজিদের কিছু থাম বা স্তম্ভ যে মন্দির উপকরণ এবং মন্দির অংশ খুলে এনে কাটছাঁট করে প্রয়োগ করা হয়েছিল তা সহজেই উপলব্ধি করা যায়। অবশ্য এ মসজিদই মন্দিব হতে সংগৃহীত পুরোনো উপকরণ ব্যবহারের শেষ উদাহরণ। কারণ এ সময় হতে যে মন্দির হতে উপকবণ সংগ্রহের উৎস একেবারে নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল তা প্রতীয়মান হয়েছে। তখন তারা দূরবর্তী স্থান হতে ইমারত নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছিল।

মালিক মুগিস মসজিদ :

মন্দির স্থাপত্য উপকরণে গড়ে ওঠা মসজিদগুলোর মধ্যে মালিক মুগিস মসজিদ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্থাপত্যকর্ম এবং এ জাতীয় ইমারতের প্রতিনিধিত্বমূলক দৃষ্টান্ত হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এটি একটি উচ্চ ঢিবি বা মঞ্চের উপব নির্মিত দৈর্ঘ্যে ৪৫.৭৫ মি. (১৫০ ফুট) ও প্রস্থে ৪০.২৫ মি. (১৩২ ফুট) আয়তনবিশিষ্ট। পূর্বাংশের বহির্মুখেব প্রকোষ্ঠগুলো খিলানেব সমন্বয়ে গঠিত। অন্যপক্ষে এর সম্মুখস্থ স্তম্ভশ্রেণী শোভিত বারান্দায় (portico) ক্রমোন্নত সোপান এসে সংযুক্ত হয়েছে। মসজিদের সম্মুখ ভাগের উভয় কোনায় দুটি গম্বুজ চূড়া (domical turrets) সংযোজিত রয়েছে। মসজিদের নির্মাণ প্রযুক্তি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে দিল্লিতে তখন হতে ৭৫ বছর পূর্বে তোঘলকদের ব্যবহৃত পদ্ধতির এখানে অনুসৃত হয়েছে।[২]

এ মালিক মুগিস মসজিদের সম্মুখে ৩০.৫০ মি. (১০০ ফুট) পার্শ্ববিশিষ্ট একটি খোলা প্রাঙ্গণ অবস্থিত এবং তার পরেই জুল্লাহ বা মূল এবাদতখানা। এ মসজিদের সামনের দিকে কোনো খিলান পরদা বা ফাসাদ নেই। তবে উন্মুক্ত বৈচিত্র্যময় স্তম্ভ শ্রেণীতে গঠিত। স্তম্ভ সংবলিত সম্মুখ ভাগের উপরে একই মাপের তিনটি চেপ্টা তালিযুক্ত নৌকা (boat-keel) আকার গম্বুজ অষ্টভুজাকৃতির পিপার উপরে ভর করে নির্মিত হয়েছে। পিপার চতুষ্পার্শ্ব আবার বলিষ্ঠ মার্লনসহ উন্নত বপ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এর প্রধান স্থাপত্যিক প্রতিফলন অভ্যন্তরের স্তম্ভ সহযোগে নির্মিত জুল্লাহ নির্মাণ প্রণালীর মাঝে দেখা যায়। জুল্লাহ চার খিলান পথ বিশিষ্ট এবং পশ্চিম দিকের কিবলা দেয়ালে সারিবদ্ধ সজ্জায়িত ও অলঙ্কৃত মিহরাব সন্নিবেশিত।

এ স্তম্ভায়িত মিলনায়তনের তিনটি স্থানে ফাঁকা রেখে স্তম্ভগুলো এমনভাবে বসানো হয়েছে যে কিছুটা উন্মুক্ত জায়গার ব্যবস্থা হয়েছে এবং এরূপে বিশেষ ধরনের বারান্দা ও দুখিলান পথের স্থান সংকুলান সম্ভবপর হয়েছে। এ প্রসারণ অষ্টভুজাকারের কেননা আটটি স্তম্ভ দ্বারা সীমায়িত জায়গার মধ্যেই এটি অবস্থিত। এক থাম হতে অন্য থামের মধ্যবর্তী প্রসারে সূক্ষ্মাগ্র খিলান দ্বারা পূর্ণ করা হয়েছে এবং এর উপরে গম্বুজ ছাদ নির্মিত হয়েছে। এটি ঐ তিনটি খোলা 'বে'-এর পশ্চাদভার খিলান (incidence arch) দ্বারা স্তম্ভসারির মধ্যেই পরিবেষ্টিত এবং জুল্লাহর চেহারায় মনোমুগ্ধকর চমৎকারিত্ব ও বৈচিত্র্য এনে দিয়েছে। এ

ধরনের মসজিদগুলোর স্থাপত্য উদাহরণে একই নকশা পরিকল্পনা, নির্মাণ কৌশল এবং রীতি পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে এদের পার্থক্য কেবল আয়তন ও বিস্তারের এবং কিছু নির্মাণ উপকরণের হেরফের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

মালোয়া স্থাপত্যের দ্বিতীয়পর্ব :

মালোয়ার ইসলামি স্থাপত্যের দ্বিতীয় পর্বের সূচনার সময় ও মান্দুতে রাজধানী স্থাপন সমকালীন ঘটনা। অন্যপক্ষে একে বলা চলে যে মান্দুতে সুন্দর সুন্দর মসৃণ ইমারত নির্মাণের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে গণ্য করা যায়। এ নতুন রাজধানী নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রশাসনিক কার্যালয় স্থাপনের কল্পন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই শুরু হয়েছিল; ঠিক তখনই দূর্গ প্রাচীর নির্মাণ করত : এর ভিতর দিয়ে গোলা, তীর ইত্যাদি নিক্ষেপের উপযোগী সচ্ছিদ্র প্রাচীর ও নগর সংরক্ষণ করার জন্য আত্মরক্ষামূলক শক্তিশালী দুটি প্রবেশপথ নির্মাণ করা হয়েছিল; এর একটি দিল্লি বা উত্তরা প্রবেশপথ, অপরটি তারাপুর প্রবেশপথ। এ দুটি প্রবেশপথই ১৪০৫-১৪০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য প্রথমটি বিরাট ও জাঁকালো তোরণ দরজা, খিলান পথের অনুবর্তিতায় ধারাবাহিকভাবে গঠিত হয়েছে। এর আকার ও কাঠামো ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত তোঘলকাবাদের গিয়াস উদ্দিন তোঘলকের সমাধিসৌধের বর্শাফলক ঝালরের অনুকরণে একই রীতিতে নির্মিত। তবে এখানে দৃঢ়ভিত্তিতে মজবুত প্রণালীতে প্রয়োজনীয় রূপ কৃচ্ছ্রপূর্ণভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

ঘোরী বংশের দ্বিতীয় শাসক হুসাং শাহের রাজত্বকালে (১৪০৫-১৪৩৫ খ্রি.) মূলত নতুন রাজধানীর উন্নয়ন কাজ শুরু হয়েছিল। কারণ এর কিছু নিদর্শন প্রকৃত অবস্থা মন্দির নগর পরিকল্পনা অবলোকন করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না। যখন মালোয়ার শাসকরা ধর হতে প্রায় ৩৬ কি.মি. দূরবর্তী মান্দুতে রাজধানী স্থাপনের পরিকল্পনা করছিল তখন তার পিছনে যে অনুভূতি কাজ করছিল তা রাজধানীকে নিরাপত্তা বিধানের অভিলাষ অন্যতম; কারণ ঐ যুগে রাজধানীর নিরাপত্তা বিধান প্রধান বিবেচনার বিষয়বস্তু ছিল।

এ শক্তিশালী নিরাপত্তা ব্যবস্থা যেন অবস্থানের কারণে প্রতিরক্ষার অসুবিধা কেটে উঠা যায় সে দিকেই তাদের লক্ষ ছিল। ফলত এটিই এখানে সাধিত হয়েছিল। এখানকার ভূ-প্রাকৃতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি প্রতিরক্ষা দুর্গের মতোই ছিল। নগর দুর্গের বহির্দিকে প্রসারিত তোরণের উপর স্থাপিত প্রহরা চৌকির আকারে তীক্ষ্ণ অভিক্ষিপাংশ বিন্ধ্যা পর্বতের প্রান্তসীমা আর একটি সংকীর্ণ ভূমি স্কন্ধের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা আদর্শ প্রতিরক্ষা প্রাচীর সৃষ্টি করেছিল। এ স্থানটা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে প্রায় ৬১০ মি. (২০০০ ফুট) উচ্চতায় অবস্থিত হয়ে প্রায় ৪০ বর্গ কি.মি. ব্যাপী এলাকার মাঝে দুর্গ নগরী মান্দু গড়ে উঠেছিল।

এরূপ আশ্চর্যজনক পরিস্থিতি ছাড়াও যেন পারিপার্শ্বিক সঙ্কট ও সঙ্কীর্ণ সোপান বেয়ে প্রবেশপথ কল্পনাপ্রসূতভাবে এর অনিয়মিত প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বুঝা যায়। এ সুউচ্চ মালভূমির প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি অতীব বৈচিত্র্যময় ও মনোরম। অন্যপক্ষে তরঙ্গায়িত অঞ্চলের বৃক্ষ ছায়ার আলোহীন রহস্যময় পরিবেশ ঘেরা দৃশ্যের সাথে নদীর গভীর অংশ, তার পাশে গর্তের মধ্যে পাখির বাসা, বৃহৎ হ্রদের পানির উপর সূর্য কিরণের চকচকে প্রতিফলন যেন একটা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের মাঝে বৈসাদৃশ্য এনে দিয়েছে। গভীর ও সঙ্কীর্ণ গিরিখাদের সাথে শ্যামল তৃণাবৃত জমির পর্যাম্বিত অবস্থান এবং সমগ্র প্রতিফলনে এর সৌন্দর্য অনেকটা অস্বাভাবিক ও অপ্রকৃত, যেন কোথাও হতে একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্যস্থল তুলে নিয়ে এসে এখানে স্থাপন করা হয়েছে। এ বিভ্রান্তি ঘুচানোর জন্যই বোধহয় প্রায় ৩০৫

মি. (১০০০ ফুট) নিম্নে বিস্তৃত নর্মদার সমতল ভূমি, যা নরম দুগ্ধবৎ শুভ্র জ্যোতির্ময় দূরবর্তী কৃষিক্ষেত্রের সাথেই বাতাসে প্রকম্পিত জনপথ সমগ্র পরিবেশকে মোহাবিষ্ট করার পটভূমি দান করেছে। এ প্রাকৃতিক রহস্য ঘেরা দৃশ্যপটের ভগ্নপৃষ্ঠে বৃক্ষরাজির মাথার উপর দিয়ে খিলানায়িত চন্দ্রাতপ বা অবকাঠামো, থাম সংবলিত ছত্রী, বুরুজ, কিউপোলা, রাজকীয় মিলনায়তন এবং রাজপ্রাসাদের অবস্থান প্রতিভাসিত হয়ে রয়েছে।

অন্যপক্ষে এ বিস্তৃত মালভূমির সমতল উপরাংশ অতিশয় মহিমান্বিত ও আনুষ্ঠানিক বাহ্যিকরূপ বিশিষ্ট, কিন্তু প্রাণহীন স্মৃতি রক্ষক স্থাপত্য ও স্মৃতিসৌধের অবস্থান দ্বারা অতীতের দলবদ্ধ সাক্ষীর মতো অবস্থান করছে। এ দলের মধ্যে রয়েছে মসজিদ, মহাবিদ্যালয়, বিজয়স্তম্ভ বা টাওয়ার এবং সমাধিসৌধ। এরূপ পরিবেশে এটি লক্ষণীয় নয় যে এখানে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশকে একটা নাটকীয় অকুস্থল ছিল। বাজ বাহাদুর ও রূপমতীর প্রেমনিবেদনের সে চমকপ্রদ ভালবাসার বৈচিত্র্যময় নাটকের দৃশ্য সংবলিত নিস্তব্ধ মঞ্চ যা সে যুগের কবিতার ছন্দে আর উপন্যাসের রোমাঞ্চকর পৃষ্ঠায় অমর হয়ে রয়েছে।

অসমকক্ষ গভীর প্রণয় আসক্ত, যা কাটার মতো বিঁধে এমনভাবে তীব্রতব আবেগময় প্রাচ্যের কাহিনী কালক্রমে হারিয়ে গিয়েছে, সে রূপমতি "পদ্মরানী"; আর সে মান্দু "আনন্দঘন নগরী" এখন অতীত। এর ইমারতগুলো এখন ধ্বংসস্তূপ, চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাওয়া প্রাসাদগুলো স্বপ্নময়, অলীক ও শূন্যতায় পরিপূর্ণ। তবু এর কিছু কিছু সৌন্দর্য এখনো অপেক্ষা করছে। এগুলো ক্ষয়প্রাপ্ত অথচ মনে দাগকাটার মতো আকর্ষণীয়।

মালভূমির বিভিন্ন অংশে প্রায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বিভিন্ন প্রকারের ইমারতের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করা যায়। তন্মধ্যে চল্লিশটির মতো আলাদা আলাদা গুরুত্বপূর্ণ ইমারত রয়েছে। এসব দালান-কোঠার অবস্থান দেখে মনে হয় নগর পরিকল্পনার কোনো বিস্তারিত নিয়মবিধি প্রয়োগ করা হয় নি। এবড়োখেবড়ো বিযুক্তি প্রকৃতির ইমাবতেব অবস্থান দেখে মনে করা যায় যে কোনো নিয়মমাফিক প্রকল্প গ্রহণ করা হয় নি। অবশ্য একটা খোলা প্রান্তরে সুবিন্যস্ত সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণীয় বৃহৎ স্মৃতিসৌধ দলবদ্ধভাবে নির্মিত হয়েছিল।

এখানে দুটি রাস্তা সমকোণে সারিবদ্ধ হয়ে মিলিত হয়েছে। এ দুটির মধ্যে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ৩০ গজের চেয়েও চওড়া পথ উত্তর হতে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে জামে মসজিদের প্রধান প্রবেশস্থল অতিক্রম করেছে এবং এর প্রায় বিপরীতে অন্য একটি অপরিমেয় কাঠামো আশরাফী মহল অবস্থিত। এতে একটি সুন্দর ক্রমোন্নত সোপান মুখোমুখিভাবে নির্মিত হয়েছে এবং এর কোনাতে একটি সুউচ্চ বিজয়স্তম্ভ নির্মিত হয়েছে।

এ বিজয়স্তম্ভের কেবলমাত্র বুনিয়াদ বা ভিত্তিভূমিটি এখন অক্ষত রয়েছে। মনে করা যায় যে, সাত তলাবিশিষ্ট এ বিজয়স্তম্ভটি ৪৫.৭৫ মি. (১৫০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল। অপর রাস্তাটি যা সুউচ্চ স্তম্ভকে প্রদক্ষিণ করে রয়েছে তা জামি মসজিদের উত্তর পার্শ্ব পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এখান থেকে অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ ইমারতের দিকে অগ্রসরমান হয়েছে। এ সৌধটি হুসাং শাহের সমাধি। এটি একটি গম্বুজ কাঠামো যার চতুর্দিকে আবেষ্টনী প্রাচীর নির্মিত হয়েছে এবং মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। এ বৃহৎ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য কাঠামোগুলো পরিকল্পিতভাবে একই অক্ষরেখায় অবস্থান করছে।

এ গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য ইমারতের সমাবেশের বাইরে গড়ে ওঠা কাঠামোগুলো ততটা উল্লেখযোগ্য নয়। তবে প্রধান রাস্তাটি শোভাযাত্রার জন্য ব্যবহৃত হত যা উত্তরাভিমুখে আবাসিক এলাকার সাথে সংযুক্ত। এ আবাসিক এলাকায় প্রধানত রাজপ্রাসাদ, দরবার হল

ও রাজকীয় প্রয়োজনে ব্যবহৃত ইমারতগুলো অবস্থিত। এ রাস্তা অবশেষে নগরের প্রধান প্রবেশপথ দিল্লি তোরণে গিয়ে মিলিত হয়েছে।

মান্দু জামি মসজিদ :

গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রীয় ইমারতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক স্থাপত্য হচ্ছে নগরের জামি মসজিদ। হুসাং শাহ কর্তৃক এর নির্মাণ কাজ শুরু হলেও তাঁর বংশধর সুলতান প্রথম মাহমুদ কর্তৃক ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে এর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়েছিল। এ মসজিদটি বর্গাকার। এর প্রতিপার্শ্ব ৮৭.৮০ মি. (২৮৮ ফুট)। এ মাপ হতে এর বিশাল আকারত্ব উপলব্ধি করা যায়। বিশেষভাবে পূর্বদিকের সম্মুখ ভাগে আরো ৩৫.৫০ মি. (১০০ ফুট) জায়গা জুড়ে গম্বুজ সংবলিত মিলনায়তন ও প্রশস্ত ক্রমোন্নত সোপান নির্মিত হয়েছে।

এ ছাড়া মসজিদে দুটি সহায়ক প্রবেশপথ উত্তর পার্শ্বে নির্মাণ করা হয়েছিল। এর একটি মসজিদের খতিব ও খাদেমদের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ছিল, অপরটি মহিলাদের একান্ত প্রবেশপথ হিসেবে ব্যবহৃত হত। অবশ্য দুটাই অত্যন্ত মনোজ্ঞ কাঠামো। এ মসজিদ একটি সুউচ্চ ভিতের উপর নির্মিত হওয়ার ফলে ভিতের নিম্নতলে সারিবদ্ধ খিলানায়িত প্রকোষ্ঠ সম্মুখ দিয়ে রচিত হয়েছে যা সরাইখানা হিসেবে জনসাধারণ ব্যবহার করত। মসজিদের প্রবেশপথ এখনো কিছু চমৎকারিত্ব বহন করছে, যেমন—সৌন্দর্যপূর্ণ নিখুঁত রঙ্গানো কিনারা, প্যানেলাকৃতির চকচকে টালির কাজ। বিশেষত এটি এ জন্য বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে যেভাবে তোরণপথের গম্বুজ ছন্দপূর্ণভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে ঠিক একইভাবে প্রাঙ্গণের অপর পার্শ্বের তিনটি গম্বুজ সুসম্পন্ন করা হয়েছে। এর ফলে সামগ্রিক গঠন কাঠামোর মূল গুণগত বৈশিষ্ট্যের মাঝে সমতা ও প্রকাশভঙ্গিতে একই অর্থপূর্ণ মান ও গুণগত চিহ্নের সূচনা করেছে।

প্রাঙ্গণটি ৪৯.৪০ মি. (১৬২ ফুট) বর্গাকার ও চতুষ্পার্শ্বই সারিবদ্ধ খিলানশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত এবং প্রতি পার্শ্বে ১১টি করে দরজা সম্মুখ.দেয়াল রচিত। এর অভ্যন্তরে থাম সংবলিত মিলনায়তন। এ থাম সংবলিত মিলনায়তনের উত্তর ও দক্ষিণ দিক তিন খিলানপথবিশিষ্ট, কিন্তু পূর্ব দিকটা দু খিলানপথের সমন্বয়ে গঠিত। অন্যপক্ষে পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত জুল্লাহ যা পাঁচ খিলানপথবিশিষ্ট। এ জুল্লাহর উপরের বাইর দিয়ে তিনটি গগনসদৃশ গম্বুজ সংস্থাপিত। এ ছাড়া সম্পূর্ণ ছাদ ক্ষুদ্রাকৃতির অর্ধ-বৃত্তাকার গম্বুজে পরিবৃত। এ গম্বুজসমূহ অভ্যন্তরীণ 'বে' বর্গাকারের উপর স্থাপিত। এর মোট সংখ্যা ১৫৮টি।

এ মসজিদের জুল্লাহর মধ্য দিয়ে কেউ অতিক্রম করলে দেখবে সারিবদ্ধ খিলানশ্রেণীর পুনরাবৃত্তি একটার মধ্যে আর একটি এভাবে নানাপ্রকার বহুধা পদমর্যাদায় সজ্জিত। এভাবে এর অভ্যন্তরভাগ কেবল জাঁকজমকপূর্ণ আড়ম্বর মর্যাদাই সৃষ্টি হয় নি বরং ভাবগম্ভীর পবিত্র পরিবেশ সৃষ্টির অভীষ্ট লক্ষ্যও অর্জিত হয়েছে। এ খিলানপথগুলো সূক্ষ্মাগ্র খিলান আকারের মাঝামাঝি ধরনের নিরলঙ্কার কারুকার্যহীন নকশায় গঠিত, তবে মাঝে মধ্যে সামান্য অলঙ্করণ দৃষ্টিগোচর হয়।

অন্যপক্ষে কিবলা দেয়ালে নিয়মিত ব্যবধানের ফাঁকে ফাঁকে নির্মিত মিহরাবগুলো খোদাইকার্য দ্বারা সজ্জায়ন করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় 'বে'-এর শেষ প্রান্তের মিহরাব ও মিম্বার চমৎকারভাবে অলঙ্কৃত। মসজিদের মূল কাঠামোর সুবিন্যস্ত সম্প্রসারণ ও কিছু সংযমিত রঙের সজ্জায়ন ছাড়াও স্থাপত্যিক সারল্য ও প্রশস্ত গাঠনিক উপাঙ্গগুলোর নির্মাণ প্রণালীও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। সমতলপৃষ্ঠ জটিলভাবে তুলনামূলক একটি হতে অন্যটির

সজ্জায়ন চমকপ্রদভাবে নিষ্পন্ন হয়েছে। এটি আবার বক্র রেখায় ও মসৃণ চওড়া কাজ দ্বারা স্বাভাবিক সৌন্দর্যে ভরপুর করে সমৃদ্ধিশালী করা হয়েছে।

প্রাদেশিক স্থাপত্য পদ্ধতির অনুসরণে মান্দুর এ মসজিদে কিছু বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে যা আহমদাবাদ জামি মসজিদেও দেখা যায়।[৪] তবে এ দু মসজিদের স্থাপত্যিক উপাঙ্গ গঠন প্রক্রিয়া দেখে কেউ খুব একটা ভিন্নতা খুঁজে বের করতে পারবে না, যদিও এ দুটি প্রায় ৩২২ কি.মি. ব্যবধানে একই সময়ে নির্মিত হয়েছে। অথচ এ দুটি মসজিদ স্থাপত্যেব সাধারণ নকশা অনুসারেই নির্মিত হয়েছিল। তা ছাড়া মসজিদ নির্মাণে ব্যবহৃত প্রযুক্তিতেও কোনো মাত্রার ভিন্নতা লক্ষ করা যায় না। এগুলোর পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশদ বিশ্লেষণেও অনুরূপ বৈসাদৃশ্যমূলক কোনো বাস্তব ফলাফল দৃষ্ট হয় না। এগুলোর আধ্যাত্মিক আবেদন ও উদ্দেশ্য ধর্ম শিক্ষার উন্নতি সাধন যা বাহ্যিক অবয়বের চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তবে এগুলো স্থাপত্যিক অনুপাত বা পরস্পর পক্ষ-বিপক্ষ গুণাগুণ দোষ-ত্রুটির পর্যালোচনা করা যেতে পাবে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে গুজরাটের মসজিদ মান্দুর মসজিদ হতে বৃহৎ, যার ফলে গুজরাট মসজিদে এর উপাঙ্গ তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি ও বৈচিত্র্যময় এবং এতে সুনির্দিষ্ট স্বাচ্ছন্দ্যবোধ প্রবহমান ছিল। এটি নিঃসন্দেহে অমিতব্যয়ী কাজ হিসেবে গণ্য করা চলে। তবে এটি একইসঙ্গে পরিষ্কাররূপে উচ্চারণ কবা যায় যে এতে স্থাপত্যিক চমৎকারিত্ব ও ঐশ্বর্যময় বৈশিষ্ট্য আনয়ন করেও নির্মাতা কোনো প্রকার অপ্রয়োজনীয় সাবলীল গতির সশ্রদ্ধ নিয়ন্ত্রণ বাদ রাখে নি।

পক্ষান্তরে মান্দুর মসজিদ কোনো প্রগলভতাব অনুভূতি ব্যক্ত করে নি।[৫] এটি যেন নিঃশব্দ পবিত্রতার সমাবেশ এবং নাম জারিব ঘটনা কেবলমাত্র অনুষ্ঠানাদি পালন সময়েব স্পষ্ট উচ্চাবণ। এটি ছন্দময় কিন্তু গতিহীন বিচলন; প্রচ্ছন্ন গভীরতায় এর আত্মপ্রকাশ, যা হৃদয়কে স্পর্শ করে। তা ছাড়া মান্দুর জামি মসজিদের বর্ণনায় বলা চলে যে এর ভিতরে প্রবেশের জন্য একটা আকর্ষণীয় ক্রমোন্নত সোপানের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং অনুরূপ সারি দিয়ে অন্য একটি বিশাল যৌগিক স্থাপত্য কাঠামো নির্মাণ কবা হযেছে যা আশরাফী মহল নামে পবিচিত। এটি সুলতান প্রথম মাহমুদের রাজত্বকালেব (১৩৪৬-১৪৬৯ খ্রি.) প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল।

সমস্ত প্রকল্পটাই এখন খণ্ড খণ্ড ধ্বংসাবশেষ। বাহ্যিকভাবে এটি দেখে মনে হয় খুবই দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় মনোযোগ ছাড়াই নির্মিত হয়েছিল। এর দেয়ালগুলো অমসৃণ আকারহীনভাবে প্রস্তুত করা পাথর কুচি দ্বারা গেঁথে তোলা হয়েছিল। এর স্থাপত্য গঠন ও গাঁথুনি মজবুতভাবে সম্পন্ন করা হয় নি। তবে বিভিন্ন প্রকার রঙের ছোপ দেওয়া কাজ দ্বারা দেয়াল পৃষ্ঠদেশ রঙের প্রাচুর্যময় প্রণালীর সঠিক প্রয়োগ সমৃদ্ধ করে নিষ্পন্ন করা হয়েছিল।

বলা বাহুল্য এর পদ্ধতি দর্শনে মনে হয় তখন স্থাপত্যকলার ধারাবাহিকতার পরিবর্তন সবেমাত্র শুরু হয়েছিল। এ স্থাপত্য অনুশীলন ক্রান্তিলগ্নের পুরোনো ধারাবাহিকতার ছেদ পড়ার বিশেষ একটা কারণ অবশ্য খুঁজে পাওয়া যায় তা হচ্ছে শাসকবংশের পরিবর্তন। এ স্মৃতিসৌধের কল্পন প্রথম খলজী সুলতানদের হাতে হয়েছিল এবং মালোয়ার ঘোরী বংশের সুলতানগণ পরে এটি সুসম্পন্ন করেন।

আশরাফি মহল :

আশরাফি মহলের নির্মাণ কাজ যখন সমাপ্ত হয়েছিল তখন এটি ৯৭.৫৫ মি. (৩২০ ফুট) বর্গাকারের একটি সুরম্য অট্টালিকায় পরিণত হয়েছিল। মূলত এটি একটি যৌগিক স্থাপত্য

কাঠামো এবং স্পষ্টত আলাদা তিনটি কাঠামোর সমন্বয়ে গড়ে উঠেছে। এটি ক্রমসরু ও আকস্মিক আকারে সংগঠিত যা সম্পন্ন হতে বহু বছর সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল।

প্রথম যখন এটি নির্মিত হয়েছিল তখন এক তলায় কলেজের প্রয়োজন মেটানোর মতো করে নির্মিত হয়েছিল। তখন একটা আয়তাকার প্রাঙ্গণের চতুর্দিকে মিলনায়তন ও প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয়েছিল এবং তার সাথে প্রতি কোনায় গোলাকার সুউচ্চ কাঠামো বা টাওয়ার সংযুক্ত হয়েছিল।

তলছাদের কিছু অংশ পিরামিডের মতো ঢেউতোলা আকর্ষণীয় নকশায় সজ্জিত। কলেজ হিসেবে বহু বছব যাবৎ এটি ব্যবহারের পরে একসময় সুলতান একে তাঁর বাজকার্যের প্রয়োজনে ব্যবহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহাবিদ্যালয় হিসেবে এর কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত তখন একে প্রশাসনিক আদিম ভবন হিসেবে গড়ে তুলতে পূর্ব ইমারতের কিছু রদবদল করতে হয়েছিল। এ যৌগিক অট্টালিকার এক অংশের উপর রাজকীয় স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করা হয়েছিল। সম্ভবত ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে এ স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং সে অনুসারে কলেজ প্রাঙ্গণ ভরাট করে একটি বর্গাকার সমাধিসৌধ নির্মাণ শুরু হয়।

এর প্রবেশপথ বিশাল ক্রমোন্নত সোপান মাদ্রাসা বা কলেজের সম্মুখ হতে অভিক্ষিপ্ত হয়েছে । সমগ্র পরিকল্পনটাই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ আকারে সম্পাদিত। এ স্মৃতিসৌধের সামান্য অংশই এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু এটি নিঃসন্দেহে চমৎকার একটি সুন্দর চেহারার মিলনায়তন ছিল তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। এর অভ্যন্তরভাগের প্রতিপার্শ্ব ১৯.৮৫ মি. (৬৫ ফুট) এবং যার উপরেই একটি বিশাল গম্বুজ নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে এব ভাঙাচোরা ধ্বংসাবশেষ দেখেও অনুমান করা যায় যে, এটি অতীব ব্যয়বহুল ও সৌষ্ঠবপূর্ণ অলঙ্করণে বিভূষিত করা হয়েছিল; কেননা এর প্রতিটি দেয়াল মুখ শ্বেতমর্মরে মোড়ানো। এ ছাড়া দরজা পথ, জানালা ও কারনিস অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ খোদাইকার্যে আচ্ছাদিত।

তবে কিছু কিছু ইমারত অংশে পছন্দনীয় নমুনায় মূল্যবান পাথরখচিত করে সজ্জায়ন সমাপ্ত করা হয়েছিল। স্তম্ভাদির শীর্ষ ও কারনিসের মধ্যবর্তী অংশ নীল ও হলুদ চকচকে কারুকার্যে ভরপুর। পি. ব্রাউন এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন যে, 'যদি এ ইমারতের গাঁথুনি বা নির্মাণ প্রক্রিয়া অলঙ্করণের মতো সমৃদ্ধিশালী হত তাহলে খলজীদের এ সমাধিসৌধ মুসলিম স্থাপত্যের একটা ঐশ্বর্যশালী অনিন্দ্যসুন্দর কীর্তিরূপে চিহ্নিত হয়ে থাকত'।[৬]

মালোয়া স্থাপত্যের তৃতীয়পর্ব :

মালোয়া স্থাপত্যের তৃতীয় বা সর্বশেষ পর্ব সম্ভবত আশরাফি মহলের স্থাপত্য কাঠামোর সাথে নতুন সংযোজন ও নির্মাণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়েছিল। এটিই মান্দুর সবচেয়ে উৎকৃষ্টতম ইমারত। এটি প্রদর্শনীর ন্যায় সুন্দর ও সুবিন্যস্ত করে নির্মাণ করা হয়েছিল। এটি অবলোকনে মনে হয় ১৪৪৩ খ্রিস্টাব্দের পর এ প্রকল্পের সাথে কিছু যোগ করা হয়েছিল। এ যোগ করা অংশটাই একটি বিজয়স্তম্ভ। কলেজ ভবনের উত্তর-পূর্ব কোনায় যে চূড়াটি ছিল এটি খলজী শাসক মাহমুদ সে বছর চিতোরের রানাকে পরাজিত করে অর্জিত বিজয়কে স্মরণ রাখার জন্য এটি আরো উঁচু করে বিজয়স্তম্ভে পরিণত করেন।

অবশ্য এটি অত্যন্ত কৌতুকপূর্ণ ঘটনা যে চিতোরের রানা মাত্র কয়েক বছর পূর্বে মাহমুদকে পরাজিত করে অনুরূপ একটি বিজয়স্তম্ভ বা "জয়স্তম্ভ" নির্মাণ করেছিল।

প্রকৃতপক্ষে মাহমুদের মনে পরাজয়ের গ্লানিকে একটি বিজয়স্তম্ভ সুযোগ মতো নির্মাণ করে পূর্বের অপমানকর পরিস্থিতির প্রতিশোধ গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এখন এর কেবলমাত্র ভিত্তি ভূমি বা বেদিটুকু অবশিষ্ট রয়েছে। এটি হতেই এর অবস্থান বুঝতে অসুবিধা হয় না।

অন্যপক্ষে চিতোরের বিজয়স্তম্ভটি সুদীর্ঘ পাঁচ শ বছর পরেও পূর্বের মতোই সুন্দর ও অক্ষত রয়েছে। এটি হতে প্রতীয়মান হয় রানার বিজয়স্তম্ভটি বিশেষ যত্নসহকারে মজবুতভাবে নির্মিত হয়েছিল। তবে মালোয়ার বিজয়স্তম্ভ সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য বিবরণী হতে অবগত হওয়া যায় যে, মাহমুদের বিজয়স্তম্ভটিও অত্যন্ত প্রাচুর্যময় ও ঐশ্বর্যশালী করে যে কোনো বিজয়স্তম্ভ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ও চমৎকার করে নির্মাণ করা হয়েছিল।

লাল বেলেপাথরে নির্মিত সাত তলাবিশিষ্ট এ ইমারতটি ৪৫.৭৫ মি. (১৫০ ফুট) উচ্চতাসম্পন্ন। শ্বেতমর্মরের দড়ি নকশা সংযুক্ত করে তলাগুলোর বিভাজন ও অবস্থান নির্ণীত হয়েছিল এবং প্রতি পর্যায় ব্যালকনি বা ঝুলন্ত বারান্দা নির্মাণের ফলে এর চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিজয়স্তম্ভের চারটি উন্মুক্ত খোলা দরজা ছাঁইচে গমনের জন্য সংযুক্ত হয়েছে যা আলঙ্কারিক স্তম্ভের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সজ্জায়ন ও অলঙ্করণ স্তম্ভ বক্রের চারধারের পৃষ্ঠের ফাঁকে ফাঁকে পর্যায়ক্রমে আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে। তবে এর গাঁথুনি দেখে মনে করা যায় যে, এ স্মৃতিস্তম্ভটির গাঁথুনি অন্যান্য ইমারতের গাঁথুনির তুলনায় মোটেও মজবুত ছিল না। এরূপ নিম্নমানের নির্মাণ প্রক্রিয়ার কারণে এ স্মরণীয় ঐশ্বর্যময় স্থাপত্যকর্ম পুনরুদ্ধারের অসাধ্যতায় চিরদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছে।

হুসাং শাহের সমাধি :

মান্দুতে নির্মিত আর সব ইমারতের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হুসাং শাহের সমাধিসৌধ (চিত্র নং-৬২)। এটি তাঁর দ্বারা পরিকল্পিত হলেও তিনি কিছু অংশ নির্মাণ করে যেতে পেরেছিলেন। তবে তাঁর বংশধর মাহমুদ এটি ১৪৪০ খ্রিস্টাব্দে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন। এ সমাধি বর্গাকার আকৃতির প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণের ঠিক মাঝখানে দণ্ডায়মান এবং জামে মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের সাথে সংশ্লিষ্ট। ঘোরী শাসক মৃত্যু শবাধারে তারই নির্মিত বৃহৎ-ত্রয়ী গম্বুজ সংবলিত মসজিদের নিচে শায়িত রয়েছেন। একটি গম্বুজ সংবলিত স্তম্ভসহ বহির্বারান্দা বা পর্টিকো আবেষ্টনী প্রাচীরের উত্তর পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে এটি প্রধান সড়ক হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রবেশপথ রচনা করেছে যা পূবেই বর্ণিত হয়েছে।

অন্যপক্ষে থাম সংবলিত ছাউনি বারান্দা কাঠামোর পশ্চিম পার্শ্বে জমায়েত ও এবাদতের জন্য নির্মিত হয়েছে। ইমারতটি একটি বর্গাকার কাঠামো যা প্রশস্ত বেদির উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে। বিশালাকৃতি কেন্দ্রীয় গম্বুজ দ্বারা এটি পরিবৃত এবং এর প্রতি কোনায় কিউপোলা বা ক্ষুদ্র গম্বুজ শোভা পাচ্ছে। এর বেদির দৈর্ঘ্য ৩০.৫০ মি. (১০০ ফুট) এবং প্রস্থ ২৫.৯৫ মি. (৮৫ ফুট), অবশ্য ৯.১৫ মি. (৩০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। এর দেয়াল শ্বেতমর্মরে মোড়ানো ও মাঝে মধ্যে রঙের কারুকার্য বিভূষিত করা হয়েছে। এ সমাধিসৌধের দিকে তাকালে মনে হয় এটি অবিচলিত ও স্তূপাকৃত মলিন ও বিষণ্নতায় সমাচ্ছন্ন।

এর দু পার্শ্বে ত্রয়ী উন্মুক্ত পথ এবং দক্ষিণের দিকে দরজা পথ প্রশস্ত হয়েছে ও অবশিষ্ট দু দেয়ালে পৃষ্ঠ সাজসজ্জাহীন ও অবাধ অবস্থায় রয়েছে। এ স্থাপত্য কাঠামো বৈচিত্র্যহীন, কঠোর আত্মসংযমী ও গভীর ধ্যানাভিমুখী অভিপ্রায়ণ মূরুতি। গুজরাট স্থাপত্যের

সমাধিসৌধের সাথে তুলনা করলে এর প্রকৃত অবস্থা অনুধাবন করা যায়। আহমদাবাদে স্তম্ভসারি এবং খিলানায়িত ফাসাদে উজ্জ্বল আলো ও ছায়ার প্রতিফলনসহ মনোজ্ঞ কাঠামোর সবই মনোহর। অবশ্য মালোয়ার মাকবারা শ্বেতমর্মরের নির্মিত, যা এ ধরনের উপকরণের কাজ চালু হওয়ার প্রথম দিকেই নির্মিত একটি মাকবারা।

এ ধরনের মাকবারা মান্দুতে আরো নির্মিত হয়েছে তবে সেগুলো অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র আকারের এবং তা পরবর্তী সময়ের। এগুলোর মধ্যে দরিয়া খানের মাকবারা অন্যতম। কিন্তু এখন এগুলো দাইকা মহল ও চাপ্পান মহল নামে পরিচিত। এগুলো অবশ্য উচ্চ পিপাতে গম্বুজযুক্ত হয়ে স্বাতন্ত্র্য আকার ধারণ করেছে। এগুলো দেখতে মনে হয় অনেক উচ্চতায় ওজন নিয়ে ঝুলছে। হুসাং শাহের সমাধিসৌধ নিঃসন্দেহে এ ধরনের মাকবারার প্রাথমিক পর্যায়ের আদর্শ বা মডেল যা পরবর্তীকালে অন্যান্য মাকবারা এরই সংস্কারপ্রাপ্ত রূপ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল।[৭]

হিন্দোলা মহল ও জাহাজ মহল :

মান্দুতে আদি পর্যায়ের পদ্ধতিতে নির্মিত দুটি স্থাপত্য ইমারত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবশ্য এগুলো পূর্ববর্তী বর্ণিত কেন্দ্রীয় ইমারতগুলোর অবস্থান হতে দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত। এসব স্থাপত্যকর্ম প্রাসাদ জাতীয় এবং এগুলোর অবস্থান মালভূমির লোকালয়ে বসতিপূর্ণ এলাকায়। এদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে হিন্দোলা মহল। এটি মালোয়া স্থাপত্যের স্পষ্টভাবে অটল ও কঠোর প্রতিরূপ চেহারা প্রতিবিম্বিত করছে। অপর আর একটি স্থাপত্যকর্ম হচ্ছে জাহাজ মহল।[৮] এটি যেরূপ প্রাণবন্ত সেরূপ জীবনী শক্তিসম্পন্ন আকারের ধারণা প্রদান করে।

সুতরাং এ দু বৈসাদৃশ্যময় স্থাপত্যকর্ম চরম বিপরীত সত্ত্বার স্থাপত্য আন্দোলনের প্রতিনিধিত্ব করছে। হিন্দোলা মহল প্রকৃতপক্ষে হুসাং শাহের স্থাপত্য আদর্শ প্রকাশ করছে। এ প্রকল্পটি ১৪২৪ খ্রিস্টাব্দের পরে নির্মিত হয়েছিল। এটি স্পষ্টত জমায়েত ঘর বা দরবার হল হিসেবে ব্যবহৃত হত। ভারতে এরূপ মনে দাগ কাটার মতো চেহারায় মতো সুঠাম কাঠামো সংবলিত ইমারত খুব কমই নির্মিত হয়েছে। অত্যন্ত সুঠামোভাবে নির্মিত হওয়ার পরেও এতে খেয়ালীপনা মিশে অসার ও উদ্ভট ধারণা প্রদান করে। অন্যপক্ষে আবার এর পরিকল্পনা কিছুটা যুক্তিহীন। বিশেষভাবে এর মোটা ও পুরু ঢালু দেয়াল সংরক্ষিত প্রাসাদ বা দুর্গের মতো দেখতে মনে হয়। এর সমগ্র বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেয়াল চিত্রণের দুর্গ ছবিরূপ মনে হলেও এর দৃশ্যমান কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। অন্যপক্ষে কামান দাগিয়ে দেয়াল ভাঙার হাত হতে রক্ষা করার মতো শক্তিশালী আলম্বন নির্মাণের জন্য ৭৭ ডিগ্রি কোণের উৎপাদন করা হয়েছে এবং এতে মনে করা যায় যে একটি বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ঐরূপ করা হয়েছে। এ ইমারতটিকে একটি নিয়ন্ত্রণ শক্তি বিশিষ্ট অট্টালিকা রূপে প্রতিভাসিত করানোর চেষ্টা করা হয়েছে। তাই বোধহয় এর নামকরণ করা হয়েছে হিন্দোলা মহল অর্থাৎ "আন্দোলিত প্রাসাদ"।

এর ভূমি নকশার আকার কতকটা ইংরেজি "টি" (T) অক্ষরের মতো এর লম্বমান অংশটাই প্রধান মিলনায়তন যা প্রথমে নির্মিত হয়েছিল এবং মাথার দিকে আড়াআড়িভাবে স্থাপিত "টি" অক্ষরের মাথারূপ অংশ পরবর্তী সময়ে নির্মিত হয়েছিল। এটি প্রস্থ অপেক্ষা অধিকতর দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট ইমারত। এর প্রধান মিলনায়তনের দৈর্ঘ্য ৩৩.৬০ মি. (১১০ ফুট), প্রস্থ ১৮.৩০ মি. (৬০ ফুট) এবং কারনিস পর্যন্ত উচ্চতা ১০.৭০ মি. (৩৫ ফুট)। এর দৈর্ঘ্য

পার্শ্বের কিছুটা ভিতর দিকে ঢুকানো উচ্চ ছয়টি অবিরত খিলান যার নিচ দিয়ে একটা দরজা পথ ও উপর দিয়ে জানালা এবং প্রস্থপার্শ্বে অনুরূপ তিনটি খিলান এবং এ তিনটির মাঝেরটা দিয়ে প্রধান প্রবেশ পথ রচিত হয়েছে। এর অভ্যন্তরটাই একটা বিশাল প্রকোষ্ঠ যা বাধাহীনভাবে ২৬.৮৫ মি. (৮৮.৫ ফুট) লম্বা ও ৭.৩৫ মি. (২৪.৫ ফুট) প্রশস্ত এবং ৯.৭৫ মি. (৩২ ফুট) উচ্চতা বিশিষ্ট। এর প্রস্থ পার্শ্ব দিয়েই পাঁচটি বলিষ্ঠ কেতাদুরস্ত রেওয়াজ মাফিক সারিবদ্ধ সূক্ষ্মাগ্র খিলান প্রসারিত হয়েছে যা পাঞ্জরাস্থির মতো সমতল ছাদকে ধারণ করে রয়েছে। অতএব আড়াআড়িভাবে স্থাপিত খিলানগুলো ভ্রমাত্মক তত্ত্বীয় মতের জন্য দায়ী। কেননা এগুলো প্রকৃত ঢেউ সদৃশ ছাদের অস্থি পাঞ্জার, অথচ বাস্তবিক পক্ষে সমগ্র ছাদটি কাঠের কড়ির উপর ভর করে রয়েছে। এর প্রমাণস্বরূপ বলা যায় যে এখনো এদের ধারণ করে রাখার কোটর বা ফুটা (sockets) দৃশ্যমান যদিও কাঠের কড়িগুলো প্রাকৃতিক নিয়মে অনেক আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

এ মহলের অন্য অংশ যা "টি" অক্ষরের মাথা; এর ঐ একই নকশারই প্রতিচ্ছবি। তবে তফাৎ এই যে এটি উঁচু দুতলাবিশিষ্ট ও অপেক্ষাকৃত কম আনুষ্ঠানিক পদ্ধতির ব্যবহারে নির্মিত হয়েছে। এখানে নির্মিত দরজা পথ বা অন্য উন্মুক্ত অংশ মামুলি সাধারণ ধরনের আকারপ্রাপ্ত হয়েছে। তবে অপেক্ষাকৃত ঝুলন্ত বাতায়নবিশিষ্ট (oriel windows) শিল্পজনোচিত নকশায় বিভূষিত হয়েছিল। অভ্যন্তরের আড়াআড়ি অংশ বিশেষ করে নিম্নতলার কিছু অংশ অপেক্ষাকৃত জটিলতাপূর্ণ স্থাপত্যকর্মের নিদর্শন বিদ্যমান। কেননা এতে ক্রুশাকারের লম্বা বারান্দা বা গ্যালারি সংযুক্ত হয়েছে।

এর খর্ব বাহুর শেষ প্রান্ত হতে একটা খিলানাকৃত উন্মুক্ত পথ প্রধান মিলনায়তনে এসে মিলিত হয়েছে। এ ছাড়াও অন্য আরো সহায়ক অতিরিক্ত পথ রয়েছে তবে তা পরস্পর আড়াআড়ি লম্বা বারান্দার সাথে সংযুক্ত হয় নি, অন্য আলাদা দরজা পথ দ্বারা সংযোগ সাধিত হয়েছে।

উপরের তলা হতে প্রধান মিলনায়তনে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা যায় এবং আসার জন্য অনুরূপ খিলানায়িত খোলা স্থানও রয়েছে। এটি অত্যন্ত সাদাসিধাভাবে প্রকল্পায়ন করা হয়েছে। এটি দুটি মিলনায়তনের সমন্বয়ে গঠিত। এর একটি দৈর্ঘ্য বরাবর বা দ্রাঘিমা বরাবর অপরটি আড়াআড়িভাবে নির্মিত। প্রথমটি আয়তাকার মিলনায়তন এবং ২১.৭০ মি. (৭০ ফুট) × ১২.২০ মি. (৪০ ফুট) আয়তনবিশিষ্ট। এটি তিন খিলানপথে বিভক্ত হয়ে দুসারি থাম ধারণ করে রয়েছে। অন্যপক্ষে পরবর্তী ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠটি বিশ্রাম কক্ষরূপে চিহ্নিত করা যায়। সমগ্র হিন্দোলা মহল সম্মিলিতভাবে প্রজাদের আবেদন-নিবেদন শ্রবণার্থে দর্শন দানের মিলনায়তন ও রাজপরিবারের আবাসিক গৃহ হিসেবে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা যায়। পক্ষান্তরে এর নির্মাণ বৈশিষ্ট্য স্পষ্টভাবে হেঁয়ালিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর।

এ ইমারতের বেমানান আকারত্ব, আয়তন ও দেয়ালের শক্ত সমর্থ মজবুত গঠন প্রণালী হতে ধারণা করা যায় যে এটি একটি শক্তিশালী উপকাঠামো হিসেবে পরিকল্পিত হয়েছিল। তবে সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটি পরবর্তীকালে আর বাস্তবায়িত হতে পারে নি। এর একটি ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে যে উৎপত্তি আরম্ভে ইচ্ছা ছিল প্রধান মিলনায়তনের উপরে অপর একটি তলা নির্মাণ করে জানানা মহল প্রতিষ্ঠা করা। অবশ্য এ ধারণাটি মেনে নেওয়ার সঙ্গত কারণ হচ্ছে যে প্রধান ও আড়াআড়ি মিলনায়তন প্রায় একই মাপ ও নকশা পরিকল্পনায় রচিত হয়েছিল। যদি এ পরিকল্পনাটি বাস্তবিকই পরিপক্কতা লাভ করত তা হলে একটা শক্ত সমর্থ উপকাঠামোর প্রয়োজন হত। বাস্তবে কষ্ট সহকারে কায়ক্লেশে হস্তীতুল্য অতিবৃহৎ

অংশটুকু এখনো বিদ্যমান। যে কোনোভাবে যদি ঐরূপ প্রকল্পের ধারণা করা যেত তা হলে মনে হয় এটি নির্মাণ প্রাক্কালের পরিত্যক্ত হত এবং বর্তমান আড়াআড়ি বন্দোবস্ত প্রতিস্থাপিত করতে হত এবং এর স্বাভাবিক বিচ্ছিন্নতামূলক প্রতিফলন নকশার পরিবর্তন অন্তর্ভুক্ত হত।

যদিও এর কাঠামো অংশ গঠনে তেমন মর্যাদার অনুপস্থিতি দৃষ্ট হয় না, যেমন- ভিতর ও বাইরের খিলানপথগুলো, অভ্যন্তরের বাঁক ও লম্বাদাঁড় তবুও ইমারতের সম্পূর্ণ উপাঙ্গের নির্মাণ প্রণালী কম চিত্তাকর্ষক নয়। এ প্রসঙ্গে ঝুলন্ত বাতায়নগুলোর সৌন্দর্য চমকপ্রদ, তথাপি এর স্থাপত্যিক কল্পন মোটামুটি সন্দেহাতীতভাবে সৌন্দর্যময় শোভনতা লাভ করেছে বলা চলে। অন্যপক্ষে এর সৌন্দর্য সুষমার চেয়ে কৌতূহলোদ্দীপকতা এতে বেশি মিশে রয়েছে।

জাহাজ মহল পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাঁচ দশকে সম্ভবত মাহমুদ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। মান্দু স্থাপত্যের তৃতীয় এবং শেষ ক্রান্তিলগ্নে পদ্ধতির ক্রমোন্নতির শুরুতে যখন ঈষৎ সৌষ্ঠবপূর্ণ ও কল্পনাপ্রসূত বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে ছিল তখনই এ প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল (চিত্র নং- ৬৩)। পি. ব্রাউনের মতে, "The Jahaz Mahall, the final building representing the classic phase of the building art at Mandu" [৯]

এ প্রাসাদ দ্বিতলবিশিষ্ট ও অত্যন্ত বৃহৎ পরিকল্পনায় নির্মিত। প্রায় ১০৯.৭৫ মি. (৩৬০ ফুট) লম্বা এবং দুটি ক্ষুদ্র হ্রদের মাঝখানে মুখোমুখিভাবে অবস্থিত। এটি ক্যাম্ফোর বা চ্যাম্ফোর টালাও (camphor talao) এবং মুনাজা টালাও (munaja talao) নামে পরিচিত।[১০] এ প্রাসাদের প্রস্থ ৫০ ফুটের কম। এর আকার ও জলে অবস্থান প্রকৃতপক্ষে জাহাজের মতোই ভাসমান বলে মনে করিয়ে দেয়। তাই নাম হয়েছে "জাহাজ মহল"।

এটি কোনো ভারিক্কি ধরনের দেয়াল নির্মাণ দ্বারা বা অতিরিক্ত শক্ত সমর্থভাবে গেঁথে তোলা হয় নি। এমনকি এর বাহ্যিক অবয়বে অবিচলিত মর্যাদার প্রয়াস সৃষ্টি করা হয় নি যদিও কিছুটা সেরূপ মনে করিয়ে দেয়। এ প্রাসাদের বৈশিষ্ট্য হাসিখুশির জীবন প্রভাব ও আতিথ্যপূর্ণ চিত্তবিনোদনকর আমেজ বিদ্যমান। এর পৃষ্ঠদেশ প্রাণচঞ্চল ও আনন্দপূর্ণ। এর স্তম্ভাদির শীর্ষ ও কারনিসের মধ্যবর্তী অংশ উজ্জ্বল চকচকে রঙ দ্বারা কারুকার্যময়। প্রাসাদের সম্মুখভাগ সারিবদ্ধ খিলানশ্রেণীতে গঠিত হয়েছে যার উপর দিয়ে প্রশস্ত ছাঁইচ নির্মাণের ফলে ঢেকে গিয়েছে। এর উপর দিয়ে ট্রিফোরিয়াম খিলানায়িত কুলঙ্গি (triforium of recessed arches) চওড়া উন্নত বপ্রে টালি আকর্ষণীয়ভাবে সাজানো রয়েছে। অন্যপক্ষে এর ছাদে নানা ধরনের উন্মুক্ত চন্দ্রাতপ, বায়ুবীয় ছত্রী ও কল্পনাপ্রসূত প্রকৃতির (imaginative nature) ঝুলন্ত ব্যালকনি বা বারান্দা উপরে সংযুক্ত হয়েছে। এর সব কিছুই হ্রদের ঢেউহীন সমতল দাঁড়ানো জলের উপর প্রতিফলিত হয়ে এক অপূর্ব সৌন্দর্যময় শোভা সৃষ্টি করে।

এর অভ্যন্তরভাগে স্তম্ভ সংবলিত প্রকোষ্ঠ সারি, শীতল সংযোগ স্থাপক পথসমূহ, ব্যয়বহুল স্নানাগার— যা একসময় বিলাসসম্ভারে পরিপূর্ণ করে রাজপরিবারের মহিলাদের চিত্তবিনোদন প্রয়োজন মেটাত আবার রাজদরবারের জন্যও এটি ব্যবহৃত হত। প্রাসাদের সমগ্র অংশই যথাসম্ভব সমধিক ভোগবিলাসের দায়িত্বহীন জীবনযাপনের পরিবেশ প্রকাশমান করে রেখেছে।

অবশ্য এর নকশালঙ্করণ ও সজ্জায়ন নিপুণ দক্ষতার সাথে সুসম্পন্ন হয়েছিল। এর নির্মাণ, গাঁথুনি ও স্থাপত্য অংশের সমন্বয় সাধন অত্যন্ত মজবুতভাবে করা হয়েছে।

বিশেষভাবে এর আকার ও উপকাঠামোর দলবদ্ধকরণ অত্যন্ত সুপ্রযুক্ত হয়েছে। এটি যে মনোজ্ঞতায় সম্পন্ন হয়েছিল তা বুঝা যায়। একদিকে যথানুপাত সম্মত ছত্রীর পর্যানুক্রমিক পিরামিড ছাদের সাথে অবস্থান অন্যপক্ষে ঝুলন্ত ছাঁইচ ও কারনিস আলো-ছায়ার জন্য সন্তোষজনক পথ রচনা করেছে।[১১]

মান্দু পদ্ধতির তৃতীয় পর্যায়ের উন্নয়ন বাস্তুশাস্ত্রসম্মত ছিল যা ইতঃপূর্বে বর্ণিত হয়েছে। এ উন্নয়ন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশকে জীবনে বাস্তবতাকে বর্জন করে ক্ষমতার অপব্যবহারে গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়ে আয়াসপূর্ণ সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্ট জীবনযাপন করা হত। শাসকের ব্যক্তিগত উৎসাহে সঙ্গীত, কবিতা এবং অনুরূপ শিল্পকলার চর্চার গতি অব্যাহত ছিল। এ প্রভাবমণ্ডিত বৈশিষ্ট্যের সাথে সঙ্গতি রেখে প্রাচুর্যময় ও ঐশ্বর্যশালী নির্জন আবাস নির্মাণ করা হয়েছিল।

এসব আবাসনগৃহ বিভিন্ন প্রকার আনন্দ উপভোগ করার নিমিত্তে নির্মিত হয়েছিল। এখানে দরবারি জীবনের বাইরে হাসিখুশিময় চিন্তাভাবনাশূন্য জীবন বিলাসিতাসহ গোপনে বা প্রকাশ্যে অতিবাহিত করার ব্যবস্থা ছিল। এ ধরনের ব্যবহৃত ইমারতগুলোর মধ্যে গ্রীষ্মাবাস, রাজপ্রাসাদ এবং চন্দ্রাতপ অন্তর্ভূক্ত ছিল।

এসব ইমারতের নিম্নতলায় সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠ গুচ্ছাকারে কেন্দ্রীয় প্রাঙ্গণকে প্রদক্ষিণ করে নির্মিত হয়েছিল এবং এর সাথে পানির ফোয়ারা ও ঝর্ণা সংযুক্ত হয়েছিল। বলা বাহুল্য উপর তলায় খিলানশ্রেণী শোভিত প্রকোষ্ঠগুলো খাঁজকাটা গম্বুজ ছাদে আবৃত হয়েছিল এবং ইমারতের দেয়ালপৃষ্ঠ সর্বত্র আড়ম্বরপূর্ণ চিত্রিত টালি দ্বারা আচ্ছাদিত ছিল। এরূপ একটি ইমারত এখন বাজ বাহাদুরেব প্রাসাদ হিসেবে পরিচিত। রূপমতির মণ্ডপ, নীল কান্ত প্রাসাদ ও চিস্তি খানের প্রাসাদ ইত্যাদি সে সময়েব অত্যন্ত আবেগপ্রবণ জীবন প্রবাহের কথাই প্রকাশ কবছে। তবে এসব ইমারতের বাহ্যিক অবয়বে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যশিল্প সমৃদ্ধ কৌশলময় কাজের সাক্ষ্য বহন করে না।

মালোয়ার রাজধানী মান্দুতে মূল স্থাপত্য পদ্ধতির উন্নয়ন ছাড়াও স্থানীয় পদ্ধতি ঐ একই বৈশিষ্ট্য নিয়ে চান্দরী শহরে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এটি ললিতপুরের পশ্চিমে অবস্থিত। পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে এটি মান্দুর ঘোরী ও খল্‌জী রাজাদের অধিকারে ছিল এবং স্থাপত্যকর্মের বলিষ্ঠ বিবরণীর মধ্য দিয়ে তাদের অধিকারের স্বাক্ষর রেখে গিয়েছে।

চান্দরীর প্রথম দিকের ইমারতগুলো মালোয়ার রাজধানীর অনুরূপ পদ্ধতি সংবলিত ছিল। কিন্তু কালক্রমে অন্য স্থাপত্য পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার চিহ্ন বহন করেছিল। এ বহিরাগত প্রভাব মান্দুর অনুরূপ চাহিদা ও সরবরাহ নিয়মনীতির দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। আবাসিক কারিগর ও স্থপতির সংখ্যা সীমিত হওয়ায় অন্য কোনো স্থান হতে প্রয়োজনীয় শ্রমিক সংগ্রহ করতে হয়েছিল। চান্দরীতে বহিরাগত যে সব কারিগর ও স্থপতির আমদানি হয়েছিল তার অধিকাংশই আহমদাবাদ হতে সংগৃহীত হয়েছিল এবং তারা গুজরাট স্থাপত্যের নির্মাণরীতি সাথে করে এনেছিল। এর ফলে পরবর্তী স্থাপত্যকর্মে ঐ বৈশিষ্ট্যের প্রভাব দৃষ্ট হয়েছে।

চান্দরী শহরে পাঁচটি স্থাপত্য ইমারত নির্মিত হয়েছিল। সেগুলো হচ্ছে—রাজপ্রাসাদ, মসজিদ, দুটি মাকবারা ও একটি তোরণ দরজা। এসব স্থাপত্যকর্ম দেড় শ বছরের মধ্যেই নির্মিত হয়েছিল, তবে স্থাপত্যিক উন্নয়ন কোনো তাৎপর্য অভিসিঞ্চিত হয় নি।

প্রথম দিকে নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ইমারত হচ্ছে চান্দরীর রাজপ্রাসাদ। এটি কুশাক মহল (kushak mahal) নামে পরিচিত। এটি ফাতেহাবাদ শহরতলিতে অবস্থিত।

এ অংশত ধ্বংসপ্রাপ্ত সাত তলাবিশিষ্ট কাঠামোটি মালোয়ার শাসনকর্তা প্রথম মাহমুদ শাহ কর্তৃক ১৪৪৫ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এর চারতলা পর্যন্ত এখনো অবশিষ্ট রয়েছে।[১২] বর্তমান সময়ে ধ্বংসস্তূপ অপসারিত করে এর যে দেয়াল অবমুক্ত করা হয়েছে তা দেখে মনে করা যায় যে এটি যথেষ্ট উচ্চতাবিশিষ্ট ইমারত ছিল। এর নকশা পরিকল্পনা বর্গাকার ৩৫.০৫ মি. (১১৫ ফুট) ব্যাসযুক্ত। এর প্রত্যেক পার্শ্বে প্রবেশপথ ও ব্যালকনিযুক্ত জানালা নিয়মিত বিরতিতে সংস্থাপিত, পক্ষান্তরে বহির্দেয়াল সমতল করে নির্মাণ করা হয়েছে।

কিন্তু অভ্যন্তরভাগের সাজানো অবস্থাটা সাধারণত যেরূপ হয়ে থাকে সেরূপ ছিল না। তবে দুটি খিলানায়িত সংযোগ পথ একটি আর একটি সমকোণে (right angles) অতিক্রম করেছে। এটিই এ ইমারতের লক্ষণীয় বা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এর ফলে সমস্ত অংশ চারটি সমচতুষ্কোণে বিভক্ত হয়েছে এবং এর মধ্যেই প্রাসাদ মিলনায়তনের স্থান সংকুলান হয়েছে। মিলনায়তনগুলোর একটির উপর আর একটি তলা নির্মিত হয়েছে। প্রতিটি খোলা অংশ অভ্যন্তরের দীর্ঘ খিলানায়িত সংযোগ পথের দিকেই অগ্রসরমান ছিল।

এতে বাইবের ব্যালকনিযুক্ত জানালা দিয়ে আলো প্রবেশ করত। এটি একটি সাদাসিধা প্রকল্প, কিন্তু বৈশিষ্ট্যসূচকভাবে ফলপ্রদ ও কার্যকর ছিল। এখানে মালোয়া পদ্ধতির স্থাপত্যিক প্রক্রিয়া অত্যন্ত প্রাণশক্তি সম্পন্নতায় আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল বলে মনে করা যায়। খিলানে প্রতিফলিত বক্রতা অত্যন্ত দৃঢ় এবং শক্তি সম্পন্ন ছিল। এর অন্তর্ভুক্ত আনুষঙ্গিক সহযোগী অংশগুলো নিপুণতার সাথে ছড়িয়ে দেওয়া বা বিভাজিত হয়েছে। এটি আবার এব সমতলপৃষ্ঠের সাথে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে। অন্যপক্ষে এটিই জোরালোভাবে মনোজ্ঞ আকারত্বে প্রকাশমান হয়ে পড়েছে। সমগ্র স্থাপত্য গাঁথুনি ও নির্মাণ প্রক্রিয়া অত্যন্ত উচ্চমানের বলে প্রতীয়মান হয়। ইমারতের সর্বাংশে একটা জীবনী শক্তির উচ্ছ্বাসময় ধারণা বিধৃত হয়ে রয়েছে।

বলা বাহুল্য এর নির্মাণ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে স্থাপত্য আন্দোলনের প্রাথমিক পর্যায়ের একটা নতুন অনুপ্রেরণা এসেছিল বলে মনে করা যায়। সম্ভবত চান্দরীর পরবর্তী স্থাপত্য কাঠামো হচ্ছে জামি মসজিদ। এটি মালোয়ার ঐতিহ্যপুষ্ট মালোয়া জামে মসজিদের অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। একই সাথে এখানেই প্রথম বহিরাগত প্রভাবের লক্ষণ প্রদর্শিত হয়। মালোয়ার বৈশিষ্ট্যের প্রভাব এর তিনটি খাঁজকাটা গম্বুজ নির্মাণের আকারত্বে প্রতিফলিত হয়েছে। এ গম্বুজগুলো অভ্যন্তর জুল্লাহর প্রতিটি 'বে'-বর্গের উপর নির্মিত হয়েছে এবং খিলানগুলো উন্মুক্ত সম্মুখ দেয়াল বরাবর রচিত।

এসব নির্মাণকার্য একই পদ্ধতিতে আকারপ্রাপ্ত হয়েছে তথাপি ছাঁইচকে (eaves) ধরে রাখার জন্য ঠেক্‌না ব্যবহারের রীতি স্থানীয় মন্দির স্থাপত্যেব উপকরণের ভাবমূলক সংক্ষিপ্তসার অনুসরণ করা হয়েছে বলে পি. ব্রাউন মতো প্রকাশ করেছেন।[১৩] তবে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় এ ধরনের আলম্বন বা ঠেক্‌নার ব্যবহার ফাসাদের বা মসজিদের সম্মুখ চেহারাকে দুর্বল করে দিয়েছে। শেষ কথা হচ্ছে যে কিছু গুণসম্পন্ন কাঠামো এ প্রক্রিয়ার ব্যবহারে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

চান্দরীর দুটি মাকবারা যা মাদ্রাসা ও শাহজাদী-কা-রওজা নামে পরিচিত মসজিদের স্থাপত্যের নির্মাণ আদর্শের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এর আকার ও খিলান নির্মাণ পদ্ধতি এমনকি প্রকৌশলী পরিচালনাও একইরূপ। এ ইমারত দুটি যারা নকশা পরিকল্পনা করেছেন বা

নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের জাতিগত পরিচয় যাই হোক না কেন নিঃসন্দেহে তারা খুবই দক্ষতা প্রদর্শন করতে পেরেছেন।

মাদ্রাসার বহির্ভাগে খিলানায়িত বারান্দা অংশ সুস্পষ্টভাবে মনোজ্ঞ ও প্রাচুর্যময়, অন্যপক্ষে অভ্যন্তর ভাগে শাহাজাদী-কা-রওজা প্রকোষ্ঠের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় যদিও জায়গায় কিছু ভারী তবুও স্কুইন্স পদ্ধতির খিলান কোনা মজবুত ও কার্যকর। চান্দরী স্থাপত্য কার্যক্রমের শেষ উদাহরণ হচ্ছে বাদল মহল নামক তোরণ দরজা। এটি একটি বিজয় তোরণ যা নীরবে একাই দাঁড়িয়ে রয়েছে, এটি কোনো ইমারতের অংশবিশেষ নয়। এটি ১৫.২৫ মি. (৫০ ফুট) উচ্চতাসম্পন্ন তবে একে প্রভাবিত করার মতো কোনো অসাধারণ বৈশিষ্ট্যযুক্ত নেই। কেননা এর সমগ্র প্রস্থ মাত্র ৭.৬৫ মি. (২৫ ফুট) এবং এর অধিকাংশ জায়গা জুড়ে দুটি তীর্যক ফিরোজিয়ান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যযুক্ত বহিঃআলম্বন বা পোস্তা (buttress) উভয় পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে।

এ দু আলম্বনের মাঝে খিলানপথ দু তলায় রচিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত পরিকল্পনাটি দুর্বল সংযোগ পথ ও অর্থহীন অলঙ্করণের প্রবর্তনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এটি অসম্ভব নয় যে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে একটি আঞ্চলিক স্থাপত্যশিল্পের স্কুল উদ্ভব বা বিবর্তিত হয়েছিল এবং এর কেন্দ্র ছিল গোয়ালিয়ার। এখানে তখনকার সকল প্রতিষ্ঠিত প্রচলিত স্থাপত্য বিদ্যার মূলসূত্র—দিল্লি, মালোয়া, রাজপুতানা এমনকি গুজরাট হতে সংগৃহীত হয়েছিল; তারপর এখানে আত্মীভূত করে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নতুন একটা ভাবনার পথ সৃষ্টি হয়েছিল।

চান্দরী বৈচিত্র্যময় স্থাপত্যকর্ম সৃষ্টির মূলে ছিল প্রকৌশলী, কারিগরি দক্ষতা। আর বাদল মহল তোরণ দ্বারের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির মূলেও ছিল দক্ষ কারিগরদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শিল্প সৃষ্টির বাসনা।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৫৯।
২. *তদেব*, পৃ. ৬০।
৩. বিজয়স্তম্ভ সম্পর্কে পি. ব্রাউন লিখেছেন, "Rising up from the comer of Ashrafi Mahall was a lofty tower of victory of seven stories (Haft Munzil) of which only the base remains, but it appears to have been over one hundred and fifty feet in height"; cf: *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬১।
৪. এ উভয় মসজিদের তুলনা করতে গিয়ে জন মার্শাল বলেন, "Ahmad Shah's great mosque at Ahmadabad, with which it was contemporary, the Jami Masjid of Mandu in lacking in poetry creative inspiration"; cf: *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ভলিউম-৩, দিল্লি, ১৯৫৮, পৃ. ৬২০।
৫. মান্দু জামে মসজিদ সম্পর্কে তিনি আরো বলেন, "It (the *Jami Masjid* of Mandu) is too cold and formal and calculated to take rank among the really great architecture creations of India"; cf· *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২০।
৬. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২।
৭. *তদেব*, পৃ. ৬৩।

৮. *Jahaz Mahall* or ship palace—so called because it stood between two lakes The palace was largely repaired and added to during the reign of Jahangir; দেখুন : জন মার্শাল, "দি মনুমেন্টস অব মুসলিম ইন্ডিয়া", *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত*, পৃ.৬২১, পাদটীকা-৩।
৯. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪।
১০. *তদেব*।
১১. জাহাজ মহল সম্পর্কে জন মার্শাল বলেন, "Its (*Jahaz Mahall*) fine arched halls, its roof pavilions and badly designed reservoirs still forms one of the most conspicuous landmarks in Mandu"; cf *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত*, পৃ ৬২১।
১২. ফিরিস্তার বিবরণ থেকে জানা যায় যে, "Mahmud Shah I of Malwa passed through fathabad on his way back from Jaunpur and gave orders for a seven storeyed palace to be errected there"; উদ্ধৃতির জন্য দেখুন *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬২৩।
১৩. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৫।

দ্বাদশতম অধ্যায়

দাক্ষিণাত্যের মুসলিম স্থাপত্য

গুলবর্গা (১৩৪৭-১৪২২ খ্রি.), বিদার (১৪২২-১৫১২ খ্রি.), গোলকুণ্ডা (১৫১২-১৬৮৭ খ্রি.)

ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তের উপদ্বীপ অঞ্চল ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ক্রান্তিলগ্নে দিল্লির সুলতানদের আধিপত্য বিস্তার লাভ করেছিল এবং এখানে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যে ইসলামি স্থাপত্যকলাব বিকাশ ঘটেছিল। এ ইসলামি স্থাপত্য অনুশীলনের ধারা উক্ত সময় হতে আরম্ভ হয়ে সপ্তদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চল মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সাড়ে তিন শ বছর অব্যাহত ছিল। তবে এখানে যে ইসলামিক স্থাপত্যধারা গড়ে উঠেছিল তা অন্যান্য প্রাদেশিক স্থাপত্যধারার বৈশিষ্ট্য হতে নিঃসন্দেহে স্বতন্ত্রতাব দাবিদার।

ভারতের অন্য প্রদেশগুলোতে মুসলিম শাসকবা স্থানীয় প্রতিভাবান স্থপতি ও কারিগরদেরকে স্থাপত্য নির্মাণ কাজে বা প্রকল্প পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য নিয়োজিত করেছিল। ফলে মূল ইসলামি স্থাপত্য পদ্ধতির সাথে স্থানীয় মন্দির স্থাপত্যেব নির্মাণ রীতিব সংমিশ্রণে নতুন একটা সংকব স্থাপত্যরীতি গড়ে ওঠে। কিন্তু বাস্তবে এ ধারাবাহিকতার সাথে সংঘাত সৃষ্টি করে দক্ষিণের এ নতুন শাসকগণ স্থানীয় স্থাপত্য প্রভাবকে পরিহার করে ইসলামের আদি ধারার কাছাকাছি তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্থাপত্য নির্মাণ করেছিল।

দাক্ষিণাত্যে দ্রাবিড় ও চালুক্যদের মনোজ্ঞ ও চমৎকার বহুসংখ্যক মন্দির থাকা সত্ত্বেও মুসলিম শাসকরা আবহমানকাল হতে প্রচলিত স্থাপত্যধারাব প্রয়োগে নিজেদের স্থাপত্য ইমারত গড়তে অন্যান্য প্রদেশগুলোর মতো তেমন উৎসাহ বোধ করে নি। বলা বাহুল্য দাক্ষিণাত্যে মুসলিম শাসকদের অনুশীলনে যে স্থাপত্য ইমারত গড়ে উঠেছিল তা মূল ইসলামি পদ্ধতির বাহ্যিকরূপ পরিগ্রহ করেছিল বলে মনে হলেও এটি স্বতঃস্ফূর্ত মূল ইসলামি স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে কোনোভাবেই গড়ে ওঠে নি; বরং এগুলো মূলগতভাবে এগুলো তুলনামূলক দুটি ইসলামি স্থাপত্যধারাব পরিপক্ব অবস্থার সংমিশ্রণ মাত্র যা অন্যত্র গড়ে উঠেছিল। এগুলোর একটি হচ্ছে ধীরে ধীরে দিল্লির সুলতানদের অধীনে শক্তিশালী প্রকৃতির অধিক বা অল্প পরিমাণ প্রভাবে প্রাদেশিক স্থাপত্যধারারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল, তারই পরোক্ষ প্রভাব এখানে এসে পৌঁছেছিল। অন্যপক্ষে অপরটি সম্পূর্ণভাবে বিদেশী বা বহিরাগত উৎস হতে এসেছিল। এ উৎসটি হচ্ছে পার্শ্ববর্তী দেশ পারস্য। এ দুটি গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য উন্নয়ন ধারার সংস্পর্শে একটা স্থাপত্যধারা দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে নতুন ইসলামি স্থাপত্যধারার অবকাশ সৃষ্টি করেছিল।

দিল্লির স্থাপত্যধারার প্রথম অবদান ১৩৪০ খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ বিন তোঘলকের বাধ্যতামূলক দিল্লির অধিবাসীবৃন্দকে নতুন রাজধানী দৌলতাবাদে স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। প্রধানত এ উদ্বাস্তুদের অভিনিক্রমণের মধ্য দিয়ে দিল্লির রাজকীয় প্রাসাদ ও সমাধিসৌধ নির্মাতা কারিগর ও স্থপতিদের বংশধরদের আগমন ঘটেছিল। তারা এ নতুন রাজধানীতে বাধ্যতামূলক বসতি গড়ে তুলতে গিয়ে দিল্লির চর্চিত স্থাপত্য ঐতিহ্য এখানে প্রচলন করেছিল। এভাবেই দাক্ষিণাত্যে নতুন পদ্ধতির গোড়াপত্তন হয়েছিল। দিল্লির এ পদ্ধতির প্রাবল্য সত্ত্বেও সময়ের পরিবর্তনে এবং অন্যান্য কারণে দিল্লি স্থাপত্য ঐতিহ্য দুর্বল হয়ে পড়েছিল এবং এটি সন্দেহাতীতভাবে বলা চলে যে এখানকার স্থাপত্যের ভিত্তিগত মৌলিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টির জন্য তারাই দায়ী ছিল।

অন্যপক্ষে অপর স্থাপত্য স্রোতধারা কিছুটা দূরবর্তী পারস্য উৎস হতে সরাসরি আমদানি হয়েছিল এমনটি নয় বরং একটু ঘুরানো পথে এখানে এসে পৌছেছিল। এটি স্মরণ করা যেতে পারে যে মধ্যযুগের প্রায় প্রথম দিকে অনেক উদ্বাস্তু পশ্চিম এশীয়, ইরানি, মোঙ্গলীয়, তুর্কিস্তানীয় এমনকি অন্যান্য গোত্রীয় ও জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রিত জনপদ এ অঞ্চলে এসেছিল। তাদের নিজস্ব আদি ভাবরস ও সংস্কৃতিভিত্তিক এক একটি সম্প্রদায় ভারতে স্থায়িভাবে বসতি গড়ে তুলেছিল।

তারা সহজ প্রবৃত্তি ও চেতনা অনুসারে পশ্চিমের ছেড়ে আসা মাতৃভূমি হতে জীবন চলার অনুপ্রেরণা গ্রহণ করত। বলা বাহুল্য তাদেব মাতৃভূমির বিশাল অঞ্চলটি তখন সকল জ্ঞানের ঝরনা ধারার উৎসমুখ ছিল। যেমন পরবর্তী সময়ে সমগ্র ইউবোপ, ইতালি ও প্রাচীন গ্রিসের দিকে তাকিয়ে থাকত তাদের ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ও কলাকৃষ্টির উৎসকে আহরণ করার জন্য সেরূপভাবে এশিয়ার অবশিষ্ট জাতি ও দেশ শক্তিশালী পারস্যের কলাকৃষ্টির প্রভাবকে আকর্ষণ ও অনুসরণ করত।

পারস্যের অটল ও প্রবল অবিরাম কৃষ্টিধাবা ক্রমে ক্রমে অলক্ষিতে ভারতে কয়েক শতাব্দী ধরে অনুপ্রবেশ অব্যাহত থাকে। তারই লক্ষণীয় প্রভাব ভারতের কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও অঞ্চলের ওপর পতিত হয়েছিল। অধিকন্তু এ পশ্চিমেব দেশ কয়েকটির সাথে বিশেষ করে পারস্যের সাথে আন্তঃযোগাযোগ তথা লোক চলাচলের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল। অবশ্য এর মূলে ইসলাম ধর্মের বিস্তার অতি দ্রুততায় সংঘটিত হওয়াটাই ছিল প্রত্যক্ষ কারণ।

মূলত অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যন্ত ভারত এ থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল এবং ৭১২ খ্রিস্টাব্দে যখন মুসলমানদের নিকট ভারতের দ্বার খুলে গিয়েছিল তখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষভাবে বিজিত রাজ্যের রাজধানীগুলোতে অসংখ্য মানুষের আগমন ঘটতে থাকে। এ সব বেশিরভাগ উদ্বাস্তুর মানুষ উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত ও বিভিন্ন গুণসম্পন্ন প্রতিভাবান ছিল। তারা এদেশে উচ্চ রাজপদে বহাল হতে সক্ষম হয়েছিল। তাদের মাঝে কেবল সামরিক বিজেতা ছিল না, ছিল প্রকৌশলী, স্থপতি, কারিগর এবং অন্যান্য দক্ষ শ্রমিকবৃন্দ। তাদের অনেকে আরবীয় জাহাজে আরোহণ করে পারস্য উপসাগর ও আরব সাগর হয়ে পশ্চিম ভারতের সামুদ্রিক বন্দরগুলোতে অবতরণ করেছিল। এমনকি পূর্ববর্তী সময়েও সমুদ্রের এপার হতে ওপারের দেশগুলোর সাথে দাক্ষিণাত্যের রাজধানীগুলোর বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। সুতরাং ইরানীয় স্থাপত্য প্রভাব ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের ন্যায় দাক্ষিণাত্যের স্বাধীন রাজ্য গুলোতেও দেখা যায়।

এর পিছনে রাজনৈতিক কারণসহ সাংস্কৃতিক কারণকেও চিহ্নিত করা যায়। কেননা দাক্ষিণাত্যের এ অঞ্চলের প্রথম শাসক আলাউদ্দিন হাসান বাহমান শাহ ছিলেন

একজন পারস্যবাসী সেনানায়ক; যিনি দিল্লিতে তোঘলকদের অধীনে বহু বছর চাকরিরত ছিলেন। তিনিই ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে গুলবর্গায় বাহমনী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। স্থাপত্যশিল্পের মূলধারা বিশ্লেষণে কিছু কিছু বিবেচনায় দাক্ষিণাত্যের এ স্থাপত্য পারস্য প্রভাব হতে উদ্ভব হওয়ার ঘটনা সচরাচর এরূপ আকারত্ব দান করেছিল বলে মনে করা যেতে পারে।

এটি ইন্দো-ইসলামিক পদ্ধতির বদলে পরিবর্তিত ভারতীয় স্থাপত্য আদর্শের ধারণা দেয়। দাক্ষিণাত্যে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইমারতে এ প্রভাব বিদ্যমান দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো খাঁটিভাবে ও ইচ্ছাকৃতভাবে ইরানি নকশায় ও অনুরূপ আকৃতিতে নির্মিত হয়েছিল। এগুলো দেখে মনে করা যেতে পারে যে অবিকল দৈহিকভাবে তাদের মাতৃভূমি হতে স্থাপত্য তুলে আনা হয়েছিল। এর আকারত্ব প্রাপ্তির ব্যাখ্যায় বলা যায় যে এখানে স্থাপত্য আদর্শের প্রবর্তনে বক্রীকরণ আকারত্ব তাদের দেশীয় পারস্য পদ্ধতির প্রায় নিকটবর্তী পর্যায়ে এসে পৌঁছে গিয়েছিল।

বলা বাহুল্য স্মৃতিসৌধের দীর্ঘ তালিকাব বিশদ ব্যাখ্যায় চিত্রানুগভাবে (graphically) দাক্ষিণাত্য পদ্ধতি ধীরে ধীরে যে চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করেছিল তা পারস্য ঐতিহ্যপুষ্ট ছিল বলে মনে করতে অসুবিধা হয় না। এ প্রভাব রাজধানী শহর—গুলবর্গা, বিদার ও গোলকুণ্ডায় নির্মিত শাসকদের সমাধিসৌধগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। এসব উদাহরণের সংখ্যা ত্রিশের মতো যা প্রায় তিন শ বছরে গড়ে উঠেছিল।

এ ধারার প্রথমপর্বে স্থাপত্য কাঠামো নির্মিত হয়েছিল গুলবর্গার বাহমনী সুলতানদের অধীনে। ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে বাহমনী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সুলতান হাসানশাহের মৃত্যুর পর তার মাকবারা নির্মাণের মধ্য দিয়ে এর সূত্রপাত হয়। এ ইমারত সরাসরি অপরিণত দিল্লির প্রথম দিকের সুলতানদের স্থাপত্য আদর্শ অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল। তোঘলকদের সুপরিচিত পদ্ধতি যেমন—ঢালু দেয়াল, মোটা গড়ন এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এখানে দৃষ্ট হয়।

পরবর্তী সময়ে পঞ্চদশ শতাব্দীর বিদারেব বাহমনী শাসকদের মাকবারায় প্রায় একইরূপ বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। তবে পারস্যের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সাথে এখানকার স্থাপত্যধারায় দিল্লির কিছু বৈশিষ্ট্য মিশ্রিত হতে পেরেছিল। তা লক্ষ করা যায় বিশেষত গম্বুজের আকারত্বে। এখানেই প্রথম অষ্টভুজ পিপার উপরে গম্বুজের সঙ্কুচিত কটিদেশের নির্মাণচিহ্ন প্রত্যক্ষ করা যায়। এ পর্বের চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে বিদারের বারিদ বংশের শাসকদের মাকবারাগুলোতে। কিন্তু এরপরও মনে দাগ কাটার মতো স্পষ্টভাবে লক্ষণ প্রতীয়মান দেখতে পাওয়া যায় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর গোলকুণ্ডার কুতুবশাহী বংশের স্থাপত্য কর্মে। এখানেই গম্বুজের বাল্ব আকার পরিপূর্ণ প্রাপ্তি ঘটেছিল এবং সমস্ত স্থাপত্য ইমারতের অংশবিশেষ বিভিন্ন স্থাপত্য উপাদানের একত্র সমাবেশে পূর্ণাঙ্গরূপ পরিগ্রহ করেছিল।

এটি দেখে মনে করা যায় যে স্বতন্ত্র দুটি ব্যবধানে আলাদাভাবে গড়ে ওঠা স্থাপত্য সত্ত্বার উৎস এখানে এসে সমন্বিত হতে পেরেছিল। এভাবে নতুন প্রবর্তনে স্থাপত্য ইমারতের সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছিল ও নির্মাতাদের রুচির মান বৃদ্ধি পেয়ে ইসলামি স্থাপত্যধারার চরম উৎকর্ষতা লক্ষ করা যায়।

মুসলিম শাসনামলে দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য অনুশীলনের প্রশস্তধারা বিশ্লেষণ করতে মোটামুটি তিনটি যুগের ক্রমবিকাশ লক্ষ করা যায়। বিশেষভাবে রাজধানী শহরগুলোতে;

যেখান হতে দেশটির শাসনকার্য পরিচালিত হত সেখানেই স্থাপত্যশিল্প গড়ে ওঠার অনুকূল পরিবেশ পেয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের শাসনকার্য বিভিন্ন পর্যায়ে সুলতানদের বংশ পরিবর্তনের ফলে তিনটি আলাদা স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়েছিল। যেমন ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে হাসান বাহমানশাহ গুলবর্গায় তার রাজধানী স্থাপনের মধ্য দিয়ে উক্ত শহরের গোড়াপত্তন করেছিলেন। বলা বাহুল্য বাহমনী বংশের শাসকবৃন্দ তাদের শাসনকার্য গুলবর্গা হতেই পরিচালিত করেছিল। এ শহরেই দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য পদ্ধতির প্রথম অনুশীলন শুরু হয়েছিল। তাই এটি দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য উন্নয়নের প্রথম যুগ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

দ্বিতীয় যুগের গোড়াপত্তন হয়েছিল ১৪২৮ খ্রিস্টাব্দে যখন প্রশাসনিক কেন্দ্র গুলবর্গা হতে বিদারে স্থানান্তরিত হয়েছিল। পক্ষান্তরে স্থাপত্য উন্নয়নধারার সর্বশেষ যুগ বা তৃতীয় পর্যায়ের সূত্রপাত হয়েছিল ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে যখন কুতুবশাহী বংশ গোলকুণ্ডায় তাদের বাজধানী স্থাপন করেছিল এবং এ যুগ ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যটি মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

এ অঞ্চলের রাজ্যগুলো দিল্লিভিত্তিক সাম্রাজ্য হতে স্বাধীনভাবে রাজ্য গঠনের পূর্বেও চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বংশগুলো এখানে রাজত্ব করত। অন্যপক্ষে দিল্লিভিত্তিক প্রদেশগুলোর মুসলিম রাজপ্রতিনিধি বা সুবেদারগণ নিজেদের প্রয়োজনে মন্দির স্থাপত্য কাঠামোকে সংস্কাব করে ব্যবহার করেছিল।

দাক্ষিণাত্যে স্থাপত্য অনুশীলন ধারার প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ দিল্লি সুলতানদেব নিযুক্ত সুবেদারদেব অধীনে দুটি উদাহরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এর একটি হচ্ছে দৌলতবাদের জামে মসজিদ এবং অপবটি হায়দ্রাবাদের নিকটবর্তী বদাউনের ডিভাল মসজিদ (deval mosque)। প্রথম মসজিদটির কাঠামো বিশাল এবং বর্গাকারে নির্মিত যার প্রতিপার্শ্ব ৭৯.২৫ মি. (২৬০ ফুট)। এ মসজিদ পরিকল্পনায় আদি মসজিদ নকশার (দামেস্ক মসজিদের নকশা) অনুকবণ করা হয়েছে। মসজিদ আবেষ্টনীর পশ্চিম পার্শ্বেই থাম সংবলিত জুল্লাহ বা এবাদতখানা নির্মিত হয়েছে এবং মসজিদের প্রবেশপথ পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বের ঠিক মাঝখান দিয়ে রচিত হয়েছে। এর সম্মুখভাগে পাঁচটি খিলানপথ রচিত হয়েছে এবং ছাদ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত গম্বুজ ১০৬ টি থামেব উপর ভর করে রয়েছে। মসজিদের অংশ গঠনে এর আশপাশে যে পুরোনো হিন্দু আমলের ইমারত ছিল সেগুলো হতে উপকরণ সংগৃহীত হওয়ার ফলে গোঁজামিলে পূর্বের উপকরণের অস্তিত্ব নতুন সংযোজনেও একেবারে ঢেকে যায় নি বরং আদিরূপ কিছুটা থেকেই গিয়েছিল।

বদাউনের মসজিদটি অল্প শ্রমে অবয়বপ্রাপ্তি ঘটেছিল। কারণ এটি ছিল একটি তারা আকৃতির নবম ও দশম শতাব্দীর চালুক্য পদ্ধতির স্থাপত্য আদর্শে নির্মিত জৈন মন্দির। এতে সামান্য কিছু কাঠামো সংযোজন করতে হয়েছিল মাত্র। এটি রূপান্তর করতে পশ্চিম পার্শ্বের খোলা অংশ নুড়ি পাথর দ্বারা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়ে কিবলা (পশ্চিম পার্শ্বের) দেয়াল নির্মাণ করা হয় এবং সমতল ছাদের উপর ইটের গম্বুজ, পশ্চিম পার্শ্বে মিহরাব ও তার সাথে ইমাম সাহেবের খোৎবা পাঠের জন্য মিম্বার সংযোজন করা হয়।

গুলবর্গা (১৩৪৭-১৪২২ খ্রি.) :

প্রথম যুগের স্থাপত্য উন্নয়ন দাক্ষিণাত্যে ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে বাহমনী সুলতানদের শাসন ব্যবস্থা শুরু হওয়ার সাথে সম্পৃক্ত। এ বংশের প্রথম সুলতান আলাউদ্দিন বাহমান শাহ দিল্লির অধীনতা হতে মুক্ত হয়েই গুলবর্গাকে তার রাজধানীরূপে গড়ে তুলেছিলেন। গুলবর্গা একটি

স্বাধীন দেশের প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ফলে স্থাপত্য উন্নয়নের কাজ আরম্ভ হয়। তিনি এ নগরীকে একটি দুর্গ নগরীতে পরিণত করেছিলেন। হিন্দু ও মুসলিম রাজত্বকালে অনুরূপ স্বাতন্ত্র্য বিচ্ছিন্ন সামান্ত রাজার বা ফিউডাল লর্ডদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজত্ব গড়ে উঠেছিল। এটি প্রতীয়মান হয় যে ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীর ফরাসি সামন্ত প্রভুদের মতোই দক্ষিণ ভারতেও অসংখ্য সামন্তরাজ্য গড়ে উঠেছিল। সীমানা রেখা পাহারা দেয়ার জন্য এসব রাজ্যের সীমান্ত রেখা বরাবর শক্তিশালী ও সংরক্ষিত ইমারত মজবুতভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল।

বাহমনী রাজ্যের কেন্দ্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত নগর ছিল এ গুলবর্গা। তবে প্রায় অনুরূপ সংরক্ষিত নগর আবো কয়েকটি নির্মিত হয়েছিল। এসব সামরিক গুরুত্বপূর্ণ নগর হতেই রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশেব প্রধান পথ পাহারা দেওয়া হত। উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত দৌলতাবাদ এরূপ একটি দৃষ্টান্ত। এটি খাড়া গিরিচূড়ার ন্যায় পরিখার দুরূহ ঢালু পার্শ্বদেশ, এক কেন্দ্রবিশিষ্ট সমকোণী দেয়ালসমূহ আঁকাবাঁকা ভ্রান্তিশীল নির্মিত ভূ গর্ভস্থ সুবঙ্গ পথ, উতপ্ত লৌহ প্রকোষ্ঠের মতোই বাধাদানে সমর্থ ছিল। এ ছাড়া বিস্ময়কব প্রকৌশলী ও কারিগরি কর্মকাণ্ডের দ্বারা এটি নির্মিত।

অধিকন্তু প্রতিটি দুর্গ স্বাতন্ত্র্য গঠন কাঠামো বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ছিল। এগুলো দেখতে প্রতিরক্ষা কাজের উপযোগী চমৎকারিত্বময় গুণবিশিষ্ট ও মনোজ্ঞ ছিল। যেমন রাইচেব (raichur) বলিষ্ঠ অথচ সাদাসিধা নওরঙ্গী দরজা (naurangi darwaza)। নাবনালা দুর্গে আবার দেখা যায় ঐশ্বর্যশালী করে মহাখালী (mahakali) তোবণ বা দরজা পথ সজ্জায়িত কবা হয়েছে। অন্যপক্ষে নালড্রাগ (naldrug) দুর্গে চিত্তাকর্ষক মাধুর্যময় খাঁজকাটা বুরুজ ও চন্দ্রাতপ নির্মিত হয়েছে। আবার পারেন্দ্রা দুর্গ দেখতে চিত্রের ন্যায় সুন্দর তবে প্রাণহীন প্রান্তর। এসব অবশ্য দুর্গের মতো হলেও দুর্গেব মতো বৃহৎ নয়, এগুলোকে সুরক্ষিত আশ্রয় কেন্দ্রও বলা যায়। এগুলো প্রধানত কঠোর সামরিক তৎপরতা পরিচালনার জন্য ব্যবহৃত হত। এসব নির্মাণ কাজে তেমন কোনো স্থাপত্যিক সৌন্দর্য প্রতীয়মান হয়ে ওঠে নি।

অবশ্য এগুলোর মূল্যায়ন অন্যভাবে করা যেতে পারে যে দুর্ভেদ্য প্রতিরক্ষামূলক ইমারত গঠনের কারিগরি ও প্রকৌশলী দক্ষতা অর্জনের নজির সৃষ্টি করেছিল। এখানে অর্জিত প্রকৌশলী দক্ষতা পাশ্চাত্য কৌশল দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। এটি দেখে মনে হয় এ কাজে নিয়োজিত কারিগর ও স্থপতিরা নিঃসন্দেহে পশ্চিমের সামরিক প্রকৌশল পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত ছিল এবং হয়তো বা তারাই সহায়তাদান করেছিল।

অন্যপক্ষে এর বৈশিষ্ট্য অবলোকনে প্রতীয়মান হয় যে এসব কাজ সিরিয়ার দক্ষ শ্রমিকরা নির্মাণ করেছিল। এখানে উল্লেখ্য যে তখনকার পাশ্চাত্য বলতে পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলোকে বুঝাত। তারাই সে সময় পৃথিবীতে সর্বদিক দিয়ে শ্রেষ্টত্ব অর্জন করেছিল। সিরীয়রা মূলত 'ফ্রানকিস' (frankish) প্রাসাদ হতে জ্ঞান আহরণ করেছিল। তাদের আহরিত জ্ঞান সেলজুক দুর্গ নির্মাণ প্রকৌশলের সঙ্গে সমন্বিত হয়ে পরিপক্কতা লাভ করে। সেলজুকগণ আলেপ্পোতে করালদর্শন দুর্গ (grim fortresses) নির্মাণে যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল। ঐতিহাসিক লিভান্ট (levant) এ দুর্গ সম্পর্কে দীর্ঘ ব্যাখ্যা দিয়েছেন।[১]

বলা বাহুল্য গুলবর্গার দুর্গের অনুরূপ সুঠাম গড়ন না হলেও সামরিক স্থাপত্য উদাহরণ হিসেবে দেখার যথেষ্ট উপাদান এতে রয়েছে। সে হিসেবে এটি একটি স্মরণীয় ও উল্লেখযোগ্য নির্মাণকীর্তি। এটি খুব একটি বিশাল এলাকা নিয়ে গঠিত নয়। এর চতুর্দিকের

পরিবেষ্টন মাত্র ২ কি.মি.-এর কম তবে যথেষ্ট শক্তিশালী। এর দ্বিজ দেয়াল ১৫.২৫ মি. (৫০ ফুট) পুরু এবং সৌষ্ঠবহীন জবুথবুভাবে কঠিনশিলা দ্বারা গেঁথে তোলা হয়েছে। এটি কোনো স্থানে ৯.১৫ মি. (৩০ ফুট) প্রশস্ত মাত্র।

এসব দুর্গের কোনো সুসামঞ্জস্যতার চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। এগুলোর অনিয়মিত সীমানা রেখা জবুথবুভাবে শিলাখণ্ডের দ্বারা নির্মিত। অন্যপক্ষে আবার ঘন ব্যবধানে ফাঁকে ফাঁকে সর্বত্র দেয়াল পরিবেষ্টিত কঠিন উপবৃত্তাকার বুরুজ পরিকল্পিত ও অভিক্ষিপ্ত হয়েছে। অনেকগুলো দুর্গ ঘূর্ণায়মান মঞ্চরূপ বা কাঁটাতারযুক্ত ভারী-অস্ত্রাগাররূপে গড়ে তোলা হয়েছিল। তীর ও গোলা ছোড়ার সচ্ছিদ্র দৈত্যের মতো শক্তিশালী প্রাচীর (battlements) প্রতিরক্ষার জন্য নির্মিত হয়েছিল। বিরল আকারের ৩.০৫ মি. (১০ ফুট) বর্গাকারের এক একটি পাথর খণ্ড মার্লন নকশায় সজ্জিত করা হয়েছিল এবং এর সাথে অমসৃণ পাথর খণ্ড স্থাপন করে কামান স্থাপনার্থে প্রাচীরগাত্রে ছিদ্র ও গর্ত সৃষ্টি করা হয়েছিল।

সচ্ছিদ্র প্রাচীরের কিছু কিছু অংশ অত্যন্ত বিশাল আকারে নির্মিত ছিল যাতে প্রয়োজনীয় রূপ পরিখা খনন করে দু তিন জন যোদ্ধা অবস্থানের সুযোগ পায়। আবার শত্রুকে পরাভূত করার মেশিকুলেসন্স (machicolations) প্রক্রিয়াসহ গলিত উত্তপ্ত তরল পদার্থ উপর হতে ঢেলে দেয়ার ব্যবস্থা ছিল।

বলা বাহুল্য দুর্গে প্রবেশের দুটি পথ রাখা হয়েছে। প্রধান প্রবেশপথটি উত্তর-পূর্বকোণে অবস্থিত যাতে অনুপ্রবেশ করা প্রায় অসাধ্য ছিল। এটি আবার গুটানো টানাসেতু (drawbridge) সংযুক্ত ছিল। এটি ভারী সূচীমুখ শক্তিশালী কীলকযুক্ত; পিছন দরজা প্রশস্ত কিন্তু বহু পেঁচানো পথের সাথে মিলিত হয়েছে। এ পথ আবার কিছুটা ঘুরানো মোচড়ানো ও জড়ানো হয়ে শক্তিশালী কয়েকটি গেট অতিক্রম করেছে। প্রতিটি গেটের উপরে আবার পাহারা দেওয়ার জন্য সুউচ্চ বুরুজ সংযুক্ত করা হয়েছিল। চৌকি দেওয়ার বুরুজগুলো একটির পর আর একটি এভাবে দুর্গের মূল পরিবেষ্টিত প্রাচীরের নিকট না পৌঁছা পর্যন্ত এটি অব্যাহত ছিল।

সে যুগে এসব আত্মরক্ষার্থে নির্মিত কেল্লা পরিসরের মধ্যে চন্দ্রাতপ, রাজপ্রাসাদ, রাজদরবারের বিশাল মিলনায়তন ইত্যাদি নির্মিত হলেও এখন কেবলমাত্র ধ্বংসস্তূপে বা ঢিবিতে পরিণত হয়েছে। তবে এসব ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি ইমারত আজো প্রায় অক্ষত রয়েছে। হয়তোবা ধর্মীয় পাদপীঠ হিসেবে বিদ্যমান বৈশিষ্ট্যের কারণে এটি সুরক্ষিত রয়েছে। অত্যান্ত কৌতূহলের সাথে লক্ষ করা যায় যে এ বিশাল ধ্বংসাবশেষের বিয়োগান্তময় শূন্যতার দৃশ্যপটে এটি একা বিচ্ছিন্নভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

গুলবর্গা জামি মসজিদ :

গুলবার্গা জামি মসজিদটি দাক্ষিণাত্যের আকর্ষণীয় ইসলামি স্থাপত্যরূপে চিহ্নিত। মসজিদ নির্মাণের পর সংযুক্ত শিলালিপিতে এর নির্মাণকার্য ১৩৬৭ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছে বলে উল্লেখ রয়েছে। ভারতে এরূপ উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ ছাড়া মসজিদের এটি বিরল দৃষ্টান্ত। এর সমস্ত কাঠামোটাই ছাদ দ্বারা আবৃত। এটি নিজেই একটি অসাধারণ শ্রেণীর ইমারত হিসেবে আত্মপরিচয় বহন করছে। এ মসজিদের মূলনকশা পরিকল্পনা এবং নির্মাণ পদ্ধতি এরূপ হওয়ার পিছনে ভারতের বাইর হতে সুদূর উত্তর পারস্যের কাজভীন শহরের রাফি নামের এক স্থপতির তত্ত্বাবধানে স্বীয় উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পদ্ধতির প্রয়োগে অনুরূপ অবয়বপ্রাপ্তি ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। ইনি একটি ঐতিহ্যবাহী ইমারত প্রকৌশলী পরিবারের ব্যক্তি

হিসেবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মসজিদের নকশা পরিকল্পনা সৃষ্টি করতে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এটি তার অসাধারণ প্রতিভার ফল বলে মনে করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে এর আবৃত বৈশিষ্ট্য সরাসরি ইসলামি মসজিদ স্থাপত্যরীতির সাথে বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে।

তাব এ নকশা পরিকল্পনার অনুপ্রেরণা পাশ্চাত্য স্থাপত্য উদাহরণ হতে সংগৃহীত হতে পারে যেখানে ব্যাসিলিকা (basılıca) পদ্ধতির ধনু বা ঢেউ ছাদের মিলনায়তন ও গম্বুজের নির্মাণচর্চা হয়েছিল।[২] এমনকি পূর্ব ইউরোপের ধর্মীয় মুসলিম ইমাবতের প্রতিকৃতি হতেও ধারণা নেওয়া হতে পারে। গুলবর্গার এ মসজিদের স্থাপত্য পদ্ধতি বা প্রণালী এককভাবে ইরানি বা ভারতীয় বলে চিহ্নিত করা যাবে না, বরং এটি দুটি স্থাপত্য পদ্ধতির সংমিশ্রণের ফল; যাতে স্থাপত্য উপকরণগুলো এমনভাবে মিশে রয়েছে যে সাধারণভাবে এগুলোর স্বতন্ত্রতা নিরূপণ করতে সংশয়ের সৃষ্টি হয়।

মসজিদটি ৬৫.৯০ মি. (২১৬ ফুট) × ৫৩.৬৫ মি. (১৭৬ ফুট) আয়তনবিশিষ্ট। এ আয়তাকার পরিসীমার তিন পার্শ্বে প্রশস্ত ছাউনি বারান্দা এবং পশ্চিম পার্শ্বের শেষ প্রান্তে অতীব ঐশ্বর্যশালী জুল্লাহ নির্মিত হয়েছে। জুল্লাহব উপবে একটি সুউচ্চ গম্বুজ সংস্থাপিত। এর পরিকল্পনা দেখে বুঝা যায় যে আদর্শ মসজিদ পদ্ধতি হতে সবে এসেছে। তবে এটি অনুভব করা যায় যে আদি আদর্শ নকশার মসজিদের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণকে এখানে ঢেকে দিয়ে খিলানপথের সারিতে বিভক্ত করা হয়েছে এবং ৬৮টি 'বে'-এর সৃষ্টি করেছে। এ 'বে'-বর্গের উপরে ছোট ছোট গম্বুজ সংস্থাপিত হয়ে ছাদেব কাজ কবছে। এভাবে সমগ্র মসজিদ প্রাঙ্গণ বিশাল থাম সংবলিত মিলনায়তনে পবিণত হয়েছে (ভূমি নকশা নং- ৪২)।
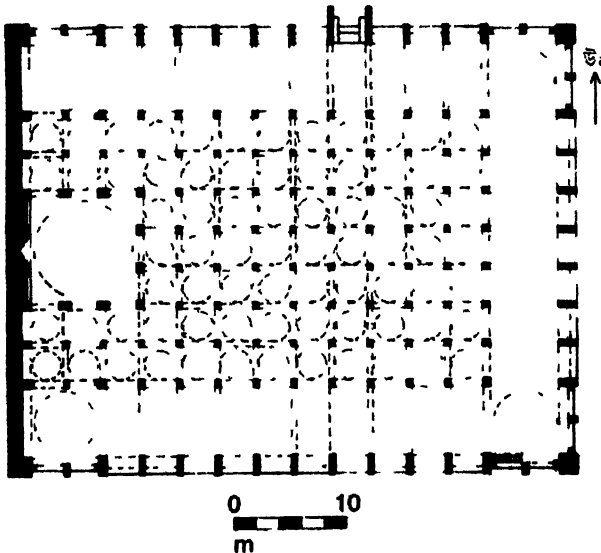
ভূমি নকশা নং-৪২ : গুলবর্গা জামি মসজিদ

এ মসজিদের বিভিন্ন অংশ গঠনে মৌলিক বৈশিষ্ট্য ছাড়াও বিভিন্ন অংশের অভিনবত্ব উল্লেখযোগ্য এবং এতে কিছু নতুন প্রবর্তন ও প্রযুক্তিময় বৈশিষ্ট্য যোগ হয়েছে। বাইরের দিক দিয়ে এর চেহারার প্রধান আকর্ষণীয় বস্তু হিসেবে গম্বুজের অবস্থান লক্ষ করা যায়। সুউচ্চ

ও শক্তিশালী বর্গাকার ক্লেরেস্টরির (clerestory) উপর গম্বুজ স্থাপনের মধ্য দিয়ে একে অতিশয় জাঁকালো ও মর্যাদা দান করেছে। এর গোলার্ধকার ঘনত্বের পুনরাবৃত্তি ছোট আকারে প্রতি কোনায় প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট গম্বুজের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে (চিত্র নং- ৬৪)।

অভ্যন্তর ভাগের নির্মাণ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে কেন্দ্রীয় গম্বুজ যুক্তিমূলক ও শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও সার্থকতা অর্জন করেছে। কেননা স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে গঠিত ক্লেরেস্টরির উপরের ভার বহনের ব্যবস্থা রয়েছে। অভ্যন্তরের কিছু কিছু খিলান ঐশ্বর্যশালী করে ফুল ও লতাপাতার কাজ দ্বারা চমৎকারিত্ব বৃদ্ধি করা হয়েছে। এতে অন্যান্য নির্মাণ পদ্ধতির ব্যবহার খিলান তলছাদে দৃষ্ট হয় যেমন- উপর দিয়ে ভাসমান গাঁথুনি এবং ছাউনিযুক্ত বারান্দার প্রশস্ত খিলানে ঢেউখেলানো ধনুকাকৃতির প্রয়োগের মাধ্যমে আর একটি নতুন পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছে।

এসব প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এটি বাস্তব হয়ে উঠেছে যে বহুদিনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতার প্রকৌশল মিশ্রিত জ্ঞান আহরণের মধ্য দিয়ে এ পর্যায়ে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছিল। এসব সফলতার মধ্যে নিঃসন্দেহে অত্যন্ত উৎকর্ষ মনে রাখার মতো হচ্ছে অভ্যন্তরের ছাউনি বারান্দার নির্মাণ প্রণালী। সচরাচর যেরূপ থাম সংবলিত খিলানপথ নির্মাণ হয়ে থাকে এখানে সেরূপ না হয়ে একক অতি প্রশস্ত পরিসরের খিলানপথ, নিচু অপ্রচলিত খুঁটি বা ভারবাহক ব্যবহার করা হয়েছে যদিও এ নির্মাণ কাজ খুব পরিচিত নয়, তথাপি সামগ্রিকভাবে দেখতে ঐশ্বর্যশালী ও মনোরম বলেই মনে হয় (চিত্র নং- ৬৫)।

গুলবর্গার এ মসজিদের বাহ্যিক অবয়ব নিয়ন্ত্রিত, সংযত ও রাশভারী এবং গুরুভার বলে মনে করা যেতে পারে। এর সমতলপৃষ্ঠ খোলাখুলি পিণ্ড ও স্তূপাকার; এমনকি আবেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যে খিলান পথগুলোর পরিসরও অনুরূপ মনে হয়। এর খাঁজকাটা গম্বুজ বর্গাকার উপকাঠামোর উপর থেকে সকল ভারসাম্যতা রক্ষা পেয়েছে বলে মনে করা যায়। যদিও অংশ গঠনে পিণ্ডত্ব ও স্তূপের আকার, তথাপি আলো-বাতাসের সঞ্চালন বাধাপ্রাপ্ত হয় নি; কেননা এর বিভিন্ন অংশের সুন্দর সুষমতা ও বর্ণালী নকশা সম্মত রেখা দ্বারা নির্দেশিত হয়েছে।

উত্তর দিকের মধ্যবর্তী স্থানে প্রধান প্রবেশপথ অবস্থিত।[৩] এ সুউচ্চ চমৎকার খিলানপথ নিপুণভাবে সমস্ত অবয়বের কঠোর প্রতিসম অবস্থা ভঙ্গ করে পরিচালকের ন্যায় অবস্থান নিয়েছে। এ খিলানপথের খিলানগুলোর মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলে অভ্যন্তরে যথানুপাতিক বর্গাকার 'বে' যা উভয় দিক হতেই আড়াআড়িভাবে অবস্থিত। এর নিয়তাকার অপরিবর্তনীয় থামগুলোও ধনুকাকৃতি তলছাদ খিলানবিশিষ্ট ও সমন্বয়পূর্ণ রয়ে পবিত্র মর্যাদার ধারণা প্রদান করে।

এর ছাউনি বারান্দার অস্বাভাবিকভাবে প্রশস্ত খিলানশ্রেণীতে কিছু অযৌক্তিকতা রয়েছে এবং সে যুগে এ নির্মাণ প্রক্রিয়া বলিষ্ঠ ও দুঃসাহসিকও বটে।[৪] এর সমগ্র অংশ গঠনে আদিত্ব ও ক্ষমতা সম্পন্নতা প্রদর্শিত হয়েছে ঠিকই, তবে সম্পূর্ণতায় কোনো বিশিষ্ট সৌন্দর্যবোধক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হতে পারে নি। অন্যপক্ষে এতে শৈল্পিক সৌন্দর্যতার চেয়ে বুদ্ধিবৃত্তির মাহাত্ম্য বেশি প্রকাশ পেয়েছে। প্রকৃতপক্ষে দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য পদ্ধতির প্রভাব সৃষ্টির জন্যই কেবল ক্ষমতায় উৎপাদিত একটি ইমারতরূপে একে চিহ্নিত করা যেতে পারে। কেননা পরবর্তী সময়ে দেখা গিয়েছে যে এ মসজিদের বিভিন্ন অংশের নকশা পরিকল্পনার অনুসরণে এ অঞ্চলে মসজিদ ও মাকবারা নির্মিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে গম্বুজের ভার ক্লেরেস্টরির উপর স্থাপন প্রযুক্তি এ অঞ্চলের স্থাপত্য নির্মাণে একটি

উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়েছিল। এমনকি ছাউনি বারান্দার খিলানে প্রশস্ত ও নিচু খুঁটি বা ভারবাহক ব্যবস্থা পরবর্তীকালের নির্মিত ইমারতগুলোর মূল বৈশিষ্ট্যে পরিণত হতে দেখা গিয়েছে।

এ মসজিদ সম্পর্কে অনেক মন্তব্য করার অবকাশ রয়েছে, কেননা এটি নিঃসন্দেহে রীতিগতভাবে উন্মুক্ত ধরনের মসজিদের চেয়ে নতুন প্রবর্তন উপহার দিয়েছে। এর নির্মাণ বৈশিষ্ট্য ভারতে খুব একটা জনপ্রিয়তা লাভে সমর্থ হয় নি। কারণ এটি ইসলামের আদি মসজিদের নকশার অনুকরণে নির্মিত না হওয়ায় এ ধরনের পদ্ধতি মসজিদ নির্মাণে তেমন গুরুত্ব পায় নি। তাই এটি মুসলিম ঐতিহ্যবাহী আদর্শরূপে গৃহীত হয় নি। তথাপি পরবর্তীকালে ফিরোজশাহ তোঘলকের রাজত্বকালে দিল্লিতে এ আদলে দুটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল- একটি কালি মসজিদ (১৩৭০ খ্রি.) ও অন্যটি খিরকী মসজিদ (১৩৭৫ খ্রি.)।

বলা বাহুল্য এ দু' মসজিদ আবৃত ধরনের মসজিদ হলেও উক্ত বাধানিষেধের কিছু মীমাংসা করা হয়েছিল। এখানে কেন্দ্রীয় প্রশস্ত পরিসর অতিক্রম করে ক্রুশাকারে খিলানপথ সৃষ্টি করে এবং এতে মাঝখানে যে প্রাঙ্গণ সৃষ্টি হয়েছিল সেটি গুলবর্গার মসজিদের প্রধান আপত্তি সম্পূর্ণভাবে আবৃত করে নির্মাণের অভিযোগ খণ্ডিত হয়েছে।

বাহমনী যুগের অবশিষ্ট স্মৃতিসৌধগুলো শাসকদের মাকবারাসমূহ যা পঞ্চাশ বছর সময়ব্যাপী সাতটি মাকবারা দুটি আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে নির্মিত হয়েছিল। সর্বপ্রথম যে মাকবারা নির্মিত হয়েছিল সেটি এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা শাসকের। তুলনামূলকভাবে এটি ছোট আকারের ও সাদাসিধা ধরনের। এটি প্রথম সফল অভিযানকারীর স্মৃতিফলক মাত্র। অবশ্য তখন সাম্রাজ্য সবেমাত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং স্থাপত্য অনুশীলনের কেবল সূচনালগ্ন ছিল।

তার মৃত্যুর পর ১৩৫৮ খ্রিস্টাব্দে এ সমাধিসৌধের কাজ শুরু হয়েছিল। এর স্থাপত্য অংশ উপকরণগুলো যেমন- সচ্ছিদ্র প্রাচীর (battlemented wall), গভীর খিলানপথ (sunken archways), সচ্ছিদ্র বপ্র (battlemented parapet), খাঁজকাটা চূড়া (fluted finials) ও নিচু গম্বুজ। এসব নমুনা প্রথম যুগের দিল্লির তোঘলক সুলতানদের মাকবারার স্থাপত্যের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। পক্ষান্তরে ঐ সব প্রণালী হতে বাহমনীর প্রথম শাসক তথা দিল্লি প্রশাসনের ভূতপূর্ব কর্মচারীর মাকবারাটি রূপ পেয়েছিল।

বাহমনী সুলতানদের এ ধরনের অপর দুটি মাকবার রয়েছে। এগুলোর নির্মাণ পদ্ধতি প্রায় একইরূপ ছিল। তবে দ্বিতীয় মোহাম্মদের (মৃত্যু ১৩৯৭ খ্রি.) মাকবারায় কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা যায় যেমন- এর গম্বুজটি গোড়ার দিকে কিছুটা উত্থিত এবং খাঁজকাটা। এটি খাঁজকাটা প্রভাবে সমৃদ্ধ ছিল। অবশ্য এর সামনের মসজিদেই অনুরূপ পদ্ধতির সূচনা হয়েছে।

অপর আর একটি বাহমনী মাকবারার দল 'হাফ্‌তে গোমবাজ' বা সাত গম্বুজ (seven domes) নামে পরিচিত। এতে চারজন সুলতানের মাকবারা রয়েছে। এদের প্রথমটি মুজাহিদ বাহমন শাহের, তিনি ১৩৭৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এটি তোঘলক বৈশিষ্ট্য সংবলিত পূর্ববর্তী শ্রেণীর মাকবারার মতোই রূপ পরিগ্রহ করেছে। তবে এর আকার অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। আবার এ দলের তিনটি হাফ্‌তে গম্বুজ বা সাত গম্বুজী মাকবারা মুজাহিদ বাহমন শাহের মাকবারার বৈশিষ্ট্য হতে ভিন্নতর না হলেও অন্যদিক দিয়ে অনন্য সাধারণ ছিল। তা হচ্ছে এদের স্থাপত্যিক বিন্যাসভঙ্গি যা আর অন্য কোথাও দেখা যায় না। এ মাকবারাগুলো দ্বিগুণ আকারের দুটি শবাধার নিয়ে গঠিত হয়েছে। এদের একটি মাকবারাতে সুলতান এবং অন্যগুলোতে তার পরিবারের সদস্যদের সমাহিত করা হয়েছে।

এ দ্বিজ শবাধার সংবলিত মাকবারার মধ্যে সুন্দরতম হচ্ছে বাহমনী বংশের শেষ সুলতান তাজ উদ্দিন ফিরোজের মাকবারা। তিনি গুলবর্গা হতেই শাসনকার্য পরিচালনা করতেন এবং ১৪২২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এ বৃহৎ চিত্তাকর্ষক স্মৃতিসৌধ দাক্ষিণাত্যের মাকবারা নির্মাণ প্রযুক্তির তৎপ্রচলিত পদ্ধতি হতে কিছুটা উৎকর্ষ সাধনের তথ্যমূলক চিহ্ন বহন করছে। তিনি যে তার পূর্বপুরুষদের চেয়ে ক্ষমতাবান জাঁকজমকপূর্ণ ও ঐশ্বর্যে উৎকৃষ্টতর ও শ্রেষ্টতর ছিলেন এ মাকবারাই তার সাক্ষ্য বহন করছে। তার ব্যক্তিগত জীবনযাপন যে জাঁকজমকপূর্ণ ছিল এ মাকবারাই তার সর্বোৎকৃষ্ট প্রমাণ।

এর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে তোঘলক স্থাপত্য পদ্ধতির সম্প্রসারিত উন্নয়ন লক্ষ করা যায়। এর নির্মাণ পরিকল্পনায় পরিবেশগত পরিবর্তনের কারণে কিছু কিছু আদি বৈশিষ্ট্যের সংযোগ ঘটেছিল। এর বহিস্থ আয়তন ৪৮.২০ মি. (১৫৮ ফুট) × ২৩.৮০ মি. (৭৮ ফুট) এবং উন্নত বপ্রসহ দেয়ালের উচ্চতা প্রায় ১২.৮০ মি. (৪২ ফুট)। এর উপরে এক সমান মাপের গোলার্ধ গম্বুজ ৯.১৫ মি. (৩০ ফুট) উচ্চতা পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। এর সর্বমোট উচ্চতা দু তলার সমান। এর প্রতিটি কুলঙ্গি বা বন্ধ খিলান দ্বারা খিলানশ্রেণী বা তোরণ গঠিত হয়েছে। অবশ্য এগুলো কিছু সচ্ছিদ্র আলঙ্কারিক পরদাযুক্ত হয়েছে। উন্নত বপ্রের উপর দিয়ে লতাপাতাযুক্ত মার্লন এবং প্রতি কোনায় ছোট আকারের খাঁজকাটা চূড়া সংযোজিত। অন্যপক্ষে গম্বুজ পিপার চতুর্দিকে পত্র ও পুষ্প নকশা অলঙ্করণ এর শোভাবর্ধন করছে।

এর অভ্যন্তর ভাগে প্রতিটি বর্গাকার শবাধার প্রকোষ্ঠের দেয়াল দুতলা বিশিষ্ট খিলানশ্রেণী দ্বারা গঠিত। উপর তলার কোনার ফাঁকা স্থান স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে (squinch system) ভরাটকৃত। এ স্কুইঞ্চের উপর ভর করে অত্যন্ত উৎকৃষ্টভাবে অলঙ্কৃত খাঁজকাটা গম্বুজ অবস্থান করছে। এর নির্মাণ স্থাপত্যরীতি এবং প্রাচুর্যময় ঢালাই অলঙ্করণ এককভাবে ফিরোজশাহ তোঘলকের মাকবারার অনুরূপ আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে যা তখন হতে ত্রিশ বছর পূর্বে দিল্লিতে নির্মিত হয়েছিল।

বিদার (১৪২২-১৫১২ খ্রি.) :

দাক্ষিণাত্যে দ্বিতীয় যুগের স্থাপত্য অনুশীলন শুরু হয়েছিল আহমদ শাহের স্থাপত্যকর্মের মধ্য দিয়ে (১৪২২ খ্রি.-১৪৩৬ খ্রি.)। এ বংশের নবম সুলতান ১৪২২ খ্রিস্টাব্দে গুলবর্গা হতে রাজধানী বিদারে যখন স্থানান্তর করেন তখনই এর সূত্রপাত হয়েছিল। রাজধানী পরিবর্তনের কারণে ইমারত শিল্প গড়ার আবেগ ও প্রেরণা এসেছিল এর সাথে অবশ্য প্রয়োজনও যোগ হয়েছিল।

বলা বাহুল্য বাহমনী যুগে দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য আন্দোলনে প্রধান ও উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক নির্মাণগুলো বাহমনী রাজত্বকালেই বিদারে প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছিল। এ সময়ে নির্মিত দুর্গ, রাজপ্রাসাদ দুটি দুর্গের অভ্যন্তরে দুটি মসজিদ, একটি কলেজ বা মাদ্রাসা এবং রাজকীয় মাকবারাগুলোই প্রধান। বিদারের দুর্গ এলাকা গুলবর্গার দুর্গের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ছিল। এমনকি এর কিছু কিছু স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য চমকপ্রদ ছিল। তবে এটি অধিকাংশে দুর্গ নির্মাণের সাধাবণ মূলরীতিনীতি অনুসরণ করে নির্মিত্ত হয়েছিল।

প্রথম যুগের বাহমনী রাজধানীর একেবারে অসাদৃশ্যতায় নতুন রাজধানী বিদারের অভ্যন্তরভাগ সাজানোর আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণভাবে নবরূপ ছিল। তবে বিদারে রাজপ্রাসাদ এবং অন্যান্য ইমারতাদি দুর্গাভ্যন্তরেই নির্মিত হয়েছিল। এটি এখন প্রায় কালের করস্পর্শে বিলীন হয়ে গিয়েছে। তবে দুভার্গ্যজনক ও শোচনীয় ধ্বংসাবশেষগুলো এখনো শনাক্ত করা

যায়। এটি দেখে নির্মাণ পদ্ধতি ও এমনকি ব্যবহারের রকমফের কিছু পরিমাণে নির্ণয় করা যায়।

এ দুর্গ ইমারতগুলো রাজপ্রাসাদ নিয়েই প্রধানত গঠিত হয়েছে। তবে এগুলোর নাম ব্যবহারের বিভিন্নতা, বৈশিষ্ট্য ও নকশা পরিকল্পনা অবলোকন করে শনাক্ত ও নির্ধারণ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়; রঙিন মহল একটি বৃহৎ জাঁকালো ইমারত এবং এর অনুরূপ নাম এ জন্য দেয়া হয়েছে যে এটি মূলত রঙ দ্বারা সজ্জিত ছিল। অপর আরো একটি সুন্দর ইমারত যার নাম দেয়া হয়েছে জানানা মহল। অবশ্য এর নাম দ্বারাই এর ব্যবহারিক পরিচয় বুঝা যায়।

অন্যপক্ষে তখ্‌ত মহল বা দরবার হল, দিওয়ান ই-আম বা জনসমাবেশের মিলনায়তন ইত্যাদি মনে করা যেতে পারে। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রকারের রাজকীয় ইমারত এদের বিশেষ উদ্দেশ্য অনুসারে পরিকল্পিত ও সজ্জিত হয়েছিল। জলপ্রবাহ হয়তো তাদের জীবনে একটা প্রাত্যহিক প্রয়োজনীয় বস্তুর অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে জল প্রাসাদ নির্মাণ করা হয়েছিল। হয়তো এটি এ যুগের শহরে পানি বিতরণ কেন্দ্র অনুরূপও হতে পারে। নগরীর মধ্যে পুকুর, ফোয়ারা, অলঙ্কৃত উদ্যান এবং সুন্দর সজ্জিত হাম্মামখানা বা স্নানাগার নির্মিত হয়েছিল।

চূর্ণবিচূর্ণ রাজপ্রাসাদগুলোর ধ্বংসাবশেষ অবলোকন করে বুঝা যায় যে তাদের ইমারত নির্মাণের কোনো ঐতিহ্য ছিল না এবং যারা এগুলো নির্মাণ করেছিল বা নির্মাণকার্যে নিয়োজিত ছিল তারা এর তত্ত্বাবধানের সময় অন্যদিকে দৃষ্টি প্রসারিত রেখেছিল এবং বিশেষভাবে পারস্যের স্থাপত্য আদর্শের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। এভাবে দেখা যায় যে বিদারে যে স্থাপত্য আদর্শ অনুসরণ করা হয়েছিল তা মূলতঃ পারস্য স্থাপত্যধারা। তবে এটি খাঁটি ইরানি পদ্ধতি-প্রণালী প্রয়োগ করতে গিয়েও ঠিক পারস্য স্থাপত্য না হয়ে অনুশীলনের সময় ইরানি আদর্শের কিছুটা পরিবর্তি প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ইরানি স্থাপত্যে পরিণত হয়েছিল। এখানকার প্রতিটি স্থাপত্য কাঠামোর বহুলাংশে পারস্য থেকে ধার করা আকার ও নকশার পুনরাবৃত্তি ঘটানো হয়েছে। এর পরেও দেখা যায় যে, ভারতীয় রাজধানীর দরবারিক চাহিদামাফিক প্রয়োজনীয় সুবিধা-অসুবিধা বিবেচনা করতে গিয়ে ইরানের হুবহু অনুকরণ করা হয় নি। তবে ইরানি স্থাপত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য রঙের ব্যবহার এবং রঙের অলঙ্করণ এখানে যথেচ্ছায় ও স্বাধীনভাবে ইমারতের পৃষ্ঠদেশ সজ্জায়নে ব্যবহৃত হতে দেখা গিয়েছে।

বিদারে যে প্রাসাদগুলো জাঁকজমকপূর্ণ করতে হয়েছিল সেগুলোকে উজ্জ্বল রঙ পরিকল্পনার আওতায় আনা হয়েছিল, সেগুলো ইমারতের দেয়াল চিত্রণ ও রঙিন টালি ব্যবহারের প্রবণতায় সমৃদ্ধ হয়ে এখনো বিরাজমান। রঙিন মহলের সজ্জায়নে রঙিন টালির কাজে সজ্জিত করা হয়েছিল বুঝা যায়। এ ছাড়াও এখানে চকচকে মোজাইক ও আরব্য নকশা নমুনার অলঙ্করণ পরিদৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য এ জাতীয় একেবারে প্রস্তুত নকশাযুক্ত টালি সরাসরি এর উৎস কেন্দ্র উত্তর পারস্যের সে যুগের বিখ্যাত শহর কাশান হতে আমদানি করা হয়েছিল। এর প্রতিটি টালিতে উৎপত্তিস্থলের নাম লিপিবদ্ধকরণ থেকে তা অনুধাবন করা যায়।

এসব রাজপ্রাসাদের পর বিদারের উল্লেখ্যযোগ্য স্থাপত্য কাঠামো হচ্ছে দুটি মসজিদ। তবে এদের কাঠামোও গঠনপদ্ধতি নির্মাণের ব্যবহারিক প্রক্রিয়ায় প্রাসাদ হতে কিছুটা ভিন্নতা দৃষ্ট হয়। ধর্মনিরপেক্ষ ও ধর্মীয় স্থাপত্য কাঠামোর মাঝে যে ব্যবধান তা বুঝার মতো করেই এগুলোর নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষ ইমারতগুলোর কাঠামো কল্পনাপ্রসূত ও

অধিক চাকচিক্যময়, পক্ষান্তরে ধর্মীয় ইমারতগুলোর কাঠামো সাদাসিধা, দেখতে মলিনভাব এবং প্রায় কঠোরতাপূর্ণ ভারী ও গম্ভীর আকারের। এ দু শ্রেণীর স্থাপত্য কাঠামো বাস্তবে একটা সংঘাতের প্রতিফলন রেখে গিয়েছে। মূলত দরবারগৃহ বা প্রশাসনের জন্য ইমারতগুলো রঙ প্রাচুর্যময়তায় সাড়ম্বর দৃশ্য সৃষ্টি করেছে। আবার মসজিদ সারল্যপূর্ণ নিস্তব্ধতার পবিত্র ধর্মবিশ্বাসের নীরব প্রতিচ্ছবিতে মহীয়ান হয়ে উঠেছিল এবং সবকিছু মেনে সে দিনের রাজধানী শহর বিদার।

বিদারের জামে মসজিদ :

ধর্মীয় পাদপীঠ হিসেবে দু'টি জামি মসজিদের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। এর একটি ষোল খাম্বা নামে পরিচিত। মসজিদের সম্মুখ দেয়াল ভেদ করে বাইর হতেই ষোলটি গোলাকৃতির থাম দৃশ্যমান হওয়ায় এর নামকরণ হয়েছে ষোল খাম্বা মসজিদ।[৫] দুটি মসজিদের অবয়ব বা চেহারা প্রশান্তিদায়ক ও গম্ভীর প্রকৃতির। এ মসজিদদ্বয়ের গঠন বৈশিষ্ট্য গুলবর্গা মসজিদের আবৃত বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবিত হয় নি। বিদারের মসজিদ দুটির গঠন কাঠামোর মধ্য দিয়ে যেন আদর্শ মসজিদের সনাতনীরূপ ফিরে এসেছিল। এখানে মসজিদের সম্মুখভাগে খোলা প্রাঙ্গণ, থাম সংবলিত জুল্লাহ এবং বিশেষ ধরনের নেভের উপরে গম্বুজ উপস্থাপিত হয়েছে।

ভূমি নকশা নং-৪৩ : বিদারের জামি মসজিদ

আয়তাকার ভূমি পরিকল্পনায় নির্মিত এ মসজিদটির পরিমিতি উত্তর-দক্ষিণে ৮৯-৮০ মি. (২৯৫ ফুট) এবং পূর্ব-পশ্চিমে ২৩.৪৬ মি. (৭৭ ফুট)। মসজিদের নামাজঘরটি চারসারি স্তম্ভের দ্বারা পাঁচ আইলে বিভক্ত। স্তম্ভগুলো বর্তুলাকার এবং অতি মসৃণ হওয়ায় নান্দনিক দৃশ্যের অবতারণা করেছে। ভারতের মুসলিম স্থাপত্যে মালোয়ার হাওয়া মহলে সর্বপ্রথম এ ধরনের গোলাকৃতির স্তম্ভের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। কেন্দ্রীয় মিহরাবের সম্মুখে অষ্টভুজাকার কাঠামোর উপর নির্মিত ষোল পার্শ্ববিশিষ্ট একটি পিপার উপর প্রতিষ্ঠিত স্টিলটেড গম্বুজ দাক্ষিণাত্যের নির্মাণ রীতিরই পরিচয় বহন করছে (ভূমি নকশা নং- ৪৩)।
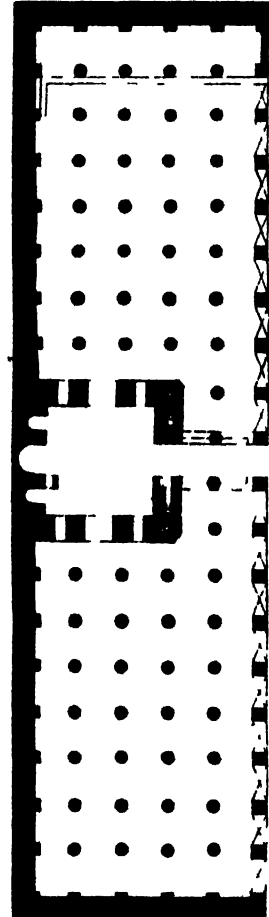
মাহমুদ গাওয়ানের মাদ্রাসা :

বিদারের অপর একটি ইমারতে অসংখ্য বহিরাগত স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। এটি কলেজ বা মাদ্রাসা। এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নির্মাতা মাহমুদ গাওয়ান বাহমনী বংশের শাসক তৃতীয় মোহাম্মদের মন্ত্রী ছিলেন। পারস্যবাসী এ বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তির উত্থান, প্রভাব, প্রতিপত্তি এবং

বিয়োগান্ত সমাপ্তির কারণে তাঁকে দাক্ষিণাত্যের কার্ডিনাল উলছি (cardinal wolsey) বলা হয়ে থাকে এবং তাঁর বিষাদপূর্ণ জীবন প্রবাহের ঘটনা বিখ্যাত এক ইংরেজ কূটনীতিবিদের জীবনের মতোই ভয়াবহ, দুঃখজনক ও বেদনাদায়ক।[৬]

একজন বিদ্যানুরাগী পণ্ডিত ব্যক্তি হিসেবে তিনি এ দেশে বৃহৎ শিক্ষা পাদপীঠ গড়ে তুলেছিলেন। তিনি তাঁর দেশে যে শিক্ষা লাভ করেছিলেন এবং মাদ্রাসা বা কলেজ দেখেছিলেন এখানেও তার হুবহু প্রতিরূপ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপী ইমারত নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। এটি স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে তার প্রস্তাবিত পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কেবল নকশা পরিকল্পনা পারস্য প্রভাবপুষ্ট করে নি, এমনকি এর প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী ও কারিগর স্বদেশ হতে আনয়ন করে বিদারকে ভারতে পারস্যের স্থাপত্যধারায় পরিণত করেছিলেন।

তাব দেখা সে মাদ্রাসার নকশা পরিকল্পনাটি দাক্ষিণাত্যের রাজধানীতে বাস্তবায়ন করতে এর কোনো প্রকার আকারত্ব বা গুণাগুণ পরিবর্তন ছাড়াই নির্মিত হয়ে বিদারে একটা শিক্ষাব নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করেছিলেন। এখানে একটি ইসলামি কলেজ, বক্তৃতা মিলনায়তন, পাঠাগার ও মসজিদসহ অধ্যাপক ও ছাত্রদের আবাসিক গৃহ নির্মাণ করেছিলেন। একে আরো মনোরম কবাব জন্য পারস্যের বিভিন্ন নগরীতে বিদ্যমান বিশ্ববিদ্যালয় ভবনের অনুরূপ স্থাপত্যিক গঠন প্রণালী ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে মর্যাদাপূর্ণভাবে নির্মাণ করেন। এসব তথ্যের ওপর নির্ভর করে সংক্ষেপে বলা যায় যে সমরখন্দের বিজিমস্তান শহর সশবীরে এখানে এসে হাজির হযেছে।[৭]

বর্তমান সময়ে ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত এসব স্থাপত্যকর্ম পরবর্তী উত্থান-পতন সত্ত্বেও এর নকশা পরিকল্পনার আয়োজন দেখে কলেজের অবস্থান ও অস্তিত্ব পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়। এটি ৭১.৬৫ মি. (২৩৫ ফুট) × ৫৪.৯০ মি. (১৮০ ফুট) আয়তনবিশিষ্ট আয়তাকাব পরিকল্পনায় নির্মিত (ভূমি নকশা নং-৪৪) । প্রচলিত প্রথানুসারে এব কেন্দ্র চতুষ্কোণ সমতল
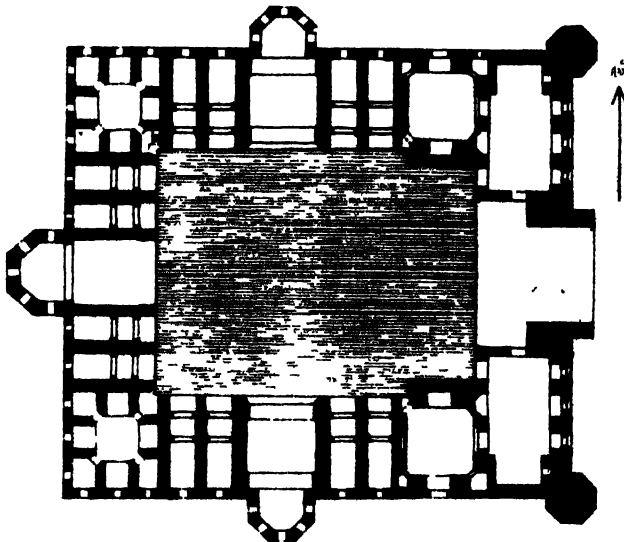
ভূমি নকশা নং-৪৪ : মাহমুদ গাওয়ানের মাদ্রাসা

ক্ষেত্র এবং এর উন্মুক্ত মিলনায়তন ও প্রকোষ্ঠগুলো ঘুরে চতুর্দিকে নির্মিত হয়েছিল। বহির্দিক দিয়ে এর গঠন কাঠামো অবলোকন করলে দেখা যায় যে তিন দিকের মধ্যবর্তী স্থলের সম্মুখ দিকে প্রলম্বিত অর্ধ-অষ্টভুজাকৃতির কাঠামো অভিক্ষিপ্ত হয়ে মানানসই উচ্চতায় উন্নীত হয়ে তাতার (tartar) ধরনের গম্বুজ ধারণ করে রয়েছে। আর এর চতুষ্পার্শ্ব বরাবর সম্মুখ দেয়াল নির্মিত হয়েছে। এরই মধ্য দিয়ে প্রবেশপথ রচিত হয়েছে। এ প্রবেশপথের পার্শ্ব দিয়ে দুটি ও প্রতিকোনায় সংযোজিত একটি করে মিনার তিন পর্যায়ে বা স্তরে নির্মিত।

ইমারতের বাইরের দিক দিয়ে উচ্চতা তিন তলার সমান যা খিলানায়িত খোলা জানালা দ্বারা সজ্জিত এবং এ সবের উপর দিয়ে প্রশস্ত উন্নত বপ্র নির্মিত হয়েছে। তবে একে একেবারে পারস্য ঐতিহ্যবাহী ইমারত হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। এর অংশ গঠনে ও আকারত্বে অনেক স্থাপত্য পদ্ধতির রকমারি সমাবেশ ঘটেছে। এর দৃশ্যমান কঠিন এবং বায়ুবীয় অংশের বিভাজনের বা ইমারতের আলো ও ছায়া সঞ্চালন পারস্য স্থাপত্য প্রণালীর অনুরূপ হতে পারে নি। তবে ইমারতের পৃষ্ঠদেশ পরিচর্যা কার্যকর হতে পেরেছিল এবং এ কাজের উপযোগী করেই বিশেষভাবে দেয়ালগুলো নির্মিত হয়েছিল।

ইমারতের দেয়ালপৃষ্ঠ সজ্জায়নের জন্য রঙের ব্যবহার বেশি প্রাধান্য পেয়েছিল। বলা চলে এটি রঙ নির্ভরশীল প্রকল্প ছিল। এ সজ্জায়ন উজ্জ্বল রঙ করা চকচকে টালির সাহায্যে সম্পাদিত হত। পদ্ধতি অনুসারে প্রতিটি সম্মুখ দেয়াল অংশ পদ্ধতির নির্ধারিত নমুনা অনুসারে খচিত করা হয়েছিল। এ পরিকল্পনার মধ্যে সবুজ ও হলুদ রঙের প্রাধান্য বেশি ছিল যা অন্য রঙকে প্রভাবিত করেছে। এগুলোতে যে নকশা বা ডিজাইন ব্যবহৃত হয়েছে তাতে প্রধানত পুষ্পপত্র ও প্রচলিত আরব্য নকশার প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। এ ছাড়া উন্নত বপ্রের প্রশস্ত সমতলপৃষ্ঠ অক্ষর সাজিয়ে লেখ নকশায় সুন্দরভাবে সজ্জিত করে ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এ অক্ষর সজ্জায়ন কাজটি দক্ষ ক্যালিগ্রাফিক বা লেখ সজ্জায়নের অভিজ্ঞ শিল্পীদের দ্বারা চমৎকার ও মনোমুগ্ধকরভাবে নিষ্পন্ন হয়েছিল। বলা বাহুল্য এ অক্ষর সজ্জায়ন পৃষ্ঠদেশ অংশ বোর্ডের মতো তিন ফুট উচ্চতাবিশিষ্ট ছিল।

এটি আবো লক্ষ করা যায় যে ইমারতের ভিত্তি প্রদানের সময় আর্দ্রতা নিরোধক প্রক্রিয়া হিসেবে সীসার পাত গাঁথুনির মাঝে প্রয়োগ করা হয়েছিল যাতে এ সীসার পাত গাঁথুনির মধ্যে নিচু হতে আসা আর্দ্রতাকে উপরের গাঁথুনিতে উঠ্তে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। পৌঁছতে না পারে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে রঙের চাকচিক্য নষ্ট হয় নি, এটি অক্ষুণ্ন রয়ে এখনো রঙের উজ্জ্বলতা কিছুটা মলিন হয়ে টিকে রয়েছে।

এ প্রণালীতে নির্মিত ইমারতগুলো প্রশংসারযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও এটি প্রকৃত স্থাপত্যরীতির কিছুটা বিপরীতরূপে প্রতীয়মান হচ্ছে বলে পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন।[৮] কেননা এতে দেখা যায় যে সজ্জায়ন কর্মকাণ্ড কাঠামো নির্মাণ কাজের ওপর কর্তৃত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছে। ফলে এখানে যা সৃষ্টি হয়েছে তা ইমারতের কাঠামো গঠনের পটভূমি মাত্র। এটি যেন দ্বিতীয় দায়িত্ব পালন করেছে এবং প্রাধান্যপূর্ণ দায়িত্ব সজ্জায়ন ও অলঙ্করণের ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। নির্মাতাদের অভিপ্রায়ণ ছিল ইমারতে শিল্প বা অলঙ্করণ রীতিতে বেশি প্রাধান্য দেয়া। মাহমুদ গাওয়ানের মাদ্রাসা নির্মাণের পূর্বে বা এর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত হওয়ার পর বহিরাগত অনুরূপ পদ্ধতিতে একটি ইমারত নির্মিত হয়েছিল। তবে এটি বিদারে না হয়ে দৌলতাবাদ দুর্গের পাদমূলে নির্মিত হয়েছিল।

চাঁদ মিনার :

১৪৩৫ খ্রিস্টাব্দে চমৎকার স্থাপত্যিক ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে এ মিনারটি নির্মিত হয়েছিল। তখন পর্যন্ত মিনারকে বিজয়স্তম্ভ হিসেবে কেবলমাত্র আত্মপ্রকাশ হতে দেখা গিয়েছিল। তবে এ অঞ্চলে এখানেই প্রথম মিনার মসজিদ স্থাপত্যের অংশ হিসেবে গড়ে উঠেছিল। সাধারণ আকারের এ মিনারটি গাওয়ানের মাদ্রাসা ব্যবহৃত স্থাপত্যরীতি হতে কিছুটা সরে এসে সুদূরের অন্য একটি স্থাপত্য উৎস দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার লক্ষণ প্রকাশমান করছে এবং তা টাইগ্রিস ও বাগদাদের গিল্টি করা গম্বুজের প্রভাবময় বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছিল। এ থেকে অনুমান করা যায় যে এটি নির্মাণে যে স্থপতি ও কারিগরগণ নিয়োজিত হয়েছিল তারা বাগদাদ অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা এর নির্মাণ কাজে লাগিয়েছিল। ভালোভাবে পর্যবেক্ষণে বুঝা যায় যে এটি কেবলমাত্র বহিরাগত প্রভাবযুক্ত নয়, এ দেশীয় অনেক পদ্ধতি ও বৈশিষ্ট্য দ্বারা প্রভাবপুষ্ট হয়ে অবশেষে একটা সংমিশ্রিত উপাদানে এটি নির্মিত হয়েছে। যার ফলে এ মিনাবের নকশা পরিকল্পনার সাথে ভারতের আর কোনো মিনারের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। এর ঝুলন্ত বারান্দা বা ব্যালকনিসমূহ ভারবাহক আলম্ব ও অন্যান্য বিবিধ ছোটখাটো গাঠনিক উপাদান ও উপকরণ ভারতীয় হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

এ মিনারটি ৩০.৫০ মি. (১০০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট হয়ে চার তলায় সমাপ্ত হয়েছে। এর তিনতলা গোলাকার, কিন্তু একটি তলার বেড় খাঁজকাটাভাবে নির্মিত ' মোটের ওপর এটি একটি মাধুর্যময় চমৎকার স্থাপত্যকর্ম যা দেখতে পাতলা সরু, কিন্তু স্থায়ী ধরনের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ সুঠাম স্থাপত্য।

বিদারে বাহমনী সুলতানদের আর যেসব স্থাপত্যকর্ম রয়েছে এগুলোর প্রায় সবই তাদের মাকবারা। যদিও এসব সমাধিসৌধ বিবিধ ধরনের তৎপ্রচলিত দেশীয় বৈশিষ্ট্য ধারণ করে রয়েছে তথাপি এগুলো স্থাপত্য উন্নয়ন ধারার চলমান অবস্থার প্রতিনিধিত্ব করছে। এগুলো দাক্ষিণাত্যে গড়ে ওঠা স্থাপত্যশিল্প রীতির বিকাশে বিভিন্ন সময়ে যে উৎকর্ষতা এসেছিল তার পদ্ধতি বিশ্লেষণে সহায়তা দান করছে।

এ শ্রেণীর রাজকীয় মাকবারার সংখ্যা হচ্ছে ১২ টি এবং এগুলো নির্মাণে প্রায় একই নির্মাণ রীতির প্রয়োগ ঘটেছে। এটি স্পষ্টভাবে বলা যায় যে প্রথম গুলবর্গায় চর্চিত স্থাপত্যরীতিই সম্প্রসারিত আকারে কেবলমাত্র প্রকাশমান হয়েছে। তবে সে সময়ের রীতির প্রচলিত অভ্যাস অনুসারে দুটি শবাধারের একত্র নির্মাণ এখানে দৃষ্ট হয় নি।

বিদারের প্রতিটি মাকবারা এক কক্ষবিশিষ্ট বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত। খাড়া দেয়াল ঘুরে একটির উপর আর একটি খিলান বিন্যস্ত হয়ে খিলানশ্রেণী রচিত। উন্নত বপ্রে সচ্ছিদ্র প্রাচীর ও প্রতি কোনায় চূড়া সংযোজিত। মাকবারার ছাদস্বরূপ অষ্টভুজাকৃতির পিপার উপর একটি গগনসদৃশ গম্বুজ সংস্থাপিত। পূর্ববর্তী মাকবারা স্থাপত্যে ব্যবহৃত গোলার্ধ আকারে এ গম্বুজটি নির্মিত নয়। তবে এটি খাঁজকাটা এবং গুলবর্গা মসজিদের সুউচ্চ গম্বুজের অনুকরণে নির্মিত। এ ছাড়া একটি অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে গম্বুজের তলা বা নিচের দিকের গোড়ার পরিবর্তন। বাহমনী মাকবারার কিছু কিছু গম্বুজ নির্মাণে এ পরিবর্তন প্রথম সূচিত হয়েছিল।

গম্বুজ স্থাপত্যের বিবর্তনের ধারায় এ পরিবর্তন পরবর্তীকালের স্থাপত্য কৌশলের জন্য একটা মূল্যবান তাৎপর্য বয়ে এনেছিল। এ নতুন প্রবর্তনে দেখা যায় যে গম্বুজের বক্রতা অংশে ঈষৎ চাপা আকার লক্ষ করা যায় । কাজেই এটি তাতার বা বাল্ব আকারের গম্বুজ

সৃষ্টির লক্ষণ এখানে প্রথম দানা বেঁধে ওঠে। পরবর্তীকালের ভারতীয় স্থাপত্য আন্দোলনে সর্বত্র এটি সাদরে গৃহীত হয়। বিদারে নির্মিত মাকবারাগুলোর অভ্যন্তর সজ্জায়ন ব্যবস্থা ও গাঁথুনির প্রক্রিয়া গুলবর্গার বাহমনী শাসকদের স্থাপত্যরীতির পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল।

তৎকালের এ ভারতীয় স্থাপত্য আন্দোলনে বিভিন্ন স্থাপত্য পদ্ধতির পাশাপাশি পারস্য স্থাপত্য প্রভাব একটি শক্তিশালী উপাদানরূপে সর্বত্র আধিপত্য বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল। কেননা এ পারস্যবাসী বা ভারতে প্রবাসী জীবনেও পারস্য ঐতিহ্য ভুলে যায় নি, বরং স্থাপত্য অনুশীলন ও অলঙ্করণে যে জাঁকজমকপূর্ণ রঙিন টালির কাজের সাক্ষ্য রেখে গেছে তা তাদের ধ্বংসাবশেষের মাঝে এখনো প্রত্যক্ষ করা যায়।

আলাউদ্দিন বাহমানশাহের ১৪৫৮ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যু হলে তাঁর দেহাবশেষের ওপর যে মাকবারা নির্মিত হয়েছিল তাতে আরব্য নকশা নমুনায় ষোড়শ শতাব্দীর ইরানি গালিচার উৎকৃষ্ট নকশার অনুকরণে অভিনব সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। মাকবাবা স্থাপত্য কার্যক্রম দাক্ষিণাত্যে বারিদশাহী বংশের শাসকদের অধীনে পূর্বের ঐতিহ্যবাহী ধারায় অব্যাহত ছিল। বিদারে এ বংশ ১৪৮৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৬১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিল। শহরের পশ্চিমাংশে তাদের সমাধিসৌধ নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ছিল। এসব সমাধিসৌধ শাসকের ব্যক্তিগত অভিরুচি ও সৌন্দর্যবোধের স্পষ্ট চিহ্ন ধারণ করে রয়েছে।

এ মাকবারাগুলোতে যে স্থাপত্য পদ্ধতির বিকাশের ছাপ ফুটে উঠেছে তা থেকে মাকবারায় শায়িত ব্যক্তির জাতিগত মূল শিকড় অবগত হতে কোন অসুবিধা হয় না। এগুলো ইরানি হলেও মূলত তুর্কি গোত্রীয় হতে এসেছিল। পারস্য স্থাপত্য বলতে বর্তমান ইরানকে কেবল বুঝায় না কারণ তখনকার পারস্য সংস্কৃতি ও স্থাপত্যধারা প্রায় এখনকার মধ্যপ্রাচ্যের আরব অঞ্চল বাদে উত্তর, পশ্চিম ও পূর্ব অঞ্চলটাতেই সম্প্রসারিত ছিল এবং বলা চলে যে এর সাংস্কৃতিক প্রভাবের আওতা এখনকার পশ্চিম এশিয়া জুড়ে ছিল। কাজেই বারিদশাহীরা যে স্থাপত্যধারার অনুশীলন করছিল তার সাংস্কৃতিক প্রভাবটা ইরান সম্পৃক্তই ছিল। মূল তুর্কিতেও যে স্থাপত্যধারা গড়ে উঠেছিল এতেও ইরানি প্রভাব বিদ্যমান রয়েছে।

এ শ্রেণীতে যেসব মাকবারা নির্মিত হয়েছিল তন্মধ্যে অটালি বারিদ শাহের মাকবারাটি সুন্দরতম। তিনি বংশের তৃতীয় শাসক ছিলেন এবং ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এর কাঠামো গঠন পূর্বের মাকবারাগুলোর মতো আবৃত ধরনের ছিল না। এটি সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত আকারে নির্মিত হয়েছিল। কাঠামোর চারপার্শ্বেই চারটি উন্মুক্ত খিলানপথ সংযোজিত ছিল। এর কবরফলক কৃষ্ণপ্রস্তরে খোদাইকৃত। এর স্থাপত্য অংশ গঠনে সাবল্যের প্রতি একটা ঝোঁক দেখা যায়। কারণ যেসব স্থাপত্যিক শিল্পকর্ম এতে রয়েছে তা সবই সাদাসিধা ধরনের। তবে গম্বুজ নির্মাণে কিছু কিছু সম্প্রসারণমূলক কাজের অভিনবত্ব দৃষ্ট হয়। এসব সরলতার মধ্যে গম্বুজের বাল্ব আকৃতির মাঝে নতুন সৌন্দর্য সৃষ্টি করার প্রক্রিয়াটাই প্রণিধানের বিষয়বস্তু।

এ মাকবারায় নতুন করে লক্ষ করা যায় যে ইরানি নির্মাতাদের সে পুরোনো স্থিরকৃত পদ্ধতি "কাঠামোকে মজবুত করে আকার দান করা", তাই প্রত্যাবর্তন করেছিল। স্থাপত্য নির্মাণে কাঠামো গঠনটা প্রধান বিবেচনার বিষয় হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে সুঠামভাবে ইমারতের বুনিয়াদ বা ভিত্তি দেওয়া হয়েছিল এবং তার উপর রঙ করা টালি দ্বারা কাজ করা হয়েছিল। এর সাথে মাকবারার নকশা পরিকল্পনা বিশাল আকারে করা হয়েছিল যাতে এটি সুন্দরভাবে

দৃশ্যমান হতে পারে। ইমারতের পৃষ্ঠদেশ এমন ধরনের করা হয়েছিল যাতে অতি সহজে দীর্ঘ বন্ধনী বিস্তার করে কবিতার পরস্পর অন্ত্যমিল বিশিষ্ট দুচরণ বা শ্লোক, ব্যক্তিগত প্রশংসাসূচক উক্তি ও পবিত্র কুরআনের বাণী সাজিয়ে খোদিত নকশার আকার দান করা যায়। বাণী প্রধানত কুফিক, তোঘরা ও নাসতালিক—এ তিন পদ্ধতিতে খোদিত হতে দেখা যায়। অক্ষর সাজিয়ে অলঙ্করণ প্রক্রিয়ায় যে উৎকৃষ্ট সৌন্দর্যময় সফলতা এসেছিল তা অন্য কিছুতে পাওয়া যেত না বলে পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন।[৭]

গোলকুণ্ডা (১৫১২-১৬৮৭ খ্রি.) :

দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য বিপ্লব গোলকুণ্ডা সাম্রাজ্যে সর্বশেষ ও তৃতীয় পর্যায়ে দানাবেঁধে উঠেছিল কুতুব শাহী বংশের অধীনে। এখানে কুতুব শাহী বংশের সুলতানগণ স্থাপত্যচর্চা অব্যাহত রেখেছিল। প্রবল পরাক্রমশালী ও ঐশ্বর্যময় এ রাজ্যটি ১৫১২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে ছিল। এ সময়ে অনেক স্থাপত্য উদাহরণ দাক্ষিণাত্যের পূর্বাংশে এখনো ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। তখন যে স্থাপত্যকর্মগুলো নির্মিত হয়েছিল তার ধ্বংসাবশেষের চিহ্ন পরিত্যক্ত অবস্থায় গোলকুণ্ডা শহরের নিকটে ও কিছু হায়দ্রাবাদে অবস্থিত।

গোলকুণ্ডা শহরের পরিবেষ্টন প্রাচীর গুলবর্গা ও বিদারের মতোই সুসংহত ও সংরক্ষিত করে নির্মিত। তবে প্রাচীরের অভ্যন্তর ভাগে নির্মিত স্থাপত্যকর্মে কিছু অতিরিক্ত বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। অন্যপক্ষে এগুলো অপেক্ষাকৃত আকারে বৃহৎ ও অজেয় বলে মনে হয়। রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ কিছুটা ভালো অবস্থায় এখনো টিকে রয়েছে। সুদীর্ঘ সময়ব্যাপী অবরোধের পর আওরঙ্গজেবের মোগল বাহিনীর নিকট ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে পদানত হওয়ার পর প্রকৃতপক্ষে এর ইমারতগুলো প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়। উপর্যুপরি গোলার আঘাতের পর যা টিকে রয়েছে তাই প্রত্যক্ষ করা যায় মাত্র।

কুতুব শাহী বংশের স্থাপত্য নির্মাণ কাজের পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতি উন্নয়নমূলক প্রতিনিধিত্বের উদাহরণ শহরের উত্তর-পশ্চিম পার্শ্বে অবস্থিত মাকবারাগুলোতে প্রত্যক্ষ করা যায়। এ দলটি সাতটি মাকবারা সমাহারে গঠিত হয়েছে। এছাড়াও পার্শ্ববর্তী স্থানেও রাজপরিবারের কিছু সমাধিসৌধ তাদের স্থাপত্যকর্মের স্মৃতি বহন করছে। এসব মাকবারায় বংশের উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বদেরকে সমাহিত করা হয়েছিল বলে মনে করা যায়। এসব মাকবারা পূর্ববর্ণিত পদ্ধতিতেই অত্যন্ত চমৎকারভাবে নির্মিত হয়েছিল। মাকবারাগুলোর নকশা পরিকল্পনাও প্রায় একই ধরনের ছিল। এ থেকে ধারণা করা যায় যে এগুলো বিদারে নির্মিত বাহমনী মাকবারার অনুরূপই ছিল। তবে এগুলোতে কিছু কিছু নতুন স্থাপত্যিক উপকরণ ও সজ্জায়নের উপাদান নতুন আঙ্গিকে সংযোজিত হয়েছিল।

প্রধানত ফুল, লতা-পাতার অলঙ্করণ এ মাকবারাগুলোতে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। তারা মাক'রায় যে বিভিন্ন প্রকার কাজের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছিল এটি মূলত কাঠামোর কোনো অপরিহার্য অংশ বিশেষ হিসেবে প্রাধান্য ছিল না। তারা তাদের আত্মপরিতৃপ্তির জন্য ইচ্ছামতো অনাবশ্যক উপকরণের সংযোজন করেছিল মাত্র। এতে কিছু অতিরিক্ত সৌন্দর্যতা বা চমৎকারিত্ব আসলেও মূল মাকবারা কাঠামোর কোনো স্থায়িত্বজনিত শক্তিবৃদ্ধি এবং কোনো পদ্ধতির উন্নয়ন সাধিত হয় নি।

ঐতিহাসিকভাবে এ পর্যায়ে দাক্ষিণাত্যের ইমারত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন ফ্রান্সের চতুর্দশ লুই-এর প্রথম দিকের শৈল্পিক উৎপাদন ও উন্নয়ন পঞ্চদশ লুই-এর সময়ের সাথে তরঙ্গায়িত অগ্নিশিখা তুল্যরেখা দ্বারা শোভিত বক্রতা ও অসংযত ফুল ও লতার কাজ মিশ্রিত ও অন্তর্ভুক্ত

হয়ে যাওয়ার অনুরূপ অবস্থার সাথে তুলনীয়। একইভাবে কুতুব শাহীদের মাকবারায় বর্ধিতহারে নকশার কিনারাগুলো অধিক পাকানো ও জটিলতাপূর্ণ ঢালাই নমুনার ব্যবহার প্রদর্শন করছে। অন্যপক্ষে অধিকহারে ইমারতের নিচের অংশে পলস্তারা কার্যে জাঁকালো চাকচিক্যময় সাজসজ্জার বিস্তার ঘটানো হয়েছে। বলা বাহুল্য এটি ইমারতের বহির্ভাগস্থ বাহ্যিক সীমারেখাকে ক্ষীণ ও দুর্বল এবং পৃষ্ঠদেশকে বিভ্রান্তিপূর্ণ করেছে। স্থাপত্য সজ্জায়নে প্রথম দিকের জাঁকালো, মহিমান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত, প্রশান্তিময় স্থির প্রক্রিয়া নির্মাতাদের অভিপ্রায়ণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। এ ইমারতগুলো যেমন শাসকদের শৌর্যবীর্যের প্রতীক তেমনি এগুলোর উপাঙ্গে বিশিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ছাপ রয়েছে। অট্টালিকাদির চূড়া ঐশ্বর্যময় ঢালাই, পাতলা দৃঢ়তাহীন সচ্ছিদ্র প্রাচীর এবং অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় অনুরূপ অলঙ্করণ সুশোভনের জন্য ব্যবহৃত হযেছিল।

এসব বৈশিষ্ট্য ও পরিচর্যার সাথে সঙ্গতি বেখে গম্বুজ অবয়বে পবিবর্তন ও পরিমার্জন এসেছিল। এ পরিবর্তনের ফলে গম্বুজের আকার সম্প্রসারিত হয়ে পরিপূর্ণ বাল্ব আকারত্ব লাভ করেছিল এবং এর সাথে ফুলের বৃত্তির (claxy) মতো ঢালাই ধরনেব ভারী ঘনত্বপূর্ণ গোড়া বা তলার ভিত্তির সংযোগ ঘটেছিল। গোলকুণ্ডার কিছু কিছু মাকবারা দু তলাবিশিষ্ট। নিচের অংশে খিলানশ্রেণী শোভিত বারান্দা সংযুক্ত হযেছে। এর কারনিস আলম্বনে অভিক্ষিপ্ত করে কিছু স্থাপত্যিক ফল বা বৈশিষ্ট্য অর্জিত হয়েছে।

অভ্যন্তরভাগেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। কারণ আকাব বৃদ্ধির কারণে বিশেষভাবে গম্বুজের উচ্চতা বৃদ্ধির জন্য ভিতবের শবাধার বা কবর প্রকোষ্ঠের উপর প্রয়োজনীয় উচ্চতা বেখে বক্র তলছাদ রচনা করে ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এর ফলে গম্বুজ পর্যন্ত এক অব্যবহৃত শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে। এর গঠন প্রক্রিয়া কিছুটা দ্বিজ গম্বুজের মতো হলেও একেবারে দ্বিজ গম্বুজের আকার ধারণ করে নি। উত্তর ভাবতে পরবর্তী সময়ে মোগলদের সম্পূর্ণ দ্বিজ গম্বুজ নির্মাণ প্রক্রিয়াব এটিই ছিল প্রাথমিক স্তর বা প্রস্তুতিমূলক প্রথম পদক্ষেপ।

গোলকুণ্ডার এসব মাকবারার মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মাকবারা হচ্ছে আবদুল্লা কুতুব শাহের মাকবারা। তিনি ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। এটি বিশাল ও দু তলাবিশিষ্ট সমাধিসৌধ। এর উপরের অংশের চতুর্দিকে ঝুলন্ত ব্যালকনি সংযোজিত রয়েছে। এতে ছিদ্রযুক্ত জালিকাটা বদ্ধ মার্লন এবং অসংখ্য চূড়ার সংযোজন প্রক্রিয়ার নবপ্রবর্তন লক্ষ করা যায়। অন্যপক্ষে মোহাম্মদ কুলি কুতুব শাহের (মৃত্যু ১৬১২ খ্রিস্টাব্দ) মাকবারায় নকশার কারুকার্য দৃষ্ট হয়। এখানে কিছুটা অধিক পারস্পরিক মৈত্রী শর্ত সংবলিত ও টেনে ধরে বা আটকিয়ে নিয়ন্ত্রিত করার মতো নকশা পরিকল্পনা সৃষ্টি করা হয়েছে।

এ ছাড়া উক্ত এলাকার আশপাশে এবং হায়দ্রাবাদে বৃহৎ আকারে অনেক মাকবারা ও মসজিদের অবস্থান লক্ষ করা যায়। বলাবাহুল্য এগুলো সবই সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্মিত, যেমন—জামে মসজিদ, মক্কা মসজিদ, সুগিয়েবাদ মসজিদ ইত্যাদি। ছোট আকারের অথচ সৌষ্ঠবময় সৌন্দর্য সৃষ্টি করে সমাপ্ত মসজিদের উদাহরণ হচ্ছে ট্রোলি মসজিদ (১৬৭১ খ্রি.)। প্রশ্নাতীতভাবে কুতুব শাহী যুগের স্থাপত্যকর্মগুলো হায়দ্রাবাদ শহরের মধ্যে অবস্থিত। এর মধ্যে একটি স্মৃতিসৌধ প্রকৃত স্থাপত্যিক মূল্য বহন করছে, যা মুহাম্মদ কুলী কর্তৃক ১৫৯১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল।[১০] এটি একটি বিজয়স্তম্ভ স্থানীয়ভাবে যা চার-মিনার নামে পরিচিত। এর অবস্থান ও বাহ্যিক চেহারা দেখে মনে হয় বহু পূর্বে নির্মিত গুজরাটের আহমদাবাদের তিন দরজার উদ্দেশ্যানুরূপ এটি নির্মাণ করা হয়েছিল।[১১]

চার-মিনার :

চার-মিনার একটি মানানসই অবয়ব নিয়ে গঠিত। বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত এর প্রতি পার্শ্ব ৩০.৫০ মি. (১০০ ফুট) এবং চার কোনায় ৫৬.৭০ মি. (১৮৬ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট চারটি মিনার সংযোজিত। এর নিচের তলা চারটি প্রশস্ত খিলানপথ দ্বারা গঠিত এবং এগুলোর প্রতিটি ১১ মি. (৩৬ ফুট) প্রসারিত। এর উপরে হ্রাসকৃত আকারের তলা নির্মিত হয়ে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এর গঠন সর্বনিম্নে সারবস্তুপূর্ণ ত্রিপত্রবিশিষ্ট খিলান সারি দিয়ে সূচিত হয়ে প্রতি তলায় এর আকারের আয়তন হ্রাস পেয়েছে। এর সব উপরের তলায় সচ্ছিদ্র সূক্ষ্মাগ্র ক্ষুদ্র স্তম্ভশ্রেণী শোভিত (চিত্র নং- ৬৬)।

এ চমৎকার খিলানায়িত তোরণপথের পরিকল্পিত চেহারায় বিশেষ শিল্পবোধ বিশিষ্টতার পরমোৎকৃষ্টতা অর্জিত হয়েছে। এতে শক্তিমত্তা থাকলেও আগ্রাসন ছিল না। এতে মর্যাদাপূর্ণ অথচ আনন্দময় প্রাণচাঞ্চল্য ছিল। বলা বাহুল্য এর উপরের কাঠামো সৌষ্ঠবময় এবং নতুন প্রবর্তনের চিহ্ন বহন করছে। বিশেষভাবে এ প্রসঙ্গে এর মিনারগুলোর কথা উল্লেখ করা যায় যা হালকা ভাবের লম্ফন সোপান সম্বলিত হয়ে (lightly leaping stages) শূন্যে বহুদূর উঠার ঝোঁক বা প্রবণতা দৃশ্যমান হয়ে ইমারতের অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সক্ষম হয়েছে।

এর সাথে একই সময়ে সমগ্র স্থাপত্য কাঠামোর অঙ্গে পরিলক্ষিত হয় দম্ভী আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য যা এ যুগের ইমারতগুলোতে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে। অপ্রয়োজনীয় ও অবান্তরভাবে অতিরিক্ত খুচরা বিবিধ উপকরণের সমাহার এবং কাঠামোর অংশ বিশেষের সম্প্রসারণ সামগ্রিকভাবে এর জীবন সৌরভের জন্য উপকারী ছিল না। চার-মিনারের পরেও দাক্ষিণাত্যে অনেক ইমারত নির্মিত হয়েছিল তবে সেগুলোর বাহ্যিক অবয়ব চার-মিনারের মতো নয়। দাক্ষিণাত্য স্থাপত্য উদাহরণ হিসেবে চার-মিনারের চেয়ে আর কোনোটাই উৎকর্ষের উচ্চতর পদমর্যাদায় উপনীত হতে পারে নি। দাক্ষিণাত্যে মুসলিম স্থাপত্য সাধনা ১৩৪৭ খ্রিস্টাব্দে গুলবর্গায় শুরু হয়ে বিদারে এর বিস্তার লাভ করে এবং ১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দে তা গোলকুণ্ডা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়ে যাওয়ায় এ আঞ্চলিক স্থাপত্য চর্চার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৬৭।
২. এস. গ্রোভার বলেন, "a domed and vaulted hall of the Basilica type", cf : *দি আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া ইসলামিক*, দিল্লি, ১৯৮১, পৃ. ১১১।
৩. *তদেব*, পৃ. ১১১, চিত্র নং- ৫.০৩ ও ৫.০৪।
৪. ছাউনি বারান্দার খিলানশ্রেণী সম্পর্কে জন মার্শাল বলেছেন, "The broad squat arches of the cloisters which now make their appearance for the first time", দেখুন : *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ভলিউম-৩, দিল্লি, ১৯৫৮, পৃ. ৬৩৪, চিত্র নং- ৯৫।
৫. এস. গ্রোভারের মতে, "The only other instance where circular pillars have been used in Islamic architecture in India was earlier seen in the so-called Hawa Mahall at Mandu in Malwa region", দেখুন : *দি আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া ইসলামিক*, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫।
৬. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০।

৭. এ মাদ্রাসা সম্পর্কে এস গ্রোভার বলেছেন, "...the Madrasha of 'Gawan' seems like a pices of Persia plated ın India", cf: *দি আর্কিটেকচার অব ইন্ডিয়া ইসলামিক, পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৬।
৮. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭০।
৯. *তদেব*, পৃ. ৭১।
১০. জি. মিচেল (সম্পা.), *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড*, লন্ডন, ২০০০, পৃ. ২৭২।
১১. "In position and appearance at seems to have served the same purpose as the Tın Darwaza built at a much earlier date in the city of Ahmedabad, Gujarat"; দেখুন : পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭২।

ত্রয়োদশতম অধ্যায়

বিজাপুর স্থাপত্য (ষোড়শ শতাব্দী)
খান্দেশ স্থাপত্য (পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী)

বিজাপুর স্থাপত্য

গোলকুণ্ডা ও বিজাপুব প্রাদেশিক স্থাপত্যধাবাব তুলনামূলক পদ্ধতির উন্নয়নের মধ্য দিয়ে ভাবতীয় স্থাপত্যশিল্পে এর গুণগত মান ও পবিচালনা শাসক বাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতাব ওপব কতখানি নির্ভবশীল ছিল তা প্রতীযমান হযে উঠেছে। দক্ষিণাঞ্চলেব মধ্যযুগীয এ দুটি রাজ্যের স্থাপত্যধারা লক্ষণীয়ভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ ছিল। বলা বাহুল্য তাদের উভয স্থাপত্যধাবার উৎপত্তি একই উৎস হতে এসেছিল, কেননা ১৪৯০ খ্রিস্টাব্দে মূল বাহমনী সাম্রাজ্য হতে বিচ্ছিন্ন হয়েই এ দুটিরাজ্যেব উদ্ভব হযেছিল। উভয বাজ্যই দাক্ষিণাত্যে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল। ১৬৮৬-১৬৮৭ খ্রিস্টাব্দেব মধ্যে প্রায একই সাথে মোগল সাম্রাজ্যভূক্ত হয়ে এ রাজ্য দুটিব পতন ঘটেছিল।

এ দু রাজ্যে যে স্থাপত্যধারার উন্নয়ন ঘটেছিল তা লক্ষ করলে দেখা যায় যে, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীর বিদরের বাহমনী শাসকদের স্থাপত্য উৎপাদনের উৎকর্ষতার মধ্য দিয়েই অগ্রসর হয়েছিল; তথাপি এ দু রাজ্যের স্থাপত্যধারার বাস্তব নির্মাণ কাজে তুলনামূলকভাবে কিছুটা বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

গোলকুণ্ডায় দেখা যায় যে সৃজনশীল স্থাপত্য সৃষ্টিকারক ঐতিহ্যবাহী শিল্পানুরাগী শাসকগণ যে পদ্ধতিতে স্থাপত্য কাঠামো গঠনে মনোযোগী হয়েছিল তার অবয়ব মোটেই উৎসাহব্যঞ্জক বা অনুপ্রেরণাদায়ক ছিল না। কেননা তারা স্থাপত্য ইমারতের রঙ সংক্রান্ত কার্য বা ইমারতের অপ্রয়োজনীয় অংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে ব্রতী হয়ে স্থাপত্যের মূল লক্ষবস্তু হতে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিল। অন্যপক্ষে বিজাপুরে বাহ্যিকভাবে অনুরূপ সাদৃশ্য থাকা সত্ত্বেও এখানে এ শিল্প তাৎক্ষণিকভাবে উন্নয়নের পন্থা সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্টতায় চমৎকারভাবে প্রকাশমান হয়েছে।

এখানে পাশাপাশি দুটি বংশের শাসকবৃন্দ বিপরীত সাংস্কৃতিক আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হওয়ার স্থাপত্য অনুশীলনে তুলনামূলকভাবে অসমতা দৃষ্ট হয় এবং তাদের স্থাপত্য নির্মাণ ফলত ভিন্নভাবে প্রকাশমান হয়েছে। মূলত গোলকুণ্ডার কুতুব শাহী বংশের শাসকবৃন্দ বিভিন্ন সৃজনশীল শিল্পকলার উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা করলেও স্থাপত্যকলার প্রতি অতি যত্নবান ছিল

এমন প্রমাণ তারা কেবলমাত্র স্থাপত্যশিল্প বা অনুরূপ ধরনের শিল্পকলা চর্চার মধ্যে নিজেদের চেতনা সীমাবদ্ধ রেখেছিল। তারা তাদের অপূর্ব স্থাপত্য সৃষ্টি করে কৃতিত্ব লাভে প্রয়াসী ছিল। এ ধরনের মানসিক প্রবণতার কারণে তাদের স্থাপত্য প্রকল্পগুলো বাস্তবে অভাবনীয় উন্নতি সাধন করতে পেরেছিল। বলা চলে যে ইমারতের সংখ্যা বৃদ্ধি ও আকারত্বে সুষমতা এবং এদের অত্যুৎকৃষ্ট উজ্জ্বল দীপ্তিশীলতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে তারা অনবদ্য অবদান বেখেছিল।

আদিল শাহী শাসকরা প্রজাকুলের মাঝে স্থাপত্য অনুশীলনের মনীষা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। এর ফলে বিজাপুরে যে পরিমাণে সুন্দর সুন্দর ইমারত নির্মাণে সমর্থ হয়েছিল তার সমকক্ষ অনুরূপ স্থাপত্য নির্মাণ ভারতের স্বল্পসংখ্যক নগরে দৃষ্ট হয়। তুলনামূলকভাবে এ রাজধানী শহরের একটা সীমাবদ্ধ এলাকায় যে ধ্বংসাবশেষ দেখা যায় তার মূল্যায়নে এগুলোকে প্রথম শ্রেণীর অতি উচ্চ শিল্প নিপুণতায় সমৃদ্ধ স্থাপত্যকর্মরূপে চিহ্নিত করতে অসুবিধা হয় না। এসব ইমাবতের প্রায় অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে স্থাপত্যিক গুণাগুণ সংবলিত কীর্তি।

এ স্থাপত্য ইমাবতগুলোর শ্রেণীবিন্যাসে দেখা যায় বিজাপুরে প্রধানত তিন ধরনের ইমারত নির্মিত হয়েছিল—মসজিদ, মাকবারা ও রাজপ্রাসাদ। এর মধ্যে প্রথম শ্রেণীর স্থাপত্য কাঠামোর সংখ্যা পঞ্চাশের অধিক; অন্যপক্ষে মাকবারার সংখ্যা কুড়ির উপরে এবং রাজপ্রাসাদেব সংখ্যাও মাকবারার অনুরূপ সংখ্যাই বলে পি. ব্রাউন উল্লেখ করেছেন।[১]

বিজাপুর শহবটি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা ছাড়াই অল্প উন্নত ভূমিতে অবস্থিত এবং এখান হতে রাজ্যের প্রশাসনিক কার্য পরিচালিত হতো। এখানে ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাঁচ দশকে স্থাপত্য প্রকল্প বাস্তবায়ন দুর্গ নগরী নির্মাণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। এ দুর্গের নকশা পরিকল্পনা অনিয়মিত বৃত্তাকার ছিল। এতে রাজপ্রাসাদ, রাজকীয় সাধারণ ইমারত ও দুটি ছোট আকারের মসজিদ অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ মসজিদ দুটি মন্দির হতে সংগৃহীত উপকরণ ও মালমসলাদি দ্বারা নির্মিত হয়েছিল।

আদিল শাহী বংশের শাসকদের ক্ষমতার বিস্তারের ফলে দুর্গ নগরের পাশ দিয়ে শহর এলাকা নতুন করে সম্প্রসারিত হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে এ সম্প্রসারিত এলাকাটুকুও শক্তিশালী ও সুরক্ষিত দেয়াল পরিবেষ্টনের মাধ্যমে মূল দুর্গ নগরীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। ১৫৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নগর সম্প্রসারণ ও প্রাচীর দেওয়া সমাপ্ত হয়েছিল। নগর সম্প্রসারণে যে প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল এর ধ্বংসাবশেষ চিহ্ন দেখে বলা যায় যে নগরটি শেষ পর্যন্ত অনিয়মিত বৃত্তাকারে ১০ কি.মি. পরিধি নিয়ে নির্মিত হয়েছিল। এ দুর্গ নগর কেন্দ্র হতে রাস্তা আবর্তিত হয়ে নগরের ছয়টি প্রধান গেট বা সদর দরজায় গিয়ে উপনীত হয়েছে। তবে এ রাস্তাগুলোর কোনো সারিবদ্ধতা ছিল না বরং এলোমেলোভাবে নির্মিত ছিল। এর অবশ্য' একটি বিষয় অনুমান করা যায় যে নির্মাতাগণ শহরটি নিয়মমতো গড়ে তোলার জন্য শৃঙ্খলাবদ্ধ শহর পরিকল্পনা বা পরিকল্পিতভাবে শহর গড়ার দিকে কোনো প্রকার সক্রিয় মনোনিবেশ করার প্রয়োজন বোধ করে নি। এটি বললে অত্যুক্তি হবে না যে যেহেতু শহরটি একসাথে গড়ে ওঠে নি, ধীরে ধীরে প্রয়োজন অনুসারে স্বাভাবিকভাবে গড়ে উঠে ছিল সেহেতু পূর্বনির্মিত অংশবিশেষের সাথে পরবর্তী অংশের সংযোগ সুশৃঙ্খলভাবে হতে পারে নি।

বলা বাহুল্য সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন আদিল শাহী বংশ ক্ষমতার শীর্ষে উপনীত হয় কেবলমাত্র তখনই নগর সম্প্রসারণের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছিল। এ মূল

শহরের উত্তর দিকে শাহাপুর শহরতলি ও পূর্ব দিকে আয়নাপুর শহরতলি গড়ে উঠেছিল। দুটি শহরতলিতে মাত্র কয়েকটি স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। তবে এসব ইমারত মোটেই তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল না।

দ্বিতীয় ইব্রাহীমের রাজত্বকালে ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে শহরের পশ্চিমাংশে কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্প্রসারণ সহ উন্নয়নমূলক কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। এ সময়ে রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম নগরী নৌরশপুর (nauraspur) প্রতিষ্ঠিত হয় যা প্রশস্ত রাজপথ দ্বারা রাজধানী শহরের সাথে সংযুক্ত করা হয়েছিল। এ নগরটি নির্মাণ শেষ হওয়ার পূর্বেই প্রকল্পটি পরিত্যক্ত হয়েছিল। এর কারণ ঐতিহাসিকভাবে আজো অজ্ঞাত রয়েছে। এখানে দুটি রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আংশিকভাবে নির্মাণ সমাপ্ত অবস্থায় দেয়ালের মাঝে দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়া এখানে উল্লেখযোগ্য কোনো ইমারতের চিহ্ন নজরে পড়ে না।

অন্যপক্ষে মূল শহর অংশের প্রাচীরবেষ্টিত এলাকায় দুএকটি ব্যতিক্রম ছাড়া প্রায় সবগুলো ইমারত গুরুত্বপূর্ণ। সপ্তদশ শতাব্দীব প্রথম পাঁচ দশকে যখন স্থাপত্য অনুশীলন পদ্ধতি চরম উন্নতি সাধিত হয়েছিল ঠিক সে সময়ে এ ইমারতগুলো নির্মিত হয়েছিল। সমসাময়িককালে পৃথিবীর আর দুটি জাতির ইতিহাসে স্বর্ণময় যুগের আবির্ভাব ঘটেছিল — একটি হচ্ছে ইংল্যান্ডের রানী এলিজাবেথ এবং অপরটি হচ্ছে ইরানি সাফাভী বংশের শাহ আব্বাসের রাজত্বকাল (১৫৮৭-১৬২৯ খ্রি.)।

বিজাপুর এখন একটি নিস্তব্ধ ধ্বংসাবশেষ। এর অন্তর্নিহিত শক্তিসত্তা ১৬৮৬ খ্রিস্টাব্দে মোগলদের নিকট বিনাশর্তে আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে যায়। এ শহরের প্রাণশক্তি মোগলদের পদানত হওয়ার পরও টিকে ছিল। তা আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মারাঠা শক্তি উত্থানের মধ্য দিয়ে পরবর্তী এক শ বছরের মধ্যে নির্বাপিত প্রায় প্রদীপ শিখাটি একেবারে নিভে গিয়েছিল। তারা এখানকার ইমারতগুলো ভেঙে ফেলে নির্মাণ উপকরণ সংগ্রহ করেছিল। অতঃপর যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা প্রকৃতির লীলাখেলায় সম্পূর্ণরূপে আজ নিশ্চিহ্ন প্রায়।

এসব ধ্বংসপ্রাপ্ত ইমারতের যেটুকু এখনও বিদ্যমান রয়েছে তা দেখে মোটামুটিভাবে বিজাপুর স্থাপত্যের মাহাত্ম্যপূর্ণ উন্নয়ন ধারা অনুমান করা যায়। শহরের সাধারণ বাহ্যিক চেহারা অবলোকনে বুঝা যায় যে সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্টময় দৃষ্টিভঙ্গিতে খুব একটা উৎসাহব্যঞ্জক অবদান সৃষ্টি হয়েছিল বলে মনে হয় না। অবশ্য এর কারণও ছিল যে নির্মাণ সামগ্রীর প্রধান উপকরণ হিসেবে স্থানীয়ভাবে প্রাপ্ত অনুজ্জ্বল রঙের আভাযুক্ত রক্তিমাবর্ণের আগ্নেয়শিলা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এখানকার ইমারতগুলো গড়ে উঠেছিল। তবুও এতে রাজনৈতিক জৌলুস একসময় উপস্থিত ছিল। কিন্তু এখন সে ঐশ্বর্যময় আড়ম্বর দৃশ্য ও রাজকীয় শানশওকতপূর্ণ ক্ষমতাশালী শাসকের প্রাচুর্যময় জীবন হতে বঞ্চিত হয়ে শহরটি ম্রিয়মাণ হয়েছে।

বিজাপুরের আদিল শাহী রাজবংশ মূলত তুর্কীয় জাতিসত্তার জনগোষ্ঠী ছিল বলে জানা যায়। তাই তারা অপরাপর ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসী জাতিদের মতোই অট্টালিকায় পতাকা প্রতীক ব্যবহার করত। তবে স্থাপত্যশিল্পের উন্নয়নে তাদের নিজস্ব জাতিসত্তার স্থাপত্যধারা দ্বারা অপেক্ষাকৃত কমই প্রভাবিত হয়েছিল। তাদের স্থাপত্য উন্নয়ন ধারা আলোচনা পূর্বেই অবশ্য উল্লেখ করা হয়েছে যে এ বংশের স্থাপত্য উন্নয়নে দাক্ষিণাত্যের প্রথম যুগের বাহমনী শাসকদের উৎপাদিত স্থাপত্য পদ্ধতির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উন্নতি লাভ করেছিল।

বিজাপুরের স্থপতিবৃন্দ ঐশ্বর্যশালী ও মনোজ্ঞপূর্ণ ইমারত নির্মাণে তাদের পরিপক্ব স্থাপত্য কৌশল ও অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে সক্ষম হয়েছিল। তারা এ দক্ষতা ও স্থাপত্য অনুশীলন জ্ঞান সম্ভবত অটোমান বা তুর্কি দেশীয় স্থাপত্যকলার কৌশল ও প্রযুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল বলে পি. ব্রাউন উল্লেখ করেছেন।[২] বিজাপুরের ইমারতগুলোতে এমন কতকগুলো পরিপক্বভাবে বিকশিত স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্ট হয় যা নিঃসন্দেহে ভুলে যাবার মতো নয়। এ ভ্রমাতীত বৈশিষ্ট্যগুলো দাক্ষিণাত্যের আর কোথাও স্থাপত্য অঙ্গে এমন সুস্পষ্টভাবে প্রকাশমান হয় নি।

গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের মাঝে অন্যতম ছিল গম্বুজ। এ গম্বুজ নির্মাণ প্রক্রিয়ায় দেখা গিয়েছে যে এর আকারত্বের অংশ গঠনে অর্ধ-গোলাকার হয়ে প্রচলিত পাপড়ি বিশিষ্ট বন্ধনী গোড়া বা উৎপত্তিস্থল নিয়ে উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এ আকারেই অল্প পরিমাণে চূড়ায় অলঙ্করণ হিসেবে এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে এবং এটিই বিজাপুর পদ্ধতিতে প্রধান উপাদান হিসেবে স্থাপত্য ইমারতের প্রধান প্রধান কোনায় বিশেষভাবে ক্রমসরু মিনারের আগমন ঘটেছে। খিলানের আকারত্বে কোনাচে লক্ষণ হারিয়ে স্বাতন্ত্র্যসূচক বাহমনী খিলান বক্রের আদিরূপ সূক্ষ্মাগ্র ধনুকাকৃতি খিলানে পরিণত হয়েছে এবং অধিক কোমলতাপূর্ণ মসৃণ দেহরেখা ধারণ করেছে। খিলানপথেও নিচু খুটি বা দণ্ডের অভিব্যক্তিপূর্ণ প্রকাশ দেখা যায়, যা গুলবর্গা স্থাপত্য আদর্শ হতে এসেছে। এটি পর্যবেক্ষণে বুঝা যায় যে এ প্রযুক্তি স্থানান্তরের মধ্য দিয়ে এখানে এসে এর আকারত্বে পরিবর্তন ঘটে কিছুটা আকারহীন হয়ে গিয়েছিল।

বিজাপুর খিলানের আকারে চতুর্কেন্দ্রীয় বৈচিত্র্যময় পার্থক্যযুক্ত চেহারায় গঠিত হয়েছে। এটি টিউডর গথিক পদ্ধতির খিলানের মতোই। তবে এর বক্রতা পরিপূর্ণভাবেই প্রকাশ পেয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য পদ্ধতির সাধারণ গুণাগুণের সাথে এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। বিশেষভাবে এর নকশা পরিকল্পনা ও নির্মাণরীতি একই ধরনের। এখানে স্তম্ভের বিরলতা দেখা যায় এবং স্তম্ভের স্থলে আয়তাকার সারবত্তাপূর্ণ শক্তিশালী·গাঁথুনিযুক্ত থাম ব্যবহার করা হয়েছে।

উপরন্তু এর কারনিস স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অলঙ্কারযুক্ত যা অধিকাংশ ইমারতে দৃষ্ট হয়েছে। এর আকারত্ব ও অভিক্ষেপণ অধিকাংশ ইমারতে প্রশংসনীয়ভাবে দানা বেঁধে উঠেছে। এ অভিক্ষেপণ অনেক সময় কাছাকাছি বিন্যাসে সজ্জিত আলম্বন বা ঠেকনা দ্বারা সমর্থিত হয়েছে। এরূপ দৃষ্টিনন্দিত স্থাপত্যিক অংশ নিয়েই এ স্থাপত্য পদ্ধতি নির্মিত হয়েছিল। তবে এতে খোদাই কার্য নমুনা যা এর আলঙ্কারিক উপাদান হিসেবে আগমন ঘটেছিল, এর অধিকাংশ উপাদান স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমূলক ছিল। এটি স্পষ্টভাবে কোনো সুনির্দিষ্ট শিল্পীগোষ্ঠীর আদর্শে ঢালাই শিল্প গড়ে উঠেছিল। মূলত এ শিল্পগুণ উত্তরাধিকারসূত্রে দাক্ষিণাত্যের স্থাপত্য উদাহরণ হতেই এর অন্তরশক্তি এবং গাঠনিক আলঙ্করিক উপকরণ ও উপাদান পেয়েছিল যা অন্যান্য ইসলামি স্থাপত্যশিল্পে দানা বেঁধে উঠতে দেখা গিয়েছে। এ ছাড়া সচরাচব বিরল এমন আদিরূপের শিল্প আদর্শ এর সাথে যোগ হয়েছিল।

এ শিল্পরীতির মধ্যে খিলানের ত্রিকোনাকার ভূমিতে কুণ্ডলাকার আলম্ব বৃহদাকার মেডেল বা নকশা বিশেষ ধারণ করে রয়েছে এবং খিলানের উপরিভাগে পত্রপুষ্প অলঙ্কৃত কারুকার্য শোভিত একক বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য নিয়ে স্বাভাবিক সৌষ্ঠবে সংযুক্ত হয়েছে। এ বিশেষ পরিকল্পনার সাথে কৃত্রিম সজ্জিত গোলাপ অলঙ্করণ ও প্রচলিত ঝুলানো প্রদীপ নকশা চলমান কিনারা নকশালঙ্কার ও জড়ানো প্রতীকে পাথরের উপর খোদাইকৃত নকশা অথবা ঢালাইকৃত স্ট্যাকো ইমারতগাত্রে দৃষ্ট হয়।

এসব নকশায় যে শিল্প আদর্শ দানা বেঁধে উঠেছিল এর কিছু কিছু চিহ্ন বা নমুনার ছাপ বিশেষভাবে খোদাই শিল্পাদর্শ বাহমনী ইমারতে ব্যবহৃত চকচকে টালি সজ্জায়নের অনুরূপ বলে মনে করা যায়। অধিকন্তু এর ব্রাস (brush forms) আকারের নকশা বাটালে কেটে প্রস্তুত করার কৌশল সর্বপ্রথম এখানেই গৃহীত হয়েছিল। পরবর্তীকালে অবশ্য এসব নকশা নির্মাণ প্রক্রিয়ার আরো উন্নতি সাধিত হয়েছিল। বিজাপুরের মননশীল শিল্পীরা মনের কল্পনা দ্বারা দক্ষতাসহ নতুন প্রাণবন্ত স্থাপত্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল।

আদিল শাহী বংশের স্থায়িত্ব দু শ বছর ধরে অব্যাহত ছিল। বাস্তবিক পক্ষে এর স্থাপত্য ইতিহাস একটানা এক শ বছর কার্যকরভাবে প্রবাহিত ছিল। এ সীমিত সময়ে পদ্ধতির উন্নয়ন বাস্তবিকপক্ষে সামান্যই ছিল। এর প্রথম অবস্থায় যা শুরু হয়েছিল তাই শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। এর সূচনা নিরলঙ্কার কারুকার্যহীন সহজবোধ্য ও সাদাসিধা ধবনের স্থাপত্য নির্মাণের মধ্য দিয়েই এগিয়ে গিয়ে ধীরে ধীরে অলঙ্কারযুক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু এর কাঠামো গঠনে তেমন কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয় নি। বলা বাহুল্য তাদের স্থাপত্যশিল্পে কোনক্রমে পতনের চিহ্ন দেখা যায় না। এর উচ্চমান প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত প্রায় একই অবস্থায় বলবৎ ছিল। এ স্থাপত্যের সমাপ্তি পতনের মধ্য দিয়ে আসে নি। তবে এর সমাপ্তি ঘটেছিল বংশের আকস্মিক পতনের মধ্য দিয়ে।

বিজাপুরের স্থাপত্যধারার ক্রমবিকাশের উদাহরণ বর্ণনায় বর্তমানে পরিত্যক্ত রাজধানীর বিদীর্ণ বিলীয়মান ইমারতগুলোর অস্তিত্ব পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। এ প্রসঙ্গে চারটি প্রতিনিধিত্বমূলক স্থাপত্যকর্মের তাৎপর্যপূর্ণ পরিচয় তুলে ধরা হল। এদেব প্রথমটি হচ্ছে জামে মসজিদ, যেহেতু এটি প্রথম দিকের ইমারত যখন স্থাপত্য পদ্ধতিতে তেমন কোনো উন্নয়ন সাধিত হয় নি, তবুও এটি সাদাসিধা ধরনের হলেও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল। দ্বিতীয়টি ইব্রাহীম রওজা; যা অত্যন্ত বিশদীকৃত, জটিল ও মূল উপাদানাদি দিয়ে তৈবি হয়েছে। এটি এরূপ একটি স্থাপত্যরূপেই সৃষ্টি হয়েছিল। তৃতীয়টি হচ্ছে গোলগম্বুজ, যার স্থাপত্য পদ্ধতি অত্যন্ত আড়ম্বপূর্ণ ও মনোরম। চতুর্থ হচ্ছে মিহতাব মহল; এটি দেয়াল চিত্রেব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ সযত্নে অঙ্কনের ছাপসমৃদ্ধ এবং একই সাথে অধিকতর সূক্ষ্ম সংস্কৃতি সম্পন্নতাসহ তৃপ্তিদায়ক প্রতিকৃতিতে বা আকারে নির্মিত। এ ছাড়া কিছু রাজপ্রাসাদ ও জনসাধারণের ব্যবহারের নিমিত্তে ইমারতাদি নির্মিত হয়েছিল। এসব কাঠামোর গঠন দেখে বিশেষভাবে ধর্মনিরপেক্ষ ইমারতের গঠন প্রণালী, নিয়মাবলি ও পদ্ধতির ক্রমবিকাশ সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।

বিজাপুর জামি মসজিদ :

বিজাপুরের প্রথম উল্লেখযোগ্য নির্মাণ প্রকল্প হচ্ছে জামি মসজিদ। এর নির্মাণ কাজ আদিল শাহী বংশের সূচনায় প্রথম আলী শাহের রাজত্বকালে (১৫৫৮-১৫৮০ খ্রি.) নির্মিত হয়েছিল। এটি বিজাপুরের সবচেয়ে উৎকৃষ্টতম ইমারত হিসেবে গণ্য করা যায়। অবশ্য এটি নির্মাণে অত্যন্ত সংযমতা পালন করা হয়েছিল। মসজিদটি আদি সনাতনী আদর্শের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রেখেই নির্মিত। যেহেতু প্রথম দিকে স্থাপত্যের অনুন্নতশীল পরিস্থিতি বিরাজ করছিল সেহেতু অত্যন্ত সাদামাটাভাবেই বাহমনী যুগের স্থাপত্যধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখেই এটি নির্মিত হয়েছিল।

মনোযোগ দিয়ে দেখলে বুঝা যায় যে এটি সুচারুরূপে সুসম্পন্ন হয় নি। তাই মসজিদের বাইরের পূর্ব পার্শ্বে যে দুটি মিনার সংযোগের অবকাশ ছিল তা আর পরবর্তীকালে

পরিপূর্ণতা লাভ করে নি। মসজিদের অংশটুকু শেষপর্যন্ত অসম্পূর্ণ অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল। অবশ্য পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রবেশপথ একই পদ্ধতিতে সংযোজন করে দিয়েছিলেন। এমনকি এ সংযোজনের পরেও এর অংশ গঠন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় নি। এটি পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যে মসজিদ স্থাপত্য অনুসারে সবগুলো উপাদান পূরণ করা হয় নি। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে বহির্প্রাঙ্গণ বা সাহনের চতুর্দিক দিয়ে উন্নত বপ্রের উপরে অলঙ্কৃত মার্লননকশা অসম্পূর্ণতা সামান্য হলেও সাধারণ মসজিদ সৌন্দর্যের স্থিতিশীলতায় এটি প্রভাব ফেলেছে। তুলনামূলকভাবে মসজিদের বহির্দিকের সৌন্দর্য সৃষ্টিতে এটি যথেষ্ট অবদান রেখেছে।

মসজিদের অনুরূপ ত্রুটিবিচ্যুতি ও অসম্পন্নতা থাকা সত্ত্বেও এটি চিত্তাকর্ষণীয় চেহারায় প্রকাশমান এবং স্থাপত্যশিল্পের একটি মহৎ দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রতিপন্ন হয়েছে। মূলত এটি একটি বিশাল স্থাপত্য কাঠামো। এর নকশা পরিকল্পনা আয়তকার এবং দৈর্ঘ্যে ১৩৭.২০ মি. (৪৫০ ফুট) ও প্রস্থ ৬৮.৬০ মি. (২২৫ ফুট)। এর বাইরের অংশে একটির পর একটি করে উপকরণ স্থাপনপূর্বক স্তূপাকৃতভাবে উচ্চ অট্টালিকারূপে আকার দেওয়া হয়েছে। এ মসজিদের নকশা পরিকল্পনা যে স্থপতি বা কারিগর প্রস্তুত করেছিল তিনি স্থাপত্যের মূলীভূত বিষয়ে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য উদ্ভাবনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয় তিনি ব্যতিক্রমধর্মী এ বিষয়ে অসাধারণ চিন্তাশৈলীর অধিকারী ছিলেন বলে মনে করা যায় (ভূমি নকশা নং-৪৫)।
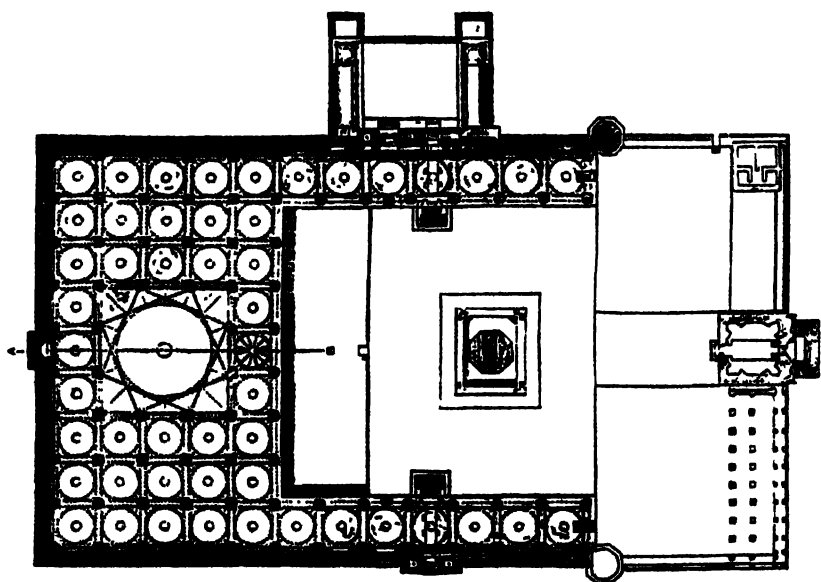
ভূমি নকশা নং-৪৫ : বিজাপুর জামি মসজিদ

মসজিদ নির্মাণ ধারায় সব সময়েই একটা অসুবিধা লক্ষ করা যায় যে নির্মীয়মাণ মসজিদের দেয়ালের বৃহৎ টানা একটা অংশ একসাথে গেঁথে তুলতে গিয়ে কিছুটা অংশ সাদামাটাভাবে করতে হয়। তখন প্রয়োজন মতো অভাঙা দেয়ালপৃষ্ঠের অলঙ্কারাদির

একঘেঁয়েমি দূর করতে বৈচিত্র্যময় পরিচর্যা আবশ্যক হয়ে থাকে। এ দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে এ সমস্যার সমাধান দেয়ালের মধ্যেই দুসারি খিলানশ্রেণী নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর স্থাপন একটির উপর আর একটি একইভাবে সম্পন্ন করা হয়েছে। নিচের সারিটা কেবল অলঙ্কৃত করা ও উপরের সারিটা উন্মুক্ত এবং একটি অনাবৃত খিলানায়িত সংযোগ পথ দরদালান পিছনে ও পার্শ্বের সমস্ত লম্বালম্বি এলাকা জুড়ে নির্মিত হয়েছে (চিত্র নং- ৬৭)।

মসজিদের সামনের অঙ্গন বা সাহনটি ৪৭.২৫ মি. (১৫৫ ফুট) বর্গাকার এবং সাহনের তিন পার্শ্বে টানা অতীব মহিমান্বিত জাঁকজমকপূর্ণ খিলান সারি রচিত হয়েছে। প্রতি পার্শ্বে খিলানের সংখ্যা সাতটি এবং সাহনের পশ্চিম পার্শ্বের মাঝখানে খোলা এবং জোরালোভাবে দেয়ালে ফুল ও লতা-পাতার কাজে সমৃদ্ধ হয়েই জুল্লাহর সম্মুখ দেয়াল রচিত হয়েছে। এ সম্মুখ দে'য়াল বা ফাসাদের উপর দিয়ে খিলান পরিকল্পিত হয়েছে এবং এর সাথে প্রশস্ত ও গভীর কারনিস আলম্বের সাহায্যে অবস্থান করছে।

জুল্লাহর মধ্যপ্রান্তের উপর দিয়ে খিলানায়িত ক্লেরেস্টরি (clerestory) নির্মিত হয়েছে এবং এরই উপরে বিশাল গম্বুজ সংস্থাপিত। এ প্রসঙ্গে স্থাপত্য পদ্ধতির ধারাবাহিকতার সংযোগ বাহমনী স্থাপত্য প্রক্রিয়ার সাথে খুঁজে পাওয়া যায়, বিশেষভাবে গম্বুজ ও উপকাঠামো নির্মাণ পরিচর্যায়। গুলবর্গার দুর্গ মসজিদের আকারত্ব যেভাবে উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল, এখানেও ঠিক একইভাবে সম্পন্ন হতে দেখা যায়। অথচ এ দুটি ইমারত প্রায় দু শ বছর বিরতির পর আলাদা দুটি স্থানে গড়ে উঠেছিল। অন্যপক্ষে এটি বলা প্রয়োজন যে বিজাপুরের স্থাপত্য উদাহরণ মনে রাখার মতো করেই নির্মিত হয়েছে। কেননা এটি স্থাপত্য পদ্ধতিতে প্রযুক্তির অগ্রসরমানতা ও অর্জিত অভিজ্ঞতার স্পষ্ট ছাপ প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে।

এ মসজিদদ্বয়ের প্রধান প্রধান অংশের তুলনামূলক বিশ্লেষণ প্রতীয়মান হয় যে বাহমনী মসজিদের বিশাল আকৃতির ঘনত্বপূর্ণ উপকাঠামো গঠনে বিস্তারিত কোনো খুচরা অংশ গঠনের দ্বারা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয় নি; বরং কিছুটা সাদাসিধা অথচ অকৃত্রিম ও আন্তরিকতায় এর অবস্থান লক্ষ করা যায়। এর গম্বুজটি দেখতে মন জুড়ানোর মতো অতিশয় জাঁকালো ও মর্যাদাপূর্ণ নয়। তবে এটি চরম মহিমান্বিতার পবিত্র প্রকাশ ভঙ্গিমার একটা গভীর ছাপ ফেলতে সক্ষম হয়েছে। এর প্রাণবন্ত সজীবতার মাঝে প্রথম প্রচেষ্টা সমৃদ্ধ সঙ্কল্পের বাস্তবায়ন প্রত্যক্ষ করা যায়।

পক্ষান্তরে আদিল শাহী মসজিদ কল্পনটি প্রায় একই নির্মাণ রীতিতে সমৃদ্ধ হলেও বাস্তবে নকশা পরিকল্পনার উৎপাদনে ভিন্ন ফল দেখা গিয়েছে। তারা পূর্বসূরির স্থাপত্য প্রযুক্তিময় উপলব্ধি, জ্ঞান অনুভব ক্ষমতা ও উৎকর্ষতা ঠিক রেখেই মসজিদকে সংযমী ও প্রশান্তময় গাম্ভীর্যতা দ্বারা এর বিভিন্ন অংশ গঠন পৃথক নয় এমন সুরুচিপূর্ণতায় নির্মাণ সমাপ্ত করেছিলেন। এ মসজিদ অবয়ব শুধু মানুষের আবেগকে নাড়া দেয় না সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্ট চেতনাকে আপ্লুত করে। অন্যপক্ষে মসজিদের যে অতিরিক্ত গুণাগুণ সংযোজিত হয়েছে তা হচ্ছে স্থাপত্যিক অলঙ্করণ প্রক্রিয়ার জটিল মনোমুগ্ধকর সজ্জায়ন ব্যবস্থা যা ক্লেরেস্টরি (clerestory) ও গম্বুজে দৃষ্ট হয়।

এখানে গম্বুজের আকৃতিতে আরো সৌন্দর্যতা ও মসৃণতা আনয়ন করা হয়েছে। ক্লেরেস্টরির সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে এর চতুর্দিক ঘুরে খিলানশ্রেণী সম্প্রসারিত করা হয়েছে এবং উন্নত বপ্রের উপর দিয়ে আরো অধিক দৃঢ়তাপূর্ণ সুস্পষ্ট পদ্ধতির মার্লননকশা সংযুক্ত করা হয়েছে। অন্যপক্ষে লতা-পাতা, পুষ্প ইত্যাদির বলিষ্ঠ নকশা দ্বারা গম্বুজ ও পিপার মিলনস্থল বিশেষভাবে অলঙ্কৃক।

এ পর্যায়ে গম্বুজের খাঁজকাটা চেহারার পরিবর্তন এসে নকশা রেখাসহ গোলার্ধ আকারত্ব লাভ করেছে। এর চূড়া ভারী ঘনত্বপূর্ণ ধাতব পদার্থে নির্মিত হয়ে ঊর্ধ্বমার্গে সব কিছুর শীর্ষে অর্ধচন্দ্র প্রতীক খচিত পতাকা দ্বারা শোভিত হয়েছে।

মসজিদ জুল্লাহর অভ্যন্তরভাগ মনের ওপর প্রভাব ফেলার মতো সুন্দর ও নিরহঙ্কার চেহারায় নির্মিত। মসজিদের এ ধরনের গুণাগুণ সৃষ্টির মূলে রয়েছে সাদাসিধাভাবে এর বিস্তৃতি ও সামগ্রিক প্রশস্ততা। জুল্লাহর পরিমিতি দৈর্ঘ্যে ৬৩.৪০ মি. (২০৮ ফুট) এবং প্রস্থে ৩২.৬৫ মি. (১০৭ ফুট) বিশিষ্ট। এবং পাঁচ 'আইলে' বিভক্ত। এর কেন্দ্রীয় নেভ বর্গাকারে গঠিত। এর ব্যাস ২৩.২০ মি. (৭৬ ফুট) এবং প্রতি পার্শ্বে ৩টি করে মোট ১২টি খিলানের সমন্বয়ে নির্মিত। খিলানগুলো আবার আড়াআড়িভাবে সংস্থাপিত। এভাবেই অষ্টভুজাকার কারনিসের সৃষ্টি যা গম্বুজের তলে আলম্ব হিসেবে ভার বহন করছে।

কেন্দ্রীয় পরিসরের চতুর্দিক দিয়ে খিলানপথের 'বে' বর্গাকারে গঠিত হয়েছে এবং এগুলো যে তলছাদ ধারণ করেছে তার নির্মাণ প্রযুক্তি নেভের তলছাদের মতোই। তবে এখানকাব ক্ষুদ্র পরিসরের উপযোগী করে নির্মিত হয়েছে। অভ্যন্তরভাগের পৃষ্ঠদেশ পরিচর্যা প্রশস্ত, দৃঢ়, নিখুঁত ও সংযতভাবে সম্পাদিত। এটি বাইরের স্থাপত্য সংক্রান্ত গঠনাত্মক ঢালাই সজ্জায়ন ভিতরে একই বৈশিষ্ট্যের অনুসরণে রচিত। এখানে প্রতীয়মান হয়ে উঠেছে যে প্রকৃত অলঙ্কৃত কাজের চেয়ে রেখা দ্বারা দেয়ালগাত্র সাজানোর দিকে বেশি প্রবণতা দেখা গিয়েছে।

পরবর্তী সময়ে এ মসজিদে অলঙ্করণের আঁচড় আরোপন লক্ষ করা যায়। তবে এটি কেন্দ্রীয় খিলান হয়ে প্রধান মিহরাব পর্যন্ত এলাকার মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল। এ অলঙ্করণ কাজ সম্প্রসারিত দেয়াল নকশায়ন ধরনের যা দেয়ালের উপরিতল হতে অভিক্ষিপ্তভাবে কারুশিল্পরূপে গঠিত হয়ে উজ্জ্বল রঙের ব্যবহারে পরিপূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। পি. ব্রাউন এ প্রসঙ্গে মতো পোষণ করেছেন[৩] যে, 'যদিও এ কাজগুলো গুণাগুণ সমৃদ্ধ তবুও কিছুটা বেমানান এবং কাঠামোর সৌন্দর্য সুষমা বৃদ্ধিতে তেমন সহায়তা কবে নি। এ মসজিদের জুল্লাহ মূলত সরলতা ও মর্যাদাপূর্ণ গাম্ভীর্যের প্রতিরূপ'। এটি শিল্পচাতুর্যের নাগপাশ হতে নিজেকে বিমুক্ত রেখে সম্পূর্ণভাবে আপন মহিমায় বিরাজমান।

ইব্রাহীম রওজা :

বিজাপুর স্থাপত্যধারার দ্বিতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক স্থাপত্যকর্ম হচ্ছে ইব্রাহীম রওজা। এর মাধ্যমে স্থাপত্যধারার পদ্ধতিগত উন্নয়ন সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এটি শহরের পশ্চিম দেয়ালের বাইরে অবস্থিত। দ্বিতীয় ইব্রাহীম আদিল শাহের শাসনামলে ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মিত হয়েছিল।[৪] এখানেই তার শেষ অন্তিমশয্যা রচিত হয়েছে। এ রওজা মোটামুটি দুটি ইমারতের সমন্বয়ে গঠিত—একটি সমাধি ও অপরটি মসজিদ। অবশ্য অন্যান্য ছোট-খাট ইমারত এর সাথে গড়ে উঠেছে। এটি বর্গাকার আবেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত এবং সব মিলে উদ্যান সুশোভিত নিভৃত নির্জন একটি আশ্রয় গড়ে উঠেছে।

এ স্থাপত্য পরিকল্পনার কার্যকলাপ দেখে পরিষ্কারভাবে মনে করা যায় যে সুলতানের ইচ্ছা ছিল যে একে কেবল অলঙ্কৃত ইমারত করেই ক্ষান্ত হবেন না বরং একে এ ধরনের ইমারতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উৎকৃষ্টতর করে নিখুঁতভাবে নির্মাণ কাজ সমাপ্ত করবেন এবং সে মর্মে অত্যন্ত সতর্কতার সাথে রাজকীয় ফরমান বাস্তবায়নের জন্য রাজকর্মচারীদের ওপর আদেশ জারি করেন। বাস্তবেও এটি দক্ষতাপূর্ণ প্রকৌশলী যত্ন মেধাসমৃদ্ধ শৈল্পিক নিষ্ঠার

সাক্ষ্য বহন করছে। অবশ্য পরবর্তী সময়ে এরূপ একাগ্রতা ও শাসকের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা ও তত্ত্বাবধানে তাজমহল নির্মাণও দেখা গিয়েছে।

এটি অবশ্যই কোনোভাবে বৃহৎ প্রকল্প ছিল না। কেননা এটি যেন মনে হয় বিবেকের দ্বারা পূর্বাহ্নে ভেবে দেখা হয়েছিল যে এ প্রকার সম্প্রসারিত বিশাল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য পরিকল্পনা গ্রহণ করলে কোনো দিনই তা সুসম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। এটি ১৩৭.১৫ মি. (৪৫০ ফুট) বর্গাকারে সম্পূর্ণ আবেষ্টনী প্রাচীর ঘেরা স্থান যার অভ্যন্তরে একটি সমাধি ও অপরটি মসজিদ। সমাধিটি বর্গাকার পরিকল্পনায় রচিত। এ বর্গাকার ইমারতের প্রতিপার্শ্ব ৩৫.০৫ মি. (১১৫ ফুট) । সমস্ত নির্মাণ কাজটি পরিপূর্ণভাবে সম্পাদিত করার জন্য সার্বিক তত্ত্বাবধান পরিচালিত হয়েছিল। কাঠামোর প্রতি অংশ তা গঠন সংক্রান্ত হোক বা প্রকৌশলী সঠিকতা সংক্রান্ত হোক অথবা অলঙ্কার সজ্জায়ন এবং অন্যান্য উপযোগিতা সম্পর্কে খুঁটিনাটি বিষয়ের ওপর হোক না কেন তা পূর্বাহ্নে চিন্তাভাবনা করা হয়েছিল, এমনকি ইমারতের যে প্রথম প্রস্তব গাঁথা হয়েছিল তার পূর্বেই সব ধরনের আয়োজন শেষ করা হয়েছিল।

ইমারত সম্পর্কে এরূপ নির্ভরযোগ্যতার সঠিক ইতিহাস উক্ত ইমারতের গাত্রে খোদাই করে লিপিবদ্ধ রয়েছে। এতে ভিত্তিপ্রস্তরের আকার ও অবস্থান সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে। কাজের প্রতিপদে বিশেষজ্ঞের বিবেচিত মতামত গৃহীত হয়েছিল। এরই ফল হিসেবে এর এমন অসাধারণ বৈশিষ্ট্যে সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্টতা অর্জিত হয়েছিল যে এটি মানুষের হাত দিয়ে অনুপম কীর্তি সৃষ্টির অপরূপ দৃষ্টান্তরূপে মনে করা যায়। এ ইমারতে মানুষের অক্লান্ত সাধ্যাতীত প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হওয়ার সাক্ষ্য চিহ্নিত হয়ে রয়েছে (চিত্র নং- ৬৮)।

আবেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে ১০৯.৭৫ মি. (৩৬০ ফুট) × ৪৫.৬০ মি. (১৫০ ফুট) আয়তাকার উঁচু বেদির ওপর দুটি ইমারত নির্মিত হয়েছে। এর পূর্ব প্রান্তে কবর ও পশ্চিম সীমান্তে মসজিদ অবস্থিত এবং এ দু'টি কাঠামোর মাঝখানে যে ফাঁকা স্থানটি রয়েছে এতেই অলঙ্কৃত চৌবাচ্চা বা ফোয়ারা নির্মিত হয়েছে। যদিও এদের আলাদা আকারত্ব ও উদ্দেশ্য ভিন্নতর তথাপি কাঠামো গঠনের ঘনত্ব ও পদ্ধতির সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য অনুরূপ করা হয়েছিল (ভূমি নক্সা নং- ৪৬)।
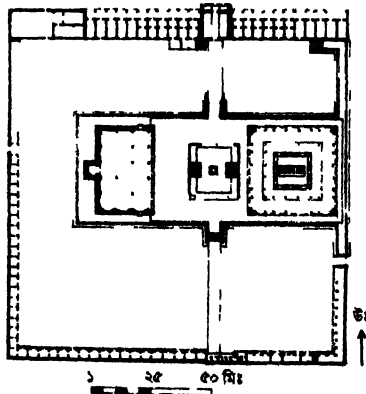
ভূমি নকশা নং-৪৬ : ইব্রাহীম রওজা কমপ্লেক্স

সমাধিসৌধ অধিক দীপ্তশীল ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে নির্মিত। এর আয়োজিত ব্যবস্থাপনায় একটি সমাধিসৌধের প্রচলিত রীতির প্রতিফলন প্রকৃতভাবেই ফুটে উঠেছে। এর বিভিন্ন অংশ, যথা- কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠ, খিলানায়িত বারান্দা এবং সমস্ত অংশের ওপর গম্বুজটি প্রসারিত হয়ে রয়েছে। স্থাপত্য উপাঙ্গগুলো এমনভাবে সংযুক্ত হয়েছে যে এটি সুরুচিপূর্ণ ও সৌষ্ঠবময় উদাহরণ উপহার দিতে সক্ষম হয়েছে। এর সম্পূর্ণ অবয়বটি পরিশেষে মিলবিশিষ্ট স্থাপত্যিক ফল হিসেবে প্রকাশিত হতে পেরেছে।

এসব দক্ষতাপূর্ণ কৌশল প্রয়োগ করা অংশগুলোর মধ্যে খিলান বিন্যাস ব্যবস্থা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানে দেখা যায় যে দু সারি খিলানের প্রতিমুখ তুলনামূলকভাবে একটি অন্যটি অপেক্ষা কিছুটা সংকীর্ণভাবে তৈরি। এভাবে ইন্দ্রিয়ের অগোচর, অস্পষ্ট ও ধবাছোঁয়ার বহির্ভূত রকমারিত্বে বিচ্ছুরণ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছে। এটি পক্ষান্তরে স্থাপত্যিক সক্ষমতা ও পর্যাপ্ত যোগ্যতা সম্পন্নতার চিহ্ন ধারণ করে রয়েছে।

অধিকন্তু এ পরিবর্তন সাধন অর্থাৎ পরিসরের মাঝেই পর্যায়ক্রমিক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া অবশিষ্ট স্থাপত্য কাঠামো গঠনে অব্যাহত ছিল এবং একইভাবে সমগ্র সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদকে প্রভাবিত করেছিল। এ ধরনেব প্রক্রিয়া জোরালোভাবে ফাঁকে ফাঁকে উন্নত বপ্রের উপরে অলঙ্কৃত চূড়াগুলোতে দৃষ্ট হয়। দীর্ঘ মিনার আকারের চূড়া ইমারতের প্রতি কোণ হতে উপরের দিকে উত্থিত। কিন্তু এর শীর্ষদেশের ওপর বিস্তৃতভাবে আলম্বনায়িত ও সচ্ছিদ্র প্রাচীব বিশেষ যে উপরতলা গঠিত হয়েছে তা বাল্ব আকৃতির গম্বুজ ধারণ কবে বয়েছে।

ইমারতের ভিতরে প্রবেশ করলে খিলানায়িত বারান্দায় থামের সারি দেখা যাবে। এখানে কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের চতুর্দিক দিয়ে দ্বিজ খিলান শ্রেণী গঠিত হয়েছে। একটি স্থাপত্যিক সম্প্রসারণমূলক নির্মাণের কৃতিত্বপূর্ণ সম্পূর্ণতা অভ্যন্তর প্রকল্পকে দর্শকের নিকট আকর্ষণীয়ভাবে প্রকাশমান হতে পেরেছে। কবর প্রকোষ্ঠের সর্বাংশ আলঙ্কারিক প্রাচুর্যতায় ভরপুর। এটি সম্পূর্ণভাবে উদ্ভাবনীশক্তি -সম্পন্ন আবিষ্কারলব্ধ প্রক্রিয়া দ্বারা কবর প্রকোষ্ঠের বহির্দেয়ালপৃষ্ঠ বিজড়িত নকশা নমুনায় যে সমাচ্ছন্ন কবা হয়েছে তা অতুলনীয়।

ইমারতেব এ অংশ প্রশংসনীয়ভাবে সে অবস্থারই বর্ণনা দান করে যখন শাসকের ধনসম্পদের বাসনা, আকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি অতৃপ্ত ছিল। এটি দেখে যখন কিছু মানুষ এ প্রকল্পের ফলাফল অস্বাভাবিক অমিতব্যয়িতা ছাড়া অন্য কিছু বলে মনে করে নি, তখন আবার কেউ কেউ প্রতি অংশের আলাদা নকশা নমুনার নিখুঁত চমৎকারিত্ব সৌন্দর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছে।

প্রতিটি দেয়াল অগভীর বা ভাসা ভাসা তিন খিলানে সজ্জিত খিলানশ্রেণী নির্মাণের জায়গা সঙ্কুলান করে দেয়া হয়েছিল এবং দেয়ালগুলো নিয়মবদ্ধভাবে কিনারা ও খোপ খোপ নকশায় আবৃত হয়ে ইমারতের প্রতি কোনায় মসৃণ ও চিত্তাকর্ষক বিজড়িত থাম সজ্জিতভাবে নির্মিত হয়েছিল। এ ছাড়া দেয়াল পৃষ্ঠকে বিভিন্ন আকারে বিভক্ত করে এটি আরব্য নকশায় পরিবৃত করে বা ঘুরিয়ে বুটিদার নকশায় অর্থাৎ স্রোতের ন্যায় খোদাই ও খচিত নকশায় পরিপূর্ণরূপে শোভিত।[৫]

বলা বাহুল্য শেষের নকশা নমুনাটাই বেশি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং অত্যন্ত সমাদৃত। এসব নকশানমুনা বিজাপুর পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্যসূচক চিহ্ন বা পরিচয় বহন করছে। এ শিল্পরীতি শিল্পীদের নিজস্ব আদি সৃষ্টিবোধ সম্পন্নতা ও দক্ষতাই প্রমাণ করে। তারা ধারাবাহিকভাবে

সমস্ত অনুক্রমিক শিল্পগুলোর সৃষ্টিতে অবদান রেখেছিল। এসব নতুন শিল্প সৃষ্টিতে স্থানীয় শিল্প আদর্শের সামান্য কিছু কিছু অনুসরণ করা হলেও সামগ্রিকভাবে এগুলো ছিল সজীব, প্রাণবন্তময় ও প্রতিনিধিত্বমূলক সার্থক সৃষ্টি।

এ মাকবারার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর কাঠামো নির্মাণের প্রক্রিয়া এবং এর কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তর ভাগের পরিচর্যা। এটি ৫.৫০ মি. (১৮ ফুট) বর্গাকার একটি প্রকোষ্ঠ। এটি অতীব সুন্দর ও চমৎকারভাবে বহিঃপ্রকাশিত হওয়ার মূলে এর সঠিক উচ্চতা স্বাভাবিক সৌষ্ঠবে বক্রতাসহ তলছাদ নির্মাণের সৌকর্যতা। এ প্রকোষ্ঠের উপরের অংশ গম্বুজ দ্বারা আচ্ছাদিত। এখানের তলছাদের প্রকৃতি দেখে মনে করা হয় যে গুলবর্গার আব্দুল্লাহ কুতুব শাহের মাকাবারায় নির্মিত তলছাদের নমুনা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। কিন্তু ঐতিহাসিকভাবে দেখা যায় যে আব্দুল্লাহ কুতুব শাহের মাকবারা ইব্রাহীম রওজার ৫০ বছর পর নির্মিত হয়েছিল। তাই প্রভাবিত হওয়ার ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ বলে মনে হয়।

এ পদ্ধতিতে প্রক্রিয়াগত অনেক অসুবিধা দৃষ্ট হয়। যদিও এখানে নিচে নির্মিত প্রকোষ্ঠের অংশ গঠনে সুষমতা রয়েছে তথাপি উপরের দিকে একটা বিরাট অপ্রয়োজনীয় ফাঁকা শূন্যতার সৃষ্টি করেছে এ সম্পূর্ণ ফাঁকা স্থানে কোনো পদার্থ এমনকি বাতাস পর্যন্ত অপ্রবেশ্য। রওজার এ তলছাদ নির্মাণ করতে সহজাত সৃজনী ক্ষমতায় কৌশলের উদ্ভাবনের মাধ্যমে সুসম্পন্ন হয়েছে এবং মিলনস্থল বা জোড়াগুলো এমনভাবে মিশে গিয়েছে যে বাইর হতে তা বুঝা যায় না। তা ছাড়া দৃশ্যত কোনো প্রকার আলম্বন প্রয়োগ করা হয়েছে কি না তা উপলব্ধি করা যায় না। এরূপ দক্ষতা সহকারে নির্মিত ঝুলন্ত তলছাদ বিজাপুর স্থাপত্যশিল্পীদের কাঠামোর গঠনের কৌশলগত প্রতিভার সাক্ষ্য বহন করছে।

রওজার অপরাংশে মসজিদ অবস্থিত যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য এগুলো আলাদা আলাদা ইমারত হলেও একই নিয়মবিধি ও একই ঘনত্বে গেঁথে নির্মাণ করা হয়েছে। তবে মসজিদের সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদের প্রশস্ততা পরিমাণে অপেক্ষাকৃত অগভীর বা অনুপাত অনুসারে কম। তা সত্ত্বেও মিল বিশিষ্টভাবে পরিপূর্ণতা পেয়ে দুটি সম্মিলিত একটা কল্পন হিসেবে প্রকাশমান।

গোল গম্বুজ :

বিজাপুরের তৃতীয় প্রতিনিধিত্বমূলক ইমারত হচ্ছে মোহাম্মদ আদিল শাহের (১৬২৬-১৬৫৬ খ্রি.) সমাধিসৌধ। এটি গোল গম্বুজ নামে সমধিক প্রসিদ্ধ। এটি অনুমিত হয় যে এ শাসক অনুভব করেছিলেন তার পূর্বপুরুষের রওজার স্থাপত্যিক উৎকর্ষতাপূর্ণ কাজ বা কারুকার্যসমৃদ্ধ সজ্জায়ন ও অলঙ্করণ কাজকে কোনোভাবেই অতিক্রম করা সম্ভবপর হবে না। তাই স্থির করেছিলেন যে অন্য গুণাগুণসম্পন্ন আকারের স্থাপত্য ইমারত নির্মাণ করবেন। এরই ফলে তিনি তার জন্য একক ইমারতবিশিষ্ট একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন যা পরিশেষে ভারতের সর্ববৃহৎ এবং লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অবদান হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

যাহোক এটি তুলনামূলকভাবে বিশাল আকারে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্য পরিকল্পনারূপে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এটি একটি মসজিদ ঘর ও তোরণ দরজাসহ ধর্মশালা বা পান্থশালা নিয়ে গঠিত। অবশ্য এর সাথে প্রয়োজনীয় রাজকীয় স্মৃতিসৌধ সংশ্লিষ্ট কাঠামো নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব কিছুই একটা আবেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। এরূপ একটা বিশাল প্রকল্প তার রাজত্বকালের প্রায় শেষের দিক নির্মিত হয়েছিল। অতএব এর নির্মাণকার্য সপ্তদশ

শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে শুরু হলেও শেষ পর্যন্ত সম্পূর্ণভাবে সমাপ্ত হতে পারে নি। এমনকি মাকবারা ইমারত অংশটাই পূর্ণাঙ্গভাবে নির্মিত হয় নি। গৃহীত নকশা পরিকল্পনা যেভাবে করা হয়েছিল তা অনেকটা অসমাপ্ত রয়ে যায়। এ বিশাল প্রকল্পের বাইর ও ভিতরের দেয়ালগুলো নিদারুণ কঠোর কৃচ্ছ্রপূর্ণ ও সাদাসিধা ও নিরলঙ্কার কারুকার্যহীন। অবশ্য প্রশস্ত পরিসর গাম্ভীর্যপূর্ণ সংযোজন মর্যাদা স্মৃতিসৌধের জন্য এনে দিতে পেবেছিল। মনে হয় এ ইমারতে চূড়ান্তভাবে সর্বশেষ সুসম্পন্নতা আনয়নের প্রচেষ্টা কার্যকর হওয়ার সুযোগের অভাব ছিল।

তা সত্ত্বেও বলতে হয় যে এ বিশাল আকারের স্থাপত্য ইমাবতের বেশিরভাগ অংশ সাদাসিধা স্থাপত্যিক অংশ গঠন সমৃদ্ধিশালী ছিল। এ ইমারতেব প্রতি কোনায় সংযোজিত হয়েছে টাওয়াররূপী মিনার। এর পরিমাপ হচ্ছে দৈর্ঘ্য+প্রস্থ+উচ্চতা বিশিষ্ট বৃহৎ ঘনক্ষেত্রফল। এর উপরে ভাসমান বিশাল গোলার্ধকার গম্বুজ সংস্থাপিত। এ কাঠামোর সন্তোষজনক চেহারা এর অংশ গঠনকারী উপাঙ্গগুলোর প্রশংসনীয় সুষম অবস্থানের জন্যই সম্ভবপর হয়েছে, বিশেষভাবে নিচের বর্গাকার অংশ এবং উপরেব গোলাকৃতি অংশেব মাঝে সুন্দর সমানুপাতের প্রাযুক্তিক বিবেচনার কারণে (ভূমি নকশা নং- ৪৭)।
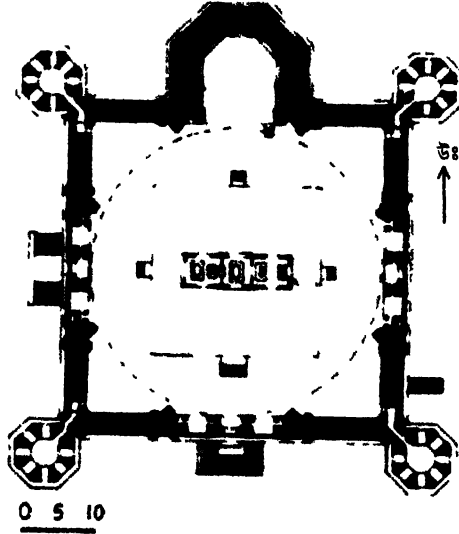
ভূমি নকশা নং-৪৭ : গোল গম্বুজ, বিজাপুর

পরের অংশে অবশ্য কোনো জটিলতাপূর্ণ বক্রতা নেই কেবল এতে প্রাচুর্যময় উল্টানো গামলার আকারত্ব সৃষ্টি করা ছাড়া। অবশ্য এতে কিছু অতিরিক্ত সহায়ক স্থাপত্য কাঠামো আকারত্বে সম্পূরক হিসেবে যোগ হতে পেরেছিল যা স্থাপত্যিক ফলাফল সৃষ্টিতে অবদান রেখেছিল। এ সহায়ক উপাঙ্গগুলোর মধ্যে সুন্দর অভিক্ষিপ্ত কারনিস এবং এর গভীর ও প্রশস্ত ছায়াবৃত (deep shadow) যা ঘন ঘন আলম্ব দ্বারা সমর্থিত হয়ে সমৃদ্ধতা লাভ করেছে। এর দুটি উল্লেখযোগ্য বা প্রধান বিন্দুতে ক্রমপূরণ রীতিতে আলম্বন (brackets) জোরালোভাবে সম্প্রসারিত বা দীর্ঘতর করা হয়েছে।

এর উপরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খিলানের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে একটি খিলানশ্রেণী। এর বাহ্যিক চেহারার একঘেয়ামি নিঃসরণার্থে একটি হতে আর একটির ব্যবধানের মধ্যে সামঞ্জস্যতা রক্ষিত হয়েছে। এর ওপর দিয়ে পুনরায় ভারী ঘনত্বপূর্ণ মার্লন এবং তার সাথে আকাশের সীমারেখা ভেদ করে সৌষ্ঠবময় লতা-পাতার কারুকার্যে শোভিত চূড়াগুলো দৃশ্যমান। পরিশেষে গম্বুজের গোড়া বা উৎপত্তিস্থল বলিষ্ঠভাবে লতা-পাতার কারুকার্যে রয়েছে সজ্জিত। তবে প্রয়োজনীয়রূপ উপায় অবলম্বন পূর্বক গম্বুজের সাথে পিপার মিলনস্থল নিখুঁতভাবে ঢেকে দেয়া হয়েছে।

নিচের প্রধান দেয়াল পরিসরে তিনটি অগভীর খিলানপথ বিদ্যমান। এগুলো দেখতে মনোরম ও আকারত্বে যথাযোগ্য মানানসই। অপেক্ষাকৃত বড় খিলানপথটি কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। এর আকার স্বাভাবিক মাপের দরজার মতো করার প্রয়োজনে খোপ খোপ চতুষ্কোণ গাঁথুনি দিয়ে দেয়ালের আকার কিছুটা হ্রাস বা ছোট করা হয়েছে। এসব স্থাপত্যিক আনুষঙ্গিক সহায়ক বস্তুসমূহ কেবলমাত্র শিল্পকে রূপ দিতে সহায়তা করে নি, প্রকৃতপক্ষে এগুলো সঠিকভাবে স্থাপত্য অঙ্গে স্থাপন করানোর কৌশলেব মাঝেই সমগ্র উৎপাদনের উৎকৃষ্টতা এনে দিয়েছিল। তাই এটি দেখতেই দর্শকের চোখে প্রশান্তি নেমে আসে।

কিন্তু ইমারতের কোনায় সংযোজিত বুরুজগুলোর কথা বিবেচনা করলে দেখা যায় যে সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্টতাপূর্ণ নকশাব উচ্চমান অবিরতভাবে সৃষ্টি হয় নি বা ইমারতের সমস্ত অংশের সাথে একটা মিলন ঐক্য সৃষ্টি হয় নি। এ ইমারতের কিছু কিছু প্রভাবশালী অঙ্গ কাঠামো বিশেষভাবে ইমারতের কোনাগুলো নিঃসন্দেহে সুসম্পন্নতা লাভ করা উচিত ছিল; অথচ আনুষঙ্গিক সহায়ক উপাঙ্গগুলোর লৌকিকতা প্রয়োজনের তুলনায় বেশি করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে প্যাগোডা সদৃশ আলম্বনপৃষ্ঠ চূড়া অপেক্ষা যথাযথ সুষমতাপূর্ণ ধাপ গঠনই অধিকতব শ্রেয় হত।

গোল গম্বুজের অভ্যন্তরভাগ মাত্র একটি প্রকোষ্ঠ নিয়েই গঠিত। তবে এটি শাসকের গাম্ভীর্যতা নিয়ে নির্মিত হয়েছে ঠিক যেমন রোমের প্যানথিওন (pantheon) বা ইস্তামবুলের সান্টা সোফিয়া গির্জা নির্মিত হয়েছিল। এক কক্ষবিশিষ্ট এরূপ বিশাল ইমারত ভারতে বিরল। পি. ব্রাউনের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, এ অর্ধ-চন্দ্রাকার ছাদযুক্ত মিলনায়তনের উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দীর্ঘ সূক্ষ্মাগ্র খিলান দ্বারা দেয়াল পার্শ্ব নির্মাণ যা উপরে অবস্থিত বৃত্তাকার মঞ্চটিকে ধরে রেখেছে এবং গম্বুজের গোঁড়া বা তল গঠনে সহযোগিতা করেছে।[৭] অবশ্য জি. মার্টিন আড়াআড়ি খিলানের কথা বলেছেন।[৮] যাহোক এ উদাহরণে কোনো তলছাদ বা দ্বিজ গম্বুজ নির্মাণের সুবিধাজনক উপায় বা কৌশল ছিল না। কেবলমাত্র মোটা করে দেয়াল গেথে এর স্থায়িত্ব বৃদ্ধিকরণ এবং উদ্ভাবিত উল্টানো বৃহৎ গামলার অবয়ব সৃষ্টি করা হয়েছে এবং এটি পূর্বের মতোই গোলার্ধ আকারে সুসম্পন্ন হয়েছে (চিত্র নং-৬৯)।

সমাধির সাদাসিধা চেহারার মতোই অভ্যন্তরভাগের নির্মাণ প্রক্রিয়া ব্যবহৃত। এর প্রারম্ভিক সূচনায় বর্গাকার থাকলেও দে'য়ালের উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এর আকারের পরিবর্তন এসেছিল এবং শীর্ষে গিযে অষ্টভুজে পরিণত হয়েছিল। এটি উপরের দিকে গিয়ে আবার বৃত্তাকার আকার ধারণ করেছে। নিচের বর্গাকার উপরের বৃত্তাকারে রূপান্তর অকপটভাবে প্রতিটি খিলান বর্গাকার অংশ অবস্থান নেওয়ার মধ্য দিয়ে সম্পাদিত হয়েছে। তবে কোনাগুলোর পৃষ্ঠদেশ ঘষে মসৃণ করে প্রাযুক্তিক কৌশলকে কাজে লাগানো হয়েছে।

উপরের আড়াআড়িভাবে প্রতিচ্ছেদনে আটটি পার্শ্বের সৃষ্টি হয়েছিল; এতেই বৃত্তাকার কারনিস অভিক্ষিপ্ত হয়েছে। গম্বুজের অভ্যন্তরপৃষ্ঠ এ বৃত্তাকারের ভিতর কিনারা হতে ৩.৭০

মি. (১২ ফুট) পশ্চাতে স্থাপিত যাতে গম্বুজের ওজনের কিছু অংশ সরাসরি নিচের দিকে চার দেয়ালের মাঝে গিয়ে পৌঁছতে পারে এবং অবশিষ্ট ভার পরস্পর ছেদ করা খিলানগুলো বহন করতে পারে। অবশ্য অন্য আর একটি প্রাযুক্তিক উদ্দেশ্য ছিল যে যদি বাইরের কোনো চাপ বা প্রতিকূলতা সৃষ্টি হয় তবে তাকেও প্রতিরোধ করার নিশ্চয়তা বিধান করবে।

গম্বুজটি সমতল আস্তর করা একটি ঢেউযুক্ত কাঠামো এবং পিপার গায়ে ছয়টি ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত অবস্থায় এগুলো মিলিত হয়েছে। গম্বুজের শীর্ষদেশ সমতল ও বৈচিত্র্যহীন এবং শিরোচূড়াতে কোনো শীর্ষদণ্ড সংযুক্ত নেই। এর নির্মাণ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে আনুভূমিক নিয়মে ইট দ্বারা গাঁথা হয়েছে। অবশ্য গাঁথুনির প্রতি স্তরে (each course) মোটা করে সংযোগ স্থাপক মসলার প্রয়োগ রয়েছে।

মোট কথা এটি নির্মাণে সমপ্রকৃতির ঝিনুক বা কচ্ছপ বা অনুরূপ প্রাণীর বহি-আবরণ বা খোলাচূর্ণের সাথে ইটের কুচি মিশিয়ে মসলা সহযোগে কংক্রিট প্রস্তুত করে পাকাপোক্তভাবে জমাট বাঁধানো হয়েছে। এ গম্বুজের সম্পূর্ণ অংশ গড়পড়তায় ৩.০৫ মি. (১০ ফুট) পুরু করে নির্মিত। বৃহৎ আকারের গম্বুজগুলো সবই এ নিয়মেই বা রীতির অনুসরণে নির্মিত হয়ে থাকে। সম্ভবত গোল গম্বুজ নির্মাণে কর্মরত স্থপতি ও কারিগরবৃন্দ এ ধরনের ঢেউযুক্ত গম্বুজ নির্মাণ অভিজ্ঞতা অটোমান বা পারস্য স্থাপত্য উৎস হতে লাভ করেছিল। কেননা সেখানে গুরুত্বপূর্ণ গম্বুজ নির্মাণ কার্যক্রম সে সময়ে পূর্ণাঙ্গভাবে অব্যাহত ছিল। এটি মনে করা অসম্ভব নয় যে কিউপোলা বা ছোট আকারের গম্বুজ তৈরিতে কাঠের কোনো মাচা বা সেন্টারিং কবা হত না। অবশ্য গম্বুজ শীর্ষের দিকে মাচা বা সেন্টারিং করতে হত, এটি কতকটা ওভার সেলিং পদ্ধতিতে ইট বসানোর মতো করে সম্পন্ন কবা হত। এ ব্যাপারে মাচা বা ভারা তৈরি অযথা বলেই মনে করা হত।

কিন্তু গম্বুজের ভার বহন ব্যবস্থা খিলানের আড়াআড়ি প্রতিচ্ছেদন অবস্থানের সংযুক্ততা দ্বারা সম্পাদনের প্রক্রিয়া পরিকল্পনা বিষয়টি সম্পর্কে বিজাপুরের স্থপতি ও কারিগরবৃন্দ অপ্রত্যাশিতভাবে পরিচিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এ পদ্ধতি অন্যত্র ও প্রায় অপ্রচলিত বা অজ্ঞাত ছিল। তবে এ দৃষ্টান্ত অতি সামান্যভাবে ছয় শ বছর পূর্বে নির্মিত স্পেনের কর্ডোভা মসজিদেব জুল্লাহর কিউপোলা বা ছোট গম্বুজ নির্মাণে লক্ষ করা যায়।

মোহাম্মদ আদিল শাহের সমাধিসৌধ সন্দেহাতীতভাবে ভারতে অন্যতম সুন্দর বৃহৎ স্থাপত্যিক নির্মাণ কাজ হিসেবে পরিগণিত হওয়ার যোগ্য। বিশেষ করে এর বিস্ময়কর স্থাপত্যাংশ গঠনের নিখুঁত সুষমতা পুনর্বিন্যাসের মধ্যেই তা ফুটে উঠেছে। বর্গাকার অবয়বে নির্মিত এ সমাধিসৌধের বহিস্থ পরিমাপ ৬১ মি. (২০০ ফুট) এবং গম্বুজের ব্যাস ৪৩.৯০ মি. (১৪৪ ফুট)। অভ্যন্তরে মিলনায়তনের এক পার্শ্ব হতে অন্য পার্শ্ব ৪১.১৫ মি. (১৩৫ ফুট) এবং উচ্চতা ৫৪.২৫ মি. (১৭৮ ফুট)। যে গ্যালারি হতে গম্বুজের উত্থান হয়েছে তা গম্বুজের উদ্ভূত (dome-springs) শান বাঁধানো বা মোড়ানোর (Pavement) স্থল হতে ৩০.৫০ মি. (১০০ ফুট) উপরে অবস্থিত। ভিতর পরিসরে বিভিন্ন প্রকার অভিক্ষিপ্ত উপাঙ্গ যে স্থান দখল করে রয়েছে তা বাদ দিয়েই মিলনায়তনের আয়তন ৫৪৮৬.৫০ বর্গ মি. (১৮,০০০ বর্গফুট)। এর আয়তন হিসাব করে বলা যায় যে এটি স্পেনের প্যানথিওন ইমারত হতে অপেক্ষাকৃত আয়তনে বৃহৎ। কারণ প্যানথিওনের আয়তন ৪৮২৫.৯০ বর্গ মি. (১৫,৮৩৩ বর্গফুট) মাত্র।[৯]

কাজেই বলা চলে যে পৃথিবীতে যতগুলো গোলাকৃতির ছাদ সংবলিত ইমারত রয়েছে তন্মধ্যে গোল গম্বুজ সর্ববৃহৎ। গোল গম্বুজের প্রতিকৃতি আলোচনায় কোনায় অবস্থিত

টাওয়ারের অসামঞ্জস্যতার কথা বাদ দিয়ে এ বিরাট আকারের কালজয়ী সমাধিসৌধটি অনন্যসাধারণ বিস্ময়কর সহনীয়তাপূর্ণ ঐশ্বর্যময় অবদান। বিজাপুরের অধিকাংশ ইমারতের অসাদৃশ্যে এটি নিরপেক্ষভাবে প্রমাণ করে যে এটি নির্মাণের উদ্দেশ্য মনোরম সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্টতা সৃষ্টি করা নয়; এটি নির্মাণের প্রকৃত কারণ মানুষের হৃদয়ের মাঝে ভয়ভীতি ও বিস্ময়-বিহ্বলতা সৃষ্টি, যাতে এর বিরাট আজানুলম্বিত চেহারার মাঝে শাসকের ক্ষমতাধর চেহারার গুরুগাম্ভীর্যতার প্রতিরূপ দেখে দর্শকের মনের মধ্যে ভয়ের সঞ্চারণ ঘটে। পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন "নির্মাতা শাসকের এ মানসিক ইচ্ছা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছিল"।[১০]

অন্যপক্ষে স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গি হতে এর গুণাগুণ বিচার-বিবেচনার বিষয়ভুক্ত করে বলা যায় যে এর বিভিন্ন উপাঙ্গগুলো নিয়ে দক্ষতাসহ অংশ গঠন, যথা- কারনিস, খিলান, খিলানশ্রেণী, লতা-পাতা ও ফুলের কারুকার্য শোভিত উন্নত বপ্র ও খাঁজকাটা গম্বুজ পিপা ইত্যাদি উদ্দেশ্য সাধনার্থ মিলনের সমন্বয় সাধন শৈল্পিক মেধাতে সুসম্পন্ন হয়েছে। ইমারত কাঠামোর ভিত্তি অতীব সারল্যপূর্ণ মনে হলেও অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে প্রকৌশল প্রযুক্তি প্রয়োগে সুসম্পন্ন, যদিও এর আকার কিছুটা সাধারণ ধরনের মনে হলেও যথেষ্ট আসজ্জনশীল শক্তিধরভাবেই গড়ে তোলা হয়েছে।

যদি কেউ এ অত্যুচ্চ ইমারতের সামনে তার পুলক শিহরনভরা হৃদয় আকুতি নিয়ে বা বিনম্র বদনে একবার এর পাদমূলে এসে দাঁড়ায় তা হলে সে তার অনুভূতির স্তরে কল্পনা করতে বিরত হবে না যে এ বিশাল অট্টালিকার অন্তর কি মহীয়ানরূপ ধারণ করে রয়েছে? এটি কি কালজয়ী প্রতিভার চিহ্ন অট্টালিকার আবরণের গহিনে গেঁথে রাখে নি?

আদিল শাহের রাজত্বকালে আর যেসব স্থাপত্যকর্ম নির্মিত হয়েছিল সেগুলোর মান অতি সাধারণ মানের ছিল। তা সত্ত্বেও ঐগুলোও যথেষ্ট গুণাগুণ সমৃদ্ধ ছিল। এদের মধ্যে শাহ করিমের মাকবারা ও শাহ নেওয়াজের মাকবারা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অন্যপক্ষে শাহাপুর শহরতলিতে নির্মিত মসজিদগুলোর মধ্যে আন্দা মসজিদ, মালেকা জাহান বেগম মসজিদ এবং আলী শাহীদ পীর মসজিদ অন্যতম। তবে আলী শাহীদ পীর মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে নির্মিত খিলান দরজার নকশা নমুনা শেষ স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যময় চমৎকার অবদান হিসেবে গণ্য করা যায়।

মিহতার মহল :

আকারে ছোট হলেও বিজাপুর স্থাপত্যের ইতিহাসে সবচেয়ে উৎকৃষ্টতর লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে যে ইমারতটি নির্মিত হয়েছে তার নাম মিহতার মহল। এর নকশা পরিকল্পনা ও অন্যান্য স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য দেখে প্রতীয়মান হয়েছে যে এটি দ্বিতীয় ইব্রাহীমের রাজত্বকালে ১৬২০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়েছিল। এতে বিকাশমান বৈশিষ্ট্যগুলো যাচাই করে বলা যায় যে ঐ রওজার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ এটি ধারণ করে রয়েছে, যেমন- এর দেয়াল ও অন্যান্য প্রধান কাঠামো অংশ প্রায় একই আলঙ্কারিক আদর্শে অলঙ্কৃত হয়েছে। এ ইমারত যে নামে ভূষিত হয়েছে তা সঠিক নয়। কেননা এটি কোনো মহল বা প্রাসাদ নয় বরং এটি একটি মসজিদের প্রাঙ্গণে প্রবেশের জন্য নির্মিত প্রবেশ মিলনায়তন। এ নির্মাণ কাজটি এর পশ্চাতে যে মসজিদ রয়েছে ঠিক প্রায় এর মতোই একটি প্রকল্প। বিশেষ করে এর অলঙ্করণ বা সজ্জায়নের প্রকৃতি দেখে তাই বলতে হয়। এ মসজিদের মতোই অভ্যন্তরভাগ মনোরম করে ও ঐশ্বর্যশালীভাবে সজ্জিত হয়েছে।

অবশ্য একে কেবল একটা প্রবেশ মিলনায়তন বলে পরিচয় দিলেই শেষ হবে না বরং এর চেয়ে বেশি কিছু। কেননা এর ওপর তলায় একটি ছোট প্রকোষ্ঠ রয়েছে যা প্রায় খ্রিস্টান চার্চের পাদরীদের একান্ত কামরার মতো করে নির্মিত। এ ছাড়াও এর উপরে একটি উন্মুক্ত বেদি অবস্থিত যা চতুর্দিকে দেয়াল ঘেরা অবস্থায় ঝুলন্ত বাতায়ন ও সচ্ছিদ্র উন্নত বপ্র ধারণ করে রয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, এ কক্ষটি আধুনিক যুগের মিলনায়তনের অনুরূপ নকশাই প্রদর্শন করছে।

এ ইমারতের বহিস্থ আবরণও প্রশংসার যোগ্য। এর সম্মুখ দেয়ালের মাঝখানে দুটি সরু পোস্তা উপরের দিকে উঠে গিয়ে মাধুর্যপূর্ণ সুউচ্চ চূড়ার আকার ধারণ করেছে। বলা বাহুল্য এর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর জানালাগুলোর ওপর অঙ্কিত কারুকার্য। এর ব্যালকনি আলম্বনের ওপর অভিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং ছায়া দানের জন্য প্রশস্ত ছাঁইচ সংযুক্ত রয়েছে।

অন্যান্য স্থাপত্যিক উপাঙ্গগুলোর মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র খিলান সংবলিত প্রবেশপথ, সমতল প্যানেলের মাঝে কুলঙ্গি, সম্মুখ দেয়ালের ঠেক্না ইত্যাদি ছাড়াও দড়ি নকশা, ঢালাই নকশার কাজ ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহায়তা দান করেছে। এ সমস্ত শৈল্পিক কাজ অত্যন্ত দক্ষতা ও চাতুর্যের সাথে করার ফলে প্রতিটি অঙ্গে যে চমৎকারিত্ব এসেছে তা একত্রিত হয়ে সমগ্র ইমারতের বাহ্যিক চেহারায় একটি শিল্প নৈপুর্ণ্যতার ছাপ পরিস্ফুট করে তুলেছে।

এখানে প্রতিটি খুচরা অংশ নিয়মমতো আকারত্ব এবং অতীব ব্যয় বহুলতায় অলঙ্কৃত। অবশ্য এর কিছু কিছু অংশ অতিমাত্রায় অলঙ্কারযুক্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে জানালার ছাঁইচ নির্মাণে ব্যবহৃত আলম্বন বা ঠেক্না অত্যন্ত মসৃণ করে কারুকার্যখচিত যেমনিভাবে বাহুর বর্মের ওপর পরিধান উপযোগী ব্রেইসের ওপর খোদাইযুক্ত হয়ে থাকে। এ নিখুঁত চমৎকার কর্ম সম্পাদনের প্রক্রিয়া দর্শকের মনে গভীরভাবে চমক সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে।

প্রস্তরখণ্ডগুলো সুবিধাজনকভাবে উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে এমনভাবে ব্যবহৃত হয়েছে যেন কাদামাটিতে অনায়াসে ছাঁচে ঢালাই করে কোনো কিছুর আকার দেয়া হয়েছে। ঢালাই কর্মগুলো অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে ও মমতা দ্বারা নিষ্পন্নকৃত। এর সাথে পি. ব্রাউন ইতালির কোয়াট্রো সেন্টো (quattro cento) শিল্পীদের কাজের তুলনা করেছেন।[১১]

সমগ্র স্থাপত্য কাঠামোর গুণাগুণ বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে নিয়োজিত শিল্পীরাই শুধু তাদের কাজের জন্য কেবল গর্ববোধ করে না বরং শিল্পীদের পৃষ্ঠপোষকরা যারা এ স্থাপত্য নির্মাণে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল তারাও সমানভাবে এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিল এবং এ প্রকার উচ্চমানের সৌষ্ঠবময় কাজ তাদের অভিভাবকত্বে সমাপ্ত হোক এটিই তারা চেয়েছিল।

বিজাপুরের ধর্মনিরপেক্ষ স্থাপত্যকর্মগুলো ধর্মীয় স্থাপত্যকর্মের তুলনায় অপেক্ষাকৃত মীমাংসিত গদ্যময় সাদাসিধাভাবে নির্মিত হয়েছিল এবং এসব ইমারতের সামান্যই তাৎপর্যময় বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। এগুলো প্রাসাদ এবং জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহারের উপযোগী করে নির্মিত হয়েছিল। অবশ্য সুলতান এগুলো বিভিন্ন প্রয়োজনে ব্যবহার করত। এর অধিকাংশ ইমারত স্থপতিরা নিজেদের ইচ্ছামতো নির্মাণ পদ্ধতির ব্যবহার প্রয়োজন উপযোগী উপকরণ দিয়েই নির্মাণ করেছিল। এখন বুঝা যায় যে অস্থায়ী ধরনের নির্মাণ প্রক্রিয়ার কারণে ঐগুলো প্রায় সম্পূর্ণভাবে ধ্বংসাবশেষে পরিণত হয়েছে।

এসব ইমারতের কিছু কিছু পরবর্তীকালে ব্যবহৃত হয়েছিল যা ব্যবহার করতে গিয়ে এদের আসল চেহারার পরিবর্তন ঘটেছে। কাজেই এদের প্রথম নির্মাণের সময়ের আকৃতি এবং এদের নির্মাণের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। এর স্বকীয় রূপোদ্ধার কোনোভাবেই সম্ভব নয়।

ধর্মনিরপেক্ষ ইমারতশ্রেণীর মধ্যে এখনো লক্ষণীয় হচ্ছে গাজান মহল (gagan mahall)। এটি ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের দিকে নির্মিত হয়েছিল। এর চেহারা দেখে মনে হয় দুটি উদ্দেশ্য নিয়ে এটি নির্মিত হয়েছিল। এটি রাজকীয় আবাসন ও মন্ত্রণালয় হিসেবে ব্যবহৃত হত। এর ভূমি নকশা আয়তাকার ৩৭.৮০ মি. × ২৫ মি. (১২৪ × ৮২ ফুট) বিশিষ্ট। এটি দু অংশে বিভক্ত। এর সামনের অংশ একটি বৃহৎ উন্মুক্ত মিলনায়তনের আকারপ্রাপ্ত হয়েছে এবং পিছনের অংশটুকু কেন্দ্রীয় মিলনায়তন অপেক্ষা ক্ষুদ্র আকারের প্রকোষ্ঠ প্রতি পার্শ্বে গঠিত হয়েছে এবং এদের উপরিভাগে আর একটি তলা সংযুক্ত।

বাহ্যিকভাবে এটি দেখে মনে করা যায় এটি রাজকীয় পরিবারস্থ মহিলাদের আবাসনের জন্য নির্মিত হয়েছিল। মধ্যযুগের উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের শহরগুলোতে অনুরূপ নকশা রীতিতে তৈরি দু-চারটি এ ধরনের ইমারতের সন্ধান পাওয়া যায়। মন্ত্রণালয় গণজমায়েত বা মিলনায়তন ও তার সাথে সংযুক্ত রাজপ্রাসাদের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ মান্দুর হিন্দোলা মহলে দেখা গিয়েছে।

পরবর্তী সময়ে মোগল স্থাপত্যে অবশ্য একটু আলাদা ধরনের ব্যবস্থা লক্ষ করা যায়। তারা সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন ইমারত নির্মাণ করতেন, যেমন- জনসাধারণের জমায়েত হওয়ার জন্য দিওয়ান-ই-আম, আবার বিশেষ ব্যক্তিত্বদেরকে নিয়ে একান্ত ব্যক্তিগত কাজের মন্ত্রণালয় হচ্ছে দিওয়ান-ই-খাস ইত্যাদি। কখনো কখনো রাজপ্রাসাদের সাথে অন্য ধরনের ইমারত সংশ্লিষ্ট করেও প্রয়োজনীয় ইমারত নির্মাণ করা হত। তবে এসব ইমারতের মূলনীতিগত ব্যবস্থাপনা কমবেশি একইরূপ ছিল।

অবশ্য যেক্ষেত্রে পরামর্শ প্রকোষ্ঠগুলো অসাধারণ সেখানে প্রকোষ্ঠগুলো বিশেষ আকর্ষণীয় অবয়বে নির্মিত হত। বিজাপুরেব গাজান মহল তার ব্যতিক্রম নয়। এর সম্মুখ দেয়াল তিনটি খিলানপথ মানুষের মনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করার মতো করে নির্মিত হয়েছে। এর কেন্দ্রীয় খিলানপথটি তুলনামূলকভাবে অসাধারণ প্রশস্তভাবে নির্মিত। এর পরিমাপ ১৮.৩০ মি. (৬০ ফুট) এবং উচ্চতা ১৫.২৫ মি. (৫০ ফুট)।

গুলবর্গার মসজিদের ছাউনি বারান্দার নিচু খুঁটির তুলনায় এটি কত বিশাল আকারের অথচ স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে স্পষ্টভাবে এরই বংশধর। ত্রয়ী খিলান সমাহার পরিকল্পনা, অস্বাভাবিকভাবে কেন্দ্রীয় পথের প্রশস্ততা বিজাপুর স্থাপত্য এখানেই কেবল পরিকল্পিত হয়েছে তা ঠিক নয়। কারণ এ স্থাপত্য পদ্ধতিতে প্রায় সব ধরনের ইমারতের সম্মুখ দেয়াল যথা- প্রাসাদ, মসজিদ, মাকবারা এবং অনুরূপ আকারের স্থাপত্যকর্মে দেখা গিয়েছে। এ ছাড়া আনন্দসংগাত (anandsangat) ও আইনপুর মহল (ainpur), মোস্তফা খানের মসজিদ এবং শাহনেওয়াজ খানের মাকবারা, ইয়াকুত ডাবলি (yaqut dabuli) ইত্যাদি উল্লেখ করা যেতে পারে।

অবশ্য এ ধরনের বিরাট পরিমাপের পথের যে প্রয়োজন ছিল তা স্পষ্টভাবে বুঝা যায়। কেননা গাজান মহলের খোলা প্রশস্ত পথের মধ্য দিয়ে অবারিতভাবে সুলতান রাজকীয় উৎসবাদি সামনের উচ্চ বেদিতে বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করতেন। বিজাপুরের স্থাপত্য কাঠামোর গঠনে প্রায় সর্বত্র পাথরের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু কিছু কিছু প্রাসাদে কাঠ নির্মাণ উপকরণ হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। বিশেষভাবে কাঠ ইমারতের স্তম্ভ বা থাম ও তলছাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমারতের দেয়ালপৃষ্ঠ স্ট্যাকোর (stucco) কাজ কাঠের সাথে সম্মিলিতভাবে সম্পাদিত। দেয়ালের নিম্নাংশ এবং উপরাংশ সজ্জায়ন করতে উজ্জ্বল রঙের দেয়ালচিত্র অঙ্কিত হতে দেখা যায়।

বিজাপুরের স্থাপত্যকর্মের উৎকৃষ্টতা নিয়োজিত কারিগরদের ক্ষমতা ও দক্ষতার মাঝে ফুটে উঠেছে। এটি অত্যন্ত পরমোৎকৃষ্ট ধরনের কাজ হিসেবে হয়তো প্রতিষ্ঠা লাভ করে নি, তবে তাদের মহিমান্বিত কর্ম সক্ষমতাকে অস্বীকার করা যায় না। তাদের স্থাপত্য নির্মাণ কাজগুলো যদি একত্র করে অনুসন্ধান করা যায় বা যাচাই করা যায় তা হলে একে উত্তম শ্রেণীর কাজ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। ভারতের অন্যান্য প্রাদেশিক স্থাপত্যধারাগুলোর অনুশীলন উৎকর্ষতা প্রাপ্তি বিচার করে একে নিকৃষ্ট কাজ বলা চলে না। বিশেষভাবে এখানকার পাথরের কাজগুলো নিঃসন্দেহে ভারতের স্থাপত্যমানকে অসাধারণত্ব এনে দিয়েছে এবং মহিমান্বিত করেছে। বিজাপুরের স্থাপত্যকর্মকে রোমানদের উৎকৃষ্ট কাজগুলোর সাথে তুলনা করা যেতে পারে। বিজাপুরের ইটের কাজে দেখা যায় যে গম্বুজ নির্মাণে কীভাবে উপকরণাদি ও মসলা প্রস্তুত করতে হয় সে সম্পর্কে কারিগরবৃন্দ পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী ছিল। তা ছাড়া কীভাবে ব্যবহার করলে স্থায়ী ফল লাভ করা যাবে এটিও তারা অবগত ছিল। আড়াআড়িভাবে খিলান স্থাপন কৌশল তাদের দক্ষতা প্রকাশ করেছে এবং এ প্রক্রিয়া যে একমাত্র তারাই অবগত ছিল তা প্রমাণিত হয়েছে। প্রতিটি স্থাপত্য পদ্ধতি এবং তা ব্যবহারের কায়দা-কৌশল বহু বছরের অধ্যবসায় ও পরীক্ষামূলক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সফলতা অর্জন করেছিল এবং কালক্রমে তারা স্থাপত্য অনুশীলনের প্রতি শাখায় দক্ষতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল।

এ প্রসঙ্গে তাদের সাধারণ মানের নির্মাণ প্রক্রিয়ার কথাও বলা যেতে পারে। ১৬৭২ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় আলী মৃত্যুবরণ করলে তার নির্মীয়মাণ মাকবারা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। এ আকাঙ্ক্ষা সংবলিত স্থাপত্য পরিকল্পনার কেবল নিচ তলার খিলানগুলো সুসম্পন্ন হয়েছিল। প্রকল্পটির এরূপ অসমাপ্ত অবস্থায় সুলতানের মৃত্যুর কারণে সমগ্র কর্মোদ্যম থেমে গিয়েছিল। কিন্তু এ সম্প্রসারিত অসমাপ্ত কাঠামো দেখে মনে হয় না যে এটি আড়াই শ বা তিন শ বছর পূর্বে এ কাজটি স্থগিত হয়ে গিয়েছিল। দেখে মনে হয় বর্তমানেই এ কাজটির অগ্রযাত্রা আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে।

এ অসমাপ্ত মাকবারার খিলান যে আকারত্বে নির্মিত হয়েছিল তা প্রণিধানের বিষয়বস্তু। এ সময় পর্যন্ত বিজাপুর ইমারতের খিলান বক্র নির্মাণ সহায়ক হিসেবে স্পর্শিনী (tangential line) বা চাপ স্পর্শ রেখার আবশ্যক হত, যার সাহায্যে খিলান শীর্ষে গিয়ে উভয় পার্শ্ব হতে উঠে আসা বাহুদ্বয় মিলিত হত।

কিন্তু এ অসমাপ্ত মাকবারায় খিলানের আকারে বক্রতা সরলভাবে দুটি কেন্দ্র হতে বহির্ভূত হয়েছে এবং সাধারণ নকশা রেখায় মিলিত হয়েছে। এটি প্রায় চতুর্দশ শতাব্দীর গথিক পদ্ধতির সম্পৃক্ততা লাভ করেছে। এটি প্রকৃতপক্ষে গথিক পদ্ধতির মূল অবস্থায় হতে প্রস্থান কি না তা পরিষ্কার রূপে উদঘাটিত হয় নি। কেননা পরবর্তীকালে বংশের পতনের সাথে সাথে স্থাপত্যশিল্পকলার চর্চা বন্ধ হয়ে যায়। তবে এ তাৎপর্যপূর্ণ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের কার্যক্রম রাজ্যের পতন না হওয়া পর্যন্ত উচ্চমান নিয়েই শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল।

বিজাপুরে স্থাপত্যের নির্মাণ উপকরণের মান ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মোটেই সহায়ক ছিল না। বিজাপুরের স্থাপত্য কার্যক্রমের সূচনালগ্ন হতে তারা যে পাথর ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছিল তা ছিল অনুন্নত মানের। কেননা নির্মাণ উপকরণ হিসেবে স্থানীয় আগ্নেয়শিলা ব্যবহৃত হত। এ প্রস্তর আবার দানা দানা আঁশযুক্ত অমসৃণ প্রকৃতির ছিল। এর ফলে বিজাপুরের স্থাপত্য কাঠামো ততটা সুন্দর হতে পারত না। তবুও বলা চলে স্থপতি ও কারিগরবৃন্দের দক্ষতার কারণে স্থাপত্য ইমারতগুলো ধ্বংসের মাঝেও টিকে রয়েছে।

খান্দেশ স্থাপত্য

দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিম কোনার ছোট যে প্রাদেশিক অঞ্চলটিতে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে স্থাপত্যচর্চা শুরু হয়েছিল এর নাম খান্দেশ। এখানে যে স্থাপত্য ইমারত গড়ে উঠেছিল তা ভিন্ন কোনো স্থাপত্য পদ্ধতির আকার ধারণ করে নি, তবে এর নিজস্ব মূল আদর্শের মর্যাদাপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। ভৌগোলিক সীমারেখায় দেখা যায় যে এর অবস্থান তাপ্তি নদীর নিকটবর্তী আঁটাআঁটিভাবে দাক্ষিণাত্যের ক্ষমতাশীল রাজ্যগুলো ও তার সাথে লাগোয়া গুজরাট ও মালোয়ার মাঝেই কীভাবে যে গড়ে উঠেছিল ভাবতে সংশয় বোধ হয়।

অন্যপক্ষে এটি স্বাভাবিক যে খান্দেশের স্থাপত্য কারিগরবৃন্দ তাদের স্থাপত্যিক অনুপ্রেরণা এসব পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো হতে পেয়েছিল। এ রাজ্যগুলোতে কর্ষিত স্থাপত্য অনুশীলন ভাবধারা দিয়ে খান্দেশের স্থাপত্য প্রভাবিত হয়েছিল। এ রাজ্যে ১৩৮২ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফারুকী রাজবংশ রাজত্ব করেছিল। তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানী থালনার (সালনার) এবং বুরহানপুর স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যেব তাৎপর্যপূর্ণ স্থাপত্যশিল্প গড়ে উঠেছিল। ভুয়াপুর শহর ১৪০০ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল এবং প্রায় একই সময় দুর্গ নগর, রাজপ্রাসাদ বা বাদশাহি কেল্লা নির্মিত হয়েছিল।

তাপ্তি নদীর তীর ঘেঁষে বাদশাহি কেল্লার অবস্থান অত্যন্ত সুদৃঢ়ভাবে সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করেই নির্মাণ করা হয়েছিল। আকার-আয়তনের দিক হতেই এটি চমকপ্রদ ছিল। এটি বিশাল প্রান্ত জুড়ে অত্যন্ত মজবুতভাবে নির্মিত। তবে বর্তমানে মারাত্মকভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত এককালের শক্তিশালী দুর্গ এখন নিস্তব্ধ। বর্তমান অবস্থায় যা অবশিষ্ট রয়েছে তা দেখে সঠিক কোনো স্থাপত্যিক পদ্ধতির সুস্পষ্ট ধারণা অবগত হওয়া খুবই দুষ্কর।

বলা বাহুল্য নগর গড়ার সময়ের অনেক পরে যে কিছুসংখ্যকস্থাপত্যকর্ম গড়ে উঠেছিল সেগুলো কিছুটা তথ্য প্রদানে সক্ষম। এগুলোর কিছুসংখ্যক মাকবারা প্রাচীন শহর থালনার নিকটবর্তী এলাকায় দেখা গেছে। এর মধ্যে একটি মাকবাবার মিনার গাত্রে মোবারক নামাঙ্কিত ১৪৫৭ খ্রিস্টাব্দের একটি খোদাইকৃত শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর ওপর নির্ভর করে সে যুগে উক্ত স্থানে যে স্থাপত্য আন্দোলন গড়ে উঠেছিল সে আন্দোলনের প্রকৃতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু অবগত হওয়া যায়।

এখানকার মাকবারা স্থাপত্য মালোয়া স্থাপত্য পদ্ধতি দ্বারা অনেকখানি প্রভাবিত হয়েছে। কারণ খান্দেশের মাকবারায় যে বৈশিষ্ট্য প্রতীয়মান হয়েছে তা নিঃসন্দেহে মালোয়া মাকবারায় দেখতে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে, মান্দুর হুসাং শাহের মাকবারা মিনার মোবারকের মাকবারার কিছু পূর্বে নির্মিত হয়েছিল।

অন্যপক্ষে থালনার মাকবারাগুলো স্থাপত্যিক পরিচর্যার সাথে মান্দুর স্থাপত্য পরিচর্যার কিছু তফাত দৃষ্ট হয়। এখানে ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি প্রক্রিয়া কিছুটা ভিন্নতর। কেননা স্থাপত্যিক কাঠামো গঠন ও অলঙ্করণ দেখে মনে করা যাবে না যে একটি আর একটির হুবহু নকল বা সরাসরি অনুকরণ। থালনা শহরে যে স্থপতি ও কারিগরবৃন্দ এ কাজে নিযুক্ত হয়েছিল তারা নিজেদের স্বকীয় শিল্প কৌশল প্রয়োগ করে স্থাপত্য নির্মাণ কাজ অব্যাহত রেখেছিল।

এখানে প্রধান নতুন প্রবর্তনে দেখা যায় যে, দরজা-জানালা বা অনুরূপ ফাঁকা প্রশস্ত স্থান জুড়ে কাঠামোগুলোকে অভিনবত্বে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল। ছাঁইচের উপরে উন্নত বপ্র গঠনে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। আবার গম্বুজের উচ্চতা বাড়ানোর জন্য অষ্টভুজাকার পিপা এবং খাঁজকাটা পার্শ্ব নির্মাণ প্রক্রিয়া চালু করা হয়।

থালনার মাকবারা অনুভূতি বা আবেগবোধ সৃষ্টিতে তেমন সক্ষম না হলেও এটি মালোয়া স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু নির্মাণকালে খান্দেশে প্রযুক্তিগত দৈন্যদশার জন্য স্থাপত্যিক ফললাভ সন্তোষজনক হতে পারে নি। তবে খান্দেশে একই পদ্ধতির অনুসরণে স্থাপত্য নির্মিত হয়েও ভিন্নতার মাত্রা প্রদর্শিত হয়েছে যা মনোরমভাবে শিল্পের রকমারিত্ব এনে দিয়েছে ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে।

ফারুকী রাজবংশের রাজত্বের শেষের দিকে বুরহানপুরে দুটি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এর একটি চতুর্থ আদিল শাহের (রাজা আলী খান) সময়ে ১৫৮৮ খ্রিস্টাব্দে এবং প্রায় একই সময়ে বিবি-কা-মসজিদ মহিলাদের জন্য নির্মিত হয়েছিল। তুলনামূলকভাবে প্রথমটির গঠন প্রকৃতি সাদাসিধা; এর সম্মুখ দেয়াল ১৫টি সূক্ষ্মাগ্র খিলানে গঠিত হয়েছে এবং দু পার্শ্বে দু উচ্চ মিনার উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এর এ স্থাপত্যিক গঠন আয়োজন পরিষ্কাররূপে যে স্থাপত্য প্রভাব প্রতীয়মান হয়েছে তাতে অপেক্ষাকৃত গুজরাট মসজিদ স্থাপত্যের অনুসরণ ঘটেছিল বলে মনে করা যায়।

এর স্থাপত্যিক কাঠামো গঠনের বিভিন্ন অংশের মাঝে সুষমতা লক্ষণীয়; বিশেষভাবে প্রাঙ্গণের চতুর্দিক দিয়ে যে খিলান শ্রেণী নির্মিত হয়েছে এর অংশ গঠন মনোজ্ঞ ও দোষমুক্তভাবে নিষ্পন্ন হয়েছিল। অন্যপক্ষে বিবি-কা-মসজিদের নকশা পরিকল্পনা ও নির্মাণ প্রক্রিয়া যথেষ্ট উৎকৃষ্টমানের প্রযুক্তি ব্যবহারের চিহ্ন বহন করছে। এখানকার নির্মাণ পদ্ধতি আহমদাবাদের মসজিদের অনুরূপই ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা চলে যে সম্মুখ দেয়াল চাপাচাপিভাবে নির্মিত বৃহৎ কেন্দ্রীয় খিলানপথ এবং শক্ত-সমর্থ মিনার ধারণ করে রয়েছে এবং সমস্ত অংশই ঐশ্বর্যশালী ও মনোজ্ঞ ঢালাই কাঁজে পরিপূর্ণ করা হয়েছে। এ ছাড়াও খোদাই করা নকশায় দেয়ালগাত্র রয়েছে পরিবৃত ।

খান্দেশ স্থাপত্য পদ্ধতির আদি বৈশিষ্ট্যের দাবি মিনারের অংশ গঠনের মাঝেই নিহিত। এর উপরের অংশ সুন্দররূপে অলঙ্কৃত। ঝুলন্ত বাতায়ন ব্যালকনির সাথে সংযুক্ত করে নির্মিত এবং মিনার শীর্ষে গোলাকৃতির ছোট আকারের গম্বুজ বা কিউপোলা সংস্থাপিত হয়েছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় শেষের দিকে নির্মিত খান্দেশের সুবাদার শাহনেওয়াজ খানের মাকবারায় স্বাধীন প্রকৃতির কিছু স্থাপত্য আদর্শ দৃষ্ট হয়। এর নির্মাণ প্রক্রিয়ায় ভুলভ্রান্তি খুব একটা চোখে পড়ে না; তবে একক কোনো পদ্ধতির বিকাশ এতে ঘটে নি; বরং এ মাকবারায় যে বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করেছে তা তৎপ্রচলিত বিভিন্ন স্থাপত্য আদর্শে প্রাপ্ত বৈশিষ্ট্য সংবলিত জগাখিচুরির উৎপাদক বলে মনে হয়। তবে গঠনে বিভিন্ন অংশের পরিপূর্ণতা রয়েছে। এতে বিভিন্ন উৎস হতে ধার করা অংশগুলো বুঝা যায়। বিভিন্ন আদর্শের স্থাপত্য উপাঙ্গ কারিগরের দক্ষতায় একেবারে এদের স্বতন্ত্র চেহারা মুছে ফেলতে পারে নি।

মাকবারার দোতলায় সমাপ্ত বর্গাকার নকশা গুজরাটের রাজকীয় মাকবারায় যে বৈশিষ্ট্য গড়ে উঠেছিল তারই প্রতিরূপ এখানে গড়ে উঠেছে। দিল্লির তোঘলক স্থাপত্য অনুসরণে সরু চূড়া নির্মিত হয়ে তার সাথে আবার বিজাপুরের লতা-পাতার কাজ যোগ হয়েছে এবং পরিশেষে লোদী পদ্ধতির গম্বুজ ধারণ করেছে।

এখানে বিভিন্ন ধরনের গুণাবলী সমৃদ্ধ স্থাপত্য পদ্ধতি ও আদর্শগুলোকে স্বীয় প্রযুক্তি ও কৌশল দক্ষতা সহকারে মানানসইভাবে সুসম্পন্ন করা হয়েছে। ঐ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত স্থাপত্য আদর্শগুলোতে এক সাথে সম্পৃক্ত করে যে ফল লাভ হয়েছিল এটি যথার্থ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করতে পেরেছিল। কেননা এভাবে যে স্থাপত্য ইমারত গড়ে উঠেছিল সেগুলো দেখতে অনাকর্ষণীয় মনে হয় নি।

যে কোনো রকমের শিল্প সাধনার ইতিহাস মন্থনে দেখা যায় যে, এটি বিভিন্নভাবে নতুন প্রবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত না হওয়া পর্যন্ত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পারে না, হয়তো তা কোনো সময় প্রত্যক্ষভাবে অথবা সূক্ষ্মভাবে অন্য একটি দ্বারা পরোক্ষভাবে কিছু বহিরাগত উপাদান গ্রহণের মধ্য দিয়ে নতুন গুণ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে। এভাবেই শিল্পের উন্নয়ন সাধিত হয়ে মানব সভ্যতার যাত্রা পথ সমৃদ্ধ ও প্রসারতা লাভ করেছে। তবে খান্দেশ স্থাপত্যে এটি স্পষ্ট যে, শাহনেওয়াজ খানের মাকবারা কাঠামোর দেহে যদি স্বাতন্ত্র্যসূচক স্বতঃস্ফূর্ত বৈশিষ্ট্য বা আদিত্য দানা বেঁধে থাকে তা কালের স্রোতে হারিয়ে যায় নি। বলা বাহুল্য এ প্রাদেশিক সুবাদারের মাকবারা নির্মাণের পর আর কোনো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য খান্দেশে গড়ে ওঠেনি।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৭৩।
২. *তদেব*, পৃ. ৭৩।
৩. *তদেব*, পৃ. ৭৫।
৪. জি. মিচেল (সম্পা.), *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড*, লন্ডন, ২০০০, পৃ. ২৬৬।
৫. এ ইমারতের অলঙ্করণ সম্পর্কে জি. মার্টিন কিছুটা ভিন্ন তথ্য দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "Extensive use is made of carved plasterwork in the execution of calligraphic inscriptions, geometric designs and medallions of local innovetion"; দেখুন : *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৭।
৬. জি. মিচেল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৭।
৭. পি. ব্রাউন, *পূর্বেক্ত*, পৃ. ৭৬।
৮. "This is (dome) supported by ingenious system of intersecting arches, transferring the shape of the square chamber to the circular drum from which the dome springs. These arches also support a circular platform slightly projecting over the chamber, masking the springing of the dome"; দেখুন : *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৬৭।
৯. এস. গ্রোভার এ গম্বুজকে বিশ্বের সর্ববৃহৎ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তিনি বলেছেন, "True the dome of the Pantheon at Rome and that of the St. Peters are both larger than the Gol Gumbaz in diameter. However, the formar two rise vertically from over a circular plan of the same size as the diameter of the dome. The Bijapur dome, on the other hand, which is poised over a large square space below, spans the largest uninterrupted floor space in the world; of the order of more than 18,000 sq. ft. (1.672 sq.m.)"; দেখুন : এস. গ্রোভার, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৩৫।
১০. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৭৭।

চতুর্দশতম অধ্যায়

কাশ্মীর স্থাপত্য (পঞ্চদশ শতাব্দী)

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তরাংশে উচ্চ পর্বত ঘেরা উপত্যকা নিয়ে যে অঞ্চলটি গঠিত এটিই কাশ্মীর রাজ্য। এখানে যে ধরনের স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল তা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে গড়ে ওঠা স্থাপত্য ইমারতের সাথে বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। কেননা এখানকার স্থাপত্য নির্মাণ কাজের সূচনা আদিতে প্রাচীন শাস্ত্র মতে অভিজাত চিন্তাধারায় পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায়ভুক্ত শাসকদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় খ্রিস্টীয় প্রথম সহস্র বছরের মধ্যে বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্ম ও কৃষ্টিকে অবলম্বন করে প্রস্তর ইমারত নির্মাণের মধ্য দিয়ে যাত্রাপথ শুরু হয়েছিল।

মুসলিম শাসন ব্যবস্থার সূত্রপাত হলে গণতান্ত্রিক জীবনবোধ সম্পৃক্ততায় সাধারণ মানুষের আবাসন নির্মাণ কাঠের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল সাম্রাজ্য সম্প্রসারিত হওয়ায় কাশ্মীর এর অন্তর্ভুক্ত হলে স্থাপত্য নির্মাণ কার্যক্রম পূর্ণাঙ্গভাবে শুরু হয়। মোগল সম্রাটরা তাদের নিজস্ব স্থাপত্য পদ্ধতির অনুসরণে প্রস্তর দ্বারা বিশাল আকারের অট্টালিকা নির্মাণ করতে থাকে।

তবে কাশ্মীর অঞ্চলে মুসলিম আধিপত্য প্রতিষ্ঠা লাভের পর যে স্থাপত্য পদ্ধতি প্রধানত প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল তা সামগ্রিকভাবে কাষ্ঠনির্ভর স্থাপত্য ছিল। এ স্থাপত্যধারায় প্রস্তর উপকরণ ব্যবহারের পাশাপাশি কাঠের ব্যবহারও লক্ষ করা যায়। তাই মনে করা যায় যে কাষ্ঠ নির্মাণ প্রক্রিয়া এককভাবে একটা স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট আকার নিতে পেরেছিল।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে কাশ্মীরে মুসলিম শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের সাথে সাথে কাষ্ঠ দ্বারা বাড়িঘর নির্মাণ শুরু হলেও মূলত প্রাচীনকাল থেকেই এর ব্যবহার প্রচলিত ছিল। প্রথম সহস্রাধিক বছর কাল ধরে ধর্মনিরপেক্ষ ইমারতগুলো নির্মাণে পাথরের সাথে সাথে কাঠের ব্যবহার লক্ষ করা যায়; কিন্তু কাঠ উপাদান হিসেবে অস্থায়িত্বতার কারণে সেগুলো কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। এখন প্রাচীনকালের কাষ্ঠ নির্মিত ইমারতের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না।

প্রাচীনকালে যে কাষ্ঠ নির্মিত গৃহ ছিল তার প্রথম পরবর্তীকালে নির্মাণ পদ্ধতি সৃষ্টির নিজস্ব সুযোগ-সুবিধার স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনে সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগানোর মানসিকতা, জলবায়ুর আনুকূল্যতা এবং অধিবাসীদের এর জন্য আগ্রহশীলতা; পরিশেষে একে ব্যবহার করার জন্য মানুষের সনাতন ইচ্ছা বহু পূর্বে সৃষ্ট প্রক্রিয়াটি তৎপরবর্তী সময়েও একটি নিয়মিত পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণযোগ্যতা রয়ে গিয়েছে।

তা ছাড়া নির্মাণ উপকরণ বা সামগ্রী হিসেবে ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোনো অঞ্চলে কাশ্মীরের মতো কাঠের সরবরাহ পাওয়া যায় না এবং দামেও তুলনামূলকভাবে সস্তা। এখানকার সর্বপ্রকার বাড়িঘর নির্মাণে কাষ্ঠ কেটে সাইজ না করে বা বিশেষ কোনো আকার না দিয়েই সরাসরি ছোট আকারের পাতলা ধরনের গাছ গৃহ নির্মাণকারী কারিগরেরা নির্মাণ কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম। এভাবেই প্রচুব কাঠ ব্যবহার করে নির্মাণ শিল্প গড়ে তুলেছিল।

কাষ্ঠ দ্বারা গৃহায়নে যে নির্মাণ পদ্ধতি গড়ে উঠেছিল তাতে দেখা যায় যে কাঠকে আনুভূমিক অর্থাৎ শোয়ানো অবস্থায় একটির ওপর আর একটি কাঠের গুঁড়ি বা খণ্ড সাজিয়ে গেঁথে তোলা হয়। সাধারণত ক্রুশাকারে ইটের গাঁথুনির অনুরূপ হেডার্স ও স্ট্রেচার্স (headers and stretchers) নিয়মে কাঠের গুঁড়িগুলোকেও গেঁথে তোলা হয়।[১] এভাবে কেবল দেয়ালগাত্র নির্মাণ করা হয় বরং স্তম্ভ বা পিয়ার হিসেবে কাঠ খণ্ডকে ব্যবহাব করা হয় । স্তম্ভ নির্মাণের প্রয়োজনে একটি সরু গাছকেই ব্যবহার করা হয়। কাশ্মীরে প্রচুর পরিমাণে চিরহরিৎ ও দেবদারু বৃক্ষ জন্মে। এসব স্থায়ী ধরনের শক্ত-সমর্থ গাছগুলো থেকে যথেষ্ট পরিমাণে নির্মাণসামগ্রী হিসেবে কাঠ সংগৃহীত হয়ে থাকে।

এটি সেতু নির্মাণেও সমানভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগর ঝিলাম নদীর তীরে অবস্থিত। কাঠের গুঁড়ি দ্বারা নির্মাণ পদ্ধতির সহজতর পন্থা বুঝতে নদীর প্রসারতায় যে সেতু নির্মিত হয়ে থাকে তাকে খাদাল (kadals) বলা হয়। এটি কান্টিলিভার রীতিতে (cantilever principle) নির্মাণ করা হয়।[২] এ প্রযুক্তি কাশ্মীরবাসী শত শত বছর ধরে সম্ভবত ব্যবহার করে এসেছে।

কাঠামোর ভার বহনকারী উপাঙ্গ থাম প্রয়োজনমতো ঘন আকারে কাঠেব গুঁড়ি হতে নির্মাণ করা হয়। এসব মজবুত কাঠের গৃহ কাঠামো দেখতে সাধারণত পিরামিডের অগ্রভাগ কেটে দেওয়ার মতো যা পাথর বা ইটের ভিত্তিভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। প্রতিটি থাম কাঠের গুঁড়িব কয়েক প্রস্থ পর্যায়ক্রমে আড়াআড়িভাবে ৯০০ ডিগ্রি কোণ উৎপাদন করে মিলিত হয়। এর ফলে থাম মতো শক্তিশালী হয় যে এটি অনায়াসে বন্যার প্রবল স্রোতকে মোকাবিলা করতে সক্ষম। এ ব্যবস্থা একদিকে নিচের স্রোতের টানকে সংযত করে অপরদিকে উপরের যুক্তিসঙ্গত ভার অনায়াসে বহন করে বহুদিন একইভাবে টিকে থাকার উপযুক্ততা অর্জন করে।

এখানে গৃহনির্মাণের যে প্রযুক্তিগত কৌশল দেখা যায় তা সেতু নির্মাণে থাম ব্যবহারের প্রক্রিয়া লক্ষ করলেই বুঝা যায়। অনুরূপ প্রযুক্তিই আরো মসৃণ ও সম্প্রসারিতভাবে স্থাপত্য ইমারতের আগমন ঘটেছে। উন্নতমানের গৃহনির্মাণে কাঠের গুঁড়িকে বর্গাকারে কেটে বা আকার দিয়ে ইটের দু প্রসারণ গাঁথুনির মাঝখানে স্থাপন করা হয়। ইটের দেয়ালের ওপর চকচকে টালি বসানো হয়ে থাকে। অন্যপক্ষে প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে ঘন সন্নিবিষ্ট মধ্যবর্তী সামান্য ফাঁক কোনো সময় কুলঙ্গি বা দেয়াল তাক বা কাপবোর্ড হিসেবে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে প্রতীয়মান হয় যে অতি উচ্চমানের এ প্রকার গৃহাদি নির্মাণে তেমন কোনো গম্ভীর বুদ্ধিগত প্রযুক্তি বা জোড়া সংযোজন কৌশল কাঠের কাজে দৃষ্ট হয় না। সাধারণত গৃহনির্মাণে একখণ্ড কাঠের সাথে অন্য খণ্ডের সংযোগ কাঠের খিল বা পিন দ্বারা করা হয়ে থাকে। কাঠের এ নির্মাণ পদ্ধতি আদিকালের অনুন্নত প্রাথমিক অবস্থাভুক্ত কর্মপ্রবাহ এতে কোনো প্রকার দক্ষতা, উল্লেখযোগ্যতা ও স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট চিহ্ন বহন করে

না যা বৌদ্ধ ভারতের আদি যুগে পর্বত গুহায় শিলা কেটে মন্দিরগৃহ নির্মাণে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

এতে যান্ত্রিক প্রকৃতির কোনো প্রকার সুবিধাজনক উপায় বা কৌশল যেমন—ভার রক্ষার্থে দু অসন্নিহিত কোণের মাঝে সংযোগস্থাপক তীর্যক কঠোর নিয়মানুবর্তিতা পূর্ণ নিশ্চয়তা দিতে সক্ষম হয় নি। এর যে ওজন বহন করার প্রক্রিয়া তা সরাসরি নিচের দিকে ধাবমান। এটি প্রথম যুগের পাথর দিয়ে মন্দির নির্মাণে প্রয়োগকৃত রীতিরই অনুরূপ। বিশাল আকারের কাষ্ঠখণ্ড দ্বারা যে গৃহাদি নির্মিত হয়ে থাকে এটি সামান্যই স্থায়িত্ব দিতে পারে মাত্র। এসব গৃহে দেখা যায় যে ইটের গাঁথুনির মাঝখানে যে কাষ্ঠখণ্ড বা গুঁড়ি প্রয়োগ করা হয় তার বর্ধিত ওজনে সমস্ত দেয়াল এলাকা এক সাথে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি করে। আবার কখনো কখনো আগুনে ভস্মীভূত হয়ে পূণঃনির্মাণের প্রয়োজন সৃষ্টি করে।

কাশ্মীরের মতো কাষ্ঠ নির্মিত স্থাপত্য পদ্ধতির ব্যবহার পৃথিবীর অন্যান্য পার্বত্য দেশগুলোতে দেখতে পাওয়া যায়। ইউরোপের স্ক্যান্ডেভিয়ান দেশগুলো ও আলপস্ পর্বত অঞ্চলে কাঠের গৃহাদি নির্মাণ করা হয়। নরওয়েতে একাদশ হতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ঢালু ছাদযুক্ত কাঠের তৈরি গির্জা দৃষ্ট হয়। এগুলো পিরামিডের মতো ধাপে ধাপে গঠিত হয়ে কারনিসযুক্ত ছাদের প্রান্তস্থ দেয়ালের ত্রিকোণ অংশ গঠন করে এবং উপরের ঝুলন্ত ছাঁইচ রচনা করে। প্রতিটি ছাদের উপরি অংশ বার্চ (birch bark) গাছের বল্কলে আচ্ছাদন করে পানির নিচে প্রবাহিত হতে দেওয়া হয় না। বল্কল আচ্ছাদনের নিচে কাঠ বিছিয়ে আচ্ছাদন প্রস্তুত করা হয়।

গৃহের ওপর তলায় ব্যালকনি খোদাইকৃত ঘেরা বা কাঠের রেলিং ও কাঠের চৌকাঠ দ্বারা ফ্রেম বা খাঁচা বা কপাট প্রস্তুত করে জানালার পাল্লা নির্মাণ পদ্ধতি অতি প্রাচীনকাল হতে চলে এসেছে। শ্রীনগরে এরূপ ধরনের পুরোনো বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। তবে পদ্ধতির অনুরূপ সাদৃশ্যতায় গৃহনির্মাণ স্থাপত্য পদ্ধতি গড়ে ওঠার পেছনে নরওয়ে বা সুইজারল্যান্ডের অধিবাসীবৃন্দের জাতিগত উৎসমূল কাশ্মীরীদের জাতিসত্তার সাথে অতীতে একই ছিল এরূপ মনে করার কারণ নেই।

তবে একই আবহাওয়াগত অবস্থা ও প্রকৃতির নির্মম আঘাত ঠেকানোর জন্য অনুরূপ পদ্ধতির স্থাপত্য কাঠামো স্বাভাবিকভাবে প্রয়োজনের তাগিদে গড়ে উঠেছিল এবং একই ধরনের নির্মাণসামগ্রী দ্বারা গৃহ নির্মাণ হত বলে পদ্ধতির চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য একই প্রকারের বলে মনে করা গিয়েছে।

কাশ্মীরের কাষ্ঠ স্থাপত্যধারা মন্থনে বুঝা যায় যে এখানে মূলত দুধরনের ইমারত নির্মিত হয়েছিল। এগুলো মসজিদ ও মাকবারা। কাশ্মীরে মাকবারাকে বলা হয় জিয়ারত। জিয়ারত শব্দের প্রকৃত অর্থ যাহোক এটি এ উপত্যকার তাৎপর্যপূর্ণ মাকবারার স্থানীয় পরিভাষারূপে প্রচলিত রয়েছে। এখানে স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ও প্রখ্যাত ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের মরদেহকে কবরস্থ করা হয়ে থাকে। গ্রামের আশপাশে বা রাস্তার পার্শ্বে অবস্থিত পবিত্র পাদপীঠগুলোকে প্রথাগতভাবে সব সময় বিভিন্ন উপায়ে সম্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে।

মসজিদে বিশেষভাবে বড় আকারের মসজিদে নতুন উপকরণ সংযোজিত হয়েছে; তা হচ্ছে ছাদের শীর্ষ এবং মোচাকার চূড়ার ভিত্তিমূল—এ দুয়ের মাঝে উন্মুক্ত বর্গাকার চন্দ্রাতপ নির্মিত হয়ে থাকে। এভাবে মিনারের মতো অথবা উচ্চ গ্যালারির আকারে স্থাপত্য অঙ্গ গড়ে তোলা হয়। এটি আজান দিয়ে নামাজে আহ্বান করার জন্য মোয়াজ্জিম কর্তৃক ব্যবহৃত হয়ে

থাকে। বহিরাগত কিছু উপকরণ ছাড়াও ছোট আকারের কবরগৃহ, ছাউনি বারান্দা এর সাথে সংযুক্ত হতে দেখা যায়।

হামাদান মসজিদ :

শ্রীনগরের শাহ্ হামাদান মসজিদ উল্লিখিত সকল উপাঙ্গ নিয়েই গঠিত। এ মসজিদটি এ দেশের কাষ্ঠ নির্মিত মসজিদগুলোর একটি উৎকৃষ্ট বৈশিষ্ট্য সংবলিত উদাহরণ।[৩] শ্রীনগরের ঝিলাম নদীর তীরস্থ এ মসজিদটি অসমতল পাকা ভিত্তির ওপর নির্মিত হয়েছে। এর নির্মাণকালে পুবোনো মন্দির হতে সংগৃহীত উপকরণ সামগ্রী দ্বারা বুনিয়াদ বা ভিত্তি রচিত হয়েছিল (চিত্র নং- ৪৭)।

এ মসজিদের প্রাকৃতিক দৃশ্যপট বড়ই মনোরম। এর চতুস্পার্শ্বের পটভূমি পর্বত ছাড়া কিছু নেই। পর্বতের চূড়াগুলো বরফে আচ্ছাদিত। এটি প্রভাতে সূর্যের নবীন কিরণে চকচক করতে থাকে এবং সব সময়ই উপভোগ করার মতো দৃশ্য সৃষ্টি করে থাকে।

এর বারান্দা বাদ দিয়ে মসজিদেব মূল কাঠামোর প্রতি পার্শ্ব ২১.৪০ মি. (৭০ ফুট) এবং দু তলার সমান উচ্চতাবিশিষ্ট; যা ছাঁইচ পর্যন্ত প্রায় ১৫.৩০ মি. (৫০ ফুট) এবং এর নিচু পিরামিড আকৃতির ছাদ এবং এতেই মোয়াজ্জিমের জন্য চন্দ্রাতপ রচিত হয়েছে এবং ঐ স্থান হতে উপরে চূড়া উঠে গিয়েছে। এ চূড়া ভিত্তিভূমি হতে শীর্ষ পর্যন্ত ৩৮.১৫ মি. (১২৫ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট।

এ মসজিদের কাঠামো গঠনে নিম্নাংশের দেয়াল অধিকাংশ কাষ্ঠ নির্মিত এবং কাঠের গুঁড়ি বর্গাকারে সাইজ বা আকার দিয়ে পর্যায়ন্বিতভাবে হেডার্স-ট্রেচার্স পদ্ধতিতে গেঁথে নির্মিত হয়েছে এবং কাঠের গুঁড়ির বহির্মাথা বা শেষ অংশ বুটিদার নকশালঙ্কারে সজ্জিত। ছাঁইচের নিচে ভারী কারনিস দেয়াল মুখ হতে বের হওয়া কাঠে আড়াআড়িভাবে খাঁজকাটা অংশের সাথে দন্ত পাটির মতো মিল বিশিষ্ট হয়ে গিয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এরূপ সুঠাম ভিত্তির ওপর ইমারত গেঁথে তোলা হয় এবং এর উপরেই অপেক্ষাকৃত পাতলা গঠনে খিলানশ্রেণী, বারান্দা ও প্রবেশ বারান্দা স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা শোভিত হয়েছে। দেয়ালের উন্মুক্ত স্থানগুলো জালির কাজে রয়েছে পরিপূর্ণ এবং শিল্পীরা তাদের প্রতিভার সাক্ষ্য কাষ্ঠ খোদাই কাজের মধ্যে অমর করে রেখেছে। পিরামিড আকৃতির ছাদ দ্বারা সমস্ত ইমারতের উপরটা আবৃত। এ ছাদ তিন ধাপে কড়ি বা বর্গার ওপব নির্মিত। তারপব কাঠের তক্তা বিছিয়ে তাতে মৌসুমি ফুল যথা টিউলিপ, ইরিশ ইত্যাদি বৃক্ষ শোভিত করে ছাদকে মনোরম উদ্যানে পরিণত করা হয়। এ উদ্যান ছাদের তলায় কয়েক প্রস্থ বার্চ গাছের বল্কল বিছিয়ে দেওয়া হয়। এভাবে যে স্তর সৃষ্টি হয় তা তুষারপাত বা বৃষ্টির পানি ছাদ ভেদ করে নিচে যেতে দেয় না।

উপরের খোলা স্তম্ভায়িত চন্দ্রাতপের পরেই ছাদের অবস্থান। এখানে ক্রমসরু চূড়াবিশিষ্ট বুরুজের পাদমূল হতে কানাওয়ালা ছাদের প্রান্তস্থ দেয়ালের ত্রিকোণ অংশ উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এটি যদিও দু তলাবিশিষ্ট তবুও কেবলমাত্র নিচের মিলনায়তনে বেশ কিছু স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য প্রত্যক্ষ করা যায়। ওপর তলা অতি সাধারণভাবে নির্মিত এবং এতে কোনো স্থাপত্যিক চমৎকারিত্ব নেই। নিম্নতলা আয়তাকার এবং ১৯.২৫ মি. (৬৩ ফুট) × (১৩.১৫ মি. (৪৩ ফুট) বিশিষ্ট। এর আদি বর্গাকার অবয়ব হতে উত্তর ও দক্ষিণ কোনায় ছোট্ট প্রকোষ্ঠ কেটে প্রস্তুত করার ফলে আদিরূপের পরিবর্তন ঘটেছে।

মসজিদের এ কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের বর্গাকার 'বে' চারটি কাঠের স্তম্ভসহযোগে নির্মিত। স্তম্ভগুলো ৬.১৫ মি. (২০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। এর দেয়াল কাঠ দ্বারা নির্মিত এবং খোপ খোপভাবে প্যানেল নকশায় অলঙ্কৃত। দেয়ালের নিম্নাংশ নানা কারুকার্য নকশায় শোভিত ও রঙের ব্যবহারে বৈচিত্র্যময় করে সজ্জিত। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে স্থাপত্যিক কাঠামোগত কোনো বৈশিষ্ট্য বা উপাদান সৃষ্টি হয় নি এবং চিত্তাকর্ষণীয় শৈল্পিক পরিচর্যার কোনো চিহ্ন বহন করে না। তবে ক্রমসরু অষ্টভুজাকার বিশিষ্ট স্তম্ভের পাদমূল ও শীর্ষদেশ লতা-পাতা ও পুষ্প দ্বারা অলঙ্কৃত করা হয়েছে। এ ছাড়া খিলান ও মিহরাব অনুরূপভাবে নকশালঙ্কারে সজ্জিত। খোপ খোপভাবে দেয়াল উজ্জ্বল বাদামি রঙ দ্বারা রঞ্জিত করা হয়েছে। এব তলছাদও মনোমুগ্ধকর করা ও মেঝে বিভিন্ন রঙের জায়নামাজ দ্বারা শোভিত। মোটের ওপর এসব উপকরণের একত্র সমাবেশ এর পরিবেশকে স্নিগ্ধ পবিত্রতা এনে দিয়েছে যদিও একটি কাঠেব অবকাঠামো স্থায়িত্বের দিক হতে ইট বা পাথরের কাঠামোর মতোই মজুবত।

শ্রীনগর জামি মসজিদ :

কাশ্মীরে নির্মিত সর্বকালের মসজিদগুলোর মধ্যে শ্রীনগর জামি মসজিদ নিঃসন্দেহে সর্বোৎকৃষ্ট। এটি কাষ্ঠস্থাপত্য পদ্ধতিতে সিকান্দার বুতশিখান (১৩৯০-১৪১৪ খ্রি.) নির্মাণ করেছিলেন। এ মসজিদটি তাঁর পুত্র জয়নাল আবেদীনের সময় (১৪৭৯ খ্রি.) সম্প্রসারিত হয়েছিল। এ মসজিদের কিছু অংশ পূর্ব হতেই ইটে নির্মিত ছিল। এর অভ্যন্তরভাগ চিত্তাকর্ষণীয়ভাবে কাঠের উপকরণে সজ্জিত।

এ মসজিদের বর্তমান অবয়ব দেখে মনে হয় এটি কমপক্ষে তিনবার অগ্নিদগ্ধ হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং তিনবাবেই পুনঃনির্মিত হয়েছিল,[৪] যার ফলে ইট ও কাঠ মিলিতভাবে প্রয়োগে মসজিদের বর্তমান বাহ্যিক চেহারা সৃষ্টি হয়েছে। তবে প্রতিবারের পুনঃনির্মাণে বড় ধরনের পরিবর্তন এর মূল কাঠামোতে আসে নি বলে মনে করা যায়।

সর্বশেষ পুনঃনির্মাণেব পর এটি যত্নসহকারে রক্ষিত না হওয়ায় ক্রমান্বয়ে এটি ভেঙে পড়তে থাকে। তবে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে (১৯৪০ খ্রি. দিকে) এটি পুনরায় নির্মিত হয়েছে। অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে বারংবার এর উত্থান-পতন সত্ত্বেও এর আদি প্রাক-মোগল যুগের গঠন কাঠামো সংবক্ষিত হয়ে কাশ্মীরের কাষ্ঠ স্থাপত্য পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই চিবঅম্লান হয়ে রয়েছে। এ মসজিদ কাশ্মীরের কাষ্ঠ স্থাপত্য পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যই শুধু বহন করে না, এটি ইসলামের আদি মসজিদ দামেস্কের বৃহৎ মসজিদের ভূমি নকশার অনুরূপ পরিকল্পনায় প্রায় নির্মাণ করা হয়েছে।

এর সাহন বর্গাকার যার পরিমিতি ৭৩.২০ মি. (২৪০ ফুট) এবং চতুর্দিকে প্রশস্ত স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা পরিবৃত। সমগ্র মসজিদ এলাকা আয়তাকার এবং উচ্চ বহিস্থ দেয়াল প্রতিপার্শ্ব ৮৬.৯০ মি. (২৮৫ ফুট) (ভূমি নকশা নং- ৪৮)।

মসজিদের বহির্দৃশ্যপটে তেমন কোনো অভিনবত্ব দৃষ্ট হয না, শুধুমাত্র গড়ে ৯.২০ মি. (৩০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট ইষ্টক নির্মিত দেয়াল ছাড়া। এর উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব পার্শ্বের মধ্যবিন্দুতে প্রক্ষিপ্ত প্রবেশপথ বিদ্যমান। এর উর্ধ্বের অংশে ক্ষুদ্র খিলানায়িত উন্মুক্ত অংশ দৃষ্ট হয়। এর প্রধান প্রবেশপথ দক্ষিণ পার্শ্বের স্তম্ভায়িত প্রবেশ বারান্দার সাথে মিলিত হয়েছে। এটি দক্ষিণ পথ বারান্দার স্তম্ভসারি অতিক্রম করে অভ্যন্তর প্রাঙ্গণে এসে উপনীত হয়েছে (চিত্র নং- ৭০)।

এ প্রাঙ্গণ বা সাহনের চতুষ্পার্শ্ব ঘিরে খিলানশ্রেণী প্রসারিত। কিন্তু প্রত্যেক পার্শ্বের অবিরত খিলানশ্রেণী মধ্যবিন্দুতে গড়ে ওঠা প্রায় স্বনির্ভর কাঠামো দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এ কাঠামোর বর্গাকার সম্মুখভাগের মধ্য দিয়ে খিলানপথ রচিত হয়েছে। এর উপরে পিরামিড আকারে ছাদ ও তার ঊর্ধ্বে চূড়া অবস্থিত। অন্যভাবে বলা যায় যে প্রত্যেক পার্শ্বের মাঝে জিয়ারতের আকারে কাঠামো গঠিত হয়েছে। এ চারটি কাষ্ঠ নির্মিত জিয়ারতের মধ্যে তিনটির আকার প্রবেশ মিলনায়তনের অনুরূপ; অন্যপক্ষে পশ্চিম পার্শ্বেরটি অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের ও তাৎপর্যপূর্ণ। একে জুল্লাহর প্রধান অংশরূপে চিহ্নিত করা যায়।

প্রধান খিলানপথ অতিক্রম করলেই মসজিদ অভ্যন্তরে জুল্লাহর সম্মুখভাগের উন্মুক্ত প্রান্তে উপনীত হওয়া যায়। তারপর সুউচ্চতা বিশিষ্ট দু প্রস্থ কাষ্ঠস্তম্ভ ও খিলানায়িত অলঙ্কৃত মিহরাব অবস্থিত (চিত্র নং-৭০)। অভ্যন্তরে আড়ম্বরপূর্ণ বিশাল স্তম্ভসারি সমগ্র ইমারতের চারদিকে অবস্থান লক্ষ করা যায়। এর তিন পার্শ্বেই চার খিলানপথ এবং চতুর্থ পার্শ্ব তিন খিলানপথ বিশিষ্টভাবে নির্মিত হয়েছে।
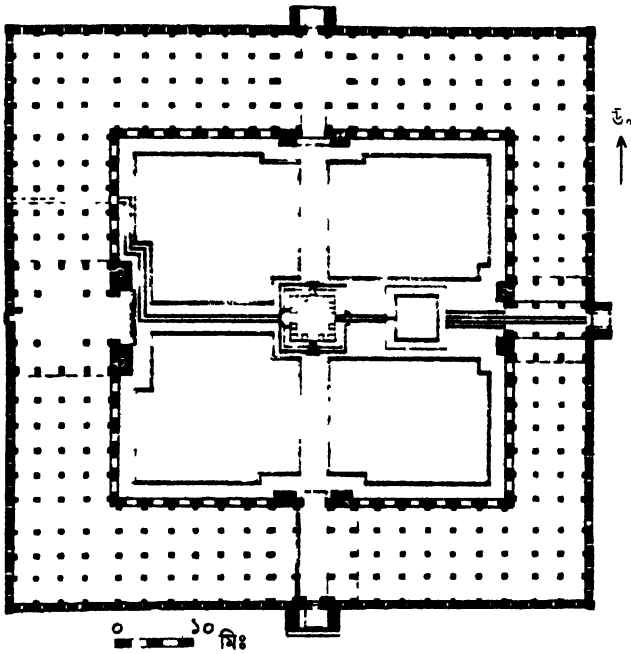
ভূমি নকশা নং-৪৮ : শ্রীনগর জামি মসজিদ, কাশ্মীর

এ মসজিদের স্তম্ভসারিতে প্রতিটি স্তম্ভ একক দেবদারু বৃক্ষ গুঁড়ি কেটে চেঁছে-ছিলে প্রস্তুতকৃত। এদের প্রতিটি ৭.৬৫ মি.- ১৫.২৫ মি. (২৫ হতে ৫০ ফুট) পর্যন্ত উচ্চতাবিশিষ্ট এবং এগুলোর মোট সংখ্যা ৩৭৮ টি। পাতলা খাড়া এবং দীর্ঘায়িত কাষ্ঠ নির্মিত স্তম্ভগুলোর অবস্থানের মধ্য দিয়ে অভ্যন্তরের যথানুপাতিক দৃষ্টিগোচর চেহারার কিছু ধারণা অবলোকন করা যেতে পারে। মসজিদের অন্যান্য অংশের তুলনায় এ অংশটি আকর্ষণীয় ও উচ্চতাবিশিষ্ট। একে অনুসরণ করে অপর অংশগুলো ছন্দিত হয়েছে।

শিল্পানুভূতির নিরিখে মসজিদ কাঠামোর সবচেয়ে প্রণিধানযোগ্য উপাদান হচ্ছে এর কাষ্ঠ নির্মিত খিলান বারান্দা ও খিলানপথের আড়ম্বরপূর্ণ মনোরম স্তম্ভগুলো। এগুলো শিল্পীর নিপুণ হস্তের স্পর্শে বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। পি. ব্রাউন মতো প্রকাশ করেছেন যে এ অপরিমেয় ইমারতের সাধারণ চেহারা চিত্তাকর্ষক হওয়ার পেছনে এর অতিশয় জাঁকালো মর্যাদাপূর্ণ অংশ গঠনের সুষমতা ভারতের অনেক বৃহৎ আকারের জামে মসজিদের মতোই মানানসই নকশায় নির্মিত হয়েছে। এর সাথে যোগ হয়েছে আবেগহীন ও সঠিক স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য।[৫]

জয়নাল আবেদীনের মাতার সমাধি :

কাশ্মীরে প্রাক মোগল যুগে চর্চিত স্থাপত্যকলার কিছু কিছু নিদর্শন অদ্যাপি বিদ্যমান রয়েছে। তবে এগুলো মুসলমানেরা পুরোনো হিন্দু মন্দিরকে তাদের প্রয়োজনীয় রূপ বা আকার দিয়েছিল মাত্র। এসব ইমারত মুসলমানেরা আংশিকভাবে নির্মাণ করেছিল এবং এটি তৎপ্রচলিত ইরানি স্থাপত্য পদ্ধতি দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল। কেননা পারস্যের ইটের গাঁথুনির অনুসরণ ও চকচকে টালির ব্যবহার এখানে লক্ষ করা যায়।

এ রীতির অনুসরণে নির্মিত ইমারতগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে জয়নাল আবেদীনের মাতার সমাধিসৌধ। জয়নাল আবেদীন ১৪২০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৪৭০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীরের শাসনকর্তা ছিলেন এবং এ সময়ের মধ্যে তার মাতার জন্য একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। শ্রীনগরে মুসলমানদের সর্বপ্রাচীন ইমারত বলে একে গণ্য করা যায়। মূলত নবম শতাব্দীর হিন্দু প্রস্তর মন্দিরের উপরের অংশ অপসারিত করে একে মাকবারায় রূপান্তর করা হয়েছিল।

মন্দিরের উপরাংশের অপসারণ করা হলেও এর পবিত্র দেব-দেবী এবং সংশ্লিষ্ট উপাঙ্গগুলো বিনষ্ট করা হয় নি। যেমন এর নিচু দেয়াল ও তোরণ পূর্বের মতোই রয়েছে। এ হিন্দু মন্দিরের নকশা পরিকল্পনা বর্গাকার এবং পার্শ্ব শাখা আয়তাকারে প্রতি কোণ হতে বৃত্তাকারে অভিক্ষিপ্ত হয়ে প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল। একে প্রচলিত মুসলিম মাকবারায় পরিবর্তন করা খুব একটা অসুবিধা হয় নি। এর আকারের পরিবর্তন সাধন করতে গিয়ে পূর্বের সে ভিত্তির ওপর ইটের উপকাঠামো গেঁথে তুলে কবর প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয় এবং এর উপরে পাঁচটি ছোট আকারের গম্বুজ সংস্থাপিত করা হয়। তবে এগুলোর মধ্যবর্তী গম্বুজটি অন্যান্য চারটি ছোট গম্বুজের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বড়।

প্রতিপার্শ্বের দেয়ালে সূক্ষ্মাগ্র খিলান নির্মাণ করা ছাড়াও গম্বুজের দীর্ঘ পিপায় শিরালোযুক্ত খিলানশ্রেণী নির্মাণ করে মাকবারাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা হয়েছে। অন্যপক্ষে ইমারতের ভিতরের দরজা পথে বিরল আকারের অশ্বখুরাকৃতি খিলান নির্মাণ প্রচেষ্টার চিহ্ন বহন করছে। এ মাকবারা নকশা নমুনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে এখানে নিয়োজিত স্থপতি, কারিগরবৃন্দ ইটের কাজে অভিজ্ঞ ছিল এবং তারা পারস্য স্থাপত্য পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। তাই এ সমাধিসৌধের অবয়বে পারস্য স্থাপত্য পদ্ধতির প্রভাব সক্রিয়ভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।[৬]

পীর হাজী মোহাম্মদের মাকবারা :

শ্রীনগরের অন্য আর একটি অনুরূপ ধরনের সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। এটি পীর হাজী মোহাম্মদের মাকবারা। এর মেঝে এবং উপরের কাঠামোর কোনাগুলো ছাড়াও আবেষ্টনী প্রাচীর প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের অংশবিশেষ। পরবর্তীকালে এর আদিরূপের কোনো পরিবর্তন না হয়েই অবস্থান করছে।

মাদানীর রওজা :

মাদানীর রওজা বা মাকবারা মসজিদ নামে পরিচিত। এ ইমারতটি যাদিবাল (Zadibal) শহরের উপকণ্ঠে জয়নুল আবেদিনের শাসনামলে ১৪৪৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এটি দেখে মনে করা যায় যে এতে স্থাপত্য নির্মাণ কৌশল অপেক্ষা অধিক চিত্রের ন্যায় স্পষ্ট ও চিত্রানুগরূপ উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কেননা এটি বিভিন্ন পরিত্যক্ত উপকরণ একত্রে সমন্বয় করে নির্মাণ করা হয়েছিল। এসব পরিস্থিতি বিচার-বিবেচনা করে সঠিকভাবে বলা যায় যে পুরোনো হিন্দু মন্দিরের অবস্থানের উপরই এটি নির্মিত হয়েছিল। এটি স্পষ্টভাবে বলা চলে যে এ মসজিদের প্রস্তর নির্মিত মেঝেটি হিন্দুদের এবং এর উপরের ইটের দেয়াল মুসলমানদের। মসজিদের গাড়ি বারান্দা নির্মাণে মন্দিরের অলঙ্কৃত স্তম্ভ ব্যবহৃত। অনুরূপ আর দুটি স্তম্ভ মাকবারার অভ্যন্তর প্রকোষ্ঠে প্রয়োগ করা হয়েছে।

প্রথম আলোচিত ইমারতের প্রবেশপথের ওপর ১৪০৪ খ্রিস্টাব্দের সময় অনুরূপ একটি শিলালিপি (হয়তোবা তা হিজরি সন) সংস্থাপিত রয়েছে। তবে এর সবচেয়ে মনোযোগ আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে এর টালি দ্বারা সজ্জিত চমৎকার সৌকর্যতা। বিশেষভাবে খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোনাকার ভূমিতে অঙ্কিত নকশা নমুনা সজ্জায়ন। এর বাহ্যিক অবয়বে প্রতীয়মান হয় যে এটি ইরানি কারিগরের হস্তে ইরানি পদ্ধতিতে নিষ্পন্ন হয়েছিল।

পামপুর জামি মসজিদ :

পামপুর শহরেও অনুরূপ মিশ্রিত উপাদানে নির্মিত একটি জামি মসজিদ দেখা যায়। এরও মেঝের অংশ মন্দিরের পরিত্যক্ত উপকরণ দ্বারা এবং উপরের অংশ কাঠ ও ইটের সংমিশ্রণে ইসলামি পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে। এসব ধারাবাহিক দৃষ্টান্ত হতে স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে মনে করা যায় যে কাশ্মীরের ইসলামিক স্থাপত্য আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক ইরানি স্থাপত্য পদ্ধতিতে রূপ নিয়েছিল। পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন স্বদেশ জাত বা দেশীয় গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত কাষ্ঠ স্থাপত্য ধারার মুখে মোগল বা পারস্য আদর্শ শেষ পর্যন্ত প্রবহমান থাকতে পারে নি।[৭]

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মোগল সম্রাটগণ কাশ্মীরে যে স্থাপত্য কার্যক্রম গ্রহণ করেছিলেন তা হিন্দু যুগের প্রস্তর নির্মাণ পদ্ধতির পুনর্জাগরণ করার জন্য নয়; বরং তাদের নিজস্ব স্থাপত্য পদ্ধতির আদর্শকে প্রবর্তনের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল। তাদের এ প্রচেষ্টা ভারতের অন্যান্য প্রদেশগুলোতে যেভাবে অনুশীলিত হচ্ছিল কাশ্মীরেও ঠিক সেভাবে চলমান ছিল। তাদের রাজত্বকালে কাশ্মীরে তিনটি নির্মাণ কাজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলো ইমারতে মোগল স্থাপত্য আদর্শ এমনভাবে নিষিক্ত হয়ে রয়েছে যে এদেরকে মোগল স্থাপত্যরূপে চিহ্নিত করতে ভুল হয় না। এসব স্থাপত্যকর্মের মধ্যে হরিপর্বতের দুর্গ ও আকহুন মোল্লা শাহ মসজিদ উল্লেখযোগ্য।

হরিপর্বতের দুর্গ :

হরিপর্বতের দুর্গ নির্মাণকার্যে উক্ত উপত্যকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রাপ্ত ধূসর বর্ণের চুনাপাথর ব্যবহৃত হয়েছিল। মোগল সম্রাট আকবর যখন হরিপর্বতে দুর্গ নির্মাণের কাজ শুরু করেন তখন কাশ্মীরে প্রস্তর দ্বারা ইমারত নির্মাণের জন্য উপযুক্ত কারিগর বা শ্রমিক সংগ্রহ করতে পারে নি। অবশেষে ভারতের অন্যান্য অংশ হতে দু শ পাথরের কাজে দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর সংগ্রহ করে তাদের দ্বারা প্রকল্প নিষ্পন্ন করেছিলেন বলে শিলালিপিতে উল্লেখ

রয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে কাশ্মীরের স্থাপত্য কারিগর ও শ্রমিকগণ কেবলমাত্র কাঠের কাজে অভ্যস্ত ছিল।

দুঃখের বিষয় আকবরের সে দুর্গ এলাকাটি এখন আর কোনো সংরক্ষিত এলাকা নয় বরং জনসাধারণের অবাধ বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে এবং তার সময়ের দুর্গের অধিকাংশ উপাঙ্গ অপসারিত হয়েছে। বলা বাহুল্য উক্ত দুর্গের আদি দেয়াল অংশ ও দুটি সদর দরজা যথা- কার্থি দরজা ও সঙ্গীন দরজা মোগল স্থাপত্য পদ্ধতির সারল্যপূর্ণ অথচ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

কার্থি দরজার প্রতিকৃতি দেখে একে দুর্গের প্রধান প্রবেশপথ রূপে চিহ্নিত করা যায়। এর অবয়ব কিছুটা সংযমিত ও গাম্ভীর্যপূর্ণতার প্রতীক বলে মনে হয়। অন্যপক্ষে সঙ্গীন দরজা অধিক ব্যয়বহুল ও অলঙ্কৃত। এটি অত্যন্ত উচ্চতাবিশিষ্ট এবং অংশ বিন্যাস ও গঠনে সুষমতা রয়েছে। এর দেয়াল খিলান কুলঙ্গি ধারণ করে রয়েছে এবং দেয়ালের প্রতি পার্শ্বে মনোজ্ঞ ঝুলন্ত বাতায়ন সংযুক্ত রয়েছে।

পাথর মসজিদ ও আকহুন মোল্লা মসজিদ :

মোগল আমলে আরো দুটি প্রস্তর স্থাপত্যকর্ম নির্মিত হয়েছিল। বলা যায় যে এগুলো অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের। তন্মধ্যে পাথর মসজিদ ১৬২৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাহাঙ্গীরেব প্রিয়তমা পত্নী নূরজাহানের আদেশে নির্মিত হয়েছিল। এ স্থাপত্যকর্মে মোটেই স্থানীয় কাষ্ঠ নির্মাণ পদ্ধতি দ্বারা প্রভাবিত হয় নি বরং সম্পূর্ণভাবে মোগল স্থাপত্য পদ্ধতিব নকশা পরিকল্পনা অনুসরণে নির্মিত হয়েছিল। এমনকি নির্মাণ সামগ্রী, উপকরণ ও নির্মাণ পরিচর্যা ও কৌশল যা এখানে প্রয়োগ করা হয়েছিল তা মোগল স্থাপত্য আদর্শের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

সম্রাট শাহজাহানের রাজত্বকালে ১৬৪৯ খ্রিস্টাব্দে আকহুন মোল্লা শাহ মসজিদটি একই রীতি ও আদর্শ অনুসরণে নির্মিত হয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে এ দুটি স্থাপত্য ইমারতের প্রতিরূপে যে পদ্ধতি দানা বেঁধে উঠেছিল তা ভারতের রাজধানী দিল্লিতে নির্মিত ইমাবতেব প্রয়োগকৃত স্থাপত্যরীতিরই পুনরাবৃত্তি।

হরিপর্বতের দুর্গে যে পদ্ধতির ছাপ মুদ্রিত হয়ে রয়েছে এটি পরিমিত সহনশীল শিল্পরীতি ব্যবহারের সাক্ষ্য বহন করছে। একে পারতপক্ষে প্রশস্তভাবে সজ্জায়ন প্রচেষ্টা সীমিত রাখা হয়েছিল এবং অপ্রয়োজনীয় উপাঙ্গ পরিহার করা হয়েছে। বিশেষভাবে হবিপর্বতের আবেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে ভাঙাচোরার মাঝে টিকে থাকা আকহুন মোল্লা শাহ মসজিদের যেটুকু ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয় তাতে মোগল স্থাপত্য আদর্শই ফুটে উঠেছে। এরূপ গাঠনিক কাঠামো পদ্ধতি মতো প্রশংসনীয়ভাবে নির্মিত হয়েছিল যে এটি বাস্তব অবস্থার সাথে সম্পূর্ণ হতে পেরেছিল। তবে এটি বিস্ময়ের সাথে লক্ষ করা যায় যে এ নমুনায় কোনো গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ অধিক পরিমাণে পরবর্তী সময়ে নির্মিত হয় নি। এর নকশা পরিকল্পনা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারের আয়তাকার আবেষ্টনী প্রাচীরের মাঝে চৌবাচ্চাসহ নির্মিত হয়ে পদপ্রখলন ব' অজু করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং এর শান বাঁধানো সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠগুলো এক সাথে অনেক মুসল্লির অজু করার ব্যবস্থা সংবলিত ছিল। মসজিদ আবেষ্টনীর পশ্চিম প্রান্তে জুল্লাহ বা নামাজ আদায় করার স্থান। এটি চতুষ্পার্শ্ব হতে পৃথক বা বিচ্ছিন্ন একটা বর্গাকার ইমারত একটি উন্মুক্ত বর্গাকার প্রাঙ্গণের মাঝখানে অবস্থিত। এব সম্মুখভাগে রয়েছে মসজিদের প্রধান প্রবেশপথ এবং তার পার্শ্বেই ছোট খিলানপথ অবস্থিত।

এর নির্মাণ প্রক্রিয়ায় লক্ষ করা যায় যে ইটের গাঁথুনির ওপর দিয়ে ধূসর কঠিন আগ্নেয়শিলা বা গ্রানাইট পাথরের পাটাতন আবরণ হিসেবে ইমারতের অধিকাংশ স্থান ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এর পৃষ্ঠদেশের পরিচর্যা স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ও নিপুণভাবে কর্মপরিচালনা সাধারণভাবে প্রশংসারযোগ্য। বিশেষভাবে লক্ষণীয় হচ্ছে যাতায়াতের খিলান সংবলিত পথগুলো। এ খিলানগুলো অতিমাত্রায় সাধারণ সহজবোধ্য হোক আর সূক্ষ্মাগ্র নকশা অঙ্কিত হোক অথবা অন্য যে কোনো আকারের হোক তবে সবই মনোজ্ঞ বক্রতায় অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যময় বৈশিষ্ট্য রচনা হয়েছিল যা সচরাচর দেখা যায় না।

পশ্চিম দেয়ালের বহির্গাত্রে অভ্যন্তরভাগের মিহরাবের মতোই কুলঙ্গি ধারণ করে রয়েছে। এ ধ্বংসপ্রাপ্ত ও অবহেলিত স্থাপত্য কাঠামো বহু দিক দিয়ে একটি সঠিক প্রয়োজনীয়রূপ মসজিদ কাঠামোর আদর্শ চিত্রণ বলে মনে করা যায়।

কাশ্মীরের অন্যান্য স্থাপত্য কর্ম :

এ উপত্যকায় দুর্গ ও মসজিদ দুটি ছাড়াও অন্যান্য ইট নির্মিত কাঠামোর ঐতিহাসিক বিবরণ রয়েছে। এদের কিছু কিছু গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণে রাত্রিযাপনের জন্য নির্মিত হয়েছিল, যেমন- পরীমহল। এটি পাহাড়ের গা ঘেঁষে দালহ্রদের সন্নিকটে অবস্থিত। পরীমহল যদিও উচ্চ ঢিবির ওপর বিশেষ ব্যবস্থা সংবলিত হয়ে আয়োজিত হয়েছিল কিন্তু এতে তেমন কোনো স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে নি। এর বাহ্যিক চেহারা দেখে মনে করা যায় যে হয়তো অত্যন্ত দ্রুততায় নির্মাণ করতে গিয়ে প্রয়োজনীয়রূপ পরিচর্যার অভাবে মজবুতভাবে সমাপ্ত হতে পারে নি। তাই আজ উক্ত ইমারতের অধিকাংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

তবে কাশ্মীরের শালিমারবাগে একটি ব্যতিক্রমধর্মী ইমারত নির্মিত হয়েছিল। তা হচ্ছে বৃহৎ আকারের চন্দ্রাতপ বা বারাদারি। এটি কালো প্রস্তরের স্তম্ভের ওপর ভর করে নির্মিত হয়েছিল। এর ভারবাহী আলম্বগুলো বিভিন্ন ধরনের কারুকার্যে সজ্জিত। এর প্রতিটি অংশ অত্যন্ত সুষমতায় গঠিত এবং অত্যন্ত শিল্প চাতুর্যের প্রয়োগে দক্ষতা ও নিপুণতায় সম্পাদিত। পি. ব্রাউন[৮] মন্তব্য করেছেন 'যে এরূপ স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের আরোপন তা ইটের কাজেই হোক আর পাথরের কাজেই হোক এর প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বহিরাগত শাসকদের প্রয়োজন মিটিয়ে তাদের মানসিক প্রশান্তি আনয়নের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখা'। স্থানীয় পদ্ধতি প্রধানত: কাষ্ঠ উপকরণে সনাতনী ঐতিহ্যবাহী নকশা পরিকল্পনায় নির্মিত হত এবং তৎপ্রবর্তিত ঐ সব ধারা হতে কোনো স্থাপত্য প্রভাব গ্রহণ না করে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রবাহিত হচ্ছিল, এমনকি ইরানি বা মোগল স্থাপত্য অনুশীলন প্রক্রিয়া বা পরিচর্যার প্রভাবও এর যাত্রাপথে কোনো প্রকার বিঘ্ন ঘটাতে পারে নি। হয়তো এ কারণেই কাশ্মীরের আদি কাষ্ঠ স্থাপত্যের নির্মাণ পদ্ধতি অদ্যাপি প্রবহমান রয়েছে।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. কাষ্ঠ দ্বারা দেয়াল গাঁথুনি সম্পর্কে জন মার্শাল লিখেছেন, "...... ...for the well finished timber work of the walls with its pleasing diaper of headers and stretchers"; cf: *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, দিল্লি, ১৯৫৮, ভলিউম-৩, পৃ. ৬৩৮।

২. "Certilever—a structural member which projects beyond the line of support"; দেখুন : *ইলাস্ট্রেড গ্লোসারি অব আর্কিটেকচার*, লন্ডন, ১৯৬৬, পৃ. ১২, চিত্র- ২১৫।

৩. নির্মাণ উপকরণ হিসেবে এ মসজিদে ইট ও পাথর ব্যবহৃত হয়েছে বলে জন মার্শাল মনে করেন। তিনি লিখেছেন, "Unlike the *Jami Masjid* (the mosque of Shah Hamadan), which is partly of timber, partly of brick and stone"; দেখুন : *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৪০।
৪. এ মসজিদের পুনঃনির্মাণ সম্পর্কে জন মার্শাল বলেছেন, "...............extended by his son Zain-ul-Abidin, it was thrice burnt down and thrice rebuilt-Once in 1479, a second time in 1620 and third time in 1674"; দেখুন : *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩৯।
৫. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮২, প্লেট-৬৮, নং-২।
৬. সমাধির নির্মাণ রীতি সম্পর্কে জন মার্শাল কিছুটা ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, "In style the tomb is typically saracenic, if not purely Persian; nor is there anything in its design (nor indeed, in the design of any other brick or stone building of this period)"; cf: *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া, পূর্বোক্ত*, পৃ. ৬৩৮।
৭. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৮২।
৮. *তদেব*, পৃ. ৮৩।

পঞ্চদশতম অধ্যায়
সূর স্থাপত্য

সাসারাম ১৫৩০-৪০ খ্রি., দিল্লী ১৫৪০-৫৫ খ্রি.

মোগল সম্রাট হুমায়ূনের রাজত্বকালেই (১৫৩০ খ্রি.) সাসারামে সূর স্থাপত্যের যে ধারা সূচনা হয় তা ১৫৪২ খ্রিস্টাব্দে শেষ হয়েছিল। দিল্লিতে অবশ্য সূর স্থাপত্য কার্যক্রম ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। তবে সামান্য কয়েক বছরেই স্থাপত্যচর্চায় সূরবংশ ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে স্থাপত্য উন্নয়নে এক অনন্য গতিধারা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিল।

শেরশাহের স্থাপত্য প্রকল্প ও পরিকল্পনা দুটি সুনির্দিষ্ট ধারায় ভিন্নতর মৌলিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বহিঃপ্রকাশিত হয়েছে এবং এ দুটি আলাদা স্থানে জন্ম লাভ করেছিল। এর প্রাথমিক ধারাটির সূচনা একজন ক্ষমতাশালী আফগান আমির হিসেবে বিহাব অঞ্চলেব শাসনকর্তারূপে। তাঁর বাজধানী সাসারামকে কেন্দ্র করে কতকগুলো সমাধিসৌধের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়িত হয়েছিল। ভারতে সে সময়ে প্রচলিত লোদী স্থাপত্য পদ্ধতি দ্বারা আফগানগণ পূর্ব হতেই অনুপ্রাণিত হয়েছিল এবং তার উন্নয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল বিহাবেব সাসাবামে।

অন্যপক্ষে তার স্থাপত্যকর্মের দ্বিতীয় ধারা মোগল সম্রাট হুমায়ূনকে পরাস্ত করে দিল্লি অধিকারের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। শেরশাহ কেবলমাত্র চলমান স্থাপত্যকর্মের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা করে দায়িত্ব শেষ করেন নি বরং একটা স্থাপত্য আন্দোলন গঠনের মধ্য দিয়ে স্থাপত্যের নতুন অর্থবহ বিকাশ ঘটানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন যা পরবর্তী মোগল স্থাপত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিরূপে গৃহীত হয়েছিল।

এর প্রথম ধারার সূচনা হয়েছিল সাসারামে। এটি বিহারের শাহাবাজ জেলার একটি ছোট্ট শহর। এখানে একগুচ্ছ কবর নির্মিত হয়েছিল। তন্মধ্যে এর তিনটি সমাধিসৌধ তাঁর পরিবারের সদস্যবৃন্দের এবং অপর একটি হচ্ছে শেরশাহের প্রধান প্রকৌশলী বা স্থপতির। অবশ্য এ স্থান হতে কয়েক মাইল পশ্চিমে সে যুগের একজন সম্ভ্রান্ত আমির বখতিয়ার খানের মাকবারাও নির্মিত হয়েছিল।

শেরশাহের সমাধিসৌধ :

দিল্লির মুসলিম রাজধানীতে নির্মিত সার্বভৌম সম্রাটদের সমাধির ন্যায় শেরশাহ নিজের সমাধিসৌধ নির্মাণের একটা সুপ্ত বাসনা সব সময় মানসিকভাবে তাঁর মধ্যে জাগ্রত ছিল এবং তা তিনি সম্রাট না হয়েই বাস্তবায়ন করেছিলেন।

এটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ যে সর্বোৎকৃষ্ট লোদী স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যপুষ্ট শেরশাহের সমাধিসৌধটি দিল্লিতে নির্মিত না হয়ে তা দিল্লি হতে প্রায় আট শ কি.মি. দূরবর্তী স্থানে তুলনামূলকভাবে প্রদেশের একটা প্রত্যন্ত অঞ্চলে নির্মিত হয়েছিল। সাসারামে অবস্থিত এ সমাধিটি প্রাদেশিক স্থাপত্যকর্ম হিসেবে পরিগণিত হতে পারত, কিন্তু এটি মুসলিম রাজধানীতে নির্মিত যে কোনো স্থাপত্যকর্ম হতে শ্রেষ্ঠত্বের অধিকাবী ছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে এ স্থাপত্যকর্ম সম্পাদনের পশ্চাতে অনন্যসাধারণ একটা প্রেরণাদায়ক চালিকাশক্তি কাজ করেছিল।

এ পরিস্থিতিব ব্যাখায় এটি স্মরণ করা যায় যে দিল্লির সমাধিসৌধগুলো যদিও উন্নত ধরনেব ছিল, কিন্তু এদের নির্মাতাবা অর্থাৎ লোদী সুলতানদের ক্ষমতা দিনে দিনে পতন অভিমুখে অগ্রসরমান হচ্ছিল। অন্যপক্ষে শেবশাহ্ তাঁর স্বল্পকালীন রাজত্বকালে স্থাপত্য পরিকল্পনামূলক কাজে সব সময় দুঃসাহসিক, বলিষ্ঠতার দীপ্তিময় ও উৎসারণ ব্যক্তিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তিনি পারিবারিক স্মৃতিসৌধের সঠিক স্থাপত্য পদ্ধতি নির্ধারণ করার জন্য একজন বিচক্ষণ নির্মাতাকে মনোনীত কবেন। তার নাম আলীওয়ালী খান।

আলীওয়ালী খান ছিলেন রাজকীয় রীতি পদ্ধতির স্থাপত্যকর্মে প্রশিক্ষিত একজন দক্ষ স্থপতি। শেরশাহ্ তাকে তাঁব স্থাপত্য প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বভার অর্পণ করেছিলেন। ঐতিহাসিকভাবে প্রতীয়মান হয় যে তাঁর প্রথম কর্মভার ছিল ১৫৩৫ খ্রিস্টাব্দের দিকে শেবশাহের পিতা হাসান খান সূরের কবরের উপব একটি সমাধিসৌধ নির্মাণ কবা।[১] হাসান খান সূরেব সমাধিসৌধ একটা আবেষ্টনী প্রাচীরের মাঝখানে অবস্থিত এবং এতে প্রবেশ কবাব জন্য মানানসই একটা তোরণ নির্মিত হয়েছিল। এ সমাধিটি সৈয়দ ও লোদী স্থাপত্যের বকমারি বৈশিষ্ট্য সংবলিত অষ্টভুজাকার পবিকল্পনায় নির্মিত

সাসাবামের এ সমাধিসৌধে প্রতীয়মান হয় যে এটি গঠনে প্রথম শিকড়ভিত্তিতে কোনো জৌলুস নেই; ইমারত কাঠামোটি সাদামাটা বরাবর প্রাথমিক কোনো উপকাঠামো ছাড়াই গড়ে উঠেছে। বাস্তবিকপক্ষে অবশ্য এতে ইমারত্বের দৈহিক ও মানসম্মান যেন বলপূর্বক কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তার পরের তলাটি একটা খোলামেলা বিশেষত্বহীন দেয়াল; অন্যপক্ষে দিল্লির রাজকীয় রীতিতে নির্মিত হলে পরদা ঘেরা নির্দিষ্ট ব্যবধানে সারিবদ্ধ ছত্রী থাকত। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে সাসারামে নির্মাণকৃত ইমারতে কোনো ঢালু দেয়াল নির্মাণের লক্ষণ নেই, যদিও ফিরোজীয় স্থাপত্যের ঢালুতার প্রভাব রাজধানীর উত্তরাংশে নির্মিত কিছু মাকবারায় তখন পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করা গিয়েছে।

পি. ব্রাউনের মতে[২] হাসান খানের মাকবারা নির্মাণের মধ্য দিয়ে হয়তো সূর স্থাপত্য নকশা পরিকল্পনার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটে নি, তবে এটি অংশত একটা পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা ছিল মাত্র। কিন্তু এর পর পরই যে স্থাপত্যকর্ম অর্থাৎ শেরশাহের নিজের সমাধিসৌধ বাস্তবায়নের সূচনা করা হয়েছিল তা তাঁর পিতার মাকবারা হতে সর্বদিক দিয়ে বহুগুণে অগ্রসরতা এনে দিয়েছিল। এটি ভারতীয় স্থাপত্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে একটি সর্বশ্রেষ্ঠ পূর্ণাঙ্গ ও কল্পনাপ্রবণ স্থাপত্যকর্মরূপে চিহ্নিত করা যায়। আলীওয়ালী খানের পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা নিশ্চিতরূপে একটা ঐশ্বর্যময় স্থাপত্য ইমারত নির্মাণে সক্ষম হয়েছিল।

আলীওয়ালী খান হয়তো লোদী পদ্ধতির স্থাপত্য নকশাকে তার প্রাথমিক চিন্তার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তবে এটি আদি আদর্শ নকশায় যেভাবে ব্যাখ্যায়িত বা নকশায়িত করা হোক না কেন বাস্তবে কিন্তু এটি ভিন্নতর অবস্থায় পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। অন্যভাবে বলা যায় যে দিল্লির দৃষ্টান্ত কেবলমাত্র প্রাথমিক ভিত্তির পদক্ষেপরূপে গ্রহণ করা

হয়েছিল যা স্থাপত্য সৃষ্টির একটা অবলম্বন এবং যা পরিশেষে অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছে গিয়েছিল।

স্থপতি প্রশংসাতীতভাবে তার মূল আদর্শ নকশার অংশকে সাসারামে বাস্তবায়িত করেছিলেন যা লোদী মাকবারা হতে আকার ও আয়তনে বহুগুণে বৃহৎ ছিল। কেননা শেরশাহের সমাধিসৌধের প্রস্থটাই ছিল ৭৬.২৫ মি. (২৫০ ফুট) এবং এর সাথে তলার সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এরূপে এটি এক বিশাল পিরামিডের আকারে সুবিন্যস্ত স্পষ্ট পাঁচটা ধাপে পূর্ণাঙ্গ ইমারতরূপে গড়ে উঠেছে এবং সম্পূর্ণ অট্টালিকা ৪৫.৭৫ মি. (১৫০ ফুট) উচ্চতায় উপনীত হয়েছে (ভূমি নকশা নং- ৪৯)।
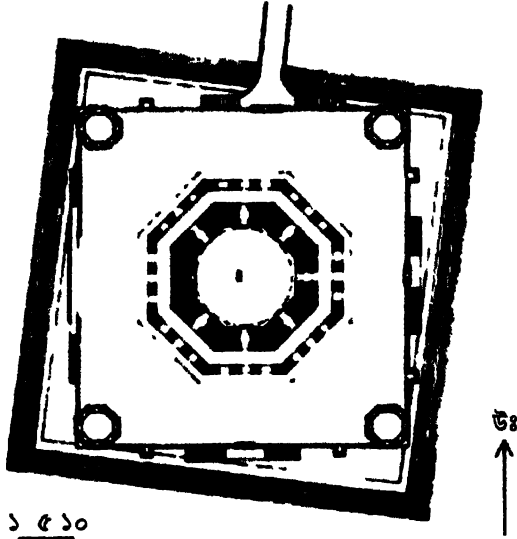
ভূমি নকশা নং-৪৯ : শেরশাহেব সমাধি

এ সমাধিসৌধের অপ্রতিদ্বন্দ্বীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সুষমতাপূর্ণ স্থাপনা। কেননা সমগ্র গঠন কাঠামোটা বর্গাকার সমচতুষ্কোণ অবস্থায় একটি কৃত্রিম জলাশয়ের মাঝখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটি এত বিস্তৃত যে এর পাকা পাটাতন করা প্রতি পার্শ্বের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪২৬.৭৫ মি. (১৪০০ ফুট) মতো। এ স্থাপত্যিক অতুলনীয় শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্মের জন্য প্রশ্নাতীতভাবে একটা বিস্ময়কর দার্শনিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন অনুভূতিই দায়ী যা অতিকল্পিত নিরেট আকার বিশিষ্ট নির্ভীক স্মৃতিসৌধটিকে হ্রদের স্বচ্ছ জলের উপর ভাসমান দেখানো হয়েছে; যার প্রতিফলিত ছায়া জলের উপর আন্দোলিত হয়ে দর্শকের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এবং ছায়া ও কায়া একই সাথে একে অভিভূত করে তোলে।

যদিও এ স্মৃতিসৌধের অবস্থা দেখে মনে হয় একে ধরিত্রী হতে নিঃসঙ্গ বা স্বাতন্ত্র করে রাখা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর সঙ্গে মাটির স্পর্শতা জলকে অতিক্রম করে একটা সুউচ্চ জাঙ্গাল দ্বারা সংযোগ রক্ষিত হয়েছে। এ জাঙ্গালটি দৃঢ়ভাবে নির্মিত উত্তর পার্শ্বের কিনারার প্রহরী প্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে স্মৃতিসৌধের সাথে সংযোগ রক্ষিত হয়েছে। মাঝে মধ্যে এটি বন্ধ এবং প্রতিরোধ্য অবস্থায় রক্ষিত।

এর পাঁচতলার মধ্যে দুতলা নিয়ে এ সমাধি দ্বীপের ভিত্তি বা কাঠামো অংশ গঠিত হয়েছে। এর সিঁড়িযুক্ত সর্বনিম্ন ভূগর্ভস্থতল সরাসরি জল থেকে উঠে এসেছে এবং তারপরের উচ্চ চত্বর। অবশ্য উক্ত সৌধের এ দুধাপ বা স্তর বর্গাকার মাপে বা আকারে গঠিত। এর পরবর্তী ধাপ বা চত্বরের উপর পৃষ্ঠদেশের নকশা এমনভাবে করা হয়েছে যে তাতে একটা প্রশস্ত প্রাঙ্গণ গঠিত হয়েছে এবং এর প্রতি কোনায় সুঠাম স্তম্ভায়িত চন্দ্রাতপ নির্মিত হয়েছে। এ প্রাঙ্গণের বৃহৎ পরিসর হতে সমাধির প্রকৃত সূচনা হয়েছে।

অষ্টভুজাকৃতি পরিকল্পনায় নির্মিত শেরশাহের সমাধি একটি ত্রিতলবিশিষ্ট ইমারত। প্রতি ধাপ ক্রমহ্রাসমানভাবে উপরের দিকে উত্থিত। ত্রিতলাকৃতির এ ইমারতের সর্বনিম্ন তলা অষ্টভুজাকারে নির্মিত এবং এর আট পার্শ্বেই ৩টি করে মোট ২৪টি খিলান ও তার সাথে উপরে ঝুলন্ত ছাঁইচ নির্মিত হয়েছে। এর উপরের দিকে উচ্চ খাঁজকাটা উন্নত বপ্র পরিবেষ্টিত এবং বপ্রের পার্শ্বেই আটকানায় রয়েছে আটটি মনোরম ছত্রী (চিত্র নং- ৭১)।

এ সমাধির দ্বিতীয় তলা সাদাসিধা ধরনের অষ্টভুজাকৃতির সমতল দেয়াল যা হাসান খানের মাকবারার মতোই। তবে এখানে কিছু অংশে প্রতি কোনায় স্তম্ভায়িত ছত্রী পরদা দ্বারা সংযুক্ত রয়েছে এবং উভয় ছত্রীর মাঝে ঝুলন্ত উন্মুক্ত গবাক্ষ সংযুক্ত। বাস্তবিকপক্ষে তৃতীয় ধাপে গম্বুজের পিপা দ্বারা গঠিত হয়েছে। এটি ছত্রীর সারি দ্বারা সজ্জায়িত হয়েছে ফলে বৃত্তাকার তলের অবস্থানের পরিবর্তন এসেছে। এরূপে পরিশেষে উদীয়মান বক্রতা বৃহৎভারী পদ্মচূড়ায় সমাপ্ত হয়েছে যা সমগ্র স্মৃতিসৌধের শীর্ষস্থান। এটিই খোলাখুলিভাবে স্মৃতিসৌধের বাহ্যিক রূপরেখা বা সীমারেখা।

স্থপতি সৌধ কাঠামোর গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলোকে অতি দক্ষতার সাথে দলবদ্ধ করে সমাবেশিত, যা অত্যন্ত মনোজ্ঞ চিত্তাকর্ষকভাবে প্রকাশমান হতে পেরেছিল। যদি একে স্থাপত্যিক বহিঃপ্রকাশের দৃষ্টান্তের দৃষ্টিভঙ্গিতে অবলোকন করা যায় তা হলে অবশ্যই মনে করতে হবে যে এটি একটি উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত কার্যক্রম, একটা প্রশান্ত, পরিমিত ও প্রকাণ্ড উজ্জ্বল দীপ্তশীল ও অত্যুৎকৃষ্ট সৃষ্টি যার জন্য যে কোনো দেশ গর্ববোধ করতে পারে।

যদিও সমাধিসৌধের জীবন্ত পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সুদীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে ছেঁটে বা অপসৃত হয়ে গিয়েছে তথাপি কোনো অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ হয়তো এ বৃহৎ গম্ভীর নিঃসঙ্গ ও নিস্তব্ধ অবয়বের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অতীতকে যদি স্মরণ করে তা হলে এর মর্যাদাপূর্ণ শান্তসৌম মুরতি দর্শনে হৃদয় গভীরে পুলক শিহরন জাগ্রত না হয়ে পারে না।

এর হ্রাসপ্রাপ্ত ধাপের সুষমতা, বর্গাকার হতে অষ্টভুজে মিলন অবস্থান্তরে গমন এবং অষ্টভুজ হতে গোলার্ধ আকারে অনুগমন, বৈচিত্র্যময় অংশ গঠনের বণ্টন প্রণালী, অনাড়ম্বরতা, শ্বসন-শক্তি বা দম এর প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্থপতি প্রতিটি প্রধান উপকরণের পরিমাপন করেছেন। অবশেষে অতি সতর্কতায় প্রকল্পের সকল অংশের বিন্যাস সাধন করেছেন। পি. ব্রাউন এ ইমারত সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে এ সমাধিসৌধ নিঃসন্দেহে একজন ভারতীয় স্থপতির সৌন্দর্যশাস্ত্রের ওপর অগাধ পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভার চরম বিন্দুতে উপনীত হওয়ার সাক্ষ্য বহন করছে।[৩]

সমাধিসৌধের অভ্যন্তরভাগে আয়োজিত গঠন ও চমৎকারিত্বের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করলে দেখা যায় যে কবর প্রকোষ্ঠের প্রবেশ করতে বৃত্তাকারে বেষ্টন করা বারান্দার দরজা অতিক্রম করতে হয়। এ সমাধিসৌধের পশ্চিম পার্শ্ব বাদ দিয়ে প্রত্যেক পার্শ্বেই এরূপ দরজার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু পশ্চিম পার্শ্বে বন্ধ করে দিয়ে সেখানে মিহরাব স্থান নিয়েছে। এটি একক ঢেউ ছাদযুক্ত মিলনায়তন যার ব্যাস ২০.১৫ মি. (৬৬ ফুট)। এতে জেরুজালেমের 'কুব্বাত-উস-

সাখরা' বা এর মতো দ্বিজ গম্বুজ ধারণ করে নি। এখানে গম্বুজটি সরাসরি স্মৃতিসৌধের শান বাঁধানো উপরিভাগ হতে শীর্ষের চূড়া পর্যন্ত ২৭.৪৫ মি. (৯০ ফুট) উপনীত হয়ে শেষ হয়েছে।

যেহেতু এ সমাধিসৌধের নির্মাণ নকশা অষ্টভুজাকৃতি সেহেতু অভ্যন্তরীণ নির্মাণ কৌশল বিজাপুরের বর্গাকার গোলগম্বুজ নির্মাণ হতে সম্পূর্ণ ভিন্নতর। বিজাপুরের গোল গম্বুজের নির্মাণ নকশা বর্গাকার এবং খিলান প্রতিচ্ছেদন পদ্ধতি আড়াআড়িভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে, অন্যপক্ষে এখানে অষ্টভুজাকারের ফলে এক পর্যায় হতে অন্য পর্যায়ে অনুক্রমণে অধিক সরল প্রক্রিয়ায় নিষ্পন্ন হয়েছে। কেননা এখানে আটটি পার্শ্ব হতে বৃত্তাকারে আগমনের প্রক্রিয়া সঞ্চালনের জন্য অষ্টভুজাকারে প্রতি কোণে খিলানকৃত কুলঙ্গি এবং এর সহায়ক হিসেবে বর্গা ও ঠেকনা পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

এর অভ্যন্তর দেয়াল তিন সারি আরোপিত খিলানের সমন্বয়ে গঠিত। প্রত্যেক সারি যতই উপরে উঠে গিয়েছে ততই উচ্চতা কমে এসেছে, কিন্তু খিলানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। ভূমি তল মেঝেতে আটটি, দ্বিতীয় সারিতে ষোলটি এবং সর্বশেষে উপরে বত্রিশটি খিলান সৃষ্টি হয়েছে। প্রত্যেক ধাপে কোণগুলো সর্দল দ্বারা সেতুর মতো সংযোগ ঘটেছে। সমগ্র নির্মাণ পদ্ধতি অত্যন্ত সরল এবং নিখুঁত পরিচালনা ও দক্ষ কারিগরি সুলভ অনুভূতিতে সম্পাদিত হয়েছে।

এ সমাধিসৌধের অভ্যন্তরে প্রধানত সরাসরি দরজা পথেই আলো প্রবেশ ব্যবস্থা রয়েছে, তবে মিলনায়তনের অভ্যন্তরভাগের ওপর অংশে নকশায়িত ও অলঙ্কৃত খিলানেব সচ্ছিদ্র পরদার ভিতর দিয়ে আলো প্রবেশ করতে পারে। মোটের ওপর কবর প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরভাগের পরিকল্পনা মানানসইভাবে সম্পন্ন। কেবলমাত্র পশ্চিম দিকের দেয়ালটাই খোদাই সমৃদ্ধ জাঁকজমকপূর্ণ লেখনকশা দ্বারা সজ্জিত এবং এর ফাঁকে ফাঁকে বিভিন্ন বর্ণের টালি ব্যবহারের মাধ্যমে এর সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

এ স্মৃতিসৌধ নির্মাণে অতি মসৃণ বেলে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। এসব পাথর খণ্ড অল্প দূরে অবস্থিত চুনার প্রস্তর খনি হতে সংগৃহীত। হয়তোবা প্রথমত ঐখান হতে বিরাট বিরাট প্রস্তর খণ্ড সংগৃহীত হয়েছিল এবং পরে এগুলোকে প্রয়োজন অনুসারে পরিমিতমাপে আকার দেওয়া হয়েছিল। যাব ফলে অট্টালিকার গাঁথুনি জোড়াগুলো সুন্দর ও পরিপক্ক হয়েছে। এ ইমারতটি দেখতে অবিচল ধূসর বর্ণের এবং সমাধিসৌধের পবিত্রতার প্রতি দৃষ্টি রেখে কিছুটা মলিন ও বিষণ্নময় দেখানো হয়েছে। তবে এটি পরিষ্কাররূপে বুঝা যায় যে যখন এটি প্রথম নির্মিত হয়েছিল তখন ভিন্নতর অনুভূতি বা আবেগ প্রতিফলন বহন করানোর জন্য রূপায়িত হয়েছিল। কেননা উজ্জ্বল চকচকে এবং চিত্রায়িত অলঙ্করণের প্রচুর প্রত্নিদর্শন এর বহির্দেয়ালে অঙ্কিত রয়েছে। এগুলো নির্দেশ করে যে রকমারি রঙের উদার অভিপ্রায়ণও প্রকল্পের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে এর অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এ ছাড়া অন্যান্য নকশা যেমন কানজুরা বা তীর নিক্ষেপের ছিদ্র উন্নত বপ্রে দেখতে পাওয়া যায়; অথবা প্রক্ষিপ্ত ছাঁইচের নিচের রঙিন টালি অলঙ্করণে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। অতি পরিষ্কার ও স্পষ্ট জ্যামিতিক নকশাগুলো লাল, নীল, হলুদ এবং সাদা রঙের সংমিশ্রণে বলিষ্ঠভাবে উজ্জ্বলকৃত। অন্যপক্ষে সৌধটিকে সৌন্দর্যময় করার জন্য পরিমাণমতো উপকরণ ও উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। মোটামুটি রঙের কার্যক্রম ছত্রী ও উপগম্বুজসহ সৌধপৃষ্ঠের সকল অংশে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। অধিকন্তু বৃহৎ গম্বুজটিকে চকচকে শুভ্র রঙের দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয়েছে। এর শিরোচূড়ায় আরোপিত চূড়াটিও রক্তিমাভ স্বর্ণ রঙ দ্বারা উজ্জ্বলকৃত।

এ সৌধের অপরূপ দৃশ্য শোভা হ্রদয়ে স্বচ্ছ জলের ঢেউয়ের সাথে কম্পিত অবস্থায় প্রতিবিম্বিত হচ্ছে। এ স্মৃতিসৌধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে প্রাচ্য দেশীয় মহার্ঘ ও ঐশ্বর্যবানের অতীব ব্যয়বহুলতার ধারণা অর্জিত হয়েছে। বাংলাদেশ হতে দিল্লির আগ্রা পর্যন্ত নির্মিত রাস্তার পার্শ্বেই এ সমাধিসৌধ অবস্থিত। বলা বাহুল্য একদা শেরশাহই ঘোড়ার ডাক চালু করার প্রয়োজনে এ রাস্তা নির্মাণ করেছিলেন তাই ইংরেজ আমলে এ রাস্তাটি গ্রান্ডট্রাঙ্ক রোড নামে অভিহিত হয়েছে। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে নির্মিত রাস্তা দিয়ে তখন হতে অবিরত জনসাধারণের অবাধ চলাচলের মাঝে এ সৌধের ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য দিক দিগন্তে প্রসারিত ও প্রচারিত হয়ে চলছে।

প্রথম দৃষ্টিতে এটি প্রতীয়মান হয় যে সাসারামস্থ শেরশাহের সমাধিসৌধ নিখুঁতভাবে প্রতিসম ও সুসামঞ্জস্য নকশায় নির্মিত হয়েছে। কিন্তু এর উপকাঠামোগুলো পরীক্ষা করলে দেখা যায় যে নির্মাণ কাজ চলাকালেই কৌতূহলময়ী অনেক উপাঙ্গ সংশোধন করা হয়েছিল। এটি পূর্বে নির্ধারিত হয়েছিল যে উক্ত সৌধের মুখ কম্পাসের কাঁটার বিপরীতে অর্থাৎ দক্ষিণমুখী হবে। কিন্তু মেঝের বৃহৎ ধাপ বা সোপানগুলো পর্যন্ত গেঁথে তোলার পর স্থপতি আবিষ্কার করতে পেরেছিল যে বেদির গাঁথুনিতে ভ্রান্তি হয়েছে এবং গণনায় হিসাব করে দেখা গেল যে আট ডিগ্রি অবস্থানের ভুল হয়ে গিয়েছে।

ইসলামি বিধান মতে কবর উত্তর-দক্ষিণে সারিবদ্ধকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু তখন অত্যন্ত দেরি হয়ে গিয়েছিল এবং উপকাঠামো ভেঙে সাজাবার উপায়ও ছিল না। কাজেই উপরের অংশ তলদেশের ভূগর্ভস্থ বুনিয়াদের সাথে কোনাকোনিভাবে পুনরায় গোঁজামিল দিয়ে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়। সৌধের পার্শ্বগুলোকে নিখুঁত ও সঠিক গতিপথে গেঁথে তোলার প্রয়োজনে ভূমি নকশাও যা ছিল তা হতে যথেষ্ট পরিমাণে বাঁকানো হয়েছে। এ পরিবর্তন সাধন বাস্তবিকপক্ষে সামগ্রিকভাবে সৌধের কোনো ক্ষতি হয় নি। তবে পরবর্তী ভুলের সমন্বয় করতে গিয়ে স্থপতিকে অবশ্যই অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল যার সাথে সময় ও সম্পদের অপচয় স্বাভাবিকভাবে সম্পৃক্ততা লক্ষ করা যায়। বলা বাহুল্য স্থপতি তা দক্ষতার সাথে ত্বরান্বিত করতে সক্ষম হয়েছিল।

সমাধিসৌধের প্রারম্ভিক নির্মাণকালে এমন একটি পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে হ্রদের মাঝখানে অবস্থিত সৌধে কীভাবে তীরভূমি হতে গমন করা যাবে। এ প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে সৌধ ঠিকই মাঝখানে থাকবে এবং স্থলভাগের সাথে যোগাযোগ রাস্তা দ্বারা নয় তবে রাজকীয় বজরা বা প্রমোদতরী ও মাঝিমাল্লা থাকবে। তারাই যাতায়াতের দায়িত্বে থাকবে। সে ব্যবস্থার প্রমাণস্বরূপ মঞ্চ বা ধাপ সৌধগাত্রে নিচে পানির কিনারে প্রত্যেক পার্শ্বে নির্মাণ করা হয়েছিল। হ্রদের পূর্ব তীরে কিনারা ঘেঁষে উঁচু ধাপের মতো গড়ে তোলা হয়েছিল।

পরিশেষে এ পরিকল্পনা বাতিল করে উচ্চ জাঙ্গাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তবে এ সিদ্ধান্তের পূর্বে আবার কবরের উচ্চ ভিত্তির সাথে সরাসরি জাঙ্গাল সংযোগ করে দেবার পরিকল্পনা ছিল। অবশেষে এ জাঙ্গাল হ্রদের জলের মধ্য দিয়ে অস্থায়ী গড় বা ছোট্ট দুর্গের মতো প্রকোষ্ঠের ভিতর দিয়ে সমাধিসৌধে গিয়ে উপনীত হয়েছে। তবে জাঙ্গালে পা রাখার পূর্বে প্রহরী প্রকোষ্ঠ অতিক্রম করতে হত।

বর্তমানে এ জাঙ্গাল ও প্রহরী প্রকোষ্ঠ এত জরাজীর্ণ যে এ থেকে প্রকৃত নকশার আন্দাজ করা কষ্টকর। তবে সাসারামের আর একটি সমাধির অনুরূপ নির্মাণ কাজের বৈশিষ্ট্য যাচাই করা সম্ভবপর হয়েছে। এটি শেরশাহের পুত্র সেলিম খানের মাকবারা। এর কৃত্রিম হ্রদের

মাঝখান হতে জাঙ্গালের সাহায্যে স্থলভাগের সাথে সংযোগ রক্ষিত হয়েছে। তবে এখানে নির্মাণ কৌশলে একটু ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। এখানে সেতু নির্মাণ করা হয়েছে। এতে খিলান ব্যবহার করা হয় নি, তবে প্রয়োজনীয় থাম ব্যবহৃত হয়েছে এবং দুথামের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গার ভার বহন করার জন্য পাথরের কড়ি ও আলম্বের সহযোগিতা নেওয়া হয়েছে, যা ক্যানটিলিভার (cantılever) রীতির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

প্রতিটি থাম শীর্ষে ছত্রী নির্মিত হয়েছে এবং তার সাথে ঝুলন্ত ব্যালকনি রয়েছে। এটি শেরশাহের সমাধিসৌধের চেয়েও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকৃতি প্রদানের পরিকল্পনা থাকলেও ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে সেলিমের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে এটি বাস্তবায়নের পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। এখানেই সূর স্থাপত্য নির্মাণরীতির চিরতরে যবনিকা পড়ে গিয়েছিল।

দিল্লি ভিত্তিক সূর স্থাপত্য (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রি.) :

সূর স্থাপত্যের দ্বিতীয় ধারার বিকাশ শেরশাহের ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দে দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে শুরু হয়েছিল। এটি তাঁর স্থাপত্যশিল্পের প্রতি ঐকান্তিক আগ্রহের বহিঃপ্রকাশ চিহ্নিত করেছে; যেমন তাঁর সামরিক তৎপরতায় দৃঢ়তা ছিল তেমনি স্থায়ী শিল্প গড়ারও একটা মানসিকতা ছিল। তাঁর সমস্ত স্থাপত্যকর্মে এ চেতনা আত্মপ্রকাশ হতে দেখা যায়।

দিল্লিতে তাঁর স্থাপত্য প্রকল্প পুরানাকেল্লা নির্মাণের মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছিল। দেয়াল পরিবেষ্টিত মানানসই আকারের একটা স্থান নিয়েই তার দুর্গ নির্মাণ পরিকল্পনা সূচিত হয় যার মধ্যে তাঁর রাজধানীর মূলকেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছিল। বলা বাহুল্য এটিই দিল্লিব ষষ্ঠ নগরী। এখন সেখানে কেবলমাত্র আলাদা আলাদা স্থানে দুটি তোরণ পথ ধ্বংসের হাত হতে অবশিষ্ট রয়েছে যৎদ্বারা উক্ত নগরের সীমারেখা শনাক্ত করা যায় মাত্র। অবশ্য শেরশাহের নগর নির্মাণ পরিকল্পনা কখনো বাস্তবায়ন হয় নি। এখন দুর্গের খোলসটি অবশিষ্ট রয়েছে; সেখানে কোনো অট্টালিকা নেই, তবে একটি মসজিদ দণ্ডায়মান রয়েছে হয়তোবা পবিত্র ধর্মীয় পাদপীঠ হিসেবে পারস্য হতে প্রত্যাবর্তিত মোগল সম্রাট হুমায়ূনের হাত হতে এটি রক্ষা পেয়েছিল।

উক্ত বিস্তৃত খালি জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে যে পুরাকীর্তির ধ্বংসাবশেষ রয়েছে তা থেকে ধারণা করা যায় যে যখন এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছিল তখন একটি সেনাশিবির ও রাজপ্রাসাদ স্থানটিকে পরিপূর্ণ করে রেখেছিল। তা ছাড়াও প্রাসাদের হলঘর ও চন্দ্রাতপ বা প্যাভিলনের কিছু অংশ জরাজীর্ণ অবস্থায় বিদ্যমান। পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন যে 'দুর্গ বা তৎসংলগ্ন ইমারতগুচ্ছ ধ্বংসের ফলে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের উন্নয়নের ধারার যে একটা নজির সৃষ্টি হয়েছিল সে তথ্য হতে মানব সভ্যতা বঞ্চিত হয়েছে'।[৫]

এর কঠোর ধূসর বর্ণের বুরুজ সংবলিত দেয়াল অমসৃণ অথচ সুন্দর বন্ধনে বেলে পাথর দ্বারা শক্তিশালীভাবে নির্মিত হয়েছে এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসূচক রঙ ও উচ্চ শ্রেণীর উপকরণে অতীব কারিগরি দক্ষতায় তোরণ দুটি নির্মাণ ও সজ্জায়ন করা হয়। এটি মসৃণ লাল বেলেপাথর ও শ্বেতমর্মর দ্বারা নির্মিত এবং চকচকে উজ্জ্বল নীল বর্ণে সজ্জিত। বিশেষভাবে পশ্চিম দেয়ালের ঠিক মাঝখানে অবস্থিত দুর্গের প্রধান প্রবেশ তোরণ একটি অনন্যসাধারণ মনোজ্ঞ ও সুঠাম স্থাপত্যকর্ম। এ দরজার স্থাপত্য বৈচিত্র্য হতে অনুভব করা যায় যে দুর্গের অভ্যন্তরে অবস্থিত ইমারতগুচ্ছের প্রতিকৃতি ও সজ্জায়ন কী ধরনের ছিল।

কিলা-ই-কুহনা মসজিদ :

শেরশাহের আমলে সূর স্থাপত্য পদ্ধতিতে যে বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়েছিল তা দুটি স্থাপত্যকীর্তি অবলোকন করলে সমক্ষ উপলব্ধি করা যায়। কিলা-ই-কুহনা মসজিদ এ দুটির মধ্যে অন্যতম। এ মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে স্থাপত্য উন্নয়নের যে ধারা চর্চিত হয়েছিল তা কেবল শেরশাহের আমলে দিল্লিতে চর্চিত স্থাপত্যের দৃষ্টান্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং এটি নিজেই একটা স্থাপত্যিক নকশা পরিকল্পনার ঐশ্বর্যময় অনুকরণীয় আদর্শ ছিল। তুলনামূলকভাবে পরবর্তীকালে অল্প পরিসরে একই প্রজাতীয় যে মোগল স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল তার অধিকাংশ অনুপ্রেরণা এটি হতে সংগৃহীত হয়েছিল।

পি. ব্রাউন, কিলা-ই-কুহনা মসজিদকে রাজকীয় ভজনালয় (royal chapel) হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। এটি শেরশাহ্ কর্তৃক ১৫৪১ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদটির কাঠামো অত্যন্ত ক্ষুদ্র হলেও স্থাপত্যিক দিক হতে গুরুত্বপূর্ণ এবং শেরমণ্ডল নামে অর্থহীনভাবে নির্জনে শূন্য জায়গায় অবস্থিত এবং এটি পরে দুর্গপ্রাকার দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়।

কিলা-ই-কুহনা মসজিদ নির্মাণের পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অনেক মসজিদ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য নিয়ে নির্মিত হয়েছিল। কিন্তু একমাত্র জামালিয়া মসজিদ ব্যতীত অন্য কোনো মসজিদের সাথে কিলা-ই-কুহনা মসজিদের তুলনা করা যায় না। এ মসজিদ কিলা-ই-কুহনা মসজিদের প্রায় ১৫ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল; তবে তথ্যবহুল এবং মসজিদ স্থাপত্যের ইতিহাসে এ ধরনের মসজিদের শেষ ধাপ। এ দুটি মসজিদের স্থাপত্য পরিকল্পনা প্রায় একই ধরনের। উভয় মসজিদের সম্মুখ দেয়ালে পাঁচটি টিউডর প্রকৃতির সূচগ্র খিলানপথ এবং কেন্দ্রীয় দরজাটা একটু ভিতরের দিকে ঢুকানো ও খিলান এখানে খাঁজকাটা হারিয়ে গিয়ে সুস্পষ্ট আয়তাকারে সম্মুখভাগে একটু এগিয়ে রচিত হয়েছে এবং এর পশ্চাতে একক লোদী পদ্ধতির গম্বুজ নির্মিত হয়েছে[৭]।

মসজিদের অভ্যন্তরের প্রত্যেক অংশ লম্বা মিলনায়তন আকারের, যা পার্শ্বগত খিলান দ্বারা পাঁচটি 'বে'-তে বিভক্ত হয়েছে। কিবলা দেয়াল পর্যন্ত তোরণ শোভিত পথ হিসেবে এদের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। মসজিদের ছাদকে ধরে রাখার জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে। তবে উভয় মসজিদের ছাদের ভারবহন পদ্ধতি বিভিন্ন হলেও এদের ধরন প্রায় একইরূপ। তথাপি সামগ্রিকভাবে দুটি মসজিদের গঠন কিছুটা ভিন্নতর।

এ ছাড়া স্থাপত্য গঠনকারী বিভিন্ন উপকরণগুলোর ওপর কৌশল প্রয়োগ পদ্ধতির নিরীক্ষায় অভিজ্ঞতা প্রয়োগের বৈসাদৃশ্য লক্ষ করা যায়। এতে এটিই প্রমাণ করে যে ১৫ বছর সময়ের ব্যবধানে যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল সে অভিজ্ঞতার আলোকে দুটির বাস্তব কর্ম নিষ্পন্নের তারতম্য চোখে ধরা পড়েছে। জামালিয়া মসজিদের প্রতিটি অঙ্গ কিছুটা অপরিবর্তিতভাবে রূপায়িত হয়েছিল; অন্যপক্ষে কিলা-ই-কুহনা মসজিদের নির্মাণ কাজে কোনো প্রকার সংশোধন জোড়াতালি ছিল না, অতি দক্ষতার সাথে একবারেই নিখুঁতভাবে নির্মিত হয়েছিল। কাজেই কিলা-ই-কুহনা মসজিদ এ পদ্ধতির চরম বা শেষ প্রতিনিধিত্বমূলক অবদান।

কিলা-ই-কুহনা মসজিদ একটি অতীব সাধারণ ধরনের মসজিদ। এটি কেবলমাত্র জুল্লাহ নিয়ে গঠিত। আয়তাকার এ মসজিদটির দৈর্ঘ্য ৪৮.১৬ মি. (১৫৮ ফুট) ও প্রস্থ ১৩.৭৫ মি. (৪৫ ফুট) এবং ২০.১৫ মি. (৬৬ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। মসজিদের পিছন ও পার্শ্ব বিভিন্ন প্রাকারের মনোজ্ঞ উপকরণে সুশোভিত হয়েছে; যেমন- ঝুলন্ত ব্যালকনিতে অভিক্ষিপ্ত অলিন্দ, দুটি দৃঢ়কায় সোপানচূড়া, উত্তর ও দক্ষিণ পার্শ্বে রাজকীয় পরিবারবর্গের জন্য নির্মিত প্রবেশপথ ইত্যাদি।

কিন্তু মসজিদের প্রকৃত বা প্রধান সৌন্দর্যকল্পন রয়েছে এর সম্মুখ দেয়ালের বহির্ভাগের গঠন ও পরিচর্যার মাঝে। সম্মুখ দেয়াল পাঁচটি প্রবেশপথের সমন্বয়ে গঠিত। এগুলো বৃহৎ খিলান সংবলিত কুলঙ্গির মধ্যে সংস্থাপিত। কিন্তু বিশেষত্ব হচ্ছে যে এর প্রতিটি অংশ যেভাবে প্রকল্পায়ন ও সুসম্পন্ন করা হয়েছিল সেটাই প্রণিধানের বিষয়বস্তু। এত সুন্দরভাবে নিষ্পন্ন করা অংশগুলো একটি আর একটির সাথে সংযোগ ঘটিয়ে পরিশেষে একটা নিখুঁত স্থাপত্যকর্মরূপে বহিঃপ্রকাশিত করানো সম্ভব হয়েছিল।

এ সুষম ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকার সমৃদ্ধ রঙ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল গাঁথুনি বেলে পাথরের সাথে কিছু অংশে শ্বেতমর্মর প্রয়োগ কবা হয়েছে। এ ছাড়া মাঝে মধ্যে রঙ খচিত করেও অলঙ্কৃত করা হয়েছে। এতে সৌন্দর্য বৃদ্ধির উপকরণ প্রয়োগের বিষয় ছাড়াও কিছু ঐতিহাসিক ও রীতিগত বৈশিষ্ট্য এর অঙ্গে প্রত্যক্ষ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কেন্দ্রীয় আয়তাকার 'বে'-এর প্রত্যেক পার্শ্বে সরু চূড়া, খাঁজকাটা নকশা যা কুতুব মিনারের খাঁজকাটা নকশার অনুকরণে প্রস্তুত হয়েছিল। অনুরূপভাবে আবাব একজোড়া পশ্চাৎ দেয়াল দৃষ্ট হয় যা তোঘলক স্থাপত্যের নিচ হতে ক্রমসরু হয়ে উপরে উঠে যাওয়ার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

কিলা-ই-কুহনা মসজিদের খিলান নির্মাণেও বিবর্তনেব চিহ্ন বিদ্যমান। খিলানেব আকারত্বে দেখা যায় যে সাধারণ খিলানের চেয়ে একটু ভিন্ন ধরনের রূপায়ণ সংবলিত হয়ে গিয়েছে। খিলানের ঠিক মাঝের কিছুটা নেমে এসে সমতল আকৃতি ধারণ করেছে এবং শীর্ষের দিকে বক্রতা ফুটে উঠেছে যা টিউডর বা মোগলদের চতুর্কেন্দ্রিক খিলান নির্মাণেব প্রাথমিক পদক্ষেপ রূপে চিহ্নিত (চিত্র নং- ৭২)।

অভ্যন্তর কাঠামোর উচ্চ বিন্যাস গঠন লক্ষ করা যায়। পাঁচটি 'বে'-এব সৌষ্ঠবপূর্ণতা ও মার্জিত সুষমতার প্রতিফলন পরিপক্ক শিল্প মেধার পরিচয় বহন করছে। অন্যপক্ষে খিলান ও খিলানশ্রেণীর সরল প্রশস্ত ঢালাইয়ের কার্যোপযোগী ব্যবস্থা, বিচক্ষণতায় ঢালাই ও নকশালঙ্কারে কিবলা পার্শ্বের বৈচিত্র্য সাধন, দক্ষতার সাথে উদ্ভাবিত ও শিল্পজনোচিত সুবিধাজনক কৌশলে ঢেউ ছাদেব ভার বহন ব্যবস্থা ইত্যাদি কৌশলের বিবর্তন ও অনুশীলন প্রমাণ করে যে নিয়োজিত স্থপতি ও কারিগরবৃন্দ তাদের দায়িত্ব ও কর্মশক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ ছিল। তাদের প্রকৌশল দৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা সম্পর্কে ধারণা কেমন পরিপক্ক ছিল তা এ মসজিদের বিভিন্ন উপাঙ্গ গঠনে বুঝা যায়। বিশেষ করে ছাদ নির্মাণ কৌশলের অবস্থানতর বা এক অবস্থা হতে অন্য অবস্থায় আনয়নের মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে। স্থপতিরা এ কাজ সফল করার জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করেছিল; কেন্দ্রীয় 'বে'-এর গম্বুজ নির্মাণের জন্য অবস্থান্তর পর্যায়ে ব্যবহৃত হয়েছে স্কুইঞ্চ; কেন্দ্রীয় 'বে'-এর উভয় পার্শ্বে 'বে'-দ্বয়ের ওপর খিলান ছাদ ন্যস্ত করার জন্য অস্বাভাবিক ধরনের ক্রমপ্রলম্বন পদ্ধতিতে নির্মিত মুকার্নাস ব্যবহৃত হয়েছে এবং উভয় প্রান্তের 'বে'-দ্বয়ের খিলান ছাদ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে ক্রুশাকৃতির পঞ্জর। ছাদ নির্মাণের এরূপ অভিনব পদ্ধতিকে শক্তিস্বরূপ এক বিস্ময়কর আবিষ্কার বলে অভিহিত করেছেন।[৮]

মসজিদে সবচেয়ে যে নৈপুণ্য সৌন্দর্যময় কাজ তা মিহরাবে মূর্ত হয়ে উঠেছে। পশ্চিম দেয়ালে যে পাঁচটি মিহরাব নির্মিত হয়েছে তা পাঁচটি 'বে'-এর সম্মুখভাগে কিবলা দেয়াল অবস্থিত। এগুলোর নকশা পরিকল্পনা ও সজ্জায়ন ঠিক সম্মুখ দেয়ালের খিলান কুলঙ্গির অনুরূপ রীতি ও পদ্ধতি অবলম্বনে করা হয়েছে। সুতরাং বলা যায় যে, পূর্বাপর সঙ্গতি রেখেই মসজিদটি নির্মিত হয়েছে। তবে অতি চাতুর্যতার অত্যধিক সূক্ষ্ম বা অলঙ্কৃতভাবে ঢেউ কুলঙ্গি

একটি অপরটির মাঝে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া প্রধান খিলানের পার্শ্ব প্রান্তর ফুল ও লতা-পাতার কাজে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে অঙ্কণ করে স্থানটি ভরাট করা হয়েছে। আয়তাকার গঠনে কিনারাগুলো সুবিধাজনক ও প্রয়োজনীয় দক্ষতা সহকারে সর্বত্র শিল্পায়িত ও চিত্রায়িত হয়েছে। অভ্যন্তরের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলোই ফলিত শিল্পায়নের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বলে মনে করা যেতে পারে।

শেরশাহের সীমান্ত দুর্গ নির্মাণ প্রকল্প :

শেরশাহেব অপর যে স্থাপত্যকর্মটি নিষ্পন্ন হয়েছিল তা কোনো মসজিদ নয়, এটি হচ্ছে একটি দুর্গ। এটি পাঞ্জাবের ঝিলাম শহর হতে প্রায় ২০ কি.মি. উত্তর-পশ্চিমে রোটাস নামক স্থানে অবস্থিত। মূলত এটি ছিল তাঁর রাজ্যেব ঐ অঞ্চলের দুর্ধর্ষ উপজাতিকে সংযত রাখার জন্য ছোট্ট থানা বা চৌকি। এটি অত্যন্ত মজবুতভাবে নির্মিত হয়েছিল। কেননা এর দেয়ালের গাঁথুনির ঘনত্ব ছিল প্রায় ১২.১৫ মি. (৩০ হতে ৪০ ফুট)। যদিও এটি সামরিক কাবণে নির্মিত হয়েছিল, তথাপি স্থাপত্যিক দৃষ্টিকোণ হতেও সমভাবে গুরুত্বপূর্ণ। এর ১২টি তোরণ পথ সে যুগের চমৎকার স্থাপত্যকর্মের নিদর্শনরূপে চিহ্নিত। এদের মধ্যে সোহল দরজা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে পাহারা দেয়ার জন্য নির্মিত হয়েছিল। অপেক্ষাকৃত সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান এ প্রবেশপথটি অবলোকন করে বলা যায় যে শক্তিশালীভাবে সামরিক প্রয়োজন রূপায়ণের পরও স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এটি অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও সৌষ্ঠবময় হয়েছিল।

এর উচ্চতা সব দিকে এক সমান ছিল না, তবে কোনো কোনো জায়গায় উচ্চতা ২১.৩৫ মি. (৭০ ফুট) পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল। দুর্গের প্রধান প্রবেশপথ অতি মনোরম ও মানানসইভাবে নির্মিত হয়েছিল। দেয়ালের উভয় পার্শ্বেই দেয়াল হতে ঝুলন্ত অভিক্ষিপ্ত জানালা সংযুক্ত ছিল। গঠন কাঠামোর প্রতি অংশ প্রশস্ত ও সরলভাবে নিষ্পন্ন করা হয়েছে। প্রতিটি রেখা সমতল ও দেখতে মসৃণ, পরিমিত ও বৃহদায়তন এবং সুরুচিপূর্ণ। অন্যপক্ষে সমস্ত স্থাপত্যকর্মটি শিল্পবিদ্যাব দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিপূর্ণ একটা নিখুঁত অবদানে পরিণত হয়েছে।

এ সমস্ত কাজকর্মের নমুনা অবলোকন করে বলা যায় শেরশাহের স্থপতি ও কারিগরগণ যথেষ্ট বাস্তববাদী মনীষার অধিকারী ছিল এবং প্রয়োজনীয় পদ্ধতি ও প্রণালী গ্রহণ করে একটা কাজকে শিল্পতে পরিণত করতে পারত।

শেরশাহের সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে খুব সামান্য স্থাপত্যকর্ম নির্মিত হয়েছিল। তবে তার যে বিস্তৃতি স্থাপত্য কর্মসূচি ছিল এর সামান্য অংশই বাস্তবায়িত হওয়ার সময় ও সুযোগ এসেছিল। বলা বাহুল্য যেটুকু টিকে রয়েছে তা দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে তিনি স্থাপত্যের আলোকবর্তিকা হাতে ধারণ পূর্বক তাঁর অপরিসীম মেধা ও বুদ্ধিমত্তা সহযোগে তা বাস্তবায়নে সচেষ্ট ছিলেন। তিনি ব্যাপক স্থাপত্য কর্মসূচির কল্পনা বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তার ধারণকৃত এ অনুভূতি ও লিপ্সা অসময়ে মৃত্যুমুখে পতিত হলে তা কার্যকর হতে পারে নি।

সুলতানের স্থাপত্যশিল্প গড়ার মানসিক ইচ্ছার কথা সমসাময়িককালের একজন ঐতিহাসিক এরূপ ভাষায় লিপিবদ্ধ করেছেন যে,[৯] '(আমি) এ প্রকারের ইমারত গড়ব যা বন্ধু-শত্রু বিনা দ্বিধায় তাদের বদান্যতামূলক প্রশংসা পাবে এবং আমার নাম পৃথিবী লয়প্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অম্লান রইবে'; তিনি আবার দুঃখের সাথে উপসংহার টেনে বলেছিলেন, 'কোনো একটা ব্যাকুল বাসনা আল্লাহ আমাকে পরিপূর্ণরূপদানে সুযোগ দিল না, এ দুঃখই

আমি কবরে বহন করে নিয়ে যাচ্ছি'। শেরশাহের স্থাপত্য শিল্পগড়ার এরূপ একটা দৃঢ় চিন্তাভাবনা ছিল তা বুঝা যায়। মূলত তাঁর ক্ষমতার আত্মগরিমার সাথে ধর্মীয় সুবাস মিলিত হয়ে আধ্যাত্মিক চিন্তাচেতনা তাঁকে দারুণভাবে পরিচালিত করত।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. এ ইমারতের মিহরাব শীর্ষের শিলালিপি হতে জানা যায় যে, জনৈক শেখ আবু শারওয়ানীর অনুরোধক্রমে শেরশাহের আমলে (১৫৪০-৪৫ খ্রি.) এটি নির্মিত হয়। আর. নাথ মনে করেন যে, এটি ১৫৪০-৪৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নির্মিত হয়ে থাকবে। আবার বিহাবে শেরশাহের ক্ষমতা সুদৃঢ় হওয়ার পর আনুমানিক ১৫৩৮ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মিত হতে পারে বলে কানিংহাম মনে করেন; দেখুন : *আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া*, ভলিউম-৪১, পৃ. ১৮৬; আর. নাথ, *হিস্ট্রি অব সুলতানাত আর্কিটেকচার*, দিল্লি, পৃ. ৯১; *আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া রিপোর্ট*, ভলিউম-১১, পৃ. ১৩৮-৩৯।
২. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৮৪।
৩. *তদেব*, পৃ. ৮৫।
৪. "The dome of Gol Gumbad is supported by Ingenious system of intersecting arches, transferring the shape of the square chamber to the circular drum from which the dome springs. These arches also support a circular platform slightly projecting over the chamber, masking the springing of the dome On the other hand the dome of shershah tomb was attained by the "beam and bracket" method, supplemented by an arched niche corresponding to a squinch, at eachangles"; দেখুন : জি. মিচেল, *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড*, লন্ডন, ২০০০; পৃ. ২৬৭। পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৫।
৫. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৬।
৬. *তদেব*।
৭. জে. ফারগুসন, *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এন্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার*, ভলিউম-২, লন্ডন, ১৯১০, পৃ. ২৮৬।
৮. শান্তিস্বরূপ, *ফাইভ থাউজেন্ড ইয়ার অব আর্টস এন্ড ক্রাফটস ইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান, বোম্বে*, ১৯৬৮, পৃ. ১০৯।
৯. উদ্ধৃতির জন্য দেখুন, পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৮৭।

ষোড়শতম অধ্যায়
মোগল স্থাপত্য
(১৫২৬-১৭০৭ খ্রি.)

ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম আধিপত্য বিস্তারের পর স্থাপত্য ও শিল্পকলা চর্চার ক্রমবিকাশ এবং উন্নয়ন ধারা বিশ্লেষণ করে মোটামুটি দুটি যুগ প্রত্যক্ষ করা যায়। একটি মোগল পূর্ব যুগ, অপরটি মোগল যুগ। প্রথম যুগের সময়সীমা মোহাম্মদ বিন কাসিমের ৭১২ খ্রিস্টাব্দে সিন্ধু বিজয় হতে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট বাবর কর্তৃক পানিপথের প্রথম যুদ্ধে পাঠান সুলতান ইব্রাহীম লোদীর পরাজয় পর্যন্ত বিস্তৃত। দ্বিতীয় যুগের সূচনা প্রথম মোগল সম্রাট বাবরের দিল্লির সিংহাসনে আরোহণের সময় হতে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের পরিসমাপ্তি (১৭০৭ খ্রি.) পর্যন্ত বলা চলে। মোগল সাম্রাজ্য ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকে থাকলেও ১৭০৭ খ্রিস্টাব্দের পর তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম লক্ষ করা যায় না। অবশ্য ১৫৪০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে শেরশাহ ও তাঁর বংশধরের রাজত্বকালকে স্থাপত্য অনুশীলনের বৈশিষ্ট্য বিচারে পূর্ব যুগের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। মোগল পূর্ব যুগের সুলতানগণ ও সূরগণ প্রায় সকলেই পাঠান ও আফগানিস্তান বা ইরানের পূর্বাংশের অধিবাসী এবং সাংস্কৃতিক উৎসমূলে প্রায় একই ধারায় প্রবাহিত ছিল।

মামলুক সুলতানগণের সময় স্থাপত্যশিল্প উন্নয়নে হিন্দু প্রভাব সমন্বিত জাঁকজমকপূর্ণ নির্মাণ কার্যাবলির উৎকর্ষ খল্‌জীদের সময় পরিপূর্ণতা লাভে সমর্থ হয়েছিল এবং ইসলামি স্থাপত্য ক্রমে ক্রমে হিন্দু প্রভাবকে অতিক্রম করে বা সংমিশ্রণে নতুন স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের জন্মদান সম্ভব করে তুলেছিল। এ স্থাপত্য ইমারতের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল খোদাই কার্যের মাধ্যমে বিচিত্র কারুকার্যে ইমারতের অঙ্গ সজ্জায়নে আঙ্গিক সৌষ্ঠব বৃদ্ধিকরণ। অন্যপক্ষে তোঘলক সুলতানগণের সময় ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য ধারার গতি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

তোঘলক স্থাপত্য ধারায় স্থাপত্য নকশা পরিকল্পনা রূপায়ণে কঠোর সংযম ও সারল্যপূর্ণ অভিব্যক্তির আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল অথচ এর অব্যবহিত পূর্ব যুগে সম্প্রসারিত নকশালঙ্কার ও কারুকার্যের নয়নাভিরাম মুরতির প্রাচুর্যময় আভাস স্থাপত্য-গাত্রকে প্লাবিত করতে দেখা গেছে।

মানব মনের এ বিপরীত সংঘাতময় চিন্তাধারার উন্মেষ বা চেতনার পরিপুষ্টি লাভের পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে হিন্দু প্রভাবময় স্থাপত্যের যাত্রাপথে নিষ্ক্রমণ তোঘলক গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়ায় বাধাপ্রাপ্ত হয়ে অন্য পথে প্রবাহিত হয়ে মানব ইতিহাসের ধারার

সনাতন নিয়মের পুনরাবৃত্তি করেছে মাত্র। এ বিবর্তনের ধারা হৃদয়ঙ্গম করতে হলে বিশেষ কথাটি মনে বাখতে হবে যে সংস্কৃতি নদীর স্রোতের মতো প্রাকৃতিক নিয়মে এঁকেবেঁকে অগ্রসর হতে থাকে। তাই মানব ইতিহাসের ধারাও কখনো সরলভাবে অগ্রসর হয় না; এটি সব সময় সর্পিল গতিতে প্রবহমান। একবার সংস্কৃতি নদীর গতিপথ বিশেষ কূলের দিকে অগ্রসর হয়ে সব প্রভাবকে আত্মস্থ করে ফেলে, আবার গতিপথের পরিবর্তন করে প্রতিক্রিয়াস্বরূপ বিপরীত দিক সমবেগে ধাবিত হয়।

মানব জীবন ধারা তথা ঐতিহাসিক ধারায় স্বাভাবিক প্রকৃতিই কতকটা এরূপই। কেননা সংঘাতময় বিপর্যয় ছাড়া সরলভাবে কোনো কিছু গড়ে ওঠে না। নব সৃষ্টির জন্য চাই সংঘাতময় আবর্তন ও বাধাবিপত্তি। সভ্যতার ইতিহাস এভাবেই এগিয়ে চলেছে। বিশ্ব ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায় মন্থনে মানব মনের যে ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা বিসর্পিত অর্থাৎ আঁকানো-বাঁকানো প্রকৃতির। এটি মানব চিন্তাধারার প্রতিরূপ। মানবজীবন সর্পিল গতিতে চলার রীতিকে দার্শনিক হেগেল বিশ্লেষণ করেছেন অস্তি-নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে বিচাব শাস্ত্র সম্মত উপায়ে।

এর মূল কথা হচ্ছে প্রত্যেক জাতি যুগে যুগে একবার ত্যাগের দিকে অর্থাৎ ধর্মীয় গোঁড়ামির দিকে, দ্বিতীয়বার ভোগ ও আড়ম্বরশীলতার দিকে প্রলুব্ধ হয়। ভোগের লিপ্সা যখন চরম বিন্দুতে উপনীত হয় তখন ত্যাগের প্রতি আসক্তি ও আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আবাব ত্যাগের উৎকর্ষ কাঠিন্যতায় জাতীয় জীবনে বিরূপ উচ্ছৃঙ্খলতাময় বিপ্লবের সূত্রপাত ঘটায়। তা সত্ত্বেও শেষের ভোগ-লিপ্সার সাথে প্রথমবারের ভোগ-লিপ্সার যথেষ্ট পার্থক্য থাকে। কেননা এবারেব যে তৃষ্ণা এটি ত্যাগেব অভিজ্ঞতায় রঞ্জিত প্রবৃদ্ধ। এতে উদ্যম আবেগ থাকলেও অপরিপক্বতার অবিমৃশ্যকারিতা নেই। ভারতের ইতিহাসে মামলুকদের স্থাপত্য যেমনি জীবন কৈশোরের চপলতায় উদ্ভ্রান্ত ও অসংযতায় পরিপূর্ণ, তোঘলকদের স্থাপত্য তেমনি কঠোর গোঁড়ামিপূর্ণ সারল্যময়তায় ভরপুর। এরূপ সরলতায় শৈল্পিক চেতনার কোনো স্ফুরণ সম্ভবপর হতে পারে না। অন্যপক্ষে মোগলদের স্থাপত্য বিপ্লব নবালোকে সাফল্য ও সম্ভোগের আবেগে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই মোগলদের স্থাপত্য পরিকল্পনাগুলো ফুটন্ত দোলন চাঁপার মতো শুভ্রতায় স্নিগ্ধ হয়ে ভারত ভূমিকে শেষবারের মতো সুবাসে প্লাবিত করে দিয়েছে।

মোগল সম্রাটগণের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতে বিশেষ করে উত্তর ভারতের স্থাপত্য কার্যক্রম উৎকর্ষ লাভ করেছিল। পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন[১] "এ মুসলিম রাজবংশের অধীনে ভারতীয় স্থাপত্যশিল্প অত্যন্ত ঐশ্বর্যবান ও অতি ব্যয়বহুলতায় নির্মিত হতে পেরেছিল"। ভারতের বুকে তখন যে স্থাপত্যশিল্পের চর্চা শুরু হয়েছিল তা মূলত মুসলিম স্থাপত্য উন্নয়ন ধারায় তুলনামূলকভাবে সর্বশেষ প্রান্তিকের সূচনা এবং এ ধারাকে গুরুত্বপূর্ণ অথচ সর্বশেষ উৎকর্ষময় যুগ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। তিনি এ যুগকে ভারতের মুসলিম কলা ও স্থাপত্যের গ্রীষ্মকাল অর্থাৎ বাংলাদেশের বসন্তকাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। তার ভাষায় মোগল যুগ প্রকৃতপক্ষে মুসলিম ভারতের সবচেয়ে স্বর্ণময় স্থাপত্য যুগরূপে চিহ্নিত। এ সময়ে স্থাপত্যে যে উর্বরা ও উজ্জ্বল দীপ্তিময়তা এসেছিল তা চিরভাস্বর হয়ে রয়েছে। মোগলদের পূর্বে যারা স্থাপত্য চর্চা শুরু করেছিল তাদের স্থাপত্যকর্মে পতনমুখিতার চিহ্ন বিধৃত হতে দেখা গিয়েছে। এর প্রধান কারণ ছিল দিল্লিভিত্তিক শাসকদের রাজ্যের অস্থিতিশীল অবস্থান এবং পর্যাপ্ত অর্থ প্রাপ্তির পথ সুগম না থাকা। অন্যপক্ষে প্রাদেশিক বাজধানীগুলোতে আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্য নির্মাণ ধারা অব্যাহত ছিল।

ঠিক এ রকম সময়েই মোগলরা উত্তর ভারতের বুকে তৈমুর বংশীয় চেতনায় সকল প্রকার উন্নততর বুদ্ধি ও মেধার কার্যক্রম প্রাণবন্ত করতে সচেষ্ট হয়। অবশ্য তাদের কার্যক্রমের সীমারেখা বিশেষভাবে স্থাপত্যচর্চার মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। মোগলদের রাজত্বের প্রথম দিকে অনিশ্চয়তাপূর্ণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে তেমন কোনো স্থাপত্য গড়ে না উঠলেও রাজ্যের স্থিতিশীল অবস্থা ফিরে আসার সাথে সাথে তারা স্থাপত্যচর্চায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেন এবং ভারতীয় স্থাপত্যধারায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতির প্রবর্তন করতে সমর্থ হন।

তাদের স্থাপত্যকর্মে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক পদ্ধতির প্রভাব মূর্ত হয়ে ওঠে নি। অন্যপক্ষে তাদের স্থাপত্য কেন্দ্রীয় রাজকীয় ধারারূপে সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। অবশ্য স্থানীয় প্রভাব সামান্য পরিমাণে নিষিক্ত হয়েছিল এ কথা অনস্বীকার্য। মোগলদের স্থাপত্যকর্ম রাজ্যের যে অংশেই নির্মিত হোক না কেন এর নিজস্ব স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ইমারতগুলো গঠন কাঠামোব মাঝে অভিসিঞ্চিত হতে দেখা গিয়েছে এবং রীতি ও পদ্ধতি বিশ্লেষণে একই প্রকারের প্রভাব সর্বত্র দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

মোগল স্থাপত্য কার্যক্রমের এরূপ উচ্চমানে উন্নয়নের পিছনে কতকগুলো স্পষ্ট ও অনিবার্যকারণ ছিল। মোগল স্থাপত্যশিল্প যে মানে উন্নত হতে পেরেছিল তা দু শ বছরের বেশি সময় অবধি অব্যাহত ছিল। এসব কারণগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম যা প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে তা হচ্ছে সাম্রাজ্যের বিশালতা, সম্রাটদের ক্ষমতা ও আর্থিক সচ্ছলতা। আর দ্বিতীয় কারণ তুলনামূলকভাবে রাজ্যের স্থিতিশীলতা এবং স্থিতিশীল রাজ্যের সকল অংশ একইভাবে প্রশাসনিক সমতা। অপর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে নিঃসন্দেহে শাসকদের স্থাপত্য ও অন্যান্য শিল্পকলার প্রতি বিশেষ অনুরাগমূলক ভূমিকা ও তাদের শৈল্পিক চেতনাপূর্ণ মানসিকতা।

মোগল বংশের যে ছয়জন শাসক পর্যায়ক্রমে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন তাঁরা সকলেই স্থাপত্য, চারুকলা ইত্যাদির প্রতি গভীর প্রাণবন্ততা ও আকর্ষণীয় মানসিকতার সাক্ষ্য রেখে গিয়েছেন। মোগলদের সময়ে যে সংস্কৃতির চর্চা প্রত্যক্ষ করা যায় তার অনুপ্রেরণা সব সময়ই সিংহাসন হতে অর্থাৎ রাজদরবার হতে সূচিত হয়। তাঁদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় রাজ্যের সর্বত্র নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুশীলন ও অনুবর্তন হয়েছিল। যখনই রাজানুগ্রহ দ্বারা সংস্কৃতি চলমান হয়েছে তখনই তা দিনে দিনে বিকাশমান ও উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হয়েছে; অন্যপক্ষে রাজানুগ্রহ বঞ্চিত শিল্প বিকাশের সুযোগ হারিয়ে পতনমুখী হয়ে পড়েছে।

মোগল সম্রাট বারর, হুমায়ূন, আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান এবং আওরঙ্গজেব স্থাপত্য কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। তন্মধ্যে আকবর ও শাহজাহানের স্থাপত্য পরিকল্পনাগুলো সমধিক প্রসিদ্ধ ও উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয়েছিল। তবে আওরঙ্গজেবের সময় মোগল স্থাপত্যের জৌলুস কমতে আরম্ভ করে। অন্যপক্ষে আকবর ও শাহজাহানের সময় স্থাপত্যশিল্পের অঙ্গনে যে পদ্ধতির জন্ম হয়েছিল তা তৎকালীন পৃথিবীর একটা সেরা স্থাপত্য পদ্ধতিরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

মোগল স্থাপত্যের মাঝে অনুশীলনের মাপকাঠিতে দুটি ধাপ লক্ষ করা যায় যা পরপর গড়ে উঠেছিল— প্রথমটি সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে লাল বেলে পাথর সহযোগে স্থাপত্য নির্মাণ এবং অপরটি সম্রাট শাহজাহানের প্রধানত শ্বেতমর্মর ও কৃষ্ণমর্মর দ্বারা স্থাপত্য নির্মাণ কার্যক্রম। শাহজাহান তাঁর বিলাসপূর্ণ মনোরম প্রাচুর্যতায় স্থাপত্যকর্ম রূপায়ণে বিশেষভাবে

শুভ্র ও কৃষ্ণমর্মরের সাথে মূল্যবান ধাতুর পেট্রাডুরা ও খোদিত নকশালঙ্কার রঙের অভিনব কাজের সমাহার লক্ষণীয় করে তুলেছিলেন।

মোগল স্থাপত্যে প্রতিটি ইমারত ঐশ্বর্যশালী ও অত্যন্ত উচ্চমানের জাঁকালো ও সুরুচিপূর্ণ। এরূপ গুণসম্পন্ন অট্টালিকা সৃষ্টির পিছনে দেখা যায় যে প্রত্যেক শাসক ব্যক্তিগতভাবে স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিল। তাদের অন্যান্য চিন্তাধারায় অক্ষমতা বা ব্যর্থতা থাকতে পারে। কিন্তু তাদের সংস্কৃতি দৃষ্টিভঙ্গির তেমন কোনো ভ্রান্তি ছিল না বললেই চলে, বিশেষভাবে স্থাপত্য ও চিত্রশিল্প রূপায়ণের আস্বাদন পূর্বক উপলব্ধির চেতনাবোধ খুবই প্রখর ছিল এবং মান উন্নয়নের সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতায় তাদের কোনো জুড়ি ছিল না।

এরূপ প্রাণবন্ত পরিস্থিতিতে এমনকি যেসব অনুচরবর্গ পরামর্শ দিতে পারত তাদের চেয়ে অন্তত এ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত বেশি সংস্কৃতি বান রূপে শাসকরা প্রতীয়মান হয়েছে। বলা বাহুল্য বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই যে মোগলদের রাজত্বকালে ভারতে বহু সংখ্যক প্রাসাদ, দুর্গ, স্মৃতিসৌধ, মাকবারা, উদ্যান, বিজয় তোরণ, নগর, মসজিদ ও ধর্মনিরপেক্ষ ইমারত গড়ে উঠেছিল এবং সেগুলোর মান সাধারণ ধরনের চেয়ে উজ্জ্বল দীপ্তি অত্যুৎকর্ষ ও সমারোহপূর্ণ ছিল। প্রতিটি স্থাপত্য নকশা পরিকল্পনায় শাসকদের প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা সক্রিয়ভাবে প্রত্যক্ষ করা যায়।

মোগল স্থাপত্যের জন্য প্রদীপ্ততা এবং এটি নির্মাণের অতিশয় আকুলতাসহ নির্মিত কর্মকে বাঁচিয়ে রাখা বা শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্য সমর্থন দান করা একটা নৈতিক দায়িত্ব বলে তারা মনে করত। তাদের এ উপলব্ধি বোধ হতে অবিচল পৃষ্ঠপোষকতার একটা অলিখিত অনুশাসন কার্যকর ছিল। তাদের এ ধরনের মানসিকতার উদাহরণ ইতিহাসে বিরল। অবশ্য অনুরূপ সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালনের নজির চীনের রাজকীয় দরবারে কোনো কোনো শাসকের ছিল তবে তা অপেক্ষাকৃত মোগলদের চেয়ে নিম্নমানের। চীনে তাদের সংস্কৃতিচর্চার উৎকর্ষময় যুগে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার ফলে সাধারণ মানুষের কলাচর্চার গুণগত সাবলীলতা এসেছিল ঠিকই তবে তা মোগলদের সমকক্ষ ছিল না।

ক্রিট দ্বীপে প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে ঐ স্থানেও প্রতীয়মান হয়েছে যে মাইনোয়ান্স (minoans) এর যুগে রাজকীয় সিংহাসন হতে অবিরতভাবে সংস্কৃতির উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা করা হয়েছিল। ভারতের ইতিহাসে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত রাজাদের আমলে কলাচর্চার স্বর্ণময় যুগের আগমন ঘটেছিল। তারা ব্যক্তিগতভাবে কোনো না কোনো কলাবিদ্যায় পারদর্শী ছিল। ইংল্যান্ডের ইতিহাসেও প্লান্টাজেন্টেস্ (plantagenets) রাজারা গুপ্তদের মতোই অনন্যসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এবং তাৎপর্যময় শিল্পকলা ও সাহিত্য সৃষ্টির পটভূমি রচনা করেছিল। তাদের সময়েই ইংরেজি সাহিত্যের অমর কবি চসার লাঙলন্ডের (chaucer langland) জন্ম হয়েছিল।[৩]

কিন্তু বিশাল পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও ব্যক্তিগত আরোপিত বাস্তব প্রভাবময় এত ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গতায় রাজসিংহাসনের সাথে কারিগরের যোগসূত্র সৃষ্টি হতে পারে নি যা মোগলদের যুগে সম্ভবপর করে তোলা হয়েছিল। ভারতীয় ইতিহাসের ধারাবিবরণী বা ভাষ্যকারেরা তাদের লেখায় তুলনামূলকভাবে সময় সময় এ প্রসঙ্গে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করে গিয়েছেন। তা ছাড়া দার্শনিকভাবে অন্য আর একটি সূত্র হতে অনুমান করা যায় যে মহাপরাক্রমশালী শাসকের স্তর হতে যখন সক্রিয় আগ্রহান্বিতা অন্য কর্মকর্তাদের অবগতির মাঝে পৌঁছে যেত তখন এর একটা আপেক্ষিক প্রভাব সর্বস্তরে বিস্তার লাভ করত এবং

পরিশেষে সকল শিল্পকলা বিশেষভাবে স্থাপত্যকলার অনুশীলন প্রাধান্য লাভ করতে পারত।

এভাবেই মোগলদের সকল স্থাপত্যকর্ম অনুপম সত্তায় নির্মিত হয়েছিল। এর ফলে মোগল সাম্রাজ্য ভারতের যে অংশে বিস্তার লাভ করেছিল সেখানেই এ বিশেষ ধরনের স্থাপত্য ইমারত নির্মিত হয়েছিল। তবে স্বাভাবিকভাবে মোগল স্থাপত্যকর্মগুলো স্থানীয় পরিবেশগত অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও মোগল স্থাপত্য পদ্ধতি ও নির্মাণ কৌশল নির্মাণের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল প্রকল্পায়নে সব সময় মোগলদের মৌলিক রীতি অনুসরণ করা ।

মধ্যএশিয়ার ফারগানার অধিবাসী জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর এশিয়ার দুটি প্রধান সংস্কৃতি সমৃদ্ধ জাতির বংশধর বলে পরিচিত। এর একটি হচ্ছে মোঙ্গল, অপরটি তৈমুরীয়। এ দুটি রাজবংশ স্থাপত্য নির্মাণ কাজে যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করেছিল। সমরখন্দ, বোখরা ও মধ্যএশিয়ার অন্যান্য শহরে সে যুগে নির্মিত প্রাসাদ, দুর্গ, মাকবারা ইত্যাদি এর সাক্ষ্য বহন করছে। মোগলরা ভারতে আসার প্রাক্কালে তাঁদের পূর্বপুরুষের সংস্কৃতির বীজ হৃদয়ে উপ্ত করে এসেছিল। ভারতে এসে তারা সে বীজ লালনপালন করে স্থানীয় উপকরণের সাথে মিলিয়ে নতুন যাত্রাপথের সূচনা করেছিল। স্থাপত্য শিল্পকলায় সে সময় ইরানের প্রভাব সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ফলে এর অনুপ্রবেশ মুসলিম স্থাপত্যকলার মধ্যে সর্বত্র লক্ষণীয়।

ভারতেও আকবরের রাজত্বকালে নির্মিত হুমায়ূনের সমাধিসৌধে সক্রিয়ভাবে ইরানি প্রভাব দেখা গিয়েছে। অন্যপক্ষে রাজপুতানার অমরকোটে হামিদা বানুর গর্ভে আকবরের জন্ম হলেও তিনি কখনই নিজেকে অভারতীয় বলে মনে করতেন না, বরং এ দেশের মাটিতে মিশে যাওয়ার প্রবণতা তার মনকে ব্যাকুল করে তুলেছিল। তাঁর চেতনায় স্থাপত্য সৃষ্টি ধ্যান-ধারণায় ভারতীয় আদর্শ ধীরে ধীরে প্রাধান্য লাভ করেছিল। তিনি এ দেশের অধিবাসীদেরকে আপনজন রূপে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। এভাবেই ইরানি কৌশল এবং ভারতীয় পদ্ধতির অপূর্ব সংমিশ্রণের ফলেই গড়ে উঠেছিল মোগল স্থাপত্য। এ যৌগিক শিল্পসত্তার চেতনা স্থাপত্য রূপায়ণের অবলম্বন হিসেবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্যকলার উন্মেষ সূচিত হয়।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৮৮।

২. *তদেব*।

৩. *তদেব*।

সপ্তদশতম অধ্যায়
সম্রাট বাবর ও সম্রাট হুমায়ূনের স্থাপত্যকীর্তি

জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবব পানিপথেব প্রথম যুদ্ধে ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহীম লোদীকে পবাজিত করে দিল্লিব সিংহাসন অধিকাব কবেন। কিন্তু ভাবতীয় স্থাপত্যকলা বা শিল্প সংস্কৃতি তখন তাব মনকে তেমন স্পর্শ কবতে পাবে নি। স্বদেশীয় সংস্কৃতিব প্রভাব মনেব গহনে এরূপভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে এখানকাব কোনো কিছু তাঁব হৃদয়ে নতুন কবে স্পন্দন জাগাতে ব্যর্থ হয়েছিল।

তাঁর আত্মজীবনীতে তিনি এ দেশীয হিন্দু কারিগবদেব দক্ষতা সম্পর্কে প্রশংসা করেছেন। অন্যত্র আবার ভুলভ্রান্তিপূর্ণ কাজেব জন্য দোষাবোপও কবেছেন। কেননা তাঁব মতে নির্মিত ইমাবতগুলো কোনো নিয়মনীতিব প্রতি তোযাক্কা না কবে নকশা প্রকল্পগুলোব বাস্তবায়ন করা হত। ফলে সৌষ্ঠবহীন নির্মাণ কাজে তাঁব মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল করে দিয়েছিল যে এসব দেশীয কারিগব দ্বাবা কোনো সুন্দব ইমাবত নির্মিত হতে পাবে না।

তিনি বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে অটোমান সাম্রাজ্যেব আলবেনিয়াব স্বনামধন্য বিখ্যাত স্থপতি সিনানেব (১৪৮৯-১৫৭৮ খ্রি) শিষ্যবর্গকে তাঁব স্থাপত্যকর্মে অংশগ্রহণেব জন্য আহ্বান জানিয়েছিলেন। তবে তাঁর এ প্রচেষ্টা আদৌ সফল হয়েছিল কি না ইতিহাসে সে সম্পর্কে কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। সে সময় ভারতীয় স্থাপত্যকর্মে কোনো বিদেশী স্থপতি অংশগ্রহণ করেছিল কি না তারও কোনো উল্লেখ নেই। তা ছাড়া ভারতীয় স্থাপত্যে কথিত অটোমান তুর্কি স্থাপত্য আদর্শ রীতির সাথে নিষিক্ত হয়ে ভারতে কর্ষিত সকল স্থাপত্যরীতির সাথে সমন্বিত হয়ে দেশীয় কারিগরদের হাতে মোগল স্থাপত্য গড়ে উঠেছিল এমন নজিরও বিরল।

এ দেশীয় কারিগরবৃন্দকে যথেষ্ট উপদেশ ও নির্দেশনা দিয়ে যে স্থাপত্য নির্মাণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল বস্তুত তাতে ভারতীয় আদর্শ অলক্ষিতভাবে এর সাথে সংযোজিত হয়ে গিয়েছিল। বাবর তাঁর জীবনস্মৃতিতে অনেক উচ্চাভিলাষী সৌধমালা নির্মাণের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন; যেমন- "প্রতিদিন ছয় শ আশি জন কারিগরকে নির্মাণ কাজে নিয়োজিত রাখা হয়েছিল এবং তিনি আগ্রা, সিক্রি, বিয়ানা, ভোলকু, গোয়ালিয়ার ও কিউলে অনেক নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেছিলেন"।[১]

কিন্তু ঐ সমস্ত নির্মাণ কাজের অধিকাংশই হালকা ধরনেব অলঙ্করণে সুশোভিত ছিল। তিনি অনেকগুলো প্রমোদ কানন ও উদ্যান রচনা করেছিলেন। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে ও প্রকৃতির ধ্বংসলীলায় এসব ধর্মনিরপেক্ষ নির্মাণ কাজগুলো কোথাও কোথাও সামান্য চিহ্ন

ছাড়া আর কিছুই টিকে নেই। বলা বাহুল্য তাঁর নির্মিত তিনটি মসজিদ কালের সাক্ষী হয়ে আজ পর্যন্ত টিকে আছে; এগুলো হচ্ছে পূর্ব পাঞ্জাবের পানিপথের কাবুলিয়াবাগে ও ভারতের উত্তর প্রদেশে অবস্থিত সম্বলের জামি মসজিদ। এ দুটি মসজিদ ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে ভারত বিজয় ঘটনাকে অক্ষয় করার মানসে নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদদ্বয়ের গঠন কাঠামো বিশাল আকারের হলেও কোনো স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে সুষমামণ্ডিত নয়। তৃতীয় মসজিদটি আগ্রায় লোদীদের দুর্গ প্রাকারের অভ্যন্তরে একই সময়ে নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদ সম্পর্কে বাবর নিজেই অভিযোগ করেছেন যে, "এটি ভালোভাবে সুসম্পন্ন হয় নি; এটি হিন্দুস্থানি রীতিতে নির্মিত হয়েছে"।[২] তিনি এ মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করলেও এটি হুমায়ূনের সময় সমাপ্ত হয়েছিল।

বলা বাহুল্য বাবরের সময়ে যদি কোনো স্থাপত্য আদর্শ অনুসরণ করা হয়ে থাকে তা পারস্য ও মধ্যএশিয়ার স্থাপত্যশিল্পের আংশিক অনুসরণ ঘটেছিল, কেবল ভাবমূলক বিমূর্ত সারাংশ গ্রহণ করে তার সাথে নিজস্ব ধ্যান-ধারণার মাধুরী মিশিয়ে মোগল স্থাপত্যের পটভূমি রচনা করেছিলেন। অন্যপক্ষে মোগল স্থাপত্য যখন একটা সুনির্দিষ্ট আকার প্রাপ্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তখনো বাবরের উত্তরাধিকারী হুমায়ূন ঐ একই ধরনের মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন।

তবে হুমায়ূনের সময় নির্মিত স্থাপত্যকর্মের স্বরূপে তাঁর পিতার স্থাপত্যকর্মের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে দেখা যায়। দুর্ভাগ্যবশত শেরশাহের (১৫৪০-১৫৫৫ খ্রি.) ১৫ বছর রাজত্বের কারণে তাঁকে পারস্যের সম্রাট শাহ তাহমাপসের দরবারে অবস্থান করতে হয়। এ দীর্ঘ সময় পারস্যে অবস্থানের ফলে হুমায়ূনের চিন্তা-চেতনায় পারসিক স্থাপত্য আদর্শ অনেকখানি স্থান করে নেয়। ফলে হুমায়ূন দিল্লির সিংহাসন পুনরুদ্ধার করলে হিন্দুস্থানের স্থাপত্য ঐতিহ্য পারসিক স্থাপত্য আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তবে ইরানি প্রভাবের স্থাপত্য ইমারত তাঁর জীবদ্দশায় বাস্তবায়িত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরই কবরের ওপর মোগলদের উল্লেখযোগ্য প্রথম ইরানি আদর্শের অনুসরণে সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল।

১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করার পরই তিনি একটা ব্যাপক স্থাপত্য নির্মাণ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তিনি 'দিনাপানা' নামে দিল্লিতে আর একটি শহর গড়তে চেয়েছিলেন। তিনি আশা করেছিলেন এখানেই তাঁর নতুন রাজধানী স্থাপিত হবে। এ স্থানে জাঁকালো সাত তলাবিশিষ্ট মনোমুগ্ধকর পুষ্পশোভিত উদ্যান রচনা করবেন, যার মধ্যে ফলবান বৃক্ষের সমারোহে সজ্জিত থাকবে। এতে তাঁর যশ ও খ্যাতি পৃথিবীর প্রত্যন্ত প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে। বলা বাহুল্য এ প্রকল্পের আংশিক সম্পন্ন হওয়ার প্রাক্কালেই তাঁর ভাগ্যের বিপর্যয় ঘটেছিল। হুমায়ূনের পরাজয়ের পর শেরশাহ এ শহর সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন করে দেন। এ ধ্বংসযজ্ঞের হাত হতে কেবলমাত্র দুটি মসজিদ রেহাই পেয়েছিল। এ মসজিদ দুটি নির্মাণের বিশেষ কোনো তাৎপর্যপূর্ণ স্থাপত্যরীতির অনুসরণ ঘটে নি এবং তেমন কোনো আকর্ষণীয়ও ছিল না।

এগুলোর মধ্যে একটি ১৫৩০-৩১ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আগ্রায় নির্মিত হয়েছিল; অপরটি নির্মিত হয় হিসারের ফাতেহাবাদে। এগুলো সুষম কাটা পাথর গেঁথে তার ওপর স্ট্যাকো জাতীয় মসৃণ আস্তর বা প্রলেপ দ্বারা আবৃত করা হয়েছিল। শেষোক্ত মসজিদটি ইরানি পদ্ধতির চকচকে টালির ব্যবহার দ্বারা বহির্গাত্র সুশোভিত করা হয়েছিল। নতুন ধরনের গম্বুজ সংযোজনের ফলে একটা অভিনব আকর্ষণ সৃষ্টি করেছিল।

হুমায়ূনের সমাধিসৌধ :

হুমায়ূনের সমাধিসৌধ যদিও তৎপুত্র আকবরের রাজত্বকালে ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল তথাপি একে তাঁর স্থাপত্যকর্মের তালিকায় আলোচনা না করে হুমায়ূনের স্থাপত্যকর্মের সাথে আলোচনা করা হল। কেননা এ প্রকল্প নকশা বাস্তবায়নে তাঁর চেয়ে অন্য আর একজনের সক্রিয় দায়িত্ব পালনের ভূমিকা লক্ষ করা যায়। এটি ভারতীয় স্থাপত্যকীর্তিগুলো বৈশিষ্ট্যের লক্ষণ যুগের সন্ধিক্ষণ বা পরিবর্তনাদিসূচক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। স্থাপত্যধারায় গতানুগতিকতার মাঝে এটি যেন যথাসময়ে এসে হাজির হয়েছিল এবং স্থাপত্য ঐতিহ্যের প্রবহমান ধারার মাঝখানে এসে অবস্থান নিয়েছিল।

সমাধিটি হুমায়ূনের মৃত্যুর আট বছর পর নির্মিত হয়েছিল। সাধারণত দেখা যায় যে শাসকের জীবদ্দশায় তার সমাধিসৌধ নির্মিত হয়ে থাকে। কিন্তু এখানে তার ব্যতিক্রম, কেননা হুমায়ূন যে বছর দিল্লির সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হন তাঁর এক বছরের মাথায় মৃত্যু হয়। মৃত্যুর যে বয়স হয়েছিল তা নয়, হঠাৎ পাঠাগাবের সিঁড়ি হতে গড়িয়ে পড়ে তার মৃত্যু ঘটে। মৃত্যু অবশ্য বলে কয়ে আসে না। তবুও হয়তো তাঁব ধারণা ছিল কিছু দিন বেঁচে থাকবেন এবং সে সময়েই নিজের জন্য একটা সমাধিসৌধ নির্মাণ করবেন।

যাহোক তার সমাধিসৌধ নির্মাণে তাঁর বিধবা পত্নী হাজী বেগম গভীবভাবে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি একে তাঁর পবিত্র দায়িত্ব হিসেবে গ্রহণ কবেছিলেন। যেমন পববর্তী সময়ে শাহজাহান তাঁর স্ত্রী মমতাজ বেগমেব সমাধির ওপর তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন। অতএব তিনি মৃত স্বামীর স্মৃতিসৌধ নির্মাণের জন্য নিজেকে নিয়োজিত করেন। অবশ্য শাহজাহানেব তাজমহল নির্মিত হয় আগ্রায় আর হুমায়ূনের সমাধিসৌধ নির্মিত হয দিল্লিতে। দিল্লির অন্যতম নগর দিনাপানা হুমায়ূন নির্মাণ করলে শেরশাহের দিল্লি অধিকার করাব সময় মসজিদ ছাড়া সব কিছুই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে যাওয়ার পব এ শহরটি একটা বিবান ভূমিতে পরিণত হয়। পরবর্তীকালে সম্রাট আকবর বা জাহাঙ্গীর দিল্লিকে রাজধানীর মর্যাদাব আসনে বাখেন নি। তাঁরা বাজদরবাব অন্যত্র সরিয়ে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক সূত্র হতে জানা যায় যে ১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে হুমায়ূনের মৃত্যুর সময় হতে ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান কতৃক দুর্গ প্রাসাদ নির্মিত না হওয়া পর্যন্ত দিল্লিতে রাজধানীর কার্যক্রম বন্ধ ছিল।

বলা বাহুল্য দিল্লি নগরীর এ বিরাট পরিত্যক্ত অংশবিশেষ মাকবারা নির্মাণের একটা অনুকূল অবস্থান রূপে নির্বাচিত হয়েছিল। এর ফলে হুমায়ূনের সমাধিসৌধ ছাড়াও এ এলাকায় আতগা খান ও আদম খানের মতো আমির-ওমরাহের সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। এ স্থানটি কিছুকাল একটা জীবিত মানুষের আবাসস্থলের চেয়ে রাজকীয় গোরস্থান রূপে পরিগণিত হয়েছিল।

১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে এখানেই সাহিবা বেগম তাঁর অনুচরবর্গ নিয়ে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পরে এটি সম্প্রসারিত আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। তিনি হুমায়ূনের ঘটনাবহুল জীবনের অভিজ্ঞতার সাথে জড়িত হয়েছিলেন এবং তাঁর সাথে কিছুকাল পারস্যে বসবাস করতে বাধ্য হয়েছিলেন। তিনি পারস্যে অবস্থানের কারণে সে দেশের কিছু শিল্পজাতক চেতনা ও অভিজ্ঞতা অনুভব ও গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। তিনি যে কেবল তৎপ্রচলিত ঐতিহ্যবাহী শিল্পজ্ঞানে নিজেকে সমৃদ্ধ করতে পেরেছিলেন তা নয়, তিনি স্থাপত্যশিল্পের ওপর এমন বাস্তব জ্ঞান সঞ্চয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তা দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে স্থাপত্য প্রকল্প পরিচালনার একজন প্রকৌশলী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ঐতিহাসিক তথ্য বিবরণীতে বর্ণিত রয়েছে যে মিরাক মির্জা গিয়াস নামে এক পারস্যবাসী এ সমাধি নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন। এ ঘটনা ছাড়াও উক্ত সমাধিসৌধের অতি নিকটে এখনো একটি প্রাচীর বেষ্টিত স্থান রয়েছে যা ভুলক্রমে আরবীয় সরাই নামে পরিচিত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এটি ছিল বহিরাগত কারিগরদের আবাসস্থল এবং সমাধিসৌধ প্রকল্প বাস্তবায়নের প্রাক্কালে বিশেষভাবে নির্মিত হয়েছিল।

বিষাদময় বর্ণ ধারণই হয়তো সমাধিসৌধের শোকময় প্রতিকৃতির প্রকাশ এবং এরূপ পরিস্থিতিতে একে অনুরূপ বৈশিষ্ট্যেই নির্মাণ করা হয়েছিল। এরূপ বৈশিষ্ট্যগুলোর জন্য এর নিকটতম স্থাপত্য পদ্ধতির নাম ব্যাখ্যায়নে একে পারস্য কল্পনের ভারতীয় অনুবাদ বলা চলে।[৩] পাশাপাশি এর নির্মাণকার্যে ইরানীয় স্থাপত্য আদর্শের অনুপ্রেরণা মিশে রয়েছে; কেননা এর কাঠামো গঠনে স্থানীয় ভারতীয় প্রভাবের অনেক উপকরণ সমাবেশিত হয়ে গিয়েছে। বলা বাহুল্য এর যে গম্বুজ নির্মিত হয়েছে তা তখন পর্যন্ত একমাত্র পারস্যেই প্রচলিত ছিল। পারস্য ছাড়া এ ধরনের গম্বুজ পৃথিবীর আর কোথাও ব্যবহার হত না। বিশেষভাবে এরূপ ইমারত নির্মাণে সম্মুখ দেয়াল বরাবর বিশাল খিলান দেয়ালের মাঝে চোরকুঠরি সংযুক্ত হয়ে সম্মুখ দেয়ালকে অভিনব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকারত্ব দান করেছে। এ আয়োজন সে দেশের রাজকীয় সমাধিসৌধে দেখা যেত এবং এ নতুন সমাধিসৌধে কিছু কাঠামোগত সংযোজন দেখা যায়। ইতিপূর্বে ইরান ছাড়া ভারতের অন্য কোথাও অনুরূপ রাজকীয় সমাধিসৌধে একাধিক অংশ দ্বারা যৌগিকভাবে অভ্যন্তরে সংযোগস্থাপক পথসহ বিস্তৃতি ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় নি।

অন্যপক্ষে ভারতেই কেবলমাত্র অনুরূপ কল্পনাপ্রসূত মনোজ্ঞ কিউপোলাসমেত সুন্দর ছত্রী দৃষ্ট হয়েছে। মোটের ওপর পারস্যের নিপুণ ও দক্ষ কারিগরগণ এখানে প্রস্তর দ্বারা মনোমুগ্ধকর স্থাপত্য নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছিল। এ প্রস্তর গাঁথুনিকে আবার শিল্প নৈপুণ্যতায় মসৃণ মার্বেলের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিল। মূলরীতি ও নীতির সাথে মননের প্রভাব একত্রিত হয়ে সমাধিসৌধ এমনভাবে স্থাপত্যিক গঠন পেয়েছিল যে তা ঐতিহ্যবাহী এশিয়ার দুটি মহান জাতি ইরানি ও ভারতীয় সভ্যতার সংশ্লেষণরূপে স্থিতি লাভ করেছিল।

প্রাথমিকভাবে এ সমাধি প্রকল্প নকশায় যে নবপ্রবর্তিত বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তা হচ্ছে মূল স্থাপত্য কাঠামোর চতুষ্পার্শ্বের বিস্তৃত এলাকায় উদ্যান যা আবেষ্টনী প্রাচীর ঘেরা। ইতঃপূর্বে অবশ্য লোদী সুলতানদের সমাধিসৌধ নির্মাণে অনুরূপ আকারের দে'য়াল ঘেরা স্থানে উদ্যানের অবস্থানও লক্ষ করা গিয়েছে। তবে সেগুলো অপরিমেয় উদ্যানের মাঝখানে একটি নিঃসঙ্গ দ্বীপতুল্য অবস্থানে সমাধিসৌধ রচিত হয়েছে। কিন্তু প্রাচীর বেষ্টিত উদ্যানের মাঝে নির্মিত এ সমাধিসৌধে কিছুটা অগ্রগতির চিহ্ন লক্ষ করা যায়, যা ধর্মীয় বিধি-নিয়মাদি হতে মুক্ত এবং সংরক্ষিত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে (ভূমি নকশা নং- ৫০)।
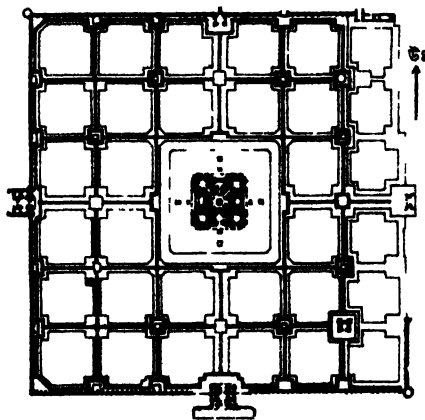
ভূমি নকশা নং- ৫০ : হুমায়ূনের সমাধি

সমাধির চারপার্শ্বের ঠিক মাঝখানে চিত্তাকর্ষক তোরণ দ্বার নির্মিত হয়েছে। তবে পশ্চিম পার্শ্বেই প্রধান তোরণ দ্বার। এ বিশাল তোরণ কাঠামোর সাথেই খিলান গঠিত হয়েছে যার মধ্য দিয়ে কুঞ্জ পরিবেষ্টিত সৌধের মনোরম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। এ তোরণ দ্বার দিয়ে অভ্যন্তর ভাগে অগ্রসর হলেই উদ্যান এবং এর বিস্তীর্ণ এলাকা বর্গাকার ও আয়তাকার আকারে বিভক্ত দেখা যায়। এ বিভক্তিগুলো ফুলের বাগানে শোভিত হয়েছে। এদের পাশ দিয়ে পতাকা শোভিত পায়ে চলার পথ ও শান বাঁধানো চত্বর নির্মিত হয়েছে।

সমস্ত কিছুই অতি সতর্কতার সাথে নকশায়ন ও সুষমামণ্ডিতভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে মূল সৌধ কাঠামোর অবয়বের সাথে অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে একাকার হয়ে যেতে পারে। এর রেখা ও ফাঁক দিয়ে সাজানো জায়গাগুলো মিল বিশিষ্টভাবে যোগ হয়ে কেন্দ্রীয় সৌধের সাথে সমন্বয় সাধিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় মূল সৌধটি একটি বেলে পাথরের চত্বর যা ৬.৭৫ মি. (২২ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। এর পার্শ্বগুলো সব খিলানায়িত, প্রতিটি খিলান পথ ছোট প্রকোষ্ঠের সাথে সংযুক্ত। এগুলো কর্মচারী ও দর্শকবৃন্দের ব্যবহারের উপযোগী বলে মনে হয়। এ প্রশস্ত মঞ্চের উপরিভাগের মধ্যখানেই মূল কবর কাঠামো নির্মিত। এটি বর্গাকার ভূমি পরিকল্পনায় রচিত যার প্রতি পার্শ্ব ৪৭.৫৫ মি. (১৫৬ ফুট)। অবশ্য প্রতি কোনায় ত্রিভুজাকারের কর্তিত অংশ (chamfered angles) ঐ মাপের অন্তর্ভুক্ত নয় (চিত্র নং- ৭৩)।

এর চারপার্শ্বের উচ্চতার বিচিত্রতা মোটামুটিভাবে একই প্রকারের। প্রত্যেকটি মুখে আয়তাকার কেন্দ্রীয় সম্মুখভাগ গঠিত হয়েছে, যা খিলান কুলঙ্গি ধারণ করে মনোমুগ্ধকর হয়েছে; এর আবার পার্শ্বের দিকে অঙ্গের সম্প্রসারণ ঘটেছে যাতে একঘেঁয়েমি দূর করে বৈচিত্র্য বিধানের জন্য ছোট আকারে পূর্বের মতোই খিলান কুলঙ্গি বা নির্জন কুঠবি নির্মিত। সর্বোপরি শ্বেতমর্মরে নির্মিত এর গম্বুজটি ৪২.৭০ মি. (১৪০ ফুট) উচ্চতায় স্থাপিত এবং চারকোনায় চারটি পার্শ্ব স্তম্ভযুক্ত ছত্রী সংস্থাপিত। গম্বুজ ও ছত্রীর শিরোভাগে রয়েছে পদ্ম ও কলসযুক্ত শিরোচূড়া।

সমাধিসৌধে ইতঃপূর্বে একক ছোট সংস্থাপনের রীতির পরিবর্তে একগুচ্ছ বা একদলে ভিন্ন ভিন্ন খোপে বিভক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কেন্দ্রীয় কক্ষেই সম্রাটের মরদেহ সমাহিত রয়েছে এবং প্রতি কোনায় ছোট আকারের শবাধারগুলো মোগল পরিবারের অন্য ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। বলা বাহুল্য অত্র সমাধিসৌধে হুমায়ূন ছাড়া আরো ৯ জন ব্যক্তিকে সমাহিত করা হয়েছে। অবশ্য হাজী বেগমের কবরটিও ঐ ৯টির মধ্যে একটি।

প্রতিটি প্রকোষ্ঠ অষ্টভুজাকার নকশায় নির্মিত। এদের একটির সাথে অপরটি তির্যক খিলান পথ দ্বারা সংযুক্ত। প্রকোষ্ঠগুলোর সকল অংশে আলো প্রবেশের জন্য জানালার ব্যবস্থা রয়েছে। খিলানায়িত এ জানালাগুলো আবার ছিদ্রযুক্ত পরদা সংযুক্ত।

এ ইমারতের বহিঃপ্রকাশিত অবয়বের দীপ্তিমান ও স্বচ্ছ কান্তিময় সৃষ্টি হওয়ার পিছনে এর প্রতি অঙ্গের সুষমতাপূর্ণ গঠন এবং দক্ষতাপূর্ণ ও দূরদর্শিতাপূর্ণ উপলব্ধি করার গুণগতমান ও বৈশিষ্ট্য যা এরূপ একটি স্থায়ী শিল্প সৃষ্টির জন্য ছিল একান্ত অপরিহার্য। সৌধের নকশায় গঠন সংক্রান্ত সংযোগ বা সম্পর্ক অভ্যন্তরের ও বাইরের পরিকল্পনার ন্যায়শাস্ত্রসম্মত যুক্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বলা বাহুল্য একটি সার্থক শিল্পকর্ম গঠনে নির্ভুল রীতির সফলতায় বাস্তবায়নের চিহ্ন সারাংশে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এসব উপাদান ছাড়াও বিভিন্ন অংশের শৃঙ্খলাপূর্ণ সাজান ও জমান অবস্থার একসাথে সুসম্পন্নতা অর্জিত হওয়া এবং প্রতিটি অংশ আলাদা আলাদাভাবে নিপুণতায় ও মনোজ্ঞতায় সমাপ্ত করার অক্লান্ত চেষ্টা সর্বোপরি সৌধের অংশবিশেষের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের উপযুক্ততা যাচাই ও বিচার করে

সুশোভন করার প্রক্রিয়াই এ সৌধকে জাঁকজমকপূর্ণ ও গাম্ভীর্যময় করে বহিঃপ্রকাশিত হতে সহায়তা করেছে। অন্যপক্ষে এসব গুণাবলীর সাথে যোগ হয়েছে সুষমতার পূর্ণাঙ্গ রূপ, পরস্পরের ওপরে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, নকশা পরিকল্পনা, আকারত্ব, মাধুর্যপূর্ণ খিলানের বলিষ্ঠ বক্রায়ন ও পরিশেষে বিশাল শ্বেতমর্মর গম্বুজের ঘনমান অবস্থান। সর্বোপরি বর্গাকার সুসজ্জিত বাগানের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত হওয়ায় সমাধিটি আরো সৌকুমার্যপূর্ণ হয়েছে।[৪]

মূল সৌধের সর্বনিম্ন অংশটুকু ৬.৭৫ মি. (২২ ফুট) উচ্চতা বিশিষ্ট যা লাল বেলে পাথরে গঠিত হয়ে শ্বেতমর্মরের থাম, স্তম্ভ ও খিলান ধারণ করেছে এবং এর পার্শ্বেই খোপ আকারের সাজানো বাগানের পায়ে চলার পথের সাথে সাইপ্রেস বৃক্ষরাজি রোপিত হয়ে পরিবেশকে. চিরসবুজ করে রেখেছে। এ নকশা পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সে সময় ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল। ইরানি শিল্পাদর্শে বা প্রণালীতে অলঙ্করণ ও অন্যান্য ভূষণ এতে মূর্ত হয়ে উঠেছে।

হুমায়ূনের সমাধিসৌধ ত্রুটিহীনভাবে নির্মাণের পরও যদি সমালোচনার মতো কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে তা হচ্ছে এর ছাদে সমাবেশিত ছত্রীগুলো যা কিছু অনাকর্ষণীয় অবস্থানে থেকে উপরের উন্নত বপ্রের সাথে সংঘাত সৃষ্টি করেছে। প্রকারান্তরে এটি কেন্দ্রীয় খিলান পথ বরাবর নির্মিত। এটি ইতঃপূর্বেই পর্যবেক্ষণ করা গিয়েছে যে ভুলভ্রান্তি তুলনামূলকভাবে গুরুত্বহীন এবং উপেক্ষণীয়, কেননা একটি বিশাল স্থাপত্যকর্মে একটা বিস্তৃত পদ্ধতির বাস্তবায়নের সফলতার মাঝে এটি নগণ্য ঘটনামাত্র।

শিল্প হিসেবে এর সফল হওয়ার পিছনে ব্যবহৃত উপকরণের উৎকৃষ্টতার নেহায়েত কম নয়। বিশেষভাবে লাল বেলে পাথর ও শ্বেতমর্মর দ্বারা এটি গেঁথে তোলা হয়েছে বটে,কিন্তু দু ধরনের পাথরকে এমন সুন্দরভাবে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে যে এদের গঠন বা গাঁথার জোড়া কৌশলে মিহিভাবে একটি অপরটির সাথে মিশে গিয়ে একাকার হয়ে যেতে পেরেছে। মনে হয় এখানেই শিল্পীর সাধনা সফল হয়েছে।

সৌধ গাত্রের বিশেষ বিশেষ স্থানে পরিকল্পনা অনুসারে সাদা রেখাগুলো এমনভাবে কষে টেনে দেওয়া হয়েছে যে সেগুলো অনড় অবস্থায় সৌধের সমস্ত অবয়বের ওপর মহীয়ান ভাবমূর্তি সৃষ্টি করতে পেরেছে। এর সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে গম্বুজ এবং এর নির্মাণ কৌশলের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন। ভারতীয় স্থাপত্যে প্রথমবারের মতো সুবিধাজনক উপায়ে দ্বিজ গম্বুজ ব্যবহার স্মরণীয় হয়ে উঠেছিল। ইরানের এ বিশিষ্ট পদ্ধতিতে পূর্বের মতো পুরু করে গাঁথুনি মসলা জমিয়ে গম্বুজ খোলস তৈরির পরিবর্তে দুটি আলাদা আলাদা খোলস তৈরি করা হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় দেখা যায় যে বহিস্থ ও অভ্যন্তরস্থ গম্বুজ খোলসের মাঝে বেশ কিছুটা ফাঁকা স্থান সৃষ্টি করা হয়। এ সৌধের বাইরের গম্বুজ খোলসটি মোটের ওপর শ্বেতমর্মরের খাঁচা, আর ভিতরের গম্বুজ খোলসটা প্রধান শবাধার কক্ষের ঢেউ ছাদযুক্ত অংশ দ্বারা গঠিত হয়েছে।

এরূপ গঠন সংক্রান্ত বা প্রক্রিয়া পদ্ধতির ফলে অভ্যন্তরের গম্বুজ ছাদটির অবস্থান অপেক্ষাকৃত নিম্নের দিকে নেমে আসার ফলে কক্ষের অন্যান্য স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সাথে একটা সামঞ্জস্যতা অর্জিত হয়ে বাইরের বহুদূর বিস্তৃত দৃষ্টিসীমায় উচ্চ গম্বুজের অশোভন ফলাফলের সাথে সমন্বয় সাধিত হতে পেরেছে। এ পদ্ধতির গম্বুজ নির্মাণ পশ্চিম এশিয়ায় তখন হতে কয়েক শতাব্দী পূর্বে প্রচলিত ছিল। হুমায়ূনের সমাধিসৌধ নির্মাণ প্রাক্কালে দিল্লিতে পুনরায় উক্ত প্রযুক্তির আবির্ভাবের ফলে এটিই প্রমাণিত হয় যে পারস্যের সাথে প্রত্যক্ষ সাংস্কৃতিক সংযোগের ফলে সে দেশীয় স্থাপত্যিক অভিজ্ঞতার আগমন ঘটেছিল এবং তারই ফলস্বরূপ ভারতীয় স্থাপত্যের অনুরূপ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। এ সমাধিসৌধ

নির্মাণের মধ্য দিয়ে মোগল ভারতের সমাধিসৌধ নির্মাণে নবদিগন্তের সূচনা হয়েছিল। এটি তাজমহলের মতো অনেক অমর স্থাপত্যকীর্তির পরিকল্পনা ও অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। ইরানি স্থাপত্যের সরাসরি প্রভাব এখানেই শুরু হয়েছিল। ঐতিহাসিক ফারগুসন্স মন্তব্য করেছেন "সৌধের চতুষ্পার্শ্বস্থ সৌন্দর্যময়তা নিস্তব্ধ শান্তির সাথে মিলিতভাবে যে কমনীয়তা সৃষ্টি করেছে তা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়"।[৫]

দিল্লিতে প্রায় অনুরূপ পদ্ধতির অপর একটি সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল। এটি ১৫৬২ খ্রিস্টাব্দে আতগা খান নামে আকবরের এক মন্ত্রী নিহত হলে তার কবরের ওপর নির্মিত হয়েছিল। এ সৌধটি হজরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার দরগার সন্নিকটে অবস্থিত, যেখানে হুমায়ূনের আমলে নির্মিত কিছু ইমারত গুচ্ছ রয়েছে। এ ইমারতের গাঠনিক বৈশিষ্ট্য হুমায়ূনের সমাধির অনুরূপই। তবে একে এর অমসৃণ ক্ষুদ্র সংস্করণ বললে ভুল হবে না। তা ছাড়া এর সম্মুখ দে'য়াল অংশে বিস্তৃত নির্মাণ প্রণালীতে অপেক্ষাকৃতভাবে স্থাপত্য পদ্ধতির অগ্রগামিতা লক্ষ করা যায়; কেননা এতে মার্বেল কেটে রঙ বসিয়ে রিলিফ প্রণালীতে সম্প্রসারিত খোদাই কার্যের মধ্য দিয়ে স্থাপত্য উন্নয়নের নতুন একটা ধাপে এগিয়ে আসতে পেরেছিল বলে মনে হয়। এক কথায় এটি অপেক্ষাকৃত দেখতে মনোমুগ্ধকর হয়েছিল এবং এখানে স্থপতি ও শিল্পীরা তাদের ইচ্ছা মতো সৌধের দেয়ালপৃষ্ঠকে অলঙ্কৃত ও সুশোভন করে এর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করার সুযোগ পেয়েছিল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৮৯।
২. ভি.এ.স্মিত, *হিস্ট্রি অব ফাইন আর্টস্ ইন ইন্ডিয়া*, পৃ. ৪০৬।
৩. এ সমাধি সম্পর্কে জি. মার্টিন বলেন, ".. .. . the tomb that was to prove a turning point in the construction of mausoleum in India, and was a clear synthesis of Iranian and Indian building traditions"; cf: *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড*, লন্ডন, ২০০০, পৃ. ২৬৯।
৪. জি. মার্টিন আরো বলেন, "An important innovation in the setting of the tomb in ornamental square garden based on the Persian charbagh principle"; দেখুন : *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭০।
৫. জি. ফারগুসন, হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এন্ড ইস্টার্ণ মার্কিটেকচার, ২য় খণ্ড, লন্ডন, ১৯১০, পৃ. ২৯০

অষ্টাদশতম অধ্যায়
সম্রাট আকবরের স্থাপত্যকীর্তি
(১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি.)

সম্রাট হুমায়ূনের মৃত্যুর পর তৎপুত্র আকবর স্বীয় রাজধানী দিল্লি হতে আগ্রায় স্থানান্তর করেন এবং এখানে রাজধানী কিছুকাল থাকাকালীন তিনি আগ্রার প্রাসাদ দুর্গ নির্মাণ করেন। শেরশাহের মৃত্যুর (১৫৪৫ খ্রি.) পর সম্রাট আকবর কর্তৃক ১৫৬৪ খ্রিস্টাব্দে আগ্রায় প্রাসাদ দুর্গের ভিত্তি স্থাপন করার পূর্ব পর্যন্ত সময়ে এখানে তেমন কোনো স্থাপত্য নির্মাণ কাজের নিদর্শন দৃষ্ট হয় না। হয়তো সে সময়ের রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার কারণে সর্বপ্রকার উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

তবে এ সময়ের মাঝে দিল্লিতে খায়রু-ই-মানজিল (khairu-i-manzil) নামে একটি ছোট আকারের মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। এর স্থাপত্য পদ্ধতির ধারা তৎসময়ের প্রবহমান সূর স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের অনুসরণ দৃষ্ট হয়। সূর শাসকরা দিল্লিতে যে স্থাপত্য পদ্ধতির অনুশীলন করেছিল তারই প্রভাব এতে স্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এ ছোট একটি মসজিদ নির্মাণের মধ্য দিয়ে বিগত সূর শাসকদের স্থাপত্যধারার সাথে আকবরের স্থাপত্য চিন্তা-চেতনার একটা সূক্ষ্ম যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায়।

এ মসজিদ পর্যবেক্ষণে অনুধাবন করা যায় আকবর তাঁর স্থাপত্য পদ্ধতির বাস্তবায়নে পারস্য স্থাপত্যধারায় চলমান প্রতিকৃতি ছাড়াও সূর স্থাপত্য পদ্ধতি তাঁর স্থাপত্য পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছিলেন। হুমায়ূনের সমাধিসৌধ নির্মাণের মধ্য দিয়ে ইরানি স্থাপত্য রীতির অনুপ্রবেশ ঘটলেও এটি ভারতের আদি স্থাপত্য পদ্ধতিকে নির্মূল করতে পারে নি; বরং এর সঙ্গে স্থানীয় স্থাপত্যধারার সংমিশ্রণে তাঁর নবস্থাপত্য আদর্শের সূচনা হয়েছিল। তিনি দেশীয় রীতি ব্যবহার করতে গিয়ে যেখানে কৌশলগত কারণে প্রয়োজন পড়েছে সেখানেই শুধু বিদেশী প্রযুক্তি প্রয়োগ করেছিলেন।

আকবর তাঁর নির্মাণ প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে স্থানীয় কারিগর ও তাদের ঐতিহ্যবাহী সনাতনী পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ অব্যাহত রেখেছিলেন। সম্রাটের উচ্চ রাজকর্মচারীবৃন্দ কেবলমাত্র নকশা পরিকল্পনা, গঠন কাঠামো ও স্থাপত্যকর্মের প্রকৃতি সম্পর্কে কারিগর ও স্থপতিদের পরামর্শ ও তথ্যের বিশ্লেষণমূলক তাৎপর্য বুঝিয়ে দিত এবং তত্ত্বাবধানের সার্বিক দায়িত্ব পালন করত মাত্র। কিন্তু সার্বক্ষণিক কর্ম নিষ্পন্ন করার মূল দায়িত্ব পালন করত এ দেশীয় কারিগর, শ্রমিক ও স্থপতিবৃন্দ।

তাঁর অধিকাংশ নির্মাণ প্রকল্প সম্পাদনে প্রধান উপকরণ হিসেবে লাল বেলে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। কেননা এ ধরনের নির্মাণ সামগ্রী ঐ অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যেত। তাঁর স্থাপত্যরীতিতে প্রধানত ক্রমপূরণ পদ্ধতির প্রয়োগ থাকলেও টিউডর খিলানের ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তবে এটি প্রধানত সজ্জিত উপকরণ হিসেবে বা সজ্জিত খিলান হিসেবে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এটি বাহ্যিকভাবে হলেও কাঠামো গঠনের পদ্ধতি হিসেবে আগমন ঘটে নি। আবার নির্মাণ কৌশলের দিক হতে খিলাননির্ভর ও স্তম্ভ সর্দল পদ্ধতি একই সাথে সমান সমান অংশে প্রয়োগ দৃষ্ট হয়েছে। বলা বাহুল্য তার পদ্ধতির মাঝে কাষ্ঠ স্থাপত্য পদ্ধতির আগমনও লক্ষ করা যায়। এটি উত্তর ভারতের লাহোর, চিনিয়ট ও কাশ্মীরের লৌকিক ইমারতগুলোতে এখনো দৃষ্ট হচ্ছে। মোগলদের প্রথম যুগে লোদী পদ্ধতির গম্বুজ অনুকরণে গম্বুজ নির্মাণ লক্ষ করা যায়। সময় সময় অনুরূপ বিরাট শূন্য গর্ভ গম্বুজ তৈরি হলেও এটি কৌশলগতভাবে কখনো দ্বিজ গম্বুজ ছিল না।

অন্যপক্ষে সাধারণ স্থাপত্য অংশ গঠনে স্তম্ভ বা থাম সাধারণত বহু পার্শ্ববিশিষ্ট এবং থাম ও স্তম্ভ শীর্ষগুলো ভাব বাহক আলম্বন আকারত্বে বিনির্মিত হত। স্থাপত্য অলঙ্করণ ও সজ্জায়নে খোদাই ও বলিষ্ঠ অন্তর্মুখী ভিতর খচিত নকশালঙ্কার সাধারণত ব্যবহৃত হত। এ ছাড়া ইমারতের অভ্যন্তরে দেয়াল ও তলছাদে সময় সময় চিত্রায়িত নকশালঙ্কার দেখা যেত। এটিই সাধারণভাবে আকবরী পদ্ধতির স্থাপত্য রীতির বৈশিষ্ট্য বলে ঐতিহাসিকগণ বিবেচনা করেছেন।

আগ্রা দুর্গ :

আকবর তাঁর রাজ্য সীমানার মধ্যে সামরিক গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে প্রাসাদ দুর্গ বা দুর্গ প্রাসাদ নির্মাণ করেন। তন্মধ্যে প্রথম যে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করেন তা হচ্ছে প্রাসাদ দুর্গ আগ্রা। এর ভূমি নকশায় দেখা যায় যে এটি অনিয়মিত উপবৃত্তাকারের সুদৃঢ় প্রাচীর বেষ্টিত স্থান এবং জ্যাসহ (chord) ৮২২৯.৬০ মি. (২৭০০০ ফুট) দীর্ঘ এটি যমুনা নদীর ডান তীরের সমান্তরালে অবস্থিত।

এ দুর্গের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর শক্ত সমর্থ সুঠাম আবেষ্টনী প্রাচীর। এটি নিরেট বেলে পাথরে নির্মিত এবং এর উপরিভাগে আত্মরক্ষার্থে চতুষ্পার্শ্বে সমতল উপরিভাগযুক্ত ঢিবি (বুরুজ) নির্মাণ করা হয়। এ প্রাচীরের উচ্চতা ২১.৩৫ মি. (৭০ ফুট) এবং এর পরিসীমা প্রায় ২.৫০ কি.মি.। এটি নির্মাণ করতে প্রথমত অধিক মাত্রায় মসৃণ কাটা পাথর দ্বারা গাঁথুনি মজবুত করা হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বর্ণিত তথ্য হতে জানা যায় এ দুর্ভেদ্য অথচ অত্যন্ত সাধারণ ঘনমান নির্মাণসামগ্রী দ্বারা নির্মিত হলেও প্রয়োগকৃত কৌশলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করছে। বলা বাহুল্য এর নিচ হতে শীর্ষদেশ পর্যন্ত আগ্নেয় লাল পাথর দ্বারা মোড়াই করে তারপর লৌহ নির্মিত বলয় দ্বারা একটি পাথরের সাথে আর একটি পাথর সংযুক্ত করে একে করা হয়েছে দুর্ভেদ্য।

যাহোক এ উদ্ভাবনী দক্ষতাপূর্ণ দুর্গ প্রাকার গঠনের কথা বাদ দিয়েও অন্যভাবে বলা যায় এর দেয়াল একটি অনিন্দ্য সুন্দর স্থাপত্যকীর্তি। কেননা এতে দুর্গ স্থাপত্যের বহুগুলো সামরিক প্রয়োজনীয় উপকরণের একত্রে সমাবেশ লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে; যেমন—

প্রাচীরগাত্রে নির্মিত ছিদ্রের ভিতর দিয়ে গোলা নিক্ষেপের ব্যবস্থা (battlements), কামান স্থাপনার্থে দুর্গ প্রাচীর গাত্রে ছিদ্র (embrasures), ওপর হতে শত্রুর ওপর গরম গলিত পদার্থ ঢেলে দেওয়ার জন্য বা নিক্ষেপের জন্য নিরাপদ কৌশলে ছিদ্র বা গবাক্ষ (machicolation) এবং নিরাপত্তামূলক রজ্জু গাঁথুনির সাথে প্রতিস্থাপনা (string courses) ইত্যাদি। এ সমস্ত বৈশিষ্ট্য একত্রে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে সমাবেশিত হওয়ার পরেও নকশালঙ্কার সুচারুভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। সর্ব প্রকারের কারিগরি কৌশলের উত্তমভাবে ব্যবহারের মধ্যে যে শিল্পানুভূতির প্রয়াস সৃষ্টি হয়েছে তা প্রযুক্তি ও অধ্যবসায়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে অম্লান হয়ে রয়েছে। ফলে মোগল শাসকদের প্রতিটি কর্ম প্রক্রিয়াগত যে বৈশিষ্ট্য দৃশ্যমান হয়েছে তার মূলে রয়েছে তাদের ঐতিহ্যবাহী বংশানুক্রমিক তৈমুরীয় প্রভাব।

এমনকি তাদের নিয়ম অতি জড়বাদী (materialistic) ও সাধারণ উৎপাদিত বস্তুসমূহ বুদ্ধিদীপ্ত পরিচালনার কারণে চুম্বুক স্পর্শের মতো একটি শৈল্পিক চেতনায় স্ফুরণ ঘটাতে সমর্থ হয়েছে এবং এসবের মূলে মিশে রয়েছে তাঁদের পূর্বপুরুষের সাংস্কৃতিক আদর্শের প্রতিফলন ও প্রতিরূপ।

এ সুরক্ষিত দুর্গের মাত্র দুটি তোরণ পথ রয়েছে। এর দক্ষিণ দিকে অবস্থিত তোরণ দ্বার নিজস্ব লোকের (private entry) গমনাগমনেব জন্য নির্ধারিত। আর পশ্চিম পার্শ্বের তোরণ দ্বারটির নাম দিল্লি গেট বা দিল্লি তোরণ। এ তোরণ দ্বারটাই দুর্গের প্রধান প্রবেশ পথ। এ তোরণ দ্বাবের দুপার্শ্বেই আত্মরক্ষার্থে সমতল উপরিভাগ যুক্ত (rampart) ঢিবি (বুরুজ) নির্মিত হয়েছে। এ তোরণ দরজা যদিও তাঁর প্রথম কৌশলপূর্ণ স্থাপত্য অবদান তথাপি এর পরিপক্বতা প্রশ্নাতীতভাবে উজ্জ্বলতম নিদর্শন। এ সুঠাম প্রাসাদ দুর্গটি ১৫৬৬ খ্রিস্টাব্দে সুসম্পন্ন হয়েছিল (চিত্র নং- ৭৪)।

এ স্থাপত্যকর্মের মধ্য দিয়ে দেখা যায় যে একদিকে মৌলিক উদ্ভাবন ও অন্যদিকে স্বতঃস্ফূর্ততায় স্থাপত্যকলা নতুন প্রারম্ভিক সূচনায় সূত্রপাত ঘটেছিল এবং সূত্রপাতের বীজ যার মাঝে উপ্ত ছিল তিনিই ছিলেন সজীব স্বাধীন মুক্তবুদ্ধির চেতনায় শক্তিমান ও প্রাণবন্ততার প্রতীক। ধর্মীয় আবেষ্টনেব কুসংস্কারকে পাশ কাটিয়ে বৃহত্তর মানব জীবনের কল্যাণময় সুধার সন্ধান তিনি পেয়েছিলেন। দুর্গের ভূমি নকশা ও পরিকল্পনা মোটামুটি তুলনামূলকভাবে সরল, কোনো জটিলতা এতে ছিল না। কেননা দুর্গের সম্মুখটাই দু'টি প্রশস্ত অষ্টভুজাকার অত্যুচ্চ খিলান পথের সাথে সংযুক্ত এবং পিছনটায় মনোজ্ঞ ফাসাদ যার উপরে উচ্চ ঢিবিতে তোরণ শ্রেণী অবস্থিত। এতে ছোট কিউপোলা (cupolas), ছত্রী (kiosks) এবং চূড়াসমূহ (pinnacles) যুক্ত হয়েছে।

এর নকশায় দেখা যায় যে কতকগুলো আরামদায়ক প্রকোষ্ঠ নিয়ে অভ্যন্তরভাগ গঠিত হয়েছে এবং এর সাথে প্রহরীকক্ষ সংযুক্ত হয়েছে। এ প্রাসাদ দুর্গকে আরো আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য দুর্গ কাঠামোর তোরণ, খিলান কুলঙ্গি এবং অন্যান্য স্থাপত্যিক উপকরণ ও সজ্জায়নমূলক অনুপাত ও উপকরণ সমাবেশিত হয়েছে। দুর্গের বাহ্যিক অবয়বে কেবল সৌন্দর্য বিন্যাস করে দায়িত্ব শেষ করা হয় নি বরং দুর্গের প্রকৃত প্রয়োজন এর দুর্ভেদ্যতা সৃষ্টিকরণে স্থপতিরা কঠোর দৃষ্টি রেখেই সর্বপ্রকার ব্যবস্থা নিষ্পন্ন করেছে।

এর অলঙ্করণ ও নকশালঙ্কার প্রয়োগে দুর্গ গাত্রের সর্বত্র চমৎকারভাবে সজ্জিত করতে বিভিন্ন প্রকারের নকশার একত্র সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। বিশেষত নকশাকারুকার্যে

শ্বেতমর্মরের ওপর অন্তর্মুখী খচিত কৌশলের ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। এটি সাধারণত প্রাণবন্ত লাল বেলে পাথরের পটভূমিতে সজ্জায়ন ফলপ্রসূতায় সুসম্পন্ন করা হয়েছে। দে'য়ালের সীমান্ত রেখা বরাবর চলতি প্রয়োগগত রীতিতে পাখির নকশা প্রতীক ব্যবহারে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়েছে। ইসলামিক চিত্রকলায় পবিত্র কোরান শরিফের বিধিনিষেধ অনুসারে কোনো জীবিত প্রাণীর বা বস্তুর চিত্রায়ন জায়েজ নয়, তা সত্ত্বেও এর প্রয়োগ দৃষ্ট হয়েছে। আকবরের এটি ধর্মীয় উদারতা ও নিরপেক্ষতার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যময় গুণাবলী যা তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার নীতির মাঝে মূর্ত হয়ে উঠেছে। আকবরের স্থাপত্য ইমারতগুলোতে সে যুগ চেতনার প্রাণচাঞ্চল্যতা প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। এটি সত্য যে তাঁর কিছু স্থাপত্যকর্ম হৃদয়কে আন্দোলিত ও স্পন্দিত করে; যেমন আগ্রা দুর্গের স্মৃতি রক্ষাকারক ঐতিহাসিক তোরণ দরজা।

উক্ত দুর্গ অভ্যন্তরভাগের দেয়াল আবেষ্টনে পাঁচ শয়েব বেশি লাল বেলে পাথরের অট্টালিকা গুজবাট ও বঙ্গীয় আদর্শের সুন্দব পদ্ধতিতে নির্মাণ করা হয়েছিল বলে আইন-ই-আকবরীতে উল্লেখ রয়েছে। আগ্রা দুর্গ নির্মাণে এ পদ্ধতির প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রতীয়মান হয় যে সম্রাট তাঁর রাজ্যের দূরবর্তী অংশের প্রজাদের স্থাপত্য শিল্পরীতির অনুশীলন সম্পর্কে ইতোমধ্যেই ওয়াকিবহাল বা অবহিত হতে পেরেছিলেন এবং এদের মেধা ও কর্মশক্তিকে ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁর পৌত্র শাহজাহান আরো সৌন্দর্য শ্বেতমর্মরের চন্দ্রাতপ তৈরির জন্য এর প্রায় সবগুলো ইমারত ভেঙে অপসারণ করেছিলেন। যেগুলো ভেঙে অপসারণ করা হয়েছিল তার অধিকাংশ স্থাপত্য নিদর্শন মূলত দুর্গের দক্ষিণাংশের কোণ হতে আরম্ভ করে পূর্ব দিকের দেয়াল পর্যন্ত উন্নত বপ্র বরাবর ছিল এবং এখান হতে ওপর দিয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে দৃশ্য অবলোকন করা যেত। পাইকারিহারে অনুরূপ ভাঙাচোরার হাত হতে কেমন করে যেন একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাসাদ রক্ষা পেয়েছিল এবং যা এখনো সুরক্ষিত অবস্থায় বিদ্যমান।

এ প্রাসাদের উদাহরণের মধ্য দিয়ে আকবরী স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য ও পদ্ধতিগত ধারাবাহিকতা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। এ ইমারতটি জাহাঙ্গীরি মহল নামে পরিচিত। এটি একটি সম্প্রসারিত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যবস্থাসহ বহু কক্ষবিশিষ্ট প্রাসাদ। সম্ভবতঃ নির্মাণের অনেক পরেও এটি পরবর্তী মোগল বংশধরদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং সে কারণে এর অনুরূপ নামকরণ হয়েছিল।

আকবরের প্রথম জীবনের নির্মিত স্থাপত্যকর্মের মধ্যে এটি অন্যতম। কারণ এর কাঠামো নকশা অবলোকনে দেখা যায় যে এটি পরীক্ষামূলকভাবে শুরু করা হয়েছিল। কেননা মিলনায়তন এবং এর সাথে অন্যান্য উপাঙ্গগুলোর যেরূপ সাজানো থাকা প্রয়োজন ছিল সেরূপে না থেকে অনিয়মিতভাবে গঠিত হয়েছিল। এরূপ এলোমেলো অবস্থান সম্পর্কে একটু ভেবে দেখলে বুঝা যায় যে সম্রাট যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবে নিয়োজিত কর্মচারী বা কারিগরবৃন্দ উপলব্ধি করতে পারে নি। স্থপতি ও কারিগরবৃন্দ কিছুটা স্বাধীনভাবেই নিজেরা নতুন পরিস্থিতিতে কাঠামো গঠন পরিকল্পনা পরিচালনা করেছিল অথচ তারা এর অন্তর্নিহিত ভাব-সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞাত ছিল। এসব অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও এর মাঝে স্থাপত্য আদর্শের যে অঙ্কুর দেখা গিয়েছে তাতে জাহাঙ্গীরি মহলকে উদাহরণস্বরূপ মূলত আকবরের স্থাপত্য বিকাশের ধারায় ক্রম পরিবর্তনের সুর ধ্বনিত হয়েছে বলে মনে করা যায়।

পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন[১] যে 'ফলত পঞ্চদশ শতাব্দীতে নির্মিত গোয়ালিয়ারের হিন্দু পদ্ধতির অনুসরণে নির্মিত মান-মন্দিরের আদর্শে উক্ত প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল'। বলা বাহুল্য এটিই ষোড়শ শতাব্দীর একজন মুসলিম শাসকের পারিবারিক আবাসনকার্যে ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ অট্টালিকা মোটামুটি অনুরূপ স্থাপত্য আদর্শে সম্পন্ন হলেও এর গুরুত্বপূর্ণ কিছু বৈশিষ্ট্য কাষ্ঠ স্থাপত্য আদর্শ হতে আহরিত হয়েছিল। অন্যপক্ষে এটি গঠনে পাথরকেই প্রধান উপকরণ বা নির্মাণ সামগ্রীরূপে ব্যবহার করা হয়। এ কাষ্ঠ স্থাপত্য অনুসরণে আকারত্ব ও অবস্থান বিশেষভাবে প্রাসাদের ছাঁইচের নিচের আলম্বগুলোতে দেখা যায়। উত্তর মিলনায়তনের ছাদের কড়ির গহ্বরে বাঁকানো আলম্বন এবং অট্টালিকার সম্মুখস্থ ও পার্শ্বস্থ স্তম্ভ শ্রেণীর সাথে একই ধরনের আলম্বন দেখতে পাওয়া যায়। এগুলো হয়তো কাষ্ঠ নির্মিত হলে অধিকতর বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হতে পারত।

প্রাসাদ দুর্গ লাহোর ও এলাহাবাদ :

সম্রাট আকবর এ ধরনের আরো দুটি প্রাসাদ দুর্গ লাহোব ও এলাহাবাদে নির্মাণ কবেন। লাহোরের প্রাসাদ দুর্গটি বাস্তবে আগ্রার প্রাসাদ দুর্গ যখন নির্মিত হচ্ছিল তখনই নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল। এ দুটি একই কল্পনার ফল। তবে লাহোবের প্রাসাদ দুর্গটি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের। সন্দেহাতীতভাবে লাহোর দুর্গের বাহ্যিক গাঠনিক নকশা বা আপেক্ষিক অবস্থান কিছুটা কম অসমাঙ্গ বা কম অনিয়মিত আকারের; কেননা এটি ৩৬৫.৮০ মি. (১২০০ ফুট) × ৩২০.০৫ মি. (১০৫০ ফুট) আয়তনবিশিষ্ট ও আত্মরক্ষার্থে নির্মিত বুরুজ সংবলিত উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত।

এ ধরনের নকশা পরিকল্পনার কারণে অভ্যন্তরে অধিক সুসামঞ্জস্যভাবে বাসস্থানের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা গিয়েছে। সমস্ত আয়তা কার এলাকা লম্বালম্বিভাবে দুটি সমান অংশে রয়েছে বিভক্ত। এর দক্ষিণের অংশ উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের জন্য ও প্রশাসনিক কার্য নির্বাহের প্রয়োজনে ইমারত নির্মাণ করা হয়। অন্যপক্ষে পিছনেব ফাঁকা জায়গায় গুচ্ছ আকারে রাজকীয় প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল।

এ দুবিভক্তির মাঝে একইভাবে সারি দিয়ে শ্রেণীবদ্ধ ইমারত নির্মিত হয়েছে যা একটি প্রতিবন্ধক পরদার মতো জনসাধারণের ব্যবহৃত অংশ হতে রাজকীয় পরিবারের অংশকে আলাদা করে রাখার পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হতে পেরেছে। আকবরের সময় এ দুর্গে যেসব স্থাপত্য ইমারত দৃষ্ট হয় তা আগ্রা দুর্গের অনুরূপই। এটি প্রধানত লাল বেলেপাথরে নির্মিত এবং নির্মাণ রীতিতে কড়ি ও আলম্বন পদ্ধতির ব্যবহার দৃষ্ট হয়। তথাপি লাহোর দুর্গে নিয়োজিত কারিগর ও স্থপতিবৃন্দ আগ্রা দুর্গের কারিগর ও স্থপতি অপেক্ষা তুলনামূলকভাবে বেশি দক্ষতার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছিল। কারণ তারা একই পদ্ধতির ব্যবহার সত্ত্বেও লাহোর দুর্গের কর্ম সম্পাদনে নিপুণতা ও কল্পনাপ্রবণতার সাক্ষ্য পাওয়া যায়, বিশেষভাবে দুর্গের বিভিন্ন অংশ সজ্জায়নে সূক্ষ্মতার পরিচয় বিধৃত হতে দেখা গিয়েছে। এ ছাড়াও আলম্বন, খোদাই কার্য, খচিত কাজ ও নকশালঙ্কার পরিকল্পনায় উদ্ভাবনী বুদ্ধির স্ফুরণ দেখা যায়। সমস্ত দক্ষতার সাথে উচ্চমানের কৌশল মসৃণতায় নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

এ দুর্গের স্থাপত্যকর্মের বর্ণনায় এর নাম ভূমিকা বা নামপত্রের অলঙ্করণ সম্পর্কে না বললে পূর্ণাঙ্গভাবে বিষয়টি উপস্থাপন শেষ হবে না। ঐগুলো অভ্যন্তর দেয়ালের উত্তরাংশে

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। এখানেই অপূর্ব বৈচিত্র্যময় চকচকে রঙিন চিত্রাদি অঙ্কিত হয়ে প্রদর্শনের জন্য সজ্জিত হয়ে রয়েছে। এটি হস্তী তোরণ দ্বার যা প্রধান প্রবেশপথ হতে জাহাঙ্গীর মহলের পূর্বদিকে উচ্চ বুরুজের চতুর্ভুজ অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এগুলো যে দেয়ালে অঙ্কিত ও চিত্রায়িত হয়েছে এটি ৪৮০ গজ পরিসর ও ১৭ গজ উচ্চতাবিশিষ্ট। বলা বাহুল্য এ চিত্রগুলোতে আকবরের সময়কালীন মোগল সংস্কৃতিস্বরূপ বিকাশমান হয়ে উঠেছে। এর দেয়ালপৃষ্ঠে অঙ্কিত নকশা বৈশিষ্ট্যে রূপায়িত হয়েছে। এদের বিষয়বস্তু হচ্ছে— মৃগয়া, হস্তীযুদ্ধ, পলোখেলা ইত্যাদি। অন্যপক্ষে চিত্রের অংশ গঠনের ফুল, লতাপাতার নকশাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এ দেয়াল নকশা (mural ornamentation) ও অলঙ্করণ পদ্ধতি বিচার করে ধারণা করা অস্বাভাবিক নয় যে, এগুলো আদি ইটের ভিত্তির ওপর পরবর্তী সময়ে প্রয়োগকৃত।

অন্যপক্ষে ১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে যমুনা ও গঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলে এলাহাবাদ প্রাসাদ দুর্গের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। এ দুটি জলধারার সঙ্গমস্থলে দুর্গের নকশা পরিকল্পনা বৃত্তাকারের টুকরা টুকরা অংশ দ্বারা আকারত্ব গঠিত হয়েছে। আকবরের নির্মিত প্রাসাদ দুর্গগুলোর মধ্যে আকারে এটিই বৃহত্তর। এর ভূমি নকশায় দেখা যায় যে আড়াআড়িভাবে একপার্শ্ব হতে অপর পার্শ্ব পর্যন্ত ৯১৪.৪০ মি. (৩০০০ ফুট)। দুঃখের বিষয় এতে নির্মিত অধিকাংশ আকর্ষণীয় স্থাপত্যকর্ম আধুনি কালেই ভেঙে অপসারণ করা হয়েছে।

অতীতের সে গৌরবময় স্থাপত্য আদর্শ ও গরিমা প্রদর্শিত হওয়ার জন্য একটি স্থাপত্যকর্ম টিকে রয়েছে, যা দ্বারা এর তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য অবগত হওয়া যেতে পারে। এটি একটি চমৎকার বারদারি বা চন্দ্রাতপ (pavilion)। এটি জানানা প্রাসাদ নামে পরিচিত। অনুরূপ কযেকটি এ ধরনের ইমাবত নিয়েই দুর্গের মধ্যে রাজকীয় বাসস্থান নির্মিত। এ থেকে জানা যায় যে এখানে সমস্ত নির্মাণ কাজ ক্রমপূরণ রীতিতে সম্পাদিত হয়েছে। অবশ্য প্রয়োগকৃত প্রণালী কিছুটা আলাদা বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ ছিল। কেননা অট্টালিকার চতুষ্পার্শ্বস্থ স্তম্ভশ্রেণী দ্বারা ছিল সুশোভিত। এ ছাড়াও অট্টালিকার অভ্যন্তরভাগে সমান সমান দূরত্বে স্তম্ভ সারি নির্মাণ করা হয়েছে।

স্তম্ভ স্থাপনের নকশা পরিকল্পনায় দেখা যায় যে একজোড়া মিলে একটা দলে স্থাপন করা হয়েছে। এরূপভাবে স্তম্ভ সাজানোর ফলে প্রত্যেক দৃষ্টিকোণ হতে এটি অপূর্ব ঐশ্বর্যময় চিত্রানুরূপ দৃশ্যের মতো প্রতীয়মান হয়েছে। এর উপরে সম্পূর্ণ সমান ব্যবধানে স্তম্ভশ্রেণী উচ্চ বেদির (terraced roof) ছাদের নিচে স্থাপিত হয়েছে। এ সচ্ছিদ্র উন্নত বপ্রকে (perforated parapet) ছাপিয়ে জাফরি সংযুক্ত ছত্রী শীর্ষদেশে অবস্থান করছে। এতে ব্যবহৃত স্থাপত্য পদ্ধতিগুলোর মধ্য দিয়ে মোগলদের প্রভূত ধনরাশির সঞ্চালন ঘটেছিল বুঝা যায়। অন্যপক্ষে এতে রাজ্যের স্থিতিশীলতা ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তৃতিব আভাস মূর্ত হয়ে উঠেছে।

আজমীর দুর্গ :

আকবর ১৫৭০ খ্রিস্টাব্দে আজমীরের দুর্গটি নির্মাণ করেন। এটি পূর্বের যে কোনো দুর্গ হতে ভিন্নতর ছিল। আক্রমণকারী বাহিনীর অগ্রভাগ বা ব্যূহমুখ হিসেবে তার সীমান্ত অভিযান জোরদার করার জন্য এ দুর্গ নির্মাণ পরিকল্পনা করা হয়েছিল। যদিও এটি অন্যগুলোর চেয়ে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ছিল তথাপি এটি অত্যন্ত শক্তিশালীভাবে

নির্মিত হয়েছিল। পি. ব্রাউন একে মধ্যযুগের ইউরোপীয় ফিউডাল বা সামন্ত রাজাদের দুর্গের সাথে তুলনা করেছেন। এটি সমতল ক্ষেত্রের পরিসীমায় দু প্রস্থ পুরু দেয়ালের পরিবেষ্টনে নির্মিত হয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী দুর্গে পরিণত হয়েছিল।

এরূপ অভেদ্য ও শক্তিশালীভাবে দুর্গ নির্মাণ করে এর মধ্যবর্তী উন্মুক্ত অঙ্গনে প্রশস্ত স্তম্ভায়িত হলঘর নির্মাণ করেন। প্রকৃতপক্ষে এটি তৎপ্রচলিত প্রাসাদ নির্মাণ পদ্ধতিতে গঠন করা হয়েছিল। এটি দু তলা বিশিষ্ট ও দ্বিজ স্তম্ভে সমান সমান দূরত্বের ব্যবধানে সজ্জিত। স্তম্ভগুলোর মাথা গঠনে আলম্বন সংযুক্ত করা হয়েছে। এর অভ্যন্তরভাগে মানানসই আকারের নির্মাণ করা হয়েছে। তবে প্রত্যেক কোনায় একটি করে প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে সমগ্র প্রাসাদকে এমন পরিকল্পিতভাবে সাজানো হয়েছে যে সম্রাট যখন অস্থায়ীভাবে ভ্রমণকালে এখানে অবস্থান করতেন তখন স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন। বলা বাহুল্য ছোট একটি চমৎকার প্রাসাদের চারপার্শ্বে নিষেধ মান্য করার জন্য এর আবেষ্টনী প্রাচীরের অবস্থান তুলনামূলক বৈষম্য প্রদর্শন করছে। নিঃসন্দেহে এটি সে যুগের মানুষের তাৎপর্যপূর্ণ মানসিকতার চিত্র তুলে ধরেছে।

ফতেপুর সিক্রি :

সম্রাট আকবর ১৫৬৮ খ্রিস্টাব্দে আগ্রা হতে ৩৮.৬৫ কি.মি. (২৪ মাইল) পশ্চিমে ফতেপুর সিক্রি নগরীর গোড়াপত্তন করেন। তিনি দিল্লি হতে এখানে রাজধানী স্থানান্তর করত এ নবনির্মিত শহরটিকে রাজধানী শহরের মর্যাদা দান করেন। এ শহরটি এক অনুচ্চ পাহাড়ের ওপর অবস্থিত। দশ-বার কি.মি. পরিধি নিয়ে বিস্তৃত এ শহরটির তিন দিকই (পূর্ব-উত্তর, দক্ষিণ-পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম) সুউচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। শহরে গমনাগমনের জন্য নয়টি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। এ তোরণ দ্বারগুলো হচ্ছে—দিল্লি গেট, লাল গেট, আগ্রা গেট, বীরবল গেট, চান্দারপোল গেট, গোয়ালিয়র গেট, তেহরা গেট, চোর গেট এবং আজমীর গেট। অধিকাংশ গেটেরই নামকরণ এগুলোর বহির্দিকে অবস্থিত শহর বা স্থানের দিক নির্দেশক রূপে আখ্যায়িত।

রৈখিক নমুনায় (linear pattern) প্রতিষ্ঠিত এ শহরটি উত্তর-পূর্ব দিক হতে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রসারিত। শহরটি বেশ কিছু অনিন্দ্য সুন্দর স্থাপত্য ইমারতে শোভিত। দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, যোধবাঈয়ের প্রাসাদ, বিবি মরিয়মের প্রাসাদ, বীরবলের প্রাসাদ, তুর্কি সুলতানার বাথ, কারওয়ান সরাই, হিরণ মিনার, জামি মসজিদ, সেলিম চিশতির সমাধি, নবাব ইসলাম খানের সমাধি এবং বুলন্দ দরওয়াজা এগুলোর মধ্যে অন্যতম (ভূমি নকশা নং- ৫১)।[২]

জামি মসজিদ :

ফতেপুর সিক্রির দক্ষিণ-পশ্চিম কোনায় ১৫৭১ খ্রিস্টাব্দে জামি মসজিদের নির্মাণ কার্য শুরু হয়। এ মসজিদটি একটি অসমতল গিরিচূড়ায় অবস্থিত। ফতেপুর সিক্রির এটি একটি অনন্যসাধারণ কীর্তি।

আয়তাকার এ মসজিদটি বহির্দিকে পূর্ব-পশ্চিমে ১৬৫.২০ মি. (৫৪২ ফুট) এবং উত্তর-দক্ষিণে ১৩৩.৫০ মি. (৪৩৮ ফুট)। বিশালাকৃতির উন্মুক্ত সাহনের পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত প্রধান নামাজঘরটি (জুল্লাহ্) অভ্যন্তরীণ দিক হতে উত্তর-দক্ষিণে ৮৭.৮০ মি.

(১) নক্কর খান;
(২) টাঁকশাল;
(৩) ট্রেজারী;
(৪) দিওয়ান-ই-আম;
(৫) তুর্কী সুলতানের স্নানাগাব;
(৬) হাকিমের স্নানাগার;
(৭) দপ্তর খানা;
(৮) খোয়াবগাহ্;
(৯) তুর্কী সুলতানের প্রাসাদ;
(১০) বালিকা বিদ্যালয়;
(১১) পঁচিশি কোর্ট;
(১২) দিওয়ান-ই-খাস;
(১৩) পাঁচ মহল;
(১৪) মরিয়মের প্রাসাদ;
(১৫) যোধবাঈয়ের প্রাসাদ;
(১৬) বীববলেব প্রসাদ;
(১৭) কবুতব খানা;
(১৮) সংগীন বুরুজ;
(১৯) হাতীপোল;
(২০) বাউলী;
(২১) কারওয়ান সরাই;
(২২) হিরন মিনার;
(২৩) জামি মসজিদ;
(২৪) বুলন্দ দরওয়াজা;
(২৫) সেলিম চিশতির মাযার;
(২৬) নবাব ইসলাম খানের সমাধি এবং
(২৭) স্টোন কার্টার মসজিদ।

ভূমি নকশা নং-৫১ : ফতেপুর সিক্রি কমপ্লেক্স

(২৮৮ ফুট) এবং পূর্ব-পশ্চিমে ১৯ ৮৫ মি (৬৫ ফুট)। মূল নামাজঘব পাঁচ আইলে বিভক্ত (ভূমি নকশা নং-৫২)।
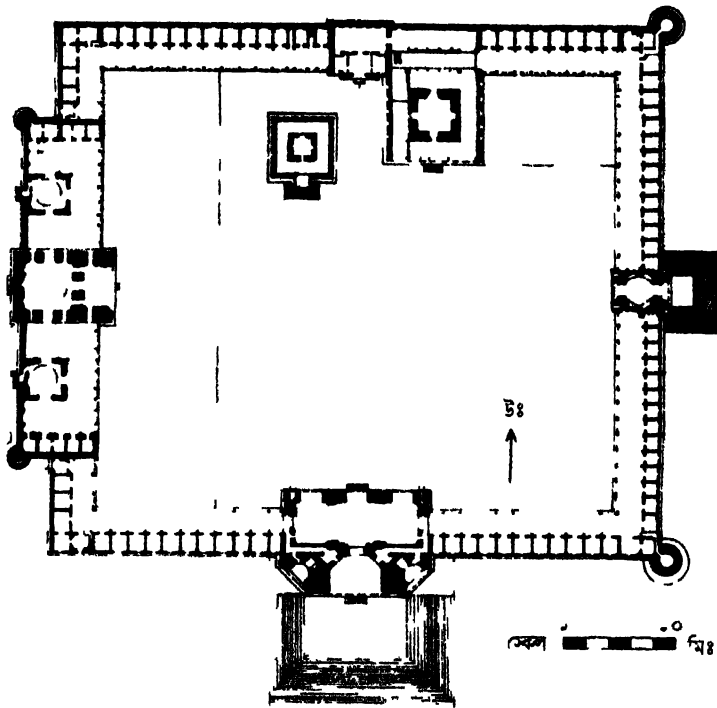
ভূমি নকশা নং ৫২ ফতেপুব সিক্রি জামি মসজিদ

কেন্দ্রীয নেভটি বর্গাকাব এবং একটি সুউচ্চ গম্বুজ দ্বাবা (এব ছাদ) পবিবৃত। কেন্দ্রীয নেভেব উভয পার্শ্ব হতে সম্প্রসাবিত আইলগুলো বৃহদাকৃতিব পিযাবেব দ্বাবা বিভাজিত এবং প্রতি অংশেই একটি কবে গম্বুজ দ্বাবা শোভিত। এ গম্বুজ দুটো কেন্দ্রীয গম্বুজ অপেক্ষা বেশ ছোট। এ ইমাবতেব গম্বুজ ও ছাদ নির্মাণে খিলান ও সর্দল পদ্ধতির সুষ্ঠু সংমিশ্রণ অত্যন্ত কৌশলেব সাথে সম্পাদিত হযেছে।

মসজিদেব কিবলা প্রাকাবে বযেছে তিনটি মিহবাব। কেন্দ্রীয মিহবাবটি জ্যামিতিক নকশা, ফুল, লতা-পাতা, আববা নকশা এবং হস্তলেখ দ্বাবা দৃষ্টিনন্দন কবে অলঙ্কৃত। মসজিদেব প্রধান প্রবেশপথটি প্রক্ষিপ্তাকাবে বেশ উঁচু ও জাঁকালোভাবে নির্মিত। প্রক্ষিপ্ত ইওযানের উভয পার্শ্বে খাঁজকাটা ট্যাবেট এবং বপ্র মার্লন অলঙ্কারে বিভূষিত। মার্লনেব পাশেই বযেছে পাঁচটি কিযস্ক (ছত্রী) যা ইমারতেব অন্যান্য উপাঙ্গেব সঙ্গে সামঞ্জস্য বক্ষাপূর্বক শোভাবর্ধনে নিযোজিত।

মসজিদেব বিশালাকৃতিব আযতাকাব সাহনেব দৈর্ঘ্য পূর্ব-পশ্চিমে ১০৯ ৭৫ মি. (৩৬০ ফুট) এবং প্রস্থ উত্তব-দক্ষিণে ১৩৩.৫০ মি (৪৩৮ ফুট)। সাহনেব তিন দিকই (উত্তব, দক্ষিণ এবং পূর্ব) ১১.৬০ মি (৩৮ ফুট ৬ ইঞ্চি) প্রশস্ততাবিশিষ্ট বিওযাক দ্বাবা

পরিবেষ্টিত। রিওয়াকের সম্মুখাংশ প্রায় ৭.০৫ মি. (২৩ ফুট) বারান্দা এবং পশ্চাদাংশ ছোট ছোট প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। অধিকাংশ কক্ষই ৩.০৬ মি. × ৩.০৫ মি. (১০ ফুট ৪ ইঞ্চি × ১০ ফুট ২ ইঞ্চি) এবং গম্বুজে আচ্ছাদিত। সাহনের তিন দিকের রিওয়াকের মধ্যবর্তীস্থানে রয়েছে তিনটি প্রবেশপথ। উত্তর রিওয়াকের প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত ছোট হলেও পূর্ব ও দক্ষিণের দুটি বেশ বড় এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ (চিত্র নং- ৭৫)।

পূর্ব বিওয়াকের প্রবেশপথটি 'বাদশা-কা-দরওয়াজা' নামে পরিচিত। এ পথে সম্রাট আকবর প্রাসাদ হতে মসজিদে যাতায়াত করতেন। এ তোরণটির সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণ মসজিদের সাহনের পীঠদেশ থেকে বেশ নিচু হওয়ায় ক্রমোন্নত সোপানের সাহায্যে গেটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা যায়। এ তোরণটি ১৩.১৫ মি. (৪৩ ফুট ৬ ইঞ্চি) উচ্চতাবিশিষ্ট এবং অর্ধ-ষড়ভুজাকারে (semi-hexagonal) নির্মিত। মসজিদ আবেষ্টনী প্রাকার থেকে প্রক্ষিপ্তাভাবে চতুর্কেন্দ্রিক খিলানে উন্মুক্ত এ প্রবেশপথটি একটি অর্ধ-বৃত্তাকার গম্বুজে আচ্ছাদিত। তোরণের বপ্র মার্লন অলঙ্করণে অলঙ্কৃত এবং কিযস্ক দ্বারা শোভিত।

বুলন্দ দরওয়াজা :

মসজিদের দক্ষিণ রিওয়াকের মধ্যবর্তীস্থানে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়গ্রাহী স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যসমৃদ্ধ রূপরেখায় নির্মিত হয়েছে বুলন্দ দরওয়াজা। তোরণটির উচ্চতার মাঝেই নামের সার্থকতা নিহিত। তোরণটি পাদপীঠ থেকে ৪০.৮৫ মি. (১৩৪ ফুট) উঁচু এবং বাইরের সমতল ভূমি থেকে এর পাদপীঠ পর্যন্ত উচ্চতা ১২.৮০ মি. (৪২ ফুট)। সুতরাং পারিপার্শ্বিক সমতল ভূমি থেকে এর মোট উচ্চতা ৫৩.৬৫ মি. (১৭৬ ফুট)। ভূমি নকশায় এ তোরণটি ৩৯.৬৫ মি. × ২৬.৮৫ মি. (১৩০ ফুট × ৮৮ ফুট ৬ ইঞ্চি) পরিসরে নির্মিত। তবে সম্মুখ অংশ ৩৯.৬৫ মি. (১৩০ ফুট) হলেও পশ্চাদভাগ ক্রমহ্রাস হয়ে ৩৭.৫০ মি. (১২৩ ফুট) পৌঁছেছে। তোরণের সম্মুখভাগের উভয় পার্শ্ব সমকোণী (chamfered) আকারে কর্তিত হওয়ায় বাহ্যিক দিক থেকে এটিকে অর্ধ অষ্টভুজাকার দেখায়। ত্রিতলবিশিষ্ট এ তোরণটির সম্মুখভাগ অর্ধ-গম্বুজ দ্বারা শোভিত। গম্বুজের অভ্যন্তরভাগ ঘালিবকারি প্যাটার্নে অলঙ্কৃত। তোরণের পশ্চাৎদেশে (অর্থাৎ মসজিদের সাহনের দিকে) রয়েছে তিনটি চতুর্কেন্দ্রিক খিলানে উন্মুক্ত প্রবেশ দ্বার। কেন্দ্রীয় দ্বারটি পার্শ্ববর্তী দ্বারগুলোর চেয়ে বড় আকৃতিতে নির্মিত। এটি অশ্বপাদুকাকৃতি পথ নামে পরিচিত। প্রবেশপথ ত্রয়ের শীর্ষে খিলানবিশিষ্ট উন্মুক্ত গ্যালারি রয়েছে; এখান থেকে সিঁড়ি বেয়ে তোরণের শীর্ষে আরোহণ করা যায়। ত্রিতলবিশিষ্ট এ তোরণটির প্রথম ও তৃতীয় তলার নির্মাণ অবকাঠামো প্রায় একইরূপ। দ্বিতীয় তলায় খিলানবিশিষ্ট গ্যালারিসহ বেশ কটি কক্ষ রয়েছে।

বুলন্দ দরওয়াজার অলঙ্করণকার্য অতি নিখুঁত ও মনোমুগ্ধকর। তোরণের সম্মুখভাগ শ্বেতমর্মরের আনুভূমিক ও উলম্ব প্যানেলে বিভক্ত। প্যানেলগুলো আবার লাল বেলেপাথরের প্রান্তিক রেখায় সজ্জিত। প্যানেলগুলোর মধ্যে আরব্য নকশা, জ্যামিতিক নকশা, ফুল, লতা-পাতা ইত্যাদি অলঙ্করণে শোভিত। খিলানের ত্রিকোণাকার ভূমিগুলো প্রস্ফুটিত রোজেট নকশাখচিত। ইমারতের কোনাগুলোতে উর্ধ্বদিকে ক্রমসরু খাঁজকাটা ট্যারেট দ্বারা অলঙ্কৃত। তোরণের শীর্ষোপরি মার্লন সজ্জিত বপ্রের পার্শ্বেই নির্মিত রয়েছে ছত্রী। উল্লেখ্য যে, মসজিদ সাহনের রিওয়াক ও জুল্লাহর শীর্ষোপরি নির্মিত ছত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বুলন্দ দরওয়াজার ছত্রীগুলো নির্মিত (চিত্র নং- ৭৬)।

বুলন্দ দরওয়াজার নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতোপার্থক্য রয়েছে। মিফতাহুত তাওয়ারিখ গ্রন্থের উদ্ধৃতি দিয়ে টি.ডব্লিউ বেলী বুলন্দ দরওয়াজার নির্মাণকাল ১৫৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দ হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৪] আবার ভি.এ. স্মিথ আকবর গুজরাট বিজয়ের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য এটি ১৫৭২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত বলে মন্তব্য করেছেন।[৫] কিন্তু ই. ডব্লিউ স্মিথ দাক্ষিণাত্য বিজয় ঘটনার (১৬০১-০২) প্রেক্ষিতে এটি স্মবণিক তোরণ হিসেবে নির্মিত হয়েছে বললেও এ.বি.এম. হোসেন এ মতো অগ্রহণযোগ্য বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[৬] যা হোক ফতেপুর সিক্রির নামকবণে গুজরাট বিজয় ঘটনা যেরূপ প্রাধান্য পেয়েছিল তেমনি এ ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে সম্রাট আকবর অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এতে সন্দেহের অবকাশ অত্যন্ত ক্ষীণ।

সেলিম চিশতির সমাধি :

ফতেপুর সিক্রির জামি মসজিদের সাহনের উত্তর রিওয়াক ঘেঁষে এ মাকবারাটি অনুপম স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ধারণ করে দাঁড়িয়ে আছে। সম্পূর্ণ সমাধি ইমারতটি শ্বেতমর্মব প্রস্তরে নির্মিত।

বর্গাকার ভূমি নকশা পরিকল্পনায একটি স্বল্প উচ্চ মঞ্চের ওপর এটি প্রতিষ্ঠিত। মঞ্চটির প্রতি বাহু ১৪.৩৫ মি. (৪৭ ফুট) এবং সমতল সাহন চত্বর থেকে .৯০ মি. (৩ ফুট) উঁচু। মাকবারার কেন্দ্রীয় কবর প্রকোষ্ঠটি প্রায় বর্গাকৃতি ৩.৩৬ মি. × ৩.০৫ মি. (১১´-৩´´ ×১০´)। এ প্রকোষ্ঠের চতুর্দিকে খিলান পরিবেষ্টিত প্রশস্ত বারান্দা রয়েছে। খিলান গর্ভগুলো মর্মর প্রস্তবের জালি কার্য দ্বারা বন্ধ। মাকবারার কেন্দ্রীয় শবাধার কক্ষটি একটি শ্বেতমর্মর প্রস্তরে নির্মিত গম্বুজে পরিবৃত। গম্বুজ নির্মাণে ক্রমপূরণ পদ্ধতির ব্যবহার পরিদৃষ্ট হয়। গম্বুজের শিরোচূড়ায় প্রস্ফুটিত পদ্মফুল ও কলস শীর্ষদণ্ড শোভিত। শবাধার প্রকোষ্ঠে কেবলমাত্র দক্ষিণ দিকে আবেষ্টনী প্রাকারের মধ্যবর্তী স্থানে নির্মিত ১.২২ মি. (৪ ফুট) প্রস্থবিশিষ্ট দরজা দিয়ে প্রবেশ করা যায়। উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম প্রাকারের নির্মিত তিনটি বাতায়ন মর্মর জালিকর্ম দ্বারা আবৃত।

কবর ফলকটি শ্বেতমর্মরে তৈরি। এটির দৈর্ঘ্য ২.৭১ মি. (১০´-৯´´), প্রস্থ ১.৮০ মি. (৫´-৯´´) এবং উচ্চতায় ৩.০৫ মি. (১০´)। কাষ্ঠ নির্মিত একটি চাঁদোয়া ছাদে শবাধারটি পরিবৃত। শবাধারটি অতি মূল্যবান গিলাফ (pall) দ্বারা সর্বদা আচ্ছাদিত থাকে।

ইমারতটির অধিক প্রলম্বিত তির্যক ছাঁইচের আলম্বনরূপে ব্যবহৃত অদ্ভুত আকারের বন্ধনীগুলো (struts) নান্দনিক দৃশ্যের অবতারণা করেছে। এগুলো শ্বেতমর্মরে তৈরি এবং নিখুঁত খোদাইকার্যে অলঙ্কৃত। ইমারতের বিশেষত্ব এগুলোর মাঝে নিহিত (চিত্র নং-৭৭)।

ইমারতের প্রতিটি উপাঙ্গ মনোমুগ্ধকর, হৃদয়গ্রাহী ও অনুপম আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যে সমৃদ্ধ। বিভিন্ন প্রকার জ্যামিতিক নকশালঙ্কার, আরব্য নকশা, ফুল-লতাপাতা ইত্যাদি এর সৌকুমার্য বৃদ্ধিতে সহায়তা করছে।

নওয়াব ইসলাম খানের সমাধি :

সেলিম চিশতির মাকবারার অব্যবহিত পূর্ব পার্শ্বেই নির্মিত হয়েছে নওয়াব ইসলাম খানের সমাধি। এ ইমারতটি লাল বেলে পাথরে তৈরি।

বর্গাকার নকশা পরিকল্পনায় এ ইমারতটি একটি উঁচু মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। মূল সমাধি প্রকোষ্ঠের চতুর্দিকে ৪.৬০ মি. (১৫ ফুট) প্রশস্ততাবিশিষ্ট বারান্দা দ্বারা পরিবেষ্টিত।

পশ্চিম পার্শ্বের বারান্দা সংলগ্ন জায়গায় অনেকগুলো কবর রয়েছে। এ কবরগুলোর মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম কোনার কবর দুটি শ্বেতমর্মর ফলকে আচ্ছাদিত। এ দুটি শেখ হাজী হুসাইন এবং শেখ মুন্নুর শবাধার হিসেবে চিহ্নিত।

ইসলাম খানের সমাধিটি বাহ্যিক দিক হতে বর্গাকার হলেও গম্বুজ পরিবৃত মূল প্রকোষ্ঠটি অষ্টভুজাকার। গম্বুজ নির্মাণে প্রতি কোনায় শীর্ষ প্রস্তর (cap-stone) স্থাপন করত অষ্টভুজকে ষোড়শভুজে এবং ষোড়শভুজকে বত্রিশভুজে রূপান্তরিত করেছে এবং এ অবস্থান্তর প্রবৃত্তির ওপরই গম্বুজের পাদদেশ অবস্থান করছে। গম্বুজের চূড়া পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত পদ্ম ও কলস দ্বারা অলঙ্কৃত। ইমারতের ছাঁইচ বন্ধনীর সাহায্যে প্রক্ষিপ্তাকারে তৈরি এবং বপ্র মার্লন নকশায় শোভিত। বপ্রের পার্শ্বেই এক সারি ছত্রী ছাদ পাঁচিলের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে নিয়োজিত। জামি মসজিদের অন্যান্য উপাঙ্গের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্যই এগুলো নির্মিত। রাজপুত স্থাপত্যকলার এ অলঙ্করণ বৈশিষ্ট্যটি আকবরের স্থাপত্যকলায় অতি দৃঢ়ভাবে স্থান করে নিয়েছিল (চিত্র নং- ৭৮)।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ৯৩।

২. শহর-নকশা পরিকল্পনায় চিহ্নিত ইমারতগুলো হচ্ছে- (১) নক্করখানা, (২) টাঁকশাল, (৩) ট্রেজারি, (৪) দিওয়ান-ই-আম, (৫) তুর্কি সুলতানার স্নানাগার, (৬) হাকিমেব স্নানাগার, (৭) দপ্তরখানা, (৮) খোয়াবগাহ্‌, (৯) তুর্কি সুলতানার প্রাসাদ, (১০) বালিকা বিদ্যালয়, (১১) পঁচিশি কোর্ট, (১২) দিওয়ান-ই-খাস, (১৩) পাঁচ মহল, (১৪) মরিয়মের প্রাসাদ, (১৫) যোধবাঈয়ের প্রাসাদ, (১৬) বীরবলের প্রাসাদ, (১৭) কবুতরখানা, (১৮) সঙ্গীন বুরুজ, (১৯) হাতীপোল, (২০) বাউলী, (২১) কারওয়ান সরাই, (২২) হিরন মিনার, (২৩) জামি মসজিদ, (২৪) বুলন্দ দরওয়াজা, (২৫) সেলিম চিশতির মাজার, (২৬) নবাব ইসলাম খানেব সমাধি এবং (২৭) স্টোন কার্টার মসজিদ; দেখুন : এ.বি.এম. হোসেন, *ফতেপুর সিক্রি এন্ড ইটস আর্কিটেকচার*, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ২১।

৩. *তদেব*, পৃ. ১১০।

৪. টি. ডব্লিউ বেলী, *এন অরনামেন্টেশন বিবলিউগ্র্যাফিক্যাল ডিক্শনারি*, লন্ডন, ১৮৬৭, পৃ. ১৮১।

৫. ভি.এ. স্মিথ, *আকবর দি গ্রেট মোঘল*, দিল্লি, ১৯৫৮, পৃ. ৩২০।

৬. এ.বি.এম. হোসেন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৪।

ঊনবিংশতিতম অধ্যায়
সম্রাট জাহাঙ্গীরের স্থাপত্যকীর্তি
(১৬০৫-১৬২৭ খ্রি.)

১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে মহান স্থপতি ও নির্মাতা আকবরের মৃত্যু হলে তৎপুত্র জাহাঙ্গীরের স্থাপত্য যুগ নতুন সম্ভাবনায় শুরু হয়েছিল। তিনি পিতা আকবরেব তুলনায় নিতান্ত সামান্য স্থাপত্য প্রতিভা প্রদর্শন করতে পেরেছিলেন। পিতা-পুত্র উভয়ই স্থাপত্য ও কলাশিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু উভয়ের রস আস্বাদনীয় চেতনা একই খাতে প্রবাহিত হয় নি। পিতার প্রেরণা ছিল স্থাপত্যের প্রতি, অন্যপক্ষে পুত্রের আকর্ষণ ছিল সুকুমার কলা চিত্রায়নের প্রতি। তাই বলে তাঁর সময় নির্মিত স্থাপত্য নিদর্শনগুলো শৈল্পিকমানে কমনীয়তা বা সৌষ্ঠব সৌকর্যহীন ছিল না।

তাঁর সময় পুনঃনির্মিত আগ্রা দুর্গে জাহাঙ্গীরি মহল (১৬২০ খ্রি.), শ্রীনগরের উপকণ্ঠে শালিমারবাগ (১৬২৪ খ্রি.) লাহোরে আনারকলির সমাধিসৌধ (১৬১৩ খ্রি.), লাহোর দুর্গের সংস্কার, আগ্রার নিকটে সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিসৌধের নির্মাণ কাজ সুসম্পন্নকরণ। তা ছাড়া তাঁর সময় ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধি (১৬২৬ খ্রি.) ও লাহোরের শাহ্দারায় তাঁর নিজের সমাধিসৌধ নির্মাণ এবং উক্ত শহরের মরিয়ম জামান-ই-মসজিদ (১৬১৪ খ্রি.), খিরাবাগ ও দিল্লিস্থ আকবরের সভাসদ খান-ই-খানানের সমাধিসৌধ নির্মাণ সমধিক প্রসিদ্ধ।

জাহাঙ্গীরের আমলে নির্মিত স্থাপত্যকীর্তিগুলোর উপকরণ ছিল লাল বেলে পাথর ও শ্বেতমর্মর। আকবরের বেলে পাথর আর শাহজাহানের মর্মর পাথরের উপকরণের যুগসন্ধিক্ষণ ছিল জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল। অন্যপক্ষে তাঁর সময় স্থাপত্যিক কৌশল প্রয়োগ প্রক্রিয়ায় মুসলিম খিলান রীতি (arcuate) ও হিন্দু স্তম্ভ-সর্দল রীতি (trabeate) অনুসৃত হয়েছিল। কিন্তু অলঙ্করণ ও কারুকার্যের ব্যবহারে খচিত ও খোদাই নকশার কাজে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এ সময় ওপাস্ সেক্টাইল ও পেট্রাডুরা রীতির প্রস্তর কাজ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

এ সময়ের স্থাপত্যকীর্তিগুলো যেন শীর্ণকায়া ও নরম মেজাজের। কিন্তু বিচিত্রতায় নিপুণভাবে চিত্রায়িত কোমল তনু। স্থাপত্য ঐতিহাসিকদের মতে স্থাপত্যে বলিষ্ঠহীনতা ও অতি সৌন্দর্যের পরাকাষ্ঠাই জাহাঙ্গীরের যুগবৈশিষ্ট্য। এখানে যে স্থাপত্য পদ্ধতির পরিবর্তন ছোঁয়াচ প্রত্যক্ষ করা যায় তাই শাহজাহানের সময় পূর্ণাঙ্গতা প্রাপ্ত হয়েছিল।

সিকান্দ্রা :

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রথম দিকে স্থাপত্যকীর্তিগুলোর মধ্যে আগ্রা হতে প্রায় ৬.৫ কি.মি. পশ্চিমে সিকান্দ্রায় নির্মিত আকবরের সমাধিসৌধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ সমাধিসৌধের নির্মাণ কাজ আকবর নিজে আরম্ভ করলেও জাহাঙ্গীর তা সমাপ্ত করেন। এটি ১৬০৫ খ্রিস্টাব্দে শুরু হয়ে ১৬১৩ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল। আকবরের সময়ে গৃহীত নকশা পরিকল্পনায় মাত্র নিম্নতলা বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং পরবর্তী তলাগুলোর যেটুকু নির্মাণ করা হয়েছিল তা জাহাঙ্গীরের আদেশে ভেঙে ফেলে নতুন নকশা পরিকল্পনা অনুসারে নির্মিত হয়েছিল।

আকবরের বিরাট ব্যক্তিত্ব যেখানে চিরশায়িত হয়ে রয়েছে তার স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য আলোচনায় দেখা যায় যে বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে অধঃপতন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে; অথচ প্রায় ৫০ বছর পূর্বে আকবরের সময়ে হুমায়ূনের সমাধি স্থাপত্যিক গুণাবলীর পূর্ণাঙ্গ সমাবেশে সম্ভবপর হয়েছিল। তবে এর পরবর্তী নির্মাতার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে একে প্রচলিত গম্বুজ শোভিত করার বাইরে নতুন রীতি ও পদ্ধতির ব্যবহারে অভিনব ও আকর্ষণীয় করে নির্মাণ করা। অবশ্য জাহাঙ্গীরের নবপ্রবর্তনরীতি ইমারতের অংশগঠনে তখন হতে প্রচলিত হয়েছিল।

স্থাপত্যশিল্পের একটা চলমান গতি রয়েছে, এটি যুগ ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়ে থাকে। তবে সিকান্দ্রার সমাধিসৌধে অনুরূপ যুগ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে নি। যদি এটি কল্পনাশক্তির সাথে বাস্তব প্রয়োগ একত্র হয়ে সঠিক রীতিতে নির্মিত না হত তা হলে সম্পূর্ণ সন্তোষজনক স্থাপত্য ফলাফল পাওয়া যেত না। তাই সিকান্দ্রায় সামগ্রিকভাবে স্নিগ্ধময় বিচিত্র্য সৃষ্টিতে ব্যর্থতা এসেছে। এ সৌধে অসম্পূর্ণতার অভাবটাই দৃষ্ট হচ্ছে। এখানে এর বিভিন্ন অংশ ও উপাদান সামগ্রী পৃথকভাবে না থেকে একটানা বিস্তারে বৃহদায়তনরূপে বহিঃপ্রকাশিত না হতে পারাটাই এর ব্যর্থতা।

এ সমাধিসৌধের নকশা পরিকল্পনা আড়ম্বরপূর্ণ না হলেও একটা বিরাট এলাকার মাঝখানে অবস্থিত এবং ঐ এলাকা জুড়েই রচিত হয়েছে উদ্যান।[১] এটি আবেষ্টনী প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েছে। মূল সমাধিসৌধ বর্গাকার নকশায় উদ্যানের মাঝখানে নির্মিত হয়েছে। এর প্রতিপার্শ্ব ৯৭.৬০ মি. (৩২০ ফুট) এবং ৩০.৫০ মি. (১০০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। প্রতিপার্শ্বের বহিস্থ দেয়ালের ঠিক মাঝখানে প্রবেশপথ নির্মিত হয়েছে। তবে এর চারপার্শ্বে তিনটি দরজাপথ বন্ধ অবস্থায় বিদ্যমান, যা কেবল সামঞ্জস্য ও সাদৃশ্যতা দেখানোর জন্য অলঙ্কার হিসেবে নির্মিত।

প্রধান প্রবেশপথ দক্ষিণের দিকে রচিত হয়েছে। এ তোরণ দ্বারটি সবচেয়ে চিত্তাকর্ষণীয় ও দর্শনীয়। প্রতিটি দরজাপথ পর্যাপ্ত ও যথাযথ পরিমাণে সুশোভিত হয়ে এক একটি ছোট্ট সৌধরূপে বহিঃপ্রকাশিত হওয়ার মতো মনোজ্ঞপূর্ণভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এগুলোর অঙ্গ গঠনে সুষমতা স্নিগ্ধতা ছাড়াও বলিষ্ঠ অন্তর্মুখী অলঙ্কারের জন্য দৃষ্টি আকর্ষণীয় হয়েছে। সমাধিসৌধে চারটি চমৎকার ও সৌন্দর্যময় শ্বেতমর্মরের মিনার প্রতি কোনার শোভাবর্ধন করছে। ইতঃপূর্বে অনুরূপ ধরনের মিনার উত্তর ভারতের স্থাপত্য কাজে আবির্ভূত হয় নি। এ সৌধেই প্রথম এ ধরনের মিনার নির্মাণ করা হয়। এটি এখানে প্রথম নির্মাণ করা হলেও এটি পরীক্ষামূলক ছিল না, বরং নির্ভরযোগ্যতায় পূর্ণাঙ্গরূপে বিকশিত সত্তায় প্রকৃত ও চূড়ান্ত আকারত্বে বিরাজ করতে পেরেছে ।

এর জাঁকালো প্রধান প্রবেশ তোরণ দিয়ে অভ্যন্তরের প্রধান সৌধ পর্যন্ত উদ্যান রচনার একটি ব্যাপক পরিকল্পনা দৃষ্ট হয়। এখানে স্থপতির মৌলিক চিন্তা ও ধারণার সাথে উদ্যান নকশা নির্মাণকারী শিল্পীর পরিকল্পনা একখাতে প্রবাহিত হতে পেরেছিল বলে দুটি কর্ম উদ্যম সমন্বিত হয়ে অপরূপ অবদান উপহার দিতে পেরেছিল। এর প্রতিটি উপাদান একটির সাথে আর একটি মিশিয়ে সুষমতায় সমাপ্ত হয়েছিল।

এ উদ্যানের অংশবিশেষ নিশ্চিহ্ন ও বিলোপ সাধন করা হয়েছে তথাপি যা অদ্যাপি টিকে রয়েছে তা হতে প্রকৃত অবয়ব ধারণা করতে কষ্ট হয় না। সরল ও বক্ররেখায় অনেকখানি জায়গা জুড়ে পাথর দিয়ে বাঁধানো উচ্চ পথ মাঝখানে বিরতি দিয়ে সুবিধামতো প্রতিপার্শ্বে প্রসারিত হয়ে বর্গাকার উঁচু টিবিতে ঝরনা ও ঢালু বা দেবে যাওয়া গামলাসহ (sunk basin) অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সামগ্রী সজ্জিত করা হয়েছে। এসব সৌন্দর্য বৃদ্ধির টুকিটাকি কাজগুলো অত্যন্ত নিপুণভাবে সম্পাদন করে উদ্যান পথকে হৃদয়গ্রাহী করে তোলা হয়েছে। অবশেষে সমগ্র স্থাপত্য পরিকল্পনার সাথে একে সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে বহিঃপ্রকাশ হতে সহায়তা করেছে।

সমাধিসৌধটির সাধারণ বাহ্যিক চেহারার আকারত্ব কতকটা নিচু, এর অগ্রভাগ কর্তিত হওয়ায় পিরামিডের মতো বা বৌদ্ধস্তূপের মতো মনে হয়। এটি তিনতলায় সমাপ্ত হয়েছে। এর কাঠামো গঠন তিন খণ্ডাংশে বিভক্ত; প্রথমত বৃহদায়তন গুরুভার চত্বরসহ ভূগর্ভস্থ তলা, এর উপরে গতানুগতিকভাবে লাল বেলে পাথরের তিন স্তরের নির্মাণ ব্যবস্থায় মধ্যম অংশ গঠিত এবং পরবর্তী তলায় একটা উন্মুক্ত অঙ্গন যা মার্বেল পাথরের পরদায় আবৃত।

ইমারতের সর্বনিম্ন ভূগর্ভস্থ তলাটি একটি অতীব জাঁকজমকপূর্ণ কল্পিত বিষয়বস্তু। এর প্রতিপার্শ্ব ৯১.৫০ মি. (৩০০ ফুট) এবং ৯.১৫ মি. (৩০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট (ভূমি নকশা নং- ৫৩)। এর চারপার্শ্বে সারিবদ্ধ খিলানশোভিত কুলঙ্গি বা ফোঁকরসহ গঠিত হয়েছে। প্রতিপার্শ্বের মধ্যখানে আয়তাকার কাঠামো খিলান কুলঙ্গিসহ নির্মিত হয়েছে। অন্যপক্ষে এ অবয়বের উন্নত বপ্রের ওপর দিয়ে মনোজ্ঞ মর্মরের ছত্রী দিগন্তরেখা ছেদ করে ফলপ্রসূভাবে অবস্থান করছে।
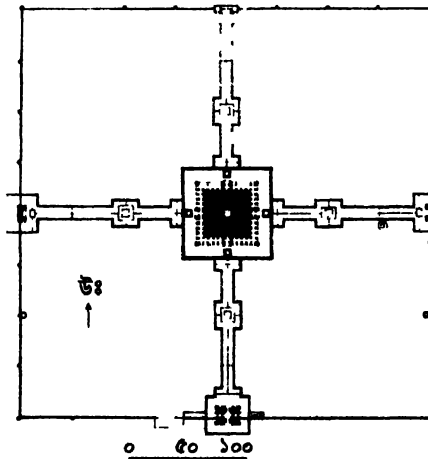
ভূমি নকশা নং-৫৩ : আকবরের সমাধি

দক্ষিণ পার্শ্বের খিলান কুলঙ্গি বা চোরকুঠরির মধ্য দিয়ে কবর প্রকোষ্ঠের দিকে সংযোগ স্থাপন প্রবেশপথ রচিত, যা ইমারতের গর্ভেই অতিক্ষুদ্র আকারের মিসরীয় পিরামিডের মতো প্রকোষ্ঠে এসে শেষ হয়েছে। ইমারত নকশা প্রকল্পের নিম্নাংশ মোটামুটি অত্যন্ত সুগঠিত ও স্থিতিবান, কেননা আকবরের জীবদ্দশায় সম্ভবত তার রাজত্বের শেষ বছরে ঐটুকু অংশ সম্পন্ন হতে পেরেছিল। কিন্তু এখানেই এ তেজস্বী, প্রাণশক্তিসম্পন্ন ও বহুমুখী কর্মশক্তি সম্রাটের প্রভাব বাহ্যত সমাপ্ত হয়েছিল।

এর দ্বিতীয় তলায় সারিবদ্ধ বেলে পাথরের অবকাঠামো। এ অংশের গঠন অত্যন্ত হালকা ধরনের এবং উদ্ভট কাল্পনিক আকারের; কেননা এর নিম্নতলার অতীব মজবুত উপকাঠামোর সাথে একেবারেই বেমানান। যদিও চমৎকার ও মনোজ্ঞ দলে দলে বিভাজিত তোরণ শ্রেণী ও ছত্রী দ্বারা শোভিত হয়েছে তথাপি এদের ওজনহীন ও দৃঢ়তাহীন মধ্যবর্তী অংশের গঠন প্রণালী সমগ্র কাঠামোর একক অনুপম চিত্র সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় নি। এগুলোর দ্বন্দ্বরত আলোছায়া স্থায়িত্বের বা স্থৈর্যের অভাবময় ফল সৃষ্টি করেছে। ফলে নির্মাণ কাজের এ পর্যায়ে জাহাঙ্গীর মনে হয় বাধাদান করে নির্মিত অংশ ভেঙে অপসারণ করে পুনঃনির্মাণের আদেশ প্রদান করেন (এ নতুনভাবে কাজটি সুসম্পন্ন করতে ১৫ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছিল)।

এ পুনঃনির্মাণ কাজে যে প্রভূত ব্যয় হয়েছিল তার পিছনে অন্য আর একটি কারণ দৃষ্ট হয়, যা হচ্ছে সৌধ কাঠামোর ঐ অংশে অনেক মূল্যবান সামগ্রির রদবদল। অন্যপক্ষে এটি অসম্ভব নয় যে সমগ্র মধ্যবর্তী তলাটাই জাহাঙ্গীর তাঁর নিজ অভিরুচি অনুসারে নির্মাণ করে নিয়েছিলেন। এটি বুঝা খুবই সহজ যে তাঁর স্থাপত্যিক আদর্শ ও ধ্যান-ধারণা তাঁর পিতা আকবরের আদর্শ হতে ভিন্নরূপ ছিল। পিতা ও পুত্রের মধ্যে মনের গঠনগত প্রকৃতির একটা সংঘাত ও বৈপরীত্য দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে। এ সংঘাতময় সামগ্রিক প্রবৃত্তির রূপরেখাই এ স্থাপত্য নির্মাণের প্রতীক চিহ্নরূপে প্রতিভাসিত হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে আকবরেব যুগে স্থাপত্য নির্মাণে যে সুঠামরূপ ছিল তা পরবর্তী সময়ে জাহাঙ্গীরের যুগে বেশ মনোরম ও সুন্দর হলেও শক্তি তাড়িত প্রাবল্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এতে ছিল না। পরিস্থিতির এরূপ প্রেক্ষাপটে হয়তো প্রকল্পের অবশিষ্টাংশের কাজ সুসম্পন্ন হয়েছিল।

আকবরের সমাধিসৌধ সিকান্দ্রার শীর্ষ তলার নির্মাণ বৈশিষ্ট্য অনুধাবন করলে এর সাথে সৌধের অবশিষ্টাংশের নির্মাণ কৌশলের ভিন্নতা ও কিছুটা সংঘাত দৃষ্ট হয়। কেননা কেবল এ অংশটুকুর সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণভাবে শ্বেতমর্মরের দ্বারা অতি পরিচ্ছন্নভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। এটি বৃহদায়তন একক কাঠামো যার সাথে নিরেট ঝুলন্ত ছাঁইচ (solid projecting cornice) নির্মিত হয়েছে।

ইমারতের বাহ্যিক চেহারায় হালকা ভাব আনয়নের জন্য সারিবদ্ধ মসৃণ ও মিহি ছিদ্রায়িত পরদা সংযুক্ত রয়েছে এবং প্রতি কোনা হতে মনোজ্ঞ ও চমৎকার ছত্রী উপরের দিকে উঠে গিয়েছে। এর অভ্যন্তরভাগে চলাচলের জন্য উন্মুক্ত অঙ্গনরূপে গঠিত হয়ে সারিবদ্ধ খিলানায়িত বারান্দা (cloister) নির্মিত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে নিচের ভূগর্ভস্থ তলার পরবর্তী তলাটি প্রতিপার্শ্বে ৫৬.৭০ মি. (১৮৬ ফুট) এবং ৪.৩০ মি. (১৪ ফুট ৯ ইঞ্চি) উচ্চতাবিশিষ্ট। এটি অন্যান্য অংশের চেয়ে বেশি অলঙ্কৃত। এর পরবর্তী তলা বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মিত যার উচ্চতা ৪.৬০ মি. (১৫ ফুট ২ ইঞ্চি)। অন্যপক্ষে শেষের তলা বাইরের দিক দিয়ে প্রতিপার্শ্ব ৪৭.৮৫ মি. (১৫৭ ফুট) এবং ৪.২৫ মি. (১৪ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। ওপর তলার শ্বেতমর্মর কাঠামো

বিভিন্ন আঙ্গিকের কারুকার্যে সুশোভিত। অবশিষ্ট তলাগুলো বেলেপাথরে নির্মিত হলেও নিখুঁত স্থাপত্যিক কৌশলময় চাতুর্যপূর্ণ কাজে রয়েছে পরিশোভিত।

সর্বনিম্ন ভূগর্ভস্থ আধারটি অসংখ্য স্তম্ভে ও অলিন্দে পরিপূর্ণ। কবর ফলকটি প্রকোষ্ঠের ঠিক মধ্যবর্তী স্থলে অবস্থিত এবং এটি মঞ্চানুরূপ কিছুটা উচ্চতাসম্পন্ন। এর প্রস্তরপৃষ্ঠ আরব্য নকশালঙ্কারে নিখুঁত খোদাই ও খচিত কার্য দ্বারা বৈচিত্র্যময় সৌকুমার্যপূর্ণ। কবর প্রকোষ্ঠে ১০.৭০ মি. (৩৫ ফুট) বর্গাকার স্থান জুড়ে ও উর্ধ্বে ঢেউ খেলানো ছাদ ধারণ করে রয়েছে (চিত্র নং- ৭৯)।

পি. ব্রাউন এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে বিভিন্ন দিক হতে চিন্তা করে দেখলে মনে করা যায় যে ছাদহীন উপরের চত্বর মিহি ও অনুপম সৌকর্যময় পদ্ধতির প্রক্রিয়া ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমগ্র স্থাপত্য কাঠামোর প্রয়োজনীয়রূপ উপযুক্ততায় সম্পন্ন হয়েছে।[২] কিন্তু ফারগুসন বলেছেন[৩] যে সমাধিসৌধের এ অংশটুকু অসম্পন্ন রয়ে গিয়েছে। স্থাপত্য কাঠামোর নির্মাণ ধারাবাহিকতায় গম্বুজ সংস্থাপনের কাজ অবশিষ্ট ছিল। এটি সংযোজিত হয়ে পিরামিডের উচ্চতায় শীর্ষ অংশ গঠিত হয; পক্ষান্তবে কবর ফলকেব অনুপম সৌন্দর্যময় শিল্পকলা রক্ষা ব্যবস্থা সুসম্পন্ন হয় নি।

এ সমাধিসৌধ সম্পর্কে নিঃসন্দেহে বলা যায় এটি মোগলদের অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও প্রাঞ্জল স্থাপত্যকর্মগুলোর মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট ও প্রাণবন্ত অবদান। যদিও একে চমৎকারিত্বের গুণে ফলপ্রসূ অনুপম কর্ম বলে মনে করা যায়, তথাপি স্থাপত্যিক দৃষ্টিকোণ হতে এটি অকার্যকব; কেননা এব কোনো সারবস্তু নেই এবং এতে ঘনমান ও সমষ্টিগত ঐক্যের অভিসঞ্চায়ন ঘটে নি। অন্যপক্ষে সঠিকভাবে সংজ্ঞা নিরূপণের যথার্থ দিঙনির্দেশনা সৃষ্টিতে স্থাপত্যকর্মটি ব্যর্থ হয়েছে। এসব ক্রটিবিচ্যুতি এর গুণগত অপূর্ণতার দিক হতেও দৃশ্যমান এবং এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয় যে শৈল্পিক চেতনায় সম্রাটের দায়িত্বহীনতার প্রভাব সমাধিসৌধে (তার সম্পাদিত অংশের নির্দেশনায়) প্রতিভাসিত হয়ে বয়েছে।

সম্রাট জাহাঙ্গীরের সমাধি :

সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিশিষ্টতম স্থাপত্যকীর্তি হচ্ছে তাঁর নিজের সমাধিসৌধ, যা তাঁর রাজত্বের শেষভাগে লাহোরের নিকট শাহদারায় নির্মিত হয়েছিল। সম্ভবত উক্ত সমাধিসৌধের অধিকাংশ নির্মাণ কাজ তাঁর পত্নী নূরজাহান কর্তৃক সম্পন্ন হয়েছিল। এ সমাধিসৌধ মোগলদের ঐ একই প্রকার প্রথা অনুসারে বিস্তৃত উদ্যানের মধ্যবর্তী স্থলে নির্মিত হয়েছিল।

এটি বর্গাকার আকারত্বে মৃতপ্রায় রাভী নদীর বাঁকে নির্মিত হয়েছে। এটি সুউচ্চ আবেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে প্রতি পার্শ্ব ৪৫৭.২০ মি. (১৫০০ ফুট) নিয়ে গেঁথে তোলা হয়েছে এবং প্রতি পার্শ্বের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে চমৎকার তোরণ দরজা। পশ্চিম দিকের মর্মর নির্মিত খিলানটি প্রায় ১৫.২৫ মি. (৫০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট। সে সময় উদ্যান ঘেরা যতগুলো সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছিল তন্মধ্যে এটিই সর্ববৃহৎ। এ উদ্যানটি সমান ষোলটি বর্গাকার উচ্চ বাঁধানো ও মোড়ানো জাঙ্গাল দ্বারা বিভক্ত হয়েছে। প্রতিটি উপবিভক্তির মাঝে ঝরনা ও অলঙ্কৃত ফোয়ারা নির্মিত হয়েছে এবং এ সমস্ত খণ্ডাংশে রঙ বৈচিত্র্যে নানা প্রকারের ফুলের কেয়ারি দ্বারা সজ্জিত করা হয়, যাতে ঋতুভিত্তিক ফুলের সমারোহে এটি সারা বছর জীবন্ত রয়ে শোভা দান করতে পারে। এর ঠিক মাঝখানে বর্গাকার সমাধি দাঁড়িয়ে রয়েছে যার প্রতিপার্শ্ব ৯৯.১০ মি. (৩২৫ ফুট)। এটি একতলা বিশিষ্ট হলেও প্রতিকোণ হতে

অষ্টভুজাকার মিনার পাঁচ ধাপে ভূমি সমতল হতে ৩০.৫০ মি. (১০০ ফুট) পর্যন্ত উঠে গিয়েছে। যখন এটি শ্বেতমর্মরের নির্মিত হয়েছিল তখন সমাধিসৌধের ছাদের কেন্দ্রীয় অংশটুকু খুবই মাধুর্যময় ও সৌষ্ঠবপূর্ণ ছিল। এজন্যই সমাধিসৌধের শৈল্পিক অবয়বকে আরও সৌন্দর্য বিভূষিত বলে মনে হয়েছে। দুঃখের বিষয় এখন এ সুন্দরতম অংশটুকু আর নেই।

এ সমাধিসৌধ নির্মাণে এর অভ্যন্তরভাগে আরো কিছু ধারণ করার মতো প্রশস্ত করার পরিকল্পনা ছিল না বলে মনে হয়। কেননা এর কাঠামো দেখে বুঝা যায় যে শবদেহ রাখার একটা হলঘর না নির্মাণ করে স্মৃতি রক্ষার দেহাবশেষ রাখার বাক্সের অনুরূপ নির্মাণ করা হয়েছে, যার ব্যাস ৭.৯৫ মি. (২৬ ফুট ৫ ইঞ্চি) এবং উচ্চতা ৬.৪০ মি. (২১ ফুট)। এ কবর ফলকটি মার্বেল পাথরে নির্মিত।[৪]

অতএব এর অভ্যন্তরভাগে গঠিত ব্যবস্থাপনায় একটি সংযোগ বা বারান্দা ইমারতের বহির্পার্শ্ব দিয়ে ঠিক চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে অবস্থিত কামরাগুলোর সাথে সংযুক্ত হয়েছে। আবার কতকগুলো প্রতিপার্শ্বের ঠিক মাঝখান হতে শুরু হয়ে একেবারে মধ্যখানের কবর প্রকোষ্ঠে এসে শেষ বা উপনীত হয়েছে। এ ঢেউ ছাদযুক্ত নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ অন্তর্মুখী মার্বেল খচিত সমাধি স্মৃতিফলক কেন্দ্রীয় তলছাদের সাধাবণ রন্ধ্র দিয়ে আলোকিত হওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু এটি আদিতে পরদাযুক্ত ছিল এবং ছত্রী দ্বারা শোভিত ছিল। ইমাবতের চারটি মিনার ছাড়া স্থাপত্যিক দৃষ্টিকোণ হতে মনের ওপর প্রভাব দাগ কাটার মতো তেমন কিছু নেই। জাহাঙ্গীরের সময়ে মোগল ভারতে রঙ দ্বারা সজ্জায়ন বা চিত্রায়নের প্রতি বেশি আকর্ষণ ছিল; এর প্রধান আকর্ষণীয় বিষয় হচ্ছে মুক্তভাবে দেয়াল পৃষ্ঠদেশে বিস্তারিত রঙ দ্বারা সুসজ্জিত করার সফলতা। এরূপ অলঙ্করণ কাজের মধ্য দিয়ে একে সৌষ্ঠবপূর্ণ কবতে বিভিন্ন প্রকার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে যথা-(১) ফ্রেসকো চিত্রায়ন, (২) অন্তর্মুখী খোদাই কাজের মাধ্যমে নকশা স্থাপন এবং (৩) মোজাইক অলঙ্করণ।

সৌধের সৌষ্ঠব বৃদ্ধিতেও কামরার অভ্যন্তরভাগে বিচিত্র রঙ রঞ্জিত রয়েছে। তা ছাড়া ইমারতের বহির্গাত্র এবং মিনারের পার্শ্বগুলো খোদাই ও খঁচিত করে মূল্যবান পাথর স্থাপিত হয়েছে। অভ্যন্তরীণ সংযোগস্থাপক পথের পার্শ্ব দেয়ালের নিম্নাংশে টালি বসানো হয়েছে। অন্যপক্ষে কবর ফলকে শুভ্রমর্মর পাথরের সাথে অতি মূল্যবান পাথর লাগিয়ে মনোজ্ঞ সর্পিল পেঁচানো অলঙ্করণে বিভূষিত করা হয়েছে। মোটের ওপর সৌধের বিস্তৃত ও ব্যাপক প্রশস্ততায় যে শিল্পসত্তার বিকাশ দৃশ্যমান হয়েছে তাকে প্রকৃতিপুঞ্জের প্রতি একটা ভালবাসার মোহ যে সম্রাটের চরিত্রে লুকায়িত ছিল তারই বাস্তব প্রতিচ্ছবি পবিত্র সমাধিতে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এখানে আরো উল্লেখ করা যেতে পারে যে শ্বেতমর্মর নির্মিত ছোট গম্বুজ বা কিউপোলাগুলো মেঝে হতে ২৫.৯০ মি. (৮৫ ফুট) উচ্চতাসম্পন্ন। এটি খিলান সারি দ্বারা পরিবেষ্টিত। কেন্দ্রীয় খিলান পার্শ্ব দিয়ে পথ রচিত হয়েছে এবং আরো পাঁচটি খিলান প্রত্যেক পার্শ্বে বিদ্যমান। এ খিলান সারির পশ্চাতে সর্বমোট ৪০টি প্রকোষ্ঠ রয়েছে।

সুউচ্চ চত্বরে উদ্যান রচনা করে ফুলের বৈচিত্র্যময় শোভা ও উজ্জ্বল রঙ ব্যবহারের মাধ্যমে একে প্রাঞ্জল করে রাখার মানসিকতা তার প্রপিতাসহ বাবরের প্রকৃতির সাথে হুবহু মিলন স্মরণে এনে দেয়। তাদের দু জনার প্রবৃত্তি প্রকৃতিপুঞ্জের স্পন্দন উপলব্ধির একটা মন ছিল।

ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধি :

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে স্থাপত্য অনুশীলন রীতির একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল। মোগলদের প্রাথমিক যুগে যে স্থাপত্য ধারাবাহিকতা লক্ষ করা যায় এখানে তার বিচ্ছেদ ঘটেছিল। শাহজাহানের সময়ে ভিন্ন আঙ্গিকে যে নতুন ধারার আগমন মোগল স্থাপত্যের শ্বেতমর্মরের পল্লবায়ন হয়েছিল তারই সংযোগস্থল এ সময়ে নির্মিত একটি স্থাপত্যকীর্তিতে নিষিক্ত হয়ে রয়েছে। একে আকবর ও শাহজাহানের স্থাপত্য পদ্ধতির সংযোগস্থল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

এ মিশ্র রীতির প্রসবিত ফল হচ্ছে আগ্রার ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধ। এ সমাধিসৌধ ১৬২৬ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের পত্নী নূরজাহান বেগম কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। ইতিমাদ-উদ-দৌলা সম্রাট আকবরের ও জাহাঙ্গীরের রাজদরবারের বিশিষ্ট সভাসদ ও নূরজাহানের পিতা ছিলেন। এ সমাধিসৌধ কেবলমাত্র মোগলদের স্থাপত্যধারা পরিবর্তনের কালান্তর পর্যায় চিহ্নিত করে নি এতে আরো অনেক কিছু স্থাপত্য পদ্ধতির বিবর্তন রূপ পরিস্ফুট হয়ে রয়েছে।

সমাধিটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও মনোজ্ঞ ও সৌন্দর্যের একটি মনোমুগ্ধকর অবদান। এখানে যে স্থাপত্য শিল্প পদ্ধতি ও সৌকর্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে তা অত্যন্ত মসৃণ ও অধিকতর সূক্ষ্মতাপূর্ণ অলঙ্করণে বিভূষিত এবং সমস্ত কিছুর মূলে ছিল একে নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ সৌন্দর্যময়তায় সুসম্পন্ন করার অব্যাহত প্রচেষ্টা। এ সমাধিসৌধটি নিঃসঙ্গতায় একটি আবেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে উদ্যানের মাঝে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এর প্রতিপার্শ্ব ১৬৪.৬০ মি. (৫৪০ ফুট), যা খিলানায়িত বারান্দার ঠিক ছাউনি করা নির্জন মঠের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

ইমারতটি একটি নিরানন্দময় মলিন বিষণ্ন পরিবেশে লাল বেলেপাথরে নির্মিত তোরণ পথের বিপরীতে মূর্তিবৎ যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে। এটি তৎপ্রচলিত নকশা পরিকল্পনায় লন (lawns) বা বাগান প্রাঙ্গণের মধ্যবর্তীস্থানে অবস্থিত যার চিত্ররূপ- সমতল বাগান অংশে ফুলের চাষ, বাঁধানো ও মোড়ানো পায়ে চলা পথ, ক্ষুদ্র পুষ্করিণী বা ডোবা, কৃত্রিম ঝরনা ও কবর এবং এতে যেন প্রশংসনীয় ব্যক্তিকে রত্নের মতোই শ্বেতমর্মরে প্রস্তুত কবর খাঁচায় বা আধারে বিশ্রামার্থে শয়ন করে দেওয়া হয়েছে।

সমাধির ভূমি নকশা বর্গাকার এবং মধ্য দিয়ে এক পাশ হতে আর এক পার্শ্ব ২১.৩৫ মি. (৭০ ফুট)। নকশা পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয়ভাবে একটি কাঠামো এবং তার সাথে প্রশস্ত অষ্টভুজাকার সুউচ্চ বুরুজ মিনারের আকারে প্রতি কোনায় নির্মিত হয়েছে। অন্যপক্ষে ক্ষুদ্র একটি অবকাঠামো বা তলছাদকে অতিক্রম করে উপরে উঠে গিয়েছে। প্রতিপার্শ্বে তিনটি খিলান শোভিত প্রবেশপথ ইমারতে দৃশ্যমান হয়ে অভ্যন্তরের দিকে ঢুকে গিয়েছে। এ ছাড়া আলম্বের উপরে কারনিস এবং প্রশস্ত ছাঁইচের বিস্তীর্ণ অবস্থায় উপরাংশের পার্শ্ব দিয়ে একটা দিগন্তের সঙ্গে সমান্তরাল রেখা সৃষ্টি করেছে যা জোরালোভাবে একটা নিস্তব্ধ ছায়ার আবেশ সৃষ্টি করেছে। এটি সমগ্র সমাধিভবনকে স্নিগ্ধতায় আবৃত করে রেখেছে। এটিই একটা চিরশান্তির অন্তিম নিদ্রার ধারণা প্রদান করছে, যা এ পূর্ণাঙ্গ সমাধিসৌধের বাস্তব কম্পন।

সমাধিসৌধের প্রথম তলা বা নিম্নতলা সারিবদ্ধ কামরা ও ভিতর পথ দ্বারা গঠিত হয়েছে এবং এর সাথেই কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠের চতুর্দিক দিয়ে বারান্দা পরিবেষ্টিত রয়েছে। এসবের মাঝখানে কেন্দ্রীয় কামরার ভিতরে শবাধার স্থাপিত হয়েছে। বর্গাকার সমাধি প্রকোষ্ঠের দেয়ালগুলো প্রকৃতপক্ষে অতি চমৎকার সূক্ষ্ম মার্বেল জালি দ্বারা আবৃত। এতে কারুকার্যের

উৎকৃষ্ট নকশা নমুনায় বাঁধানো দুটি হলুদ বর্ণের অতি কঠিন শিলাখণ্ডের শবাধার অভ্যন্তরে শোভা বৃদ্ধি করেছে।

এ ইমারত এবং এর উদ্যানের আনুষঙ্গিক অংশ ও প্রবেশ তোরণসহ এ জাতীয় স্থাপত্য চিত্রকর্মের মধ্যে এটি একটি নিখুঁত উদাহরণ বলে মনে করা যায়। এ সমাধির সূক্ষ্ম সৌকুমার্য ও অলঙ্করণ কেবল কেন্দ্রীয় কাঠামোকে শ্বেতমর্মরের মনোজ্ঞ সজ্জায়নের মধ্যেই নিহিত নয় বরং এ ভূষণ প্রতিক্ষেত্রে স্থাপত্যরীতির পদমর্যাদার ফলপ্রসূ প্রতিক্রিয়ার প্রতি বিচক্ষণতায় লক্ষ্য রেখে সম্পাদন করা হয়েছে।

রিলিফ প্রণালীতে দেয়াল অলঙ্করণ কাজ খুবই সামান্য। তবে সূক্ষ্ম মসৃণভাবে অন্তর্মুখিতায় পাথর বসিয়ে বর্ণায়ন করা হয়েছে। এ ধরনের পরিচর্যার ফলে বেমানান শ্বেতমর্মরের উজ্জ্বলতা কোমলীকৃত হয়ে অন্তর্মুখী পাথর কাজের সূক্ষ্ম অস্পষ্ট ছোপ ও আভার সাথে মসৃণভাবে দেয়ালপৃষ্ঠের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে চমৎকাবিত্ব সৃষ্টি করেছে। বর্ণায়িত ও রঙ্গানো চিত্রগুলোর মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্রজাপতির পাখার বৈচিত্র্য রঙের মনোহর চিত্রণ। এর অধিকাংশ অলঙ্করণে বিশেষ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে পাথর বসিয়ে সুসম্পন্ন কবা হয়েছে যা প্রচলিত পদ্ধতি হতে ভিন্নতর ও অভিনব (চিত্র নং- ৮০)।

এর ফলে দেখা যায় যে জাহাঙ্গীরের পরবর্তী স্থাপত্য ইমারতগুলোর নির্মাণ কৌশলে কেবলমাত্র পরিবর্তনই আসে নি সাথে সাথে ইমাবত সজ্জায়ন পদ্ধতিরও পরিবর্তন এসেছিল। এ সময় পর্যন্ত অন্তর্মুখী খোদাই করার কাজ যে পদ্ধতিতে চালু হয়েছিল এটি ঔপাস্‌সেক্টাইল[৫] (opussectile) পদ্ধতি নামে পরিচিত। এতে শ্বেতমর্মরের সাথে বিভিন্ন রঙ ছেদিয়ে বসিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু এর পব হতে যে পদ্ধতিতে ইমারত পৃষ্ঠ ও অন্যান্য অংশ সজ্জায়ন করার প্রথা চালু হয়েছিল এটি পেট্রাডুরা[৬] (pietradura) নামে পরিচিত। এটি কঠিন ও দুর্লভ পাথর, যথা- নীলকান্তমণি (lapislazuli), রক্ত কবরী (cornelian), আকিক মণি (onyx), জ্যাস্‌পার মণি (jasper), পোখরাজ ও পুষ্পরাগ মণি (topaz) ইত্যাদি অতীব মূল্যবান প্রস্তরাদি মার্বেল পাথর খোদাই ও আকার অনুসারে কেটে অতি নিখুঁতভাবে বসিয়ে হর্ম্যরাজিকে শোভিত করা হতো। ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধিসৌধে যে পূর্বাহ্নেই শ্বেতমর্মরের কল্পনার আভাস দিয়েছিল তা মহামূল্যবান পাথরের চতুর্দিকে স্বর্ণের পাতে সাজিয়ে চূড়ান্ত এবং অতীব ব্যয়বহুল স্থাপত্যিক সৃষ্টি শাহজাহানের সময়ে সম্ভব হয়ে উঠেছিল।

নূরজাহানের সমাধিসৌধ :

শাহদারায় জাহাঙ্গীরের মাকবারার সাথেই নূরজাহানের সমাধিসৌধ নির্মিত হয়েছে। এটি বর্গাকার এবং বহু স্তম্ভ সংবলিত একটি বিরাট ইমারত। এ সমাধিসৌধ নির্মাণ যে স্থাপত্যরীতি অনুসরণ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণে দেখা যায় যে মোগল স্থাপত্যধারার চেয়ে বিগত সময়ের লোদী স্থাপত্য পদ্ধতির পুনরায় কিছুটা অনুসরণ ঘটেছে। এ নির্মাণ রীতির অনুসরণ ইতঃপূর্বে কল্পীর মাকবারা চৌরাশি গম্বুজে দৃষ্ট হয়েছে। এরও পূর্বে জাহাঙ্গীরের মাতা সিকান্দ্রায় নির্মিত মরিয়ম জামানীর সমাধিসৌধ একই প্রকারের নকশা কল্পনার প্রয়োগ দৃষ্ট হয়েছে।

নূরজাহানের সমাধিসৌধ শাহদারায় জাহাঙ্গীরের কবর ফলকের মতো না করে ভূগর্ভস্থ কক্ষে দেহ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে মাটির স্পর্শ রয়েছে, প্রকৃতির শ্যামল আস্তরণে এটি আবৃত। নূরজাহানের কন্যা লাডলী বেগমের সমাধিও একই সাথে রচিত

হয়েছে। স্থাপত্যিক দৃষ্টিকোণ হতে এ সমাধিসৌধের তেমন কোনো অভিনবত্ব নেই।

খান-ই-খানানের সমাধি :

জাহাঙ্গীরের রাজত্বের শেষভাগে আকবরের নবরত্ন সভার অন্যতম সভাসদ ও জাহাঙ্গীরের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী আব্দুর রহিম-খান-ই-খানানের মৃত্যু হলে তাঁকে দিল্লিস্থ হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়ার মাজারের নিকট সমাধিস্থ করা হয়। স্থাপত্য নির্মাণশৈলীর দৃষ্টিভঙ্গিতে এ কীর্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটি সম্রাট হুমায়ূনের সমাধির অনুকরণে নির্মিত হলেও হুবহু অনুসরণ ছিল না। তখন হতে ৬০ বছর পূর্বে ইরানি আদর্শে নির্মিত হুমায়ূনের সমাধিসৌধের কিছু সজ্জায়ন ও পরিকল্পনার প্রভাব নতুন আঙ্গিকে খান-ই-খানানের সমাধিসৌধে দৃষ্ট হয়।

খান-ই-খানানের সমাধিসৌধে যে প্রযুক্তির উন্নয়ন ঘটেছিল তা একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে উপনীত হতে পেরেছিল। প্রকৃতপক্ষে তাজমহলের নকশা পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে তাজমহলের প্রধান প্রকৌশলী ওস্তাদ মোহাম্মদ ঈশা এ ইমারত হতেও ভূমি নকশার অনুপ্রেরণা গ্রহণ করেছিল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে নির্মিত এ সমাধিসৌধের মর্মর নির্মিত কবর ফলকটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরেজরা ক্ষমতা গ্রহণ করার পর হস্তগত করে পরে এটি নিলামে বিক্রি হলে সফদার জঙ্গ তাঁর সমাধিসৌধে ব্যবহার করে।

আনারকলির সমাধি :

সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১৫ খ্রিস্টাব্দে লাহোরে আনারকলির সমাধিসৌধ নির্মাণ করেন। এ সমাধি নির্মাণের পশ্চাতে জাহাঙ্গীরের হৃদয়মন্দিরে যত বেদনাই অভিসিঞ্চিত হয়ে থাকুন না কেন তা উন্মোচন না করে শুধু স্থাপত্যিক দৃষ্টিকোণ হতে মূল্যায়ন করলে দেখা যায় যে এটি একটি একক গম্বুজ বিশিষ্ট ষড়ভুজাকৃতি বা ছয়কোণী ইমারত। প্রত্যেক কোনায় অষ্টভুজাকার টাওয়ার বা বুরুজ নির্মিত হয়ে শোভাবর্ধন করছে এবং সমস্ত এলাকাটি উন্মুক্ত প্রান্তর ছিল যেখানে ঘন সবুজের লীলাখেলা পরিদৃশ্যমান হত। অবশ্য এখন আর সে নীরবতা নেই, এর পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছে।

জাহাঙ্গীরের অন্যান্য স্থাপত্যকীর্তি :

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে অন্যান্য নির্মাণ কাজ অবলোকনে সে যুগসন্ধিক্ষণের প্রতিরূপ ও ধারাবাহিকতা অনুভব করা যায়। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ স্বরূপ জলন্ধরের সরাইখানার পশ্চিম পার্শ্বে নির্মিত প্রবেশ তোরণের সৌকুমার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি অতীব ক্ষুদ্র হলেও অত্যন্ত আকর্ষণীয় কাঠামোয় তৈরি। এটি কিছুটা বহু মূল্যবান শিল্প কারুকার্যের শোভনতায় ভরপুর। অবশ্য নির্মাতার উদ্দেশ্য ছিল একে শক্তিসম্পন্ন ও উত্তেজনাপূর্ণভাবে নির্মাণ করার চেয়ে চমৎকারিত্বে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রূপদান করার অঙ্গীকার যা সাধিত হয়েছে।

জাহাঙ্গীর শুধুমাত্র চিত্রকলা ও স্থাপত্যকীর্তির অনুশীলনে তাঁর সুকুমারবৃত্তি নিঃশেষ করেন নি। তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের লীলাময় চর্চায়ও ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি অনেক চিত্তাকর্ষক উদ্যান রচনা করেছিলেন। এগুলোর মধ্যে ভূস্বর্গ কাশ্মীরে গড়ে ওঠা উদ্যানগুলো সমধিক প্রসিদ্ধ। উদ্যানগুলো শুধু সে যুগেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে নি বরং এ যুগেও এর চিরন্তনীয় প্রভাব অক্ষুণ্ন রয়েছে। ১৬২৪ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর কাশ্মীরের উপকণ্ঠে নিদাঘ বিশ্রাম ও ভ্রমণের জন্য যে অনিন্দ্য সুন্দর উদ্যান রচনা করেন তা এ জাতীয়কার্যের মধ্যে সর্বোত্তম। কাশ্মীরে রচিত

উদ্যানগুলোর মধ্যে শালিমারবাগ, নিশাতবাগ এবং ভরিনাগ (আচাবল) অন্যতম। এগুলোতে প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির পরিপূরকস্বরূপ প্রয়োজন অনুসারে কৃত্রিম ঝরনা, উচ্চতর বেদি, মোড়ানো পাকা শান বাঁধানো মেঝে নির্মাণ করা হয়েছিল।

উদ্যানগুলো বিভিন্ন রঙবেরঙের পত্রবিশিষ্ট গাছ আয়তাকার ও বর্গাকার নকশায় সজ্জিত। এর সাথে সারিবদ্ধ সাইপ্রেস বৃক্ষ রোপিত হয়ে উদ্যানকে স্নিগ্ধ রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নানা প্রকারের ফুলের গাছ ফোয়ারার ফাঁকে ফাঁকে রোপণ করে উদ্যানকে আরো সমৃদ্ধিশালী করে তুলেছিল। জলের বৃহত্তর নহর নির্মাণ করে তার সাথে কৃত্রিম ঝরনা ও ফোয়ারাগুলোর সংযোগ স্থাপিত হয়েছিল যাতে সারা বছর একইভাবে জলপ্রবাহ অক্ষুণ্ণ রয়ে উদ্যানের সজীবতা সর্বদা একই অবস্থায় থাকতে পারে। বাগানের বর্গাকার ছকের মাঝখানে থাম সংবলিত কৃষ্ণমর্মর প্রস্তরের ছত্রী ও চন্দ্রাতপ স্থাপিত ছিল। এ ধরনের কার্যক্রম তাঁর শৈল্পিকমনের পরিচয় বিধৃত করেছে। উদ্যানের নির্মল পরিবেশ বজায় রাখার প্রয়োজনে উদ্যানের চতুর্দিকে সুউচ্চ আবেষ্টনী প্রাচীর নির্মিত হয়েছিল। কাশ্মীরের উদ্যানগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ উদ্যানটি আয়তন হচ্ছে ৪৮৭.৮৫ মি. (১৬০০ ফুট) x ২১৩.৪০ মি. (৭০০ ফুট)।

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে স্থাপত্যকার্যক্রমের বিকাশ ঘটেছিল যা পরবর্তী মোগল স্থাপত্যে উৎকর্ষ আনয়নের পথ সুগম করে দিয়েছে এবং তাঁর সময়ে যে চিত্রকলার উদাহরণ দৃষ্ট হয়েছে তা পরিপূর্ণ বিকাশময় সত্তায় মূর্ত হয়েছে যার সূচনা সম্রাট আকবরের সময় হয়েছিল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. এ সমাধির ভূমি পরিকল্পনা সম্পর্কে জি. মার্টিন বলেন, "This tomb takes the form of a tiered pyramid, perhaps inspired by earlier Buddhist monasteries"; cf: *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড*, লন্ডন, ২০০০, পৃ. ২৭২।
২. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ১১০।
৩. জে. ফারগুসন, *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এন্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার*, ২য় খণ্ড, লন্ডন, ১৯১০, পৃ. ৩০০।
৪. এ সমাধিফলক সম্পর্কে জি. মার্টিন বলেন, "The marble cenotaph is one of the finest in India with inlaid semi-precious stones set in naturalistic floral designs and calligraphy inscribing"; cf: *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৩।
৫. The inlaid work had been of the kind known as opussectile, a marble intarsia of various coloures.
৬. The art took the form of that called pietra-dura in which hard and rare stones such as lapislazuli, onyx. jasper, topaz, cornelian and the like were embedded in marble in graceful foliations.

বিংশতিতম অধ্যায়
সম্রাট শাহজাহানের স্থাপত্যকীর্তি
(১৬২৭-১৬৫৮ খ্রি.)

মোগল সম্রাট শাহজাহানের সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে মোগল স্থাপত্যেব স্বর্ণযুগ শুরু হয়। শাহজাহান নামটি পৃথিবীর স্থপতিদের নিকট অতি সুপবিচিত। তাঁর স্থাপত্য পরিকল্পনার নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত ভারতের বুকে কেন পৃথিবীর আর কোথাও এত জোরালোভাবে চিরন্তনত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর সময় মোগল স্থাপত্য তথা ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য এর বিকাশ দণ্ডেব শীর্ষবিন্দুতে আরোহণ করতে পেরেছিল। ফারগুসন বলেছেন "সমস্ত স্থাপত্য ইতিহাসের মধ্যে আকবর ও তাঁর পৌত্র শাহজাহানের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের এত অকস্মাৎ পরিবর্তনের মতো ঘটনা নির্দেশ করা দুরূহ ব্যাপার এবং উভয়ের মধ্যে তুলনামূলক সংঘাত এত শক্তিশালী যে প্রথমটি তেজদীপ্ত প্রাণবন্তময় মৌলিকত্বের অধিকারী, অন্যপক্ষে দ্বিতীয়টি নারীসুলভ কমনীয়তায় স্থাপত্যরূপের বহিঃপ্রকাশ প্রত্যক্ষ করা যায়"।[১]

শাহজাহানের স্থাপত্য রুচিবোধ তাঁর পূর্বপুরুষ হতে স্বতন্ত্র ছিল। ঠিক সে কারণে স্থাপত্য নির্মাণ কাজগুলো নতুন আঙ্গিকে ও বৈশিষ্ট্যে মহিমান্বিত হয়ে উঠেছিল। তাঁর সময় আগ্রা ও লাহোর দুর্গ নগরীর সংস্কার সাধন করা হয়েছিল। আকবরের সময় নির্মিত অপেক্ষাকৃত অমসৃণ ইমারতগুলো অপসারণ করে সম্রাট শাহজাহান তদস্থলে মসৃণ ও সুন্দর প্রাসাদ নির্মাণ করেন। স্থাপত্য নির্মাণ কাজে মালমসলা ও উপকরণ পরিবর্তনের সাথে সাথে স্থাপত্যিক পরিচালনা অনুশীলন ধারায় পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করা যায়।

স্থাপত্যকর্মের প্রধান উপকরণ বেলে পাথর হতে মার্বেল পাথরে পরিবর্তিত হওয়ায় স্থাপত্য গঠনগত প্রকৃতি ও নির্মাণ প্রণালীর পরিবর্তন সূচিত হয়। যোধপুর রাজ্যের মার্করানা মার্বেল খনির মার্বেল পাথর অত্যন্ত মসৃণ ও উৎকৃষ্ট তন্তুময় বা আঁশযুক্ত ছিল। ভরাট অথচ সূক্ষ্ম কোমল বুনন গুণের জন্য এ মার্বেল পাথর যে কোনো প্রকার নকশালঙ্কার কেটে অঙ্কিত করার উপযোগী ছিল। ঢালাই বা ছাঁচে কাটা নকশা এতে সুন্দবভাবে ফুটে উঠত যার তুলনা বিরল। এতে দেয়াল পূর্বের চেয়ে ছোট্ট ছোট্ট ঢেউ তুলিয়ে অভিনবভাবে সজ্জায়ন সম্ভবপর হত। মার্বেল পাথরে সমতল ফাঁকা দেয়াল গাত্র বা মেঝেতে অন্তর্মুখী ও সহজাত সৌন্দর্য সৃষ্টি করা সম্ভব যা আর কোনো উপকরণের দ্বারা কার্যকর হয়নি।

শাহজাহানের স্থাপত্য রীতির যে বিশেষত্ব তা মূলত মার্বেল আকারত্ব অর্থাৎ তাঁর নির্ধারিত স্থাপত্যকর্মের সৌন্দর্যময় বৈশিষ্ট্যপ্রাপ্তির জন্য একমাত্র মার্বেলই মনোনীত প্রধান

উপকরণ। স্থাপত্য সজ্জায়নে সুবিধা মতো ছাঁচ অনুযায়ী গঠিত নকশা ব্যবহার করা হত এবং এ সজ্জায়ন কর্মগুলোর অংশত রঙিন মূল্যবান প্রস্তরে অন্তর্মুখী প্যাটার্ন বা আদর্শ নমুনা প্রয়োগে সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও উন্নতি সাধন করা হত। স্থাপত্যধারায় কৌশল পরিবর্তনের ফলে পদ্ধতির বৃহত্তর স্থাপত্যিক উপকরণের পরিবর্তন এসেছিল।

বিশেষভাবে খিলানের আকারত্বের পরিবর্তনের মাঝে এটি লক্ষ করা যায়। খিলান বক্রতায় পূর্বরীতির পরিবর্তে তখন খাঁজকাটায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সাধারণত একটি খিলানে বৃক্ষ পত্রের নয়টি সুচালো ডগার অনুরূপ নকশা শোভা পেত। এর ফলে মার্বেল খিলান সারিতে নকশায়িত খিলানই সে যুগের বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে পরিগণিত হয়েছিল। গম্বুজের যে সাধারণ আকার পূর্বে ছিল তারও পরিবর্তন এসেছিল। তখন ইরানি পদ্ধতির গম্বুজের ব্যবহার শুরু হয়ে যায়, যার বাহ্যিক চেহারা বাল্বের মতো ও স্কন্ধের কাছে সঙ্কোচিত। অবশ্য এটি দেখতে মনোরম আকৃতির। এভাবেই প্রকৃত দ্বিজ গম্বুজের ব্যবহার রীতি স্থাপত্য পদ্ধতিতে আগমন ঘটে। অন্যপক্ষে স্তম্ভ নির্মাণের প্রণালীতেও উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। এটি ক্রমসরু বা সূক্ষ্মাগ্র দণ্ড ও ঢেউ খেলানো আলম্ব শিরোপরি এবং খাঁজকাটা নিচু অংশ বা তল বক্র রেখা দ্বারা বেষ্টিত বা গঠিত নকশা প্রাধান্য পেয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে খিলানের আকারে আরো পরিবর্তন দেখা যায়। খিলানের চতুর্কেন্দ্রিক বক্রগুলো প্রায় সর্বক্ষেত্রে কোঁকড়ানো ও ঢেউ খেলানো। মোগলদের ক্ষমতা যখন চরম শিখরে উপনীত হয়েছিল তখনই তাদের স্থাপত্য শিল্পেব উৎকর্ষতা সম্পর্কে ধারণা তাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের নিরিখে সহজেই গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। তাই শাহজাহানের পক্ষে তাঁর স্থাপত্য কার্যক্রমকে বেলে পাথর হতে মার্বেল পাথরের পরিবর্তন আনতে অসুবিধা হয় নি।

তাঁর পরিবর্তনমূলক পরিকল্পনা সর্বপ্রথম আগ্রা ও লাহোর দুর্গে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এখানে কতকগুলো ইমারত তাঁর রাজত্বের প্রথম দিকে নির্মিত হয়েছিল; অন্যপক্ষে আবার কতকগুলো পরবর্তীকালে স্থাপত্যরীতি ও আদর্শ একটা পরিপক্ব রূপ পরিগ্রহ করতে পেরেছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে আগ্রা দুর্গে মার্বেল মিলনায়তন নির্মাণ করা হয়, যা দিওয়ান-ই-আম হিসেবে পরিচিত। এটি ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে শাহজাহান যে বছর সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন সে বছরই নির্মিত হয়েছিল। অন্যপক্ষে এর দশ বছর পরে দিওয়ান-ই-খাস নির্মিত হয়েছিল। এখানে জোড়া কলাম বা স্তম্ভ ব্যবহার করা হয়েছিল, যা স্বাভাবিক সৌষ্ঠবে অতীব মাধুর্যময় ছিল। তাঁর সময় স্থাপত্য নির্মাণ কাজে চরম উৎকর্ষপূর্ণ অতীব মহিমান্বিত উদাহরণ হচ্ছে মতি মসজিদ যা ১৬৫৪ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত হয়েছিল। এর কিছু দিন বিরতির পর যে সব মার্বেল প্রস্তর প্রাসাদ ও অবকাঠামো নির্মিত হয়েছিল এগুলো হচ্ছে—খাস মহল, শীষ মহল, নাগিনা মসজিদ এবং এগুলোর সাথে নির্মিত হয়েছে সম্মুখ ও পাদদেশস্থ স্তম্ভশ্রেণী ও মনোরম নিচু করে বসানো ঝরনাসহ মুসাম্মাম বুরুজ এবং নওলাখি প্রাসাদ। প্রতিটি স্থাপত্যকর্ম অত্যন্ত মার্জিত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে সুসম্পন্ন করা হয়েছে।

তবে যতগুলো স্থাপত্য নির্মাণ কাজে মার্বেল পাথর ব্যবহৃত হয়েছে তন্মধ্যে সার্থক ও মনোজ্ঞ সৃষ্টি হচ্ছে মতি মসজিদ, যাতে ব্যবহৃত পদ্ধতির চমৎকারিত্বের সাথে আর কোনোটাই তুলনীয় নয়। এতে স্থাপত্যিক প্রণালী নিবিড় ও গভীরভাবে প্রয়োগে আঙ্গিক সংগঠন অত্যন্ত সুঠাম ও শক্তিশালীভাবে সম্পাদিত হয়েছে। এর কাজের প্রধান গুণাবলী হচ্ছে সম্মুখ দেয়ালের খিলানশ্রেণীর মুখপূর্ণ অংশ গঠন সুষমতায়। ক্লোরেস্টরি বারান্দার সমান সমান ব্যবধানে স্থাপিত স্তম্ভশ্রেণীর ও খিলানায়িত প্রবেশ তোরণ নিখুঁতভাবে

সম্পাদনের উদাহরণ দৃষ্ট হয়। এটি সম্মুখ দেয়ালের খিলানশ্রেণীর সাথে তুলনামূলক বৈসাদৃশ্য সৃষ্টি করেছে। উন্নত বপ্রের উপর দিয়ে ছত্রীর নারীসুলভ কমনীয় আকার ও রোমাঞ্চকর অবস্থান আরো সৌন্দর্যময় হয়ে উঠেছে। কেন্দ্রীয় গম্বুজ পিপার সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিচরণ; সর্বোপরি নিখুঁত প্রকৃতির দ্রব্য সামগ্রীর সংবলিত প্রয়োগই এ ইমারতের বাহ্যিক অবয়বে বিরল এক গতিদায়ক সৌন্দর্য সৃষ্টি করছে। অঙ্গ সজ্জায়নের মাঝে মধ্যে ভাস্কর্যাদির প্রভাব থাকলেও প্রায় সর্বক্ষেত্রে আবরণহীন শুভ্র মর্মরতন্ত্র হর্ম্যের রূপে প্রতিভাসিত হয়েছে এবং খোদাই কাজের স্থান পেট্রাডুরা পদ্ধতি অধিকার করে নিয়েছিল।

শাহজাহান যেমন আগ্রা দুর্গে প্রাসাদ শ্রেণীর রদবদলের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন অনুরূপ পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা লাহোর দুর্গেও দৃষ্ট হয়। এখানে আকবরের সময়ের বেশ কয়েকটি প্রাসাদ ভেঙে অপসারণ করে শাহজাহানের শ্বেতমর্মরের প্রাসাদ নির্মাণ পরিকল্পনার জন্য স্থান করে দিতে হয়েছিল। অপসারিত প্রাসাদ শ্রেণীর স্থলে যে ইমারতগুলো নির্মিত হয় এগুলো আবেষ্টনী প্রাচীরের উত্তরাংশের সমতল স্থানের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়েছিল। এগুলো হচ্ছে—দিওয়ান-ই-আম বা সাধারণ দরবার গৃহ, খোয়াবগাহ বা স্বপ্ন মহল, শীষ মহল বা আর্শি মহল, নওলাখি বা নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে তৈরি মহল এবং মুসাম্মাম বুরুজ। এসব প্রকল্প নির্মিত হওয়ার পর পুনরায় পরবর্তী সময়ে সম্প্রসারিত ও সংস্কারপ্রাপ্ত হয়েছিল।

আকবরের জীবিত কালেই বেলে পাথরের নির্মিত দুর্গ প্রাকারের মাঝে মার্বেল প্রাসাদ নির্মাণের মূল পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল। তবে প্রাথমিক পর্যায়ে সামান্য কিছু মার্বেল প্রকল্প বাস্তবায়ন শুরু হলেও সম্রাট শাহজাহানের সময় এটি পরিকল্পনা অনুসারে প্রাচুর্যময় হর্ম্যরাজির নির্মাণ কাজ বৈশিষ্ট্যপূর্ণভাবে শুরু হয়েছিল। শাহজাহানের স্থাপত্য কার্যক্রম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে তিনি তাঁর পিতা বা প্রপিতামহের স্থাপত্য আদর্শ অনুসরণ না করে স্বীয় মনীষা প্রয়োগে নতুন আদর্শ প্রবর্তন করেন।

শাহজাহানাবাদ নগর :

ভারতের রাজধানী দিল্লি নামে পরিচিত হলেও মূলতঃ দিল্লিতে এর অবস্থান না হয়ে দিল্লির আশেপাশে ভারতের রাজধানীর অবস্থান লক্ষ করা যায়। এমনকি আকবরের সময় ভারতের রাজধানী বহু বছর ধরে ফতেপুর সিক্রিতে অবস্থিত ছিল। এভাবে বিভিন্ন স্থানে রাজধানীর মূল কার্যালয় অবস্থানের পর শাহজাহান ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে রাজ্যের রাজধানী আগ্রা হতে দিল্লিতে স্থানান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এর ফলে শাহজাহানাবাদ নগর নির্মাণের সূত্রপাত ঘটে। যমুনা নদীর ডান পার্শ্বে দিল্লি নগরীর চৌহদ্দির মধ্যেই শাহজাহানাবাদ নগর নির্মাণ কাজ শুরু হয়।

এ প্রকল্পের প্রধান প্রণিধানের বিষয় ছিল যে পূর্বের যে কোনো প্রাসাদ দুর্গের চেয়ে বিস্তৃত ও সম্প্রসারিতভাবে রাজপরিবারের সুন্দর বাসস্থানের বন্দোবস্ত করা। সে লক্ষ্যে দিল্লির প্রাসাদ দুর্গের বিশাল ও মজবুত গৃহ বা ইমারত নিপুণ স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যে সুসম্পন্ন করা হয়েছিল। অন্যপক্ষে বলা যেতে পারে যে এটি শুধু সর্ববৃহৎ প্রাসাদ দুর্গ নয় সর্বশেষ সুন্দরতম মনোজ্ঞ স্থাপত্যকর্ম যা ভারতে মুসলিম আধিপত্যের চরম ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার বিরল দৃষ্টান্ত হিসেবে পরিগণিত হয়ে রয়েছে।

স্থাপত্য কৌশলগত মানের দিক হতে বিচার করে বলা চলে বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে স্থাপত্য নির্মাণের প্রযুক্তিগত অভিজ্ঞতা ও বৈশিষ্ট্যের যে উন্নয়ন অর্জিত হয়েছিল তারই পরিপূর্ণ বিকাশ শাহজাহানের সময়েই সাধিত হয়। অন্যপক্ষে শাহজাহানের সময়ে স্থাপত্য

কর্মের যে উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয় তা ছিল একক মনের কল্পনা। তাঁর প্রায় সব স্থাপত্য পরিকল্পনা একক ব্যক্তিত্বের নির্দেশ ও অভিরুচি অনুসারে বাস্তবায়িত হয়েছিল। এর ফলে নিয়মাবদ্ধ এককরূপত্ব ও বিভিন্ন অংশের মধ্যে সঙ্গতি বিবেচনা করে স্থাপত্যকর্মগুলো সুন্দর ও সুশৃঙ্খলভাবে রূপায়িত হতে পেরেছিল।

ঐতিহাসিকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে, সম্রাট শাহজাহান গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যকর্মগুলোর নকশা পরিকল্পনা নিজে গ্রহণ করতেন এবং নিজ তত্ত্বাবধানে নির্মাণ কাজের তদারকিসহ এব অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ করতেন।[২] তবে দুঃখের সাথে বলতে হয় যে, তাঁব অনেক মহার্ঘ ও জাঁকালো স্থাপত্যকর্ম পরবর্তীকালে ভেঙে ফেলা হয়েছে এবং সুন্দর স্থাপত্য অংশ বিদেশী রাজশক্তি লুণ্ঠন করে নিয়ে গেছে। তবুও যেসব অমর স্থাপত্য ইমারত টিকে রয়েছে তা থেকেই তাঁর স্থাপত্য পরিকল্পনা আদিতে কেমন ঐশ্বর্যমণ্ডিত ছিল সে সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধাবণা পাওয়া যায়। ব্রিটিশ রাজশক্তিব ১৯২ বছর বাজত্বকালে ইংরেজ শাসকগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা বলে সরকারি সমর্থিত পথে পূর্ববর্তী শাসকদের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো হস্তগত কবেই ক্ষান্ত হয নি, বরং ব্যক্তিগতভাবে নিজস্ব প্রয়োজনে মূল্যবান স্থাপত্য উপকরণ লুণ্ঠন কবে নিয়ে গিয়েছে যার কোনো সরকাবি হিসাব রক্ষিত হয় নি।

প্রাসাদ দুর্গ দিল্লি :

মি. ফারগুসন দিল্লির দুর্গ নগরী সম্পর্কে মন্তব্য কবেছেন "যদিও আগ্রার প্রাসাদ দুর্গ দিল্লির প্রাসাদ দুর্গ হতে অপেক্ষাকৃত চিত্রোপম ও ঐতিহাসিক কারণে আকর্ষণ যুগিয়েছে তথাপি শেষোক্তটির নির্মাণ সুসংঘবদ্ধ পরিকল্পনায় সংযত দায়িত্ব নিখুঁতভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে"।[৩] শাহজাহান তাঁর নতুন শহর শাহজাহানাবাদ নির্মাণেব পূর্বেই আগ্রা, লাহোর এবং এ প্রাসাদ দুর্গের সম্প্রসারণ এবং নতুন হর্ম্যগুলোর নির্মাণ কাজ সমাপ্ত কবতে সক্ষম হয়েছিলেন। আগ্রায় নির্মিত হর্ম্যরাজির সৌম্য ও প্রশান্তিময় মুবতিব জৌলুস দিল্লিকে নিষ্প্রভ করে দিয়েছে সত্যি, তা সত্ত্বেও দিল্লি প্রাসাদ দুর্গেব সামান্য কিছু ভুলভ্রান্তি সংবলিত নিদর্শনগুলো বাদ দিলে একে এশিয়া এবং সম্ভবত বিশ্বের অদ্বিতীয় চমৎকারিত্বপূর্ণ জাঁকালো প্রাসাদরূপে গণ্য করা যায়।

এর নকশা পরিকল্পনার মাঝে অনুপম স্থাপত্য আদর্শ প্রতিভাসিত হয়ে উঠেছে যা কেবলমাত্র একটা পরিপূর্ণ স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রাসাদ দুর্গে লক্ষ করা যায়। আগ্রার প্রাসাদ দুর্গের অনুরূপই যমুনা নদীব ডান তীর ঘেঁষে এটি নির্মিত হয়েছে। এটি প্রায় আয়তাকার ও কোণগুলো ঈষৎ কাটা। তোরণ বাদ দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে ৪৮৭.৭০ মি. (১৬০০ ফুট) ও উত্তর-দক্ষিণে ৯৪৪.৯০ মি. (৩১০০ ফুট)। প্রাসাদ দুর্গটি উত্তর-দক্ষিণে সারিবদ্ধভাবে নির্মিত পূর্ব দিকে মুখ করে নকশা পরিকল্পনা করতে গিয়ে অসুবিধা হলেও মসজিদের অবস্থানের সাথে প্রতিসম বা সামঞ্জস্য কবতে গিয়ে সমস্ত পরিকল্পনার অপূর্ণতা রয়ে যায়, যে অপূর্ণতা বা ত্রুটি সম্রাট আকবরের কিছু সময়কালীন রাজধানী ফতেপুর সিক্রিতেও দৃষ্ট হয়েছিল।

দিল্লির এ প্রাসাদ দুর্গ সুষম সামন্তরিক ক্ষেত্র হিসেবে ভূমি নকশার বাস্তবায়ন লক্ষ করা যায়। এটি সুউচ্চ শক্তিশালী সুরক্ষিত লাল বেলে প্রস্তরের আবেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে নির্মিত হয়েছে। এর দুটি প্রবেশ পথ বা তোরণ, যার একটি তোরণ পশ্চিমের দিকে এবং অপরটি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। এ আবেষ্টনী প্রাচীবের চতুর্দিকেই মাঝে মাঝে ছত্রী সংযুক্ত ও ছোট ছোট টাওয়ার বা বুরুজ সংস্থাপিত হয়েছে।

পশ্চিম পার্শ্বের প্রবেশ তোরণটিই প্রধান বা সদর তোরণ। এটিই পর্বাদি পালন সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিক সমারোহ উদ্‌যাপনেব দরজা। দক্ষিণ দিকের তোরণটি ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। এ দুটি তোরণ হতে দুটি রাস্তা দুর্গের একবারে অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছে এবং ৯০০ ডিগ্রি সমকোণে একটি আর একটিকে দুর্গেব কেন্দ্রস্থলে ছেদ করেছে (ভূমি নকশা নং- ৫৪)।
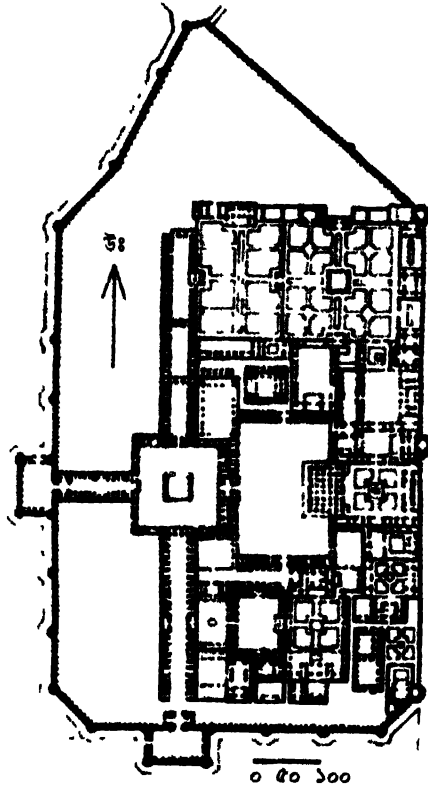
ভূমি নকশা নং-৫৪ : শাহজাহানাবাদ দুর্গ নগরী

প্রধান প্রবেশপথ পশ্চিম দিক হতে আগত; এটি লাহোর গেট বা প্রবেশ তোরণ। এটি প্রশস্ত ঢেউ খেলানো খিলানশ্রেণী দ্বারা গঠিত ও চাঁদনি চকের দিকে মুখ করে বয়েছে। এ চাঁদনি চক একটি সুপ্রশস্ত রাজপথ যা প্রায় ১.৬০ কি.মি. লম্বা। এর দুপার্শ্বে দুসারি সবুজ পত্র শোভিত বৃক্ষ রোপিত হয়েছে। লাহোর তোরণে খিলান কুলঙ্গিযুক্ত এবং অট্টালিকাদির চতুষ্পার্শ্বস্থ পরিবেষ্টিত খোলা জায়গা অত্যন্ত চিত্তাকর্ষকও বটে।

এ দুটি তোরণ হতে রাস্তাদ্বয় অভ্যন্তরের আয়তাকার প্রাঙ্গণের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়েছে। এ অংশটুকু সমস্ত পরিসরের দুই-তৃতীয়াংশ এবং এ এলাকার চতুর্দিকে আবার প্রাচীর পরিবেষ্টিত। এর অর্থ হচ্ছে আবেষ্টনী প্রাচীর আবার আবেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যে অবস্থান করছে। ভিতরের এ জায়গাটি ৪৮৭.৭০ মি. (১৬০০ ফুট) দীর্ঘ ও ৩৫০.৫৫ মি. (১১৫০

ফুট) প্রস্থ; অন্যপক্ষে পূর্ব দিকের আত্মরক্ষার্থে নির্মিত গড়ের সমতল ঢিবিতে সারিবদ্ধ প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করা হয়েছে যেখান হতে প্রশস্ত নদীবক্ষ দেখা যায়। এ প্রকোষ্ঠগুলো নিজস্ব ব্যক্তিগত প্রয়োজনে রাজপরিবারের সদস্যদের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ছিল। এর বাইরে ঐ আয়তাকার এলাকার মধ্যে অন্য সব প্রকোষ্ঠগুলো কর্তব্যরত রাজকর্মচারীদের ও সেনাদের আবাসিক এলাকা হিসেবে ব্যবহৃত হত। তা ছাড়াও এগুলোর কিছু কিছু কামরা রকমারি কাজের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

প্রথম উল্লিখিত আবেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে রাজপ্রাসাদ, বুরুজ ইত্যাদি অবস্থিত। এখানেই সবচেয়ে সুন্দর ও মনোজ্ঞ স্থাপত্য ইমারতগুলোর অবস্থান। এ অংশটুকুর নকশা পরিকল্পনা একান্ত প্রাসাদতুল্য আদর্শে গৃহীত ও রূপায়িত হয়েছিল বলে মনে করা যায়।

ভিতরের আবেষ্টনী প্রাচীরের অভ্যন্তরে মূল প্রাসাদ, এ প্রাসাদ আবেষ্টনী প্রাচীরের এলাকা প্রায় চারটি প্রতিসম বা সামঞ্জস্য ভাগে বিভক্ত; যথা- বৃহৎ কেন্দ্রীয় চতুষ্কোনায় সমতল ক্ষেত্রে দিওয়ান-ই-আম বা জনসাধারণের মিলনায়তন; এর প্রতি পার্শ্বে দুসমচতুর্ভুজ উন্মুক্ত জায়গা এবং অলঙ্কৃত উদ্যান তার সাথে চত্বর। অন্যপক্ষে পরিকল্পিত সারিবদ্ধ মার্বেল প্রাসাদগুলো এক পার্শ্বে উদ্যানের দিকে মুখ করে রয়েছে আবার অন্য পার্শ্বে নদীর দিকে দৃষ্টি প্রসারিত করে এর দৃশ্য অবলোকন করা যায়। এরূপ স্থাপত্যকর্মগুলোর আকৃতি ও চেহারা নিয়মমাফিক মৌলিকতাপূর্ণ ও স্বাভাবিক ধারাবাহিকতা অনুযায়ী নির্মিত। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বর্গাকারভাবে পরিকল্পিত হয়েছে এবং সমস্ত নকশা প্রকল্পে কদাপি তির্যক বক্র রেখায় বা সাধারণ বক্রতায় নির্মাণের পরিকল্পনা দৃষ্ট হয় না।

প্রাসাদের পূর্ব দিকের দেয়াল অবাধে প্রচুর পরিমাণে সুন্দরতম ও মনোজ্ঞ চিত্রায়নের পরম্পরানুসারে ও ধারাবাহিকভাবে সমাপ্ত করা হয়েছে। এর পূর্বে আর কোনো প্রাসাদ সারি এত অধিক উজ্জ্বল ও দীপ্তিশীলভাবে সজ্জিত হয়নি।

আদি নকশা অনুসারে বুঝা যায় যে কমপক্ষে ঐ সব মার্বেল কাঠামোর ৬টি অনিয়মিত ব্যবধানে কেল্লা ঢিবির উচ্চতাকে ছাড়িয়ে অবস্থান করছে। এদের ঝুলন্ত বারান্দা বা ব্যালকনিগুলোর অভিক্ষিপ্ত বাতায়ন এবং উজ্জ্বল বুরুজযুক্ত চূড়া দুর্গের বাইরের দিকের চেহারাকে চিত্রবৎ ও রোমান্টিক দৃশ্যময় করে তুলেছিল।

এর বাইরের দিকে চন্দ্রাতপ বা প্যাভিলিয়নগুলো বদ্ধ। তবে জানালা বা অনুরূপ উন্মুক্ত স্থানে পরদার ব্যবস্থা ছিল। এদের স্তম্ভায়িত সম্মুখভাগ ও অভ্যন্তরীণ ফাসাদ অধিক স্থাপত্যিক গুণাগুণ জাঁকজমকপূর্ণ সাড়ম্বরশালী ও মর্যাদাপূর্ণ করা হয়েছিল। এখন হতে দুর্গ প্রাকারের মধ্যে অবস্থিত উদ্যানের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার ব্যবস্থা ছিল। এসব ইমারতের মধ্যে রাজপ্রাসাদ ছাড়াও একান্ত গোপনীয় বিষয় শ্রবণার্থে মিলনায়তন এবং সকল ব্যবস্থাসহ বিলাসপূর্ণ হাম্মাম খানার অবস্থান লক্ষ করা যায়। এ কাঠামোগুলোর প্রতি দুটির মাঝখানে প্রশস্ত অঙ্গন রাখা হয়েছিল। দুর্গের পার্শ্ব চত্বরগুলোর নিরাপত্তা বিধানের জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা হিসেবে মনোজ্ঞ সচ্ছিদ্র পরদা সংযুক্ত ছিল।

এ স্থাপত্যকর্মগুলো বিস্তীর্ণ ও উন্মুক্ত বৈশিষ্ট্য আলোচনায় একটা সাধারণ সূত্র খুঁজে পাওয়া যায়; পক্ষান্তরে আবার এগুলোর একটা বৃহত্তর পদ্ধতিগত ঐক্যের পরিচয় বিধৃত হয়ে রয়েছে। প্রতিটি কাঠামো একতলাবিশিষ্ট উন্মুক্ত মণ্ডপ বা প্যাভিলিয়ন আকারে নির্মিত হয়েছে। এর সম্মুখ দেয়াল ঝালর বা অলঙ্কারযুক্ত খিলান ও প্রশস্ত ছাঁইচ বাইরের দিকে সংযুক্ত হয়েছে এবং উপরের দিকে উন্নত বপ্র নির্মিত হয়েছে। প্রত্যেক কোণে মনোজ্ঞ ছত্রী

শোভাবর্ধন করে আছে। অন্যপক্ষে অভ্যন্তরভাগেও অনুরূপ ঝালর বা অলঙ্কারযুক্ত খিলান সারি নির্মিত হয়ে পরস্পর খিলান সারিকে ছেদ করে সম্পূর্ণ এলাকাকে বর্গাকার অথবা আয়তাকার 'বে'-তে বিভক্ত করেছে।

প্রতিটি 'বে' আবার সাইমারেক্‌টা (cyma-recta) পদ্ধতির নকশা অলঙ্করণে কারনিস পরিপূর্ণ করে আবার একই নকশায় এগুলোর ছাদতল সুন্দরভাবে সজ্জিত। এখানে কোনো স্তম্ভের ব্যবহার হয় নি এবং তদস্থলে ভারী মোটাসোটা বর্গাকার অথবা দ্বাদশভুজাকার থাম ব্যবহৃত হয়েছে। বলা বাহুল্য মোটা থামের কারণে খিলানের তলদেশ খুবই প্রশস্ত হয়েছে। স্থাপত্যিক অলঙ্করণ করার পক্ষে এ প্রশস্ত খিলান-তল খুবই সুবিধাজনক হওয়ায় এটি অলক্ষে প্রভাব বিস্তার করেছিল। এ প্রভাবের কারণে এগুলোর প্রতি যে কোনো কোণ হতে দৃষ্টিপাত করা হোক না কেন এটি দ্বিগুণ, চারগুণে অথবা আরো বহু গুণে খিলান তলদেশের বাহ্যিক সীমারেখা দৃষ্টি গোচর হত।

এতে অভ্যন্তরভাগে বহুভুজাকার খিলান বক্রাকারের ঢেউ প্রবাহ এবং এগুলোর কুণ্ডল আবর্ত পরিশেষে এক রেখায় বহুগুলো অর্ধচন্দ্র আকারে আঁকা ছবির মতো দেখা যেত। এতে নমনীয় ও মনোরম প্রাচুর্যতায় বিলাসপূর্ণভাবে কাঠামো গঠনের অভিব্যক্তিময় প্রকাশ ঘটেছে। এ ছাড়াও ইমারতের সর্বাংশ সমানভাবে নকশালঙ্কার, গিল্টি ও বিভিন্ন প্রকারের রঙের কাজ ও অন্তর্মুখী কারুকার্যের নমুনায় তরঙ্গায়িত আঁকাবাঁকা কুণ্ডলী সজ্জায়নে প্রয়োগ করা হয়েছে। অন্যপক্ষে এর সাথে সর্পিল রেখায় বৈশিষ্ট্যময় অভিব্যক্তি সূচক প্রকাশভঙ্গিতে ইন্দ্রিয় পরায়ণতাপূর্ণ পরিবেশে যোগ হয়েছে যা ঐ ইমারতের প্রকৃতির সাথে স্পষ্টভাবে সঙ্গতিপূর্ণ। বৃক্ষাদির পত্রোদগম নকশা অঙ্কনে দেয়ালপৃষ্ঠ, থাম ও খিলানের অংশবিশেষ পরিপূর্ণরূপে সজ্জিত।

ইমারত উপাঙ্গে বিভিন্ন ফুলের নকশা নিঃসঙ্কোচে অঙ্কন করা ছাড়াও গোলাপ, পপি, লিলি অথবা অনুরূপ ফুলেব নকশা গাম্ভীর্যতার সঙ্গে ইমারতের অঙ্গে শোভিত। মোগল বাদশাগণ ফুলের প্রতি অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন এবং তাদের বাগানে যথেষ্ট তাজা গোলাপের প্রাচুর্য ছিল। প্রাসাদের বাইরে প্রাকৃতিক নিয়মে ফুলের ডালও ভরপুর ছিল; কিন্তু চোখের সামনে সব সময় ফুল দেখার নিমিত্তে বিকল্প হিসেবে ইমারত অঙ্গে ফুলের চিত্র অঙ্কিত করে রাখত।

রঙমহল :

এ অবকাঠামোর মধ্যে রঙমহল বা প্রমোদশালা ইমারতটি মাত্রাতিরিক্তভাবে অলঙ্কৃত ও সজ্জিত। এটিই শাহজহানের স্থাপত্য ঐতিহ্যের শিরোভূষণ ও তাঁর স্থাপত্য শিল্পায়নে উৎকৃষ্ট ঐশ্বর্য বলা চলে। ফলত এর প্রাচুর্যময় চমৎকার সৌন্দর্যময় মুরতি সমসাময়িক গীতিকারবৃন্দ তাঁদের মানসিক অভিব্যক্তি অত্যন্ত জোরালো ভাষায় আবেগ ও উচ্ছ্বাসের সাথে প্রকাশ করে গেছেন তা কতকটা এরূপ যে এর চাকচিক্য, উজ্জ্বল্য, দ্যুতি, যশ ও বর্ণ বেহেশতের প্রাসাদ ও দালানকোঠা হতে উজ্জ্বল চমৎকার ও ঐশ্বর্যময়।

রঙমহল আয়তাকার ভূমি নকশায় নির্মিত। এর দৈর্ঘ্য ৪৬.৬৫ মি. (১৫৩ ফুট) এবং প্রস্থ ২১.০৫ মি. (৬৯ ফুট)। এর কেন্দ্রস্থলে একটি হলঘর বা মিলনায়তন এবং ছোট প্রকোষ্ঠগুলো কাঠামোর দু প্রান্তে অবস্থিত। এ কেন্দ্রীয় মিলনায়তনটি ১৫ টি 'বে'-তে বিভক্ত। এর প্রতিটি 'বে' অলঙ্কৃত থামযুক্ত হয়ে ৬.১০ মি. (২০ ফুট) বর্গাকার আকার ধারণ করেছে। এভাবে স্থাপত্য গঠন পরিকল্পনার ফলে স্বাভাবিকভাবে অবকাঠামো অবস্থানের সাথে অন্য অংশগুলোর প্রশংসনীয় ও সুবিধাজনক সামঞ্জস্য সৃষ্টি করেছে।

আদিতে এর বহিস্থ খিলানগুলো সচ্ছিদ্র জালিকাটা মার্বেল পরদা দ্বারা আবৃত ছিল বলে মনে হয় এবং একত্রে যুক্ত তিন খিলানবিশিষ্ট কাঠামোগুলোকে জাফরির কাজে সুন্দরভাবে সজ্জিত হয়ে প্রতি পার্শ্বের কেন্দ্র অতিক্রম করে সংস্থাপিত হয়েছে। এ জাফরী সংযুক্ত করার পিছনে যে পারিবারিক নিজস্ব গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়াস ছিল তা সফল হয়েছিল বলে মনে হয়; কারণ জাফরির মধ্য দিয়ে বাইরে দৃষ্টিপাত করলে দেখা গেলেও বাইর হতে ভিতরে কিছুই দেখা যায় না।

দিওয়ান-ই-খাস :

এ ইমারতটি অত্যন্ত স্নিগ্ধময় নকশা পরিকল্পনায় নির্মিত। এর পরিকল্পনায় দেখা যায় যে এটি অন্য ইমারতগুলোর তুলনায় কিছুটা খোলামেলা আকারে নির্মিত হয়েছে। এর একটি বৃহৎ মিলনায়তন দৈর্ঘ্যে ২৭.৪৫ মি. (৯০ ফুট) ও প্রস্থে ২০.৪৫ মি. (৬৭ ফুট)। এর সম্মুখে দেয়াল পাঁচটি সমান মাপের বহুভুজাকার খিলান দ্বারা গঠিত।হ্রাস পার্শ্বে ঈষৎ পরিবর্তিত আকারের খিলান নিপুণ ও চাতুর্যতার সাথে প্রয়োগ করা হয়েছে। এর কোনো অংশে আবেষ্টনী প্রাচীর না থাকায় শীতল বাতাস বাইরে হতে সরাসরি ভিতরে প্রবেশ করত। ইমারতটির অভ্যন্তরভাগ ১৫টি প্রশস্ত 'বে'-তে বিভক্ত করা হয়েছিল। 'বে'-গুলোতে বর্গাকার থাম নির্মাণ করে তাতে অলঙ্কৃত খিলানে সুশোভিত করা হয়েছে। অন্যপক্ষে কেল্লার পূর্ব পার্শ্বের অংশে খিলানায়িত খোলা জানালায় সজ্জিত ছিল। আবার এ জানালাগুলো মনোজ্ঞ সচ্ছিদ্র জাফরির উপর স্রোতের ন্যায় নকশালঙ্কারে বিচিত্রভাবে সজ্জিত ছিল (চিত্র নং- ৮১)।

এর মসৃণ মার্বেল মোড়ানো মেঝেগুলো এতই উজ্জ্বল যে এতে অবস্থিত ভারী মোটা থামগুলো ঐশ্বর্যময় অন্তর্মুখী ফুলেল অলঙ্করণ আর্শির মতোই মেঝেতে প্রতিফলন ঘটাত। লতা-পাতার কাজে শোভিত খিলানগুলো স্বর্ণ ও বিভিন্ন বর্ণের রঙ ধারণ করে এর শোভা বৃদ্ধি করেছে। মোটের ওপর হর্ম্যের অভ্যন্তরভাগের বিভিন্ন অংশে স্থাপত্য ও তন্তুর বা নির্মাণ উপকরণের বয়ন বিন্যাস বা প্রণালী কোমল নরম ও রসালো আবেগময় রোমান্সে একে আলোড়িত করে তুলেছিল। দিওয়ান-ই-খাসের কিছু কিছু দৃশ্যপট এতই প্রাচুর্যপূর্ণ ও হৃদয় উদ্বেলোক যে একে বাহ্যিক মনোজ্ঞ অবয়বের রঙমহলের প্রতিদ্বন্দ্বী বলে মনে করা যায়। তা ছাড়া একে মানুষের অনুভূতি প্রবণতার ওপর প্রভাব বিস্তারের জন্য যে কাব্যিক ছন্দটি যোগ করে দেওয়া হয়েছিল এটি একে অমরত্ব দান করেছে।

সম্রাটের এ ব্যক্তিগত মিলনায়তনের ছাদের নিকটবর্তী স্থানকে প্রদক্ষিণ করে যে বিখ্যাত উৎকীর্ণ লিপিমালা বিদ্যমান তা তৎকালের রাজ ভাষা ফারসিতে এভাবেই রয়েছে।

"আগার ফেরদৌস বারি যামিনাস্ত
ও হাসিনাস্ত, নামিনাস্ত, ও হাসিনাস্ত"।

এর অর্থ হচ্ছে- 'পৃথিবীতে যদি কোথাও স্বর্গ থেকে থাকে, তা এখানে, এখানে, তা এখানে'।

সম্রাট শাহজাহান এ ধরা পৃষ্ঠ হতে বিদায় নিয়েছেন, তাঁর রাজত্ব হারিয়ে গিয়েছে যথাসময়ে; কিন্তু অমর পঙ্ক্তি দুটি হারিয়ে যায় নি। এটি আজো স্মৃতির তর্পণে জাগিয়ে ওঠে। মনের অগোচরে বহু অতীতকে সামনে এনে দেয়।

জল সরবরাহ ব্যবস্থা :

এ দুর্গ কাঠামোর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে জল সরবরাহের মনোরম বা আরামপ্রদ ব্যবস্থা। প্রাসাদ অংশের নকশা পরিকল্পনার অন্যতম উপাদান এর সার্বক্ষণিক সমগ্র দুর্গ এলাকার মধ্যে পানি সরবরাহ পদ্ধতিকে বাধাহীনভাবে চালু রাখা। এ জন্য 'নহর-ই-বেহেস্ত' নামক উৎস হতে নল বা নালার সাহায্যে পানি জল-কপাটে নিয়ন্ত্রিত হয়ে উত্তর-পূর্ব কোনায় শাহ-বুরুজ বা রাজার-টাওয়ারের নিচে সংরক্ষিত হত। এখানে অবিরত ধারায় পানি ব্যবস্থার সাথে উদ্যানের অলঙ্কৃত ফোয়ারা সংযুক্ত করা হয়েছিল। একে সুন্দরতম করতে জলপ্রপাতের ন্যায় প্রসারিত করে পরে ঝালরগুচ্ছ দ্বারা সাজানো হয়েছে। কৃত্রিম জলপ্রপাত ও জলের ফোয়ারা মিলিতভাবে যে দৃশ্যপট সৃষ্টি হয়েছে তা অতীব মনোরম ও আকর্ষণীয়। পানির প্রবাহ অবশেষে সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সংবলিত রাজপ্রাসাদ সংলগ্ন হাম্মাম বা স্নানাগারের সাথে সংযুক্ত হয়েছে।

এ জল সরবরাহ ব্যবস্থার আর একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল যে পানি সরবরাহ ভূ-গর্ভস্থ প্রণালী দ্বারা রাজকীয় প্রকোষ্ঠের মার্বেল বাঁধাই করা বা মোড়ানো অংশের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করানো এবং এভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছিল যে যাতে প্রাসাদের প্রতি অংশে জল প্রাসাদ হতে অনায়াসে পানি পৌছতে পারে। উত্তর ভারতে পানি প্রবাহ ব্যবস্থায় সাধারণত ভূগর্ভ হতে জল সেচ প্রক্রিয়ায় পানি সঞ্চয় করে সঞ্চিত আধার হতে সর্বত্র সরবরাহ করা হয়। এ দেশে অনাদিকাল হতে কৃষিকার্যে পানি সরবরাহের এ শিল্পরীতি প্রক্রিয়ায় গড়ে উঠেছিল এবং এ রীতি অনুসারে দুর্গের অভ্যন্তরে জল সরবরাহ ব্যবস্থা বাস্তবায়িত ছিল। এ প্রযুক্তির সাথে যোগ হয়েছিল স্থাপত্য নির্মাণ কৌশলেব পবিকল্পনা। এটি যেমন চমৎকার তেমনি ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

কিছু ঝরনা রঙমহলে স্থাপিত হয়েছিল। চতুষ্পার্শ্বের স্থাপত্যকে পূর্ণাঙ্গতার দিকে দৃষ্টি বেখে ঝরনাগুলোকে মনোজ্ঞ অলঙ্করণে সুসম্পন্ন করা হয়েছিল। মূলত এটি একটি অগভীর মার্বেলের তৈরি নিচু গামলা বা বেসিন (basın sunk) বাঁধানো স্থলের মধ্যবর্তী জায়গায় অবস্থিত এবং এটি একটি ৬.১০ মি. (২০ ফুট) বর্গাকার পার্শ্বযুক্ত বারান্দার মধ্যে রচিত। কেন্দ্র হতে পাতলা সরু দণ্ডে যে রূপালী পদ্মফুল উত্থিত রয়েছে এর সরু দণ্ডের মাঝ দিয়ে সুগন্ধযুক্ত পানি অবিরত ধারায় বের হত। বেসিন বা গামলা নির্মাণ পরিকল্পনাতেই একে একটা বিশাল পদ্মের আকারে নারীসুলভ কমনীয়তায় গঠন করা হয়েছিল; আর পদ্মের পাপড়িগুলো সমস্ত বর্গাকার জায়গা ঘিরে কাঠামোর সাদৃশ্যতায় বিরাজমান হয়েছিল।

এসব উদ্যান ও ঝরনার দৃশ্য এতই চিত্তাকর্ষক ও চমৎকার ছিল যে এটি সমসাময়িক লেখক বা গীতিকারবৃন্দ অনুপ্রাণিত ও হতবাক হয়ে মন্তব্য করেছিলেন "লতাগুল্ম ও পুষ্পের তরঙ্গ নৃত্যরত পানির নিচে জাদুর দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই ছিল না।"[৪] এ ঝরনাটি এ ধরনের অনেকগুলোর মধ্যে অন্যতম, যাতে শিল্পীর স্বকীয় মেধা প্রয়োগে মনের মাধুরী মিশিয়ে আপন কল্পনায় সৌন্দর্যময় করে সৃষ্টি করার সুযোগ পেয়েছিল। এ প্রাসাদে এরূপ মনোরম শৈল্পিক আবিষ্কার কম আনন্দদায়ক ও মনোমুগ্ধকর ছিল না, এটি কল্পনাপ্রবণতার ইন্দ্রিয়গত বুদ্ধি বিকাশের বিদ্যমান পরিস্থিতির কথাই প্রমাণ করছে।

দিওয়ান-ই-আম :

দুর্গের রয়াল প্রাসাদ বা রাজকীয় অংশের মধ্যে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য ইমারত হচ্ছে দিওয়ান-ই-আম বা জনসাধারণের মিলনায়তন। জনসাধারণ এখানে এসে সম্রাটের সাথে

দেখা করত এবং তাদের প্রয়োজনীয় আবেদন-নিবেদন পেশ করত। এটি অবশ্য প্রাসাদের মতো সুসজ্জিত বা অলঙ্কৃত ছিল না। তবে এর নকশা পরিকল্পনা প্রশংসনীয়ভাবে এর অভীষ্ট লক্ষ অনুসারে বা অভিপ্রায় অনুযায়ী সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল। কেননা এটি কোনো আমোদ-প্রমোদের স্থান ছিল না; তবে এর পিছনের দিকে মার্বেলে তৈরি চন্দ্রাতপ বিনোদনমূলক কাজের জন্য ব্যবহৃত হত।

বলা বাহুল্য এটি রাজকীয় প্রাত্যহিক কার্যনির্বাহের প্রয়োজনে নির্মিত হয়েছিল। আদিতে এর পূর্ণাঙ্গ নকশা পরিকল্পনায় দেখা যায় যে এটি একটি উন্মুক্ত বর্গাকার অঙ্গন যার চতুর্দিকে স্তম্ভ পরিশোভিত হয়েছে। বিশেষত এর পূর্বাংশেই স্তম্ভসারি বিদ্যমান। কিন্তু দুঃখের বিষয় ঐসব উপকাঠামো আজ আর টিকে নেই। অযত্নে অবহেলায় বিজাতীয় ইংরেজদের সক্রিয় অত্যাচারে মুসলিম ঐতিহ্য কালক্রমে হারিয়ে গিয়েছে। এখন কেবলমাত্র মিলনায়তনটাই অবশিষ্ট রয়েছে। এ হর্ম্যটি বেলে পাথরে তৈরি এবং দৈর্ঘ্যে ৫৬.৪০ মি. (১৮৫ ফুট) ও প্রস্থে ২১.৪৫ মি. (৭০ ফুট) (চিত্র নং- ৮২)।

ইমারতের সম্মুখভাগ ৯টি খিলান দ্বারা শোভিত। খিলানগুলো প্রতিটি জোড়া স্তম্ভের ওপর ভর করে রয়েছে। তবে কোণগুলোতে দু জোড়া করে স্তম্ভ সংযুক্ত করা হয়েছে। অভ্যন্তরভাগ তিন খিলান পথবিশিষ্ট এবং স্তম্ভসারির উপরিভাগে অবস্থিত খিলানগুলো অলঙ্কৃত ও সুসজ্জিত। এতে সর্বমোট ৪০টি স্তম্ভ ব্যবহৃত হয়েছে। এর সাদাসিধা পিছনের দেয়ালে তির্যক কুলঙ্গি ধারণ করে রয়েছে। যদিও এ হর্ম্যটি বেলে পাথরের নির্মিত তবুও যখন এটি প্রথম নির্মিত হয়েছিল তখন এর প্রতি অংশ ঝিনুক বা শঙ্খ খোলা দ্বারা মোড়াই করে গজদন্তভস্ম (ivory) দ্বারা ঘষে-মেজে পালিশকৃত। এ পালিশ সামগ্রী প্রস্তুতে প্রচুর পরিমাণে চুনাম (chunam) নামের দ্রব্য মিশ্রণ করা হত। প্রকৃতপক্ষে এ মিশ্রণ প্রস্তুতকরণ কাজটি খুবই কৌশলপূর্ণ কাজ যা কেবলমাত্র রাজপুতানার কারিগরগণই নির্ভুল ও পূর্ণাঙ্গভাবে সম্পাদন করতে পারদর্শী ছিল। এরূপ পদ্ধতির ব্যবহারে নির্মিত স্তম্ভসারি ওপর ছাদ যুক্ত হয়ে যে মিলনায়তন নির্মিত হয়েছিল তা বাহ্যিক চেহারার দিক থেকে মার্বেল প্রাসাদের সাথে একাকার হয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছিল এবং সমগ্র হর্ম্যটি যৌগিকভাবে উজ্জ্বল শুভ্রতায় দণ্ডায়মান রয়েছে। পদ্ধতির এ বিঘোষিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত অবয়ব দেখতে সম্রাটের মানসিক ইচ্ছা প্রবল ছিল বলে মনে করা হয়।

এ সাধারণ মিলনায়তনের অভ্যন্তরভাগে বিশেষ একটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তাৎপর্য ছিল। এর পিছনের দেয়ালে তাক কেটে চোরকুঠরি নির্মাণ করা হয়েছিল যেখানে সম্রাট আসন গহণ করতেন। এখানেই বিশ্ববিখ্যাত ময়ূর সিংহাসন স্থাপিত ছিল। এটি ছিল বহু মূল্যবান দুর্লভ মণিমাণিক্য খচিত। পারস্যের নাদির শাহ্ এটি লুণ্ঠন করে নিয়ে গেলেও এর অবস্থান ও প্রকৃতি সম্পর্কে মোগল দেয়াল চিত্রকলায় প্রমাণ আজো সংরক্ষিত রয়েছে।

মোগল চিত্রকলা হতে উপলব্ধি করা যায় যে, সে যুগের রাজসভা কবিরা কেন অনুপ্রাণিত হয়ে কবিতার ছন্দে এর ভূয়সী প্রশংসা করে লিপিবদ্ধ করেছিল। ময়ূর সিংহাসনের বেহিসাব মূল্যের কথা পয়ার ছন্দে বর্ণিত হয়েছে "পৃথিবী এর কারণে স্বর্ণ হারিয়ে প্রাচুর্যহীন হয়ে পড়ে এবং পৃথিবীর থলি ধন-সম্পদ শূন্য হয়ে যায়"।

ময়ূর সিংহাসনের পশ্চাতের অলঙ্কৃত ও সজ্জায়ন করা দেয়ালের মধ্যে যে চোরকুঠরি নির্মিত হয়েছিল তার ঠিক উপরের দিকে দেয়ালে দৃষ্টিপাত করলে বিশেষ একটা আকর্ষণীয় সজ্জায়ন দেখতে পাওয়া যায়, যা সৌকর্যপূর্ণ পেট্রাডুরা পদ্ধতির নকশায় অঙ্কিত হয়েছে। এর বিষয়বস্তু এবং কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান বিশেষ অর্থ প্রকাশ করেছে; শীর্ষে ছোট

খোপের মাঝে সযত্নে অঙ্কিত রয়েছে বৈশিষ্ট্যসূচক পাশ্চাত্য দেশ গ্রিসের পৌরাণিক সঙ্গীতবিদ ও কবি অরফিউস্ ও তাঁর বীণার প্রতীকরূপের দৃশ্য। কথিত আছে তাঁর সঙ্গীতে বনের পশুরাও আত্মহারা হয়ে যেত।

সুনির্দিষ্ট এ উদাহরণ ও এর সাথে হয়তো আরো কিছু নমুনা দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে আসল ফ্লোরেস্টাইন পদ্ধতির ইনলে বা খঁচিত নকশা ব্যবসা-বাণিজ্যের যোগাযোগের ফলে সংগৃহীত হয়ে ভারতে নীত হয়েছিল। পরে চিত্রকর্মটি পছন্দ হওয়ায় ভারতীয় শিল্পী বিমূর্ত আদলে তার অলঙ্করণ পরিকল্পনায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল যেমন এক খণ্ড বহিরাগত বুটিদার রেশমি ও জরির কাপড়ের টুকরা লেপ বা বালাপোশ তালি দিতে ব্যবহার করে থাকে সেরূপে এর তালি হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে। এ খোপে আঁকা নকশার উপস্থিতি সে যুগের মোগল চিত্রকলা ইতালি আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল বলে চূড়ান্তভাবে সমর্থিত হয়েছিল; তবে এ প্রসঙ্গে পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন[৫] যে এ সিদ্ধান্তের হয়তো কিছু গুণগত পরিবর্তন দরকার। এটি সত্য যে কোনো কোনো সময়ে ইউরোপীয় দক্ষ কারিগরদের প্রযুক্তিগত চিত্রায়ন বা রত্ন মণিমাণিক্যের এবং অনুরূপ ধাতুর কাজের উদাহরণ মোগল ভারতে দেখতে পাওয়া যায়।

পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অধিকতর বাণিজ্যিক সম্পর্ক বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে অনুরূপ পরিস্থিতিব আগমন ঘটেছিল বলে মনে করা যায়; হয়তো এটি বাস্তবে তথ্যপূর্ণভাবে সঠিক। অন্যপক্ষে ইউরোপীয় দুঃসাহসিক কারিগরবৃন্দেব মোগল দরবারে চাকুরি গ্রহণেব তথ্য বিবরণী সংরক্ষিত রয়েছে বলে জানা যায়।

কিন্তু এ রীতি পদ্ধতির প্রভাব দেশীয় ইমারতেব ওপর দীর্ঘস্থায়ী ফলাফল আনতে পারে নি। এব প্রভাব সামগ্রিকভাবে অপ্রধান কেবলমাত্র গৌণ ফলিত চিত্রকর্মের ক্ষেত্রেই সামান্যভাবে দেখতে পাওয়া যায়। কেননা আবহমান কাল হতে ভারতীয় ধাতুগত স্বাভাবিক প্রাণশক্তির তেজস্বী ভারতীয় স্থাপত্য আপন গতিতে চলমান ছিল। পি. ব্রাউনের মতো পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন[৬] যে পূর্ব ও পশ্চিমের সাংস্কৃতিক ভাবধারায় আদান-প্রদানের সূচনায় অন্যান্য শিল্পরীতির মতোই ইমারত নির্মাণ শিল্পেও সামান্য প্রভাব কার্যকর হওয়ার চিহ্ন লক্ষণীয় হয়ে উঠেছিল।

দিল্লি দুর্গ হতেই এর উদাহরণ চিহ্নিত করা যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, দিল্লি দুর্গের রঙমহলে সংস্থাপিত বিচার মানদণ্ড পরদাটিতে পাশ্চাত্য প্রভাবযুক্ত কিছু কিছু উপকবণ প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। এ ছাড়াও পারসিক শিল্পরীতিরও প্রভাব লক্ষ করা যায়।

দিল্লি জামি মসজিদ :

শাহজাহানের স্থাপত্য প্রকল্প শুধুমাত্র দুর্গ ও প্রাসাদ নির্মাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। দুর্গ ছাড়াও বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম তার পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি জনসাধারণের নামাজের জন্য একটি বিরাট জামি মসজিদ নির্মাণ করেন। মসজিদটি তার দুর্গের অতি নিকটে এবং শহর সীমানার মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। এ মসজিদে জনসাধারণের নামাজের উত্তম ব্যবস্থাসহ নিজের আনুষ্ঠানিক ও পর্বাদি পালনের নিমিত্তে তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করেন।

বলা বাহুল্য দুর্গের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার ছয় বছর পর এ মসজিদের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হয়েছিল। ভারতে মোগল আমলে ইতঃপূর্বে যে মসজিদগুলো নির্মিত হয়েছিল

এগুলোর একটিও এব সমকক্ষ ছিল না।[৭] এটি আকারে কেবল বিশাল ছিল না অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও মনোজ্ঞ ছিল। অভিজাতপূর্ণ বৈশিষ্ট্যই একে কালজয়ী করে তুলেছিল। জন জামায়েতের মসজিদগুলো ঐতিহ্যবাহী ধারায় নির্মাণে নিচু মেঝে সংযুক্ততা দৃষ্ট হয়ে থাকে। এগুলোর বাহ্যিক অবয়ব তুলনামূলকভাবে ততটা সুন্দর ও আভিজাত্যময় দেখায় না; অন্যপক্ষে দিল্লির এ মসজিদ একটা সুউচ্চ মঞ্চের ওপর নির্মিত। এর ফলে সম্রাটের মসজিদ নির্মাণের যে মানসিক অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল তা অর্জিত হয়েছিল।

অন্যপক্ষে মসজিদের সবগুলো অংশই প্রয়োজনীয় উচ্চতায় স্থাপিত হয়েছিল। এ মসজিদে তিনটি আভিজাত্যময় প্রবেশ তোরণ এবং উপরে চতুষ্পার্শ্বে বুরুজ নির্মিত হয়েছিল। এতে অভিগমন প্রবেশপথ রাজোচিত শূন্যে ধারণ সোপানাদির দ্বারা রচিত হওয়ায় এর যে উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়েছে তা মসজিদের বহির্দৃশ্যের মর্যাদা ও আভিজাত্য সৃষ্টি করেছে।

এ মসজিদে জনসাধারণের প্রবেশের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ তোরণ পথ নির্ধারিত ছিল। পক্ষান্তরে পূর্ব দিকের প্রবেশ তোরণ কেবলমাত্র রাজকীয় ব্যবহারের জন্য সুনির্দিষ্ট রাখা হয়েছিল। এ সংরক্ষিত প্রবেশ তোরণ হতে দুর্গ পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক শোভাযাত্রায় দলবদ্ধভাবে বা কুচকাওয়াজ করে যাবার হুকুম পথ হিসেবে গণ্য হত।

মসজিদের পূর্ব দিকেব সম্মুখ তোরণ হতে ভিতরের দিকে প্রস্তর ফলকে যা বাঁধানো হয়েছে তা ৯৯.১০ মি. (৩২৫ ফুট) পার্শ্ববিশিষ্ট চতুষ্কো সমতলক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে। এর পরের অংশটাই জুল্লাহ। মসজিদের এ মূল অংশ লাল বেলে পাথরে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও সৌন্দর্যময়তায় নির্মাণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য মনোহর ও প্রশংসনীয় স্থাপত্যিক প্রণালীর বলিষ্ঠ প্রয়োগে মসজিদের বেশ কিছু অংশের উপরিভাগ বা পৃষ্ঠদেশ কালো ও শ্বেতমর্মরে আচ্ছাদিত করে অপূর্ব বাহ্যিক দৃশ্যপট সৃষ্টি করা হয়েছে। এ মসজিদে যে জুল্লাহ নির্মাণ করা হয়েছিল এটি মুসলিম এবাদতখানা নির্মাণ কৌশলের ক্রমোন্নতির বিকাশমান গঠনসত্তার বিবর্তনমান ফল। এ বিবর্তন ধারা বিশ্লেষণে পাশ্চাত্যের পণ্ডিতগণ গির্জার কোনো কোনো অংশের সাথে যোগসূত্র অন্বেষণ করলেও ফলত এটি নিজস্ব প্রয়োজন ও উপলব্ধির মাঝেই স্থাপত্যিক উপকরণ ও কাঠামোর অংশগুলো গড়ে উঠেছিল। অবশ্য পৃথিবীর প্রতিটি সভ্যতা পুর্ববর্তী সভ্যতার দ্বারা কিছুটা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু মুসলিম সভ্যতা কোথাও থেমে থাকে নি বরং এর কৃষ্টিগত ধারা অব্যাহত থেকে দিনে দিনে বিকশিত ও প্রসারিত হয়েছে।

মসজিদ সাহনের তিন দিকেই (কিবলা দিক ব্যতীত) রিওয়াক বা ছাউনি বারান্দা রয়েছে। এর স্তম্ভসারির কেন্দ্র বা মাঝামাঝি স্থলে প্রবেশ তোরণের ভিতর মুখে এসে স্তম্ভের ছেদ ঘটেছে। কেননা প্রবেশ পথ বরাবর অংশটি ফাঁকা রাখা হয়েছে। সামনের চতুষ্কো খোলা সমতল অংশটাই সাহন। এটি সম্পূর্ণভাবে উন্মুক্ত; কেবলমাত্র মাঝখানে বর্গাকার চৌবাচ্চা নামাজের অজুর জন্য নির্মিত হয়েছে। মসজিদ অবয়বের মনোজ্ঞ কল্পন মানুষের সহজাত প্রবৃত্তিকে জুল্লাহব দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করতে অনুপ্রাণিত করে।

বিশাল বাধাহীন প্রসারিত প্রান্তরের সম্মুখটাই শোভিত দেয়াল যা এর ঘনত্ব, শ্বসন শক্তি ও প্রসারতাকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হতে সহায়তা করেছে। এ জুল্লাহ অংশ ৬১ মি. (২০০ ফুট) ও ২৭.৪৫ মি. (৯০ ফুট) আয়তনবিশিষ্ট (ভূমি নকশা নং- ৫৫)। এর নকশা কাঠামো অত্যন্ত সুচতুরতায় নিষ্পন্ন। এর অভ্যন্তরভাগ প্রশস্ত কেন্দ্রীয় খিলানপথ দ্বারা গঠিত এবং পার্শ্বদেশ হতে দুদিকে বাহুর বিস্তার ঘটেছে। ঐ বাহু দুটিতে পাঁচটি করে মোট দশটি অলঙ্কৃত খিলান নির্মিত হয়েছে। বাহুদ্বয়ের শেষ মাথায় একটা করে দীর্ঘ মিনার চার পর্যায়ে

বা স্তবে নির্মিত হযে উপবেব দিকে উত্থিত। মসজিদেব ছাদে তিনটি শ্বেতমর্মবেব বাল্ব আকৃতিব গম্বুজ চমৎকাবভাবে নির্মাণ কবে এব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হযেছে (চিত্র নং- ৮৩)।
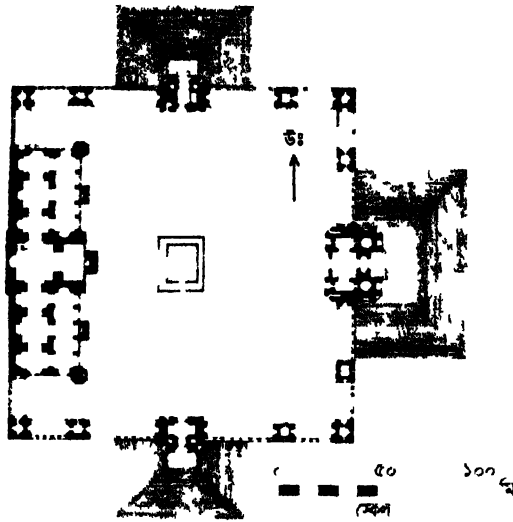
ভূমি নকশা নং ৫৫ দিল্লি জামি মসজিদ

জুল্লাহব অভ্যন্তবেব নকশা পবিকল্পনা অত্যন্ত বিধিসম্মত ও চাতুর্যতাব সাথে সুসম্পন্ন হযেছে যেমনটি হযেছে বহির্ভাগস্থ নকশা পবিকল্পনাব ক্ষেত্রে। কেননা নামাজগৃহেব অভ্যন্তবভাগ এক বিশাল আকৃতিব মিলনাযতন যা বিভিন্ন খিলান পথে বিভক্ত। খিলানগুলো ভাবী থামযুক্ত হযে অভ্যন্তবীণ শোভাবর্ধন কবছে। মসজিদেব প্রতিটি 'বে'-এব শেষপ্রান্তে অর্থাৎ কিবলা দেযালে খিলানযুক্ত মিহবাব সন্নিবেশিত বযেছে।

এ খিলান সজ্জাযনেব সাথেই আবাব দেযালেব অভ্যন্তরভাগেব গাত্রে সজ্জাযন ও অলঙ্কবণ সম্প্রসাবিত কবা হযেছে। এতে খোপ খোপ আকাবেব প্যানেল নকশা এবং প্যানেলেব অভ্যন্তবে বৃক্ষাপত্রাদিব সুচালো ডগা শোভাবর্ধন কবে আছে। তা ছাড়া খাঁজকাটা খিলান নকশা এব আলঙ্কাবিক শ্রীবৃদ্ধি কবেছে। আবাব দেযাল, থাম ও বাঁধানো মেঝেতেও বিভিন্ন বিমর্ত চিত্র ব্যবহাব কবে মসজিদেব সৌষ্ঠব বৃদ্ধি কবা হযেছে। বলা বাহুল্য মসজিদেব স্থাপত্যিক প্রযোগ বিধি ও সজ্জাযন প্রক্রিযা নিপুণভাবে অতি দক্ষতায পবিচালনা কবতে গিযে কাঠামোব দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেধেব মধ্যে পবিমিতিব একটা সামঞ্জস্যতা বযেছে। মাপেব অনুপাত বিচাবে দেখা যায যে মসজিদেব প্রতি অংশ অত্যন্ত সুনিপুণভাবে নির্মিত। এমনকি ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র উপকবণ বা অংশ সমান ও একইভাবে স্থপতিব সক্রিয দৃষ্টিসীমাব মাঝে ছিল বলে এটি সুষমতায গড়ে উঠেছিল।

সম্মুখ দেযালেব খিলানেব অংশ গঠনে অত্যন্ত প্রশংসনীয প্রক্রিযাব ব্যবহাব কবে আলো প্রবেশেব পথ উন্মুক্ত বাখা হযেছে। এ মসজিদেব মূলত অপবিহার্য উপাদানসমূহ ও বৈশিষ্ট্য এখন পবিপক্ব ভিত্তিব ওপব সুপ্রতিষ্ঠিত যে এটি একে গভীবভাবে প্রভাবিত না কবে পাবে না। এসব স্থাপত্যবীতি ও পদ্ধতি প্রযোগ কবাব পব যত্নসহকাবে সঠিকভাবে পবিচালনা সহ প্রতিটি অংশ নিযমিত গঠন প্রযোজনীযরূপ প্রযুক্তিব ব্যবহাব নিশ্চিত কবা হযেছে।

মসজিদের বাহ্যিক অবয়ব যদিও প্রদর্শনীর ন্যায় সুন্দর ও সুবিন্যস্ত তথাপি এ জাতীয় হর্ম্যের মৌলিক অপরিহার্য গুণাগুণ হচ্ছে এর সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্টতা বা সৌন্দর্যবাদের সংবেদনশীলতা সৃষ্টি করা যা সম্পূর্ণভাবে অর্জিত হয়েছে। এটি প্রায় যান্ত্রিক গণনার নির্ভুলতায় বলা যায় যে মিনার ও গম্বুজের বহিস্থ বাহ্যিক সীমারেখা দৃঢ়তার সাথে সংযুক্ত হয়েছে। মসজিদের আকারত্ব ও এর গাঠনিক পূর্ণাঙ্গতা একে উচ্চতর স্থানে নিয়ে গিয়েছে সত্যি, তা সত্ত্বেও পি. ব্রাউনের মতে[৮] এটি মানুষের অনুভূতি ও আবেগপ্রবণতার তন্ত্রীতে ধ্বনি তুলতে ব্যর্থ হয়েছে, যা এ সময়ে নির্মিত অন্য স্থাপত্যকর্মগুলোতে সার্থকভাবে ফুটে উঠেছিল।

জাহানারা বেগম মসজিদ (আগ্রা ১৬৪৮ খ্রি.) :

দিল্লির জামি মসজিদ নির্মাণের সমসাময়িক কালেই শাহজাহান তাঁর প্রিয়তমা কন্যা জাহানারার সৌজন্যে আগ্রায় একটি জাম মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। এর আয়তনে তেমন বৃহৎ নয়। একে দিল্লির মসজিদের সাথে স্থাপত্য তত্ত্বমূলক সঠিকতা নিয়ে তুলনা করলে প্রশংসা করা যায় না। তথাপি এর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়েই অনেক তথ্য বর্ণনা করা যেতে পারে।

আকারে এটি দিল্লির জামি মসজিদের অর্ধেকেরও কম যা ৩৯.৬৫ মি. (১৩০ ফুট) × ৩০.৫০ মি. (১০০ ফুট) আয়তনবিশিষ্ট। যদিও এর চিত্তাকর্ষকতা প্রথমটির মতো নয় তথাপি এর সুষম অঙ্গ সংযোজন ও সজ্জায়ন বাহ্যিক অবয়বে অভিনবত্ব ও বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্রতা এনে দিয়েছে। এর খিলানগুলো অতি সাধারণ টিউডর পদ্ধতির আকৃতিতে নির্মিত। এগুলোতে কোনো প্রকার অলঙ্করণ খাঁজ কেটে বসিয়ে দেওয়া হয় নি। মসজিদের ছাদ হিসেবে যে তিনটি গম্বুজ নির্মিত হয়েছে এগুলোর উচ্চতা প্রয়োজনানুরূপ করা হয় নি। এমনকি কোনো কোমল বর্ণ বৈচিত্র্যের বর্ণালী নকশা বা নমুনা এর দেহ রেখায় ফুটে তোলা হয় নি। এতে যেন জাহানারার বিয়োগান্তময় জীবনের বিষাদময় প্রচ্ছদ ছায়ায় আবির্ভূত হয়েছে।

অন্যপক্ষে কোনো উচ্চ মিনার এর সম্মুখ দেয়ালের উপরে মনোজ্ঞতায় রচনা করে মসজিদ অবয়বকে সুদর্শন করার চেষ্টা নেওয়া হয় নি। তবে এর সব অস্নিগ্ধার ক্ষতিপূরণ খিলানের মানানসই অবস্থানের দ্বারা পরিশোধ করতে পেরেছে বলে মনে হয়। সম্মুখস্থ খিলানের প্রশস্ত ব্যবধানে অবস্থানের মনোরম বন্টন প্রণালী উন্নত বপ্রের উপরের দিকে মানানসইভাবে সরু চূড়া পর্যায়ক্রমে ছত্রীর সাথে অবস্থান, সাহনের আকার ও স্থাপত্যকর্মের উচ্চাঙ্গতা বিশেষ করে ফোয়ারা ও চৌবাচ্চার ওপর সৌন্দর্যবর্ধক সৌকুমার্যতা এবং ইমারতের কোনাগুলোতে ছোট আকারের ছত্রীর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। এ সমস্ত প্রধান প্রধান স্থাপত্য উপকরণগুলো আগ্রার মসজিদে সমাবেশিত হয়ে একে একটা চিত্তাকর্ষক স্থাপত্য ইমাবতরূপে প্রতিভাসিত হতে সহায়তা দান করেছে। প্রকৃতপক্ষে এসব মৌলিক অবদান ও গুণগত বৈশিষ্ট্যতার পূর্ণাঙ্গ অবস্থান একে একটি সার্থক সৃষ্টিরূপে চিহ্নিত হওয়ার অবকাশ সৃষ্টি করেছে। এ মসজিদ নির্মাণকালে স্থপতি বা কারিগরবৃন্দ কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল এবং নির্মাণ কাজ কীভাবে নিষ্পন্ন হয়েছিল তার কোনো তথ্য বিবরণী লিপিবদ্ধ হয় নি।

অবশ্য খিলান ও গম্বুজ নির্মাণে কোনো রীতি অবলম্বন করা হয়েছিল তা অজ্ঞাত রয়ে গিয়েছে। তবে পি. ব্রাউন এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন[৯] যে রোমান পদ্ধতিতে অস্থায়ী কাঠের কাঠামো ইট সহযোগে উপকাঠামো নির্মাণ করে এ সমস্যার সমাধান করা হয়েছিল। পি.

ব্রাউন অবশ্য সে সময়ে চিত্রিত মোগল মিনিয়েচার বা দেয়ালচিত্র হতে অনুরূপ ধারণা করেছেন যা অনেকটা সত্য বলেই মনে হয়।[১০]

আগ্রার এ মসজিদ সমাপ্তির সমসাময়িক কালের বর্ণনায় এ সম্পর্কে কিছু তথ্য অন্যভাবে পাওয়া যায় এবং তা এরূপ যে আগ্রা শহরের অধিবাসীবৃন্দকে ঢোল সহরত করে জ্ঞাত করা হয় যে মসজিদের সেন্ট্রারিং কাজে ব্যবহৃত কাঠ বিনামূল্যে যে কেউ রাত শুরু হওয়ার পূর্বেই নিয়ে গিয়ে গৃহে ব্যবহার কবতে পারে। পরিব্রাজক ট্যাভারনিয়ার (Tavernıer) সুনির্দিষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে তাজমহলের গম্বুজ নির্মাণে ইটের উচ্চ মঞ্চ সেন্ট্রারিঙের জন্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল, যার ফলে এব নির্মাণ ব্যয় কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছিল। মোগল ভারতে সম্রাট শাহজাহানের সময় মুসলিম স্থাপত্য উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। স্থাপত্য সুন্দর ও মজবুতভাবে নির্মাণের প্রযুক্তি ও প্রয়োজনীয় উপকরণাদির উদ্ভাবন ও যোগান সেভাবেই সম্পাদিত হয়েছিল। তারা যে উন্নয়ন সাধন কবেছিল তাতে পাশ্চাত্য বা অন্য কোনো দেশের স্থাপত্য প্রযুক্তি অনুকরণ করার কোনো অবকাশ ছিল না।

শাহজাহানের ইষ্টক নির্মাণ প্রকল্প :

শাহজাহানের রাজত্বকালে বড় বড় শহবগুলোতে ইমারতের নির্মাণ উপকরণ হিসেবে বেলে ও মর্মর প্রস্তরের ব্যবহার চালু থাকলেও এর পাশাপাশি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের নির্মাণ উপকরণ স্থাপত্য ইমারত নির্মাণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। বিশেষ করে তার রাজ্যের উত্তর প্রদেশগুলোতে স্বতন্ত্রভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়া সূচনা হয়েছিল। এ ধরনের কার্যক্রমের উন্নয়ন পাঞ্জাবের লাহোর শহরকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও পাঞ্জাবের প্রায় সর্বত্রই এর প্রসারতা দৃষ্ট হয়। অবশ্য এর মূলসূত্র খুঁজতে গেলে দেখা যায় যে এসব এলাকাগুলোতে বহু পূর্ব হতে ঐ অঞ্চলের আঞ্চলিক পদ্ধতিরূপে ইমারত নির্মাণের ক্ষেত্রে ইষ্টকের ব্যবহার সমৃদ্ধি লাভ করেছিল। এ পর্বের স্থাপত্যিক প্রকাশ স্পষ্টভাবে বিশেষত কাঠামো গঠনে ইট এবং এর সাথে মাঝে মধ্যে বেলে পাথর ইমারত শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার কবা হত। এ পর্যায়ের স্থাপত্যকর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল যে এর অধিকাংশ ক্ষেত্রে বহিস্থ পৃষ্ঠদেশ সব সময়ই সজ্জায়ন কাজ দ্বারা ঢেকে দেয়া হত। এ সজ্জায়ন উপকরণ হিসেবে উজ্জ্বল রঙিন নকশা নমুনায় তৈরি চকচকে টালি ব্যবহৃত হত।[১১]

এরূপ নির্মাণ ও অলঙ্করণ কৌশল ছিল দুটি উৎপাদকের ফল। প্রথমত, পাঞ্জাবের ভূ-তাত্ত্বিক গঠন, আর দ্বিতীয়ত, ক্ষমতাশালী পারস্য সাম্রাজ্যের অতি নিকটবর্তী অবস্থান। কেননা পাঞ্জাবের উত্তর সীমানা তৎকালীন পারস্য সাম্রাজ্যের পার্শ্বস্থ অংশ ছিল। এ অঞ্চলটি সমতল পাললিক মাটি দ্বারা গঠিত এবং পাথর এখানে বিরল উপাদান। ফলে ঐ অঞ্চলের অধিবাসীবৃন্দের মধ্যে ইট ও কাষ্ঠ দ্বারা বাড়িঘর নির্মাণে একটি মানসিক প্রবণতা ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে সাফাভী বংশের রাজত্বকালে পারস্যের চিত্রকলা এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করেছিল। ঠিক অনুরূপ সময়ে পাঞ্জাবের এ অঞ্চলটি পারস্য স্থাপত্য ও চিত্রকলা দ্বারা অন্যান্য যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছিল। তবে এটিও সঠিক নয় যে লাহোর বা অন্যান্য নিকটবর্তী স্থানগুলোতে যে ইষ্টক স্থাপত্য রীতির চর্চা বা অনুশীলন ধারা অব্যাহত ছিল তা ইস্পাহানে নির্মিত ইমারতের অনুরূপ আদর্শের পুনরাবৃত্তি মাত্র। তবে একই ঐতিহ্যবাহী ধারায় অনুসরণ

ঘটেছিল বলে মনে করা যায়। মোটের ওপর বাহ্যিক চেহারার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুরূপ কৌশলে উজ্জ্বল দেয়াল সজ্জায়ন সম্ভবপর হয়েছিল।

ইরানি সংস্কৃতির সাথে মোগল ভারতের শিল্প চর্চার যে যোগসূত্র রচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে এ.বি.এম. হোসেন মন্তব্য করেছেন যে ত্রয়োদশ শতাব্দী হতে বৈচিত্র্যময় নানাবর্ণের রঞ্জিত টালির কার্য[১২] 'এ উপমহাদেশে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। সম্রাট শাহজাহানের সময় হতে ইরানি প্রভাব সর্বপ্রকার টালির সজ্জায়নে প্রেরণার উৎসরূপে পরিগণিত হয়েছিল'। এ পর্যায়ে শিল্প চেতনার নব পল্লবায়নের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতিনিধিত্বমূলক উদাহরণ হচ্ছে লাহোরের ওয়াজীর খান মসজিদ। এটি ১৬৩৪ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা সুবাদার হাকিম আলিম উদ্দিনের সৌজন্যে নির্মিত হয়েছিল।

অবশ্য উক্ত সময়ে লাহোর এবং এর চতুষ্পার্শ্বস্থ এলাকা জুড়ে একই নকশা পরিকল্পনা অনুসরণে স্থাপত্যকর্মের নির্মাণ প্রবাহ চলমান ছিল। তন্মধ্যে গোলাপীবাগ তোরণ (১৬৫৫ খ্রি.), চৌবুর্জী (১৬৪৬ খ্রি.), আলী মর্দন খানের মাকবারা (১৬৩৭ খ্রি.), মারাফুন্নেসার মাকবারা, শালিমার বাগ, ভাই-আগলা মসজিদ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অধিকন্তু এটি প্রতীয়মান হয় যে, এ ধরনের স্থাপত্য আদর্শ হিন্দুস্থানে প্রবেশের উপযোগী যথেষ্ট পরিমাণে পুরুষোচিত গুণসমৃদ্ধ ছিল। এগুলো অবশ্য প্রস্তরের নির্মিত না হলেও অত্যন্ত টেকসই ছিল। লাহোরের আগ্রায় আফজাল খানের সমাধিসৌধ যা এখন চিনি-কা-রওজা নামে পরিচিত এবং মাত্রায় (Muttra) যে জামি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এতে অনুরূপ স্থাপত্য প্রভাবই লক্ষ করা যায়।

ওয়াজীর খান মসজিদ :

ওয়াজীর খান মসজিদ অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং দৃষ্টি নন্দনীয় পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছিল। পাঞ্জাবেব প্রাদেশিক রাজধানীর উজ্জ্বলতা এ মসজিদের রূপসজ্জার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এ চিত্তাকর্ষক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ স্থাপত্যকর্মের নকশা প্রকল্প সাধারণ ধরনের তবে এর বিভিন্ন অংশ শান বাঁধানো প্রাঙ্গণের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। এর বিশাল তোরণ ও চারটি অষ্টভুজাকার মিনারসহ বিশেষ চিত্রের ন্যায় বৈশিষ্ট্যসংবলিত হয়ে নিজেই একটা স্থাপত্য শ্রেণীর কল্পন হিসেবে প্রতিভাসিত হয়েছে (ভূমি নকশা নং- ৫৬)।
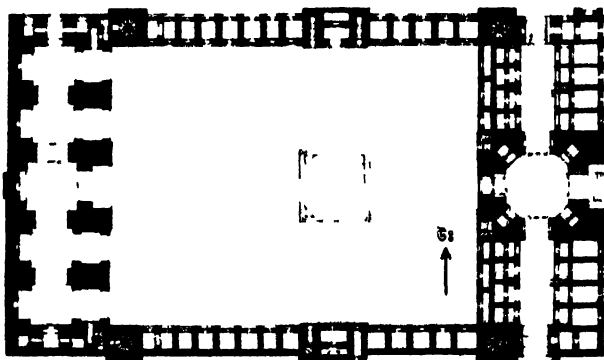
ভূমি নকশা নং-৫৬ : ওয়াজীর খান মসজিদ

এ মসজিদের গরুত্বের প্রধান কারণ হচ্ছে যে এর অন্তস্থ ও বহিস্থ অংশের ওপর রঙের কারুকার্যের প্রাচুর্যময় রূপায়ণ পরিকল্পনার বাস্তবায়ন। বিভিন্ন বর্ণের রঙ রঞ্জিত ফুল, লতাপাতার নকশালঙ্কার দ্বারা এর দেয়ালগাত্র সজ্জিত। এ ধরনের প্রাচুর্যময় সজ্জায়ন সার্থকভাবে সফলতার সাথে করা হত যে এটি প্রকারান্তরে স্থাপত্য অংশ গঠনের ওপর আধিপত্য বিস্তার করত। দেয়াল চিত্রণে কোনো কোনো স্থানে পুষ্প নমুনায় চিত্রিত ও সজ্জায়ন করা হত। তবে এটি সত্য যে স্থাপত্য গঠনের গাঠনিক প্রভাব চরমভাবে উপেক্ষিত হয়ে কেবল চিত্রণ বা অলঙ্করণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, রূপ সজ্জায়নের রকমারিত্বের নিকট কাঠামো গঠন প্রক্রিয়া পরাভব স্বীকার করে নিয়েছে।

এতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে এখানে ইমারত শিল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও রীতিকে অবহেলা করা হয়েছে। স্থাপত্যকর্মের অঙ্গ সজ্জায়ন মূলত কাঠামোর অন্তর্ভুক্ত একটা বিষয় এবং গঠন কাঠামো একে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। তবে এখানে স্থপতি তার স্থাপত্যকর্মের সর্বত্র রঙ দ্বারা অলঙ্কৃত করার কৌশল প্রয়োগের জায়গা কবে নিতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। সমগ্র দে'য়ালপৃষ্ঠ খোপ খোপ করে প্যানেল নকশায় অলঙ্কৃত। বিশেষভাবে ইমারতের বহিঃপৃষ্ঠদেশ টালিব কাজটা প্রথম বিবেচনায় আনা হত এবং স্থপতি সে অনুপাতেই তার কার্যক্রম পরিচালনা করত।

এরূপ পরিস্থিতিতে স্থাপত্য অবকাঠামো বা স্থাপত্য পকরণেব অন্যতম একটা অপরিহার্য অঙ্গ তা মৌলিক চাহিদা পূবণ করা হতে বাদ পড়ে যায়; অথচ একটা উত্তম ইমারতের জন্য এটা একান্ত আবশ্যক। এর ফলে অত্যন্ত অকার্যকর স্থাপত্য ইমারতের উৎপাদন দেখা। যদিও এটি উত্তম শ্রেণীর স্থাপত্যকর্ম নয় তথাপি নির্মাণ কাজে ইট ও টালির ব্যবহার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যই প্রতিফলিত হয়েছে।

উপকরণের সহজ প্রাপ্যতা আঞ্চলিক পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে দেয়। তাই পাঞ্জাব অঞ্চলের দালানকোঠা নির্মাণে কেবল ইটই উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, অবশ্য ঢালাই বা ভাস্কর্য ছাঁচ অনুযায়ী গঠিত নকশা কাজেব পবিমিত প্রয়োগ প্রবণতা দেখা গিয়েছে। এসব স্থাপত্যকর্মের মোটামুটি সৌন্দর্য গুণাগুণ সৃষ্টির প্রতিকূলতা দূর করার জন্য দেয়ালপৃষ্ঠ খোপ খোপ করে বিভক্ত করা হয় এবং তা বিভিন্ন রঙে উজ্জ্বল করে রঙ করা হয়। এটি স্নিগ্ধ ও মনোমুগ্ধকর হয়েছিল এবং মানুষের হৃদয় আকৃষ্ট করত (চিত্র নং- ৮৪)।

ইমারতে টালি সজ্জায়ন দুপদ্ধতিতে সাধিত হত। প্রথমটি হচ্ছে .০২ মি. (৬ ইঞ্চি) বর্গাকার টালি একটির সাথে অপরটি সংযুক্ত হয়ে সমগ্র দেয়ালগাত্র বিস্তার করে একই নকশা নমুনা ফুটে উঠত। দ্বিতীয় প্রকারে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টালি যে কোনো নমুনায় কেটে মোজাইক চতুষ্কোণ খুপরির অনুরূপভাবে সম্পাদিত হত। অনেক সময় একে মোজাইক টালি বলে অভিহিত করা হয়।

প্রথম পদ্ধতির ব্যবহাব খুবই সীমিত যা কদাপি চোখে পড়ে। লাহোরের নিকটে শাহদারায় আসফ খানের সমাধিসৌধের দেয়ালে বিক্ষিপ্তভাবে এ রীতি সামান্য কিছু দৃষ্ট হয়। শেষোক্ত পদ্ধতির টালির সজ্জায়ন সাধারণতঃ প্রচুর পবিমাণে ওয়াজির খান মসজিদে ও লাহোর দুর্গের বহিস্থ দেয়ালে প্রত্যক্ষ করা যায়। এসব টালির কোনোটাই রিলিফ পদ্ধতিতে বা উপরিতল হতে অভিক্ষিপ্তভাবে উঁচু উঁচু ভাবে কারুশিল্প দিয়ে ভরাট করে ছাঁচে ঢালাই করা নয়। সমতল পৃষ্ঠখণ্ডকে চকচকে পদার্থ দ্বাবা প্রলেপ দিয়ে আগুনে পুড়িয়ে সুন্দর দেয়াল মোড়াই উপকরণে রূপান্তর করা হত। তারপর সুবিধামতো সজ্জায়ন কাজে প্রয়োগ করা হত।

এ মোজাইক টালির ব্যবহার কেবলমাত্র পারস্য ও উত্তর ভারতে প্রচলিত ছিল এবং ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পরীতিরূপে ঐ অঞ্চলে প্রচলিত হয়েছিল। এটি সমাদৃত হওয়ার ফলে বহু সুদক্ষ কারিগর বিশেষ করে ফেইন্স মোজাইক উৎপাদনে নিয়োজিত হয়ে বিশেষজ্ঞ কারিগরে পরিণত হয়েছিল। এ টালি উৎপাদনে তারা কর্দম ব্যবহার না করে বেলে পাথর খণ্ড চূর্ণ করে তা বিশেষ অবস্থায় গলায়ে সাদা রঙের কাচাপের চুনাম দিয়ে জমাট বাঁধিয়ে তার ওপর স্বচ্ছ চকচকে পদার্থ লাগিয়ে দিত। কাঁচা অবস্থায় এর ওপর বিভিন্ন রকমের নকশা করা হত। এটি মোজাইক নামে, আবার কখনো ফেইন্স মোজাইক নামেও পরিচিত ছিল। এ মোজাইকের প্রতি খণ্ড নকশায়িত করে কাটা হয়, যা একত্রে জোড়া লাগানো যায়। অন্যপক্ষে এটি দেয়ালে নকশা পরিকল্পনা অনুপাতে প্রয়োজন মতো অবস্থায় বা জায়গার বিস্তৃতি যাচাই করে সিমেন্ট বা জোড়া লাগানোর আঠা দিয়ে লাগানো হত।

উত্তর ভারত বিশেষ করে পাঞ্জাব প্রদেশেই এর ব্যবহাব প্রত্যক্ষ করা যায়। তা সত্ত্বেও এর উৎপাদনক্ষম কোনো স্থানের নামে পাঞ্জাব অঞ্চলে বলে ঐতিহাসিক সূত্রে জানতে পারা যায় না এবং প্রায় এর সবগুলো কাশানে প্রস্তুত বলে মনে হয়। বিশেষ করে টালির গায়ে কাশি শব্দটা উৎকীর্ণ থাকায় পারস্যের কাশান শহরে নির্মিত বলে অতিসহজে মনে করা যায়। ঐ সময় পারস্যের কাশান শহর ফেইন্স মোজাইক টালি উৎপাদনের জন্য বিশ্ব-বিশ্রুত হয়ে পড়েছিল। এমনকি এর বাণিজ্যিক নাম কাশি বলেই পরিচিত হয়েছিল। অতএব এটি অস্বাভাবিক নয় যে প্রচুর পরিমাণে টালি কাশান শহর হতে পাঞ্জাবে আমদানি হত। কেননা সেখান হতে বিশেষ শ্রেণীর মৃৎপাত্র বা সামগ্রী আমদানি করার ঐতিহাসিক তথ্য রয়েছে।

১৬৪১ খ্রিস্টাব্দে আসফ খানের মৃত্যু হলে তাঁকে শাহদারায় সমাধিস্থ করা হয়। তার সমাধিতে সম্ভবত প্রথম দিকে প্রবর্তিত অন্য একটি বহিরাগত পদ্ধতির প্রভাব লক্ষ করা যায়। এটি হচ্ছে সমাধিসৌধের সজ্জায়নের কিছু অংশে যেমন- দেয়ালগাত্র মার্বেল পাথর দ্বারা সজ্জিতকরণ যা ইতঃপূর্বে আর কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। এখানে ইরানি বৈশিষ্ট্য মূর্ত হয়ে উঠেছে। যদিও আজ এর শ্বেতমর্মর আবরণ মুসলিম রাজশক্তি পতনের সাথে সাথে হারিয়ে গেছে তথাপি সমাধিসৌধের মালিন্য বেশের মাঝে এর বিস্মৃতি অতীত মন্থনে উদ্দীপ্তময় যৌবনের আভাস পাওয়া যায়।

এর বাইরের অংশে প্রাচুর্যময় টালি দ্বারা দেয়াল অলঙ্করণের নিদর্শন দৃষ্ট হয়। কিন্তু অভ্যন্তরভাগে অন্যান্য সাধারণ সুন্দর মসৃণ ছাঁচে ঢালাই কাজের নিদর্শন বহন করছে। প্রকোষ্ঠের ছাদতলে মনোজ্ঞ বিজড়িত উচ্চমানের রিলিফ কার্যের নমুনায় পৌচড়া দেওয়া কাজ বিদ্যমান। ভিতরের দিকে ধনুকের ন্যায় বক্র পৃষ্ঠদেশে বাঁশের কাঠামো কার্য দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। এ নকশা পরিকল্পনার এমন কিছু রয়েছে যা স্মরণ করায় যে এখানে ইতালীয় অথবা সিসিলির বয়ন বিন্যাস বা প্রণালী ব্যবহৃত হয়েছে। এটি অসম্ভব নয় যে অনুরূপ শিল্পকৌশল বা কারিগরি পদ্ধতি সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক কাজের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দ্বারা মোগল দরবারে নীত হয়েছিল।

এ ধরনের সৌন্দর্যময় নমুনায় কারুকার্য কোনো বহিরাগত উৎস হতে আমদানিকৃত, নাকি খাঁটি স্বদেশী সে বিষয়ের চেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে, বক্র পৃষ্ঠদেশের আবরণ সফলতার সাথে নিপুণভাবে প্রয়োগ পরিচালনা করে স্বকার্যে লাগানো সম্ভবপর হয়েছিল। অভিপ্রায় অনুসারে এ প্রযুক্তি যে যথোচিত বৈশিষ্ট্যসূচক হতে পেরেছিল এটিই স্পষ্টত প্রশংসার বিষয়বস্তু।

শাহজাহানের উদ্যান কার্যক্রম :

মোগল স্থাপত্যশিল্প সম্পর্কে বলা সম্পূর্ণ হবে না যদি সে যুগের স্থাপত্যিক প্রাকৃতিক ভূ-দৃশ্যাবলির কথা এর সাথে বর্ণনা না করা যায়। সে যুগের বৃহৎ আলঙ্কারিক উদ্যানগুলো শাসক ও ক্ষমতাবান ব্যক্তিরা নির্মাণ করেছিলেন। উদ্যান নির্মাণ ও উন্নয়নের প্রেরণা মোগলরা পারস্য হতেই পেয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ কবি ফেরদৌসির বর্ণিত কারুকার্যময় বস্ত্রাদির ন্যায় আফরাসিব উদ্যান, হুরমুজ বাদশাহের উদ্যান কাহিনী যেখানে সমীরণ কস্তুরি দ্বারা সুবাসিত হত, আর ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীর পানি গোলাপের নিষিক্ত নির্যাসে সুগন্ধিময় হত।

প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালবাসার টান এ বংশের প্রতিষ্ঠাতা জহিরউদ্দিন মোহাম্মদ বাবরের হৃদয় মাঝে অভিসিঞ্চিত ছিল। তিনি ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করে ভারতে মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বটে, কিন্তু তখনো এ বিজয় ঘটনাকে স্মরণীয় করার জন্য কোনো বিজয়স্তম্ভ নির্মাণ করেন নি। তার পরিবর্তে পানিপথের কাবুলিবাগে তিনি একটা বিরাট উদ্যান রচনা করে প্রকৃতির মাঝে স্বীয় ভালবাসাকে চিরঅম্লান করে রেখেছেন।

পরবর্তীকালে মোগলদের প্রধান প্রধান স্থাপত্য প্রকল্পগুলোর মধ্যে উদ্যান রচনার পরিকল্পনাও সন্নিবেশিত হত। প্রকল্পের আবেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করে মূল কাঠামোর আশপাশে উদ্যান রচনার ব্যবস্থা রাখত। ফলে দেখা যায় যে সমাধিসৌধ বা ধর্মনিরপেক্ষ স্থাপত্যকর্মেও উদ্যান রচনাব পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত থাকত। ঐশ্বর্যময় স্থাপত্যকর্মের সাথে বিশাল আড়ম্বরশালী উদ্যান রচনা করা হত। এসব উদ্যান আনন্দ আশ্রয় হিসেবেও ব্যবহৃত হত। এসব বিনোদনমূলক বিখ্যাত উদ্যানের মধ্যে কাশ্মীরের শালিমার বাগ ও নিশাতবাগ সমধিক প্রসিদ্ধ। এসব উদ্যানের নৈস্বর্গিক দৃশ্যাবলি মনোরম, চিত্তাকর্ষক ও আনন্দদায়ক।

অন্যপক্ষে এসব বিশাল আকারের সৌন্দর্যময় উদ্যানগুলো পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে বেশিরভাগ নষ্ট হয়ে গেছে। দিল্লিস্থ বাগানটির আর আজ কোনো অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এর পরিচয় শুধু ভারতীয় স্থাপত্য ইতিহাসের পাতায় জীবিত রয়েছে।

শাহজাহান কেবলমাত্র সুন্দর সুন্দর অতুলনীয় প্রাসাদ, স্মৃতিসৌধ বা দুর্গ নির্মাণ করেই ক্ষান্ত হন নি তাঁর সময়ে অনেক স্নিগ্ধময় উদ্যান ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠেছিল। তিনি তাঁর পিতা জাহাঙ্গীরের বাগান রচনার প্রবাহকে অব্যাহত রেখেছিলেন। ভারতের সমতল ভূমিতে তাঁর রচিত উদ্যানগুলোর বিবরণ দিতে হলে লাহোরের নিকটবর্তী শালিমার বাগে রচিত উদ্যানের দৃষ্টান্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বলে মনে করা যায়। এটি ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে মোগল স্থাপত্য রীতির অনুসরণে ঐ একই মনোরসতায় মানুষের চিত্তকে আনন্দ দানের অভিলাষে নকশা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছিল।[১২] লাহোর নগরীর শোভাবর্ধন করে আজো এটি বিদ্যমান এবং অতীতের মুসলিম শানশওকতের জীবন্ত প্রতীকরূপে এশিয়া মহাদেশের সর্বোত্তম জৌলুসময় উদ্যানরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। এটি প্রায় ৪০ একর জমির ওপর তিনটি ক্রমঅবরোহণ সমতল রেখার ধাপে আয়তাকার চত্বর পরিকল্পনায় নির্মিত।

উদ্যান নির্মাণে প্রতিক্ষেত্রে ভূমি নকশা কঠোরভাবে রীতিগত ও অক্ষীয় সুসামঞ্জস্য বৈশিষ্ট্যময় নমুনায় বাস্তবায়িত হয়েছে । কিন্তু নিয়ম অনুসারে এটি জ্যামিতিক ও ছন্দপূর্ণ বটে। অন্যপক্ষে এ পদ্ধতির মাঝে আনুষ্ঠানিক লৌকিকতার প্রভাব থাকলেও স্বাভাবিক

প্রকৃতিবাদিতার কিছু ছিল না। মনে হয় এর উদ্দেশ্য ছিল প্রকৃতির স্বাভাবিক গতিধারার অনুকরণ না করে প্রকৃতিকে বাধ্যতামূলক নিয়মানুবর্তিতার মাঝে আনয়ন করা।

মোগলদের রচিত উদ্যানগুলো নিয়মিত বর্গাকার ব্যবস্থায় পরিকল্পিত; এমনকি বর্গাকার ক্ষেত্র আবার ক্ষুদ্র বর্গাকারে বিভক্ত হয়েছে। অন্যভাবে বলা চলে যে উদ্যানগুলো আয়তাকার; বেদির সুশৃঙ্খল কতকগুলো ঢিবির সমষ্টি যা বাগানের উঁচু পার্শ্ব হতে ক্রমে ক্রমে ঢালুভাবে নিচের দিকে নেমে এসেছে এবং বাগানের বিভিন্ন স্থানে নির্মিত ফোয়ারা বা ঝরনা, চৌবাচ্চা, ডোবা বা জলাধার ইত্যাদি হতে পানি সতত প্রবাহিত হয়ে উদ্যানকে জলসিক্ত রাখত। এসব জলপ্রবাহের ব্যবস্থায় যথেষ্ট নিয়মশৃঙ্খলা মান্য করা হত এবং এতে একটা ছন্দময় গতি ছিল।

কখনো আবার এ বর্গাকার বা আয়তাকার খণ্ডাংশের অনুসরণে বা চতুর্দিকে শান বাঁধানো পাকা চলাচলের পথ রচিত হয়ে এর কিনারা ঘেঁষে জলধারা কুলকুল নাদে সম্মুখ ও পার্শ্বে চলে গিয়েছে যাতে সব সময়ে পানিপ্রবাহ সঠিকভাবে উদ্যানের প্রতি অংশে পৌঁছে ফুলের সমারোহ অটুট থাকে। এভাবে এগুলোকে বিস্তীর্ণ জলোদ্যানে পরিণত করা হয়েছিল, যা সত্যিই চমকপ্রদ।

এসব বাগান রচনায় অনেক সময় তির্যক আকারের নকশা ও স্থানের অবস্থানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে করতে হয়েছে তবে বক্রাকারের নকশা কদাপি দৃষ্ট হয়। উদ্যানগুলোতে একটা সাধারণ সূত্র কার্যকর ছিল যে যাতে সারা বছর একইভাবে জল সরবরাহ পেতে পারে সে দিকে লক্ষ রেখে বাধাহীনভাবে অতি দূরবর্তী জল উৎস হতে নালার সাহায্যে পানিপ্রবাহের ব্যবস্থা বা জল সেচ করার ব্যবস্থা কারিগরি প্রকৌশল প্রযোগ করার দৃষ্টান্ত রয়েছে।

লাহোরের নিকট শালিমারের উদ্যানে যে তিনটি ধাপ নির্মিত হয়েছিল এর প্রথমটির নাম "ফারাহা বাকম" বা আনন্দ দায়িনী, মধ্যম ও সর্বনিম্নটির নাম "ফয়েজ বাকম" বা বদান্যতাশীল। এগুলো মানুষের মনে যে রস্যতা ও আত্মতৃপ্তি দানে সমর্থ হয়েছিল তাই এর নামকরণের যথার্থতার মাঝে ফুটে উঠেছে। বাগানের ধাপগুলো একটি অপরটি হতে ঝরনা সংবলিত অলঙ্কারযুক্ত ডোবা দ্বারা বিচ্ছিন্ন।

কাশ্মীরের উদ্যান গঠনে অতিশয় মর্যাদাপূর্ণ চুনার বৃক্ষসারি বিশিষ্ট স্থানে লাগিয়ে এর শোভা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। রাজপ্রাসাদসমূহেও অনেক সময় বেড়া দেওয়া ফলের বাগান সংযুক্ত করা হত। রাজপথের পার্শ্বে বা সমাধিসৌধের সীমানা বরাবর এবং গুরুত্বপূর্ণ সরকারি কার্যালয়ের পার্শ্বে সাইপ্রেস বৃক্ষসারি শোভাবর্ধনের জন্য রোপণ করা হত। এ ছাড়াও পুষ্প চত্বরের প্রান্তে যেখানে পথ চওড়া হয়েছিল সেখানে শ্রেণীবদ্ধ সাইপ্রেস বৃক্ষসারি নিরভিরাম দৃশ্য মনে প্রশান্তি বৃদ্ধি করে। উদ্যান উন্নয়ন শিল্পের বিশেষ একটা রূপ বৃক্ষাবলির ছাঁটাই করে শোভাবর্ধনমূলক কাজের অনুশীলন প্রচলিত ছিল এবং বাগানের সমতল অংশে ফুলের চাষ করা হত। এর প্রধান আকর্ষণ ছিল সীমানা রেখায় সৌরভযুক্ত মধুভরা ফুলের চাষ।

বেশিরভাগ বাগানে দেখা যায় যে প্রকল্পের কেন্দ্রবিন্দুতে পাকা বুরুজ, ছত্রী নির্মাণসহ উন্মুক্ত আচ্ছাদিত ভ্রমণ স্থানের ব্যবস্থা এবং এতে কুঞ্জবন সৃষ্টি করা হত। এছাড়া বাগানের বিশেষ বিশেষ স্থানে স্তম্ভ সহযোগে কালো মার্বেল পাথরে বুরুজ ও চন্দ্রাতপ নির্মাণ করা হত। কাশ্মীরের শালিমারবাগ অনুরূপ আকারেই চন্দ্রতপ নির্মাণ করা হয়েছিল। এ সবের স্থাপত্যিক মূল্য ও গুরুত্ব অপরিসীম।

এ বাগানে ভ্রমণকারীদের গোপনীয়তা রক্ষার নিমিত্তে প্রথাগতভাবে সমগ্র বাগান এলাকা ছিল সুউচ্চ আবেষ্টনী প্রাচীরে ঘেরা। বলা বাহুল্য এসব বাগানে কখনো কখনো রাজপরিবারের সদস্যবৃন্দ অবসর বিনোদনের জন্য আসত। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজেদের রুচি ও মানসিক অভিব্যক্তি অনুসারে চন্দ্রাতপ, বারাদরী বা গ্রীষ্মকালীন নিকেতন গড়ে উঠেছিল। এসব উদ্যান শুধুমাত্র মোগল স্থাপত্যের জীবিত সত্তার প্রতীকই নয়, এগুলো হচ্ছে মোগল শিল্প মানসের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

তাজমহল
(১৬৩২-৫৩ খ্রি.)

শাহজাহানের জীবনবীণায় যে প্রেমের সম্ভাষণ নন্দিত হয়ে উঠেছিল তার বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল আগ্রার উপকণ্ঠে যমুনা নদীর বাঁকে বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল নির্মাণের মধ্য দিয়ে। এটি যেন এক অমর মহাকাব্য; প্রকৃতির প্রেক্ষাপটে প্রশান্ত মুরতিতে স্নিগ্ধ মনে নৈবেদ্য নেবার জন্য অনন্তকাল হতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রেমের এ মানস মন্দিরে হৃদয়ের গভীর আকুতি প্রতিনিয়ত অভিসারে হাতছানি দিচ্ছে। তাই সুন্দরের উপাসক কবি-সাহিত্যিকের দৃষ্টিতে তাজের যে অপরূপ মাধুর্যময় সৌন্দর্য মূর্ত হয়ে উঠেছে তা সকল অনুভূতিপ্রবণ হৃদয়কে উদ্বেলিত করে। প্রণয় যে আত্মার চেতনার সঞ্চার করে তা শাহজাহানের জীবনে যেভাবে বাস্তবায়িত হয়েছিল তারই অনন্ত প্রকাশ বিন্দু বিন্দু নিটোল শুভ্র মর্মর প্রস্তরের কীর্তিতে স্থায়িত্ব লাভ করেছে।

এখানে শাহজাহান কীর্তির চেয়ে মহানরূপে চিরজাগ্রত। রাজার রাজত্ব অতিক্রম করে কীর্তির মধ্য দিয়ে প্রেমিক শাহজাহান নির্মাতার ভূমিকায় যা করে গিয়েছেন তারই মূল্যায়ন করতে হবে স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে, যদিও এতে হৃদয়াবেগময় কাব্যিক রূপটাই আংশিক চাপা পড়ে যাবে।

ঐতিহাসিক ফরগুস মন্তব্য করেছেন[১৩] যে 'ভারতের আর কোনো হর্ম্য তাজমহলের মতো বারংবার ফটো তোলার বিষয়বস্তুতে বা বর্ণনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয় নি। বস্তুত পৃথিবীর কোনো সৌধ এর মতো পর্যটক আকর্ষণ করতে পারে নি। সর্বোপরি এটি চোখে না দেখা পর্যন্ত এর অসীম নমনীয়তা, সুন্দর নির্মাণ উপকরণের কমনীয়তা বা আপাতত দৃষ্টিতে এর জটিল নকশা পরিকল্পনা ধারণাকে বর্ণনায় অনুভব করা সম্ভব নয়। যদি তাজ শুধুমাত্র একটা কবরঘর হত তা হলে অবশ্য বর্ণনা দেওয়া সহজ হত। কিন্তু মিনারসহ তাজের মঞ্চটি একটা জটিল শিল্পকর্ম। বস্তুত শাহজাহানের স্থাপত্যে তথা ভারতীয় স্থাপত্যের চরম উৎকর্ষ সাধনের সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত এ স্মৃতিসৌধ।

পি. ব্রাউন তাজমহল সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন যে, মোগলদের সমস্ত অর্জিত স্থাপত্যিক অভিজ্ঞতা এবং অতীব উল্লেখযোগ্য সৌন্দর্যময় স্থাপত্যকর্মগুলোকে পিছনে ফেলে যে প্রণয়োদ্দীপক আনন্দদায়ক ভালবাসার বাস্তবায়ন মুরতি একটা চিরন্তন মুহূর্তের মাঝে অভিসিঞ্চিত করে রাখতে পেরেছিল এটিই তাজমহল।[১৪]

শাহজাহানের মানসলোকে যে কল্পনা দানা বেঁধে উঠেছিল তার সমার্থ কারো দ্বারা বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করেছিল এটি নিয়ে মতো পার্থক্যের সূচনা হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে পি. ব্রাউন বলেছেন যে সিবাস্তিয়ান ফাদার ম্যানরিক নামে একজন বিশেষজ্ঞ পরিব্রাজক এ দেশে

এসেছিলেন এবং তিনি লিপিবদ্ধ করে গেছেন যে ভেনিশিয়ান অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও রূপকার বা রূপামিস্ত্রি জিরোনিমো ভিরোনিও নামের এক ব্যক্তি মোগল দরবারে রাজকীয় শিল্পী হিসেবে নিয়োজিত রয়ে উচ্চহারে বেতন পেতেন এবং তিনি এর বাস্তবায়ন রূপকার ছিলেন।[১৫]

অন্যপক্ষে সমসাময়িক তথ্য বিবরণীতে যা লিপিবদ্ধ হয়ে রয়েছে তা হতে পরিষ্কাররূপে অবগত হওয়া যায় যে তাজমহল নির্মাণে কোনো ইউরোপীয় স্থপতি বা কারিগর অংশগ্রহণ করে নি বা তাদের কোনো প্রকার প্রভাব এর সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল না। এটি সম্পূর্ণরূপে এ দেশীয় প্রতিভার লব্ধবস্তু যা মোগলদের স্থাপত্য ইমারত শিল্পের ক্রমবিকাশের প্রবহমান ধারার নীতিশাস্ত্রসম্মত বিবর্তনমূলক ফলশ্রুতির অবদান।

স্মৃতিসৌধ যে বৈশিষ্ট্য নিজেই ধারণ কবে রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহেব অবকাশ সৃষ্টি করে না যে একটা মনের আকুতি আবেগের যাতনায় ২২ বছর ধরে ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছিল সে যুগের সব ভালোকে একত্র করার বা সমাবেশের প্রাণোজ্জ্বল চেষ্টায় তাজমহলের স্বচ্ছ মুরতি। যে আবেগ ধরা যায় না, ছোঁয়া যায় না কেবল অনুভব করা যায় তাকেই বস্তুব মাঝে বাস্তব করেছিল প্রেমিক শিল্পী শাহজাহান।

এ প্রসঙ্গে পি. ব্রাউন বর্ণনা দিয়েছেন[১৬] যে ইতালীয় কারিগরের উপস্থিতি অমূলক নাও হতে পারে; অন্যান্য স্থপতি কারিগরদের সাথে ভেনিশিয়ান কারিগরকে তাজমহল নির্মাণ প্রকল্পে নকশা দাখিল করার আহ্বান জানানো হয়েছিল। তবে এ দেশীয় দক্ষ স্থপতির নকশাই মনোনীত হয়েছিল।

পরিশেষে বলতে হয় সর্বকালের বিস্ময়, মুসলিম ও মোগল স্থাপত্যেব সর্বোত্তম নিদর্শন এবং বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সমাধিসৌধ নির্মাণ পরিকল্পনা সুসম্পন্ন করাব দায়িত্ব যার ওপর অর্পিত হয়েছিল এবং সম্রাট যার নিকট ব্যাকুল আকুতি অস্ফুট ভাষায় ব্যক্ত করে ভারমুক্ত হয়েছিলেন তিনি হচ্ছেন পারস্য হতে আগত সুদক্ষ ও নিপুণ স্থপতি ওস্তাদ মোহাম্মদ ঈশা। তিনি সময়ের একটা প্রবাহকে আবেগময় মুহূর্তকে প্রস্তরবক্ষে চিরদিনের জন্য ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন, মোগল স্থাপত্যের চরম বিকাশ চিরন্তনত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। শিল্পের সৌধরূপে তাজের ব্যাখ্যায় এতে শ্বেতমর্মরের স্বপ্নরূপ ছাড়া আর কোনোভাবেই এর স্বরূপকে ধারণা করা যায় না।

শাহজাহানের প্রিয়তমা পত্নীর প্রকৃত নাম আরজুমান্দ বানু বেগম হলেও সাধারণত তিনি মমতাজ মহল নামে সমধিক পরিচিত এবং তাঁরই কবরের ওপর যে মহার্ঘ্য স্মৃতিসৌধ নির্মিত হয়েছে এটিই তাজমহল। তিনি ১৪তম সন্তান প্রসবকালে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।[১৭]

এ সৌধ নির্মাণের নকশা প্রস্তুত করতে ওস্তাদ মোহাম্মদ ঈশাকে পারস্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয় নি। নকশা চূড়ান্তভাবে অনুমোদনের জন্য দিল্লির দুটি স্মৃতিসৌধের গঠন কাঠামো অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল। এদের একটি হচ্ছে অল্প পরিচিত হুমায়ূনের সমাধিসৌধ এবং অপরটি ১৬২৭ খ্রিস্টাব্দে মৃত্যুবরণকারী মোগল সভাসদ আব্দুর রহিম খান-ই-খানানের সমাধিসৌধ। এর প্রথমটি তখন হতে প্রায় ৬০ বছর পূর্বে নির্মিত হয়েছিল। এ স্মৃতিসৌধ দুটির আদর্শ ও পদ্ধতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে এটি প্রমাণিত হয়েছে যে এ পদ্ধতি ও প্রণালীর স্থাপত্যকার্যক্রম তখন তাদের স্মৃতি হতে হারিয়ে যায় নি।

তাই যখন তাজমহল নির্মাণের জন্য চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যা স্থির হয়েছিল তাতে আনুষ্ঠানিকভাবে হুমায়ূনের সমাধিসৌধের নকশাটাই গৃহীত হয়েছিল এবং এর সাথে যোগ হয়েছিল আব্দুর রহিম খান-ই-খানানের সমাধিসৌধ নির্মাণে অর্জিত

অভিজ্ঞতা। এটি বলা চলে যে এ দুটিকে একসূত্রে ধারণ করে ও যোগবিয়োগ করে শাহজাহানের স্থপতি চূড়ান্তভাবে তাজমহলের ভূমি নকশার রূপদান করেছিলেন।

নকশা অনুসারে যমুনা নদীর তীর ঘেঁষে এটি গড়ে উঠেছিল। অনেকে হয়তোবা মনে করতে পারে যে মমতাজ মহলের সমাধিসৌধটাই নকশা পরিকল্পনা পূর্ণাঙ্গরূপ, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি সমগ্র পরিকল্পনার অংশবিশেষ মাত্র। যমুনা নদীর দক্ষিণ তীরে মূল সমাধিকে রেখে অর্থাৎ প্রধান হর্ম্যের পশ্চাৎ দিয়ে কূলকূলরবে যমুনা নদী প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

এটি সম্পূর্ণ একটি আয়তাকার ক্ষেত্র বিশেষের নকশা; উত্তর-দক্ষিণের পরিমিত ৫৭৯.১৫ মি. (১৯০০ ফুট) ও পূর্ব-পশ্চিমে ৩০৪.৮০ মি. (১০০০ ফুট) প্রশস্ত। এর কেন্দ্রীয় এলাকা ৩০৪.৮০ মি. (১০০০ ফুট) পার্শ্ববিশিষ্ট এবং বর্গাকার উদ্যানে বিভক্ত হয়েছে। এভাবে বিভক্তির ফলে আয়তাকার ফাঁকা জায়গার অবস্থানও সুনিশ্চিত হয়েছে। (ভূমি নক্সা নং- ৫৭) দক্ষিণ প্রান্ত বা পার্শ্ব দিয়ে রাস্তা ও কর্মচারীদের বাসগৃহ লক্ষ করা যায়। পক্ষান্তরে উত্তরাংশে সুউচ্চ শ্বেতমর্মরের সমাধিসৌধ বেদি এবং অন্যান্য সম্পূরক কাঠামোর অবস্থান লক্ষ করা যায় এবং এগুলোই নিম্নের প্রবহমান নদীর দিকে যেন তাকিয়ে রয়েছে।
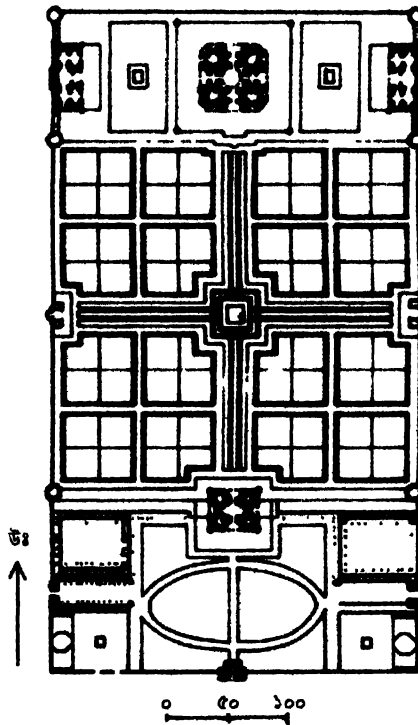
ভূমি নকশা নং-৫৭ : তাজমহল কমপ্লেক্স

প্রকল্পটি সম্পূর্ণভাবে সুউচ্চ আবেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত। এ বেষ্টিত এলাকার মাঝে মূল সমাধিসৌধ ছাড়াও অন্যান্য সম্পূরক কাঠামো ও উদ্যান অংশ সন্নিবেশিত রয়েছে। প্রাচীরের কোনায় কোনায় প্রশস্ত অষ্টভুজাকার চন্দ্রাতপ (pavilion) নির্মিত হয়েছে

এবং দক্ষিণ পার্শ্বের ঠিক মাঝখানে বিস্ময়কর স্মৃতিবিজড়িত প্রবেশ তোরণ অবস্থিত। তবে প্রকল্পের আনুষঙ্গিক মনোরমতা এখানেই নিঃশেষিত হয়ে যায় নি কেননা প্রবেশ তোরণ ছাড়াও সুন্দর সুন্দর প্রাঙ্গণ, ঘোড়ার জন্য আস্তাবল, মুসাফিরখানা ও অন্যান্য ইমারতাদি ছাড়াও দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য বাজার এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মোটের ওপর সমাধিসৌধের নকশার মধ্যে কোনো কিছুই বাদ পড়ে নি।

এ প্রসঙ্গে মনে দাগকাটার মতো সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে যে সে যুগের স্থাপত্যিক প্রকল্পের প্রাথমিক চিন্তাভাবনাগুলোর সম্প্রসারণ বা একবারেই অন্তর্ভুক্ত করা হত। প্রকৃত নির্মাণ কাজ শুরু করার পূর্বেই সব শেষ করতে হত। মোগলদের স্থাপত্য প্রযুক্তিতে কোনো প্রকার পরবর্তী সংস্কার বা সংযোজন ও সংশোধনের অবকাশ ছিল না। প্রতিটি কর্মপরিকল্পনা প্রারম্ভিকভাবেই সকল অংশের প্রয়োজনীয় সম্ভাব্যতার পূর্ণাঙ্গতা আনয়ন করতে হত।

এ স্মৃতিসৌধে গমনাগমনের পথ সমানভাবে জল ও স্থল দুটাই ব্যবহৃত হত। জলপথে নদী হয়ে আর স্থলপথে রাস্তাব ব্যবস্থা রাখা হযেছে। এ প্রসঙ্গে জি. মার্টিন মতো পোষণ করেছেন[১৮] যে সৌধ নির্মাণের পরবর্তী সময়ে এতে যাবার অনুকূল পথ ছিল নদী হযে জলপথে গমন। রাজকীয় বজরা বা নৌকায় সম্রাট ও তাঁর অনুচরবর্গ জলপথে আসতেন এরূপ প্রমাণাদি এখনো রয়েছে। উক্ত চত্বরের উত্তর-পশ্চিম কোনায় অবতরণ স্থলে সোপান রয়েছে। অবশ্য যে পথেই আসা হোক না কেন প্রথম দর্শনেই ইমারতটিকে অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক ও হৃদয়কে অভিভূত করার মতো মনোরম মনে হয়ে থাকে। মনোমুগ্ধতায় এর ছায়া জলের ওপর প্রতিফলিত হয়ে থাকে; আবার ছোট ঢেউয়ের আঘাত দেয়ালের গায়ে স্পর্শ করে মৃদু শব্দ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়।

একটি সুসজ্জিত ও রমণীয় তোরণের মধ্য দিয়ে এর প্রবেশপথ রচিত হয়েছে। এ নকশার সর্বদক্ষিণ সীমায় তোরণটি অবস্থিত। তোরণ অতিক্রম করলেই সম্মুখে সুপরিকল্পিত উদ্যান দৃষ্টিতে পতিত হবে। উদ্যানের মধ্যপ্রান্তে আলম্ব জলাধার ও ফোয়ারা ৩০৪.৮০ মি. (১০০০ ফুট) বর্গাকার স্থানের মধ্যে সুসজ্জিত অবস্থায় বিদ্যমান এবং তাজের সম্মুখে এসে শেষ হয়েছে। ফলে তাজের প্রতিচ্ছবি শান্ত জলধারার ওপর প্রতিফলিত হয়ে থাকে। পর্যায়ন্বিতভাবে মসৃণ খিলান ঢেউ খেলানো প্রবেশ মিলনায়তনের দুগ্ধবৎ শুভ্র জ্যোতির্ময় কাঠামোর ছবি হৃদয় মন্দিরে মুহূর্তের মধ্যে পুলক শিহরন জাগিয়ে দেয়।

অধিকন্তু অলঙ্কৃত উদ্যান এমনভাবে নকশায়িত করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় কাঠামোর নিখুঁত চমৎকারিত্বপূর্ণ বাহ্যিক চেহারার সাথে এটি একাকার হয়ে গিয়েছে। ফলে এ উভয়ের আনন্দদায়ক মর্যাদাপূর্ণ অবস্থান দর্শকের অভিভূত না করে পারে না। এর প্রতিটি আকারগত বাহ্যিক উপকরণ ও উপাদান যথাযথ উদ্দেশ্য অভিপ্রায়ণে নকশায়িত করা হয়েছে অথবা স্থাপত্য কাঠামোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে এর মনোরম দৃশ্যরূপ চেহাবা দৃষ্টি আকর্ষণীয় করা হয়েছে। এ ছাড়া ঝরনার সাথে জলপ্রবাহ ব্যবস্থায় উত্থিত পদ্ম ফোয়ারার সংযোগ অত্যন্ত সৌন্দর্যময়। এর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশের ব্যবস্থাপনাতেও বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে সুন্দর ও স্বাচ্ছন্দ্যময় করার একটা প্রেরণা কার্যকর ছিল।

এরূপ অবস্থার কারণেও এর বৈশিষ্ট্যের মাঝে নারীসুলভ কমনীয়তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এ সৌধের অনুরূপ বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করানো হয়তো সম্রাটের স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণা হতেই এসেছিল। এরূপ অভিলাষের প্রকাশ সৌধের বিশেষ কতকগুলো স্থাপত্যিক ও সজ্জায়ন প্রক্রিয়ার মাঝে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে; যেমন—নমনীয় ও মার্জিত ঢালাই ছাঁচ জাতীয়

অলঙ্করণ ও সজ্জায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ। এ ছাড়া বর্ণবৈচিত্রের নকশায় সমন্বিত দেহ রেখাতেও এর প্রতিফলন ঘটেছে।

সর্বোপরি এর অত্যন্ত প্রাচুর্যপূর্ণ সজ্জায়ন প্রক্রিয়া সংযত ও বিনয়পূর্ণ বয়ন। বয়নের বিন্যাস ও উপকরণাদির রঙের ইন্দ্রিয়ের অগোচর ও ধরাছোঁয়ার বহির্ভূত অসীম সূক্ষ্মতাময় অস্তিত্ব। প্রতি অঙ্গের বিস্ময়সূচক শোভনতা কাব্যিক প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে সমগ্র সৌধ অবয়বকে চিরন্তনত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। পক্ষান্তরে এটি কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে মোগল স্থাপত্যকার্যক্রম প্রথম যুগের শক্তিশালী পৌরুষ প্রকৃতির স্থাপত্য আদর্শ স্তর অতিক্রম করে তা পরিপক্ব ও পরিণতি অবস্থায় উপনীত হতে শোভনতা কাব্যিক প্রকৃতির সাথে মিলিত হয়ে সমগ্র সৌধ অবয়বকে চিরন্তনত্বে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছে। পক্ষান্তরে এটি কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না যে মোগল স্থাপত্যকার্যক্রম প্রথম যুগের শক্তিশালী পৌরুষ প্রকৃতির স্থাপত্য আদর্শ স্তর অতিক্রম করে তা পরিপক্ব ও পরিণত অবস্থায় উপনীত হতে পেরেছিল যদিও পূর্ববর্তী ধারার সাথে পরবর্তী পরিবর্তন কিছুটা বিসদৃশ মনে হতে পারে।

তবে স্থাপত্য আদর্শের পরিবর্তনের যে পরিস্থিতি উদ্ভব যোগ হয়েছিল এর পিছনে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতাকে প্রথমত চিহ্নিত করা যায় এবং এর সাথে আর একটি ছোট্ট কারণ যোগ হয়েছিল এটি হচ্ছে স্থাপত্য নির্মাণের প্রয়োজনীয় উপকরণাদির পর্যাপ্ত পরিমাণে সরবরাহ পাবার অনুকূল নিশ্চয়তা ও সুযোগ অর্থাৎ প্রয়োজনীয় উপকরণ বা মালমসলার যথাযথ যোগান পেতে কোনোরূপ অসুবিধা হত না, যা স্থপতি বা কারিগরদের মনে কম উৎসাহের সঞ্চারণ করে নি। এমনি মুহূর্তে সমাধিসৌধের কোমল স্বরূপের বহিঃপ্রকাশ ছিল একটা বিশেষ সময়ের আনন্দোচ্ছল প্রাণচাঞ্চল্যমাত্র। এ প্রাণচাঞ্চল্যতার সাথে শাহজাহানের হৃদয়াবেগের অসীমতার একটা যোগসূত্র গ্রথিত হয়ে গিয়েছিল।

তাজমহলের স্থাপত্যিক গঠন কাঠামো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এর সুউচ্চ বেদি আবেষ্টনী প্রাচীরের উত্তর সীমান্ত রেখায় নদীর তীরে অবস্থিত। মূল কাঠামোকে কেন্দ্রে রেখে দু পার্শ্বে বিভিন্ন উপকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে। এগুলোর পশ্চিম পার্শ্বেরটি মসজিদ এবং পূর্বের পার্শ্বের প্রতিবিম্ব ইমারত ঐ মসজিদের প্রতিধ্বনিরূপ একটি ইমারত, তবে এটি ধর্মীয় প্রয়োজনে নির্মিত নয়। প্রকৃতপক্ষে একে প্রতিসম একটি কাঠামো বলা চলে; উভয় পার্শ্বের মাঝে সৌন্দর্যের ভারসাম্যতা বা সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য নির্মাণ করা হয়েছে। পশ্চিম পার্শ্বেরটির নাম রাখা হয়েছে সওয়াল এবং পূর্ব পার্শ্বের প্রতিবিম্বিত ইমারতের নাম জওয়াব বা প্রতি উত্তর। এটি এখন মেহমানখানা বা গেস্ট হাউজ রূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। তবে ইদানীংকালে তাজমহলের সে ঐতিহ্যবাহী গৌরব ধরে রাখার দায়িত্ব কতটুকুই বা পালিত হচ্ছে! পারিপার্শ্বিক অধিবাসীবৃন্দের কাছে এর মূল্যই বা কতটুকু!

আবেষ্টনী প্রাচীরের মধ্যমণি হচ্ছে শুভ্র মার্বেল পাথরে নির্মিত সমাধিসৌধ। এটি সমস্ত প্রকল্পের উৎস ও কেন্দ্রবিন্দু। এর মূল মঞ্চ বা বেদি বর্গাকার যা ৬.৭৫ মি. (২২ ফুট) উঁচুতে প্রতিষ্ঠিত। এর প্রতি পার্শ্ব ৫৬.৭০ মি. (১৮৬ ফুট); তবে চারকোনা ৯.২০ মি. (৩০ ফুট ৯ ইঞ্চি) করে তির্যকভাবে কর্তিত (chamfered)। ফলে বর্গাকার হতে অষ্টভুজে পরিণত হয়েছে। এ আকারেই ৩২.৯৫ মি. (১০৮ ফুট) উঠে গিয়েছে এবং প্রতি কোনা হতে মার্বেল ছত্রী উত্থিত হয়েছে (ভূমি নকশা নং- ৫৮)।

ঠিক মাঝখান হতে টাওয়ারের মতো কাঠামো ৪৪.৮৫ মি. (১৪৭ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট হয়ে বিশাল বাল্ব আকৃতির গম্বুজ ধারণ করেছে। চারকোনা হতে উত্থিত ৪১.৭৫ মি.

(১৩৭ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট মার্বেল মিনারের শীর্ষদেশ ছত্রী দ্বারা শোভিত। এ মিনারগুলো তিনটি স্তরে থেমে থেমে ব্যালকনিসহ গঠিত হয়েছে এবং ভিতর দিয়ে সোপান রয়েছে। গম্বুজরূপী ছত্রী সংস্থাপনার চাতুর্যই এর সৌন্দর্যকে বিকশিত হতে সহায়তা করেছে এবং সৌন্দর্যের আভিজাত্য দান করেছে। এটি কুব্বাতু-উস-সাখরার মতোবা পারস্যের সমাধির অনুসরণে দ্বিজ গম্বুজবিশিষ্ট হয়েছে। অবশ্য দ্বিজ গম্বুজ এদেশে লোদীরাই প্রথম ব্যবহাব কবেছিল এবং মোগল আমলে হুমায়ূনের সমাধিসৌধে প্রথম দ্বিজ গম্বুজের ব্যবহার দৃষ্ট হয়।
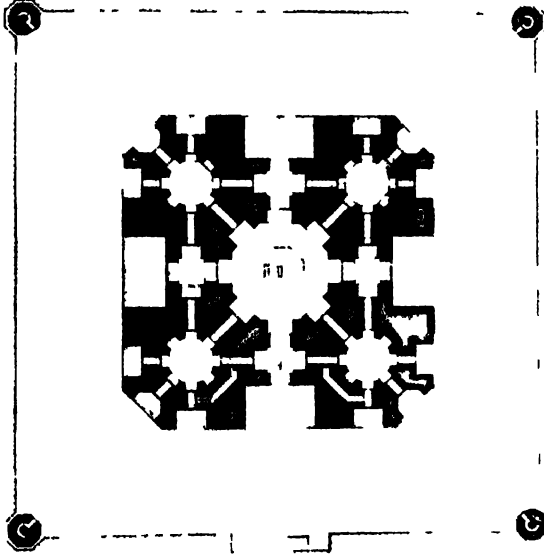
ভূমি নকশা নং-৫৮ · তাজমহল, আগ্রা

তাজমহলের কাঠামো গঠনের কথা ভেবে দেখলে এটি কোনোভাবেই জটিল স্থাপত্যকর্ম বলে মনে নাও হতে পারে। তুলনামূলকভাবে অতি স্বচ্ছন্দতায় অংশগুলো গঠিত হয়ে একটা সুন্দব কাঠামোরূপ লাভ করেছে বটে তবে একে জীবন্তভাবে সম্পূর্ণতাদান করে সৌরভ ছড়ানোর জন্য একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। এর বিভিন্ন অংশের সুষমতা ও আনুপাতিক যথাযথ সম্বন্ধ এর আকারত্বের মতোই সরলতাপূর্ণ।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে সমগ্র প্রস্থ এর উচ্চতার সমান; আবার ফাসাদের মাঝামাঝি স্থান হতে যে উচ্চতা তাই গম্বুজের উচ্চতা। অন্যভাবে বলা চলে যে উন্নত বপ্রের শীর্ষবিন্দু যা বিশাল ছায়াকুঞ্জে বা চোরকুঠরি সমস্ত উচ্চতার মধ্যবিন্দু। আবার অন্যান্য পরিমাপগুলোও যথাযথ বাস্তুশাস্ত্রসম্মত ফলাফল। এসব উৎপাদক অনুভব করতে সঠিক বিবেচিত উপলব্ধির প্রয়োগ অবশ্যই নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এর সাবলীল দলবদ্ধতা, ছন্দপূর্ণ সমাপ্তি, প্রতি অংশের দক্ষতাপূর্ণ আন্তঃযোগাযোগ একত্র হয়ে স্মৃতিসৌধের বাহ্যিক অবয়বে অনিন্দসুন্দর কাব্যিক মুরতির স্বচ্ছ চিত্রটি সৃষ্টি হতে পেরেছে যা সৌন্দর্যবোধ বিশিষ্টতায় গভীরভাবে মানসলোকে অত্যন্ত অনুপ্রেরণায় সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে।

তাজমহলের সবচেয়ে উজ্জ্বলতম রূপ ও সুষমা নিহিত রয়েছে এর গগনভেদী গম্বুজের আকারত্বে ও ঘনমান অবয়বে। গম্বুজ কটিদেশ চাপা এবং সুসজ্জিত পিপার ওপর সংস্থাপিত। মনে হয় মেঘের বায়বীয় সিংহাসনে হেলান দেয়ার মতো করে মহিমান্বিত অত্যুচ্চ গম্বুজ পিপার অবগাহন দৃশপট মানব হৃদয়কে স্পর্শ করে এবং পুলকিত করে। যখন এর দেহ বিশ্লেষণ করা যায় পৃথিবীর মতো গোলাকার দেখতে গম্বুজের নিম্নাংশ পিপার অবস্থানে কটিদেশ ছাঁটিয়ে দেয়া বা সরু হয়ে এসেছে এবং এর ওপর অংশ বক্র হয়ে চাপা স্পর্শকর রেখায় স্পর্শিনী সৃষ্টি করেছে। এটি মঞ্চের ওপর অবস্থিত দুতলার ওপর নির্মিত উন্নত বপ্র অতিক্রম করেছে। গম্বুজের ব্যাস ১৭.৭০ মি. (৫৮ ফুট): ভিতরে এর উচ্চতা ২৪.৪০ মি. (৮০ ফুট) ও বহির্গম্বুজ ৬০.৯৫ মি. (২০০ ফুট) মতো উচ্চতাবিশিষ্ট। ভিতরের গম্বুজটি প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরভাগের উচ্চতার মানানসই সৌন্দর্যতা রক্ষা করে নির্মিত, আর বহির্গম্বুজটি বহুদূর হতে সৌধের অপরূপ সৌন্দর্য বহিঃপ্রকাশিত হওয়ার দিকে লক্ষ রেখে নির্মিত।

এখানেই এটি শেষ না হয়ে আরো উঠে গিয়ে গম্বুজের শীর্ষে পদ্ম ও কলসযুক্ত শিবোচূড়া সংস্থাপিত হয়েছে। প্রধান গম্বুজকে কেন্দ্র কবে প্রত্যেক কোনায় এর ক্ষুদ্র সংস্করণ নির্মিত হয়ে এটি সৌন্দর্য বিকাশে পরিপূর্ণতা দান করেছে। ক্ষুদ্র গম্বুজগুলো দু তলাবিশিষ্ট উচ্চতায় ৭.৯৫ মি. (২৬ ফুট ৮ ইঞ্চি) ব্যাসযুক্ত পার্শ্বগুলোর শীর্ষে অবস্থান নিয়েছে। এভাবে দেখা যায় যে তাজমহলের মাঝখানে মিলনায়তন এবং চারপার্শ্বে চারটি অষ্টভুজাকার ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ অবস্থিত।

এব ফলে চারটি একই চেহারায় ফাসাদ নির্মিত হয়েছে। বেদি হতে চারদিকের ফাসাদের উচ্চতা ২৮.০৫ মি. (৯২ ফুট ৬ ইঞ্চি)। প্রবেশ পথ প্রতি ফাসাদের ঠিক মাঝখানে রচিত হয়েছে। এগুলো দেখতে একই ধরনের এবং দিক ভ্রান্তি অসম্ভব নয়। চারকেন্দ্রিক খিলানসহ আয়তাকার ফ্রেমে আটা সুন্দব কারুকার্য ও ক্যালিগ্রাফিক লিখন এতে দৃষ্ট হয়। কোণের ছোট হতে মধ্যবর্তী বড় মিলনায়তনে প্রবেশ করতে সরাসরি একটি করে এবং আর দুটি পথ ৯০০ ডিগ্রি কোণে দু বাহুর ন্যায় ইওয়ান হতে মধ্যবর্তীগামী পথে এসে মিলিত হয়েছে। এর ফলে কেন্দ্রীয় কক্ষ বা মিলনায়তন হতে ছোট্ট কক্ষগুলোর সংযোগ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে রক্ষিত হয়েছে।

প্রধান প্রকোষ্ঠ বা মিলনায়তনে ঢুকে যা চোখে পড়ে আসলে এটি নকল সমাধিফলক। একটি অবরোহণ সোপানের মাধ্যমে ভূগর্ভস্থ একটি কামরায় পৌছলে আসল কবর দুটি দৃষ্ট হবে। মূলত এ সৌধের মাঝের কক্ষগুলো আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থা হুমায়ূনের সমাধিসৌধের অনুকরণে করা হয়েছে এটি বুঝতে অসুবিধা হয় না। ঐ একই অষ্টভুজাকার মিলনায়তন এবং সহায়ক প্রকোষ্ঠগুলো কোনায় গঠিত হয়ে বিদীর্ণ রশ্মিসম বারান্দা দ্বারা প্রধান কক্ষের সাথে সংযুক্ত হয়েছে। একইভাবে এখানেও দ্বিজ গম্বুজের ঢেউ খেলানো অভ্যন্তর খোলস গঠিত হয়েছে। মিলনায়তনের যে আয়তন বা এলাকা এর সমান তলছাদ এবং এ তলছাদের উপরের দিকে বিরাট ফাঁকা বা শূন্যতা রয়েছে যার বাইরে আসল গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত।

ছোট আকারের গম্বুজগুলোর প্রকৃতি ভারতীয় সরাসরি হিন্দু স্থাপত্য আদর্শের অনুসরণ ঘটেছে। কিন্তু বৃহৎ গম্বুজ গঠনে সম্পূর্ণরূপে ইরানি প্রভাবের মোগলাই অনুবাদ। তাজমহলের পূর্ববর্তী নির্মিত সমাধিসৌধের পরিপূর্ণ সৌন্দর্যতা ফুটে তোলার যে ক্রটি পরিলক্ষিত হয় তা এখানে সংশোধন করা হয়েছে। স্থাপত্যিক কর্মকাণ্ড এখানে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। কেননা তজমহলের চারকোনায় হুমায়ূনের বা আব্দুর রহিম খান-ই-খানানের সমাধিসৌধের মঞ্চ ন্যায়

ফাঁকা না রেখে চারটি মিনার সংস্থাপিত হওয়ার ফলে একে চিত্তাকর্ষক ও অপরূপ লাবণ্যে প্লাবিত করেছে।

মিনারের গাঁথুনিতে অভিনবত্ব রয়েছে। এগুলো দুটি আলাদা পদ্ধতিতে গড়ে উঠেছে যে পদ্ধতিদ্বয় দুটি আলাদা ঐতিহ্যের প্রবহমান অস্থিত্বের ফল। ছোট গম্বুজের নিচের দিকে চাপিয়ে সঙ্কুচিত করা হয় নি যা এ দেশীয় স্থাপত্যরীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এভাবে যে সূক্ষ্ম সংঘাত উৎপন্ন হয়েছে তাই সমগ্র পদ্ধতির সুরেলা পরিবর্তনের চাবিকাঠি মনে করা যেতে পারে; কেননা সমপর্যায়ের একই বিচলন ও গতি মিনার নির্মাণ কৌশলে প্রতিভাসিত হয়েছে। প্রস্তর খণ্ডের মুখের জোড়াগুলো বিপরীত দিকে বসিয়ে যেভাবে ঘষিয়ে ঘষিয়ে সংযুক্ত করা হয়েছে যা এক প্রকার জবুথবু ভাবে সম্পন্ন এবং এ প্রকার কাজ সৌধের আর কোনো অংশে দেখা যায় না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পাবে যে প্রধান গম্বুজটি দ্বিজ গম্বুজ হলেও ছোট গম্বুজগুলো কিন্তু সাধারণ এক খোলসযুক্ত একক গম্বুজরূপে নির্মিত হয়েছে।

সৌধের মধ্যে অন্যান্য প্রকোষ্ঠগুলোর নির্মাণ কাজ যদিও প্রথম দৃষ্টিতে অত্যন্ত জটিল বলে মনে হয়, কিন্তু বাস্তবে তুলনামূলকভাবে এটি ততটা নয়, বরং সরলতাপূর্ণ ও সুগঠিত। প্রতিটি প্রকোষ্ঠ কোনায় সংশোধন করা হয়েছে। ওপর তলার প্রকোষ্ঠগুলো নিচের মতেহি একইভাবে অবস্থান নিয়েছে।

এ স্মৃতিসৌধের স্থাপত্য কাঠামো প্রয়োজনীয়রূপে অলঙ্করণ করা হয়েছে। সাজসজ্জায়নের মাঝে যে মৌলিকত্ব অভিসিঞ্চিত হয়েছে তা এর নিজস্ব। ভারত বা ভারতের বাইরে তখন হতে পূর্বযুগে সে অলঙ্কার অঙ্গসজ্জায়ন ও নকশালঙ্কার বিভিন্ন স্থাপত্যকীর্তির গাত্রে ব্যবহৃত হয়েছিল তার অনুসরণ হলেও এখানে যেভাবে বা অভিনব উপায়ে সংযোজিত হয়েছে তা আর অন্য কোথাও দৃষ্ট হয় না। ঐসব নতুন নতুন কৌশলের প্রয়োগ পরিবেশনায় যে অভিনবত্বের ইঙ্গিত ও আভাস মিশ্রিত হয়েছে তাই একে অন্যান্যগুলো হতে স্বতন্ত্র সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

এর অঙ্গসজ্জায়ন অত্যন্ত সাদাসিধা, কেননা প্রকোষ্ঠের দেয়ালগাত্রের মেঝের কোণ হতে নিম্নভাগ শুরু হয়ে উপরের দিকে উঠে যাওয়া অংশ যা ডাডো বলা হয় খোদাই কাজ ও সচ্ছিদ্র মার্বেল পরদায় কবর ফলক সংযুক্ত দেয়াল; ভিতরে স্থাপিত বা খচিত নমুনার নকশায় সমৃদ্ধ কার্য আর কোথাও পরিস্ফুট হয় নি; এর একটা ব্যতিক্রম এ নমুনা নকশা এর সমতলপৃষ্ঠের ওপর কিছুটা টানিয়ে আটকিয়ে রাখা হয়েছে।

অতি সারল্যের মাঝে কীভাবে নিখুঁত সৌন্দর্যের প্রভাব বিধৃত হল যা অনন্তের জন্য লোকলোচনে বিস্ময়াভাবের উদ্রেক করে এবং এর সংস্পর্শে হৃদয় উদ্বেলিত হয়; তখন হতবাক এ বিহ্বলতায় কীর্তিমানকে স্মরণ করে থাকে। এতে যে পরিপূর্ণতার স্নিগ্ধ প্রশান্তিময় আভাস অনুপ্রাণিত করে তা সেরূপ উৎকর্ষতায় হুমায়ূন সমাধি বা অন্য কোনো সমাধি পীঠে অর্জিত হয় নি। অবশ্য এ প্রসঙ্গে পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন,[১৯] 'কোনো কোনো নকশা প্রয়োজনের তুলনায় তাদের অবস্থান অনুসারে অপর্যাপ্ত এবং ঢিলা, অসংযুত ও অনব্যবহিতভাবে গঠিত হয়ে শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছে এবং এতে সম্ভবত পূর্ণাঙ্গরূপ অর্জিত হয় নি'। অথচ হুমায়ূনের সমাধিসৌধে এ প্রাসঙ্গিক ভুলভ্রান্তি চোখে পড়ে না।

তাজমহলের প্রধান সৌন্দর্য এর বহিস্থ অবয়বের পরিপূর্ণতায় দীপ্তময়তায়, স্বচ্ছ স্পষ্টতা ও নির্মল প্রাঞ্জলতায় বিকাশিত হয়েছে। এটি পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে এর উচ্চমান সম্পন্ন পূর্ণাঙ্গতা কেবল অংশ গঠনের সুষমতায় অর্জিত নয় তবে এটি মূলত অত্যন্ত

সরলতার জন্য ও এর বিভিন্ন অংশের তরলায়িত নিশ্চিত ঘনীভূত অবস্থা; যেমন- প্রধান প্রকোষ্ঠের উন্নত বপ্রের উচ্চতার সমান এর গম্বুজ এবং গম্বুজাংশের উচ্চতা এর প্রস্থ এবং কেন্দ্রীয় কাঠামোর উচ্চতা (মাত্র এক ফুট কম-বেশি) একই। তাজমহলের অবয়ব চোখে তৃপ্তিদায়ক এ কারণে যে, এর মতো আর কোনো স্থাপত্যকীর্তির মাপে আনুপাতিক সমতা অর্জনে সক্ষম হয় নি।

এ সমাধিসৌধের অবিস্মরণীয় নির্মল সৌন্দর্যতা এর বর্হিবর্মের পরিপূর্ণ কাব্যিক সামঞ্জস্যতা ও অংশ বিশেষের নিখুঁত সমাবেশের কারণে সম্ভবপর হয়েছে। অম্লান সারল্যই যে সৌন্দর্যের পরিপূর্ণতা আনতে পারে তা তাজকে পবখ করলেই বুঝা যায়। তাজমহলে যা সৃষ্টি হয়েছে তা একে দিয়েই অনুভব করতে হবে। পৃথিবীর আর কোথাও অন্য কিছুকে অবলম্বন করে তুলনামূলকভাবে আর একটি হাজির করে তার সাহায্যে একে বুঝার চেষ্টা নিষ্ফল হবে। কেননা এর মতো এর পূর্বে ও পরে আর একটিও সৃষ্টি হয় নি। সৌন্দর্য এর বেশভূষার আড়ম্বরপূর্ণতায়, পরিচ্ছন্ন, সুরুচিপূর্ণ চমৎকারিত্ব, নমনীয় সাবলীলতা এবং সর্বোপরি সমগ্র শ্বেতমর্মর সৌধের স্বর্ণময় সুরের লয়, মূর্ছনা ও ছন্দের সুর প্রবাহের মাঝে নিহিত রয়েছে (চিত্র নং- ৮৫)।

এর সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য এতে ব্যবহৃত দ্রব্যসামগ্রীর উৎকৃষ্টতা যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। নিঃসন্দেহে এর অধিকাংশ জলুস নির্মাণ কাজে উপকরণের গুণাবলীর ও বয়ন প্রক্রিয়াই এনে দিয়েছে। কেননা মার্করানা ও জয়পুরের মার্বেল পাথরের এমন প্রকৃতি যে এটি অবিশ্বাস্যভাবে অস্পষ্ট পরিবর্তনশীল বর্ণের ঈষৎ ছোপ ও আভার সমন্বয় প্রভাব আলো উঠানামার সাথে সম্পর্কযুক্ত হয়ে মুহূর্তে সৌধগাত্রে চলমান বর্ণের ছবি ফুটে তোলে। তাজমহলের ওপর প্রতিফলিত আলোক রশ্মি প্রতিনিয়ত এর রঙের রূপান্তর দর্শকের মনে ও চোখে পুলক শিহবন জাগ্রত করে থাকে।

যমুনার বাঁকে তাজমহল নির্মাণ পরিকল্পনার পশ্চাতে ছিল একে প্রকৃতি পুঞ্জের অবগাহিত এক শুভ্র স্বপ্নময়পুরী রূপে আত্মপ্রকাশ করানো এবং সে পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে। তাজের প্রতি দৃষ্টিনিবদ্ধ করে এর পশ্চাৎ সম্পূর্ণ বা পার্শ্ব বুঝতে হলে সমগ্র নকশা পরিকল্পনার ব্যাখ্যা অনুধাবন প্রয়োজন। তাজমহলের পশ্চাতে যমুনা নদীর স্বচ্ছ জলের ওপর এর দেহ অবয়ব ঢেউয়ের ছন্দে আন্দোলিত হয়ে থাকে, আর সম্মুখে সুবিন্যস্ত সাইপ্রেস বৃক্ষের পত্র ঘন সবুজ পেখম মেলে বাঁধানো রাস্তার দুকিনারা দিয়ে বেষ্টিত হয়ে রয়েছে।

এ সারিবদ্ধ বৃক্ষশোভিত পথের মাঝ দিয়ে কৃত্রিম ঝরনা ও ফোয়ারা পথের সাথে সাথে তাজকে পিছনে ফেলে তোরণের দিকে এগুতে থাকে। তোরণ হতে তাজের দিকে দৃষ্টিনিবদ্ধ করলে শুভ্রমর্মর সৌধের পশ্চাতে কোনো পটভূমি দৃষ্ট হয় না শুধু নীল আকাশ ছাড়া। সম্ভবত পৃথিবীর আর কোথাও স্থাপত্যকলা প্রকৃতি পুঞ্জের সাথে এত গভীরভাবে সমন্বিত হয়ে শিল্পকলার নিখুঁত অবদানরূপ বহিঃপ্রকাশের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে পারে নি। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে স্বচ্ছ জলে প্রতিবিম্বিত তাজের ছাপ কমনীয়তা দৃশ্যমান যা শান্ত, সৌম্য ও ঈষারপূর্ণ অথচ এর সীমানা নির্দেশনা জলের গভীরতায় প্রতিফলিত অস্তিত্বে অনুভব করা যায়।

তাজমহলের অভ্যন্তর গাত্রে বিশেষ করে কবর প্রকোষ্ঠ এলাকায় আরব্য নকশালঙ্কার ও পুষ্পিত নকশা এবং বিভিন্ন কারুকার্য দ্বারা দেয়াল অংশ সমাচ্ছন্ন করা হয়েছে। ফারসি ভাষায় রচিত বিখ্যাত কবিগণের অমর মহাকাব্যের অংশবিশেষ ও গীতিধর্মী সাহিত্য খঁচিত

করে তাজমহলকে শ্বেতমর্মর পৃষ্ঠার একটানা মহাকাব্যে রূপান্তর করে কীর্তিমান মানুষটি যেন অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে সব কিছু প্রত্যক্ষ করছেন; তাজমহলের দেহ সজ্জায়নে রঙের কারুকার্যের চেয়ে মূল্যবান পাথর ও ধাতুর খচিত ও খোদিত পেট্রাডুরা পদ্ধতির কারুকার্য বিশেষ আকর্ষণীয়।

বর্গাকার কিনারাগুলোতে উৎকীর্ণ লিপিমালায় অত্যন্ত উচ্চমানে সজ্জিত করানো হয়েছে যার দৃষ্টান্ত মোগল শিল্পকলা এমনকি ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পকর্মে দ্বিতীয় কোনো দৃষ্টান্ত সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয় না। অভ্যন্তরভাগেব নিম্নাংশ যদিও প্রচলিত ধাবায় সজ্জিত তথাপি সংস্থাপনাব গুণে এটিও দর্শকের মনকে স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছে। সমস্ত শ্বেতমর্মরে প্রস্তুত গাবদগুলো বা চৌকাঠগুলোর মনোজ্ঞভাবে মূল্যবান পাথর বসানো হয়েছে এবং এ খচিত পাথরগুলোর ফাঁকে ফাঁকে আবার পাশাপাশিভাবে পেঁচানো কুণ্ডলী নমুনায় নকশা দিয়ে শোভিত করা হয়েছে। সব কথার শেষ কথা হচ্ছে তাজমহলের সজ্জায়ন প্রক্রিয়া ভাষায় সাজিয়ে এর বাস্তবরূপ ফুটে তুলে অন্যকে বুঝানো বা পবিবেশন করা সম্ভবপব নয়: এটি শুধু অনুভূতির স্তরে অনুভব করে হৃদয়ে পরিতৃপ্তি লাভ করা সম্ভব এবং এ ভালোলাগার রেশ দেখার বহু পরেও মনে স্থির প্রশান্তি এনে দিতে সক্ষম।

তাজমহলের দেহ অবয়বে কী রঙ ধারণ করেছে তার সঠিক স্থিবতা নির্ণয় কবা একটা দুরূহ ব্যাপার। কেননা মর্মর প্রস্তরের ওপর প্রতিফলিত আলোক রশ্মি বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রঙের অবতারণা করে থাকে। দর্শক কী বঙ বলে বর্ণনা করবে তা নিশ্চিতভাবে অনুমান করতে সংশয় জাগে। দিনের প্রতি ঘণ্টায় এবং প্রতি বায়ুমণ্ডল সংক্রান্ত অবস্থান্তর তাজের রঙ বৈচিত্র্যের অভিনবত্ব রয়েছে। যেমন শুভ্র ঊষায় রঙ শীতল নরম ও ধূসর পাণ্ডুর আবার কমনীয়তার স্বপ্নময়রূপ ধারণ করে, দিনের মধ্য প্রহরে শ্বেত প্রলেপে ঝলমলানি বা ঝিকিমিকি; অপরাহ্নে কোমল ও শান্ত গোলাপি আভায় পরিপ্লুত. এর মধ্যবর্তী সময়ে বিস্তৃত বেগুনি রঙের আঁচ, আবার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রাত্রে স্নিগ্ধ উচ্ছলতায় শান্ত ষোড়শীর উজ্জ্বলদীপ্তশীল চেহারারই প্রতিবিম্ব। তখন গম্বুজটা যেন বাতাসের মতোই পাতলা ও ওজনহীন কোনো বস্তুবিশেষ, যেন অকাশের তারার মাঝে বড় মুক্তার মতো ঝুলে রয়েছে।

আবার মনে হয় এসব কোনো প্রতিক্রিয়াই দ্রুতগামী ধাবমান অস্থায়ী মুহূর্তগুলোর সমান হতে পারে না, যা নরমভাবে আলোকিত অল্পক্ষণ স্থায়ী ভারতীয় সন্ধ্যারাগের অনুরূপ হতে পারে। পরখ করে দেখলে এটি যেন প্রকৃতি পুঞ্জে শান্ত প্রীতিপূর্ণ গোলাপের ন্যায় অতীব আকর্ষণীয় আভার ঈষৎরূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার যখন এর সম্মুখের উদ্যান বিভিন্ন ফুলের ফুটন্ত স্বরূপ ভরিয়ে যায়, পুষ্পিত আঁচলে বৈচিত্র্যময় রঙের লেখা শুরু হয় তখন এর দৃশ্য অপরূপ হয়ে ওঠে। এসব মুহূর্তগুলোতে মনে হয় প্রকৃতি ও শিল্পী সম্মিলিতভাবে এর চলমান সৌন্দর্য সৃষ্টির চেষ্টায় সফলতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। এর দেহ অবয়বের কমনীয়তা, নরম অল্পস্ফীত নকশালঙ্কার চমৎকার ও মনোজ্ঞ অঙ্গ সজ্জায়ন, সুরুচিসম্পন্ন তনু রঙ চাতুর্যময় উপকরণের সমাবেশ এবং খোদাই ও খচিত কার্যের যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জিত হয়েছে তাই এর মাঝে কাব্যের নমনীয়তা দান করেছে।

শাহজাহানের অন্তিম বাসনা ছিল যে উক্ত তাজমহলের নকশানুরূপ আর একটি কালো মার্বেল পাথরের সমাধিসৌধ তাঁর নিজের জন্য যমুনা নদীর অপর পাড়ে নির্মাণ করে সেতুর মাধ্যমে যোগাযোগ সৃষ্টি করে দুটিকে একত্র করে দেখার। ট্যাভারনিয়ার নামে এক ফরাসি পরিব্রাজক ও বণিক সম্রাট শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ভারতে

এসেছিলেন। তাঁর বিবরণী হতে জানা যায় যে শাহজাহান সবেমাত্র তাঁর কালো মার্বেল প্রকল্পটি বাস্তবায়নে হাত দিয়েছিলেন, কিন্তু পুত্রদের ভ্রাতৃবিরোধ ও যুদ্ধ শুরু হওয়ায় তা বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং তৎপরবর্তীতে আওরঙ্গজেবের রাজত্ব শুরু হলে উক্ত প্রকল্প নিরুৎসাহিত হয়ে পড়ে।[২০]

সম্রাটের যে আলাদা একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের অভিলাষ ছিল তা তাজমহলেব অভ্যন্তরের কবর ফলকের অবস্থান দেখে সঠিকভাবে অনুমান করা যায়। কেননা সম্রাজ্ঞীর কবর মঞ্চটি ঠিক মাঝখানে এবং সম্রাটের কবর এর একপার্শ্বে রচিত হয়েছে। এটি হতে প্রতীয়মান হয় যে পরবর্তী চিন্তাভাবনায় সম্রাটের কবর দেয়ার স্থান আলাদাভাবে কোনো সমাধিসৌধ নির্মাণ সম্ভবপর হচ্ছে না তখন বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে ঐ ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল বলে মনে করা যায়।

অবশ্য এটি ঐতিহাসিকভাবে সঠিক যে সম্রাট তাজমহল নির্মাণেব পর তাঁর বিশাল সম্পদ ও সামগ্রী দ্বারা অনুরূপ আর একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন না করতে পারলেও তাঁব যে মানসলোকে সীমাহীন স্থাপত্যিক নির্মাণ ইচ্ছা লুকিয়ে রয়েছিল তার প্রমাণ অন্তত পক্ষে এব মধ্য দিয়ে পাওয়া যায়।

যে অমরকীর্তি দীর্ঘ ২২ বছর ধরে ২০ হাজার স্থপতি ও কারিগর শিল্পীর শ্রমে গড়ে উঠেছিল তার পরিপূর্ণতা শিল্পানুভূতির নিরিখে শুধু নয় বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতেও চরম উৎকর্ষ লাভে সমর্থ হয়েছিল। এটি নির্মাণে শুধু যে কালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও উৎকৃষ্ট উপাদান ও সামগ্রী সংগ্রহ করে শিল্পকলার বা আর্টের বিকাশ ঘটে নি বরং বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি নিপুণতাব অনবদ্য অবদান চিরন্তনত্বে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। বর্ণিত আছে যে তাজের নির্মাণ কাজে ১২ হাজার টন শ্বেতমর্মব ব্যবহৃত হয়েছিল।[২১]

বিগত সাড়ে তিন শ বছরের বেশি সময়ব্যাপী এর ওপব দিয়ে পাশবিক ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘনঘটা প্রতিনিয়ত ঘটে গিয়েছে তথাপি এর বাহ্যিক অবয়বে বা অভ্যন্তরের কাঠামো অংশের কোনোরূপ পরিবর্তনের চিহ্ন বিধৃত হয় নি। এর গাঁথুনি ও বাঁধন এত সুসংহত ও সুগঠিত এবং পরিপক্কভাবে সংস্থাপিত যে এর সে গাঠনিক রেখা বিন্দু ও কোণগুলোর এর নির্মাণ প্রাক্কালে যে সঠিকতা নিয়ে গঠিত হয়েছিল তার একচুল পরিমাণ যোগ কিংবা বিয়োগ ঘটে নি। তাই এটি পরিপূর্ণভাবে পূর্ণাঙ্গ ও সার্থক এবং পৃথিবীর স্থাপত্যকীর্তিগুলোব এক অমর সাক্ষ্য।

যুগে যুগে মানুষ এর সৌন্দর্য সুষমার গুণকীর্তন করবে। পৃথিবীর বুকে এ ধরনের যত কীর্তি আজ পর্যন্ত নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে এটি যে সর্বশ্রেষ্ঠ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। অনন্ত জীবনের যে প্রভাময় দীপান্বিতা তাজমহল লাভ করেছে তা শুধু হৃদয় বেদনার প্রসর ঘটে নি, এটি একে একটা প্রশান্তিময় পরিবেশে নিয়ে যেতে পেরেছে। এটি মানব প্রেমের পরিপূর্ণতা চিরন্তন রূপের প্রতিচ্ছবি একটা শান্তির অবলম্বন। তাজমহলের জীবন বেদে কাব্যিক সুরমূর্ছনা আরোপন করার সফলতাই শিল্পকর্মের শেষ কথা। তাই কেবল স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে তাজমহলের অন্তর অনুসন্ধান কোনোদিনই নিঃশেষ হবে না।

কাব্যিক মন নিয়ে হৃদয়াবেশ সঞ্চালিত করে স্থাপত্যিক জরিপ করতে পারলে এর অন্তর ও দেহের অর্থাৎ ভিতর ও বাইরের প্রকৃত পরিচয় লাভ করা সম্ভবপর হতে পারে। ঠিক তখনই এক অনির্বচনীয় আলাদানুভূতিতে প্রেমিক মন বলে ওঠে 'তুমি অনন্ত প্রেমের প্রতীক জড় ও প্রাণী বিশ্বের অবিরাম গতির মাঝে তুমি অমর, অম্লান ও অব্যয়'।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. জে. ফারগুসন, *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এন্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচার*, লন্ডন, ১৯১০, ভল্যুম-২ পৃ. ৩০৭-৩০৮

২. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচার* (ইসলামিক পিরিয়ড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ. ১০৩।

৩. জে. ফারগুসন, *পূর্বোক্ত*, পৃ.৩০৯

৪. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৪।

৫. *তদেব*।

৬. *তদেব*, পৃ. ১০৫।

৭. এ মসজিদ সম্পর্কে জি. মার্টিন বলেছেন, "....... it (Delhi Mosque) is one of the largest courtyard style mosques in India"; cf: *আর্কিটেকচার অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড*, লন্ডন, ২০০০, পৃ. ২৭০।

৮. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৬।

৯. *তদেব*।

১০. *তদেব*।

১১. পাঞ্জাব স্থাপত্য রীতি ও অলঙ্করণ সম্পর্কে জি. মার্টিন বলেন, "A separate and distinct style of Mughal architecture evolved in the Panjab, influnced by Safavid Iran. Buildings were constructed in baked brickwork and used glazed tiles for decoration"; দেখুন : *আর্কিটেকচার অব ইসলামিক ওয়ার্ল্ড, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৩।

১২. অবশ্য বাগানের নির্মাণরীতি সম্পর্কে জি. মার্টিন লিখেছেন, "The idea of the formal enclosed garden was brought from the lands of Timur, the favourite from being the charbagh, a garden divided into four axial canals or walkways"; দেখুন : *আর্কিটেকচার অব ইসলামিক ওয়ার্ল্ড, পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭৩।

১৩. জে. ফারগুসন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৩১৩

১৪. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৭।

১৫. *তদেব*।

১৬. *তদেব*, পৃ. ১০৭-০৮।

১৭. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৭৭ নং টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃক প্রচারিত তথ্য।

১৮. জি. মিছেল (সম্পা.), *আর্কিটেকচার অব ইসলামিক ওয়ার্ল্ড*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬।

১৯. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৯।

২০. ডব্লিউ. হেগ, *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ভলিউম-৪, ক্যামব্রিজ, ১৯৩৭, পৃ. ৫৬৪।

২১. আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ৭৭ নং টেলিভিশন চ্যানেল কর্তৃক প্রচারিত তথ্য।

একবিংশতিতম অধ্যায়
সম্রাট আওরঙ্গজেবের স্থাপত্যকীর্তি
(১৬৫৮-১৭০৭ খ্রি.)

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে বিজয়ী বাবর মোগল বংশকে দিল্লির সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশেরই কজন সম্রাট স্থাপত্যশিল্প চর্চার ক্ষেত্রে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। সম্রাট মহিউদ্দিন আলমগীর আওরঙ্গজেব এ বংশের ষষ্ঠ সম্রাট। তাঁর সময় ইতপূর্বে অর্জিত স্থাপত্যের উজ্জ্বল দীপশিখা প্রায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। তাঁর ধর্মীয় অনুরাগ ও কঠোর নৈতিক অনুশাসন মোগল স্থাপত্যকলার বিকাশমান ধারাকে নিম্নমুখী করে দিয়েছিল।

মোগল সাম্রাজ্য তখন পতনের সূক্ষ্ম আঘাতে জর্জরিত এবং এর চিহ্ন স্থাপত্যকলার বিকাশমান সত্তার ম্লানময় চেহারায় ফুটে উঠেছিল। মোগল স্থাপত্য পদ্ধতির পতনশীলতা রাজনৈতিক অবনতিশীল পরিস্থিতি হতে বিচ্ছিন্ন কোনো ঘটনা ছিল না; বরং অনেক গভীরে এর সম্পৃক্ততা দৃশ্যমান হয়ে উঠেছিল। এ সময় স্থাপত্যকলার অবনতির অনেকগুলো কারণের মধ্যে সম্রাটের ব্যক্তিগত উদাসীনতা ও পৃষ্ঠপোষকতার অভাব অন্যতম। অন্যপক্ষে মোগল স্থাপত্যরীতি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সম্রাটের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। তাঁর ব্যক্তিগত অভিরুচি ও মতামতের ওপর স্থাপত্যশিল্প নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিল এবং তাঁর মরজিমতো ইমারত নির্মিত হত।

স্থাপত্যধারায় যে নিজস্ব একটা গতি এতকাল গড়ে উঠেছিল এবং বিভিন্ন ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে স্থাপত্যের পাকা পথ রচিত হয়েছিল এটি উপেক্ষিত হয়ে তা মনগড়া ব্যক্তিগত খামখেয়ালিপনা পদ্ধতিতে চলতে শুরু করে এবং ফলে বিকর্ষণীয় স্থাপত্য ইমারত নির্মিত হয়েছিল যা মোগল স্থাপত্যের পতন ত্বরান্বিত করেছিল।

প্রকারান্তরে এ সময়ে নির্মিত ইমারতগুলোর প্রায় অধিকাংশই তাঁর মানসিকতার প্রভাবময় ভ্রান্ত স্থাপত্য আদর্শ বিধৃত হয়েছে। বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করলে প্রতীয়মান হয় যে স্থাপত্য নির্মাণ ধারায় চিন্তা-চেতনার অভাব প্রকল্পগুলোতে প্রকট হয়ে উঠেছিল। তাঁর অতিশয় ধর্মীয় গোঁড়ামি স্থাপত্য অনুশীলনের স্বাভাবিক গতি পথে যে বাধা সৃষ্টি করেছিল তা প্রতিরোধ করার কোনো উপায়ও ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাঁচ দশকে মোগল স্থাপত্যকলার মান ও ইমারত গড়ার কার্যক্রমের স্বল্পতা পূর্বের যে কোনো মোগল শাসকদের সময় হতে নিকৃষ্ট ও নাজুক অবস্থায় উপনীত হয়েছিল। ধর্মীয় গোঁড়ামি বা রাজনৈতিক অথবা উভয়বিধ কারণ মিলিতভাবে

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের বুকে যেসব স্থাপত্যকীর্তি নির্মিত হয়েছিল তা পূর্বস্থাপত্য আদর্শের ও রীতির ছিল পশ্চাৎগমন। এর বাস্তব তাৎপর্য সে যুগের বিশেষ একটি কীর্তির নির্মাণ কৌশল অনুধাবন করলেই বুঝা যায়।

রাবেয়া দুররানীর সমাধি :

আওরঙ্গজেবকে সুদীর্ঘ ২২ বছর দাক্ষিণাত্যে রাজ্য জয় ও মারাঠা শক্তিকে দমনকার্যে ব্যাপৃত থাকতে হয়েছিল। আওরঙ্গাবাদ তাঁর সাময়িক রাজধানীরূপে গড়ে উঠেছিল এবং একে দাক্ষিণাত্যের দিল্লি বলে অভিহিত করা হত। এখানে প্রাসাদ দুর্গ ছাড়াও অন্যান্য কীর্তির নিদর্শন আজো টিকে রয়েছে। তন্মধ্যে তাঁর পত্নী রাবেয়া দুররাণীর সমাধিসৌধ বা রওজা স্থাপত্যিক কারণে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এর আকর্ষণ উৎকৃষ্টতা যাচাইয়ের জন্য নয়, বরং একই জিনিস পরিবেশ ও অনুরাগহীনতায় কত বিকর্ষণীয় ও নিকৃষ্ট হতে পারে তা অনুধাবন করার জন্য।

এ সমাধিসৌধ আওরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ আজিমের তত্ত্বাবধানে ১৬৭৮ খ্রিস্টাব্দে সমাপ্ত হয়েছিল। এর ওপর একপলক দৃষ্টি নিবদ্ধ করেই বলতে হয় যে শাহজাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি আগ্রার তাজমহলের নকশার অনুকরণে এটি নির্মিত হয়েছিল।

এর নকশা পরিকল্পনার বর্ণনায় বলা যায় যে গম্বুজ সংবলিত কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠকে প্রদক্ষিণ করে অন্য কক্ষগুলোর অবস্থান। চারকোনায় মিনার এবং তৎসংলগ্ন উদ্যান তাজমহলের প্রতিকৃতির প্রতিফলন বুঝাতে অপেক্ষা রাখে না। অবশ্য তাজমহলের আয়তনের অর্ধেকের চেয়ে কিছুটা বেশি হবে বিবি-কা-রওজার আয়তন। পাশাপাশি দু সম্রাজ্ঞী যাদের সম্পর্ক—শাশুড়ি ও পুত্রবধূ অথচ তাদের অন্তিমশয্যা রচনায় যে প্রযুক্তি, পদ্ধতি, সংস্থাপন ও উপকরণ বা দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহারে আকাশ-পাতাল ব্যবধান তা যে কোনো সাধারণ দর্শকের নিকটেও ধরা পড়ে। এদের শৈল্পিক পূর্ণাঙ্গতা কতখানি অর্জিত হয়েছে তা বুঝা যায়। কোনটিতে ছন্দ ও সুরের ঝঙ্কার সমন্বয় সাধন হয়েছে বা ছন্দ ও সুরের বাঁধনে মূর্ছনা সৃষ্টি হয় নি তা স্থাপত্যিক দৃষ্টিভঙ্গিতে অনুধাবন করা যায়।

মাত্র ৩০ বছরের ব্যবধানে পাশাপাশি দুটি শাসন আমলে স্থাপত্য প্রযুক্তির কতখানি অবনতি ঘটেছিল তা অতি সহজেই উপলব্ধি করা যায়। তাজমহলের অনুকরণে বিবি-কা-রওজা সংক্ষিপ্ত উপাঙ্গের সংস্থাপন লক্ষ করা যায়। কিন্তু এখানে উপাঙ্গগুলোর নির্মাণ এত নিম্নমানের যে, কোনো ভাবেই একে তাজমহলের সাথে তুলনা করা যায় না। এর অসমর্থতা সাধারণ অসফলতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। এর মিনার চূড়ায় যে ছত্রীগুলো নির্মিত হয়েছে তা অত্যন্ত বেমানান ও দেখতে অশোভন এবং হাস্যকর অনুকরণ বলে মনে করা যায়।

তা ছাড়া তাজমহলে বর্গাকার সৌধের কোনাকেটে অষ্টভুজের রূপান্তর একটা সফল প্রযুক্তির বাস্তবায়ন ছিল; অথচ এখানে ঐস্থানে বর্গাকার পিলাস্টার বা দে'য়াল সংলগ্ন থাম ব্যবহার করে সৌন্দর্য সৃষ্টির নতুন একটা প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল যা উক্ত শিল্পচেতনা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়েছে। সমাধিসৌধের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য যা করা হয়েছিল তা অকার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। অঙ্গ সজ্জায়নের প্রক্রিয়ায় উন্নত বপ্রে অলঙ্করণে খিলানসমূহের খাঁজ নকশার নির্মাণ প্রণালী প্রাণহীন ও দৈন্যদশায় পতিত হয়েছে। শৈল্পিক অসফলতার চিহ্ন ছোট ও বড় গম্বুজেও দৃষ্ট হচ্ছে। গঠনের মধ্যে অবসাদগ্রস্ততা ও বলিষ্ঠহীনতা লক্ষণীয়। ফলে সমাধিসৌধের বাহ্যিক অবয়বের অঘনীভূত দৃশ্যপট এর দৈহিক সৌন্দর্য হারানোর আভাস প্রদান করছে (চিত্র নং- ৮৬)।

অবশ্য এসব দোষক্রটি সত্ত্বেও এ সমাধিসৌধের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য মিনারের নকশা পরিকল্পনায় ফুটে উঠেছে। ব্যালকনিগুলোর তরঙ্গায়িত অগ্নিশিখা তুল্যরেখা দ্বারা শোভিত করা হয়েছে এবং কেন্দ্রীয় কাঠামো সাদাসিধা ধরনের। এর কাঠামো গঠনের অংশগুলোর সুষমতায় একটির সাথে অন্যটি সুন্দরভাবে অবস্থান নিয়েছে। এ সৌধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রতীয়মান বিষয় হচ্ছে আধ্যাত্মিকতা বা পাবলৌকিক অনুভূতির সাথে মানবিক উদ্দীপনার সমন্বিত হওয়ার পরিবেশহীনতা। এখানে যা আরোপিত হয়েছিল তা কঠোব প্রকৃতির সম্রাটের নিজস্ব বৈচিত্র্যহীন শিল্পরীতি যা মোগল স্থাপত্য কারিগরবৃন্দকে অনুসরণ করে সঙ্গতিপূর্ণ স্থাপত্য উন্নয়নের প্রতি উৎসাহিত করেছিল এবং তাঁর রাজত্বকালে নিরুপায় শিল্পীরা অনুরূপ পদ্ধতির আদর্শই প্রবহমান করেছিল। এর ফলে তাজমহলের মিনাবসহ কেন্দ্রীয় প্রকোষ্ঠগুলোর সরল অবস্থানের সব স্বাভাবিক কিছু চোখে ভালো লেগে অন্তরে মিলিয়ে যেতে পারে নি। তাই বিবি-কা-বওজায় সুন্দর সমাবেশের কোনো চাতুর্যময় অভিব্যক্তি বিধৃত হয় নি।

এখানে সম্রাটের চেতনা শান্তি ও কর্মোদ্যম সমন্বিত হয়ে ওঠার মাঝে ছিল চরম একটা হতাশা, যা উক্ত সমাধিগাত্রে ফুটে উঠেছে। স্থপতিদের মনে প্রেরণার সঞ্চার করে এ অবসাদগ্রস্ততা কেটে ওঠা কি সম্ভবপর ছিল ? ঠিক শাহজাহান যেমন তাজমহলের কর্মী বাহিনীকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। কিন্তু সে প্রেরণা তখন শান্তি ও স্থিতির চেয়ে দমন ও যুদ্ধজয়েব দিকে পরিচালিত হয়েছিল।

লাহোরের বাদশাহি মসজিদ :

আওবঙ্গজেবের রাজত্বকালে ধর্মীয় (মসজিদ স্থাপত্য) স্থাপত্য নির্মাণ কার্যক্রম কিছুটা সফলতাপূর্ণ ও আশাব্যঞ্জক হয়েছিল। পি. ব্রাউন কিছুটা আশার আলো প্রত্যক্ষ করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলে মনে হয়।[১] অবশ্য এর কাবণও তিনি বিশ্লেষণ করেছেন। সপ্তম শতাব্দীতে দামেস্কে আদর্শ মসজিদ নির্মাণের যে পদ্ধতিগত রীতির সূচনা হয়েছিল এটিই মসজিদ স্থাপত্যের সনাতন আদর্শ এবং সে রীতির অনুসরণেই আওরঙ্গজেব মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। মোগল যুগে ইতিপূর্বে লাহোর ও দিল্লিভিত্তিক অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল; কিন্তু সেগুলো ঠিক মসজিদের ক্লাসিক বা আদি নকশায় নির্মিত ছিল না যতটা এ সম্রাটের সময় সম্ভব হয়েছিল। ফলত তাঁর সময়ের পূর্বে নির্মিত মসজিদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য তাঁর বিবেকে যে পীড়ার সৃষ্টি করেছিল তারই ফলে মসজিদ নির্মাণের মোগলদের গতানুগতিক ধারার মাঝে তিনি তখন অভিনবত্ব সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এ গতানুগতিকতা অতিক্রম করে যে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল এটি তাঁর ধর্মানুরাগের গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বাদশাহি মসজিদ ১৬৭৪ খ্রিস্টাব্দে লাহোরের হুজুরিবাগের পশ্চিম পার্শ্বে নির্মিত হয়েছে। পি. ব্রাউন উল্লেখ করেছেন যে, 'এ মসজিদ আওরঙ্গজেবের তোপখানার প্রধান কর্মকর্তা ফিদাই খান কোকা নির্মাণ করেছিল'।[২] ঐতিহাসিক ফরগুসনও বলেন যে, 'সম্রাটের পালক ভ্রাতা ফিদাই খান কোকা এ মসজিদ প্রকল্পটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন এবং তিনিই ছিলেন এর নির্মাতা'।[৩] এটি নির্মাণের ব্যয়ভার আওরঙ্গজেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারাশিকোহের সম্পত্তির আয় হতে বহন করা হয়েছিল এবং তিনি একে মোগলদের শেষ শ্রেষ্ঠতম কীর্তি বলে আখ্যায়িত করেছেন।

হুজুরিবাগের দিকে আগত পথ এ সুউচ্চ বেদিযুক্ত খিলানায়িত চিত্তাকর্ষক লাল ও শ্বেতমর্মর সংবলিত কাঠামো নির্মিত মসজিদে এসে শেষ হয়েছে। এ সুঠাম অটল বৃহৎ

কাঠামো সে যুগের মোগল প্রকৌশলী ও স্থপতিদের দৃঢ়প্রত্যয়যুক্ত দক্ষতার প্রতিফলন উজ্জীবিত করে রেখেছে। এ জাতীয় কীর্তিতে সাধারণত যে কয়টি মিনার সংযুক্ত হয়ে থাকে এর চেয়ে এখানে বেশি দৃষ্ট হয়। মসজিদের বহির্দেয়াল আবেষ্টনীর প্রত্যেক কোনায় একটি করে বড় এবং মসজিদ কাঠামোর জুল্লাহর প্রত্যেক কোনায় একটি করে ছোট মিনার নির্মিত হয়েছে, এরূপে ৮টি মিনার এতে স্থাপিত হয়েছে। মিনারগুলো তিন তলা উচ্চতাবিশিষ্ট।[৪]

মসজিদের অঙ্গনের এক পার্শ্ব হতে অপর পার্শ্ব ৫৩.৪৫ মি. (১৭৫ ফুট); তবে ১৮৪০ খ্রিস্টাব্দের ভূকম্পনের পর মসজিদ মিনারে যে ছত্রী ছিল এটি ভূপতিত হওয়ার ফলে নির্মাণ সমাপ্ত কালের সৌন্দর্য কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। এটি দেখতে দিল্লির জামি মসজিদের অনুরূপ মনে হলেও অপেক্ষাকৃত ছোট ও সম্মুখ দেয়াল বা ফাসাদের মাঝামাঝি স্থানে চোরকুঠরি বা কুলঙ্গি রচিত হয়েছে এবং উভয় পার্শ্বে পাঁচটি করে একইরূপ খিলান সংস্থাপিত হয়েছে (ভূমি নকশা নং- ৫৯)।
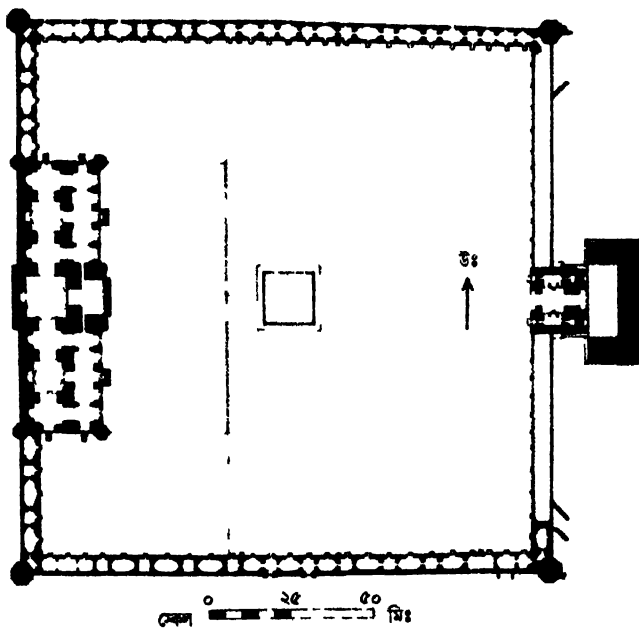
ভূমি নকশা নং-৫৯ : বাদশাহী মসজিদ, লাহোর

মসজিদ কাঠামোর প্রতি কোনায় মিনারগুলো অষ্টভুজাকার ও ছাদ তিন গম্বুজবিশিষ্ট। গম্বুজগুলো বাল্ব আকৃতির ও শুভ্র মর্মরে তৈবি। স্থাপত্যের বিকর্ষণীয় যুগ হিসেবে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকাল চিহ্নিত হলেও বিশেষ বিশেষ মসজিদের নির্মাণ উপকরণ প্রক্রিয়া ও পদ্ধতির গঠন সুঠামতা মন্থনে স্থাপত্য অনুশীলনে মোগল স্থাপত্য যুগের মধ্যাহ্ন উত্তাপই অনুভূত হয়; অপরপক্ষে নির্মিত শিল্পের অন্তর্নিহিত শক্তি, রস ও সামগ্রীর অবনতিশীল পরিস্থিতির সন্ধিক্ষণ ঘোষণা করছে। এটি মনে করা যায় যে একটি বৃক্ষের রস ধীরে ধীরে শুকিয়ে গিয়ে এটি কমনীয়তা হারিয়ে কঠিন ও নির্বাক জড় পদার্থে পরিণত হয়েছে।

এ ধরনের স্থাপত্যিক অপূর্ণতা বা ভুলভ্রান্তি জুল্লাহর বহির্দেয়াল বা ফাসাদে দৃষ্ট হয়। যদিও অঙ্গ-সংস্থাপনায় সুষমতা বা প্রয়োজনীয় উপকরণাদির বিশুদ্ধতা আনয়নে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না তথাপি চুপিসারে যে মোগল স্থাপত্য স্বরূপের জীবনীশক্তি হারিয়ে যাচ্ছিল তা আর পূরণ করা সম্ভব হয় নি। কেননা আলো-আবছায়ার রকমারিত্বে খেলার সুখকর স্নিগ্ধতা যে সার্থক স্থাপত্যকর্মের গুণগত বৈশিষ্ট্য বা লক্ষণ তা এখানে অর্জিত হয় নি (চিত্র নং- ৮৭)।

মসজিদের অঙ্গ সজ্জায়নে ও ভূষণে মোটেই সাধারণ বৈচিত্র্য আনযনের চেষ্টা ফলবতী হয় নি। মাত্রাহীন বিশুদ্ধতার লক্ষণ আনয়ন করতে গিয়ে সরলতার এমন এক পর্যায়ে গিয়ে উপনীত হয়েছে এতে কোনোরূপ আবেগের উদ্রেক করার কিছুই অবশিষ্ট ছিল না; আর সুশোভনকরণের ব্যাপারটা মনে হয় শূন্যস্থান পূরণের মতো একটা নিছক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। তবে শ্বেতমর্মরের গম্বুজ নকশা, কারুকার্য ও শিল্পকৌশল অপেক্ষাকৃত মনোমুগ্ধকর।

মসজিদ অঙ্গনের সম্মুখ হতে বা পশ্চাৎ হতে এক নজরে দেখলে সুন্দরই মনে হয়। তথাপি যেন মনে হয় এ ভালোলাগাব গভীরতা নেই; নেই কোনো কাব্যিক ছন্দময়তা। পি. ব্রাউন গম্বুজেব ক্রমবিকাশের ধারা মন্থন করে বলেছেন[৫] যে 'বাহ্ম আকৃতির গম্বুজের কটিদেশের সঙ্কোচন পদ্ধতিগত উন্নয়নে সাবলীল গতি ধারায় বাহ্যিকতা এখানে অক্ষুণ্ণ রয়েছে; কেননা গম্বুজ আকৃতির যাত্রাপথ সূচনা হয়েছিল হুমায়ূনের সমাধিসৌধের গম্বুজ হতে। এবপব আব্দুব বহিম খান-ই-খানানেব সমাধিতে, তাজমহলে, দিল্লির জামি মসজিদে এবং সর্বশেষে এখানে সে বিবর্তনেব প্রবহমান ধারা অব্যাহত থাকতে দেখা গিয়েছে'। কালক্রমে গম্বুজ কটিদেশের স্বাভাবিক বিবর্তন প্রচলিত পদ্ধতিতে পরবর্তীকালে প্রত্যক্ষ করা গেলেও আকারত্বের বিচারে সৌকর্যেব গুণে তাজমহলের গম্বুজ সবচেয়ে উৎকৃষ্ট যা চোখ জুড়ানো ও মনভুলানোর মতো।

এ মসজিদ আঙ্গিক সৌষ্ঠবতা ও অন্যান্য পরিচর্যা বিচার-বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে, পাক-ভারতের মসজিদ স্থাপত্যশিল্প লাহোরের বাদশাহি মসজিদে গিয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করেছে। মসজিদের তোবণ দ্বার যেন রাজকীয় সিংহদ্বার। এর বিশাল প্রাঙ্গণ মুসল্লির মনে বিশালতা এনে দেয়। মসজিদের আন্তঃভাগ যেন সকলকে আমন্ত্রণ জানায়। হয়তো গভীর ধর্মানুরাগ আওরঙ্গজেবকে কমপক্ষে মসজিদগুলো সুন্দরভাবে সমাপ্তকরণের অনুভূতি জাগিয়ে দিয়েছিল।

মতি মসজিদ :

সম্রাট শাহজাহান দিল্লির সাধাবণ মুসল্লিদের নামাজের জন্য দুর্গ প্রাকারেব বাইরে জামি মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। আওরঙ্গজেব দিল্লির সিংহাসনে আরোহণ করার পব দুর্গাভ্যন্তরে একটি মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তিনি ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে যে মসজিদটি নির্মাণ করেন তার নাম দেওয়া হয় মতি বা মুক্তা মসজিদ।[৬] অবশ্য এটি মুক্তা দ্বারা নির্মিত না হলেও এতে ব্যবহৃত শ্বেতমর্মর এত বিশুদ্ধ শুভ্রতার প্রতীক যে প্রদত্ত উক্ত নামের সাথে মসজিদ দেহাবযবের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে।

এস. গ্রোভারের বিবরণ থেকে জানা যায় যে তাঁর প্রাসাদ সংলগ্ন এ মসজিদ দিবারাত্র আরাধনার জন্য একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল।[৭] ঐতিহাসিক মোহাম্মদ কাজেম আলমগীর নামায় উল্লেখ করেছেন যে বাদশাহ এবাদতের জন্য দুর্গাভ্যন্তরে তাঁর শয়নকক্ষ

সংলগ্ন মনোরম অথচ ছোট একটি ব্যক্তিগত আরাধনার উপযুক্ত মসজিদ নির্মাণ করেন।[৮] বাস্তবিকপক্ষে এটি যেন মুক্তার নিটোল মনোমুগ্ধকর চোখ জুড়ানো অবয়বের চিত্রোপম করে নির্মাণ করা হয়েছিল। সত্যিই এরূপ মুসলিম মসজিদের দৃষ্টান্ত বিরল (ভূমি নকশা নং- ৬০)।
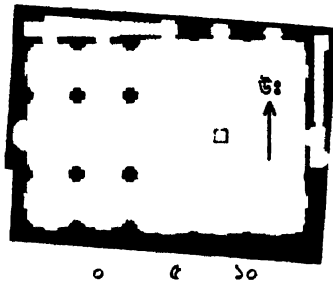
ভূমি নকশা নং-৬০ . মতি মসজিদ, দিল্লী

আয়তনের দিক হতে এটি নিতান্তই ছোট আকারের মসজিদ। এ আয়তনের মসজিদ প্রায় সবর্ত্রই দেখা যা। কিন্তু এর বিরল স্থাপত্যিক ও আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্য, হৃদয়গ্রাহী সৌন্দর্য ও মনোহারিত্ব একে অভিজাত মসজিদগুলোর অন্তর্ভুক্ত হতে সহায়তা করেছে।

মসজিদের জুল্লাহ দুসারি স্তম্ভের দ্বাবা তিন আইলে বিভক্ত; অপরপক্ষে তিনটি 'বে' মসজিদেব আইলগুলোকে ছ'টি বর্গাকারে বিভাজিত করেছে। কেন্দ্রীয় 'বে'-টি প্রশস্ত এবং এর পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে মিহরাব। মসজিদের ছাদ তিনটি কন্দাকৃতির শিরাল গম্বুজে পরিবৃত। গম্বুজগুলো পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম, কলস এবং মোচাকার শীর্ষদণ্ড দ্বারা পরিশোভিত (চিত্র নং- ৮৮)।

মসজিদের কেন্দ্রীয় নেভটি বাংলা স্থাপত্যের বক্র কারনিসের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত বহন করছে। এ সম্পর্কে জি. মিচেল বলেছেন "This mosque is characterized by the predominance of a sinuous contour illustrated by the curved Bengali cornice"[৯]। মসজিদের বপ্র পেট্রাডুরা অলঙ্করণে খচিত এবং ছাঁইচ বন্ধনী দ্বারা প্রক্ষিপ্তারে নির্মিত।

মসজিদের সম্মুখভাগ তিনটি খাঁজ খিলানের দ্বারা সাহনের দিকে উন্মুক্ত। প্রতিটি খিলানের তলদেশ ন'টি খাঁজ দ্বারা শোভিত। সম্রাট আওরঙ্গজেবের কঠোরতাময় মানসিকতায় কীভাবে এত শিল্পচাতুর্য প্রয়োগে অনুরূপ অনবদ্য স্থাপত্য সৃষ্টির সুযোগ হয়েছিল তা বিস্ময়ের ব্যাপার।

এ মসজিদ বাহ্যিক সৌন্দর্যে যে আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তাই এর নামকরণের যথার্থ সার্থকতা দান করেছে। এর গাত্রে যে উচ্চ মূল্যের কথা লিপিবদ্ধ হয়েছে তা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। এ মসজিদ সম্পর্কে ঐতিহাসিক ফারগুসন বলেছেন যে 'আমি কোনোখানেই কদাচ এরূপ চিরন্তন সত্তায় অনুপম ও খাঁটি সৌন্দর্যময় স্থাপত্য কাঠামো দেখি নি। এটি স্বর্গের গৌরবান্বিত হর্ম্য যা একটি অতি উজ্জ্বল ও প্রভাময় মুক্তা হতে অবয়ব প্রাপ্তি ঘটেছে। মানব সভ্যতার ধারায় পৃথিবীর কখনো কোথাও এরূপ একটি খাঁটি এবং সম্পূর্ণরূপে মর্মর দ্বারা মসজিদ নির্মিত হয় নি যা এর মতো নিটোল, মসৃণ ও উজ্জ্বলতার প্রাণবন্তময় আবেদন বলে অভিহিত ও অভিনন্দিত।'[১০]

বেনারস শহরের মসজিদ :

উত্তর ভারতের উত্তর প্রদেশের হিন্দু অধ্যুষিত বেনারস শহরে মুসলিম এবাদতখানা বা মসজিদের অবস্থান বিস্ময়ের উদ্রেক করে। পৌত্তলিকতার কেন্দ্রভূমিতে ইসলাম ধর্মীয় পাদপীঠ তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়ে তা আজো টিকে রয়েছে। মসজিদের ৬০.৯৫ মি. (২০০ ফুট) সুউচ্চ মিনারটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এটি প্রায় হিন্দু তীর্থযাত্রীদের স্নানঘাটের পার্শ্বেই নির্মিত হয়েছিল।

স্থাপত্য দৃষ্টিভঙ্গিতে এর তেমন কোনো মৌলিক উপাদানের চিহ্ন বহন করে না বা উৎকৃষ্টতার পরিচয় পাওয়া যায় না। এটি মুত্রার (Muttra) মসজিদ নকশানুরূপে নির্মিত হলেও এতে সে মৌলিকত্ব দৃষ্ট হয় না তবে এটি নির্মাণে দুটি আলাদা পদ্ধতির সংমিশ্রণ ঘটেছে—একটি হচ্ছে কাষ্ঠ ও টালির কাজ সংবলিত পাঞ্জাবি পদ্ধতি যা লাহোরের ওয়াজির খান মসজিদে ব্যবহৃত হয়েছে এবং অপরটি হচ্ছে পরবর্তী মোগল মসজিদ স্থাপত্যের আদর্শানুরূপ কার্যক্রম। পি. ব্রাউন এ মসজিদকে প্রকারান্তরে বিভিন্ন পদ্ধতির পরিণতির মিশ্রিত রূপের সমাহার বলে অভিহিত করেছেন।[১১]

এটি সুউচ্চ বেদি বা মঞ্চের ওপর প্রতিষ্ঠিত। খিলানায়িত পথ এবং তার সাথে হয়তো পরবর্তীকালে দোকানঘর জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মসজিদের পূর্ব পার্শ্বে সুউচ্চ তোরণ পথ এর সংলগ্ন ওপর দিকে লম্বা বারান্দা বা দরদালান (gallery) টালির খোপ খোপ প্যানেল দ্বারা সজ্জিত। রঙিন টালির কারণে এটি জীবন্ত ও উজ্জ্বলরূপ ধারণ করেছে। সাহনের প্রত্যেক কোনা হতে দ্বাদশ পার্শ্ববিশিষ্ট মিনার পাঁচ ধাপে সমাপ্ত হয়ে উন্মুক্ত আকাশের পানে বিস্তার লাভ করে রয়েছে। মিনারের উপরিভাগে ছত্রী সংস্থাপিত হয়েছে। মসজিদের নকশা পরিকল্পনার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করলে অনুভূত হয় যে মোগল স্থাপত্য উৎকর্ষতার দিন ফুরিয়ে আসলেও তখনো এর অতীত ঐতিহ্য সুষমা কিছুটা টিকে রয়েছে; বিশেষভাবে জুল্লাহর ফাসাদের কিণার বা বর্ডারে যে বৈচিত্র্যময় রঙের প্রয়োগ ঘটেছে তা অত্যন্ত মনোজ্ঞ ও ঐশ্বর্যময়।

১৭০৭ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু হলে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার যূপকাষ্ঠে মোগল সাম্রাজ্য দ্রুত ধ্বংসের পথে এগিয়ে যায় এবং তার প্রভাব স্থাপত্য ও কলাশিল্পের ওপর প্রভূত অবনতির কালোটিকা চিহ্নিত করেছিল। এ প্রসঙ্গে গ্রোভার বলেছেন, "......sap drying up and the architecture becoming stiff and soulless".[১২] পরবর্তীকালে মোগল স্থাপত্যচর্চার ধারা কার্যক্রম থেমে গেলেও মোগল স্থাপত্য পদ্ধতির অনুসরণে অন্যত্র স্থাপত্যচর্চা প্রায় ২০০ বছর অব্যাহত ছিল। তবে এতে মূল আদর্শ হতে অনেকটা সরে এসেছিল। এ সময় নির্মিত কীর্তিগুলো প্রায় সবগুলো পতনোম্মুখ সাম্রাজ্যের বিষাদময় ছায়া চিত্রায়িত করছে।

মোগল স্থাপত্য আদর্শ অনুসরণে পরবর্তী স্থাপত্য কার্যক্রম :

রাজনৈতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন স্থাপত্যকীর্তি নির্মাণের পাদপীঠের পরিবর্তন আনয়ন করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় ক্ষমতার উৎস দিল্লি হতে লক্ষ্ণৌ শহরে স্থানান্তরিত হওয়াব সাথে সাথে স্থাপত্য কলাকৃষ্টির চর্চা সেখানে দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। অযোধ্যার নবাবগণ পতনোন্মুখ মোগল সাম্রাজ্যের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হয়ে স্থাপত্য অনুশীলনে মনোনিবেশ করেন। অবশ্য অযোধ্যার প্রথম নবাবের ভ্রাতুষ্পুত্র সফদার জঙের (১৭৩৯-৫৩ খ্রি.) সমাধিসৌধ দিল্লিতে হুমায়ূনের সমাধিসৌধ সংলগ্ন নির্মিত হওয়ার ঘটনা

একটি ব্যতিক্রম। এর পর আর কোনো উল্লেখযোগ্য মুসলিম স্থাপত্য নিদর্শন দিল্লির আশপাশে নির্মিত হয় নি।

প্রায় ২০০ বছর ব্যবধানে হুমায়ূনের সমাধিসৌধের গা ঘেঁষে যা নির্মিত হয়েছিল তা স্থাপত্য কলাকৌশলের দৃষ্টিকোণ হতে বিশেষ কৌতূহলপূর্ণ। কেননা এর একটি মোগল স্থাপত্যের প্রাথমিক সূচনা নিদর্শক এবং অপরটি সর্বশেষ ও চূড়ান্ত পরিণতি চিহ্নিত করছে। নবাব সফদার জঙের সমাধিসৌধের আকার ও নির্মাণ উপকরণ মোগলদের চেয়ে উৎকৃষ্টমানের না হলেও নিম্নমানের ছিল না। এটি মোগলদের সমাধিসৌধ নির্মাণের মতোই বিরাট উদ্যানযুক্ত স্থানের মধ্যবর্তী অবস্থান নিয়েই রচিত হয়েছিল। তবে কোনোভাবেই মোগল স্থাপত্য আদর্শের প্রবহমান ধারার মান অর্জিত হয় নি।

সমাধিটি ৩.০৫ মি. (১০ ফুট) উচ্চতাবিশিষ্ট বেদির ওপর দুতলা উচ্চতায় নির্মিত হয়েছে এবং সৌধের এ ঢিবির প্রতি পার্শ্ব ৩৩.৫৫ মি. (১১০ ফুট)। তবে মূল সৌধের প্রতি পার্শ্ব ১৮.৩০ মি. (৬০ ফুট)। এর শীর্ষে গোলাকার গম্বুজ ধারণ করে রয়েছে। এ কীর্তির স্থাপত্যিক উপাদানগুলো সবই এ জাতীয় মোগল কীর্তিগুলোর মতোই প্রত্যয় করা যায় যেমন বৃহৎ ও ক্ষুদ্র খিলানায়তন, ইরানি আকারের কুলঙ্গি বা চোরকুঠরি, চূড়া, ছত্রী, মিনার, কেন্দ্রীয় গম্বুজ ইত্যাদি।

আপাত দৃষ্টিতে অংশ গঠনের উপকরণগুলো অভিন্ন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু স্থাপত্যিক কলাকৌশলের সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায় যে মোগল পদ্ধতির মূলধারা হতে ধীরে ধীরে কিছুটা দূরে সরে এসেছিল। এখানে কারুকার্যের ও গঠন প্রক্রিয়ার যে সরলতা ছিল এটি অপ্রয়োজনীয়ভাবে জটিলতার দিকে টেনে আনা হয়েছে; ফলে বিভিন্ন উপাঙ্গের সুষমতা ও সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গিয়েছে। শিল্পের মাঝে নির্মলতার যে সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় তা এখানে হারিয়ে গিয়েছে। স্থাপত্য সৌধের অংশ গঠনের সুষমতার ভারসাম্য ও অংশ বণ্টনের অনুপাত সঠিক হলে তা চোখকে পীড়া দেয় না বরং তা স্নিগ্ধ ও শীতল অনুভূতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। কেননা স্থাপত্য কাঠামো এখানে ক্ষীণকায় হয়ে কেবল উর্ধ্বে ধাবিত হয়েছে। কাঠামোর ভিত্তিভূমির সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নির্ভুলভাবে স্থাপত্য কাঠামো সম্প্রসারিত হয় নি। বাস্তবে দেখা গিয়েছে যে হঠাৎ ছন্দপতন ঘটার ফলে যদিও মোগল যুগের দুটি আদর্শ কীর্তি হুমায়ূনের সমাধিসৌধ ও তাজমহলের মতো রূপ প্রদানের চেষ্টা করা হয়েছিল; কিন্তু এগুলোর মূলগত বৈশিষ্ট্য ও আঙ্গিকপূর্ণতা এ সমাধিতে আনয়ন করা সম্ভব হয় নি। কোনোভাবেই স্থাপত্যিক আদর্শের শর্তগুলো এখানে অভিসঞ্চায়ন হয়ে ওঠে নি।

এটি লক্ষ করা যায় যে মোগল স্থাপত্যধারার অনুশীলন তাদের দ্বারা না হয়ে অন্য এক বংশের নতুন শাসকদের হাতে নির্মাণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে। এরা হচ্ছে অযোধ্যার নবাব বংশ। এদের পৃষ্ঠপোষকতায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সুদীর্ঘ প্রায় ২০০ বছর যাবৎ স্থাপত্য কার্যক্রম সক্রিয় ছিল। এ পর্যায়ে তারাই ভারতে জৌলুসময় মুসলিম স্থাপত্যধারার সমাপ্তি পট রচনা করেছিল।

মোগল স্থাপত্যকলার ক্রান্তিলগ্নে এটি যে রূপ পরিগ্রহ করেছিল তার পরিপূর্ণ প্রকাশ লক্ষ্ণৌ শহরকে ঘিরে বিদ্যমান। তখন হতে প্রায় ১০০ বছরের মধ্যে ভারতের আর কোনো শহরে নতুন কোনো স্থাপত্য ইমারত গড়ে ওঠে নি যা এ শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এ সময়ে নির্মিত ধর্মীয় ও লৌকিক স্থাপত্যগুলো পরখ করে দেখলে নিরাশ ও হতাশার প্রতিচ্ছবি ছাড়া কিছুই প্রতীয়মান হয় না।

এ সময়ে নির্মিত ইমারতগুলোর মাঝে উদ্ভাবনী কোনো প্রয়াস তো ছিলই না বরং বুদ্ধিহীনতার গতানুগতিক প্রবাহকেই কোনোক্রমে জিইয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছিল মাত্র। অবশ্য এ সময়ে দু-একটি স্থাপত্যকর্ম মনোজ্ঞ এবং অভিষ্ঠ সাধনার্থে বিশাল ও চমৎকার জাঁকজমকে পরিপূর্ণ করা হয়েছিল। কিন্তু এগুলো পদ্ধতির অবনতিশীলতা ঢেকে রাখতে পারে নি। সৃজনশীল স্থাপত্য বিনির্মাণে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রেরণার উৎসমুখ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থাপত্য অনুশীলন মুখ থুবড়িয়ে স্পন্দনহীন হয়ে পড়েছিল।

এরূপ অধঃপতিত পরিস্থিতিতে প্রগতিশীল মৌলিক সৃষ্টি সুযোগ হয় না। এ প্রসঙ্গে পি. ব্রাউন উল্লেখ করেছেন[১৩] 'মোগল ভারতীয় স্থাপত্যকলা একসময় এমন একটা বিন্দুতে উপনীত হতে পেরেছিল যে নির্মাণ সমস্যা সংক্রান্ত সকল প্রতিপাদ্য বিষয়গুলোর সমাধান অর্জিত হয়েছিল এবং যখন পদ্ধতির প্রধান প্রধান অপরিহার্য অংশ ও উপাদানগুলো যথাযথরূপে সংশোধিত হতে পেরেছিল তখন পুনঃউন্নয়নে আর কোনো সুযোগ ছিল না'। এক কথায় এটি কেবলমাত্র এর পরিপূর্ণ বিকাশ মাত্রার চরম শিখরে আরোহণ করে নি বরং সে মাত্রা অতিক্রম করে বহুদূরে পৌছে গিয়েছিল। অন্যপক্ষে এ অবস্থায় পূর্বের অনুসৃত পদ্ধতিগুলোর খাপছাড়াভাবে অনুশীলিত হতে থাকে। কেননা সাংস্কৃতিক জীবনে সূক্ষ্মানুভূতির প্রভাবময় পরিবেশ পতনোন্মুখ জাতির জীবনে গুরুভাররূপে অনুভূত হতে থাকে এবং চরম বিন্দুতে পৌছে পুনরায় সেখান হতে নিচের দিকে নামতে থাকে। শাহজাহানের সময় মোগল স্থাপত্যের যে উৎকর্ষ সাধিত হয়েছিল তা আওরঙ্গজেবের যুগে ক্রম ক্ষয়ধারায় রূপান্তরিত হয়। এ সময় স্থাপত্য সাধনায় উন্নয়নেব প্রয়োজনীয় পথ রুদ্ধ হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু গতানুগতিক নির্মাণ ধারা সক্রিয় হয়ে উঠেছিল।

মোগল স্থাপত্য পদ্ধতির শেষ অধ্যায়ে দুটি সংক্ষিপ্ত যুগের মাঝে সীমাবদ্ধ হয়েছে— প্রথমটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং অপরটি উনবিংশ শতাব্দীতে বৈদেশিক প্রভাবপুষ্ট সাংস্কৃতিক নবউন্মেষের মাঝে। প্রথম স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যেব মাঝে দেখা যায় পুরোনো পতনোন্মুখ স্বাভাবিক অভিব্যক্তিহীন স্থাপত্য অনুশীলনের পরিবেশকে চালু রাখার আপ্রাণ চেষ্টা, আর দ্বিতীয়টিতে দেখা যায় যে ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্য নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ইউরোপীয় আদর্শের দিকে মোড় নিতে শুরু করেছে।

এ অধ্যায়ের প্রথম যুগে ১৭৭৫ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নবাব আসাফ-উদ-দৌলার স্থাপত্যানুরাগের পরাকাষ্ঠায় অনেকগুলো উল্লেখযোগ্য ইমারত নির্মিত। বলা বাহুল্য এর প্রায় সবগুলো লক্ষ্ণৌ শহরে নির্মিত হয়েছিল। এ স্থাপত্যকর্মগুলো জাঁকজমকপূর্ণ ছিল। এদের মধ্যে ছিল মসজিদসহ বৃহৎ তোরণ সংবলিত ইমামবাড়া। এ ইমারতগুলোর অঙ্গন ও ঐশ্বর্যশালী তোরণপথ অনন্যসাধারণ স্থাপত্য সৌন্দর্যে ভরপুর হয়েছে। তোরণ নির্মাণে সুষমতা, উপাঙ্গে সৌষ্ঠবতা ও চমৎকারিত্ব এনে দিয়েছে। দুটি তোরণের মধ্য দিয়ে মসজিদ ও ইমামবাড়ার অঙ্গনে প্রবেশ করা যায়। দক্ষিণ তোরণটাই প্রকৃতপক্ষে প্রশস্ত প্রবেশপথ। অপর পার্শ্বের তোরণটি দুটি তোরণের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য নির্মিত হয়েছে। দক্ষিণ তোরণের সম্মুখে ঘেরা অঙ্গন যা ত্রিপাল্লাযুক্ত দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। এর মধ্য দিয়ে প্রধান অঙ্গনে ঢুকেই অঙ্গনের দক্ষিণ সীমান্তে ইমামবাড়া এবং এর সাথে পশ্চিম পার্শ্বে মসজিদ অবস্থিত।

প্রতি বছর মহরম উপলক্ষে এখানে জনসমাবেশ হয়ে থাকে। এটি একটি একতলা বিশিষ্ট অট্টালিকা। এর কোনো স্থাপত্যিক দাম্ভিকতা নেই, তবে বিশেষভাবে এর অভ্যন্তরীণ নির্মাণ কাজের চমৎকার বৈশিষ্ট্য ও কাঠামোর বিরাটত্ব ছাড়া। এর অভ্যন্তরভাগ একটি বড়

আকারের ধনুকাকৃতি ছাদ বা খিলানযুক্ত ছাদ (vaulted) সংবলিত মিলনায়তন। এটি আয়তনে ৪৮.৮০ মি. (১৬০ ফুট) × ১৬.১৫ মি. (৫৩ ফুট) × ১৫.২৫ মি. (৫০ ফুট) বিশিষ্ট। এটি যদিও এ জাতীয় ইমারতের মধ্যে বৃহত্তম, কিন্তু এর গাত্রের নকশালঙ্কার মোটেই আকর্ষণীয়ভাবে করা হয় নি।

অন্যপক্ষে ইমারত কমপ্লেক্সের কোনায় অবস্থিত মসজিদটির স্থাপত্যিক অবয়ব মনোরম তবে মাত্রাতিরিক্ত অলঙ্করণ এর সৌন্দর্য খর্ব করেছে। বলা বাহুল্য নিকট হতে পর্যবেক্ষণ করলে এটি প্রতীয়মান হয় যে অতিরিক্ত অলঙ্করণ ও সজ্জায়ন এবং বিশেষ আনুষঙ্গিক অলঙ্করণ দ্রব্যাদি প্রয়োগে এর সমস্ত কাঠামো যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে এসেছে। বিশেষত উন্নত বপ্রের উপরে ছিদ্রযুক্ত খিলানশ্রেণী স্থাপত্যিক প্রাচুর্যে সমৃদ্ধ করে নির্মিত হয়েছে। এটি উল্লেখ্য যে এ ধরনের প্রয়োগ লক্ষ্ণৌ এর স্থাপত্য ইমারতের প্রায় সর্বত্রই দৃষ্ট হয়েছে এবং এটি লক্ষ্ণৌ স্থাপত্যের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এর সাথে উল্লেখ করা যেতে পারে যে অনুপ্রাণিত স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন পত্রযুক্ত স্ফীত অলঙ্করণ ও অনুভূতিহীনতা গম্বুজের আকারত্বে দৃষ্ট হয়। বলা বাহুল্য এগুলো সব পুষ্পময় প্রকৃতির অলঙ্করণ রীতি বা পদ্ধতিতে সমাপ্ত হয়েছে যা প্রকৃতপক্ষে জাতীয় জীবনীশক্তির মাঝে স্থবিরতার সুরধ্বনি প্রকাশ করছে।

ইমামবাড়ার বৃহৎ তোরণ অলঙ্করণেও প্রতীয়মান হয় যে কারিগরবৃন্দ বিখ্যাত তোরণরূপী দরজা বা তুর্কি দরজার অনুরূপ প্রক্রিয়ায় তোবণের বাহ্যিক অবয়ব সজ্জায়ন করেছিল। এ কাঠামোকে কিছু বৃহৎ আকার বিশিষ্টতায় সুবিন্যস্ত ও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণীয় ও চিত্তাকর্ষক করে রূপদান করা হয়েছিল। যেরূপ ইস্তাম্বুলেব বিখ্যাত সাবলাইম পোর্ট (Sublime Porte) নামীয় স্থাপত্য কাঠামোকে নির্মাণ করা হয়েছিল। এমনকি বাস্তবে তারা এব চেয়ে আরো গরিমাময় কবে গড়তে চাইলেও পরিণামে তা একটা বৃথাড়ম্বরযুক্ত বিস্বাদময় বিদঘুটে ধরনেব জগাখিচুড়িতে পবিণত হয়েছিল। অন্যপক্ষে একে কোনোভাবেই আকবরের নির্মিত ফতেপুর সিক্রিতে অবস্থিত বুলন্দ দরজার সাথে তুলনা করা যায় না। কেননা ফতেপুর সিক্রির বুলন্দ দরজা এ জাতীয় কাঠামোর মধ্যে অনন্যসাধারণ।

এ প্রসঙ্গে পি. ব্রাউন মন্তব্য করেছেন[১৪], 'লক্ষ্ণৌ প্রকল্পে এর উত্তরাধিকারিতার কতখানি সংযত গভীরতার রেশ কার্যকব হতে পেরেছিল তা বলা মুশকিল, এসব স্থাপত্যকর্মের নকশা পরিকল্পনায় প্রতীয়মান হয় যে কেবল বাসনা চরিতার্থ করার নিমিত্তে কোথাও স্থাপত্যরীতির সীমারেখা লঙ্ঘন করে অপচয়ের দিকে মোড় নিয়েছে, আবার অন্যত্র পরস্পরবিরোধী চাঞ্চল্যপূর্ণ কর্মের নজির সৃষ্টি করেছে'। বলা বাহুল্য এসব কাজের পৃষ্ঠপোষকরা সংস্কৃতিসুলভ পবিমার্জিত রুচিশীলতা হতে সামগ্রিকভাবে বর্জিত ছিল। এ ইমারত এবং এ জাতীয় সৌধে প্রায় একই প্রকারের বৈশিষ্ট্য রাজধানী অযোধ্যায় প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়।

এদের বাইরের ভাসা ভাসা দৃশ্যও রুচিশীল চটকদার শোভা স্থাপত্যের মাঝে উচ্চাকাঙ্ক্ষী চিহ্ন সৃষ্টির ভান করেছে মাত্র, যা তাদের দরবারি জীবনের অবনতিশীল অবস্থাই প্রত্যক্ষ করেছে। বলা বাহুল্য এসব স্থাপত্যকর্মে ব্যবহৃত পদ্ধতিতে কোনো আধ্যাত্মিক মূল্যবোধ বিধৃত হয় নি এবং অধিকাংশ ইমারত প্রতিদ্বন্দ্বীর সাথে পাল্লা দিয়ে হঠাৎ তাড়াহুড়া করে নির্মিত হয়েছিল। সে সময় শাসকরা প্রয়োজনীয় কার্যাদি পরিত্যাগ করে নিভৃতে ইন্দ্রিয়ের বশীভূত হয়ে বিলাসপূর্ণ জীবনযাপনে কর্মশক্তির অপব্যয় করে অতীব ব্যয়বহুল ও মহার্ঘ্য অথচ জাঁকালো বড়াইপূর্ণ প্রাসাদতুল্য আবাস নির্মাণে ব্যস্ত হয়েছিল।

মোগল স্থাপত্য অনুসরণে সংক্ষিপ্ত যুগের দ্বিতীয় বা সর্বশেষ যুগ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সূচিত হয়েছিল। এর প্রধান অনুপ্রেরণা এসেছিল নতুন একটা উৎস হতে। গত ঊনবিংশ শতাব্দীব শেষ কয়েক বছরে এর অনুসরণে ও অবলম্বনে লক্ষ্ণৌ শহরে বৃহৎ ও অতিদাম্ভিক স্থাপত্য নির্মাণ কাজ ধীরে ধীরে প্রাণবন্ত হয়ে উঠছিল যা কনস্টানশিয়া (Constantia) নামে পরিচিত। এটি এখন মার্টিনারি স্কুল হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মূলত এটি মেজর জেনারেল ক্লড মার্টিনের (major general clude martin) বাসগৃহ ছিল। তিনি একজন ফরাসি সেনানী অযোধ্যার নবাবের অধীনে কর্মরত ছিলেন। এর নকশা পরিকল্পনা মার্জিন (margin) নামক স্থপতির দ্বারা প্রস্তুত হয়েছিল। তিনি এ পদ্ধতির নামকবণ কবেছিলেন ডিবেসড প্যালাডিয়ান পদ্ধতি (debased palladian style)। অবশ্য এ ইমারতের কাঠামো গঠনে ক্ষমতা ও বৈশিষ্ট্যময়তার চিহ্ন ধারণ করেছে। উত্তর ভারতে ইউরোপীয় আদর্শে প্রভাবিত এটিই প্রথম স্থাপত্যকর্ম।

কলা ও স্থাপত্যশিল্প গড়ে ওঠার প্রভাবময় দৃষ্টিভঙ্গিতে এ নব অবদান নেহায়েত কম প্রেবণার উৎসরূপে পরবর্তী স্থাপত্য কাঠামোগুলোতে বহিঃপ্রকাশিত হয় নি; কেননা এতে যে স্থাপত্য আদর্শ মুদ্রিত হয়েছিল তা অত্র অঞ্চলে স্থাপত্য ইমারতগুলোর পদ্ধতিকে প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবপুষ্ট কবতে সক্ষম হয়েছিল এবং নব স্থাপত্যকর্ম প্রবাহ সাবলীল গতি লাভ করতে পেরেছিল।

এ নবযাত্রা অতীতকে অস্বীকার করে নয় বরং পুরোনো স্থাপত্য আদর্শের মৌলিক উপাদানের মধ্যে নতুন উপাদানেব অনুপ্রবেশ এবং উভয় মিলে স্থাপত্য শিল্পের নতুন চর্চা ক্ষেত্রে প্রস্তুত করতে পেরেছিল। এ সঙ্কর স্থাপত্য পদ্ধতির স্থাপত্যকে লক্ষ্ণৌ স্থাপত্য বললে ভুল হবে না। এটি শুধু অযোধ্যার নবাব তাদের ইমারত নির্মাণে প্রয়োগ করে নি, পববর্তীকালেও এব ব্যাপক ব্যবহার প্রত্যক্ষ করা যায়। এ নবস্থাপত্য পল্লবায়নে অট্টালিকার সম্মুখভাগেব উপরিদেশে ত্রিভুজাকার ত্রিকোণগঠন, করিন্থিয় পদ্ধতিব স্তম্ভশীর্ষ, রোমান গোলাকৃতি খিলান, আদি মোগল পদ্ধতির বাঁশির ছেঁদার ন্যায় খাঁজকাটা গম্বুজ, বন্ধনীর ন্যায় বক্র খিলানশ্রেণী, আরব্য নকশা ও পত্রের নানাবিধ ভাঁজ নকশা এবং অনুরূপ উপাদানেব সমাবেশে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য (western+easterh forms) আদর্শের মিশ্রণে মাঝামাঝি একটা জগাখিচুড়ি স্থাপত্য সৃষ্টি হয়েছিল। উপকরণে এ ভেজাল মিশ্রণের ফলে স্থাপত্য কাঠামোর যে অবয়ব প্রাপ্তি ঘটেছিল একে পি. ব্রাউন ষোড়শ শতাব্দীর ইংরেজি স্থাপত্যের গথিক্ উপকরণ সংযোজনের পরবর্তী যুগের সাথে তুলনা করেছেন।

শিল্পকলা ও স্থাপত্য অনুশীলনেব ইতিহাসে একটা প্রচলিত রীতি হল এক আদর্শ ও পদ্ধতিব সাথে অন্য আদর্শ ও পদ্ধতির সংমিশ্রণে নতুন সৃষ্টির অবকাশ; তবে সর্বক্ষেত্রে এটি সার্থকতা লাভ করেছে এমনও নয়। কিন্তু অনুরাগময় অনুশীলন অবশেষে সমৃদ্ধি এনে দিয়ে থাকে, এটিই নতুন কিছু সৃষ্টি করায় এবং এ অনুশীলন মানব সভ্যতার গতিপথকে সক্রিয় করে রেখেছে। এ নবস্থাপত্য পদ্ধতির অনুশীলনে যেসব স্থাপত্য ইমারত নির্মিত হয়েছিল এদের প্রায় সবগুলো ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক স্থাপত্য। তন্মধ্যে বড় ও ছোট ছাত্রমঞ্জিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ দুটি ইমারত ১৮২৭ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৮৩৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে নবাব নাজির উদ্দিন হায়দার কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। এ ছাড়া নবাব ওয়াজীর আলী শাহের (১৮৪৭-১৮৫৬ খ্রি.) রাজত্বকালে সেকেন্দ্রাবাগ তোবণ দরজা এবং কাইজার বাগের চৌলাখা দরজা নির্মিত হয়েছিল। এগুলো ইতালীয় পদ্ধতিতে নির্মিত হয়েছে এবং এতে এ দেশীয় প্রভাব সামান্যই দেখা যায়। এটি ধারণা করা যায় যে পাশ্চাত্য

আদর্শের অনুপ্রেরণায় রওশনওয়ালী কুঠি হযরতগঞ্জের বেগম কুঠি অনুকরণে নির্মিত হয়েছিল।

অন্যপক্ষে নবাব মোহাম্মদ আদিল শাহ ১৮৩৭-৪২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে একটি জামি মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেছিল যা ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দের দিকে সমাপ্ত হয়েছিল। এটি মোগল স্থাপত্য আদর্শ অনুসরণে অযোধ্যায় সর্বশেষ স্থাপত্যকর্ম।

মোগল সাম্রাজ্য পৃথিবীর অন্যান্য সাম্রাজ্যের মতোই একদিন ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁরা স্থাপত্য অনুশীলনের যে চিহ্ন রেখে গেছেন তা বিশ্ব-স্থাপত্য ইতিহাসের ভাণ্ডারকে করেছে সমৃদ্ধ। তাঁরা অভাবনীয় সৃজনশীল মনীষা দ্বারা ইমারতের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে সৌকুমার্য, মননশীল, চিত্তাকর্ষক, বিস্ময়কর, হৃদয়গ্রাহী ও নয়নাভিরাম দৃশ্যের যে পরিপুষ্ট শৈল্পিক নজির স্থাপন করেছে তার দৃষ্টান্ত শুধু ভারতের মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে নয় সারা বিশ্বের মুসলিম স্থাপত্যের ইতিহাসে বিরল।

টীকা ও তথ্যনির্দেশ :

১. পি. ব্রাউন, *ইন্ডিয়ান আর্কিটেকচাব* (ইসলামিক পিবিযড), দিল্লি, ১৯৭৫, পৃ.
২. ডব্লিউ হেগ, *দি ক্যামব্রিজ হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া*, ভলিউম-৪, ক্যামব্রিজ, ১৯৩৭, ভল্যুম-২ পৃ. ৩২১।
৩. জে. ফারগুসন, *হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া এন্ড ইস্টার্ন আর্কিটেকচাব*, লন্ডন, ১৯১০, পৃ.
৪. এ মসজিদেব মিনাব সম্পর্কে জি. মিচেল বলেছেন, " the tall framing minarets at the corners have been replaced here by octagonal turrets crowned by kiosks and set at each of the four corners of the prayer hall, rendering it a free-standing structure separate from the arcades enclosing the courtyard Tall minarets are placed at each corner of the courtyard", দেখুন ঃ *আর্কিটেকচাব অব দি ইসলামিক ওয়ার্ল্ড*, লন্ডন, ২০০০, পৃ ২৭৪।
৫. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, ১১১।
৬. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, ১১২।
৭. এস. গ্রোভাব, *দি আর্কিটেকচাব অব ইন্ডিয়া ইসলামিক* (৭২৭-১৭০৭), দিল্লি, ১৯৮১, পৃ. ২১৯।
৮. উদ্ধৃতিব জন্য দেখুন : পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, ১১২।
৯. জে. মিচেল, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২৭০।
১০. জে. ফাবগুসন, *পূর্বোক্ত*, পৃ ৩২০
১১.পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, ১১২।
১২.এস. গ্রোভাব, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ২২১।
১৩. পি. ব্রাউন, *পূর্বোক্ত*, ১১৩।
১৪. *তদেব*, পৃ. ১১৪।
১৫. পি ব্রাউন, তদেব, পৃ. ১১৪

স্থাপত্য পরিভাষা

A

Abacus	স্তম্ভ শীর্ষস্থ পীঠিকা বিশেষ
Abstract	নির্বস্তুক, বিমূর্ত
Acanthus leaf	অ্যাকান্থাস পত্র
Adjacent room	সংলগ্ন কক্ষ
Aisle	আইল, খিলানপথ, স্তম্ভপথ, বালত (আরবি)
Alcove	চোবকুঠরি
Apex	শীর্ষ, চূড়া
Apodyterium	বেশ পরিবর্তন কক্ষ
Arabesque	আববা নকশা
Arcade	খিলানসারি, খিলানশ্রেণী
Archaeology	প্রত্নতত্ত্ব
Architect	স্থপতি, স্থাপত্যবিদ
Architecture	স্থাপত্য, স্থাপত্যশিল্প
Architrave	স্তম্ভ শীর্ষস্থ প্রধান কড়িকাঠ
Arrow-silt	শরছিদ্র
Art	কলা, শিল্প
Art Gallery	চিত্রশালা
Ashlar	বর্গাকার সুষম প্রস্তরখণ্ড
Audience hall	হলকক্ষ, সভাকক্ষ, দববার হল
Axis	অক্ষ

B

Bath	স্নানাগার, হাম্মাম (আববি), গোসলখানা (পাবসি)
Battlemented parapet	সামরিক প্যাবাপিট
Bay	খিলানপথ, স্তম্ভ, উলম্ব খিলানপথ
Bayt	বাইত (আর্বি)
Beam	তীব, সর্দল
Blind arch	বদ্ধ খিলান
Block	প্রস্তরখণ্ড, কাষ্ঠখণ্ড

Bond	গাঁথুনি
Bonding stone	বন্ধনী প্রস্তর
Border	প্রান্ত, পাড়, ধার সীমা
Bracket	ব্র্যাকেট, ঠেকনা, ঠেস
Brick	ইট, ইষ্টক
Builder	নির্মাতা, কারিগর
Burnt Brick	অগ্নি সেঁকা ইট
Buttress	পোস্তা, বুরুজ ঠেকনা, ঠেস, আলম্ব

C

Calidarium	উষ্ণস্নানকক্ষ
Canopy	চন্দ্রাতপ, ছত্রী
Capital	স্তম্ভশীর্ষ
Carving	খোদাইকার্য
Cause way	জাঙ্গাল
Ceiling	ছাদ, ছাদতল
Cenotaph	নকল কবর ফলক
Church	গির্জা
Circular	বৃত্তাকার, গোলাকৃতি গোলাকার, গোলায়িত
Circumference	পরিধি
Clerestory	ক্লেরেস্টরি
Column	স্তম্ভ, থাম
Concave	অবতল
Construction	গঠন, নির্মাণ
Conventional	প্রথাগত
Convex	উত্তল
Corbel	কর্বেল, ক্রমপ্রলম্বনরীতি
Corinthian	করিন্থীয়
Cornice	কারনিস
Cornucopia	প্রাচুর্য-শৃঙ্গ
Court, Courtyard	অঙ্গন, প্রাঙ্গণ, আঙ্গিনা, সাহন (আরবি, মসজিদের বেলায় বিশেষ অর্থে)
Craftsman	কারিগর
Crest	কিরীট, শিখা
Crosswise	আড়াআড়িভাবে, ক্রুশাকারে
Crossvault	ক্রুশাকৃতি খিলানছাদ, ক্রুশাকার খিলানছাদ বা ভল্ট
Cruciform	ক্রুশাকার, ক্রুশাকৃতি
Cushion voussoir	গদি ভূঁসোয়া
Cyma Curve	সাইমা রেখা

D

Dado	দেযালেব নিম্নাংশ, পিঁড়ালি
Decoration	অলঙ্কবণ, সজ্জা
Dentil	দন্ত-নকশা
Diameter	ব্যাস
Disk	সবা, থালা, বেকাবি
Diwan	দিওযান, আপিস কক্ষ, দপ্তব
Dome	গম্বুজ
Door	দ্বাব, দবজা
Double tiered	দ্বিস্তবে নির্মিত, দ্বিস্তববিশিষ্ট
Drum	পিপা

E

Eaves	ছাঁইচ, ছাঁচা
Elliptical	ডিম্বাকৃতি, ডিম্বাকাব, উপবৃত্তাকৃতি, উপবৃত্তাকাব
Elongated	লম্বিত
Emboss	খোদাই কবা, বুটি দ্বাবা অঙ্কন কবা, অলঙ্কাব দ্বাবা সজ্জিত কবা
Enclosing wall	বেষ্টনী প্রাচীব, বেষ্টনী দেযাল
Enclosure	প্রাচীব বেষ্টিত স্থান, দেযাল বেষ্টিত স্থান
Engrailed arch	খাঁজ খিলান
External	বহির্গাত্র, বাহ্যাঙ্গ

F

Facade	ফাসাদ (ফবাসি)
Facet	সকপৃষ্ঠ, ক্ষুদ্রমুখ, ক্ষুদ্রবিক
False arch	মেকি খিলান
Feature	বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব
Figure	বেখাচিত্র
Finial	শীর্ষদণ্ড
Fluted	শিবাল
Flying buttress	ঝুলন্ত পোস্তা, ঝুলন্ত ঠেস
Foiled arch	খাঁজখিলান
Foundation	ভিত, ভিত্তি, বুনিযাদ
Fountain	ফোযাবা
Four centred	চতুর্কেন্দ্রিক
Frame	ফ্রেম
Fresco	ফ্রেস্কো, কাঁচা বা ভিজা অবস্থায অঙ্কিত দেযালচিত্র
Frigidarium	শীতলকক্ষ

G

Gable roof	গ্যাবল বা চালাছাদ
Gate	তোরণ, দ্বার, ফটক
Glass mosaic	কাচ মোজাইক
Gilt	স্বর্ণমন্ডিত, গিল্টি করা
Groin vault	সম্মিলিত খিলানছাদ, সম্মিলিত ভল্ট
Ground plan	ভূমিনকশা
Gypsum	জিপসাম

H

Half ruined	অর্ধভগ্ন
Hall	হলকক্ষ, অভ্যর্থনাকক্ষ
Halo	জ্যোতিশ্চক্র, বর্ণবলয়
Hammam	স্নানাগার, গোসলখানা
Header and stretcher	ইট বা প্রস্তরের পর্যায়ক্রমিক সরু ও প্রশস্ত বিন্যাস
Horizontal arch	সমান্তরাল খিলান
Horse-shoe arch	অশ্বনালাকৃতি খিলান

I

Inscribe	উৎকীর্ণ করা, খোদাই করা
Inscription	লিপি
Interior	অভ্যন্তর
Iwan	ঈওয়ান

J

Jam	বাজু
Joggled-Voussoir	খাঁজ ভুঁসোয়া

K

Kangura	কাঙ্গুরা
Keel	কিল
Key-stone	শীর্ষ ভুঁসোয়া, কি-স্টোন
Kiosk	ছত্রী
Kotla	দুর্গ

L

Lattice	জাফরি, জালি
Lintel	সর্দল
Lobed arch	খাঁজ খিলান

M

Machicolation	দুর্গের উন্নত বপ্রের শরছিদ্র
Maqsura	মাকসুরা (আরবি, খলিফার নিরাপত্তার জন্য মসজিদ অভ্যন্তরে দে'য়াল বেষ্টিত স্থান)
Marbel	মর্মর
Material	উপকরণ, উপাদান, মালমসলা
Measurement	পরিমিতি
Merlon	মার্লন নকশা
Mihrab	মিহরাব (আরবি, মসজিদের কিবলা দিকে ইমাম দাঁড়াইবার অবতলাকার বা আয়তাকৃতি স্থান)
Minar	মিনার, মাজিনা (আরবি, আযান দিবার মিনার)
Moat	পরিখা, দুর্গের চারদিক ঘেরা গভীর নালা
Mosaic	মোজাইক, ফুসাইফিসা (আরবি)
Mosque	মসজিদ
Motif	মোতিফ্, নকশা নমুনা
Moulding	ছাঁচ
Muqarnas	মুকার্নাস, মুকার্নাস কার্য

N

Nave	নেভ, ইমারতের মধ্যবর্তী খিলানপথ
Niche	কুলঙ্গি

O

Oblong	লম্বাকৃতি
Octagonal	অষ্টকোণী, অষ্টভুজ বা অষ্টবাহুবিশিষ্ট
Opencourt	উন্মুক্ত অঙ্গন, প্রাঙ্গণ, আঙ্গিনা, সাহ্ন (আরবি, মসজিদের অঙ্গন)
Outer Wall	বহির্প্রাচীর, বহির্দেয়াল
Ovoid	ডিম্বাকৃতি, ডিম্বাকার

P

Painting	রঙচিত্র, রঙরেখা
Palmet-te	পামেট
Panel	প্যানেল
Parapet	উন্নত বপ্র, প্যারাপেট
Pavilion	চন্দ্রাতপ
Pebble	নুড়ি, ক্ষুদ্র প্রস্তর
Pedestal	স্তম্ভপদ
Pendentive	পান্দানতিফ

Picture	চিত্র, ছবি
Pier	আয়তাকৃতি বা বর্গাকৃতি স্তম্ভ, চতুষ্কোণী স্তম্ভ
Pilaster	আয়তাকার স্তম্ভ বা পোস্তা (সাধারণত দেয়াল হতে বহির্গত)
Pillar	স্তম্ভ, থাম, খুঁটি
Plan	নকশা
Plate	আলোকচিত্র
Pointed arch	কৌণিক খিলান, সূক্ষ্মাগ্র খিলান
Porch	তোরণ, অলিন্দ, চাঁদনি, গাড়ি বারান্দা
Portcullis	ঝুলন্ত দরজা
Portico	তোরণ, অলিন্দ, চাঁদনি
Post	স্তম্ভ, থাম, খুঁটি
Postern	খিড়কি
Prayer Chamber	নামাজগৃহ, প্রার্থনাকক্ষ, জুল্লাহ (আরবি)
Projection	অভিক্ষেপ

R

Rampart Walk	দুর্গরক্ষার রাস্তা
Relic	নিদর্শন
Ribbed	পঞ্জরাকৃতি, শিরাল
Rich	জমকালো, জাঁকালো, জাঁকজমকপূর্ণ
Riwaq	রিওয়াক, বারান্দা
Rosette	রোজেট
Rotunda	বৃত্তাকৃতি ইমারত
Round colum	গোলায়িত স্তম্ভ
Row	সারি

S

Sahn	সাহন, মসজিদ অঙ্গন
Sanctuary	নামাজগৃহ, প্রার্থনাকক্ষ, জুল্লাহ (আরবি)
Sandstone	বেলেপ্রস্তর
Sarai	সরাইখানা, মুসাফিরখানা
Sculpture	ভাস্কর্য, ভাস্কর্যশিল্প, মূর্তিশিল্প
Semi-circular	অর্ধবৃত্তাকৃতি
Semi-dome	অর্ধগম্বুজ
Shaft	স্তম্ভদণ্ড
Soffit (of arch)	খিলানগর্ভ
Solid	নিরেট
Spandrel (or Spandril)	খিলান পার্শ্বস্থ ত্রিকোনাকার ভূমি
Springing-line	উত্থান রেখা

Squinch	স্কুইঞ্চ
Stair	সিঁড়ি, সোপান, সোপানশ্রেণী
Stalactite	মুকার্নাস (আরবি), স্তালাকতাইত
Standard plan	আদর্শ নকশা
Stela (pl. Stelae)	স্মারক স্তম্ভ, পীঠিকা
Stepped arch	ধাপ খিলান
Stilted	খাড়া, উল্লম্ব, লম্বিত
Stucco	পলেস্তারা, পলস্তারা
Surface	গাত্র, বহির্গাত্র, পৃষ্ঠ, উপরিভাগ

T

Tappering	ক্রমহ্রস্বায়মান
Tepidarium	ঈষদুষ্ণ স্নানকক্ষ
Tie-beam	বন্ধন তীর
Tower	টাওয়ার, বুরুজ, মিনার
Tracery	জালিকার্য, জাফরি
Transept	ট্র্যানসেপ্ট
Transverse	আড়াআড়ি তেবচা
Trellis	জাফরি, জালি
Trippled-aisled entrance	ত্রিখিলান দ্বার, ত্রিখিলানবিশিষ্ট প্রবেশপথ
Tunnel-vault	নলাকৃতি খিলান ছাদ, নলাকৃতি ভল্ট
Two-centred	দ্বিকেন্দ্রিক
Tympanum	খিলান-পটহ্

V

Vault	খিলানছাদ, ভল্ট
Vestibule	দরদালান
Voussoir	ভূঁসোয়া

W

Wall-face	প্রাচীরগাত্র, দেয়ালগাত্র

Z

Zarih	মুসলিম সমাধিসৌধের কবরফলক
Ziada	যিয়াদা (আরবী, মসজিদের বেষ্টিত বহিরাঙ্গন। বেষ্টনী এক বা একাধিক দিকে হতে পারে)
Ziggara or Ziarat	সুফি সাধকের সমাধি (কাশ্মীরে)
Zone of transition	অবস্থান্তর প্রবৃত্তি

পরিশিষ্ট-১

দিল্লি সালতানাতের বংশ তালিকা

মামলুক বংশ

* কুতুব উদ-দীন আইবক ১২০৬—১২১০ খ্রি
* আবাম শাহ ১২১০—১২১০ "
* শামস উদ-দীন ইলতুৎমিস ১২১০—১২৩৬ "
* বোকন উদ-দীন ফিবোজ শাহ ১২৩৬—১২৩৬ "
* সুলতানা বাজিযা ১২৩৬—১২৪০ "
* মুইজ উদ-দীন বাহবাম ১২৪০—১২৪২ "
* আলা উদ-দীন মাসুদ শাহ ১২৪২—১২৪৬ "
* নাসিব উদ-দীন মাহমুদ ১২৪৬—১২৬৬ "
* গিযাস উদ-দীন বলবন ১২৬৬—১২৮৭ "
* মুইজ উদ-দীন কাযকোবাদ ১২৮৭—১২৯০ "

খলজী বংশ

* জালাল উদ-দীন ফিরুজ খল্জী ১২৯০—১২৯৬ খ্রি
* রুকন উদ-দীন ইব্রাহীম ১২৯৬—১২৯৬ "
* আলা উদ-দীন খল্জী ১২৯৬—১৩১৬ "
* শিহাব উদ-দীন উমব ১৩১৬—১৩১৬ "
* কুতুব উদ-দীন মুবাবক ১৩১৬—১৩২০ "
* নাসিব উদ-দীন খসরু (অবৈধ দখলদাব) ১৩২০—১৩২০ "

তোঘলক বংশ

* গিযাস উদ-দীন তোঘলক ১৩২০—১৩২৫ খ্রি
* মুহাম্মদ বিন তোঘলক ১৩২৫—১৩৫১ "
* ফিরুজ শাহ তোঘলক ১৩৫১—১৩৮৮ "
* গিযাস উদ-দীন তোঘলক (২য) ১৩৮৮—১৩৮৯ "
* আবু বকব ১৩৮৯—১৩৯০ "
* নাসিব উদ-দীন মুহাম্মদ শাহ ১৩৯০—১৩৯৪ "
* আলা উদ-দীন সিকান্দাব ১৩৯৪—১৩৯৪ "
* নুসবাত শাহ ১৩৯৪—১৩৯৮ "
* মাহমুদ শাহ ১৩৯৮—১৪১৩ "

সৈয়দ বংশ

*	খিজিব খান	১৪১৪—১৪২১ খ্রি.
*	মুইজ উদ-দীন মুবাবক	১৪২১—১৪৩৪ "
*	মুহাম্মদ শাহ	১৪৩৪—১৪৪৫ "
*	আলা উদ-দীন শাহ	১৪৪৫—১৪৫১ "

লোদী বংশ

*	বাহলুল লোদী	১৪৫১—১৪৮৮ খ্রি.
*	সিকান্দাব লোদী	১৪৮৮—১৫১৭ "
*	ইব্রাহীম লোদী	১৫১৭—১৫২৬ "

দিল্লির সুলতানগণের অধীনে বাংলার শাসনকর্তাগণ (গভর্নর)

*	মোহাম্মদ বখতিয়াব খলজী	১২০২-১২০৫ খ্রি.
*	ইজ্জ-উদ-দীন মোহাম্মদ শিবান	১২০৫-১২০৮ "
*	আলা-উদ-দীন মর্দান	১২০৮-১২১১ "
*	গিযাস-উদ-দীন ইওযাজ	১২১১-১২২৬ "
*	নাসিব-উদ-দীন মাহমুদ	১২২৬-১২২৯ "
*	আলা-উদ-দীন জানী	১২২৯-১২২৯ "
*	সাইফ-উদ-দীন আইবক	১২২৯-১২৩৩ "
*	ইজ্জ-উদ-দীন তুগ্রীল তুঘান খান	১২৩৩-১২৪৪ "
*	কমব-উদ-দীন তামাব খান কিবান	১২৪৪-১২৪৬ "
*	ইখ্‌তিযাব উদ্দিন ইযাজবুক	১২৪৬-১২৫৮ "
*	জালাল উদ-দীন মাসুদ মালিক জানী	১২৫৮-১২৫৮ "
*	ইজ্জ-উদ-দীন বলবান	১২৫৮-১২৬০ "
*	মোহাম্মদ আরসলান তাতাব খান	}
*	শিব খান	} ১২৬০-১২৭৮ "
*	আমিন খান	}
*	মুগিস্‌-উদ-দীন তুগ্রীল	১২৭৮-১২৮২ "
*	নাসিব-উদ-দীন বুগবা খান	১২৮২-১২৯১ "
*	রুকন-উদ-দীন কাযকাউস	১২৯১-১৩০২ "
*	শামস-উদ-দীন ফিরুজ শাহ	১৩০২-১৩১৮ "
*	শিহাব-উদ্দীন বুগবা শাহ (পশ্চিম বাংলা)	১৩১৮-১৩১৯ "
*	গিযাস-উদ-দীন বাহাদুব শাহ (পূর্ব বাংলা)	১৩১০-১৩১৯ "
*	গিযাস-উদ-দীন বাহাদুব শাহ (সম্পূর্ণ বাংলা)	১৩২৩ পর্যন্ত
*	নাসিব-উদ-দীন	১৩২৩-১৩২৫ "
*	বাহাদুব শাহ (পূর্ব বাংলা) বাহবাম শাহসহ	১৩২৪-১৩৩০ "
*	বাহবাম শাহ (একাকী)	১৩৩০-১৩৩৮ "
*	কদব খান (লক্ষ্মণাতী	১৩২৫-১৩৩৯ "
*	ইজ্জ-উদ-দীন আজম আল মূলক	১৩২৩-১৩৩৯ "

আঞ্চলিক স্বাধীন সুলতানগণের তালিকা
বাংলাব স্বাধীন সুলতানি বংশ

মুবারকশাহী বংশ

*	ফখব উদ্দিন মুবাবক শাহ্ (পূর্ব বাংলা)	১৩৩৮–১৩৪৯ খ্রি.
*	ইখ্‌তিযাব উদ্দিন গাজী শাহ্ (পূর্ব বাংলা)	১৩৪৯–১৩৫২ "

ইলিয়াসশাহী বংশ

*	শামস্ উদ্দিন ইলিযাস শাহ্ (পশ্চিম বাংলা)	১৩৪২–১৩৫৭ খ্রি.
*	সিকান্দাব শাহ্	১৩৫৭–১৩৯২ "
*	গিযাস উদ্দিন আজম শাহ্	১৩৯২–১৪১০ "
*	সাইফ উদ্দিন হামযাহ্ শাহ্	১৪১০–১৪১২ "
*	শিহাব উদ্দিন বাযযীদ শাহ্	১৪১২–১৪১৪ "
*	আলা উদ্দিন ফিরুজ শাহ্	১৪১৪–১৪১৪ "

রাজা গণেশের বংশ

*	জালাল উদ্দিন মুহাম্মদ শাহ্	১৪১৪–১৪৩২ খ্রি.
*	শামস্ উদ্দিন আহম্মদ শাহ্	১৪৩২–১৪৪২ "

পরবর্তী ইলিয়াসশাহী বংশ

*	নাসিব উদ্দিন মাহমুদ শাহ্	১৪৪২–১৪৫৯ খ্রি.
*	রুকন উদ্দিন বববক শাহ্	১৪৫৯–১৪৭৪ "
*	শামস্ উদ্দিন ইউসুফ শাহ্	১৪৭৪–১৪৮১ "
*	সিকান্দাব শাহ্ (২য)	১৪৮১–১৪৮২ "
*	জালাল উদ্দিন ফতেহ্ খান	১৪৮২ ১৪৮৬ "

হাবসী সুলতানগণ

*	সুলতান শাহ্জাদা বববক	১৪৮৬–১৪৮৬ খ্রি.
*	সাইফ উদ্দিন ফিরুজ শাহ্	১৪৮৬–১৪৮৯ "
*	নাসিব উদ্দিন মাহমুদ শাহ্	১৪৮৯–১৪৯০ "
*	শামস্ উদ্দিন মুজাফফব শাহ্	১৪৯০–১৪৯৩ "

হোসেনশাহী বংশ

*	আলা উদ–দীন হুসেন শাহ্	১৪৯৩–১৫১৯ খ্রি.
*	নাসিব উদ্দিন নসবৎ শাহ্	১৫১৯–১৫৩১ "
*	আলা উদ–দীন ফিরুজ শাহ্	১৫৩১–১৫৩২ "
*	গিযাস উদ্দিন মাহমুদ শাহ্	১৫৩২–১৫৩৮ "
*	নাসিব উদ্দিন হুমাযূন	১৫৩৮–১৫৩৮ "

বাংলা ১৫৩৮-১৫৫৩ দিল্লির সুর বংশের শাসনাধীন ছিল

*	শামস্ উদ-দীন মুহাম্মদ সুব	১৫৫৩–১৫৫৫ খ্রি.
*	গিযাস উদ্দিন বাহাদুব শাহ	১৫৫৫–১৫৬০ "
*	জালাল শাহ	১৫৬০–১৫৬৩ "
*	গিযাস উদ্দিন	১৫৬৩–১৫৬৪ "

কররানী বংশ

*	তাজ খান কববানী	১৫৬৪–১৫৬৫ খ্রি.
*	সুলাইমান খান কববানী	১৫৬৫–১৫৭২ "
*	দাউদ খান কববানী	১৫৭২–১৫৭৬ "

(১৫৭৬ খ্রি. বাংলা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয)

জৌনপুরের স্বাধীন শরকী বংশের শাসকগণের তালিকা

*	মালিক সবওযাব খাজা জাহান	১৩৯৪–১৩৯৯ খ্রি.
*	মোবাবক শাহ	১৩৯৯–১৪০০ "
*	শামস্ উদ্দিন ইব্রাহীম শাহ	১৪০০–১৪৪০ "
*	মাহমুদ শাহ বিন ইব্রাহীম	১৪৪০–১৪৫৬ "
*	মোহাম্মদ শাহ	১৪৫৬–১৪৫৭ "
*	হোসাইন শাহ বিন মাহমুদ	১৪৫৭–১৪৭৯ "

(১৪৭৯ খ্রি. দিল্লিব লোদীবা জৌনপুব দখল কবেন)

গুজরাটের স্বাধীন আহমদশাহী বংশের সুলতানগণের তালিকা

*	সুলতান মুহাম্মদ (১ম)	১৪০৩ খ্রি. (৩ মাস শাসনেব পব পুনবায দিল্লিব শাসন)
*	সুলতান মুজাফফব শাহ (১ম)	১৪০৭–১৪১১ খ্রি.
*	সুলতান আহমদ শাহ (১ম)	১৪১১–১৪৪২ "
*	সুলতান মুহাম্মদ (২য)	১৪৪২–১৪৫১ "
*	সুলতান কুতুব উদ-দীন আহমদ (২য)	১৪৫১–১৪৫৮ "
*	সুলতান দাউদ	১৪৫৮–১৪৫৮ "
*	সুলতান মাহমুদ বেগাড়া	১৪৫৮–১৫১১ "
*	সুলতান মুজাফফব শাহ (২য)	১৫১১–১৫২৬ "
*	সুলতান সিকান্দাব শাহ	১৫২৬–১৫২৬ "
*	সুলতান মাহমুদ (২য)	১৫২৬–১৫২৬ "
*	সুলতান বাহাদুব শাহ	১৫২৬–১৫৩৭ "
*	সুলতান মুহাম্মদ (৩য)	১৫৩৭–১৫৩৭ "
*	সুলতান মাহমুদ শাহ (৩য)	১৫৩৭–১৫৫৪ "
*	সুলতান আহমদ শাহ (৩য)	১৫৫৪–১৫৬১ "
*	সুলতান মুজাফফব শাহ (৩য)	১৫৬১–১৫৭৩ " ১৫৮১–১৫৮৩ " (পশ্চিম গুজবাট)

(১৫৭৩ খ্রি. গুজবাট মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয)

কাশ্মীরেব স্বাধীন সুলতানগণের তালিকা

শাহ্ মির্জা সোয়াতীর বংশানুক্রম

* শামস্ উদ-দীন শাহ্ মির্জা সোযাতী — ১৩৪৬-১৩৪৯ খ্রি.
* জামসীদ — ১৩৪৯-১৩৫০ „
* আলা উদ-দীন আলী শিব — ১৩৫০-১৩৫৯ „
* শাহিব উদ-দীন শিব সামাক — ১৩৫৯-১৩৭৮ „
* কুতুব উদ্দিন হিন্দাল — ১৩৭৮-১৩৯৪ „
* সিকান্দাব বুত শিকান — ১৩৯৪-১৪১৬ „
* আলী মির্জা খান — ১৪১৬-১৪২০ „
* জযনাল আবেদীন শাহী খান — ১৪২০-১৪৭০ „
* হাযদবশাহ্ হাজী খান — ১৪৭০-১৪৭১ „
* হাসান — ১৪৭১-১৪৮৯ „
* মোহাম্মদ (১ম বাজত্বকাল) — ১৪৮৯-১৪৯০ „
* ফতেহ্ শাহ্ — ১৪৯০-১৪৯৮ „
* মোহাম্মদ (২য বাজত্বকাল) — ১৪৯৮-১৪৯৯ „
* ফতেহ শাহ্ (২য বাজত্বকাল) — ১৪৯৯-১৫০০ „
* মোহাম্মদ (৩য বাজত্বকাল) — ১৫০০-১৫২৬ „
* ইব্রাহীম (১ম) — ১৫২৬-১৫২৭ „
* নাজক (১ম বাজত্বকাল) — ১৫২৭-১৫২৯ „
* মোহাম্মদ (৪র্থ বাজত্বকাল) — ১৫২৯-১৫৩৩ „
* শামস উদ-দীন — ১৫৩৩-১৫৪০ „
* নাজক (২য বাজত্বকাল) — ১৫৪০-১৫৪০ „
* হাযদাব — ১৫৪০-১৫৫১ „
* নাজক (৩য বাজত্বকাল) — ১৫৫১-১৫৫২ „
* ইব্রাহীম (২য) — ১৫৫২-১৫৫৫ „
* ইসমাইল — ১৫৫৫-১৫৬১ „
* হাবিব — ১৫৬১-১৫৬১ „

গাজীখান চাকের বংশানুক্রম

* গাজীখান বিন চাক — ১৫৬১-১৫৬৩ খ্রি.
* নসব উদ-দীন হোসাইন — ১৫৬৩-১৫৬৯ „
* জহিব উদ-দীন আলী — ১৫৬৯-১৫৭৯ „
* নসব উদ-দীন ইউসুফ — ১৫৭৯-১৫৮৬ „
* ইযাকুব — ১৫৮৬-১৫৮৯ „

(১৫৮৯ খ্রি. কাশ্মীব মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয)

ভারতের আঞ্চলিক স্বাধীন মুসলিম বংশ ও শাসকগণের তালিকা

মালওয়া

ঘোরী বংশ

*	দেলোযাব খান হোসাইন ঘোবী	১৪০১–১৪০৫ খ্রি.
*	আলপ খান হুসাং শাহ	১৪০৫–১৪৩৫ "
*	মোহাম্মদ গজনী খান	১৪৩৫–১৪৩৬ "
*	মাসুদ খান	১৪৩৬–১৪৩৬ "

খলজী বংশ

*	মাহমুদ শাহ (১ম) খলজী	১৪৩৬–১৪৭৫ খ্রি.
*	গিযাস শাহ বিন মাহমুদ	১৪৭৫–১৫০০ "
*	নাসিব শাহ বিন গিযাস	১৫০০–১৫১১ "
*	মাহমুদ শাহ (২য)	১৫১১–১৫৩১ "

(১৫৩১ খ্রি. গুজবাটেব সুলতান বাহাদুব শাহ মালওযা দখল কবেন)

খান্দেশ

ফারুকী বংশ

*	মালিক বাজা	১৩৭০–১৩৯৯ খ্রি.
*	নাসিব খান	১৩৯৯–১৪৩৭ "
*	আদিল খান (১ম)	১৪৩৭–১৪৪১ "
*	মিবান মোবাবক খান	১৪৪১–১৪৫৭ "
*	আদিল খান (২য)	১৪৫৭–১৫০৩ "
*	দাউদ খান	১৫০৩–১৫১০ "
*	গাজনী খান	১৫১০–১৫১০ "
*	আলম খান	১৫১০–১৫১০ "
*	আদিল খান (৩য)	১৫১০–১৫২০ "
*	মিরান মুহাম্মদ (১ম) শাহ	১৫২০–১৫৩৭ "
*	আহমদ শাহ	১৫৩৭–১৫৩৭ "
*	মোবাবক শাহ (২য)	১৫৩৭–১৫৬৬ "
*	মিবান মুহাম্মদ (২য়) শাহ	১৫৬৬–১৫৭৬ "
*	হাসান শাহ	১৫৭৬–১৫৭৭ "
*	আলী খান বা আদিল খান (৪র্থ)	১৫৭৭–১৫৯৭ "
*	বাহাদুব শাহ	১৫৯৭–১৬০১ "

(১৬০১ খ্রি. খান্দেশ বাজ্য মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয)

দাক্ষিণাত্যের আঞ্চলিক স্বাধীন রাজ্যসমূহের শাসক বংশ

বাহমনী শাসকগণ

*	আলা উদ-দীন হাসান বাহমন শাহ	১৩৪৭-১৩৫৮ খ্রি
*	মোহাম্মদ (১ম)	১৩৫৮-১৩৭৫ "
*	আলা উদ-দীন মোজাহীদ	১৩৭৫-১৩৭৮ "
*	দাউদ	১৩৭৮-১৩৭৮ "
*	মোহাম্মদ (২য)	১৩৭৮-১৩৯৭ "
*	গিযাস উদ-দীন	১৩৯৭-১৩৯৭ "
*	শামস্ উদ-দীন	১৩৯৭-১৩৯৭ "
*	তাজ উদ-দীন	১৩৯৭-১৪২২ "
*	আহমদ (১ম) ওযালী	১৪২২-১৪৩৬ "
*	আলা উদ-দীন আহমদ (২য)	১৪৩৬-১৪৫৮ "
*	আলা উদ-দীন হুমাযূন শাহ	১৪৫৮-১৪৬১ "
*	নিজাম	১৪৬১-১৪৬৩ "
*	মোহাম্মদ (৩য) লস্কবী শাহ	১৪৬৩-১৪৮২ "
*	মাহমুদ শাহ	১৪৮২-১৫১৮ "
*	আহমদ (৩য) শাহ	১৫১৮-১৫২১ "
*	আলা উদ-দীন শাহ	১৫২১-১৫২২ "
*	ওযালিউল্লাহ শাহ	১৫২২-১৫২৫ "
*	কলিম উল্লাহ শাহ	১৫২৫-১৫২৭ "

(বাহমনী বাজ্য পাঁচটি ক্ষুদ্র বাজ্যে বিভক্ত হয)

বেরার

ইমাদশাহী বংশ

*	ফাত্হ উল্লাহ	১৪৮৪-১৫০৪ খ্রি
*	আলা আল-দীন	১৫০৪-১৫২৯ "
*	দবিযা শাহ	১৫২৯-১৫৬০ "
*	বুবহান শাহ	১৫৬০-১৫৬৮ "
*	তুফাল শাহ	১৫৬৮-১৫৭২ "

আহমদনগর

নিজামশাহী বংশ

*	আহমদ বিন নিজাম শাহ (১ম)	১৪৯০-১৫০৮ খ্রি
*	বুবহান শাহ (১ম)	১৫০৮-১৫৫৩ "
*	হোসাইন শাহ	১৫৫৩-১৫৬৫ "
*	মর্তুজা শাহ	১৫৬৫-১৫৮৮ "
*	মিরান হোসাইন	১৫৮৮-১৫৮৯ "
*	ইসমাইল শাহ	১৫৮৯-১৫৯০ "
*	বুবহান শাহ (২য)	১৫৯০-১৫৯৪ "

*	ইব্রাহীম শাহ	১৫৯৪–১৫৯৪ "
*	আহমদ শাহ (২য়)	১৫৯৪–১৫৯৫ "
*	বাহাদুর শাহ	১৫৯৫–১৫৯৮ "
*	মর্তুজা (২য়) (মানমাত্র শাসক)	১৫৯৮–১৬০৭ "

বিদার
বারিদশাহী বংশ

*	কাশিম (১ম)	১৪৯২–১৫০৪ খ্রি.
*	আমির (১ম)	১৫০৪–১৫৪৯ "
*	আলী	১৫৪৯–১৫৬২ "
*	ইব্রাহীম	১৫৬২–১৫৬৯ "
*	কাশিম (২য়)	১৫৬৯–১৫৭২ "
*	মির্জা আলী	১৫৭২–১৬০৯ "
*	আমির (২য়)	১৬০৯–১৬০৯ "

বিজাপুর
আদিলশাহী বংশ

*	ইউসুফ আদিল শাহ	১৪৮৯–১৫১১ খ্রি.
*	ইসমাইল শাহ	১৫১১–১৫৩৪ "
*	মাল্লুশাহ	১৫৩৪–১৫৩৫ "
*	ইব্রাহীম (১ম)	১৫৩৫–১৫৫৭ "
*	আলী (১ম)	১৫৫৭–১৫৭৯ "
*	ইব্রাহীম (২য়)	১৫৭৯–১৬২৬ "
*	মোহাম্মদ	১৬২৬–১৬৬০ "
*	আলী শাহ (২য়)	১৬৬০–১৬৮৬ "

(১৬৮৬ খ্রি. বিজাপুর মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়)

গোলকুণ্ডা
কুতুবশাহী বংশ

*	সুলতান কুলী	১৫১২–১৫৪৩ খ্রি.
*	জামসীদ	১৫৪৩–১৫৫০ "
*	সোবহান কুলী	১৫৫০-১৫৫০ "
*	ইব্রাহীম	১৫৫০–১৫৮১ "
*	মোহাম্মদ কুলী	১৫৮১–১৬১১ "
*	আব্দুল্লাহ	১৬১১–১৬৭২ "
*	আবুল হাসান	১৬৭২–১৬৮৭ "

(১৬৮৭ খ্রি. গোলকুণ্ডা মোগল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়)

মোগল বংশের শাসনকাল

*	বাবর, জহির-আল-দীন	১৫২৬—১৫৩০ খ্রি.
*	হুমায়ুন, নাসির-আল-দীন	১৫৩০—১৫৪০ " ১৫৫৫—১৫৫৬ "

সুর বংশ

*	শের শাহ	১৫৪০—১৫৪৫ খ্রি.
*	ইসলাম শাহ	১৫৪৫—১৫৫৩ "
*	ফিরুজ শাহ	১৫৫৩—১৫৫৩ "
*	আদিল শাহ	১৫৫৩—১৫৫৫ "

*	আকবর, জালাল-আল-দীন	১৫৫৬—১৬০৫ খ্রি.
*	জাহাঙ্গীর, নূর আল-দীন	১৬০৫—১৬২৭ "
*	শাহজাহান, শিহাব-আল-দীন	১৬২৮—১৬৫৮ "
*	আওরঙ্গজেব, আলমগীর, মহি-আল-দীন	১৬৫৮—১৭০৭ "
*	শাহ আলম বাহাদুর শাহ, কুতুব-আল-দীন	১৭০৭—১৭১২ "
*	জাহান্দার শাহ, মুইজ-আল-দীন	১৭১২—১৭১৩ "
*	ফররুখ শিযর	১৭১৩—১৭১৯ "
*	রাফি-উদ-দরাজাত, সামস-আল-দীন	১৭১৯—১৭১৯ "
*	রাফি-উদ-দৌলা, শাহজাহান (২য)	১৭১৯—১৭১৯ "
*	মুহাম্মদ শাহ, নাসির-আল-দীন	১৭১৯—১৭৪৮ "
*	আহমদ শাহ	১৭৪৮—১৭৫৪ "
*	দ্বিতীয় আলমগীর, আজিজ আল-দীন	১৭৫৪—১৭৫৯ "
*	দ্বিতীয় শাহ আলম, জালাল আল-দীন	১৭৫৯—১৮০৬ "
*	দ্বিতীয় আকবর	১৮০৬—১৮৩৭ "
*	দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ	১৮৩৭—১৮৫৭ "

তথ্যনির্দেশ :

Bosworth, C E , The Islamic Dynasties, Edinburg University Press, Edinbrug, 1967
Lane-Poole, S , The Muhammadan Dynasties, Frednck Ungar Publishing Co , New York Reprint, 1965

নির্দেশিকা

হ

নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জি

Abul Fazl — *Ain-i-Akbari*, Eng. Trans. by H. Blockmann, Calcutta, 1873; by H.S. Jarrett, Calcutta, 1891.
—,Akbarnama, Eng. Trans. by H.Beveridge, Calcutta, 1903.

Ahmad, S., — *Archaeology of the Muslim Towns of Gujarat with Special Refference to their Monuments* (An unpublished Ph.D. Thesis, M.S. University), Baroda, 1982.

Batley, C., — *Design Development of Indian Architecture*, D.B. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd. Bombay, 1934.

Brown, C.J. — *Caltalogue of Coins in the proviencial museum, Lucknow.*

Brown, P., — *Indian Architecture (Islamic Period), Taraporevala & Sons, Bombay, 1942.*

Burgess, J., — The Muhammadan Architecture of Ahmadabad, Willam Grigges & Sons Ltd., London, 1900.
—, *Muhamadan Architecture in Gujrat* (Archaeological survey of India, New, Imperial series, Vol. XXXII, Western India, Vol.VI, London, 1896).
—, *The Muhammadan Architecture of Bharoch, Cambay, Dholka, Champanir and Mahmudabad in Gujarat*, William Griggs & Sons Ltd., London, 1896.
—,The Architectural Antiquities of Northern Gujarat, Luzac & Co., London, 1903.
—, The Sharqi Architecture of Jaunpur, Archaeological Survey of India, Vol. I, Calcutta, 1889.

Commissariat, M.S., *A History of Gujarat*, Vol.I, Longmans Green & Co., Ltd. Bombay, 1938.

Cousens, H., — *Bijapur and Its Architectural Remains*, Bharatiya Publishing House, Varanasi, 1976.
—, *The Architectural Antiquities of Western India*, Luzac & Co., London, 1926.

Creswell, K.A.C. — *Early Muslim Architecture*, Oxford, 1932.

Croness and Haywoods, — *The Gardens of Mughal India*, Vikas, New Delhi, 1973.

Cunningham, A. — *Archaeological Survey of India*, Vols. I-XXIII, Simla, Calcutta, 1865-77.

Dani, A.H. — *Muslim Architecture in Bengal*, Dacca (Asiatic Society of Pakistan), 1961.

Desai, Z.A., — *Indo-Islamic Architecture*, New Delhi (The Director Publication Division, Ministry of Information and Broadcasting, Govt. of India), 1970.

Fabri, C. — *An Introduction to the Indian Architecture,* Asia Publishing House, Bombay, 1963.

Farashudin, M., — *The Sharki Monuments of Junpur,* Allahabad, 1922.

Fergusson, J. — *History of Indian and Eastern Architecture,* John Murray, London, 1910.

Fletcher, B. — *A History of Architecture on the Comparative Method,* London, 1921.

Frishman, M. — *The Mosque,* Thames and Hudson, London, 1997.

Goswami, A., — *Indian Terracotta Art,* Calcutta (Rupa & Co.,), 1959.

Grover, S., — *Architecture of India : Islamic (727-1707 A.D.),* New Delhi, 1981.

Gunguli, O.C., — *Indian Architecture,* Bombay, 1954.

Haig, W. (ed.) — *The Cambridge History of India,* Vols, III & IV, University Press, Cambridge, 1928 & 1937.

Hambly G. — *Cities of Moghul India,* Vikas, New Delhi, 1977.

Husain, A.B.M. — *Fathpur-Sikri and Its Architecture,* Bureau of National Reconstruction, Dacca, 1970.

Hasan, A., — *Notes on the Antiquities of Dacca,* Dacca, 1940.

Havell, E.B. — *Ancient and Mediaeval Architecture of India,* New Delhi (S. Chand & Co., Pvt. Ltd.), 1915.

—,*The Ancient and Medieval Architecutre of India,* John Murray, London, 1915.

--,*Indian Architecture, Its Psychology, Structure and History from the Earliest Muhammadan Invasion to the Present Day,* John Murray, London,1913.

Khan, F.A., — *Architecture and Art Treasures in Pakiatan,* Karachi (Elite Publications), 1969.

Koch, E. — *Mughal Architecutre : An outline of its History and Development,* Munich, Prestel, 1991.

Mehta, R.J., — *Master Pices of Indo-Islamic Architecture,* Bombay, 1976.

Michell, G., — *Architecture of the Islamic World,* Themes and Hudson, London, 1978.

—, *The Islamic Heritage of Bengal,* Paris, 1984.

—, *Islamic Heritage of Deccan,* Bombay, 1986.

Munshi, R.N. — *History of the Qutab Minar,* Delhi, 1911.

Nath, R., — *History of Sultanate Architecture,* New Delhi (Abhinav Publications), 1978.

—,*Some Aspects of Mughal Architecture,* New Delhi (Abhinav Publications), 1976.

Smith, E.W. — *The Moghul Architecture of Fatipur Sikri.*

Stephin, C., — *The Archaeology and Monumental Remains of Delhi,* Delhi, 1876.

Tary, J., — *The Carm of Indo-Muslim* Architecture, New Delhi, 1970.

Archaeological Reports & Epigraphy

Archaeological survey of India, Annul Reports.

Epigraphia Indo-Moslemica

Epigraphia Indica Arabic & Persian Suplement.

আলোকচিত্র–১ : কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য
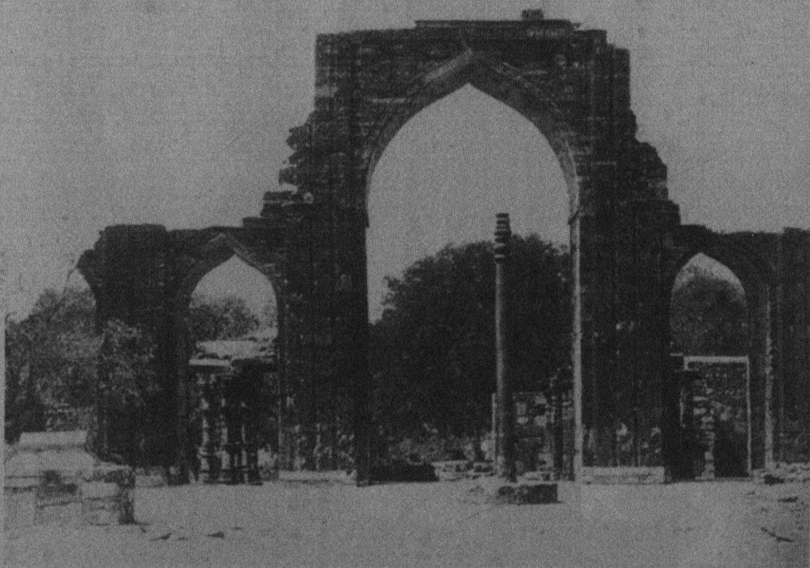
আলোকচিত্র–২ : কুওয়াতুল ইসলাম মসজিদের খিলানপর্দা
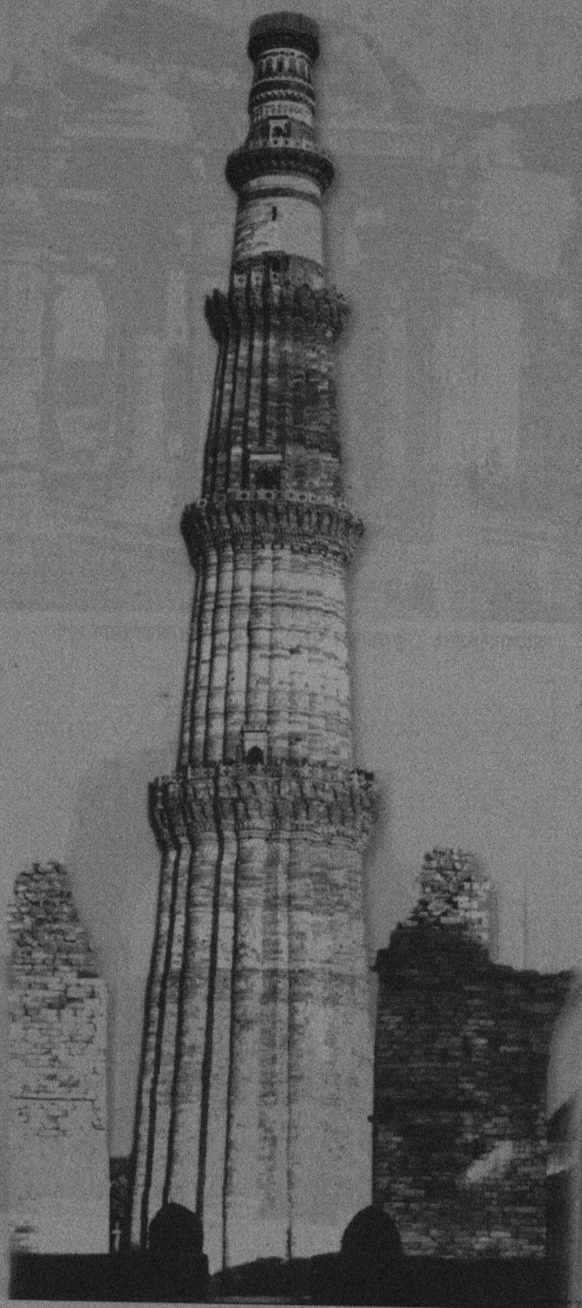
আলোকচিত্র-৩ : কুতুব মিনার

আলোকচিত্র–৪ : আড়াই দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য
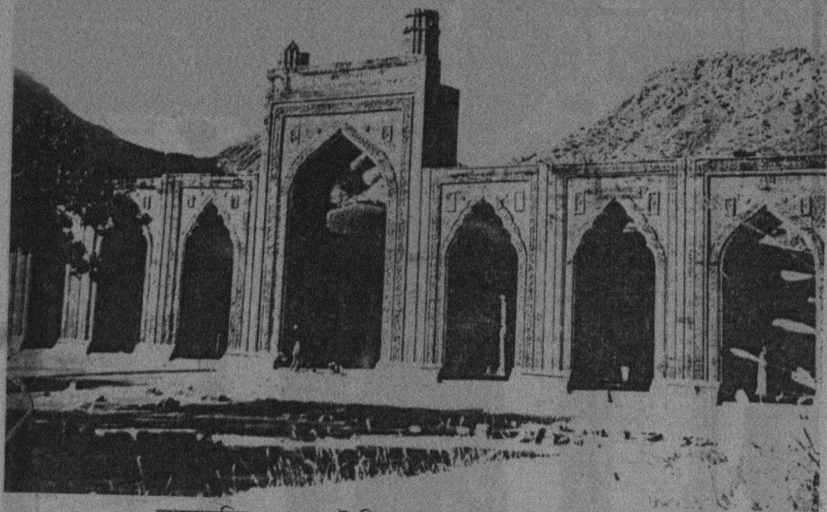
আলোকচিত্র–৫ : আড়াই দিন-কা-ঝোপড়া মসজিদের খিলানপর্দা

আলোকচিত্র–৬ : সুলতান ঘারির সমাধির অভ্যন্তরীণ দৃশ্য
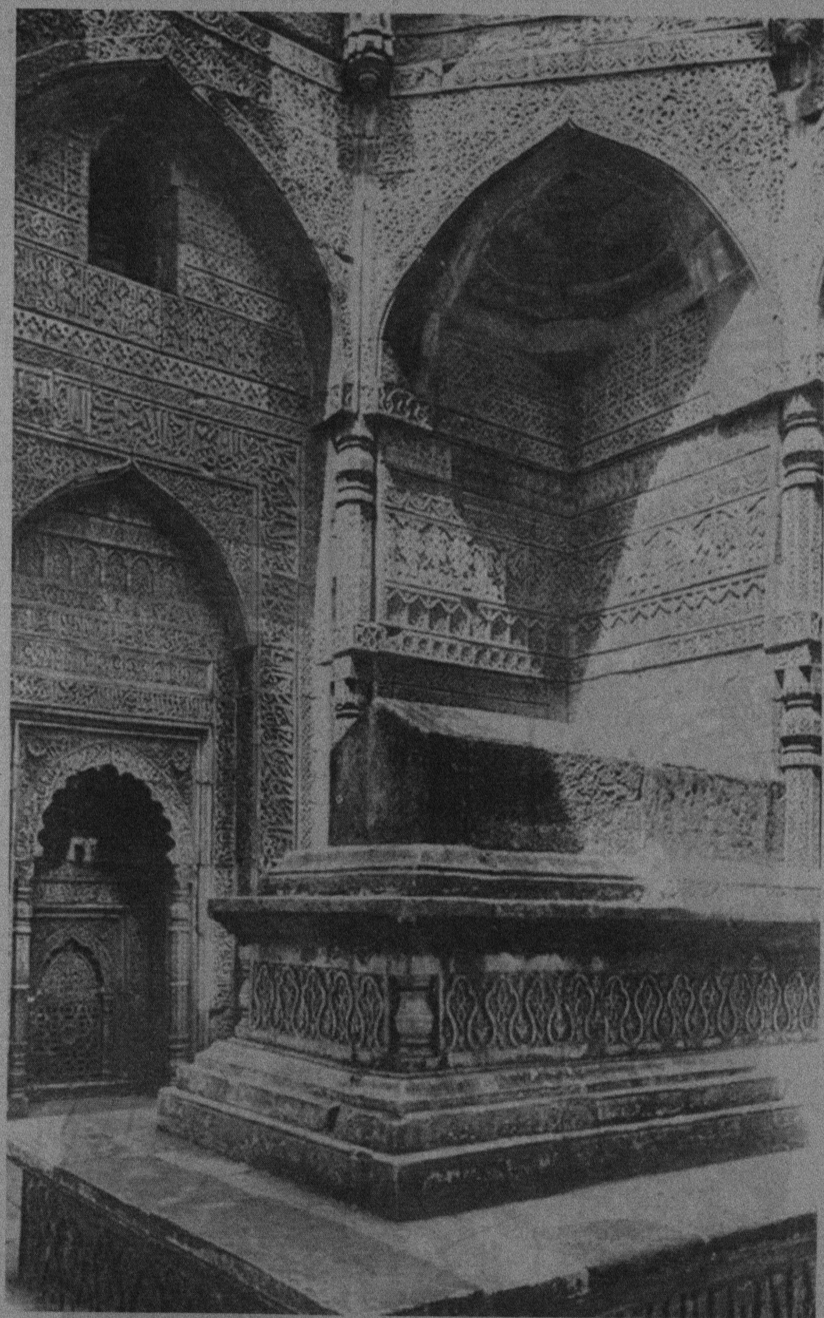
আলোকচিত্র-৭ : সুলতান ইলতুৎমিসের সমাধির অভ্যন্তরীণ দৃশ্য
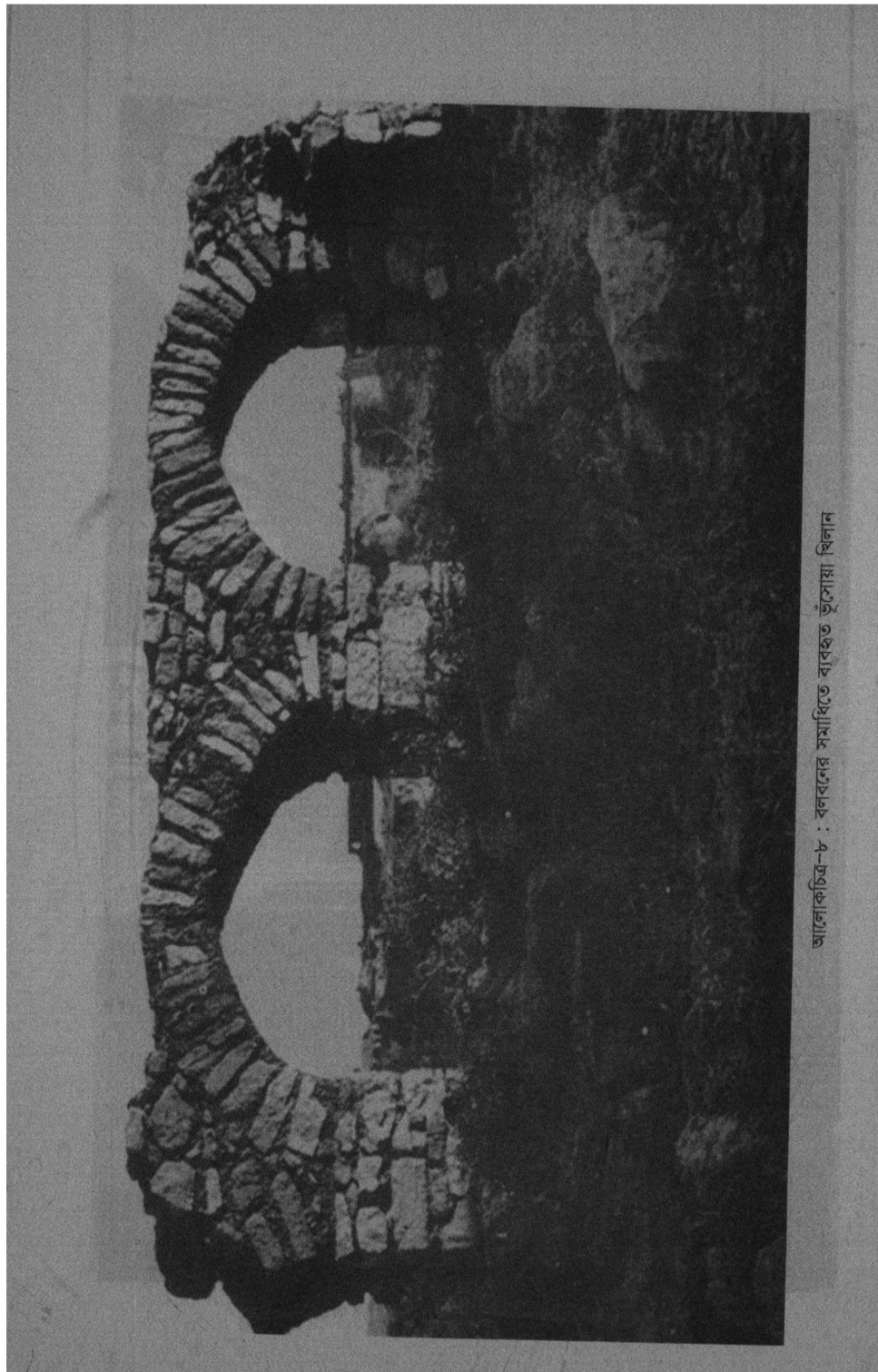
আলোকচিত্র–৮ : বলবনের সমাধিতে ব্যবহৃত ভূঁসোয়া খিলান
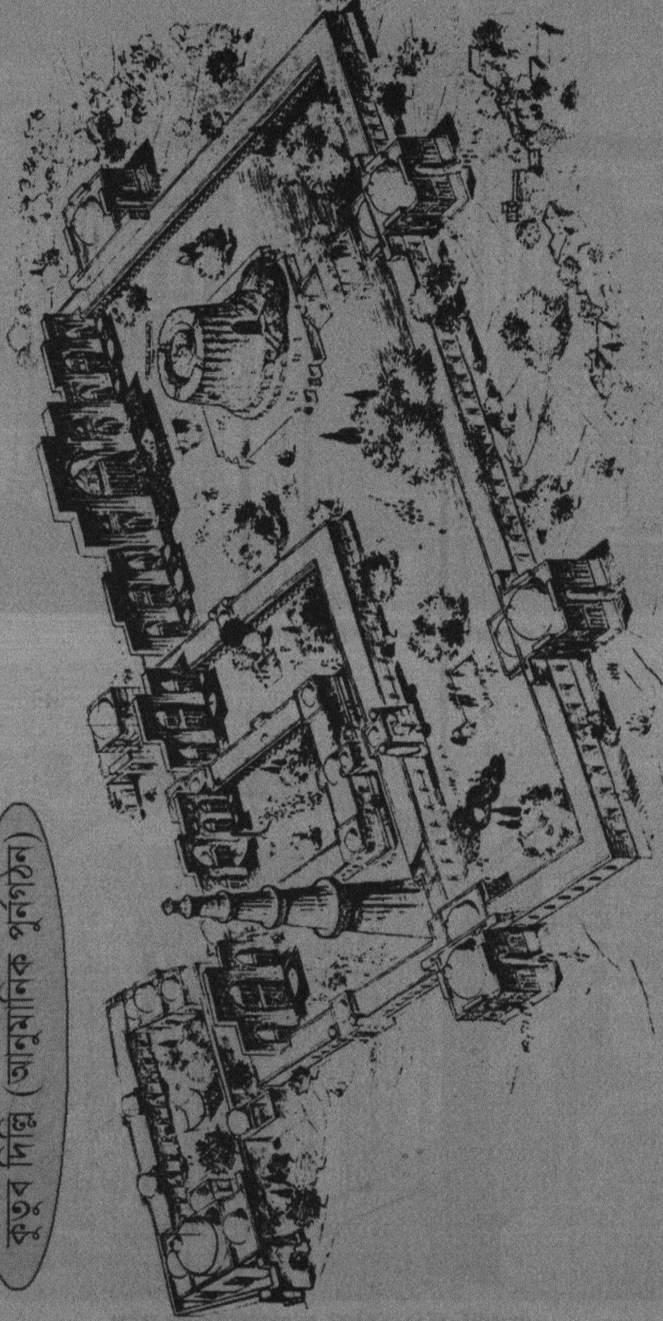
আলোকচিত্র–৯ : কুতুব দিল্লি (আনুমানিক পুনর্গঠন)
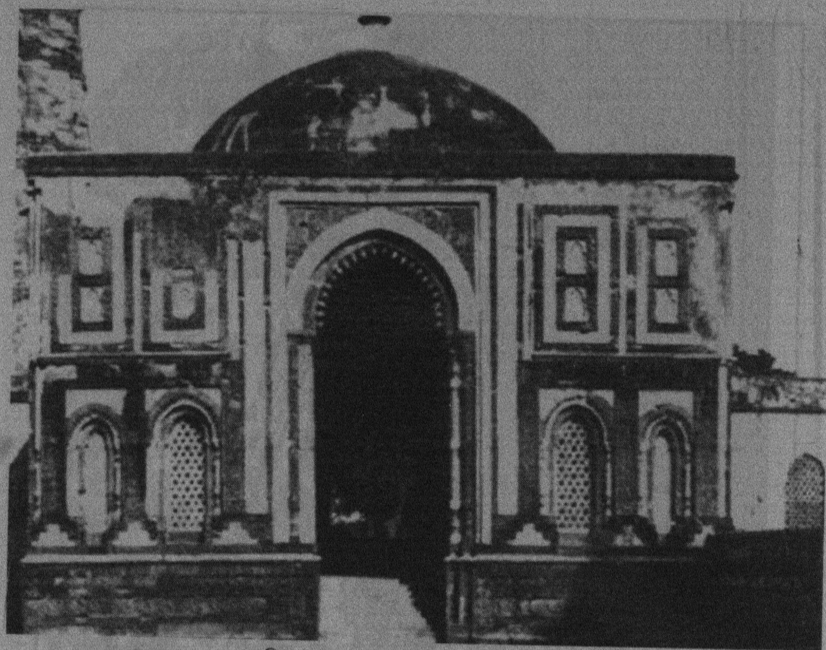
আলোকচিত্র–১০ : আলাই দরওয়াজা (দক্ষিণ ফাসাদ)
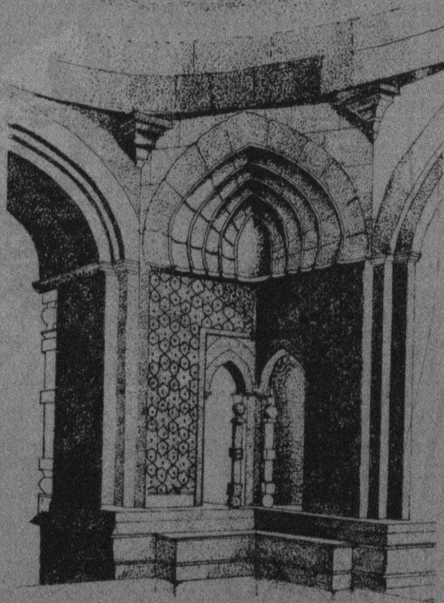
আলোকচিত্র–১১ : আলাই দরওয়াজার কোনার স্কুইঞ্চ
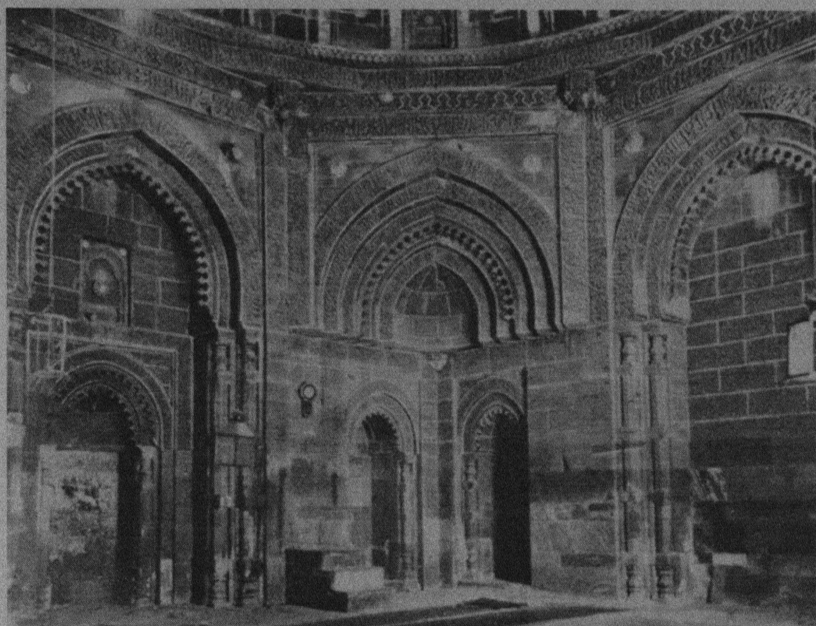
আলোকচিত্র-১২ : জামাত খানা মসজিদের অভ্যান্তরীণ দৃশ্য

আলোকচিত্র-১৩ : তোঘলকাবাদ, দিল্লি
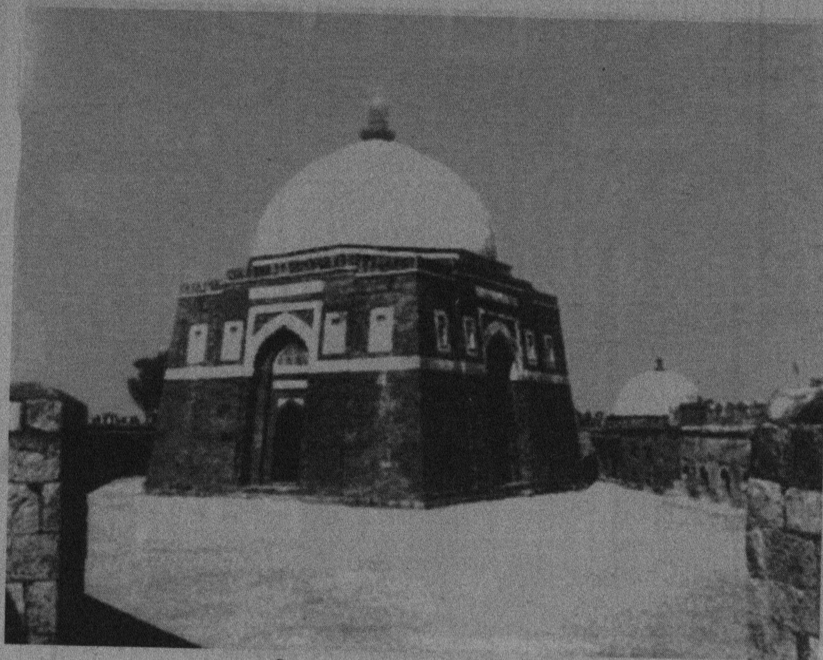
আলোকচিত্র–১৪ : গিয়াসউদ্দিন তোঘলকের সমাধি

আলোকচিত্র–১৫ : শাহ রুকন-ই-আলমের সমাধি

আলোকচিত্র–১৬ : কোট্‌লা ফিরুজশাহ, দিল্লি (আনুমানিক পুনর্গঠন)
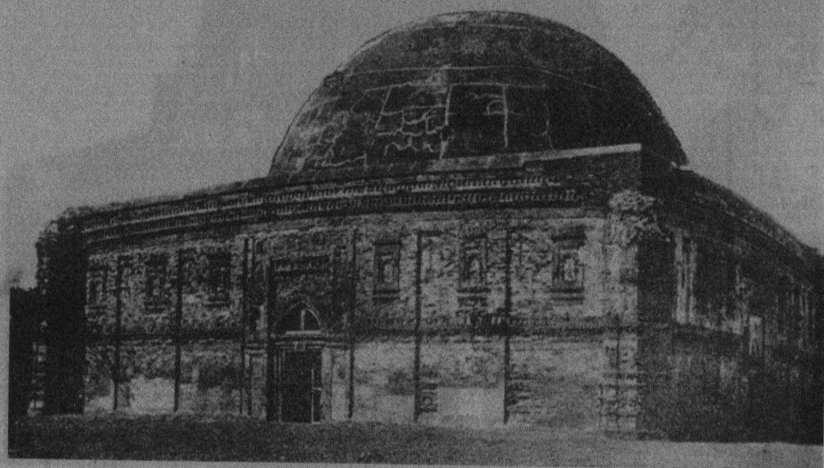
আলোকচিত্র–২১ : একলাখি সমাধি, হযরত পাণ্ডুয়া
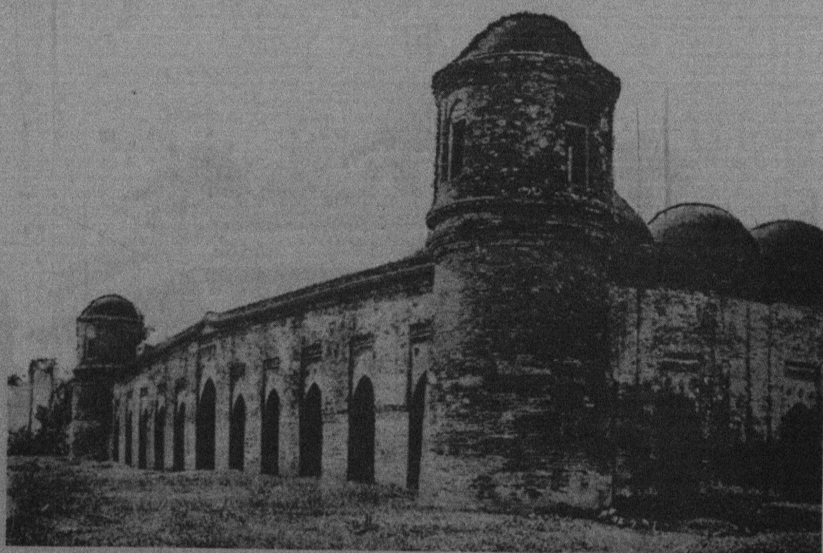
আলোকচিত্র–২২ : ষাট গম্বুজ মসজিদ, বাগেরহাট
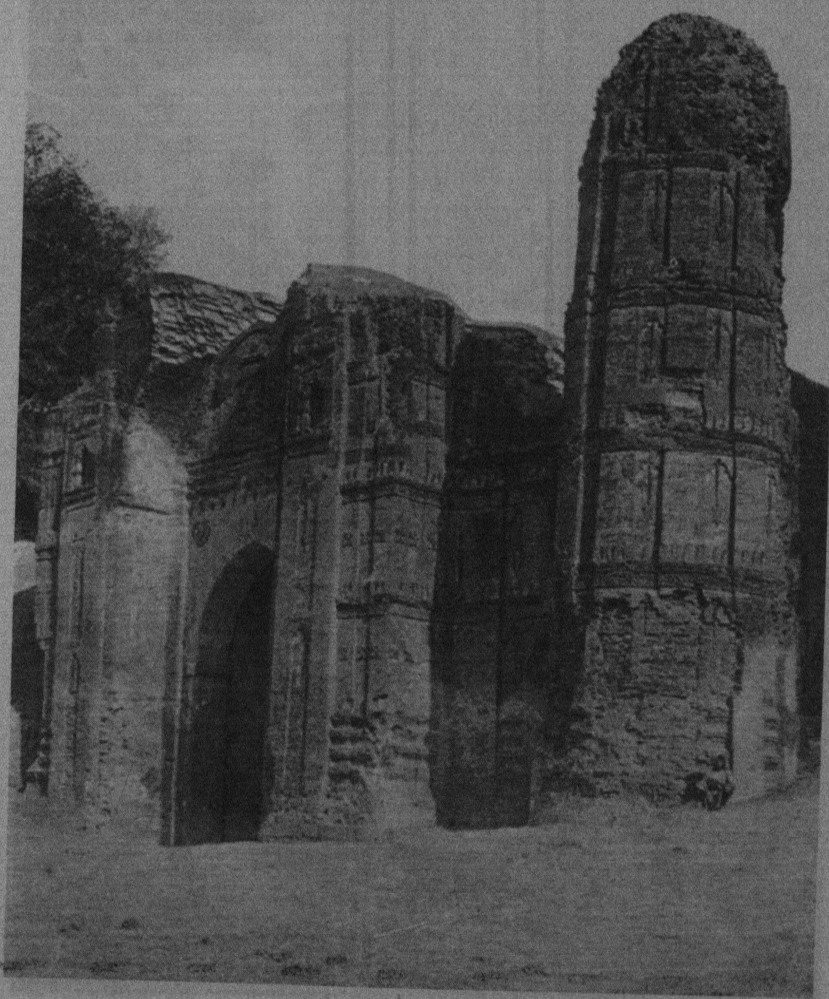
আলোকচিত্র–২৩ : দাখিল দরওয়াজা, গৌড়

আলোকচিত্র-২৪ : মাহীসন্তোষ মসজিদের উত্তর মিহরাবের অলঙ্করণ
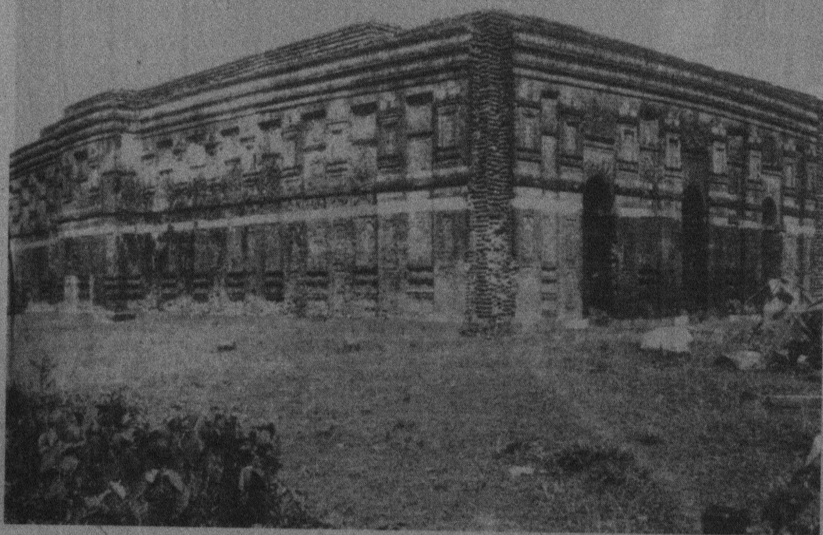
আলোকচিত্র-২৫ : দরসবাড়ী মসজিদ, গৌড়

আলোকচিত্র–২৬ : ফিরোজ মিনার, গৌড়
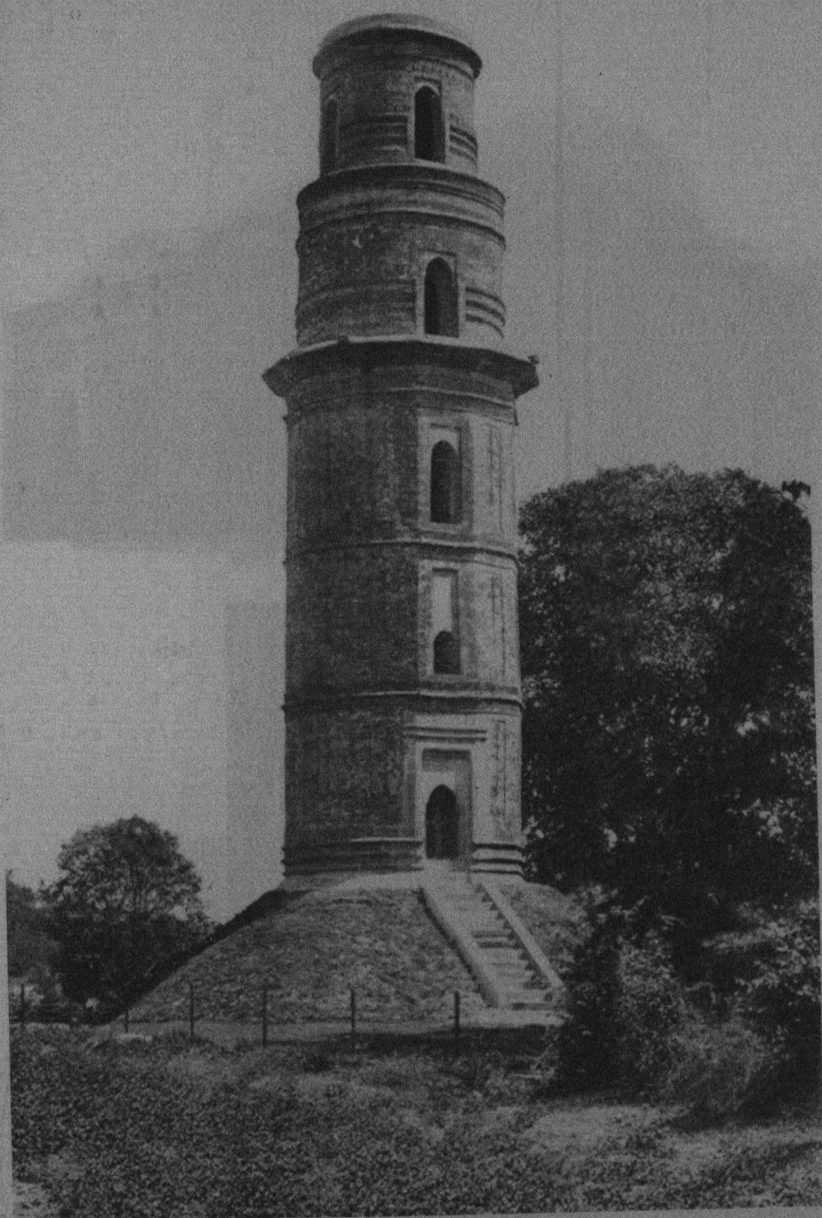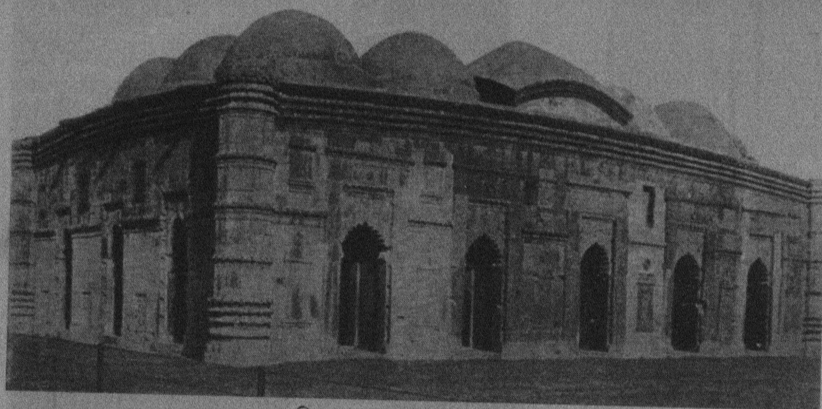
আলোকচিত্র–২৭ : ছোটসোনা মসজিদ, গৌড়

আলোকচিত্র–২৮ : শিকল-ঘণ্টা নকশা, ছোটসোনা মসজিদ, গৌড়
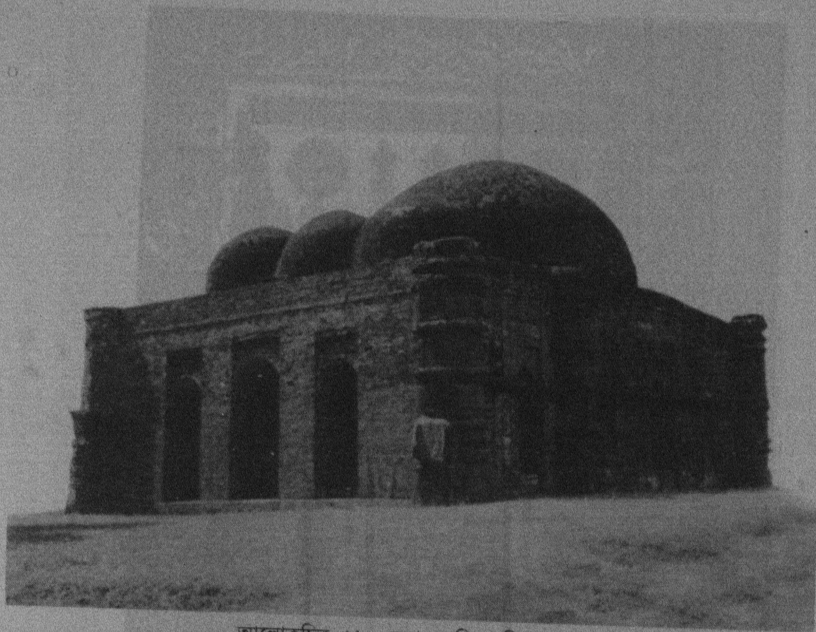
আলোকচিত্র–২৯ : সুরা মসজিদ, দিনাজপুর
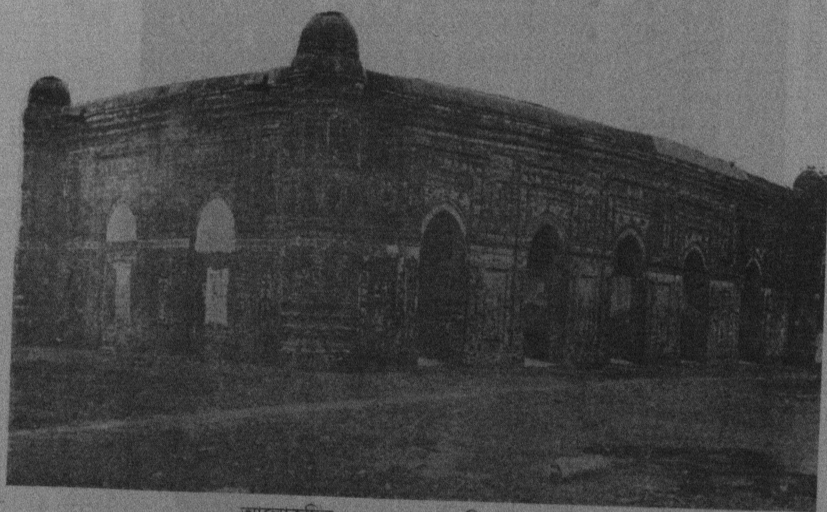
আলোকচিত্র–৩০ : বাঘা মসজিদ, রাজশাহী

আলোকচিত্র–৩১ : বাঘা মসজিদের টেরাকোটা নকশা
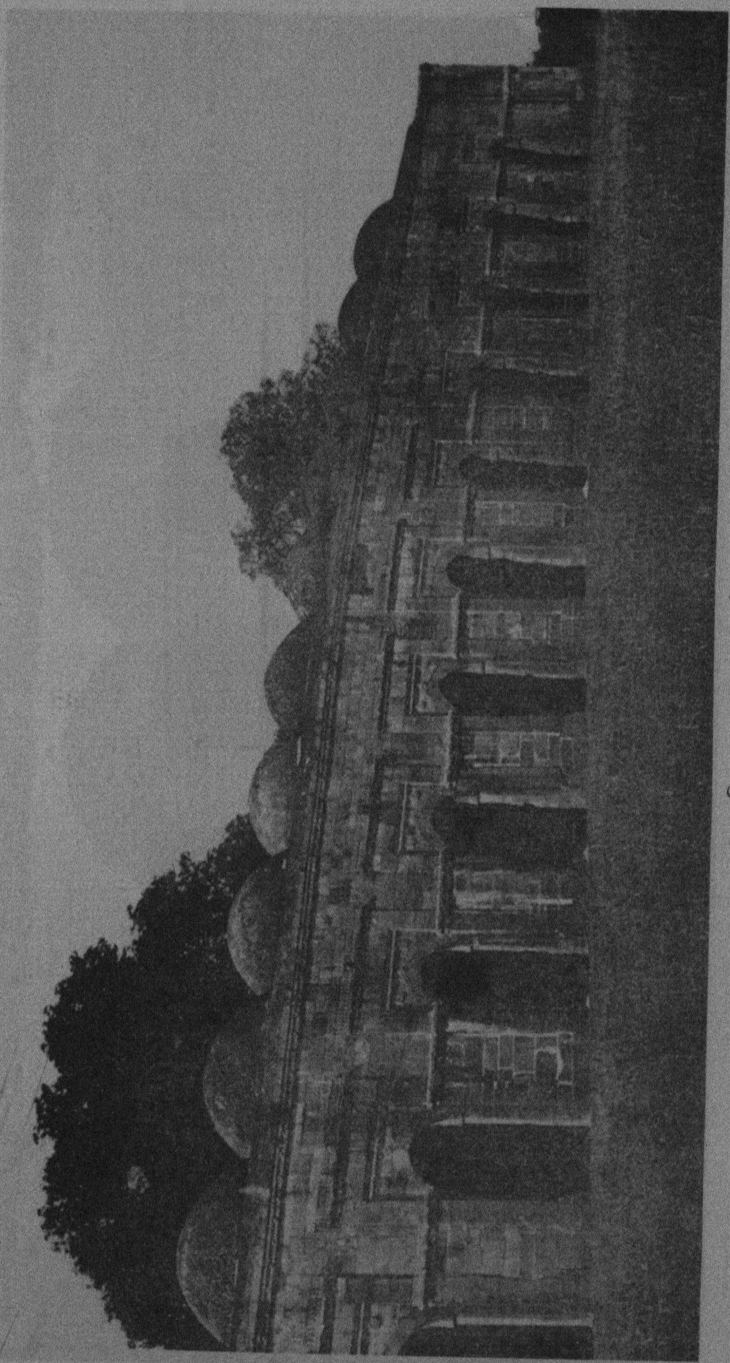
আলোকচিত্র–৩২ : বড়সোনা মসজিদ, গৌড়
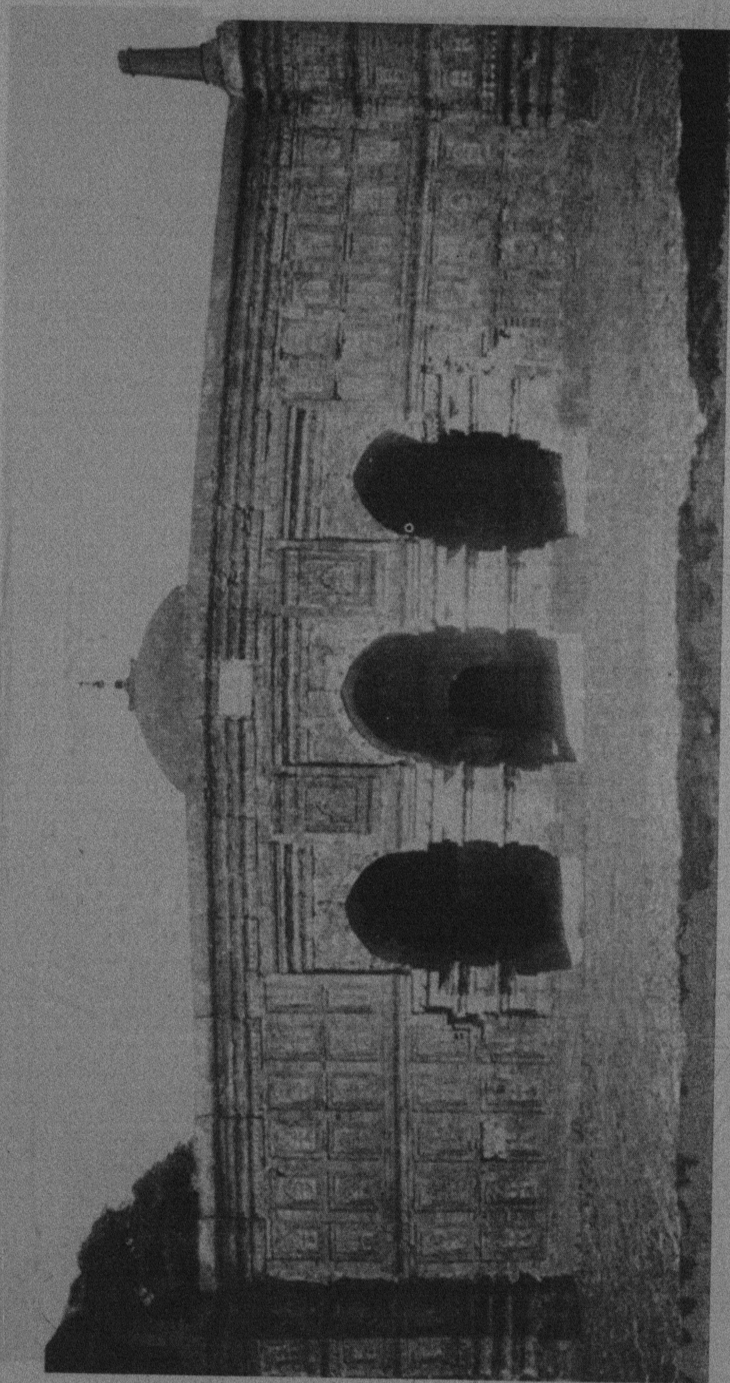
আলোকচিত্র-৩৩ : কদম রসুল মসজিদ, গৌড়
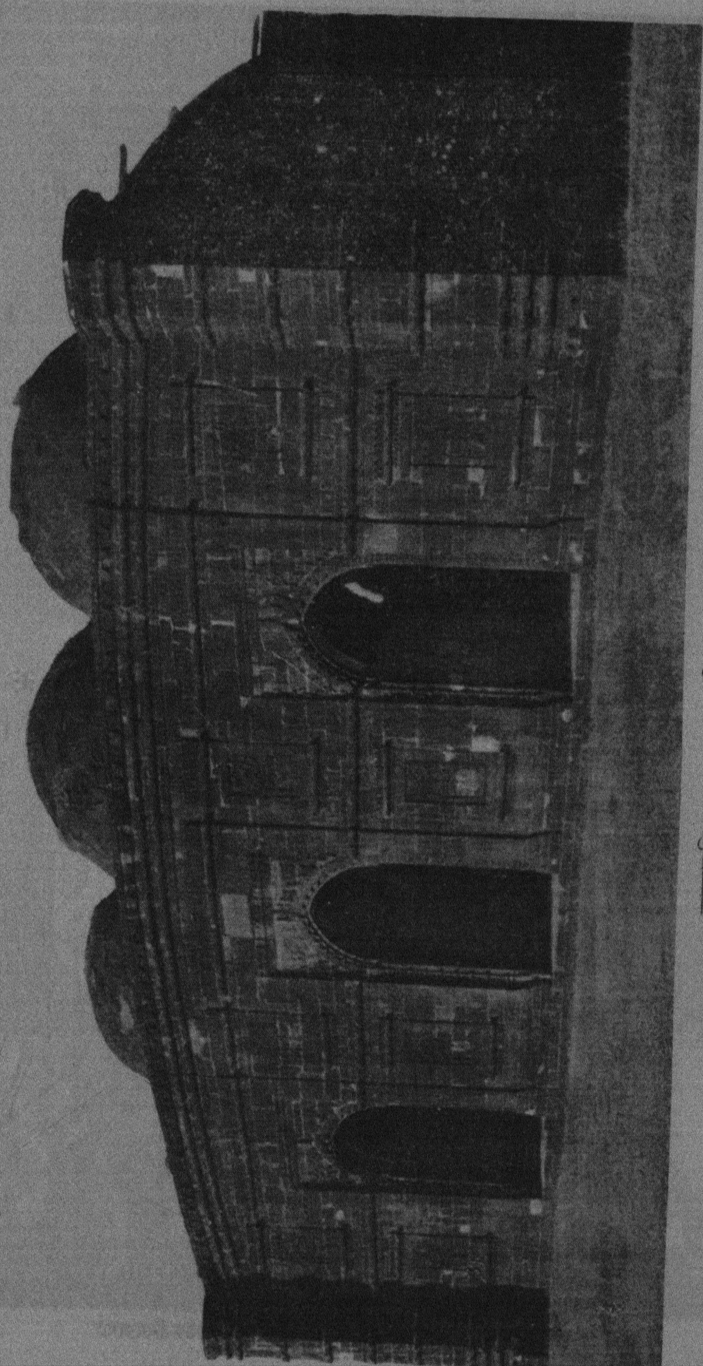
আলোকচিত্র–৩৪ : কুসুম্বা মসজিদ (১৫৫৮), রাজশাহী

আলোকচিত্র–৩৫ : কুসুম্বা মসজিদের প্রস্তর মিহরাব

আলোকচিত্র-৩৬ : খেরুয়া মসজিদ (১৫৮২), বগুড়া

আলোকচিত্র-৩৭ : আতিয়া মসজিদ (১৬০৯), টাঙ্গাইল

আলোকচিত্র–৩৮ : ফতেহ্ খানের সমাধি (১৬৬০), গৌড়

আলোকচিত্র–৩৯ : তাহখানা কমপ্লেক্স, গৌড়
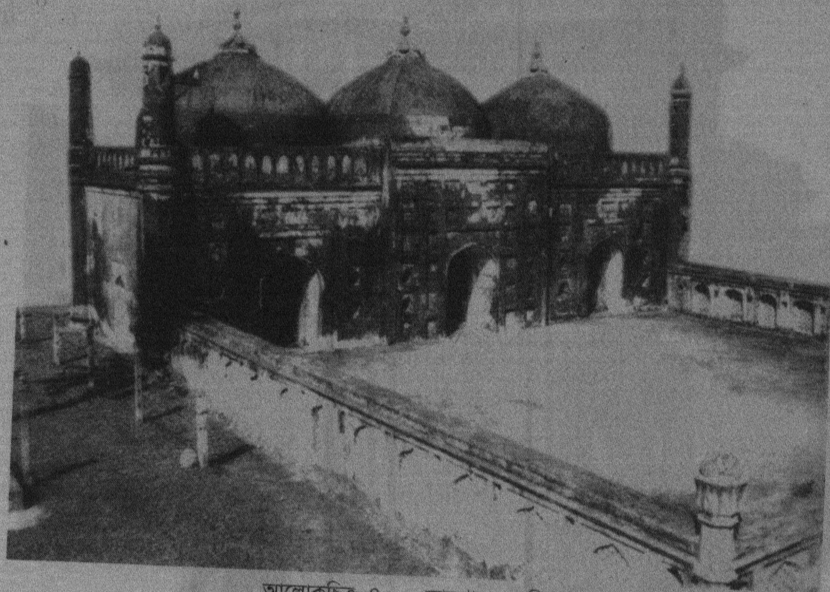
আলোকচিত্র-৪০ : তাহখানা মসজিদ
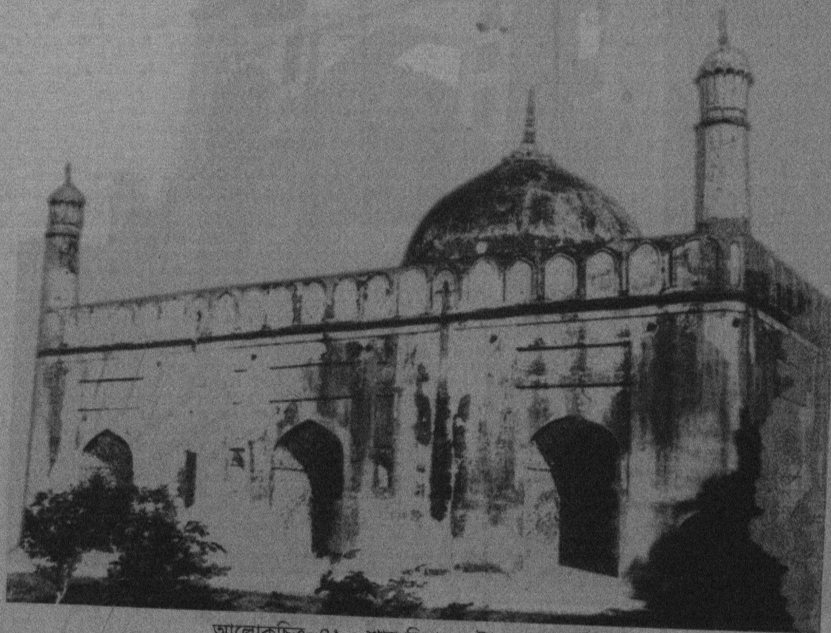
আলোকচিত্র-৪১ : শাহ নিয়ামত উল্লাহ-এর সমাধি
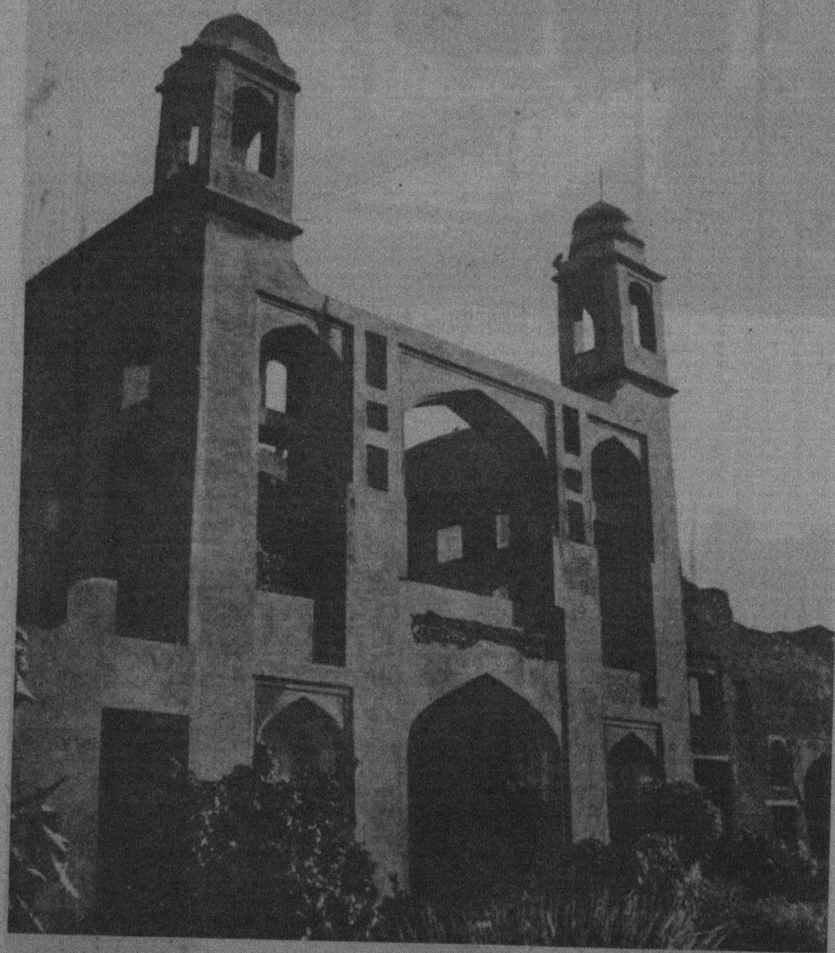
আলোকচিত্র–৪২ : লালবাগ দুর্গের প্রধান প্রবেশ তোরণ
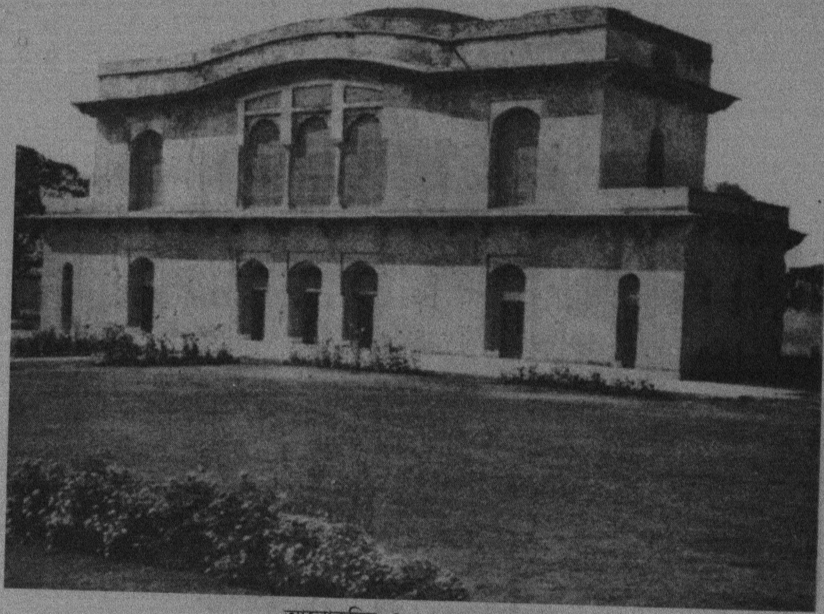
আলোকচিত্র-৪৩ : দরবার হল
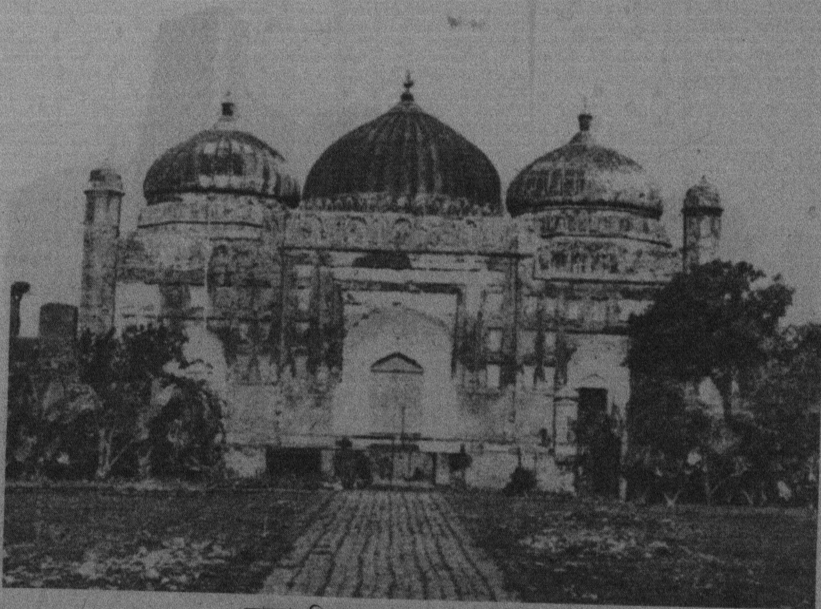
আলোকচিত্র-৪৪ : লালবাগ দুর্গ মসজিদ

আলোকচিত্র–৪৫ : পরী বিবির সমাধি
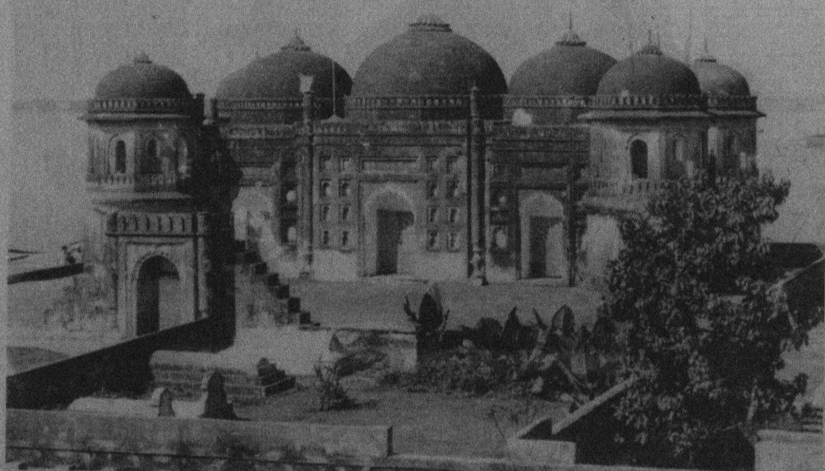
আলোকচিত্র–৪৬ : সাত গম্বুজ মসজিদ

আলোকচিত্র-৪৭ : ভাঙ্গনী মসজিদ, মিঠাপুকুর, রংপুর
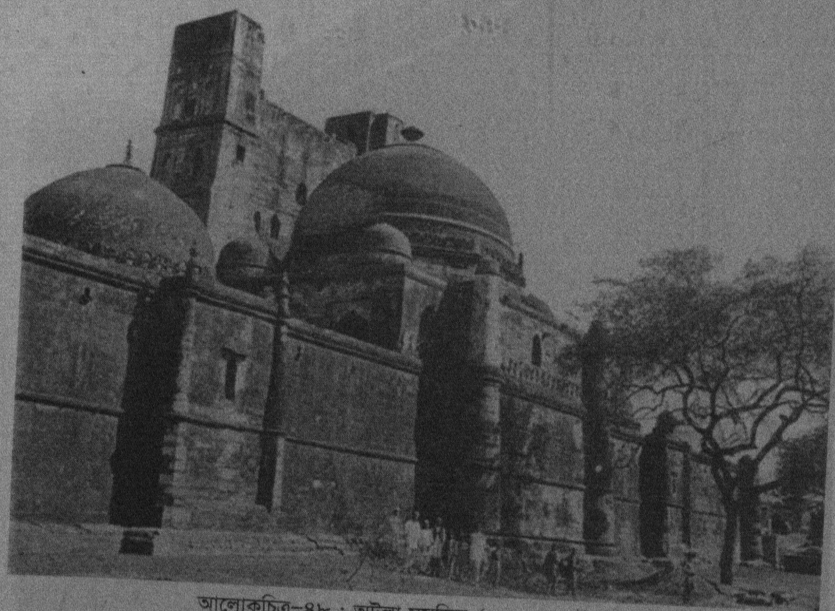
আলোকচিত্র-৪৮ : অটলা মসজিদ (১৪০৮), জৌনপুর
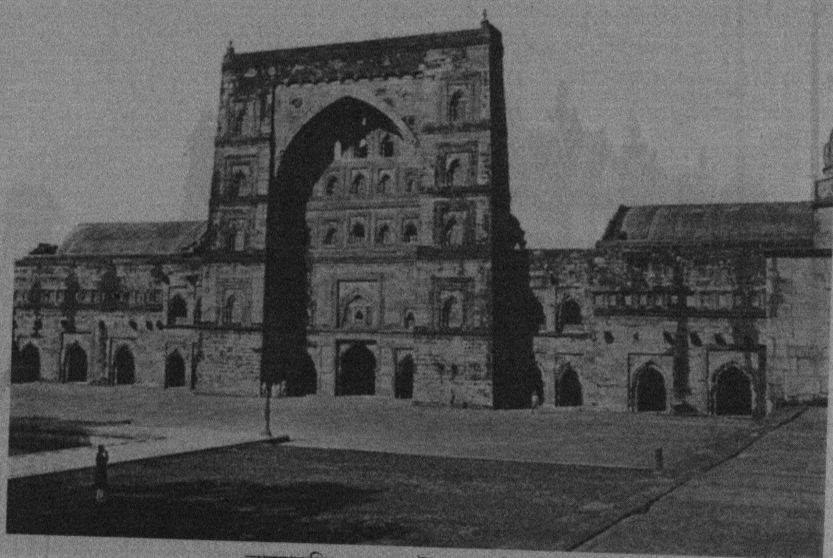
আলোকচিত্র-৪৯ : জৌনপুর জামি মসজিদ

আলোকচিত্র-৫০ : ভারুচ জামি মসজিদ, গুজরাট

আলোকচিত্র-৫১ : ক্যাম্বে জামি মসজিদ

আলোকচিত্র-৫২ : আহমদ শাহ মসজিদ, আহমদাবাদ

আলোকচিত্র–৫৩ : আহমদাবাদ জামি মসজিদের প্রধান খিলান পথ

আলোকচিত্র–৫৪ : তিন দরওয়াজা, আহমদাবাদ
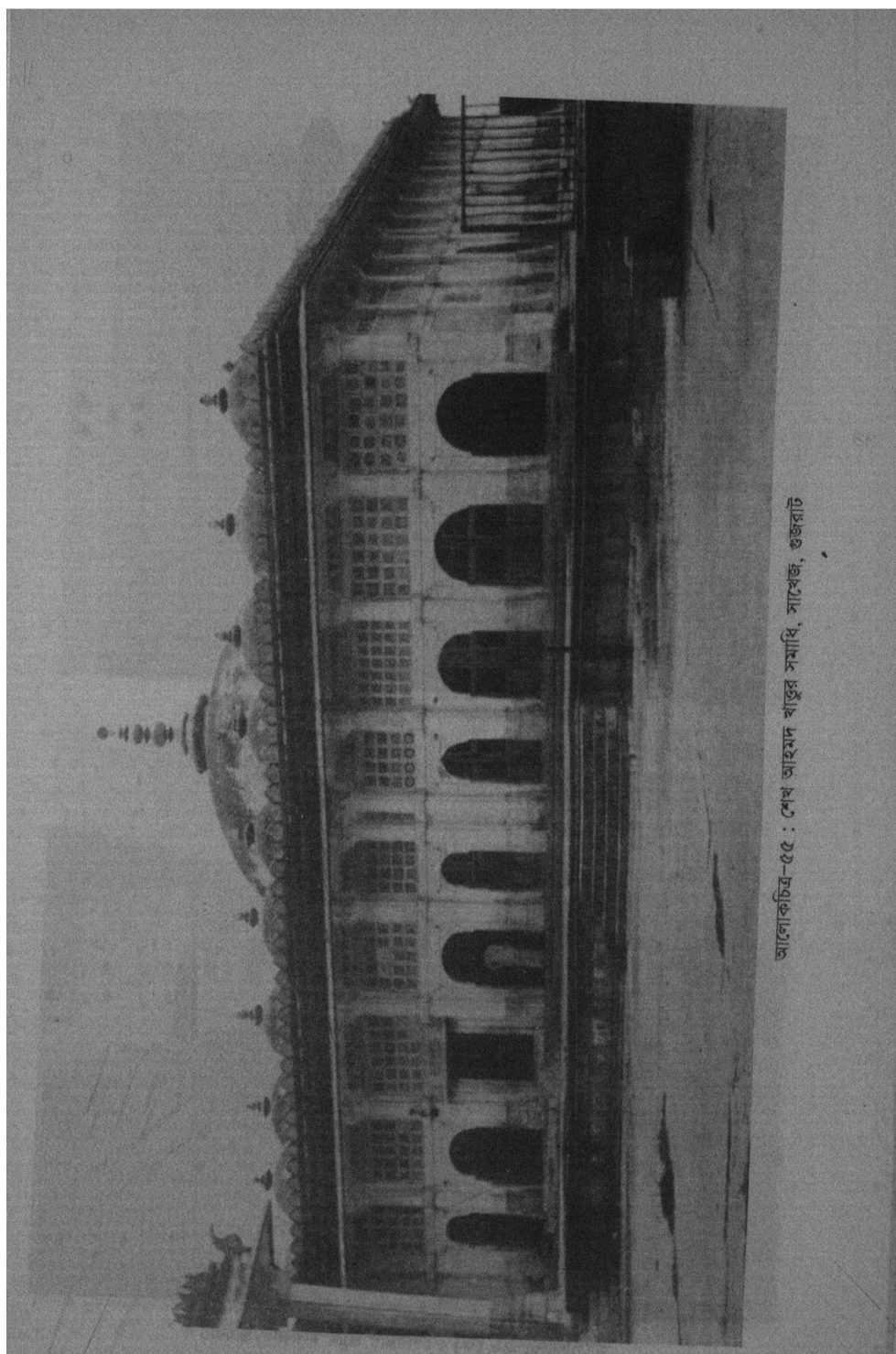
আলোকচিত্র–৫৫ : শেখ আহমদ খাত্তুর সমাধি, সাখেজ, গুজরাট

আলোকচিত্র-৫৬ : চম্পানার জামি মসজিদ, গুজরাট

আলোকচিত্র-৫৬ (ক) : চম্পানার জামি মসজিদ, গুজরাট

আলোকচিত্র–৫৬ (খ) : কেন্দ্রীয় মিহরাবের তলছাদ অলঙ্করণ

আলোকচিত্র–৫৭ : নাগিনা মসজিদ, চম্পানার
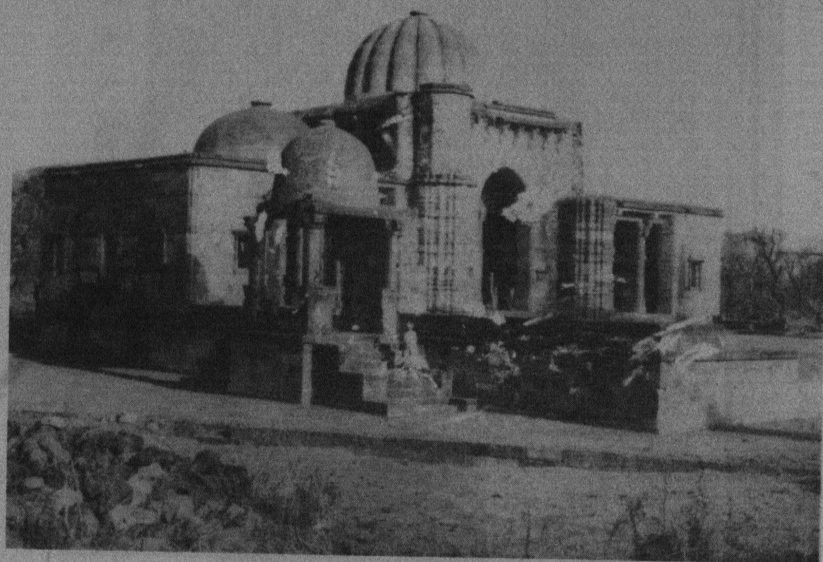
আলোকচিত্র-৫৮ : নীলা গম্বুজ মসজিদ, চম্পানার
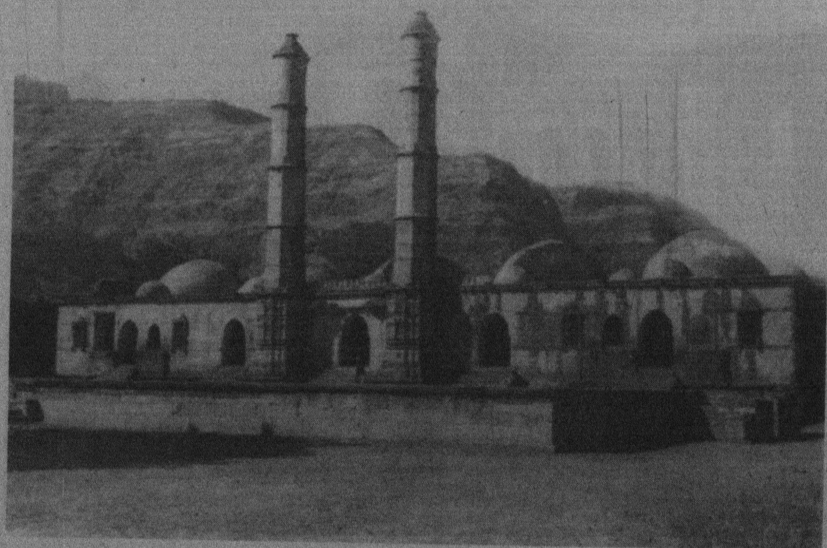
আলোকচিত্র-৫৯ : শাহী মসজিদ, চম্পানার
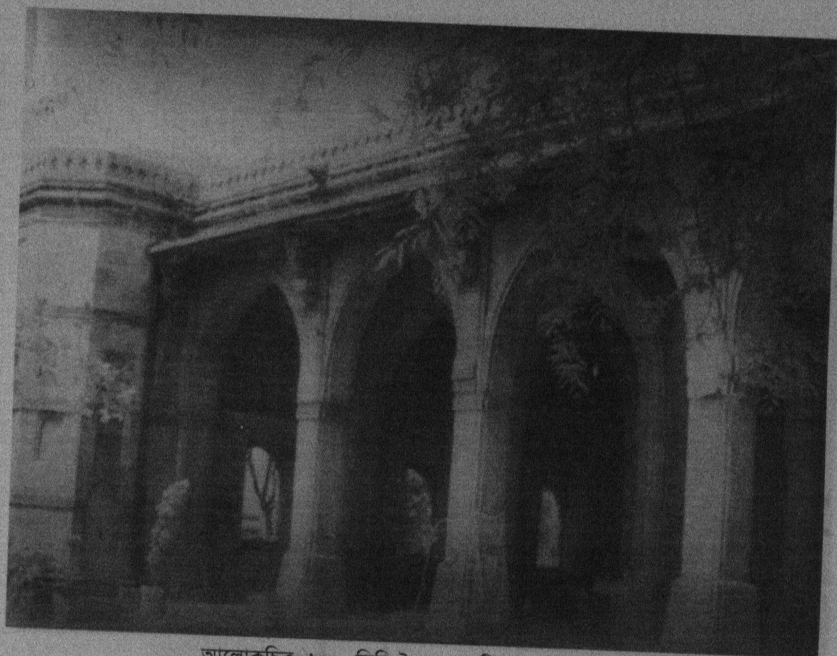
আলোকচিত্র–৬০ : সিদি সৈয়দ মসজিদ, আহমদাবাদ
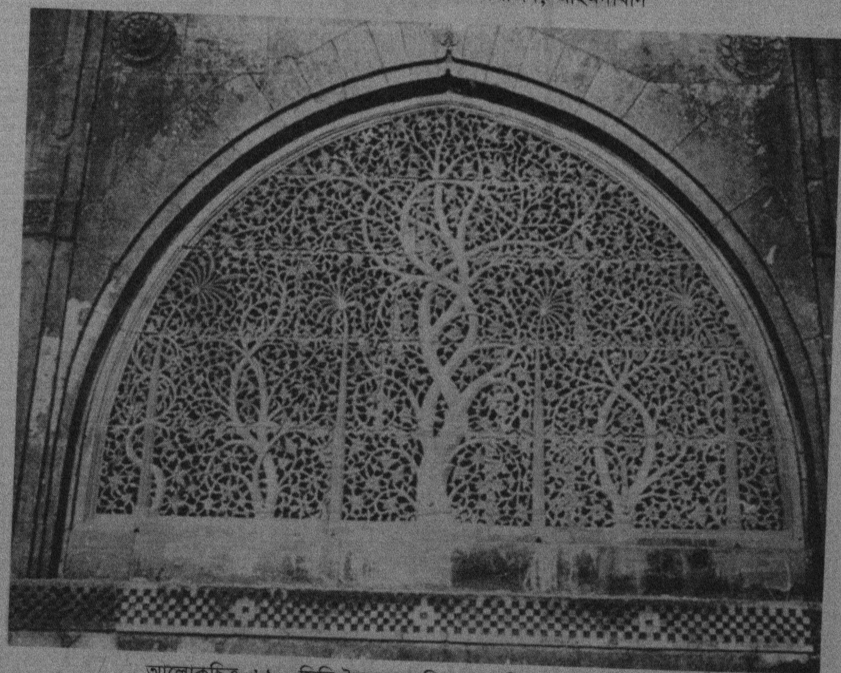
আলোকচিত্র–৬১ : সিদি সৈয়দ মসজিদের জালি নকশা, মাহমদাবাদ
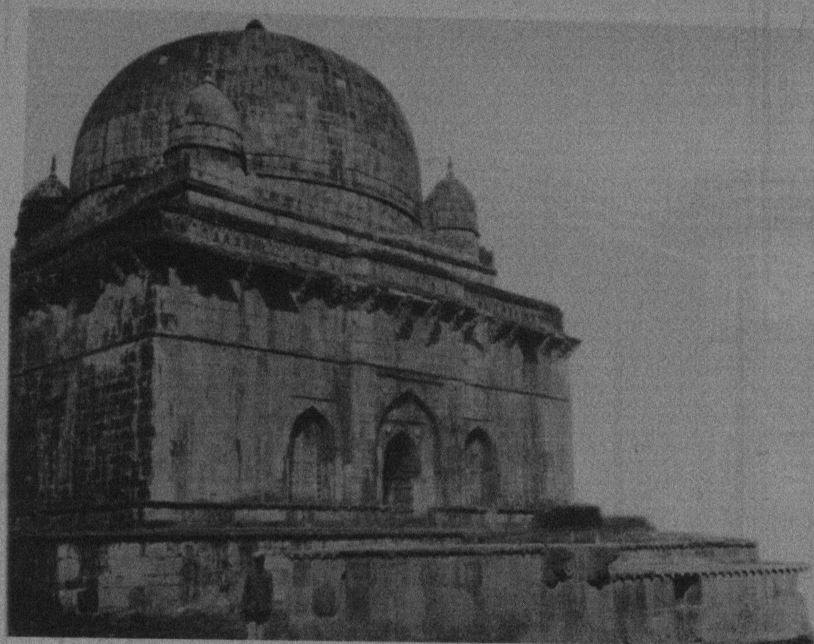
আলোকচিত্র–৬২ : হুসাং শাহের সমাধি, মান্দু

আলোকচিত্র–৬৩ : জাহাজ মহল, মান্দু
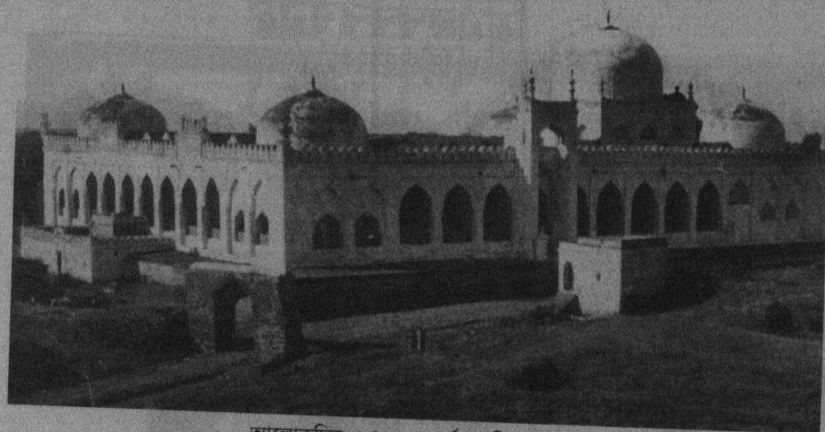
আলোকচিত্র–৬৪ : গুলবর্গা জামি মসজিদ
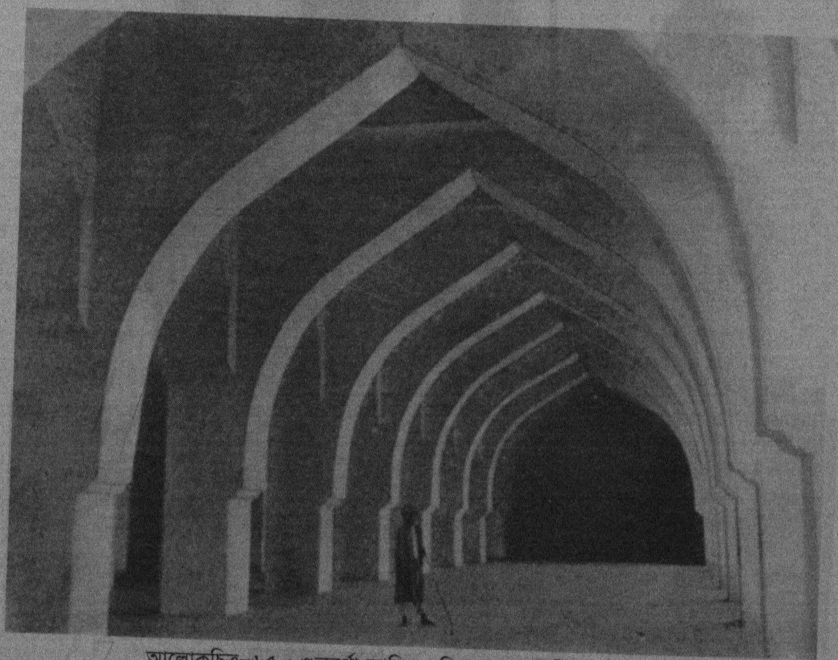
আলোকচিত্র–৬৫ : গুলবর্গা জামি মসজিদের অভ্যন্তরীণ খিলানশ্রেণী

আলোকচিত্র–৬৬ : চার মিনার, হায়দ্রাবাদ

আলোকচিত্র–৬৭ : বিজাপুর জামি মসজিদ
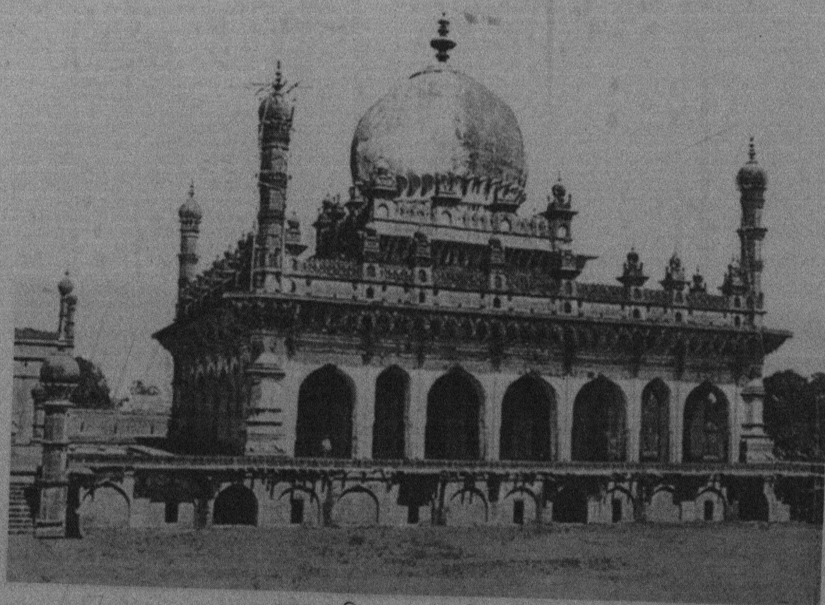
আলোকচিত্র–৬৮ : ইব্রাহিম রওজা
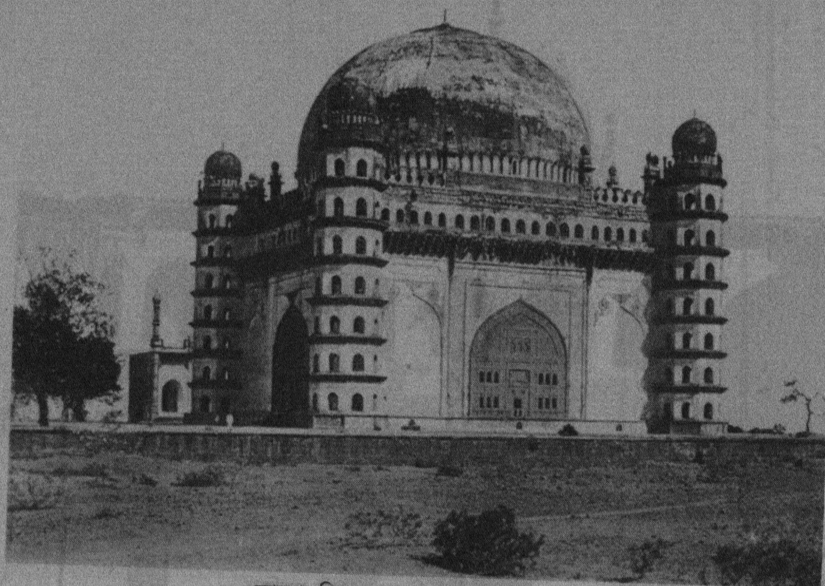
আলোকচিত্র–৬৯ : গোলগম্বুজ, বিজাপুর

আলোকচিত্র–৭০ : শ্রীনগর জামি মসজিদ
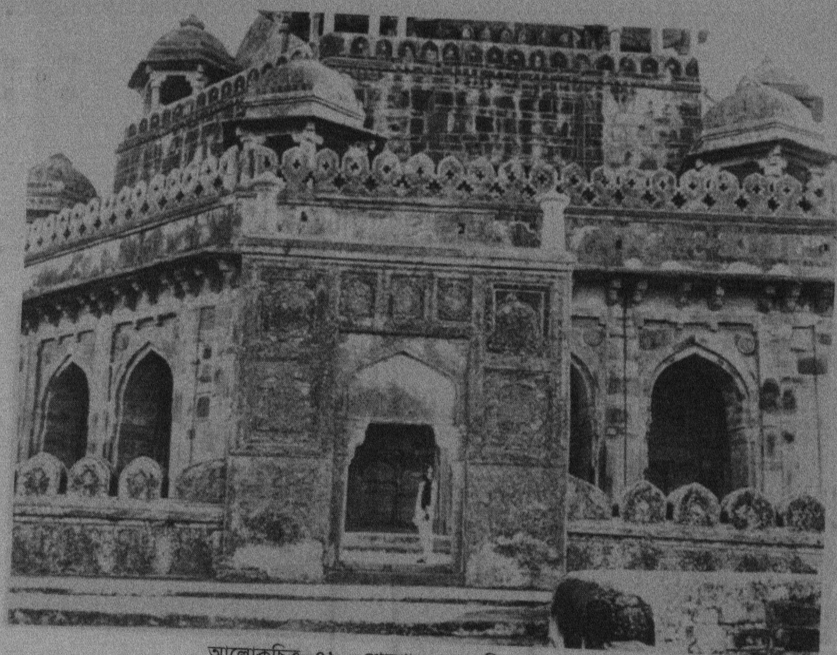
আলোকচিত্র–৭১ : শেরশাহের সমাধি, সাধারণ দৃশ্য

আলোকচিত্র–৭২ : কিলা-ই-কুহ্না মসজিদ
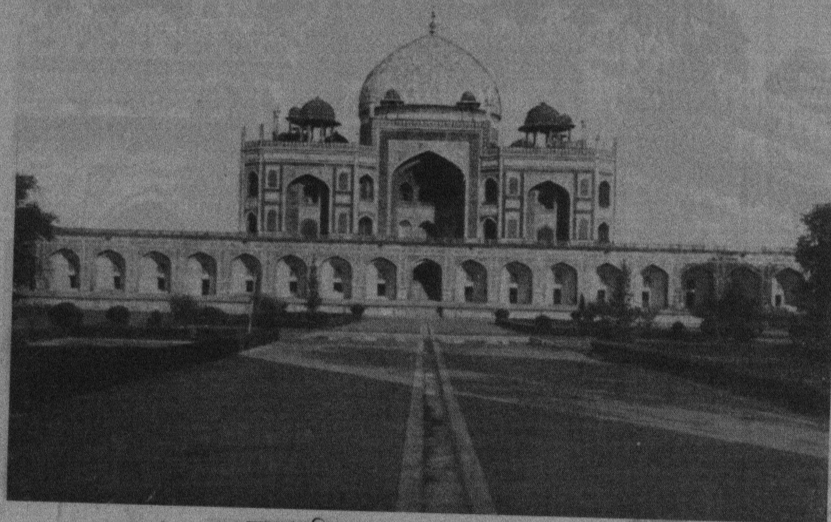
আলোকচিত্র–৭৩ : হুমায়ুনের সমাধি, দিল্লি

আলোকচিত্র–৭৪ : আগ্রা দুর্গের দিল্লি তোরণ
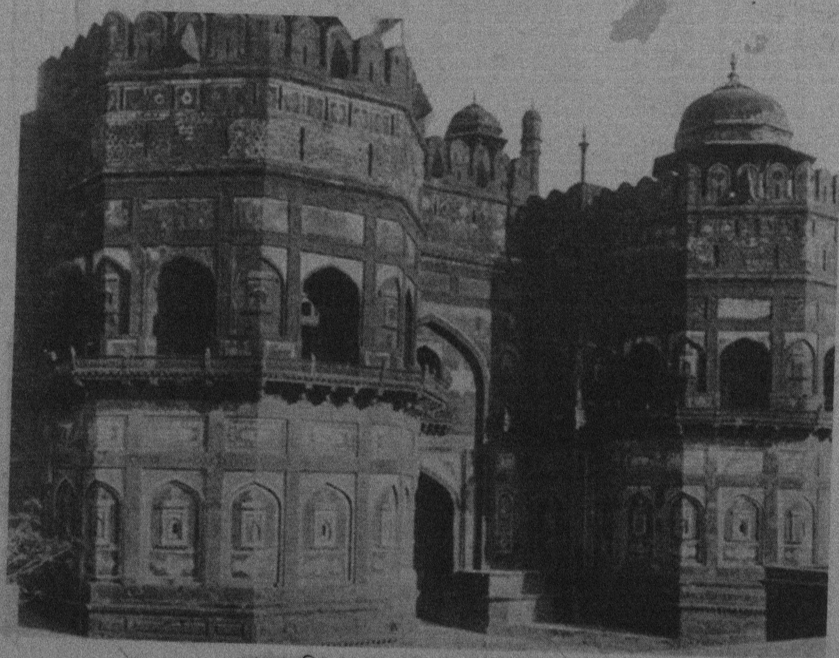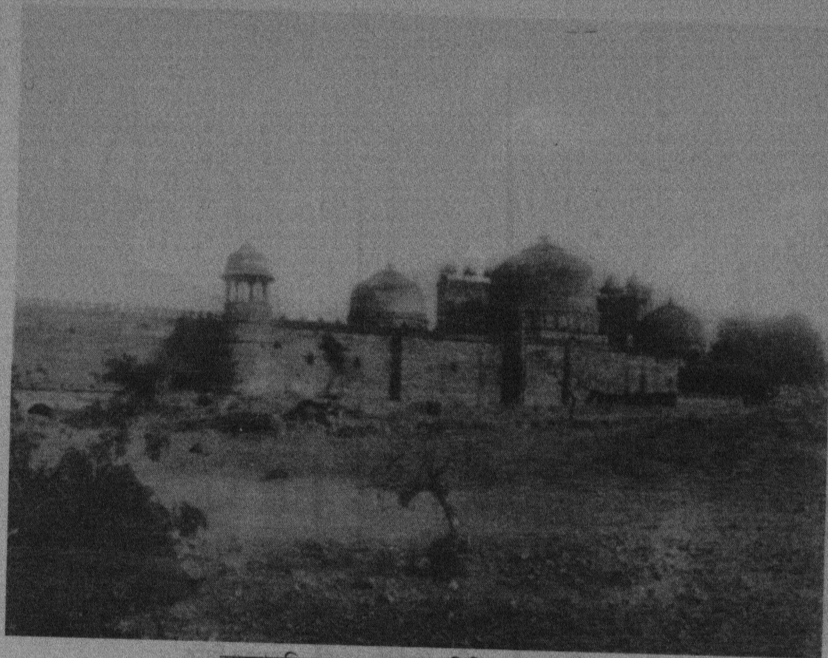
আলোকচিত্র–৭৫ : ফতেপুর সিক্রি জামি মসজিদ
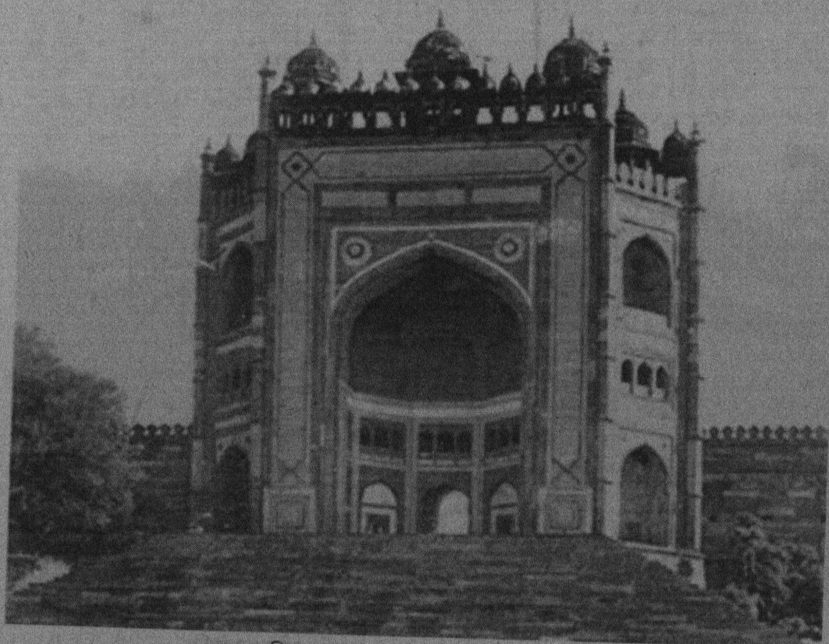
আলোকচিত্র–৭৬ : বুলন্দ দরওয়াজা, ফতেপুর সিক্রি
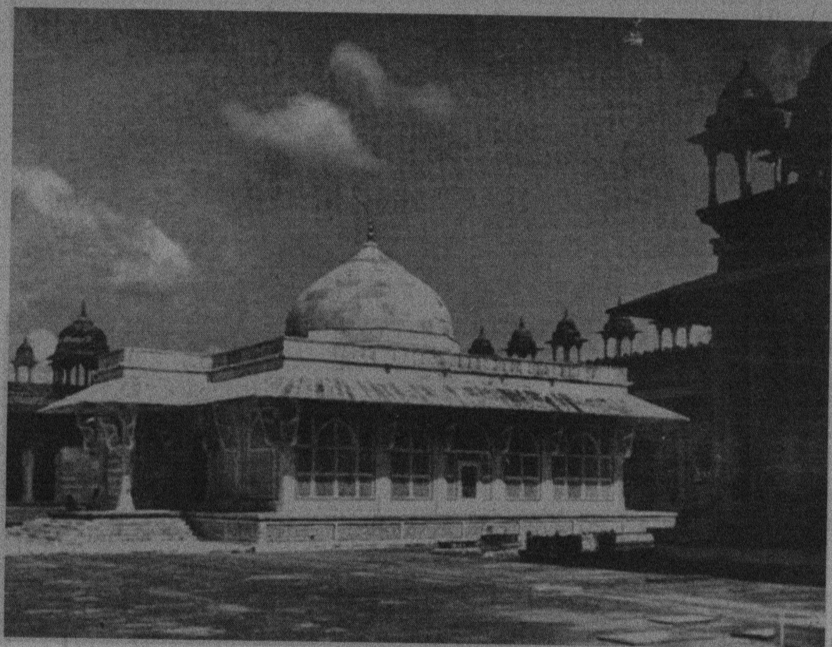
আলোকচিত্র–৭৭ : সেলিম চিশ্‌তির সমাধি, ফতেপুর সিক্রি
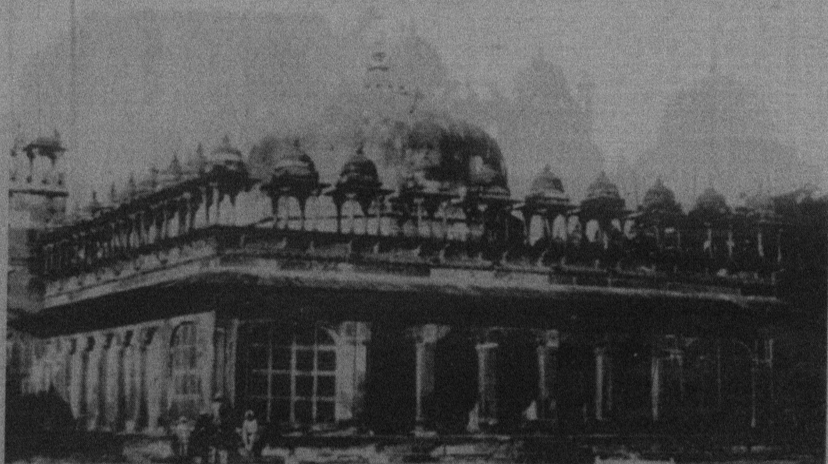
আলোকচিত্র–৭৮ : ইসলাম খানের সমাধি, ফতেপুর সিক্রি
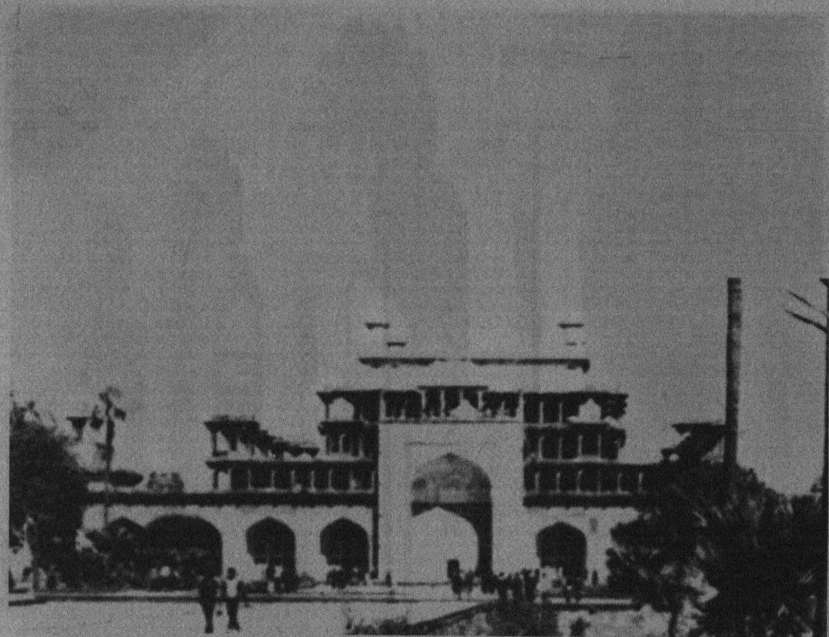
আলোকচিত্র–৭৯ : আকবরের সমাধি, সিকান্দ্রা
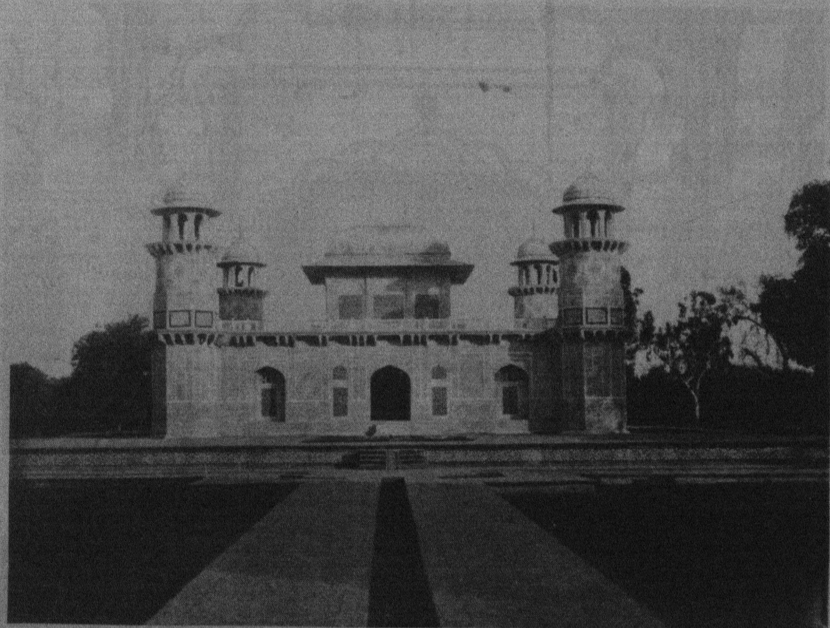
আলোকচিত্র–৮০ : ইতিমাদ-উদ-দৌলার সমাধি, আগ্রা
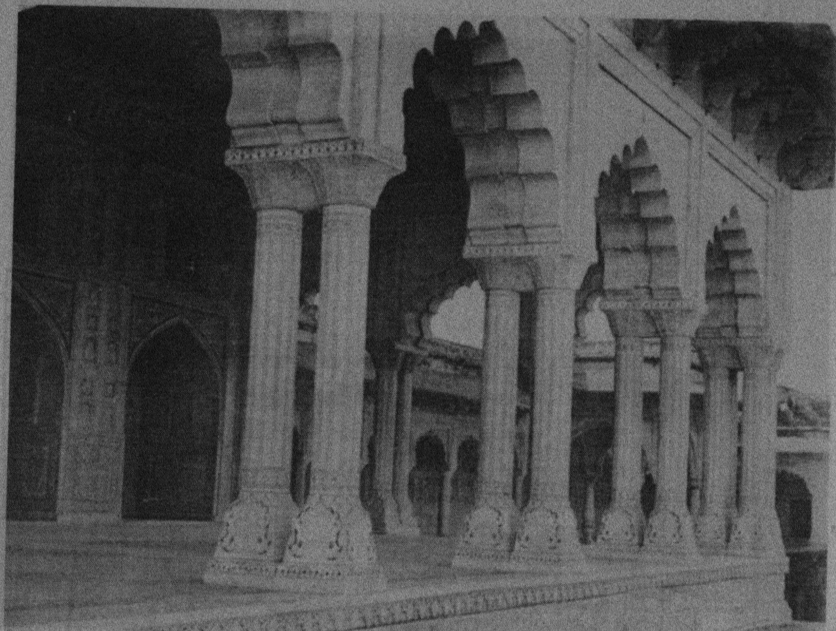
আলোকচিত্র–৮১ : দিওয়ান-ই-খাসের সম্মুখ দৃশ্য
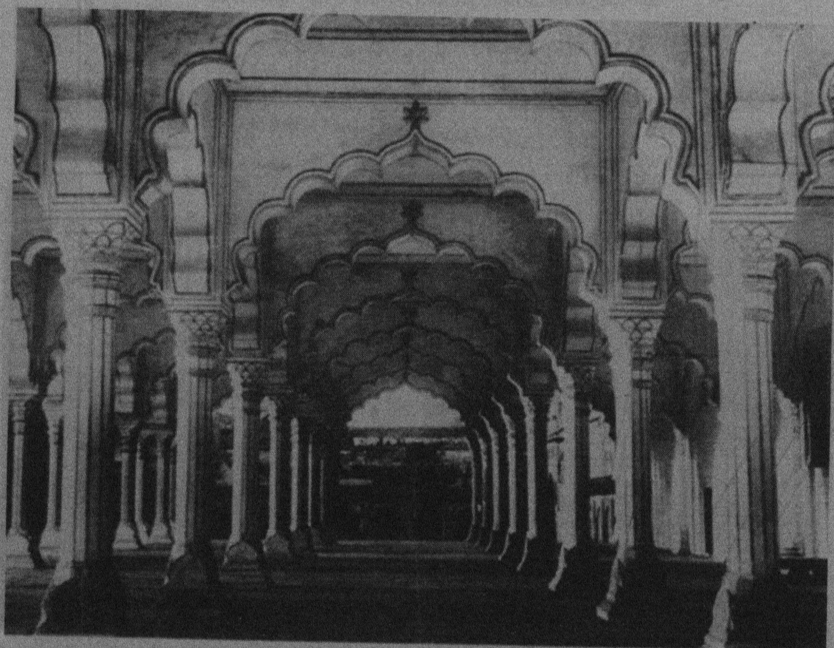
আলোকচিত্র–৮২ : দিওয়ান-ই-আমের অভ্যন্তরীণ দৃশ্য, আগ্রা
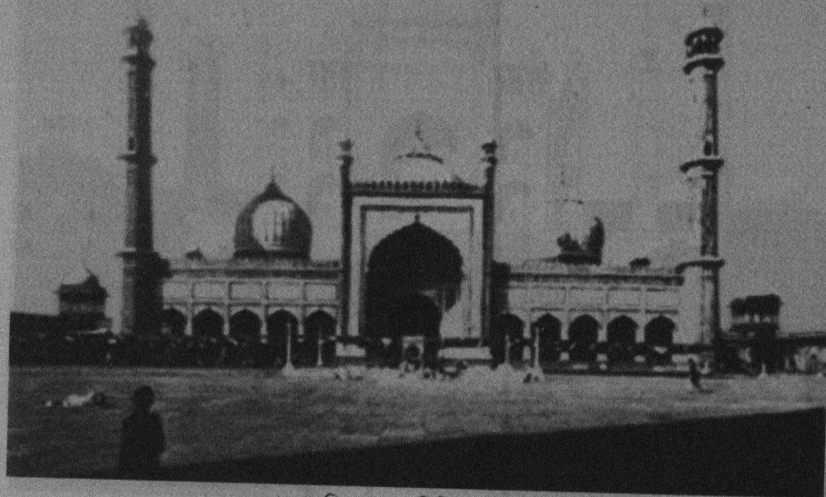
আলোকচিত্র–৮৩ : দিল্লি জামি মসজিদ
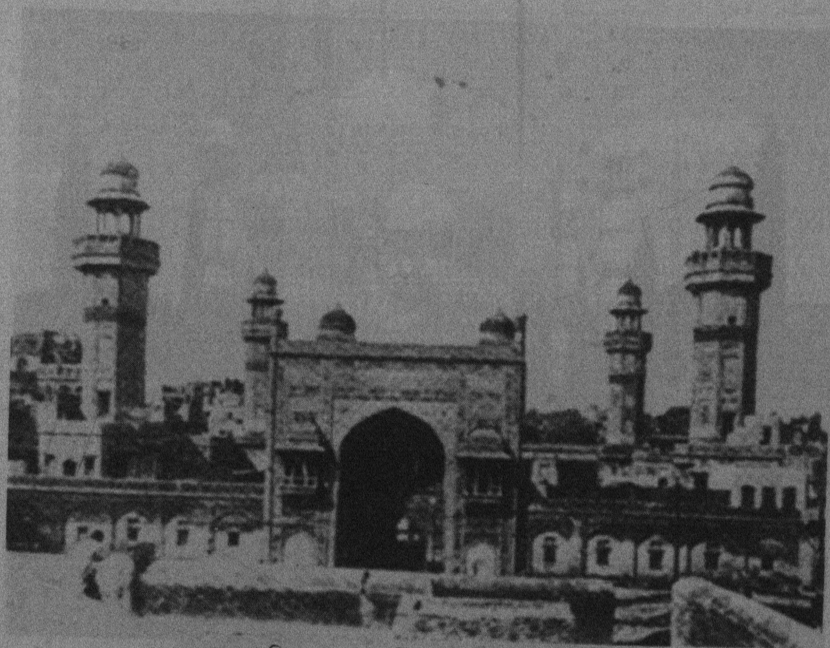
আলোকচিত্র–৮৪ : ওয়াজির খানের মসজিদ, লাহোর
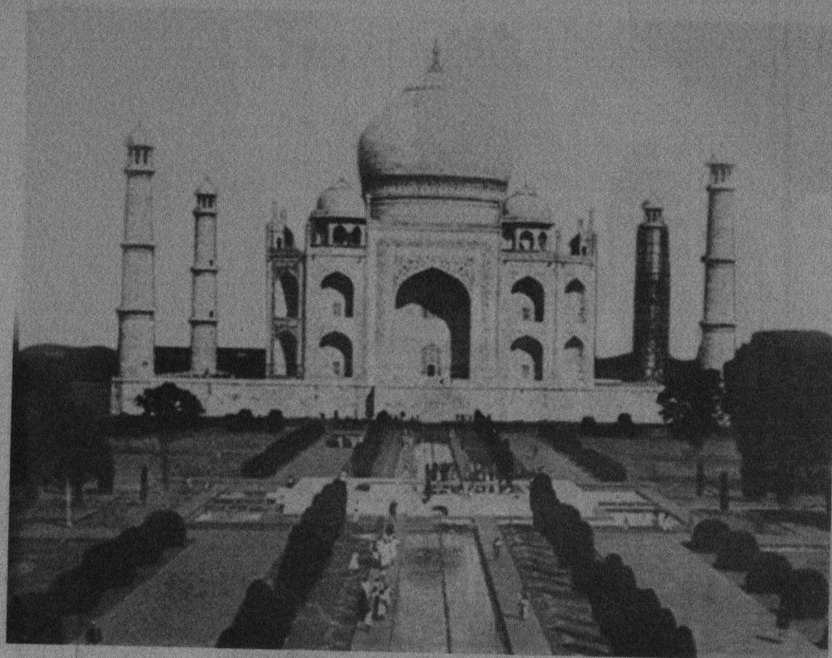
আলোকচিত্র–৮৫ : তাজমহল
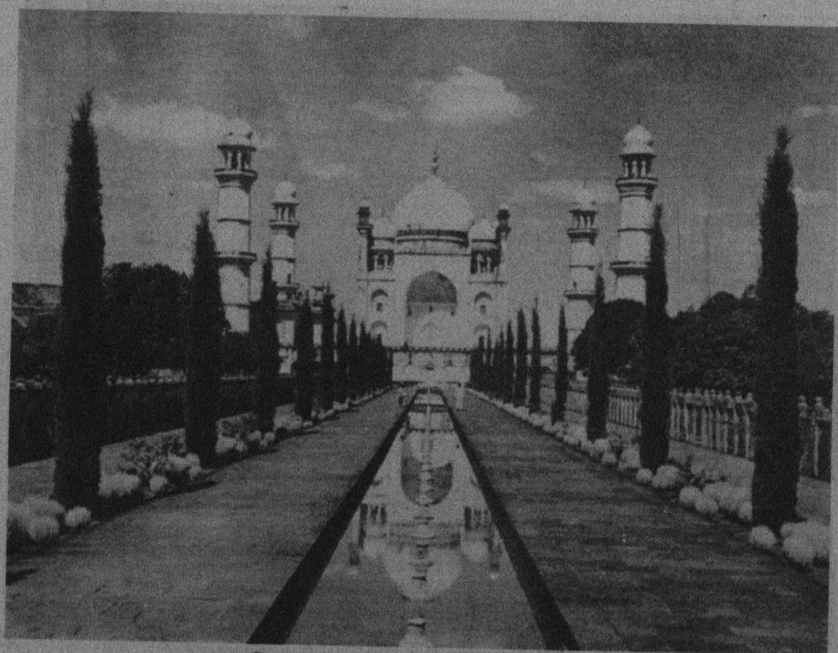
আলোকচিত্র–৮৬ : রাবেয়া দুররানীর সমাধি, আওরঙ্গাবাদ
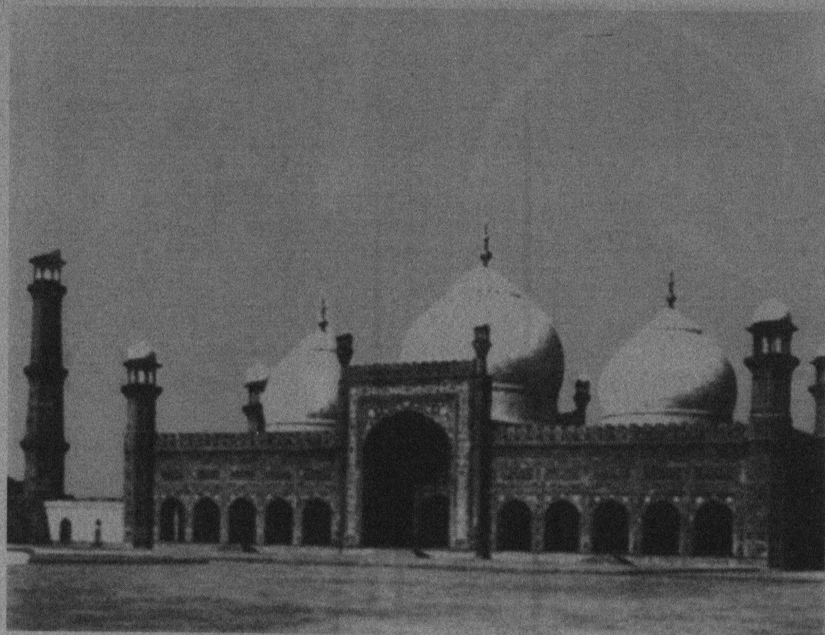
আলোকচিত্র-৮৭ : বাদশাহী মসজিদ, লাহোর

আলোকচিত্র-৮৮ : দিল্লির মতি মসজিদ
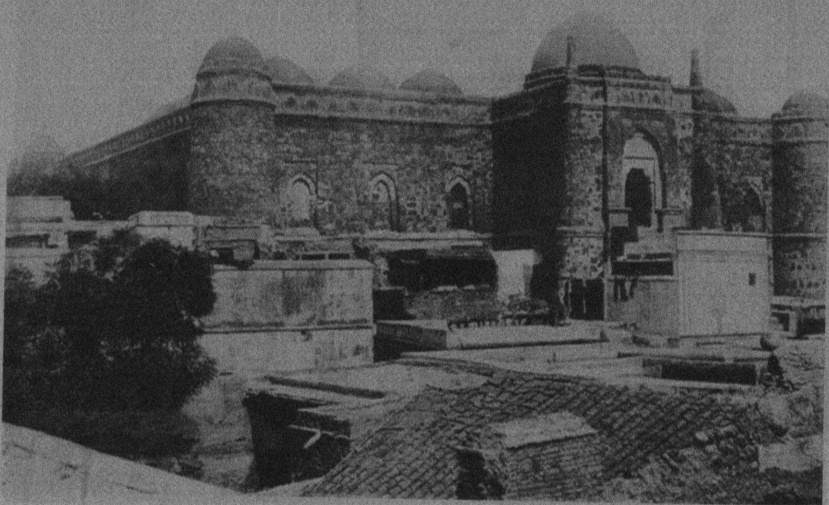
আলোকচিত্র–৮৯ : কালান মসজিদ, দিল্লি (পৃ. ৭৯)

আলোকচিত্র–৯০ : বড় গম্বুজ মসজিদ (পৃ. ৯৫)
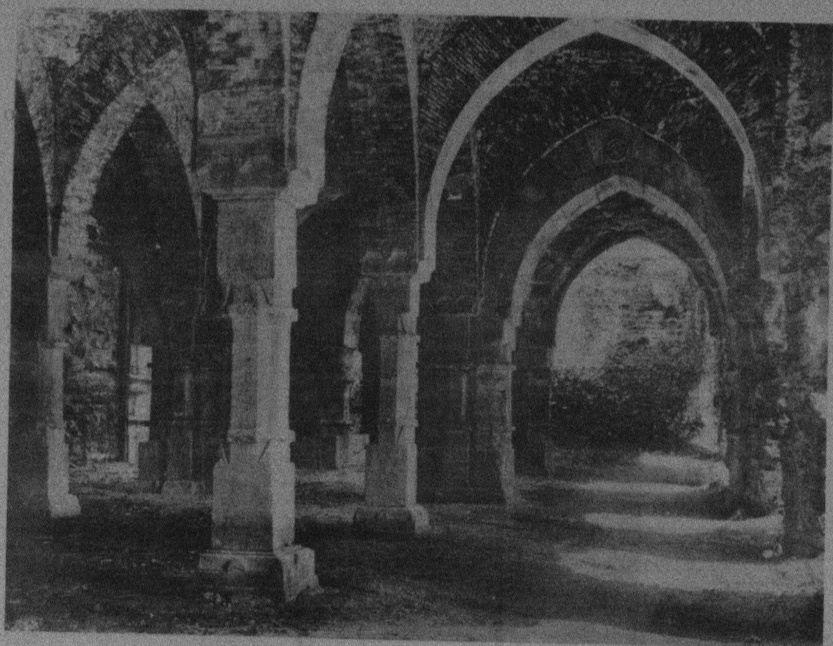
আলোকচিত্র–৯১ : গুণমান্ত মসজিদের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য (পৃ. ১১৭)
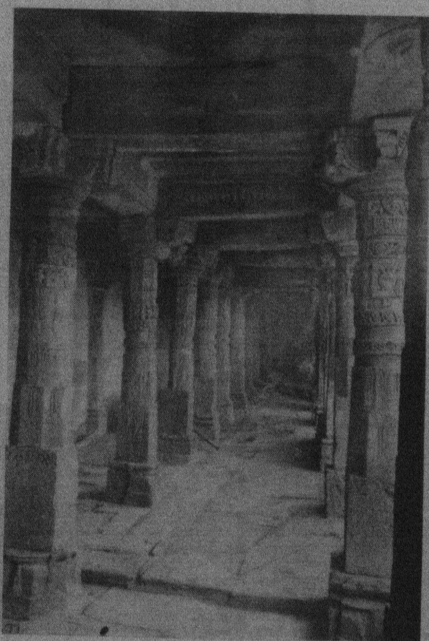
আলোকচিত্র–৯২ : ধোলকার তঙ্কা মসজিদের আভ্যন্তরীণ দৃশ্য (পৃ. ১৮৩)
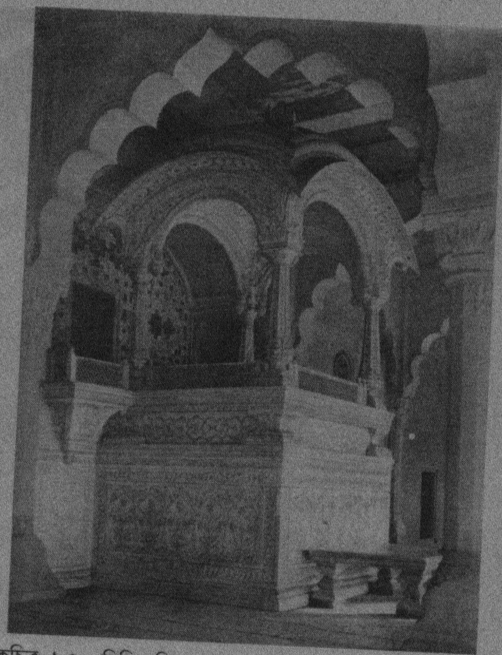
আলোকচিত্র-৯৩ : দিল্লির দিওয়ান-ই-আম-এর সিংহাসন (পৃ. ৩৪১-৩৪২)
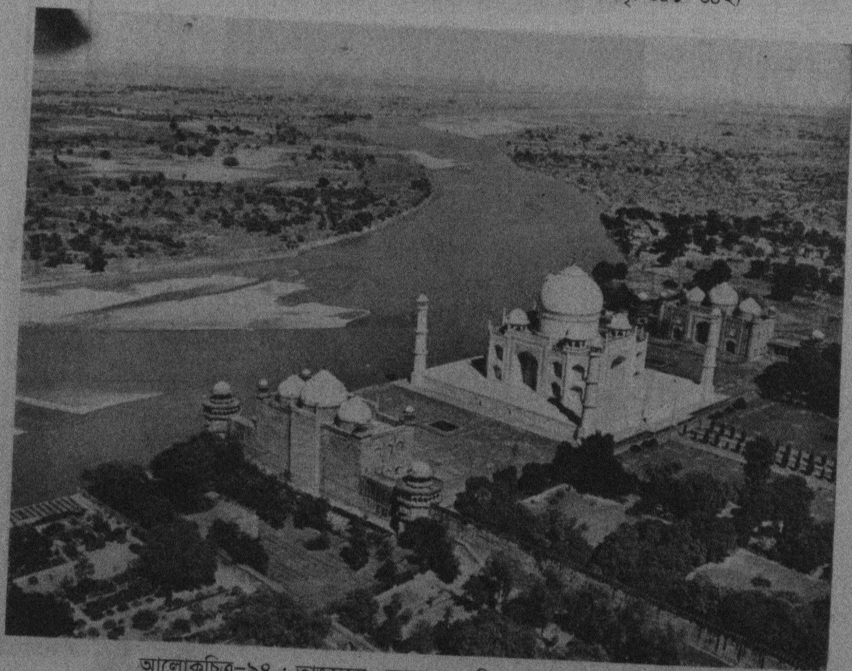
আলোকচিত্র-৯৪ : তাজমহল, (আকাশধৃত চিত্র) আগ্রা (পৃ. ৩৫৩-৩৬৩)